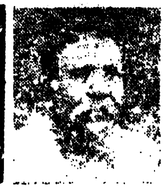




ভারতবর্ষ



আষাঢ়—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আষাঢ়ের অমারাত্রি। শিবাকণ্ঠে ঘোষিল প্রহর
সূচিতে দ্বিতীয় যাম। দিনব্যাপী বর্ষণের পর
ক্ষণিক ক্ষান্তিতে যেন বারিধর লভিল বিশ্রাম।
ঝিল্লীস্বনে শোনা যায় ভেকের সঙ্গত-স্বরগ্রাম
আঁধারের রঙ্গমঞ্চে। মেঘভারে স্তম্ভিত আকাশ।
নক্ষত্রের নাহি দেখা। রুদ্ধপ্রায় বিশ্বের নিঃশ্বাস;—
বহে কি না বহে বায়ু—মূর্চ্ছার লক্ষণ যেন তার!
মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্দীপ্ত তপোবনে আশ্রমের দ্বার
বন্ধ সব চারিধারে—যেন-বা তারাও যোগাসনে
রুধি' যত চিত্তবৃত্তি—ধ্যানমগ্ন এ নিশি-নির্জ্জনে।
বশিষ্ঠ-কুটীরে শুধু একটী আলোক দেখা যায়
উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, রশ্মি য ফুটে না কুণ্ঠায়।

উঠিলা ব্রহ্মর্ষিবর সন্ধ্যাপূজা করি' সমাপন
রাত্রির বিশ্রাম লাগি'; শ্রান্তদেহে ছাড়ি' দর্ভাসন
সম্ভাষিলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে—"অরুন্ধতি, কোথা অরুন্ধতি?

(পরক্ষণেই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ায় মন্দ পদক্ষেপে দেবীর
পার্শ্বে গমন ও ভূমিতলেই উপবেশনান্তে).

—অন্ধকার কোণে হেথা একান্তে বসিয়া কেন সতী,
কুণ্ঠিত বিষণ্ণ মূর্ত্তি? শোন' কথা, কহি পুনর্ব্বার,
পুত্রশোক বক্ষে পুষি' কতদিন কাটাইবে আর
অঞ্চলে বহ্নির মতো?—সময়ে সকলই যদি যায়,
তোমারই এ চিত্তভার—সেই কি অনন্ত এ ধরায়?
—জানো তো নিয়তিধর্ম্মে! দেহধর্ম্মে অবহেলা করি'
কেন তবে অনুক্ষণ দুঃখ পাও পুনঃপুনঃ স্মরি'
গত শোচনার কথা?—বহু কার্য্য মানবজীবনে,
ঋষি-পত্নী তুমি শুভে, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো মনে।

—ঊর্দ্ধে ঐ দেখ চেয়ে দিগ্বিদিক্-ঘেরা অন্ধকার,—
মুক্তকেশী মহামায়া সৃষ্টি জুড়ি' অধিকার যাঁর,
আজিকার রুদ্ররাত্রে; তা বসিয়া ভাবিছ কি মনে
নব সূর্য্যোদয় আর হেরিবেনা পুনঃ এ নয়নে?

—সবই হেথা ক্ষণস্থায়ী—বিচিত্র লীলা এ ধরিত্রীর,
সত্য-শুভ-সুন্দর সে ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অস্থির—
সকলই অনিত্য ভবে—সেই কথা ধ্রুব জানি' মনে
তাঁরই ধ্যানে আত্মজ্ঞান লাভ' কর কর্ত্তব্যসাধনে।"

শুনি' সে সান্ত্বনা-বাণী সতী-চক্ষে দ্বিগুণিত ধারা
বহিল নয়ন-পথে, নদী যেন সেতুবন্ধহারা!
—"একসঙ্গে শতপুত্র একে-একে গেল যে আমার!
মোর মতো অভাগিনী এ জগতে কে-বা আছে আর?
কহ, প্রভু,"——
রুদ্ধকণ্ঠে আর বুঝি ফুটিলনা স্বর,—
গুমরি' উঠিল যেন ভগ্ন বক্ষে বিদীর্ণ পঞ্জর!
—সেই ক্ষণে পর্যণ্যেরও আর্ত্ত বক্ষ গেল যেন ফাটি',—
ভীষণ বজ্রের শব্দে দিগ্দিগন্ত, নদী, গিরি, মাটি'—
কাঁপিল নিখিল পৃথ্বী বিদ্যুতে ধাঁধিয়া চরাচর!
মহাবীর বিশ্বামিত্র,—সেই শব্দে তাঁহারও অন্তর
উঠিল কাঁপিয়া—যেথা, লুকাইয়া গবাক্ষের নীচে
উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে মুহূর্ত্তের সুযোগ মাগিছে
চিরশত্রু বশিষ্ঠের হত্যাপণে চিত্ত করি' স্থির;
মহাতপা বিশ্বামিত্র, মহারাজা যে-বা পৃথিবীর!

কহিল বশিষ্ঠ-ঋষি পত্নীশিরে স্নেহ-হস্ত রাখি',
'ভাবিওনা তুমি সতী, এ জগতে তুমিই একাকী
সহিছ এ অরুন্তুদ বহুপুত্র-বিয়োগের ব্যথা;—
ভেবে দেখ, ক্ষণকাল, তোমারই সম্মুখে পতিব্রতা,
আমিও যে অংশভাগী! এ জগতে সর্ব্বহারা যে-বা,
মায়াবদ্ধ,—সে জনও যে নিত্য করে নিয়তির সেবা।
তোমার অজ্ঞাত নয়—এ বিশ্বের দুঃখ-ইতিহাস;—
বিশ্বস্রষ্টা—জানো তুমি শাস্ত্রপাঠে, তিনিও যে দাস,
আপন নিয়মবদ্ধ বিধিনিষেধের চক্রতলে,
কর্ম্মাকর্ম্ম দুঃখ-সুখ-রহস্যের দুর্ব্বোধ্য শৃঙ্খলে।"
উত্তরিলা অরুন্ধতী, স্বামীপদে রাখিয়া নয়ন,
"কিন্তু কেন তুমি প্রভু, হেন শত্রু করিলে সৃজন?
সমগ্র ভারত যাঁরে শ্রেষ্ঠ মানে সভয়ে শ্রদ্ধায়,
অস্বীকার করি' সেই তপস্বীর ব্রহ্মর্ষি-আখ্যায়
করনি কি অসম্মান বারম্বার সভামধ্যখানে?
সে দুঃসহ অপমানে বন্ধুরও শত্রুতা জাগে প্রাণে!"

"সত্য, সত্য, অরুন্ধতি, বাক্য তব সত্য অনুমানি;—
ভক্তির না হোক্, তাঁর শক্তির তপস্যা-তেজ জানি।
তাই তো বন্ধুরে বরি' রাজর্ষির যোগ্য প্রতিষ্ঠায়
নন্দিত করেছি তাঁরে আর্য্যাবর্ত্তে তপস্বী-সভায়;—
তথাপি ব্রহ্মর্ষি বলি' সম্মানিতে পারিনি যে তাঁরে,
সেই অভিমানে বুঝি অনিষ্ট সাধিছে বারে বারে।"

উৎকর্ণ আগ্রহভরে বিশ্বামিত্র শুনিলেন কাণে
উভয়ের বাক্যালাপ বাতায়নমাত্র ব্যবধানে,
অন্ধকার অন্তরালে।
শত্রুর সে উগ্র তপোবল
শুনিয়া স্বামীর কণ্ঠে, তাঁরই লাগি' আতঙ্কবিহ্বল
কহিলেন পতিপ্রাণা—
"তবু কেন করনা স্বীকার
ব্রহ্মর্ষি মানিতে তাঁরে? শতপুত্র-নিধন আমার—
সেও এই কর্ম্মফলে! হায়, প্রভু, নিষ্ঠুর দেবতা,
সংশয় জাগে যে চিত্তে,—কহ এর রহস্য-বারতা,—
একান্ত অধীরা আমি"—
দুটি চক্ষে ভরি' এল বারি।
কহিলেন ঋষিবর সে বেদনা সহিতে না পারি',
"শোন' তবে অরুন্ধতী, বুদ্ধিমতী তুমি, আমি জানি;—
নহে মোর অহঙ্কার,—এ আমার অন্তরের বাণী—
—বিশ্বামিত্র মিত্র মোর; কে যে শত্রু,—বুঝিনাক তাই,
সত্ত্বগুণে বঞ্চিত সে, তাই বুঝি ঈর্ষা ভোলে নাই!
তবু তার তপস্যার গুণমুগ্ধ—আমি তারে বড় ভালবাসি;
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ তারে দেখিবারে তাই তো প্রয়াসী!
যে রাজসি শক্তি তার পূর্ণতার প্রতিবন্ধকামী,
তারই প্রতীকার তরে ব্রহ্মর্ষি বলিনি আজও আমি।

অদূরে বিপুল শব্দে কি যেন পড়িল ভূমিতলে;—
চমকি' উঠিলা দোঁহে সহসা বিস্ময়ে-কৌতূহলে!
মুহূর্ত্তে করিয়া চূর্ণ দুর্ব্বল সে উটজের দ্বার
উন্মাদের মতো যে-বা প্রবেশিল,—যোদ্ধবেশ তার,—
দস্যু বা তস্কর নয়, চকিতে চিনিল দোঁহে চোখে;—
—মহারাজ বিশ্বামিত্র! কুটীরের স্বল্প দীপালোকে।
বিমূঢ় দম্পতীদ্বয়ে মুহূর্ত্ত না দিয়া অবসর
বশিষ্ঠের পদতলে মুক্ত অসি রাখি' যুক্তকর

কহিলেন আগন্তুক,—"যে কথা শুনিনু আজ কাণে,
ধর্ম্ম জানে, কোনও ইচ্ছা নাই আর এ লাঞ্ছিত প্রাণে
বহিতে পাপের ভার। প্রভু মোর, এই অসি লহ,
নিজ হস্তে হানো মোরে—এ জীবন হয়েছে অসহ!
প্রভু মোর, বন্ধু মোর, এত দয়া তোমার অন্তরে
মহাশত্রু 'পরে তব!—নতুবা এ অভিশপ্ত করে
নাশিব এ ঘৃণ্য প্রাণ, শেষ পাপ সমাপ্তির লাগি'!
—অরুন্ধতি, মাতা মোর, পুত্রহারা হায় রে অভাগি!
—আর নয় গুরুদেব; অসহ্য এ জীবন-যন্ত্রণা
দূর কর এ মুহূর্ত্তে,—কৃতঘ্নের এ শেষ প্রার্থনা।"

কহিলা বশিষ্ঠ-ঋষি বিশ্বামিত্রে দিয়া আলিঙ্গন,
বন্ধুবর, আজি তুমি রাহুমুক্ত সূর্য্যের মতন
ব্রহ্ম-ঋষি একসঙ্গে, তপস্যার বিশ্বে তুমি রাজা।
একান্ত প্রার্থনা যদি,—এই তব দিনু
যোগ্য সাজা!
প্রিয়তম, আজি তুমি অনুতাপ-দহনে নির্ম্মল,
সত্ত্বগুণে বিভূষিত নবধর্ম্মে উদার উজ্জ্বল।

আষাঢ়ের অমারাত্রি পুনরায় ঘনতর মেঘে
ঘনাইল চারিধারে। বর্ষাসাথে বায়ু
বহে বেগে।
ঊর্দ্ধে মেঘাজিনে বসি' তপস্বী যতেক ব্যোমচর
ধারা-উপবাতধারী বৃষ্টিমন্ত্রে হইল মুখর।
বিদ্যুতের দীপ্ত আঁখি ঘন-ঘন দৃষ্টি মেলি' তার
মর্ত্যলোকে দেখে চাহি' যুগ্মমূর্ত্তি সত্য-সাধনার!

নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা

ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি

আজ বাঙ্গালী হিন্দু দাবি করিয়াছে—বাঙ্গালার নিরাপত্তা, শান্তি, কল্যাণ এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ চাই। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার যে সকল অংশ ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাদের লইয়া এই নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে। ইহার সীমা কি হইবে এবং কোন্ কোন্ অংশ ইহার অন্তর্গত হইবে, এসম্বন্ধে ইতিমধ্যেই জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গদেশের আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গ মাইল। মোট লোকসংখ্যা ৬০,৩০৬,৫২৫ জন। ইহার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩৩,০০৫,৪৩৪ (শতকরা ৫৪ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সবই হিন্দু) ২৭,৩০১,০৯১ (শতকরা ৪৬ জন)।

মুসলমানেরা দাবি করিয়াছেন যে, তাহারা ভারতীয় জাতির অন্তর্গত নহেন—পৃথক জাতি। সুতরাং বাঙ্গালার যে অংশে এইরূপ মনোভাবাপন্ন লোকের সংখ্যাই বেশী, সেই অংশ হইতে হিন্দু-প্রধান অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। বঙ্গবিভাগের উদ্দেশ্য ইহাই। বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী হিন্দু-প্রধান অংশ বিভাগের পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি প্রদেশ ও তাহার অংশ হইবে।

ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদেশ বিভাগের কোন পরিকল্পনা তৈয়ারী করিতে হইলে, প্রথমে আমাদের কতকগুলি মূলনীতি মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) বিভাগের ভিত্তি:—শাসনবিভাগের যে-কোন বর্ত্তমান ইউনিট, যেমন বিভাগ, মহকুমা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া পার্টিসন করিতে হইবে।

(খ) ভৌগোলিক ঐক্য:—নবগঠিত প্রদেশ ভৌগোলিক হিসাবে এক ও অখণ্ড দেশ হওয়া আবশ্যক, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা ও উহার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা অসুবিধাজনক।

(গ) সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক ঐক্যরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পার্টিসন করা উচিত। অধিকন্তু এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক; কারণ, অন্যথায় সমস্ত শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের অনর্থক প্রতিযোগিতাতেই অপব্যয়িত হইবে এবং জাতিগঠনমূলক কোনো কার্য্যই সম্ভবপর হইবে না।

(ঘ) জনবিনিময়ের প্রয়োজন যত কম হয় ভালো; কারণ বিরাট আকারে জনবিনিময় কোন দেশেই সফল হয় নাই।

(ঙ) সীমান্তে অবস্থিত কোন স্থানে শত্রুভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থান বিপজ্জনক। প্রাকৃতিক সীমার তথাকথিত সুবিধার মোহে মুসলিম-বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির মধ্যে কোন মুসলিম-প্রধান অঞ্চল রাখা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়, এবং এইরূপ স্থানগুলিকে ঐ সকল জেলা হইতে বাদ দেওয়াই সুবিধাজনক। তবে চতুর্দ্দিকে হিন্দু অঞ্চল

দ্বারা পরিবেষ্টিত মুসলিমপ্রধান অঞ্চল হিন্দু বঙ্গের মধ্যে আসিতে বাধ্য হইবে।

(চ) বাঙ্গালা দেশের মোট জমি (৭৭,৪৪২-বর্গ মাইল) হিন্দু ও মুসলমানের জনসংখ্যা অথবা স্থাবর সম্পত্তির অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জমিরই মালিক হিন্দু; সুতরাং সেই হিসাবে হিন্দুরই বেশী জমি পাওয়া উচিত। জনসংখ্যার দিক হইতে হিন্দু শতকরা ৪৬ জন; অতএব জমির বখরা ঐভাবেও হইতে পারে। জনসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর পাওয়া উচিত ৩৬০০০ বর্গমাইল জমি।

(ছ) অস্থায়ী বিভাগের পরে সীমা নির্দ্ধারণ কমিটির দ্বারা উভয়-প্রদেশের সীমা স্থির করা চলিবে।

বঙ্গ বিভাগে বিশেষ অসুবিধা হইবে না, কারণ এই প্রদেশের পশ্চিমাংশে হিন্দু এবং পূর্ব্বাংশে মুসলমানরা অত্যধিক বাস করে। তাহার উপর হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্থানের বাকি অংশের সহিত সংযুক্ত; সুতরাং ইহাও বিশেষ সুবিধা।

পার্টিসনের ভিত্তি কি হইবে? বর্তমান বিভাগ, জেলা বা থানাকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গদেশ পার্টিসন করা যাইতে পারে। আমরা যদি বিভাগকে (ডিভিসন) ভিত্তি ধরি, তাহা হইলে মুসলিমপ্রধান রাজশাহী জেলা হইতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি দাবি করিতে পারি না। আবার জেলাকে যদি ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দুইটি জেলা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলা বাদ পড়িবে, কারণ এইগুলিতে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, একমাত্র যদি থানাগুলিকে পার্টিসনের ভিত্তি ধরা যায়। কয়েকটি জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহাদের অন্তর্গত কতক অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই সকল অঞ্চল পার্শ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান অংশের সংলগ্ন থাকায় সহজেই হিন্দুবঙ্গের অন্তর্গত হইতে পারে। সুতরাং মুসলিমপ্রধান থানাগুলিকে বাদ দিয়া এবং হিন্দুপ্রধান থানা সকল লইয়া এইরূপ জেলাগুলি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। নবগঠিত জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান হইবে। বর্তমান হিন্দু-প্রধান জেলাসমূহ এবং পুনর্গঠিত জেলাগুলির সমন্বয়ে যে হিন্দুপ্রদেশ গঠিত হইবে তাহা হইবে এক অখণ্ড প্রদেশ। এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশে বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৭০ জন হিন্দু থাকিবে। থানা-হিসাবে বিভাগ পরিকল্পনাও প্রকৃতপক্ষে জেলা অনুসারে বিভাগ; পার্থক্য শুধু এই যে ইহাতে কেবলমাত্র বর্তমান হিন্দু-প্রধান জেলাগুলিকেই ধরা হয় নাই, সেই সঙ্গে অন্য কতকগুলি জেলাকে পুনর্গঠিত করিয়া হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

থানাকে যদি পার্টিসনের ভিত্তি ধরা যায়, তাহা হইলে নূতন বাংলা প্রদেশের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্দ্ধমান বিভাগ এবং কলিকাতা শহর, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা তো আসিবেই, তাছাড়া বর্তমানে মুসলিম-প্রধান আরও কয়েকটি জেলাও পাওয়া যাইবে।

বর্তমান দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলা যেভাবে গঠিত তাহাতে সেখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। এইজন্য শ্রীরাজাগোপালাচারী এইগুলিকে মুসলিম বঙ্গে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই জেলাগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এমন অঞ্চল আছে যেখানে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জেলার মধ্যে পশ্চিমাংশে হিন্দু-বেশী, আর পূর্ব্ব দিকে বেশী মুসলমান; ঠিক যেমন পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা। সুতরাং প্রদেশ বিভাগের পূর্ব্বে এইরূপ জেলাগুলিকেও বিভক্ত করিতে হইবে। বর্তমান জেলাগুলির গঠন দোষের জন্য হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা কেন অসুবিধা ভোগ করিবে? এইরূপ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকেও যদি পাকিস্থানে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবিচার করা হইবে। জেলাগুলির সীমা কৃত্রিম এবং অতীতে বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ জেলামধ্যস্থ হিন্দুপ্রধান থানাগুলি যাহাতে হিন্দু বঙ্গে যোগদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মুসলমান বঙ্গের পার্শ্ববর্তী জেলার মুসলিম-প্রধান থানাগুলি অনায়াসে পাকিস্থানে যাইতে পারিবে। এই সকল জেলার হিন্দু-প্রধান থানাগুলির হিন্দু অধিবাসীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের যুক্তিবলে এই ন্যায়সঙ্গত দাবি নিশ্চয়ই করিতে পারে। জেলার সীমা-পরিবর্তনের জন্য বড়লাট বা পার্লামেন্টের নিকট দরবার করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রাদেশিক সরকারই ইচ্ছা করিলে ইহা করিতে পারেন। নিয়ম-তান্ত্রিক কোন অসুবিধা ইহাতে নাই।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে বাংলার নিম্নলিখিত স্থানগুলি হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত হইবে:—

বর্দ্ধমান বিভাগ (সম্পূর্ণ)

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে সমগ্র কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা; এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে:—সমগ্র দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা; এবং ইহা ছাড়া দিনাজপুর ও মালদহ জেলার হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলি।

ঢাকা বিভাগের মধ্যে:—ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চল।

উপরে লিখিত জেলাগুলিকে গ্রথিত করিয়া যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে, তাহা এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন দেশ হইবে। ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

নূতন বঙ্গ হইবে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রদেশ। ইহার উত্তরে থাকিবে হিমালয় ও ভুটান; পূর্ব্বে আসাম ও মুসলিম বঙ্গ; পশ্চিমে নেপাল, বেহার ও উড়িষ্যা; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

এই নূতন প্রদেশের সীমানা হইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। মোট লোক সংখ্যা আড়াই কোটি; ইহার মধ্যে মাত্র ৭৬ লাখ মুসলমান (শতকরা ২৮ জন) এবং অমুসলমান (প্রায় সকলেই হিন্দু) এক কোটি চুরাশি লক্ষ (শতকরা ৭২ জন)।

এই সংখ্যায় বঙ্গদেশের যে মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলিমপ্রধান প্রদেশটিকে কালো করিয়া (shaded) দেখানো হইয়াছে। জেলার মধ্যে যে সংখ্যা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে খোলা (un boxed) সংখ্যাটি বর্ত্তমানে ঐ জেলায় হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত বুঝাইবে, এবং ঐ জেলাটিকে পুনর্গঠিত করিবার পর হিন্দুর জনসংখ্যার যে অনুপাত হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে চতুষ্কোণের মধ্যে প্রদত্ত (boxed) সংখ্যা। যথা, উপস্থিত যশোহর জেলায় হিন্দু শতকরা মাত্র ৩৯ জন; কিন্তু যশোহরের হিন্দু-প্রধান থানাগুলিকে যদি পৃথক করিয়া লওয়া যায়, সেই অংশে হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত হইবে প্রতি শতে ৫৪ জন।

থানা ভিত্তি করিয়া বিভাগের অসুবিধা এই যে, থানাগুলির সীমা অধিকাংশক্ষেত্রেই মনগড়া; সুতরাং ইহাদের সংযোগে যে প্রদেশ সৃষ্ট হইবে তাহার সীমাও যে খুব সুবিধাজনক হইবে না তাহা ঠিক। তবু পার্টিসন তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই পদ্ধতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। বঙ্গ দেশের থানাসমূহের সীমা যুক্ত একখানি মানচিত্র এবং লোকগণনার কার্য্য বিবরণী (সেন্সাস্ রিপোর্ট ১৯৪১) সম্মুখে থাকিলেই ইহা করা যাইবে। পরে সীমা নির্দ্ধারণ কমিটি উপযুক্ত সীমার ব্যবস্থা করিবেন।

বর্ত্তমান দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত হিন্দু-প্রধান অঞ্চল লইয়া নূতন জেলা গড়িতে হইবে। এইরূপ করা হইলে ত্রিশ লক্ষের বেশী হিন্দু নূতন হিন্দু প্রদেশে আসিতে পারিবে। এইবার এই জেলাগুলিকে কিরূপে পার্টিসন করা সুবিধাজনক, তাহা আলোচনা করিব।

দিনাজপুর জেলা—দিনাজপুর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী (৫০.৫%), যদিও তিনটির মধ্যে দুটি মহকুমায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই জেলার পূর্ব্বাংশে রংপুর সীমান্তে মুসলমানের বাস খুব বেশী। এই সামান্য স্থান ব্যতীত দিনাজপুর জেলার বাকি অংশে হিন্দু সংখ্যায় অধিক। কিন্তু তথাপি সারা জেলার জনসংখ্যা দেখিলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া যায়। এই ক্ষুদ্র অংশের মুসলমানদের ধরিলে এই সম্প্রদায় দিনাজপুরের হিন্দুর সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায়। শুধু এই কারণে দিনাজপুর জেলা মুসলিম বঙ্গে যাইবে, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয়। সদর মহকুমার মুসলিম-প্রধান চিরির বন্দর, পার্ব্বতীপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা বাদ দিতে হইবে; এইগুলি মুসলিম বঙ্গে যুক্ত হইতে পারে।

পরিবর্ত্তিত দিনাজপুর জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি পড়িবে—বালুরঘাট ও ঠাকুরগাঁও মহকুমা (সম্পূর্ণ); সদর মহকুমার দিনাজপুর, বিরাল, বংশীহাটী, কুশমণ্ডি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহার থানা। নূতন দিনাজপুরের আয়তন হইবে ৩,৪২৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ১৬ লক্ষ; ইহার মধ্যে ২ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫৩ জন হিন্দু। যদি স্বাভাবিক সীমার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পরে যমুনা নদীকে পূর্ব্ব সীমা ধরা চলিতে পারে।

মালদহ জেলা—মালদহ জেলা পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রাজশাহীর অংশ লইয়া সৃষ্ট হয়; এবং ইহা ১৯০৫ পর্য্যন্ত বিহারের ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল। হিন্দু বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের ভগ্নাবশেষ এই জেলায়। মালদহের উত্তর-পূর্ব্ব, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমাংশে হিন্দুর ঘন বসতি। মুসলমান থানাগুলির অবস্থান এমন যে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। ইহাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর, খরবা এবং রতুয়া থানার চারিদিকে হিন্দু অঞ্চল; সুতরাং ইহাদের হিন্দু বঙ্গে বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইবে। সমস্যা হইয়াছে এই কয়টি থানা—ভোলাহাট, কালিয়াচক, শিবগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ। এই থানাগুলি ঠিক মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গে যাত্রার পথে অবস্থিত। চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ দিলেও বাকি চারটি থানা আমাদের চাই। ইহাদের মুসলিম জনসংখ্যা কেবলমাত্র আড়াই লক্ষ। মুসলিম-প্রধান থানাগুলির মধ্যে গোমস্তাপুর ও চাপাইনবাবগঞ্জ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কেবলমাত্র চাপাই-নবাবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর থানা বাদ দিয়া নূতন মালদহ গঠন করিলে তাহাতেও মুসলমানের সংখ্যা সামান্য বেশী থাকিবে। দশলক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৬০৬,৪৩৯ (শতকরা ৪৭ জন) হইবে হিন্দু। হিন্দু বঙ্গের অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য ভোলাহাট, কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ থানা নূতন মালদহের অন্তর্গত করায় এই সামান্য মুসলিম সংখ্যাধিক্য হইতেছে। এই তিনটি থানার আড়াই লক্ষ মুসলমানকে স্থানান্তর গমনের সুযোগ দিলে মালদহ জেলায় হিন্দুর অনুপাত বর্দ্ধিত হইয়া শতকরা প্রায় ৫৮ জন হইবে।

গোদাগরিঘাট ও তাহার সন্নিকটস্থ রেল লাইন বাদ যায়, কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ হইতে মালদহ জেলায় যাইবার ইহাই পথ। সুতরাং এই রেলপথ নূতন মালদহের পূর্ব্ব সীমা হওয়া উচিত। সারা সেতু পথে উত্তর বঙ্গে যে রেল লাইন গিয়াছে তাহা মুসলিম বঙ্গের ভাগে পড়িবে; সুতরাং ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

মুর্শিদাবাদ জেলা—মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমা ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে অল্পপরিসর স্থানে হিন্দুর বাস বেশী। মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গে যাইবার পথে পড়ে জঙ্গীপুর মহকুমা। এই মহকুমার মধ্যে সাগরদীঘি থানা বাদে সকল স্থানেই মুসলমানরা সংখ্যাধিক। দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের মধ্যে পথ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য এই অঞ্চলের ২ লক্ষ মুসলমানদের স্থানত্যাগের সুযোগ দিতে হইবে।

নবগঠিত মুর্শিদাবাদ জেলায় বসিবে:—কান্দি মহকুমা (সম্পূর্ণ); সমগ্র জঙ্গীপুর মহকুমা (মালদহের পথে অবস্থিত মুসলিম থানাগুলি সহিত); লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম ও জিয়াগঞ্জ থানা এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত বহরমপুর শহর ও বেলডাঙ্গা থানা। বেলডাঙ্গা সামান্য মুসলিম-প্রধান হইলেও নদীয়া হইতে মুর্শিদাবাদের পথে পড়ে।

এই নূতন জেলার জনসংখ্যা হইবে ১৩ লক্ষ; তাহার মধ্যে হিন্দু ৭ লক্ষ (শতকরা ৫১ জন)। যদি জঙ্গীপুর মহকুমার মুসলিম অঞ্চলের ২৩৮,৩৮৮ জন মুসলমান স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে

এই জেলার মুসলমান সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে এবং হিন্দু হইবে শতকরা ৬২ জন।

নদীয়ার পূর্ব্ব সীমার জন্য বর্ত্তমানে পলাশী হইতে লালগোলাঘাট পর্য্যন্ত রেলপথটি কাজে আসিতে পারে। সীমা নির্দ্ধারক কমিটি যদি নিযুক্ত হয় তখন ভৈরব নদকে পূর্ব্ব সীমা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলে বোধহয় সুবিধা হইবে।

নদীয়া জেলা—নদীয়া জেলার মধ্যে আছে বাঙ্গালার বারাণসী নবদ্বীপ। ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানেই হিন্দুর বাস বেশী। নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া মহকুমায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং এই জেলার হিন্দু অঞ্চলকে সহজেই মুসলিম অঞ্চল হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণগঞ্জ থানা হিন্দু প্রধান। মুসলিম-প্রধান অংশ বাদ দিলে নূতন নদীয়া জেলায় থাকিবে—সদর বা কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাট মহকুমা (সমগ্র); এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ থানা। মোট জনসংখ্যা হইবে ৬৪৬, ৪৯২; উহার মধ্যে ৩৪৮, ২৫৭ (অর্থাৎ শতকরা ৫৪ জন) হিন্দু।

যশোহর জেলা—যশোহর জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক; অধিকন্তু ইহার কোন মহকুমাই হিন্দুপ্রধান নয়। থানাগুলির মধ্যে কালিয়া, নড়াইল, অভয় নগর ও সালিখা হিন্দু প্রধান। সালিখা থানা মুসলিম অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত; সুতরাং উহাকে হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত করা অসম্ভব। বাকি তিনটি থানাকে খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিবে। যশোহর জেলার সীমা পূর্ব্বে বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এককালে সুন্দরবন পর্য্যন্ত যশোহরের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান যশোহর সহরের সহিত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর বর্ত্তমানে খুলনা জেলার অন্তর্গত।

যশোহরের হিন্দু-প্রধান অংশে পড়িবে নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত নড়াইল ও কালিয়া থানা এবং সদর মহকুমার অভয় নগর থানা। আয়তন ৩৬১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩০৪, ২০০; ইহার মধ্যে ১৬৪,০৬৭ (শতকরা ৫৪) জন হিন্দু। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থান লইয়া জেলা গঠন হয়তো অসম্ভব হইবে। কিন্তু যশোহরের এই অঞ্চলের সহিত খুলনা জেলার ভৈরব নদের পূর্ব্বে অবস্থিত অংশ যোগ করিয়া একটি নূতন যশোহর জেলা গঠন করা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া আমি মনে করি। ভৈরব এবং মধুমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান লইয়া এই নূতন জেলা গঠিত হইতে পারে।

ফরিদপুর জেলা—ফরিদপুর জেলা মুসলিম-প্রধান হইলেও উহার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বাস। এই গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং উহার সহিত সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান রাজৈর থানা লইয়াই একটি নূতন জেলা অনায়াসে গঠিত হইতে পারে; এবং উহার নাম গোপালগঞ্জ জেলা দেওয়া যায়। মোট লোকসংখ্যা ৭৪২, ১৯০ ইহার মধ্যে ৪১৬, ২১৯ (শতকরা ৫৭ জন) হিন্দু। প্রয়োজন হইলে বাখরগঞ্জ জেলার গৌরনদী থানা এই নূতন জেলার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

বাখরগঞ্জ জেলা—বাখরগঞ্জে মুসলিম সংখ্যাধিক্য থাকিলেও, উহার উত্তর-পশ্চিম অংশ হিন্দু-প্রধান। এই অংশ গোপালগঞ্জ মহকুমা ও খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন থাকায়, হিন্দু বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। হিন্দুপ্রধান থানাগুলির মধ্যে নাজিরপুর স্বরূপকাঠি, ঝালকাঠি এবং বরিশাল পরস্পর-সংলগ্ন। গৌরনদী থানা এই সকল হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গোপালগঞ্জ মহকুমার সহিত সংলগ্ন।

বাখরগঞ্জ জেলার নিম্নলিখিত থানাগুলি হিন্দু বঙ্গে আসিবে:— (ক) সদর মহকুমার অন্তর্গত গৌরনদী, ঝালকাঠি ও বরিশাল থানা (বরিশাল সহর ইহার মধ্যে পড়িবে); (খ) পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি থানা। এই অংশের মোট জনসংখ্যা ৭৮৪, ৮৩৫; ইহার মধ্যে ৪৪৪, ২৮৭ (শতকরা ৫৭) জন হিন্দু। গৌরনদী থানা যদি গোপালগঞ্জের সহিত সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঝালকাঠি, বরিশাল, নাজিরপুর ও স্বরূপকাঠি এই চারিটি থানার মোট জনসংখ্যা হইবে ৫৭২, ৫৯১; উহার মধ্যে ৩২৩, ৪১০ জন হিন্দু। এই অংশ লইয়া একটি পৃথক জেলা গঠন অসম্ভব হইবে না; অন্যথায় ইহাকে বর্ত্তমান খুলনা জেলার সহিত সংযুক্ত করা চলিতে পারে।

নূতন বরিশাল জেলার প্রাকৃতিক সীমার ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। মুসলিম-প্রধান উজিরপুর ও বানরিপাড়া থানা এবং পিরোজপুর ও বাবুগঞ্জ থানার কিয়দংশ যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই অংশ নদী বেষ্টিত ও অধিকতর সুরক্ষিত হইবে। ইহার সীমানা হইবে:—পূর্ব্বে আড়িয়ল খাঁ, কাপুর ও কীর্ত্তনখোলা নদী; পশ্চিমে—হিন্দু বঙ্গের খুলনা জেলা; উত্তরে—হিন্দু বঙ্গের গোপালগঞ্জ; পূর্ব্বে—ঝালকাঠি নদী, গাফখান্ খাল ও পুরাতন দামোদর নদী।

উপরে যে জেলাগুলির সীমানা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত এবং প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের যে অনুপাত হইবে, তাহা নিম্নে পাশাপাশি প্রদর্শিত হইব।

	বর্ত্তমানে হিন্দুর শতকরা অনুপাত	পরিবর্ত্তিত জেলায় হিন্দুর শতকরা অনুপাত
দিনাজপুর	৪৯.৫	৫৩
মালদহ	৪৩	৪৭
মুর্শিদাবাদ	৪৪	৫১
নদীয়া	৩৯	৫৪
যশোহর	৪০	৫৪
ফরিদপুর	৩৬	৫৭
বাখরগঞ্জ	২৬	৫৭

উপরে লিখিত জেলাগুলির হিন্দু অধিবাসীগণের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারা যেন এ বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জানান। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহ, গোপালগঞ্জ ও বরিশালের হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

বৰ্দ্ধমান বিভাগের সকল জেলাই হিন্দু প্রধান। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, খুলনা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলারও কোনো অদল বদলের আবশ্যকতা নাই।

	হিন্দুর শতকরা অনুপাত	মুসলমানের শতকরা অনুপাত
বৰ্দ্ধমান বিভাগ	৮৬	১৪
কলিকাতা শহর	৭৬	২৪
২৪ পরগণা	৬৬	৩৪
খুলনা জেলা	৫০·৪	৪৯·৬
দার্জিলিং জেলা	৯৭	৩
জলপাইগুড়ি জেলা	৭৭	২৩

কুচবিহার রাজ্য—কুচবিহার হিন্দু রাজ্য এবং ইহা হিন্দু বঙ্গের সহিত সহযোগিতা করিবে। ইহার আয়তন ১৩১৮ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৬৪০,৮৪২; ইহার মধ্যে ৪০১,৫৯৪ (শতকরা ৬৩) জন হিন্দু এবং কেবলমাত্র ২৪২, ৬৪৮ জন মুসলমান।

ঢাকা শহর—ঢাকা শহরের মোট জন সংখ্যা ২১৩,২১৮ জনের মধ্যে ১৩০,৫২৫ জন হিন্দু এবং মুসলমানরা সংখ্যায় মাত্র শতকরা ৩৯ জন। হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ঢাকা শহর হিন্দু বঙ্গের অন্তর্গত হওয়া উচিত। অনেকে আপত্তি করিবেন যে, এইরূপ বিচ্ছিন্ন দূরবর্ত্তী শহর কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে? তাঁহাদের আপত্তির উত্তর—ফরাসী চন্দননগরের উদাহরণ। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র শহরটি সুদূর পণ্ডিচেরী হইতে শাসিত হয়। ইহাতে যখন অসুবিধা হয় না, তখন বুড়ীগঙ্গা তীরে অবস্থিত ঢাকা বন্দর নূতন বাঙ্গালার অধীনে থাকার পক্ষে কোন অসুবিধাই হইতে পারে না। বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে ঢাকা গমনের বাধা নাই। মুসলিম বঙ্গের নিজস্ব বড় বন্দর রহিয়াছে চট্টগ্রাম; সুতরাং হিন্দু-প্রধান ঢাকা শহর উহারা কোন কারণেই দাবি করিতে পারে না। হিন্দু বঙ্গের অধীনে ঢাকা শহর স্বায়ত্তশাসনাধীন স্বতন্ত্র (**autonomous**) শহর হইবে।

হিন্দু বঙ্গের আয়তন হইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। মোট জনসংখ্যা ২৫,৮৫৪,৯৪৯ জন; তন্মধ্যে মুসলমান ৭,৩৮৯,০৪৭ (শতকরা ২৮) জন এবং অমুসলমানের (প্রায় সবই হিন্দু) সংখ্যা ১৮,৪৬৫,৯০২ (শতকরা ৭২) জন। ইহার সহিত ঢাকা শহর যুক্ত হইলে মোট জন সংখ্যা হইবে ২৬,০৬৮,১৬৭; উহার মধ্যে ১৮,৫৯৬,৪২৭ জন হিন্দু।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল

বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম ও সিংভূম জেলার কিয়দংশের অধিবাসীগণ বঙ্গভাষাভাষী। ভাষা অনুসারে অঞ্চলিক বিভাগের নীতি কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং এই অঞ্চলগুলির দাবি সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে এই বিষয়ে দাবি তুলিয়া সমস্যাকে জটিলতর করা সমীচিন হইবে না। উপযুক্ত সময়ে পরে গণপরিষদের সম্মুখে এ বিষয়ে দাবি করা চলিবে। বিহারের এই চারটি জেলার মোট লোক সংখ্যা ৭৭৯৯,৪৬৫; ইহার মধ্যে হিন্দু ৬,৩৮৫,১১৪ এবং মুসলমান মাত্র ১,৪১৪,৩৫১ জন।

লেখকের পরিকল্পনা অনুসারে প্যার্টিসন হইলে মুসলিমবঙ্গে নিম্নলিখিত স্থানগুলি পড়িবে:—

ঢাকা বিভাগে:—ময়মনসিংহ জেলা (আংশিক শাসন বহির্ভূত উপজাতি অঞ্চল ব্যতীত) ঢাকা জেলা (ঢাকা শহর বাদে); ফরিদপুর জেলা (গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজইর থানা বাদে)।

চট্টগ্রাম বিভাগে:—সমগ্র চট্টগ্রাম জেলা; নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা (ত্রিপুরা মহারাজের রোশনাবাদ জমিদারী বাদে)। (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম মুসলিম বঙ্গে পড়িবে না)

প্রেসিডেন্সি বিভাগে:—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমা (বহরমপুর ও বেলডাঙ্গা থানা বাদে) এবং লালবাগ মহকুমা (জিয়াগঞ্জ ও নবগ্রাম থানা বাদে); নদীয়া জেলার মধ্যে সমগ্র মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া মহকুমা এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমা (কৃষ্ণগঞ্জ থানা বাদে); যশোহর জেলার মধ্যে সমগ্র মাগুরা, বনগাঁ ও ঝিনাইদহ মহকুমা, নড়াইল মহকুমা (নড়াইল ও কালিয়া থানা বাদে) এবং সদর মহকুমা (অভয়নগর থানা বাদে)।

রাজশাহী বিভাগে:—সমগ্র রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা; দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত চিরির বন্দর, পার্ব্বতীপুর, নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট থানা; মালদহ জেলার অন্তর্গত গোমস্তাপুর ও চাপাই-নবাবগঞ্জ থানা।

মুসলিম বঙ্গের আয়তন হইবে ৪০,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৪,২০৪,৫২৩; ইহার মধ্যে মুসলমান ২৫,৬০৯,১১১ (শতকরা ৭৫) জন এবং হিন্দু ৮,৫৯৫,৪০৬ (শতকরা ২৫) জন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৭২৭০ জন এবং এবং অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আদিম অধিবাসীগণের স্বার্থের খাতিরে এই জেলাটি সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে থাকা উচিত।

ত্রিপুরা রাজ্য—ত্রিপুরার হিন্দু রাজ্য হিন্দু বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আসামের মধ্য দিয়া যোগাযোগ রক্ষার সুবিধা আছে। এই রাজ্যের আয়তন ৪,১১৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩৮২,৪৫০ জন। নোয়াখালি জেলার ফেনি মহকুমায় এবং ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লা শহর ও সদর বিভাগের কিয়দংশ ত্রিপুরার মহারাজার রোশনাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত। এই অংশ পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইহা পুনরায় মহারাজাকেই প্রত্যর্পণ করা উচিত।

(ক) লেখকের পরিকল্পনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র শাসন অঞ্চল 'থানাকে' ভিত্তি করা হইয়াছে। যে-সকল জেলার মধ্যে কয়েকটি হিন্দুপ্রধান থানা একস্থানে একত্রে রহিয়াছে, সেখানে ঐ থানাগুলিকে পৃথক করিয়া নূতন জেলা গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে জেলাগুলি হিন্দুপ্রধান

সেইগুলির সহিত এই সকল নবগঠিত জেলার সমন্বয়ে হিন্দু বঙ্গ গঠিত হইবে।

(খ)* ভৌগলিক ঐক্য ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাধারণ পারিবারিক ভাগবাঁটোয়ারার সময় একজন সরিকের সম্পত্তি যদি সামান্য একটু খোঁচের জন্য খণ্ডীভূত ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই অংশ-টুকু উহারই ভাগে দিয়া একটি অখণ্ড হোলডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। সেই নীতি অনুসারে মালদহের দক্ষিণে ও মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে অবস্থিত মোট আটটি মুসলিম-প্রধান থানাকে হিন্দু-প্রধান বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। এই থানাগুলি মালদহের ভোলাহাট, কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ; এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ, সুতি, রঘুনাথপুর লালগোলা ও ভগবানগোলা। এই কয়টি থানায় ৫৮৫,২৬৬ জন মুসলমানের বাস। এই পাঁচ লক্ষ মুসলমানের জন্য হিন্দু বঙ্গের ঐক্য ও প্রায় ৩ কোটি লোকের স্বার্থহানি হইতে কখনই দেওয়া যাইতে পারে না। এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের স্থানান্তর গমনের সুযোগ ও ক্ষতিপূরণ দান সহজসাধ্য হইবে।

(গ) নবগঠিত হিন্দু বঙ্গে বাঙ্গালার সমস্ত হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৭০ জন থাকিবে। হিন্দু বঙ্গে শতকরা ৭২ জন হইবে হিন্দু; সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দ্বারা সদাসর্ব্বদা উত্যক্ত হইয়া থাকিতে হইবে না এবং নিশ্চিন্ত মনে দেশের মঙ্গলজনক উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সুযোগ লাভ করিবে।

(ঘ) জন-বিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হইলেও এইরূপ জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। হিন্দু বঙ্গে মুসলমান থাকিবে ৭,৩৮৯,০৪৭ জন; অন্যদিকে মুসলিম বঙ্গে হিন্দু থাকিবে ৮,৫৯৫,৪০৬ জন।

(ঙ) হিন্দু বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত কোন জেলায় মুসলিম প্রধান কোন স্থান থাকিবে না। ভবিষ্যতে আসাম অভিযানের অনুরূপ কোন আক্রমণ হইলে হিন্দুবঙ্গের ভিতরে বিপক্ষের সহিত সহানুভূতি সম্পন্ন প্রবল সম্প্রদায়ের বাস বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে সেই বিপদের ভয় নাই।

(চ) হিন্দু বঙ্গ পাইবে ৩৬,৬১০ বর্গ মাইল। এই জমির পরিমাণ বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যানুপাতের অনুরূপ। কিন্তু বাংলার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ জমির মালিক হিন্দু; সুতরাং হিন্দু ন্যায়সঙ্গতভাবে আরও বেশী জমি দাবি করিতে পারে।

হিন্দু বঙ্গ উত্তরে দার্জিলিং হইতে দক্ষিণে ২৪ পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি অখণ্ড প্রদেশ হইবে। আয়তন ও শাসনতন্ত্র পরিকল্পনার জন্য এই প্রদেশকে মুসলিম বঙ্গের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে না। অন্যান্য পরিকল্পনায় বিচ্ছিন্ন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্বন্ধে এই অসুবিধা আছে।

নূতন প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৭৩ জন।

ইহার মধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল লইয়া ভাবী গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে না। যে সকল পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ প্রেসিডেন্সি বিভাগ দাবি করা হইয়াছে তাহাতে এই অসুবিধা আছে।

জনবিনিময় অবশ্যম্ভাবী হইলে, এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত প্রদেশ বেশী সুবিধাজনক।

অন্যান্য পরিকল্পনার তুলনায় ইহাতে মুসলিম বঙ্গে কমসংখ্যক হিন্দু থাকিয়া যাইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পার্টিসন সহজসাধ্য। বঙ্গদেশের যে মানচিত্রে থানাগুলি দেখানো হইল তাহার সাহায্যেই মোটামুটি অস্থায়ী পার্টিসন করা সম্ভবপর হইবে।

এই পরিকল্পনার একমাত্র আপত্তি পূর্ব্বদিকে প্রাকৃতিক সীমার অভাব। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের যুগে অতীতকালের ন্যায় নদীর ধারা আদৌ দুর্ভেদ্য নয়। তথাপি সীমা হিসাবে নদী সুবিধাজনক এবং উভয় প্রদেশের সীমানির্দ্ধারণ কালে যাহাতে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

দীক্ষা

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

শীতবাষ্পসমাচ্ছন্ন কুজ্ঝটিকা-জড়ত্বের ভাঙিয়া দুয়ার
আসে দুর্নিবার।
চকিত অম্বরে হেরি তার আবির্ভাব
চপল, চঞ্চলগতি, অকস্মাৎ, অমিত-প্রতাপ!
বনে বনে বাজে আগমনী,
বিহঙ্গ-কাকলী গীতে চরণের নূপুরের ধ্বনি।
অরণ্য ক্ষণিক-দ্বিধা নিঃশেষে সম্বরি
বাহুমেলি' নিল তারে বরি'।
জরাজীর্ণ রিক্ততার বহির্বাস করি পরিহার
ধরিত্রী ধরিল বক্ষে অশোক-কিংশুক ফুলহার,
অনন্ত যৌবনখানি
মুক্তি পেল দুর্দ্দিনের ছদ্মবেশী জরা-গুণ্ঠ' হানি।

বর্ণগন্ধ-ছন্দ নিয়ে অজস্র-বিলাসে
এই মতো নিত্য মধুমাসে
চলে তার আবর্তিয়া অনন্ত যৌবন
বার্দ্ধক্যে বিদ্রূপ করি, তুচ্ছ করি মৃত্যু-আস্ফালন।
হে ফাল্গুন, যে অগ্নিতে ধরিত্রীর পুষ্পিত জড়িমা,
জ্বালায়ে জাগায়ে দাও নবীনের মৌন মধুরিমা,
যে অগ্নি জ্বেলেছ বনে বনে
সে অগ্নির স্পর্শ দাও মনে—
আমারে জ্বলিতে দাও জরামুক্ত অমৃত-বহ্নিতে
ক্লেদরিক্ত গ্লানিরিক্ত চিতে,
তীক্ষ্ণ করি সূক্ষ্ম অনুভূতি, কদর্য্যের শেষ লেশ মুছি
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে করো মোরে শুচি॥

একচিত্ত

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

একটা বিরাট শূন্যতা—রিক্ত প্রাণের ক্ষুধা-কাতর একটি সকরুণ নীরব রব চিত্তচলে ধ্বনিত হ'য়ে উঠে প্রতি মুহূর্তে জীবনের অসারত্ব সপ্রমাণ ক'রে দেয়। জীবনটা বাস্তবিকই যেন মনে হয় একটা মরুভূমির মত! সর্বপ্রকার পরিপূর্ণতার মাঝেও যেন কোথায় একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা।

চন্দ্রা ভাবে—সত্যিই কি নারীজন্ম এমনিভাবে বয়ে যাবে তার? ভগবান কি তাকে মা হবার অধিকার এ জন্মে দেবেন না? কামনা তো তার বেশী নয়—একটি, মাত্র একটি সন্তান। যাকে বুকে জড়িয়ে সে তার জীবনের সকল বেদনা ভুলতে পারবে। সেই উদ্বেলিত স্নেহ-পারাবার মন্থন করা অমূল্য সম্পদ কি তার জীবনকে ধন্য ক'রে দেবে না? কল্পনার মোহন তুলিকায় যার প্রতিমূর্তি সে মনের মণিকোঠায় গোপনে অংকিত ক'রেছে—প্রতি মুহূর্তে যার মৃদু-মধুর আহ্বান তার মর্মের কানে কানে গুঞ্জরিত হ'চ্ছে, সে কি তার একান্ত আপন হ'য়ে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবে না? উঃ, কি অভিশপ্ত জীবন! চন্দ্রার চোখে শ্রাবণের বারিধারা নেমে আসে।

এই পনেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে চন্দ্রা কি না করেছে? একটি সন্তানের কামনায় উন্মাদিনীর মত ছোট বড় সকলের আদেশ উপদেশ মাথা পেতে নিয়েছে সে··· কত দেবতার দ্বারে সকাতরে মানস-পূর্ণের মানসিক জানিয়েছে—দৈব-শক্তিসম্পন্ন অসংখ্য মাদুলী তার অংগের ভার বর্ধন করেছে···গোপনে কতো সাধুর চরণ-ধূলি পরম ভক্তির সংগে সে মাথায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু দেবতা কোন কিছুতেই প্রসন্ন হ'লেন না। অথচ এই সমস্ত ব্যাপার তাকে কত সাবধানেই না করতে হয়! পাছে স্বামী জানতে পারেন, তাই প্রত্যেক বিষয় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় তাকে। যা কিছু সে করে সমস্তই স্বামীর অলক্ষ্যে এবং অজ্ঞাতে। কারণ স্বামী তার ডাক্তার এবং এ সব ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক। তুক্-তাক্, দৈব-টৈব বা মানসিক-ফানসিকের 'পরে তাঁর মোটেই আস্থা নেই। তিনি বলেন—'ও সব বাজে। বরাত ছাড়া পথ নেই—বরাতে যদি সন্তান লাভ থাকে তো হবে, নইলে একরাশ মাদুলীই অংগে ধারণ করো, আর সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো মুঠো মুঠো করেই গেলো, কিছুতেই কিছু হবে না।' চন্দ্রার প্রতি তাঁর কড়া আদেশ—সে যেন ওসব নিয়ে মাতামাতি না করে। বিজ্ঞানের যুগে ঐ সব যত আজগুবী করণ-কারণ শোভা পায় না।

ডাক্তার স্বামী, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটিও চন্দ্রার হয়নি; কিন্তু তাতেও কোন সুফল হল না। স্বামী বলেন—'ক্ষতি কি···নাই বা হ'ল ছেলে! পৃথিবীর সকল নরনারীর ভাগ্যেই যে সন্তান লাভ ঘটবে তার কি মানে আছে!'···অর্থাৎ স্বামীর সন্তানের কামনা খুব বেশী নয়। তাঁর মতে, ও সব না হওয়াই ভালো। ছেলেপুলে হ'লে তার অনেক ঝঞ্ঝাট। তার চেয়ে এই বেশ।

চন্দ্রার মন কিন্তু এ কথায় সায় দেয় না। সে যেন আরও ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। শাশুড়ী তার মুখের পানে চেয়ে তার দুঃখ নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেন। মাঝে মাঝে কোথাও থেকে একটু জলপড়া নিয়ে এসে চুপি চুপি তাকে ডেকে বলেন—'বৌমা, ঢুক্ ক'রে এটুকু খেয়ে ফেলো তো মা। এ এ্যাকেবারে সাক্ষেৎ ধন্বন্তরি! আর এই মাদুলিটি শনিবার সকালে চান ক'রে কোমরে ধারণ করবে। অনেক ব'লে ক'য়ে, ও-বাড়ীর বামুনদিকে ধ'রে রামরাজাতলা থেকে এ ওষুধ আনিয়েচি। বামুনদি বললে—এ ওষুধ ডাকলে সাড়া দেয়! দত্তদের মেজবোয়ের ব্যাপার কে না জানে? বাইশ বছর ধ'রে একটি ছেলের পিত্তেশে ছুঁড়ি কি কাণ্ডই না করেচে! তারপর যেই বামুনদিকে ধরে এই জলপড়া আনিয়ে খেলে আর মাদুলি ধারণ করলে, অমনি—আহা কি চমৎকার ফুটফুটে ছেলে যে হয়েছে বৌমা, তা আর তোমাকে কি বলবো!'

সাগ্রহে হাত বাড়ায় চন্দ্রা, কিন্তু পরক্ষণে মনে প'ড়ে যায় স্বামীর কঠিন আদেশ—বিজ্ঞানের যুগে ও-সব দৈব-টৈবর ধাপ্পাবাজি অচল। কোন বিবেচক শিক্ষিত লোক এই সব বাজে জিনিষের সমর্থন করে না। সুতরাং সে চায় না

যে, তার স্ত্রী ঐ সব নিয়ে মাতামাতি করে এবং কতকগুলো ফুল বেলপাতা বা শেকড়-মাকড় পোরা মাদুলি পরে দেহের শ্রী নষ্ট করে।

হাতখানা কেঁপে ওঠে চন্দ্রার। নিমেশে তার সকল ব্যগ্রতা অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। শাশুড়ী বধূর মনের কথা বুঝতে পেরে খাটো গলায় বলেন—'অরুণ বকবে ভেবে ভয় পাচ্ছো মা? তা ছ্যাখো মা, অরু আমার ডাক্তার মানুষ, তার ওপর চিরকালই ওর স্বভাব ঐ রকম—এ সবে বড় অবিশ্বাস! ঠাকুর দেবতাও মানতে চায় না। কত্তা তো তাই অনেক সময় দুঃখু ক'রে বলতেন—আমাদের ছেলে হ'য়ে ও অমন নাস্তিক হ'ল কি ক'রে? সবই কপাল বৌমা, সবই কপাল! নইলে অত নেকাপড়া শিখে এটুকুও বোঝে না যে, একটা ছেলে বিহনে বংশটা শেষে লোপ পাবে।'

চমকে ওঠে চন্দ্রা। একটু কি ভেবে নিয়ে সে কাতর ভাবে বলে—'মা, আপনার পায়ে পড়ি—যেমন ক'রে হোক আপনার ছেলের আবার বিয়ে দিন। আমার কোন দুক্ষু হবে না, বরং তার ছেলে হ'লে—'

বাধা দিয়ে শাশুড়ী বলেন—'পোড়া কপাল! সে চেষ্টাও কি কসুর করেচি মা। কিন্তু ছেলেকে রাজী করায় কে?'

শাশুড়ীর দেওয়া জলপড়াটুকু ভক্তিভরে পান ক'রে নেয় চন্দ্রা। কত আশানিরাশার তরংগাঘাত তার তার মনখানাকে চঞ্চল ক'রে তোলে। বহু আয়াসপ্রাপ্ত কবচটি সযত্নে মুঠার মধ্যে চেপে ধরে সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করে।

এমনি করেই আশার জাল বুনতে বুনতে দিনের পর দিন তার কেটে যায়। কত বিনিদ্র রজনীতে পুত্র কামনায় সে নৈশ-উপাধান সিক্ত করেছে—কতো নিশিথ-স্বপ্নে পুত্রমুখ চুম্বন করতে গিয়ে সে স্বপ্নভংগে নিরাশ হয়েছে! কোথা হ'তে কোন শিশুর ক্রন্দন তার কানে এলে সে ক্ষিপ্তার মত নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে। এমনি করেই দীর্ঘ পনেরোটি বৎসর তার জীবন হ'তে অতীতের দেশে সরে গেছে।

কিন্তু··চন্দ্রা আশ্চর্য হ'য়ে যায় তার স্বামীর পানে চেয়ে। ভাবে—আচ্ছা পুরুষ মানুষের মন কী ধাতু দিয়ে ভগবান গড়েছেন! তাদের প্রাণে কি সন্তানের মুখ দেখার সাধ জাগে না? মেয়েদের মত কি পুরুষরা সন্তানের কামনা মনে মনে পোষণ করে না? কই তার স্বামীর চিত্ত তো সন্তান কামনায় তার মত ব্যাকুল নয়!

সেদিন চন্দ্রার শাশুড়ী চুপি চুপি চন্দ্রাকে ডেকে বললেন—'বৌমা, একটা খবর শুনেচ? গোঁসাই গিন্নীর মুখে শুনলুম—কালীঘাটে নাকি একজন মহাপুরুষ এসেছেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তিনি মুখ দেখে মানুষের মনের কথা বলে দেন। যে যা কামনা নিয়ে তাঁর কাছে যায়—তিনি তা পূরণ ক'রে দেন। সাক্ষেৎ দেবতা বিশেষ লোক! গোঁসাই গিন্নীর ছেলের চাকরী গেছলো—ঠাকুরের কেরপায় আবার কাল থেকে একটা ভালো চাকরীতে বাহাল হয়ে গেছে। সেই সাধু ঠাকুরকে দেখবার জন্তে নাকি শহর শুদ্ধু লোক কালীঘাটে ভেঙে পড়েচে। যাবে বৌমা একবার ঠাকুরকে দেখতে? যদি তাঁর দয়া হয়—যদি আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন! দরকার কি অরুকে জানাবার—কারুদের বাড়ী বেড়াতে যাচ্চি বলে এক ফাঁকে ঘুরে এলেই হবে।'

প্রতিবারের মত এবার চন্দ্রাকে কেন জানি না—তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা গেল না। এত বড় একটা সাধুর আগমন সংবাদেও অন্যান্য বারের মত সে আশান্বিতা হ'য়ে উঠলো না। তার সারা মুখে কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়াই যেন ফুটে উঠলো। ম্লান একটু হেসে সে বললে—'কিন্তু ফল কী কিছু হবে মা? এই পনেরোটা বছর ধরে অনেক কিছুই তো করা হ'ল মা—কী হ'য়েচে?' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে সে বললে—'বাবা পঞ্চানন্দের দোরে হ'ত্যে পর্যন্ত দিয়েচি। ভেবেছিলুম—বাবার কৃপায় এবার বোধ হয় আশা আমাদের সফল হবে। কিন্তু পোড়া ভাগ্যে কিছুই ফললো না!' তার বড় বড় চক্ষু দুটিতে মুক্তার মত দু'ফোঁটা অশ্রু টল টল করে উঠলো।

শাশুড়ী বললেন—'সবই তো বুঝতে পারি মা, তবে কি জানো—মন কিছুতেই বোঝে না। মনে হয়—এবার বোধ হয় দেবতা মুখ তুলে চাইবেন। তাই বলচি মা—

একবার শেষ চেষ্টা করতে দোষ কি? আমার মন কি জানি কেন—এবার যেন বাছা ভালো গাইচে।'

—'বেশ, তবে যাবো।'

—'হ্যা, আমিও তাই বলি। আর কিছু না হোক, একজন সাধুপুরুষ দর্শনও তো হবে। আজকের খবরের কাগজেও নাকি সাধুর গুণাগুণ আর কখন কি ভাবে তাঁর দেখা মিলবে, সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছে। তুমি পড়ো নি বৌমা?'

—'কৈ না তো!'

হঠাৎ চন্দ্রার মনে পড়লো…আজ সকালে স্বামীকে চা দিতে গিয়ে সে দেখেছে, আজকের কাগজ থেকে খানিকটা অংশ স্বামী যেন তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেললেন। সে তাই দেখে প্রশ্ন করেছিল—'কাগজটার অতোখানি ছিঁড়ে ফেললে কেন গো?' উত্তরে স্বামী গম্ভীরকণ্ঠে বলেছিলেন—'ও কিছু নয়।' কথাটা চাপাই দিয়েছিলেন তিনি। এতক্ষণে চন্দ্রার মনে সেই কাগজ ছেঁড়ার হেতুটা যেন বেশ স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। পাছে চন্দ্রার দৃষ্টিতে খবরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং সে সাধুর দর্শন ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে; তাই তাড়াতাড়ি কাগজের সেই স্থানটুকু তিনি নষ্ট করে ফেললেন।

শাশুড়ীর সংগে কথা শেষ ক'রে চন্দ্রা ঘরে এসে কাগজখানা খুলে দেখলে—একটা পাতার খানিকটা অংশ নেই। সে বুঝলে—এইখানেই সেই সাধুর কথা ছিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে স্বচ্ছ আকাশ হতে কিছুটা রৌদ্র ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চেয়ে চন্দ্রা ভাবতে লাগলো—তার স্বামীর অদ্ভুত প্রকৃতির কথা। উঃ, একটি সন্তান লাভ করার জন্য সে এই দীর্ঘ দিন কী না করেছে! আর তার স্বামী? বাস্তবিক পুরুষদের কি পিতা হওয়ার সাধ জাগে না প্রাণে?

সেদিন ছিল অমাবস্যা তিথি…

পূর্ব পরামর্শ মত সন্ধ্যার কিছু আগে গোপনে শাশুড়ী-বধূতে সাধু দর্শনে বার হ'য়ে পড়লেন। ভাগ্যগুণে সেই দিন চন্দ্রার স্বামীও বাড়ী ছিলেন না—প্রভাতেই কোথায় বেরিয়েছিলেন। বলে গেছেন আজ ফিরবেন না। সুতরাং তাদের গমনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি।

যথাসময়ে শাশুড়ীসহ চন্দ্রা এসে পৌছালো—কালীঘাটে সাধুর আশ্রম সন্নিকটে। রাস্তার ধারে ধারে অসংখ্য গাড়ী—মোটর, ঘোড়ার বাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি দাঁড়িয়ে আছে। সাধুর দর্শনাভিলাষী বহু নরনারীর আগমনে সে স্থান যেন এক মেলার আকার ধারণ ক'রেছে। এত লোকের ভীড় এর পূর্বে বোধ হয় আর কখনো দেখেনি চন্দ্রা। সে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। একটা লোককে দেখবার জন্য এত ভীড়! তবে কি, তবে কি—এতদিনে প্রাণের আশা পূর্ণ হবে তার? ঠাকুর কি তবে মুখ তুলে চাইবেন? একটা অজানা সম্ভাবনার আশায় তার প্রাণটা দুলে উঠলো।

ভীড় বাঁচিয়ে একটা আবছায়া প্রায়ান্ধকার গলি পথ ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলতে লাগলো চন্দ্রারা।

অনেকটা পথ নীরবে চলে আসার পর এক সময় চন্দ্রা শাশুড়ীকে প্রশ্ন করলে—'আর কতটা পথ যেতে হবে মা? রাস্তাটা বড্ড অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। এমন পথও শহরে আছে?'

—'আছে বৈকি মা…কলকাতা শহরে নেই কি?' একটু থেমে শাশুড়ী বললেন—'হবে কি জানো বৌমা, সব দেখে শুনে বড় ভাবনায় পড়ে গেচি। এই এ্যাত লোকের ভীড় ঠেলে আমরা কি সাধুর কাছে পৌছাতে পারবো—দ্যাখা কি পাবো তাঁর? কিন্তু বৌমা এ্যাতদূর যখন এসেচি তখন যাই হোক—দ্যাখা না করে ফিরচি না।'

কথা কইতে কইতে অবশেষে এক সময় তাঁরা উভয়ে এসে উপস্থিত হ'লেন সাধুর আশ্রমে। একটা প্রকাণ্ড স্থান ঘিরে এই আশ্রমটি তৈরী হ'য়েছে। চারিদিকে লোকজন গিস্ গিস্ করছে। একদিকে পুরুষ ও অন্যদিকে মহিলাদের আসা যাওয়া এবং বসা দাঁড়ানোর স্থান। কত নরনারী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কে জানে তাদের আশা সফল হবে কি না! চন্দ্রাও শাশুড়ীর সংগে এসে মহিলাদের ভীড়ের মধ্যে একস্থানে জড় সড় হয়ে বসে পড়লো।

অদূরে দেখা গেল—হোমাগ্নি জ্বলছে, আর তারই সামনে শিষ্য ও ভক্ত পরিবেষ্টিত সাধুজী বসে আছেন একটি মৃত্তিকা-নির্মিত বেদীর উপর ব্যাঘ্রাসনে। অপূর্ব সে মূর্তি…মস্তকের

সুদীর্ঘ জটা সর্পিল আকারে পৃষ্ঠদেশ বেয়ে মাটীতে এসে লোটাচ্ছে—দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষদেশ প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে—নয়ন যেন ধ্যান স্তিমিত—ভস্মাচ্ছাদিত সারা অংগে একমাত্র কৌপীন ব্যতীত অন্য কোনও আবরণ নেই। আননে এক অনবদ্য হাস্যের রেখা। হ্যাঁ, সাধু বটে! শ্রদ্ধায় অন্তরখানা যেন সাধুর চরণ পরে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রার।

অন্ধ খঞ্জ অনাথ আতুর প্রভৃতি কত শত লোক ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সাধুর মুখের পানে চেয়ে বসে আছে। যদি তিনি কৃপাদৃষ্টি করেন এই আশায়!

সাধু মাঝে মাঝে চক্ষু উন্মীলিত করে সামনের দিকে প্রতীক্ষিত নরনারীর পানে তাকাচ্ছেন এবং তাদের মধ্য হ'তে কখনও বা এক এক জনকে কাছে ডেকে কথাও বলছেন। তারা কেউ কেউ আবার অন্তরের অভিলাষ জ্ঞাপন করে সাধুর কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছে। সাধুও মধুর হাসির সঙ্গে পার্শ্বের ধুনী হ'তে একটু ছাই কারো হাতে—কারো হাতে বা একটা শুষ্ক বেলপাতা কি ফুল—আবার কাউকে এতটুকু একটু কি এক গাছের শিকড় দিয়ে বলছেন—'ঈশ্বর তোমার আশা পূর্ণ করুন! ওঁ শান্তি···'

শ্রদ্ধানত মনখানি নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে চন্দ্রা! অন্তরের কানায় কানায় তার হাসি-কান্নার ফেনিলোচ্ছ্বাস। কে জানে—সাধুর কৃপা লাভে তার পোড়া ভাগ্য সমর্থ হবে কি না! বন্ধ্যার মর্ম বেদনা কি সাধু উপলব্ধি করবেন! না সর্বক্ষেত্রের ন্যায় এবারও বিফল হবে তার আয়োজন?

চন্দ্রার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও হয়তো এমনই নানা কথা চিন্তা করছিলেন। এই সময় কি ভেবে বধূর কানে কানে বললেন—'বৌমা, কি জানি—আমার কেমন যেন হঠাৎ ভয় ভয় করচে মা! অরুণ যদি জানতে পারে যে, আবার আমরা এই রাত্তিরকালে এ্যাত দূরে সাধু দেখতে এসেচি, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। যা রাগী ছেলে! একে তো দৈব-টৈব সাধু-সজ্জন মানেই না সে, তার ওপর—কাজ নেই মা—চলো একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা যাক্। আর যা দেখচি, তাতে সাধু ঠাকুরের সুনজর যে চট্ করে আমাদের দিকে পড়বে তা তো মনে হয় না। অন্য আর একদিন না হয় সুবিধে মত আসা যাবে, কি বলো?'

চন্দ্রারও মনটা কেমন ছাঁৎ করে উঠলো—সত্যিই যদি স্বামী তার জানতে পারেন! স্বামীর কঠিন চিত্ত তো তার ব্যথা বুঝবে না। মনে পড়লো স্বামীর নিষেধাজ্ঞা—বিজ্ঞানের যুগে এসব শোভা পায় না। শাশুড়ীর কথার-উত্তরে কি যেন একটা বলতে গেল সে, কিন্তু সহসা একস্থানে দৃষ্টি প'ড়তেই তার কণ্ঠের ভাষা কণ্ঠেই রুদ্ধ হ'য়ে গেল। বিস্ময়ে তার চক্ষু দুটি ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হ'ল।—কিন্তু এও কি সম্ভব!

ঠিক এই সময় সাধুজী ইংগিতে এক ব্যক্তিকে কাছে ডাকলেন। লোকটির চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, যুক্তকর—ধীরে ধীরে সাধুর কাছে এসে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলে। স্বল্প হাস্যের সংগে সাধু আশীর্বাদ ক'রে বললেন—'তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে···এক বৎসরের মধ্যেই তুমি ভগবানের দয়ায় পুত্র মুখ দর্শন করবে। ঈশ্বর তোমার মংগল করুন ···ওঁ শান্তি।' বলেই কি একটা শিকড় তার হাতে তুলে দিলেন। লোকটি পরম ভক্তির সংগে সাধুর সে দান বক্ষে চেপে ধরলো।

—'কে ও—কে!'

আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উন্মাদিনীর মত শাশুড়ীর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে চন্দ্রা বলে উঠলো—'মা, মা, ঐ দেখুন, আপনার ছেলে, আপনার ছেলে'—আর সে বলতে পারলে না, আনন্দাশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

আর, আর চন্দ্রার শাশুড়ী?

নাস্তিক পুত্রের গোপন আস্তিকতা দর্শনে তিনিও গভীর বিস্ময়ে হতবাক। সূর্যের বিপরীত গতি যদি আজ তিনি চোখের ওপর দেখতেন, তাহলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হতেন না। তাঁর অরুণ—ডাক্তার ছেলে অরুণ—ক্ষণপূর্বেও যার অবিশ্বাসী অন্তরের কথা চিন্তা ক'রে তিনি ভীতি প্রকাশ করেছেন—সেও পুত্রের কামনায় আপনার আশৈশব দৃঢ় মতামতকে তুচ্ছ করে ছুটে এসেছে—দৈবজ্ঞের দরবারে! পুত্রের অভাবনীয় আচরণে হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক করতে পারলেন না তিনি। নিমেষহারা দৃষ্টি তাঁর পুত্রের প্রতি স্থির হ'য়ে গেল।

মূলধন ও যান্ত্রিক উৎপাদন

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ধনিকবাদের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সমাধানের জন্য ধুরন্ধর ধনপতিগণ যে কতরকম ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করতে পারে, মার্কসের আমলে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় নি, তাই মার্কসের হিসাব থেকে সে সব বাদ পড়েছে। Capitalism বা ধনিকবাদ স্বদেশে যখন পরিপক্ক অবস্থায় (Saturation pointএ) গেল, তখনই তার নূতন বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হল—উপনিবেশিক প্রথায়, সাম্রাজ্যবাদে ও বিশ্ববাণিজ্যে। এর কোনোটাই মার্কসের আমলে তেমন ভাবে দেখা দেয় নি।* লেনিন বলেছেন ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য কেবল পরিণামগত (Quantitative) নয়,—এটা গুণগতও (Qualitative)। ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল সাম্রাজ্যবাদ ; তবুও উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধী ভাবও (Opposition) আছে। কিন্তু মার্কস তেমন ভাবে ইহা অনুভব করতে পারেন নি। উপনিবেশের আদিম অবস্থা—অর্থাৎ কেবল কাচামালের (প্রধানত-ভূমিজ) জোগানদারের অবস্থা, মার্কসের আমলে পূর্ণ পরিস্ফুট ও উত্তীর্ণ হয় নি। উপনিবেশসমূহে নূতন নূতন ধন-সম্ভার বের হল—খনিজ তৈল সম্পদ ও রবার চা, পাট প্রভৃতি কৃষিজ সম্পদ এর মধ্যে প্রধান ; অন্যপ্রকারের plantationও আছে। তাতেও ধনিকপ্রথার ফাটা-চেরা অনেকটা ঢাকা পড়ল। তারপর এল বিশ্ববাণিজ্য (international trade) ; তার ফলে ধনিকপ্রথা বিস্তৃত ক্ষেত্র পেল এবং নূতন উদ্যমে বিশ্বকে শোষণ করতে লাগল। গত যুদ্ধের পর আবার এল ফ্যাসিবাদ Fascism ; ধনিকবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ যেমন সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের ঘনীভূত ও চরমরূপ হল ফ্যাসিবাদ। গত মহাযুদ্ধে ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানে, শ্রমজীবীরা যে অভিনয় করেছে, তাতে তাদের উপর মার্কসের মতো ততটা নির্ভর করা যায় না। মার্কস তাদের আহ্বান করেছিলেন—বিশ্বের শ্রমজীবীরা তোমরা একত্র হও ; শৃঙ্খল ব্যতীত তোমাদের হারাবার কিছু নেই।—"Proletariat of the world, unite ; you have nothing to lose but your chains।" মার্কসের এই আহ্বানের মর্য্যাদা শ্রমজীবীরা রাখে নি। দেখা গেল মুসোলিনী ও হিটলারের হাতে তারা ফ্যাসিবাদের পরিপোষক ও বাহক হয়ে উঠল। দুটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোনটাতেই তারা সেই ভাবে বিপ্লবের নামে সাড়া দেয় নি। সাম্রাজ্যবাদী নেতাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে একদেশের শ্রমিক অপর দেশের শ্রমিককে হত্যা করতে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহায়তা করতেও এরা পরাঙ্মুখ হয় নি। এই যুদ্ধে ভারতেও দেখা গেল essential service বা "অত্যাবশ্যকীয় সেবক" হিসাবে কিছু সুখ-সুবিধা দিলে এরা নিজেদের স্বার্থকে আলাদা ক'রে বিপ্লব বা বৃহত্তর সমাজের কথা বেশ ভুলে থাকতে পারে।

তাই গান্ধী সহজ পন্থা নিয়েছেন ;—তিনি যন্ত্রকে একেবারে বাতিল না করলেও অত্যন্ত সঙ্কুচিত ক'রে রাখতে চান—অর্থাৎ মানুষের একান্ত অনুগত সেবক হিসাবে তার কাছ থেকে যতটুকু সেবা আদায় করা যায় ততটুকুই খুব সতর্কতার সহিত তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ! মার্কস যখন বলেছেন যে মানুষের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে—"Human labour creates value" বা শ্রমই হ'ল সব মূল্যের গোড়া—"labour is the sole source of value"—তখন তার মনের সামনে যেন রয়েছে কারখানার শ্রমজীবিরা—যাদের দুঃখের জীবন তিনি নিজ জীবনের অঙ্গ ক'রে নিয়েছিলেন। তাই কৃষকদের শ্রমকে তিনি ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় প্রায় উপেক্ষাই করেছেন। তাঁর এই একান্ত একমুখী সহানুভূতি তাঁকে শ্রমের সহজ স্বাভাবিক ও আদিমরূপ সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—মানুষের শ্রমের সহজ, আদিম ও স্বাভাবিক রূপ হ'ল

* মার্কসের "ক্যাপিটেল" (Capital) গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের এই দিক সম্বন্ধে কোন কথাই নেই। এমন কি Imperialism সম্বন্ধেই ঐ গ্রন্থ প্রায় নীরব। উপনিবেশ ও উপনিবেশপ্রথা (Colonies & Colonisation) সম্বন্ধে তাতে কিছু আছে ; কিন্তু Colony শব্দটিকে তিনি মৌলিক ল্যাটিন অর্থে ধরেছেন—অর্থাৎ অকর্ষিত জমি Virgin soil—যা নবাগতরা এসে চাষ ক'রে শোষণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের যে রূপ এখন আমরা দেখছি—এর আর্থিক রূপ,—তা হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থকের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ সম্বন্ধে J. A. Hobson লিখেছেন—"The economic taproot, the chief diverting motive of all the modern imperialistic expansion is the pressure of capitalistic industries for markets—for surplus markets, for investments & secondarily to supply products of home industry."—অর্থাৎ বর্তমান সাম্রাজ্যিক বিস্তারের প্রধান উৎস ও প্রধান আর্থিক তাগিদ হ'ল বাজার প্রসারের চেষ্টা—প্রধানত টাকা খাটাবার বাজার এবং দ্বিতীয়ত দেশের কারখানার উৎপন্ন মাল বিক্রির বাজার। সাম্রাজ্যবাদের এই রূপ মার্কস দেখতে পান নি। ক্রমেই বিদেশে ও সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশে টাকা খাটাবার প্রথা বেড়ে চলছে। ১৯০৫ সালে দেশে খাটাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং বিদেশে খাটাবার জন্য ছিল ২ কোটি পাউণ্ড মাত্র। ১৯১৩ সালে এই অঙ্ক পর্য্যায়ক্রমে হয় ৩½ এবং ১৫ কোটি পাউণ্ড। ১৯১৫ সালে ব্রিটেনের বিদেশে ন্যস্ত মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪০০ কোটি পাউণ্ড, ফ্রান্সের ছিল ১৮০ কোটি এবং জার্মেনীর ছিল ১২০ কোটি পাউণ্ড।

তার স্বাধীন স্বাবলম্বী শ্রম—স্বাধীন কৃষক, স্বাধীন কারিগর ও স্বাধীন বুদ্ধিজীবীর—সমাজসেবার উপচারের বা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন-দ্রব্যের উৎপাদনে যার স্ফুরণ। তাই তাঁর সব দুঃখ দরদ, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সব কিছুই কারখানার শ্রমজীবীদের জন্য। সেথানে গান্ধী ব্যাপকতর ও দূরতর দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন ; সেই জন্যই তিনি চেয়েছেন কারখানার অস্বাস্থ্যকর ও ব্যক্তিত্ববিনাশী আবহাওয়া হ'তে সরিয়ে শ্রমিককে তার স্বাস্থ্য ও সবৃত্তিতে স্থাপিত করতে,—তার শ্রমের লাঘবের জন্য যন্ত্র সে আনবে ও খাটাবে—কিন্তু প্রত্যেকের শ্রমের অধিকার ও দায়িত্ব অব্যাহত রেখে। শ্রমের যন্ত্র ও উপকরণের মালিক হবে শ্রমিক ; অপরের ক্রীতদাস হয়ে, অপরের মুনাফার জন্য অপরের যন্ত্রে ও উপকরণ নিয়ে সে শ্রম করবে না।

মার্কস কেবল কারখানার শ্রমজীবীদের উপরই জোর দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে সমাজ তাদের উপরই গড়তে চেয়েছেন। কিন্তু সমাজের একটা বৃহৎ অঙ্গ—এবং যাদের শ্রমের মূল্য সমাজের পোষণের পক্ষে সব চেয়ে বেশী, সেই কৃষকদের তিনি কার্যত বাদ দিয়েছেন। তাঁর সমাজ-দর্শনের এই একদেশদর্শিতার ত্রুটি বিশেষভাবে ধরা পড়ল রুষ-বিপ্লবের সময়,—লেনিন ও ট্রটস্কী প্রথম নৈষ্ঠিক মার্কসীয় নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সুরু করেছিলেন—War Communism উগ্র সাম্যবাদ ; কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁরা বৈপ্লবিক সাহসের পরিচয় দিয়ে নিজেদের ভুল শুধরে নিলেন এবং কৃষককে তার ন্যায্য স্থান দিলেন। ষ্টালিন এই কার্যক্রমকে পূর্ণ করলেন, তখন শ্রমিক ও কৃষকের ভোট-ক্ষমতা সমান ক'রে দিলেন।

গত মহাযুদ্ধের পর, প্রাচ্য ইউরোপ—বিশেষ ক'রে বলকান রাজ্য-সমূহে "সবুজ সাম্যবাদ" (Green Socialism) নামে কৃষক-মূলক সাম্যবাদের আন্দোলন সুরু হয়। তাদের কথা ছিল "Peasants of the world, unite"—বিশ্বের কৃষকগণ একজোট হও। বুলগার কৃষক দলের নেতা ষ্টামবুলিস্কী (Stambulisky) ছিলেন এই আন্দোলনের নেতা ; পরে তিনি আততায়ীর হাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর নেতৃত্বে এক প্রচার পত্রে বলা হয়েছিল "বুলগেরিয় কৃষক সংঘের এই কংগ্রেস সমস্ত জাতিসমূহের কৃষকদের আহ্বান করছে—নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে আহরণ করার জন্য যেন একসঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। এই ভাবে সংঘবদ্ধ কৃষকদের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক কৃষক সংঘের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মানব সমাজকে নূতন ক'রে গড়বার কাজে এই বিশ্ব-সংঘ বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে।"*

কৃষকের চেয়ে শ্রমজীবীর সংখ্যা বরাবরই কম—এবং হয়ত বরাবর-ই তা থাকবে। কৃষকরা-ই সমাজের আদিম ও মৌলিক অভাব-পূরণ করে। গান্ধী এটা উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর কার্যক্রমে ও সমাজ-ব্যবস্থায়—এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে কৃষকের দিকে-ই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। খাদ্যের পর-ই মানুষের প্রধান অভাব হ'ল—বস্ত্রের। ইংরাজী বচন আছে—"When Adam delved and Eve span, who was then a gentleman ?" —আদিম মানব আদাম যখন চাষ করত এবং তার পত্নী ইভ যখন কাপড় বুনত, তখন ভদ্রলোক ছিল কে ? পূর্বে বলেছি—ধনিকপ্রথার—(Capitalism) সূত্রপাত হয়েছে—বস্ত্র উৎপাদন দিয়ে। এই ঐতিহাসিক তথ্যের হিসাব গান্ধী করেছেন কি না, জানি না ; কিন্তু ধনিকপ্রথা ও ইণ্ডাষ্ট্রীবাদের বিরুদ্ধে অভিযান তিনি সুরু করেছেন বস্ত্র-উৎপাদন দিয়ে-ই। ধনিকপ্রথার একেবারে গোড়ায় আঘাত ক'রে তিনি সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অন্যায়, অসত্য ও হিংসা-মূলক ব'লে ঘোষণা করেছেন।

মার্কসের পর বা সমসময়ে অর্থ-ব্যবস্থায় আরও দুটি নূতন প্রথা দেখা দিয়েছে—joint stock company এবং co-operative society.—যৌথ ও সমবায় কারবার। পূর্বে যে সব যৌথ কারবার joint stock Co.) ছিল, তা ছিল প্রায়-ই সরকারী সনদ প্রাপ্ত (chartered) কোম্পানী—উৎপাদনের চেয়ে বাণিজ্যের প্রতি-ই যার লক্ষ্য ছিল বেশী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং (East India Co.)—এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু দেশে খুচরা আয়ের পরিমাণ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমবেতভাবে ও সীমাবদ্ধ দায়িত্ব (limited responsibility) নিয়ে সম্মিলিত উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা স্থাপন করতে লাগল। বৃহৎ ধনপতিদের একাধিপত্যে—এক নূতন বাধার উদ্ভব হল। আজ শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান ও কারখানা যৌথ কারবার—বহু লোকের অর্থে তা গঠিত এবং বহুলোক এর লভ্যাংশ পায়। এর ফলে শ্রমজীবীরা এবং মধ্যবিত্তরা-ও ছোট খাটো ধনপতি (capitalist) হবার সুযোগ পেল এবং ন্যস্ত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হল। এই অবস্থা-ও মার্কস অনুধাবন করেন নি। এর পর এল সমবায় প্রতিষ্ঠান। Capital গ্রন্থে co-operation শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। সেখানে এর অর্থ হল—এক বিরাট কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমের বিভাগ *। সমাজের অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমশীল জনতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই সমবায় প্রথা যে কতটা সহায়ক—তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এই বিষয়ে-ও সোভিয়েট রাষ্ট্র-নৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে এগিয়ে গিয়ে সমবায় প্রথার আশ্রয় নিয়েছে।

যৌথ কারবারে ও বড় বড় কারখানায় শ্রমজীবী ও ধনপতিদের

---

* "The Congress of the Bulgarian Peasants Union invites the peasants of all nations to organise in the name of their common interests and to take political power into their hands. Peasants thus organised have need of a powerful International Peasant Union. And this Union will play a great role in the rebuilding of humanity.

* When numerous workers labour purposively side by side and jointly, no matter whether in different or in inter-connected processes of production, we speak of this as co-operation."—অর্থাৎ যাকে আমরা বলি division of labour—শ্রমের বিভাগ।

স্বার্থের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য, অন্য অনেক রকম ফন্দি-ও উদ্ভাবিত হয়েছে। শ্রমজীবীরা যৌথ কারবারের অংশীদার হ'তে পারে এবং অনেক সময় তাদের সেই সুযোগ-ও দেওয়া হয়। লাভের একটা অংশ আজকাল অনেক কারবারেই শ্রমজীবীদের জন্য ভিন্ন ক'রে রাখা হয়;—profit sharing—লাভের অংশ এবং bonus—বকসিস—এই দুই ভাবে এটা সাধিত হয়। এর ফলে কারখানায় বা কম্পানীতে যাতে বেশী লাভ হয়, সে দিকে শ্রমজীবীদের একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা জাগে। অনেক যৌথ কারখানার, পরিচালনায় (managementএ) শ্রমিকদের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়; বিভাগীয় পরিচালক বা তার কমিটি তাদের ভোটে ও তাদের মধ্য হ'তে নির্বাচিত হয়। এমন ব্যবস্থাও ২।১ স্থানে হয়েছে—সমস্ত ব্যবসায়টি শ্রমিকগণই পরিচালনা করে এবং লাভও তারা পায়;—কেবল ব্যবসায়ের মূলধন হিসাব ক'রে শ্রমিকগণ ধনপতিকে (Capitalist) মূলধনের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয় মাত্র। এই সব ফন্দি-ফিকিরের ফলে ধনজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব তা অনেকটা ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

শ্রমজীবী ও ধনজীবীর যে মৌলিক দ্বন্দ্ব—যার উপর মার্কস তাঁর সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করেছেন, তা আজ নানাভাবে প্রতিহত ও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। শ্রমজীবীগণ এক একটা কারখানায় বা ইণ্ডাষ্ট্রীয় অঞ্চলে জমাট হয়ে বাস করে; কৃষকদের মতো নানাস্থানে ছড়িয়ে থাকে না। তাই শ্রমজীবীদের ছোটখাটো সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিকে উস্কিয়ে দিয়ে, তাদের হাত করা অনেক সহজ। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শ্রমিকদের (Specialised and expert) এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে ব্যবস্থার পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে শ্রমিকদের মধ্যেও কুলীন ও ভঙ্গের পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। বেকার সমস্যা বর্তমানে এমন প্রবল যে তার ফলেও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা অটুট রাখা সম্ভব হয় না;—গোলমেলে বা অবাধ্য শ্রমিকের স্থানে বেকার শ্রমিক বসিয়ে কাজ চালানো ধনজীবীদের পক্ষে আজ খুবই সহজ হ'য়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও এই গত যুদ্ধের সময়ও শ্রমিকগণ অনেক সময়ই বিপ্লব-বিরোধী পন্থা নিয়েছে। ৪২ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টায়ও আমাদের দেশের শ্রমিকগণ essential serviceএর খুচরা সুখ সুবিধা পেয়েই, বিপ্লবের অনুকূল না হয়ে বরং প্রতিকূলই হয়েছিল। আজও বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থিক ধর্মঘটের দিকেই এদের নজর বেশী; দেশের বৃহত্তর জনতার মঙ্গল সাধনে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে এদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অপর দিকে বরং কৃষকগণ সরকারী প্রলোভনের বেড়া-জালে তত সহজে ধরা দেয় না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারীয় (czarist) সরকার শ্রমিকদের হাতে রাখার অনেক ব্যবস্থা করে;—Workers' Group of the War Industry Committee স্থাপন করার উদ্দেশ্য ছিল, উহাই। জারীয় সরকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সফলও হয়েছিল। এই যুদ্ধে আমাদের দেশে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু কোন সময়ই কোন দেশের সর্বত্র-বিস্তৃত কৃষকদের তেমন ভাবে হাত করা সরকারের পক্ষে তত সহজ হয় না।

১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইউরোপ ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনে মেতে উঠেছিল। তার সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা এই ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনের উপরই গ'ড়ে তুলতে লাগল। কৃষিজ সম্পদ ও কাঁচামালের জন্য তারা নির্ভর করত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার উপর। তারা মনে করেছিল এমনি ভাবেই বরাবর চলবে। কিন্তু সাম্রাজ্যিক রেষা-রেষি ও ঈর্ষার ফলে এই ব্যবস্থায় বাধা পড়তে লাগল। কাঁচামাল সংগ্রহের, মূলধন খাটাইবার ও উৎপন্ন মাল বিক্রীর ক্ষেত্র হিসাবে—আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার সাম্রাজ্যিক ও উপনিবেশিক ক্ষেত্র আর তেমন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রইল না। পূর্বে ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও বেচাকেনায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভবপর হল না। ক্রমে ইউরোপে জার্মাণী, ইটালী প্রভৃতি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বী হল। পরে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীও এল। জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, চীনের ও ভারতের কতক অংশ এবং ইউরোপের পরে আগত জার্মেণী ও ইটালী ইণ্ডাষ্ট্রীয় উৎপাদনে ও বেচাকেনায় পূর্বাগত ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতির একচেটিয়া শোষণের বাধা হ'য়ে উঠল। সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ এমন বিশ্বব্যাপী হ'য়ে উঠল এবং মারণ অস্ত্রও এমন গুরুতর হ'য়ে উঠল—যে দূর দূর দেশ হ'তে খাদ্য বা কাঁচা মাল আনা বা দূর দেশে উৎপন্ন মাল বিক্রি ক'রে সমাজের পূর্ব ঠাট বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠল। তার ফলে সব দেশেরই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেরও আবার কৃষির দিকে নূতন ক'রে ঝোঁক দিতে হচ্ছে। ইণ্ডাষ্ট্রির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিলে এবং কৃষি ও কৃষককে উপেক্ষা ক'রে যে সমাজ বড় হ'তে পারে না—তা আজ সকলেই বুঝতে পারছে। অর্থাৎ এক শতাব্দী পূর্বে মার্কসের আমলে ইউরোপীয় সমাজে কৃষি ও কৃষক যেমন কতকটা অনাবশ্যক ব'লে বিবেচিত হত, আজ আর তা নয়। প্রত্যেক দেশেই আজ কৃষক সমস্যা—রাজনৈতিক দলসমূহের নজর আকর্ষণ করছে; সোভিয়েট রুশিয়া এই বিষয়ে প্রায় অগ্রণী। আজ গান্ধীও যদি কৃষকের দিকেই বেশী করে দৃষ্টি দেন, তবে বাস্তব সমস্যার মর্যাদাই তিনি দিচ্ছেন।

সমাজ ব্যবস্থার এই সব নূতন শক্তি ও ঝোঁকের (tendency) উদ্ভব, আজ আমাদের হিসাব করা দরকার। সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক মার্কসীয়বাদ থেকে কোথায়ও কোন বিষয়ে-ও কতটা সরে বা এগিয়ে গিয়েছে, তাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে মার্কসীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা কতটা সফল হয়েছে বা কতটা ব্যর্থ হয়েছে—আজ তা হিসাব ক'রে আমাদের পন্থা নির্ণয় করা দরকার। লেনিন যে মনোবৃত্তির নিন্দা ক'রে বলেছেন "learned by rote—without studying the unique living reality"—একমাত্র জীবন্ত বাস্তবকে অধ্যয়ন না করে, পুঁথির মুখস্ত বিদ্যা—সেই মনোভাব নিয়ে তোতাপাখীর মতো মার্কসের বুলি আওড়িয়ে গেলে, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। মার্কসের অভিজ্ঞতা, অনুমান ও আশার অনেক ব্যতিক্রম অর্থব্যবস্থায় এই পৌণে এক শতাব্দীতে হয়েছে; সোভিয়েট রাষ্ট্র-ও তা কার্যত স্বীকার ক'রে নিয়েছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মার্কসের এমন কি লেনিনের আশাও সোভিয়েট রাষ্ট্র পূরণ করতে পারে নি। লেনিন বলেছিলেন—স্থায়ী সৈন্য, স্থায়ী পুলিশ

ও আমলাতন্ত্র কম্যুনিষ্ট-আদর্শমুখী রাষ্ট্রে থাকবে না। (No standing army, no standing police and no bureaucracy in the interrim stage.) এই তিনটিই সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ প্রবলরূপে আছে। এর মধ্যে সোভিয়েটরাষ্ট্র-নায়কদের দোষ ত্রুটির কথা বলছি না,—বলছি বাস্তব অবস্থার অপ্রতিহত গতির কথা, যে গতির সামনে কেতাবী বাঁধি গৎ স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। তার উপর এসেছে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক রাষ্ট্র (totalitarian state) সমাজের সর্বাঙ্গকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখার যার কায়দা-সভ্য মানুষকে শঙ্কিত করেছে।

এমনি অবস্থায় এসেছেন গান্ধী-তাঁর ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ নিয়ে। মার্কসীয় ব্যবস্থার ব্যক্তি হল আত্ম-সত্তা-হীন সমাজের অঙ্গ। তার বিষময়রূপ আমরা দেখছি—ফ্যাসীবাদে, যার গঠনে ও প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবীদের অবদানও কম নয়। সমষ্টিগত সমাজের মঙ্গলময় রূপ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস হচ্ছে সোভিয়েট রাষ্ট্রে। এর মধ্যে ব্যক্তির স্বতন্ত্র স্থান কতটা থাকবে—আজও তা সন্দেহের। ব্যক্তিকে সমষ্টিগত সত্তার নিকট বিসর্জন দিয়ে মঙ্গলকর ব্যবস্থা কি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে, তাও সন্দেহজনক। তাই গান্ধী ব্যক্তির স্বতন্ত্র আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সত্তা মান্য ক'রে—নূতন অর্থ ব্যবস্থার সূচনা করেছেন। এর মধ্যে ব্যক্তিগত ধন সঞ্চয়কে তিনি চৌর্য বলে অভিহিত করেছেন।* গান্ধীর ব্যবস্থার মধ্যে সমবায় প্রথার স্থান সঙ্কুলানও হতে পারে;—এবং সর্বোপরি ব্যক্তির আর্থিক স্বতন্ত্রসত্তা এতে স্বীকৃত হয়েছে।

মার্কস ঐতিহাসিক ডায়েলিকটীকের (historical dialectic) উপর একটু অতিরিক্ত নির্ভর ক'রে আগতপ্রায় সাম্রাজ্যবাদের আধিকরূপ যৌথ-কারবার (joint stock co) ও সমবায় সমিতির (co-operative society) সম্ভাবনা দেখতে পান নি,—যদিও তাঁর জীবিতকালেই এই সব দেখা দিয়েছিল। তিনি কৃষকের শ্রমকে উপেক্ষা করেছেন বৃত্তিহীন শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখে অভিভূত হ'য়ে এবং সর্বোপরি কল কারখানার এমন তীব্র নিন্দা করেও (বোধ হয় গান্ধীর চেয়েও তাঁর ভাষা এই বিষয়ে কঠোর), তিনি কল-কারখানাকে বাদ দিবার প্রস্তাব করতে সাহস পান নি। আজ গান্ধী মার্কসের এই সব ত্রুটি শুধরিয়ে চলবার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা মার্কসের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুরক্তির অভাব থেকে একথা বলছি না;—একথা বলছি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকে। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি মার্কস একজন যুগপ্রবর্তক; সমাজের গতি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কেউ ত' সর্বকালের জন্য অভ্রান্ত নন। কিন্তু তিনি যখন শ্রমজীবীর একাধিপত্য বা "Dictatorship of the Proletariat" এর জন্য আহ্বান দিয়েছেন, তখন তিনি যে সমাজের বিরাট শ্রমশীল কৃষক জনতাকে উপেক্ষা করেছেন, তখন তিনি যে কারখানার বাইরে শ্রমিকের স্বাধীন ও স্বাবলম্বী রূপকে অসম্ভব ব'লে ধ'রে নিয়েছেন—তা ত অস্বীকার করার নয়। * অবশ্য মার্কস বহু স্থলে কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকা ও সম্ভাবনার কথা পরে বলেছেন; কিন্তু প্রধানতঃ ইংলণ্ডের অবস্থাকে মনের সামনে রেখে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি বিত্তহীন শ্রমজীবীকে-ই বা proletariat কে-ই একমাত্র বিপ্লবের যন্ত্র হিসাবে নিয়েছেন। আজ গান্ধী যদি এই ত্রুটি সংশোধন করেন, তবে তা ও স্বীকার ক'রে নিতে হবে। †

* We are thieves in a way if we take anything that we do not need for immediate use and keep it from somebody else who needs it......So long we have got this inequality, so long I shall have to say we are thieves.

* অবশ্য পরবর্তী জীবনে জার্মেনীর কৃষক বিদ্রোহের সংবাদের পর, তিনি কৃষকদের সম্বন্ধে এতটা উদাসীন থাকতে পারেন নি। কিন্তু তবুও তাঁর ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার শেষ কথা রেখে গেছেন—কারখানার শ্রমজীবীদের একাধিপত্যে (Dictatorship of the proletariat), তার মধ্যে কৃষকের কোন স্থান-ই প্রায় নেই।

† বাংলায় industry শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে চলছে শিল্প। industrial area-এ বাংলা হ'ল—শিল্পাঞ্চল। আমার মনে হয়—এটা ভাষার দৈন্যের পরিচায়ক এবং শিল্প শব্দটার প্রতি এতে জুলুম করা হয়। তাই আমি বাংলাতে ইণ্ডাষ্ট্রি শব্দই রেখেছি। এমনি বিদেশী শব্দ ত বাংলায় বহু গ্রহণ করা হয়েছে।

অরুণাচলের ঋষি

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

রাত্রির তৃতীয় যামে তরুণ তাপস তড়িতাহত হয়ে বেরিয়ে পড়েন পথে—কে যেন তাঁকে ডাকছে। কার ডাক্ তিনি শুনলেন, কে সে, কোথায় সে—স্কন্দপুরাণে তিনি পড়েছেন, তীর্থশ্রেষ্ঠ অরুণাচলের কথা, বালারুণের মত প্রোজ্জ্বল, স্বয়ং ক্ষেমঙ্কর শিব যার কেন্দ্রে অধিষ্ঠান্। দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত নিদাঘতপ্ত গ্রীষ্মের পর ঝরঝর বর্ষা, বর্ষার পরে শুভ্রশরৎ, আলোছায়ার লুকোচুরি নিয়ে, হেমন্তের দিনান্তে ঝলমল করে শস্যমালিনী পৃথিবী, আসে শীত, আসে নবমুকুলিত বসন্ত, পরিব্রাজকের পরিক্রমার কিন্তু শেষ নেই—ক্লান্তিবিহীন পথ। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, খোঁজার আর বিরাম নেই—কোথায় তুমি! উন্মাদ হয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্ দেশে দেশে, অরণ্যে কান্তারে—দেখা দাও দেখা দাও। হঠাৎ এক শুভক্ষণে লগ্ন এলো—বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে উঠেছে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একটি

রেখা, সামনে দাঁড়িয়ে অরুণাচল—হাতছানি দিচ্ছে—এসো তুমি বন্ধু সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে আমার এই আশ্রয়ে। বিদ্যুৎদৃষ্টিতে দেখলেন তিনি পাহাড় বাঙ্ময়, প্রাণময়, তার অনুতে অনুতে স্পন্দন্। ওই তে সেই শ্যামলসুন্দর, চিররাস রসিক, প্রশান্ত মহেশ্বর। ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়ে—কি অপরূপ বেশেই তুমি দেখা দিলে প্রভু 'ঠাড়ি রাহা মেরে আঁখনকে আগে।

ইনিই তামিল দেশের বিখ্যাত মহর্ষি রমণ্—আজও অরুণাচলের পাদপীঠে তপস্যামগ্ন। ভারত ইতিহাসের প্রথম পরিচিত পর্বে আমরা শুনেছি মানব কল্যাণ কামনায় হিতব্রত, স্থিতধী আরণ্যক ঋষিদের কথা—কত সমিধোজ্জ্বল হোমধূমাগ্নি কলরবমুখরিত বেদগান। তারপর কতযুগ কেটে গেছে, কত শতাব্দী পার হয়ে মানুষ চলেছে, দেশে দেশে সৃষ্টির রূপ বদলেছে, সংস্কৃতির রূপান্তর, নতুন মত, নতুন রীতি চলতি পথে ভিড় জমিয়েছে, কত দুঃখ বেদনা, আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে সে যাত্রা। শত বাধা বিপর্যয় দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্যেও ভারতবর্ষের সাধক কবি কর্মী মনীষীরা ঋষিকুলের সেই পুরাতনী বাণী বহন করে চলেছেন আজও এই বিংশশতাব্দীর পঞ্চম পাদে গুহাগহ্বর আশ্রমের উপান্ত থেকে জনঅধ্যুষিত প্রান্তরে, প্রাণোৎসবের সার্থকতায়।

মহর্ষি রমণ্ সেই গোষ্ঠীরই একজন। বাংলাদেশে অপরিচয়ের ব্যবধান হেতু তাঁর সম্যক্ স্বীকৃতি হয়ত নেই। কিন্তু যাঁরাই এই তপোজ্জ্বল ঋষিকে তাঁর চিরশান্ত সমাহিত তপস্যার অপ্রগল্ভ আসনে স্থির অচঞ্চল দেখেছেন তারাই মনে মনে নমস্কার জানিয়েছেন। বিখ্যাত লেখক পল্ ব্রণ্টনের লেখাতেই তিনি প্রথমে প্রতীচির কাছে প্রচারিত হন্, A Search in Secret India, A message from Arunachala প্রভৃতি পুস্তকে।

মহর্ষি রমণ্ স্বয়ং তামিল ভাষায় তাঁর সাধন্ সন্ধানের গূঢ় কথা, কয়েকটি সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তারই ভাবসমষ্টির একটু ক্ষীণ পরিচয় নীচে লিপিবদ্ধ হল।

মৌনীমুনি, ধ্যানী অরুণাচল
উর্দ্ধশীর্ষ, বিলীনাক্ষ হে অতল
উদয় অচল চূড়ার শুভ্র উপান্তে
সমীরিত আকাশের নিমীলিত সীমান্তে
মূর্ত মহাকাল অতন্দ্র আছ জাগি
যুগ যুগ ধরি তব ভক্ত লাগি
কে বলে তোমায় শুধু পাথরে গড়া অচঞ্চল
নির্বাক্ নিষ্প্রাণ্, নিশ্চল
নও তুমি নও তুমি
পাষাণ তৃণগুল্ম গিরিদরীভূমি
মসীলেপা ধরণীর বুকে
তুমি দিলে এঁকে
কালো গেরি মরকতরেখা
আলোক আলোর একটি লেখা
মগ্ন অগ্নি স্তম্ভ
হিরণ্ময় হিরণ্যগর্ভ।
সবিতার দ্যুতি নবোজ্জ্বলা
তব অঙ্গন্ তলে কভু হয়নি নিষ্ফলা

হে প্রভু, শ্যামল শোভন্
মর্মপ্রিয়, মনোমোহন্
তোমাতে আমাতে
পরম প্রীতিতে
কি রীতিতে করিলে উন্মন্
বন্ধনহীন্ নিমন্ত্রণ
মনপ্রাণ নিলে হরে
রূপরসে দিলে ভরে
ধ্যানমগ্ন সে তুমি
সম দুঃখ সুখ ক্ষমী
তাই নিয়েছি শরণ্
মরণ জয়ী ঐ রাতুল চরণ
তোমার হৃদয় কন্দরে
মোর মন আজি বন্দরে।
আমি শুনেছি তব অশ্রুত ভাষা
নীরব বীরাত্রির অপ্রমত্ত আশা
অরণ্যবীথির অনুতে বর্ণিত স্পন্দনে
প্রতিটি ধূলিতে পাত্রে অপরূপের মণ্ডপে

শুনেছি তব সাদর সামগান
আকুতি ব্যাকুল আহ্বান্
নিঃসীম নৈঃশব্দ মাঝে
অনাহত একতারায় বাজে
প্রত্যুষে সায়াহ্নে
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে
রাত্রির গভীরে উচ্ছ্বসি
রিক্ততা পূর্ণতায় মহীয়সী
শান্ত শিব কল্যাণের সে বাণী
জলে স্থলে ব্যাপি বনানী
অন্তরের আঁখি দিলে খুলে
সৃষ্টি করা দৃষ্টি দিলে মেলে
মনের মণিকোঠায়
পৃথকের সত্তা যেথা লুকায়
বিলুপ্তির বিরামতটে
চির চরমের ঘাটে
পরিপূর্ণ একটি প্রমাণে
সেই তুমি প্রাণারামে।



অৰ্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা— শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

(১১)

নীহারিকা সবই শুনল। বন্ধুমহলে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর এই রকম আলোচনা অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে করল—কিন্তু তার মুখ সে বন্ধ করবে এবং কি করে বন্ধ করবে? বাধা দিলে হবে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। আর প্রদ্যুম্নটাও এমন বোকা; মুখের মধ্যে যেন বুকের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে। রঘুবংশ পড়তে পড়তে যদি দেখল সে জানালার উপর দিয়ে মেঘ যেতে যেতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, ওর মুখ দেখেই মনে হবে যেন ও বলছে—হায়, আজ আর আমার লিপি অলকাপুরীতে প্রিয়ার কাছে পৌছাল না। কীট্‌স্ পড়া যখন হয়—মনে হয় বেচারার হৃদয়ে শত কীট দংশন করছে। আহা এমন সরলহৃদয় বন্ধুর প্রণয় পথ এত অসরল কেন? একই শতাব্দীর দুই যুগের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের এত প্রভেদ কেন?

তাই সে ঠিক করল যে প্রদ্যুম্নকে যুদ্ধাভিমুখী করতে হবে, আর তারই প্ররোচনায় সুরধুনীকেও জাগাতে হবে। তার ফলে মোক্ষদা যদি তাজ্জব বনে যান তা বনতে দাও; তার নিজের মতে নিয়ন্ত্রিত সংসারে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে বলে যদি মনে করেন ত করতে দাও। বিপ্লব? হ্যাঁ, ওই কথাটাই ঠিক। অতীত যখন বর্ত্তমানের কণ্ঠরোধ করে ভবিষ্যতের সঙ্গীত সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে তখন বিপ্লবই চাই। বিপ্লব।

ওর মতে রবি ঠাকুরী মিইয়ে-পড়া হাল ছেড়ে দেওয়া বিলাপের সুরে আর চলবে না। সেদিন বন্ধু বহুক্ষণ তার ঘরে বসেছিল। বেশী কথা হয় নি। কোন ভাব বিনিময়ও হয় নি। শুধু সে জানতে পেরেছিল যে বাড়ীর সবাই থিয়েটারে গেছে। তারও আহ্বান ছিল কিন্তু নীচের স্টলে (স্টৈবল অর্থাৎ আস্তাবল নয়, মশায়। ওটাকে স্টল বলে, কারণ সেখানে সেঁটে বসতে হয়) তাকে একা বসতে হত আর সবাইকে—অর্থাৎ যে নিজেই তার কাছে সব, তাকে—বসতে হত আর সবার সঙ্গে উপরে চিকের আড়ালে, পুরুষদের সঙ্গে আড়ি করে। কাজেই প্রদ্যুম্ন বন্ধুর বাড়ীতে বিশেষ নিমন্ত্রণের অজুহাতে অভিনয়ের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়েছিল। থিয়েটারে যাবার সময় অল্পক্ষণের জন্য সুরধুনীর সঙ্গে একা দেখা হয়েছিল শোবার ঘরে; সে তখন অভিমানে ঘর ছেড়ে রওনা হয়ে যাচ্ছে। দুজনে বেশী কথা হয় নি, বাইরে যে সবাই সোরগোল করে অপেক্ষা করছে। কাজেই সে জানায় নি অভিমান, আর সুরোও বলতে পারে নি নিজে কি চায়। প্রদ্যুম্ন চুপচাপ এসে বসেছিল নীহারিকার ঘরে। বাক্যালাপ হয় নি, হয় নি অভিযোগ বর্ণনা বা অভিমান ব্যঞ্জনা। শুধু নীরবতা সরব হয়ে ঘরটী ভরে ছিল।

সেদিন রাত্রে প্রদ্যুম্ন চলে যাবার পর নীহারিকা অশান্ত উত্তেজনায় সারা ঘর পায়চারী করে কতক্ষণ কাটিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। রাত্রি গভীর হয়ে গেল, চাঁদ আকাশে হেলে গেল। সহরের শেষ 'বাসে'র শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল, আর সে একটী সনেট রচনা করে তার পরে ধীরে ধীরে শান্তি পেল।

বিদায় আরতি শেষে নিশীথের বাস
যদি ভারী হয়ে আসে স্মরিয়া তোমায়,
যদি কভু বিরহার্ত্ত হৃদয়ের ভার
ভুলে যেতে চায় তব বসন্ত সন্ধ্যার
সীমন্ত সিন্দুর রাগ—সে হৃদয়খানি
দূরান্তরে রাঙাইব সাধনার বাণী
গুঞ্জরিয়া। যতটুকু তব স্পর্শডালা
তোমারেও না জানায়ে এ দূর নিরালা
জীবন ভরাতে পারে, শুধু সে টুকুরে
যদি পাই—তার বেশী ব্যথাহত সুরে
চাহিব না, প্রিয়ে। যাহা দিলে তৃপ্তি পাও,
যা বরিয়া নিলে মোর মৌন বেদনাও

জ্বলিবে অনল হয়ে, তুমি দিয়ো তাই ;
সে আগুন ছানি' আলো লভিব সদাই।

কিন্তু আর এই উদাস বিধুর আত্মবিলোপে চলবে না। এখন চাই বিক্রম, চাই আক্রমণ। চাই বিপ্লব, চাই বিপ্লাবন। মোক্ষদার মোক্ষপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। যৌবন যে যায়। তার প্রত্যেকটী দিন, ঘণ্টা, প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যে চায় বিকাশ ও বিস্তার ; তাদের দাবীকে ঠেকিয়ে নিজেদের বুভুক্ষু তৃষ্ণার্ত্ত করে রাখা চলবে না আর। প্রদ্যুম্নকে প্রয়াস করতে হবে যাতে সুরধুনীর মনে জাগে সুরগুঞ্জন আর নিজের মনে আসে সাহস নিজেকে স্বীকার করবার। ভ্রূক্ষেপে উপেক্ষা করো বাড়ীর চিরাচরিত ধারাকে। শাশুড়ীর কারাগার থেকে উদ্ধার করে আনো নববধূকে। নববিবাহিত দম্পতী কি মিলবে শুধু রাত্রির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে প্রেমাবিষ্ট মোহের মধ্যেই। প্রতিটী ক্ষণের প্রতি চিন্তা কর্ম্ম আশার সহভাগিনী যে—তাকে কি পাওয়া যাবে না সব সময় ইচ্ছা মাত্রই—এই বয়সে—যখন মনে নিত্য দোলা লাগছে, জীবনে জাগছে উচ্ছ্বাস? তা ত হতে পারে না। অতএব ব্রাউনিং পড়াও সুরধুনীকে।

ইংরেজ কবি ব্রাউনিংকে প্রাচীনপন্থী পরিবারের কিশোরী বধূকে উদ্ধার করবার জন্য কেন ডাকা হল তা জানলে ইংরেজরা এদেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবে নিশ্চয়ই। তার একটী কবিতাতে এক ইটালিয়ান ডিউক ফার্ডিনাণ্ড রিকার্ডি নামে আর একজন ডিউকের স্ত্রীকে ভালবাসতেন ; তাকে কামনা করে প্রত্যহ রিকার্ডি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান—আর বধূও তাকে ভালবেসে জানালা থেকে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারা পলায়নের বন্দোবস্ত করেও পালাতে পারলেন না। জীবনে পেলেন শুধু দৃষ্টি বিনিময়। ক্ষণস্থায়ী যৌবন স্বপ্ন মলিন হয়ে আসতে লাগল ; তাই বধূ তার আবক্ষ মূর্ত্তি স্থাপন করলেন বাতায়নে, আর নাচের উদ্যানে ডিউক প্রতিষ্ঠা করলেন তার নিজের প্রতিমূর্ত্তি। অনন্ত প্রেমের এই ক্ষুদ্র পরিণতিকে কবি বলেন পাপ। পূর্ণ মিলন হল না, প্রদীপ জ্বলল না মণিকোঠায় ; জীবনে ছড়িয়ে রইল অভিশাপ। সে কথা বুঝতে হবে প্রদ্যুম্নকে, আর বুঝাতে হবে সুরধুনীকে।

বলা ত সহজ, কিন্তু করার পথ কই? বাগবাজারের উপর ব্রাউনিংএর বোমা ফাটালেও কোন ফল হবার আশা নেই। রক্ষণশীলতা হচ্ছে সবচেয়ে কার্য্যকর বিফল দেওয়াল, ইংরেজীতে যাকে বলে ব্যাফল ওয়াল। আধুনিকতার কত বোমা কত গোলাগুলি এসে তাতে ঠেকে হঠে গেল, এমন কি গেঁথে গেল। সে দেওয়ালে ফাটল ধরল, গাঁথুনী হেলে পর্য্যন্ত গেল। তবু পড়বার নামটী নেই। অতএব দূর থেকে গতিবেগ নিতে হবে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাকে বলে মোমেণ্টাম।

তাই সে প্রদ্যুম্নকে পরামর্শ দিল সুরধুনীর পিত্রালয় থেকে আরম্ভ করতে। শূন্য ঘণ্টা অর্থাৎ জিরো আওয়ার ঠিক হল রবিবার বিকেল বেলা, যে সময় বাপের বাড়ী থেকে সে ফিরে আসবে স্বামীর সঙ্গে। মোক্ষদার কবলে পড়বার আগেই একটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে প্রচণ্ড ভাবে।

বাপের বাড়ীর কন্যা ও শ্বশুর বাড়ীর কনে একই প্রাণী হলেও একই মন নয়। তারা দুজন সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথিবীর বাসিন্দা। একজন প্রভাত পদ্ম, আর একজন সন্ধ্যার সূর্য্যমুখী। একজন জেগে থাকে সারাদিনের আলো হাসি আনন্দের মধ্যে, অন্যজন মুদে আসে বিষণ্ণ সন্ধ্যার মৌনতায়। কাজেই সুরধুনীর জীবন প্রবাহের গতিমুখ ফেরাবার এই বন্দোবস্ত করা হল তার অজ্ঞাতে।

(১২)

কোন্ কবি বলেছিল ক্লান্ত দ্বিপ্রহর? সে নিশ্চয়ই আসলে কবি নয়। দ্বিপ্রহরের মত সতেজ সক্রিয় মন প্রত্যুষেও পাওয়া যায় না। মধ্যাহ্ন সঙ্গীতের মত উদাত্ত গভীর সুর সন্ধ্যার পুরবীতে কোথায়? দুটী প্রাণ আজ যেন জীবনের সঙ্গে ঝুলন খেলায় মেতেছে—অবিরাম, আত্মহারা, আনন্দোচ্ছল।

সুরধুনী। আজ তোমার কি হয়েছে বল ত?

প্রদ্যুম্ন। কই, রোজ যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছুই নয়।

সু। উহুঃ, মনে হচ্ছে হয়েছে অনেক কিছু।

প্র। যদি হয়ে থাকে ত হতে দাও। অনেক কিছু ও কোন কিছুই না এ দুইয়ে মিলে যাক—যেমন করে আমরা মিলে যাচ্ছি।

সু। না কই? আমরা ত মিলি নি। তুমিই ত বল

যে আমাদের ঠিক মিলন হচ্ছে না। তোমার সেই জার্মাণ 'হায় হায়' কবি কি বলে এ সম্বন্ধে ?

প্র। ও, সেই 'হাইনের' কথা বলছ ? প্রেমের প্রত্যেক পর্ব্ব সম্বন্ধেই তার কবিতা তৈরী আছে। সখি শুবে অবধান কর।

তোমার নয়ন পানে চাহিয়াছি আমি
ব্যথা অবসান হয়ে ঘুম গেছে দূরে,
মধুর সরম মাখা অধরেতে চুমি
পূর্ণ হয়েছি আমি সর্ব্ব সুখ পুরে ;
তোমার বুকের মাঝে বক্ষ তার রাখি
আমরা বিরাম সুখ অলকার পাই,
বলো সবে আমি শুধু তোমা ভালবাসি
আমি যে আঁখির জলে কাঁদিয়া ভাসাই।

সু। থাক্ থাক্ কবিচোরামণি, ওকথা শুনে আর কাউকে কাঁদতে হয় না।

প্র। কেন ? অতি আনন্দে মানুষ কাঁদে না ? তুমি বলবে যে তুমি আমায় ভালবাস, আর আমি কান্না সামলাতে পারব ?

সু। 'নাঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজে পড়েও মানুষের কাণ্ডজ্ঞান হয় না। না হলে যেটা অবশ্যই পাবে তা পাচ্ছ জেনে কেউ কাঁদতে চায় ?

প্র। কে বলে অবশ্যই পাব ? ওই তোমাদের সেকেলে পাওয়া—বিয়ে করে সিন্ধুকে চাবী দিয়ে গদীয়ান হয়ে সংসারে বসাটাকে আমি পাওয়া মনে করি না।

সু। ও, তুমি বুঝি একেলে পাওয়া চাও ? প্রজাপতির মত ঘুরে ঘুরে ভেসে বেড়ান। কমুনিষ্ট পাওয়া না কি একটা নাম হয়েছে আজকাল লোকে বলে। আচ্ছা কমুনিষ্ট কি ?

প্র। সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ কমন ইষ্টে সবার কম অনিষ্ট হবে বলে যারা মনে করে তারা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট। আমাদের কলেজে কয়েকটা লক্কা পায়রা আছে, লাল ঝাণ্ডাওয়ালা সব পাণ্ডা কম্যুনিষ্ট। কারণ প্রাণটা তাদের নিশ্চিন্ত আছে পৈতৃক সম্পত্তির পাকা ভিত্তিতে। যাক ওদের কথা। চল আজ তোমায় কান্না সাগর দেখিয়ে আনব গঙ্গার বুকে।

"আমার রোদন ভুবন ব্যাপিয়া
দুলিছে যেন।"

সু। কোথায় সেটা ? আর কান্না সাগরই বা কেন ? তার চেয়ে চল না, হাসি সাগর যদি কোথাও থেকে থাকে।

প্র। দুই তোমায় দেখাব। সে কোন্ জায়গায় এখন তোমায় জানাব না। আমাদের গাড়ীটা নূতন এক ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে। সে সব জানে। চল আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক। মাকে বুঝিয়ে রাজী কর।

সু। বোঝাবারই বা দরকার কী ? ও বাড়ীতে বিকেলে কুটুমরা আসছে বললেই হবে। কেহ ত আর খবর নিয়ে দেখছে না। তুমি কিন্তু কাউকে বলতে পাবে না বলে দিচ্ছি। আর শোন, আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা নেই। রাত্রে ফিরেও বাড়ীতে বলতে হবে যে এখানে অনেক লোক এসেছিল—তাই বের হতে দেরা হয়ে গেল।

প্রদ্যুম্ন ভাবছে এ কী পরিবর্ত্তন হল আজ সুরধুনীর। এ যে নূতন লোক, নব বিস্ময়ের আনন্দ ছড়াচ্ছে নিজের চারদিকে। নিজে থেকে সহজে ধরা দিচ্ছে। সাবলীলভাবে কথা বলছে, স্বাধীন বাতাসে প্রজাপতির মত রঙীণ পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে তার মন। আজ তার মায়ের পুত্রবধূ নয়, তার নিজের বঁধু—ইটালিয়ানে যাকে বলে 'কারা মিয়া'।

'কারা মিয়া'। প্রিয়া মোর। কথাটী মধুমালতীর মত কেবল মিষ্টই নয়, এতে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধবৈচিত্র্যও আছে। এ যেন শুধু স্বদেশী সন্দেশ নয়, ভেনিসের লেমন কেক। সনাতনী বাঙ্গালিনী চিরন্তনা অভিসারিকারূপে ধরা দিয়েছে আজ, কাছে আসতে চাইছে—খুব কাছে—সজীব সাজে—বুকের মাঝে। এ শুধু মন্ত্রের গ্রন্থিতে গৃহকোণে আবদ্ধ বিবাহিতা স্ত্রী নয়। এর মন জাগাতে হয়েছে, একে জয় করতে হয়েছে, একে পাবার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছে। সহস্র জনের মধ্যে তুমি মাত্র সেই একজন—যে মান অভিমান লোকলজ্জা সব কিছুর পরীক্ষা পার হয়ে ওর মনের কাছে এগিয়ে এসেছে। তাই প্রাপ্তির পূর্ণতাও হয়েছে গভীর। বুকে ফুলের মালার

ব্যবধানটুকুও আজ সইছে না। দেহ সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে কিন্তু আত্মা অসীমে এসে মিশাবে। বধূ আজ হবে বঁধু।

গঙ্গার উদার উন্মুক্ত তীরভূমিতে মোটর হাওয়ার মত উড়ে চলল। সঙ্গে পাল্লা দিল দুটী উচ্ছল উন্মুখ প্রাণ—বাসনাব্যাকুল, মিলনমুখর, অনুরাগরঞ্জিত, পরস্পরসমাহিত। দেহের তটভূমিকে হৃদয়স্রোত এসে ছল ছল রবে স্পর্শ করে যেতে লাগল। আজ কাছে কেহ নেই, নেই কোন সংসারের বাধা বা সময়ের বন্ধন। জনমানব বুঝি নেই পথে, জেটী থেকে ফিরছে না খালাসী কুলীর দল। সামনের শোফারটীও লোপ পেয়ে গেছে। তার মাথার ক্যাপ সামনের দিকে নীচু করে টানা, একমনে সে গাড়ী চালিয়ে চলেছে। সামনের সীট দুটীও পিছনের মাঝখানে কাঁচের পর্দ্দা টানা আছে। গঙ্গাবক্ষে শুব্ধ ষ্টীমারগুলির শাদা ফানেল বাহির বিশ্বের অনন্তে ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কোন একটার ভিতর থেকে বেতারে নাচের বাজনা ভেসে আসছে—যেন মুগ্ধ সমীরণ স্নিগ্ধ সলিলস্রোত স্পর্শ করে ওদের এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন কাল-বৈশাখীর মেঘ ঘন হয়ে নত হয়ে নেমে এসেছে নদীর উপর। ছিন্ন একটু মেঘের ফাঁক দিয়ে কনে দেখা আলো এসে পড়ছে সুরধুনীর লীলাচঞ্চল আনন্দোচ্ছল মুখে। শুধু প্রদ্যুম্ন আর সুরধুনী। ত্রিভুবনে আর কেহ নেই।

সু। শুনছ সেদিন থিয়েটারটা মোটেই ভাল লাগল না।

প্র। কেন? খুব ভাল পালাই ত ছিল। শুনলাম মা নাকি ঠিক করেছেন আবার যাবেন সেটা দেখতে।

সু। তা করুন। আমার ভাল লাগে নি। তবে থিয়েটারের আর এমন কি দোষ ছিল। ওরা ত ভালই করেছিল।

প্র। কি? কি বললে? ওরা ভালই করেছিল? তবু তোমার ভাল লাগল না? পরিহাসে তরল হয়ে সে আবার বলে উঠল—কেন? চিকের পিছনে এতগুলি চোখ—সবাই জমাট হয়ে বসে দেখছিলে, তবু ভাল লাগল না?

কিন্তু সুরধুনী আজ অন্তলোকে বিচরণ করছে। পরিহাসকে সে হাসিমুখে সরিয়ে দিল। সহানুভূতিতে কোমল দুটী আঁখি মেলে বলল—তুমি ত জান না ওই চিকের ঢাকনা আমার মনকে পাথরের মত চেপে রেখেছে। তুমি চাওনা এরকম, তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি সাহস করে বেঁকে দাঁড়াতে পার না কেন? পার না কেন আমায় ওই শত বাধা লোকাচার আর সারাদিনের বিরহের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে? ওদের সামনে নিজেকে মনে হয় আমি নই, আর তোমাকেও দেখি এত অসহায়। কেন, কেন তুমি পার না?

ওর কণ্ঠে একটু উত্তেজনার আভাস এসে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সে বিহ্বল হৃদয়াবেগে প্রদ্যুম্নর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল। কি নিশ্চিন্ত নির্ভর, কি পরম পরিতৃপ্তি।

ক্ষণপরে সুরধুনী বলল—চল, আজ আবার আমরা থিয়েটারেই যাই। আর সেই থিয়েটারেই যাব।

প্র। কেন, সেটা ত একবার দেখলে? চল, বরং অন্য কোনটাতে যাওয়া যাক।

সু। না, সেটাতেই যাব। আমাদের বিয়ের পর প্রথম অভিনয়-দেখা এমন ভাবে অঙ্গহান হয়ে থাকতে দেব না। সেদিন যা দেখেছি তা অভিনয় নয়, নিজের মনের অভিচার। আজ সেখানে গিয়ে দুজনে একসঙ্গে নীচের হলে সবার মাঝে বসে সেদিনটার উপর প্রতিশোধ নিব।

প্র। ঠিক, ঠিক বলেছ। চল, ওখানেই যেতে হবে। ড্রাইভার, চলো শ্যামবাজার।

ক্রমে ভীড়ের পথে মোটর চলতে লাগল। চার পাশে উৎসুক প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি, মোটরের কাঁচের জানালার খুব কাছে দাঁড়াচ্ছে ট্রামের যাত্রীর দল। একবার পথে পুলিশ গাড়ী থামালে—মনে হল সবাই গাড়ীর ভিতরের দিকে তাকাচ্ছে। আপনার অজ্ঞাতসারে সুরধুনার মাথার ঘোমটা একটু নেমে এল।

প্রদ্যুম্ন লক্ষ্য করল। ভয় হল, এবার বুঝি তার ক্ষণস্থায়ী নবলব্ধ জীবনের উচ্ছ্বাস ও স্বাধীনতার উপর যবনিকা নেমে আসছে। সারা দ্বিপ্রহরের অশিক্ষিতপটু প্রেমকূজনের পর গঙ্গাতীরের উদার প্রশস্ত বিস্তার সুরধুনীর মনে যে প্রবাহ জাগিয়েছিল• পুরাতন পৃথিবীর পরিচিত স্পর্শ লেগে তার গতিপথ ক্ষুণ্ণ হয়ে আসছে; জনতার বালিতে স্রোতধারা

শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে; সংস্কার সংহার করতে সুরু করেছে সদ্য অর্জ্জিত স্বাধীনতাকে।

লঘু পরিহাসে গুরু আবহাওয়াকে সহজ করে তুলবার জন্য সে বলল—এই দেখ, এই রাস্তাতে কতগুলি সিনেমা নূতন গজিয়ে উঠেছে। এগুলিতে মেয়েদেরই এত ভীড় হয় কেন জান?

ক্লান্ত, অনেকটা নিস্পৃহ স্বরে সুরধুনী বলল—না, তুমি বল, কেন?

প্র। দেশী ছবি দেখে ভবিষ্যৎ আর অনন্ত যৌবন সম্বন্ধে সবারই আশা হয়। মনে হয় যে যাক্, বয়স আর বাড়বে না। যত মোটা হয়ে যাই, মুখে বয়সের রেখা পড়ুক, তন্বী তরুণী নায়িকা সাজা আমার আটকায় কে? কায়কল্প চিকিৎসারও দরকার নেই। ওগো তুমি চিরপঞ্চদশী?

সু। বা রে, বেশ ত। আর তোমরা বুঝি হতে চাও না চিরপঞ্চবিংশতি?

প্র। চাই বই কি। কিন্তু দেয় কে? নায়িকার যে প্রেম খোলে না নায়কের বয়স বেড়ে গেলে। দর্শিকারা দেয় না হাততালি, আর দর্শকরা দেয় গালাগালি। নায়িকাদের অবশ্য সাতখুন মাপ। সিনেমার পর্দায় পাবে থাঁটী শিভ্যালরীর শিহরণ। তাই ত দেশী ছবিগুলি অত কাঁপে।

সু। আর থিয়েটারে কি হয়?

প্র। থিয়েটারে গেলে মনে হয় সারাটা জীবন শুধু অভিনয় করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে। নাচো কাঁদো কথা কও সবেতেই বীর রস। ভীরু বাঙ্গালী জীবনে বীরত্ব আমরা পুষিয়ে নিয়েছি ওইখানে। ভাবের অভাবকে ভরে দিয়েছি কথার ভারে। এই যে এসে গেল দেখতে দেখতে। চলো আমরা অভিনয়ের মুখোমুখী হয়ে বসি আজ।

মোটরের ভিতর থেকে চারদিকে চকিতে একবার তাকিয়ে অবগুণ্ঠন একটু নামিয়ে নিল সুরধুনী। হাত ধরাধরি করে দ্রুত সাবলীল গতিতে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। নারী জেগে উঠেছে আজ অর্দ্ধেক মানবাতে; অর্দ্ধেক কল্পনা এসে মিশে গেছে তার সঙ্গে। আজকের অভিনয় যেন না ভাঙ্গে ওদের জীবনে।

ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এসে ক্যাপটা খুলে চুলের মধ্যে হাত বুলাতে বুলাতে নীহাররঞ্জন তখন স্মিত প্রসন্ন মুখে থিয়েটারের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

সমাপ্ত

ভানিয়া*

শ্রীউমাশশী দেবী বি-এ, বি-টি, সরস্বতী

সোফার কুশনের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মিলোচ্‌কা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। সুন্দর গোলাপ ফুলের মত মুখখানি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে দিনটীর জন্য সে এই সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল—সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দিনটী আজ তাহার দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছে; কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই।

প্রথানুযায়ী ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলেই তাহাদের খৃষ্টমাস উৎসবের নাচের মজলিসে যাইতে [illegible] মিলোচ্‌কা তাহার যৌবনের প্রথম প্রভাত হইতেই এই দিনটীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু আজ সকালে তাহার মা তাহাকে জানাইয়াছে যে, এ বছর টাকার টানাটানির জন্য নূতন পোষাক কেহই পাইবে না এবং সেইজন্য নাচের আসরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাই নয়, নাচে যাওয়ার জন্য খরচ জোগাড় করা স্বপ্নের অতীত। এ নিষ্ঠুর আঘাতের জন্য মিলোচ্‌কা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

* একটী রাশিয়ান গল্প হইতে।

বাল্যকাল হইতে সে ভোগবিলাসের ভিতর দিয়া লালিত হইয়াছে, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সে যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়াছে তখনি। তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সমস্ত সংসারটা যেন প্রবল ঝটিকায় ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। মিলোচ্‌কারও সুখের জীবন শেষ হইয়াছে। তিনি যে সামান্য কয়েক হাজার রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা শেষ হইলে তাহাদের এখন নূতনভাবে সাধারণ জীবনযাপন করিতে হইতেছে।

খ্রীষ্টমাসের ছুটীতে মিলোচ্‌কা প্রচুর আনন্দ, প্রচুর আশা লইয়া বোর্ডিং হইতে ফিরিয়াছিল। সামাজিক নাচে সে তাহার মায়ের সহিত যাইবে বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, আশা আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে মায়ের আদেশে ভাংগিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। খ্রীষ্টমাস উৎসবের জন্য বাড়ীতে সামান্য কিছু আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে নিজের দুঃখ লইয়াই বিব্রত হইয়াছিল। এমন সময় ঘরে ঢুকিল তাহার উনিশ বছরের ভাই ভানিয়া।

মিলোচ্‌কা তাহার সুন্দর মুখখানি ভানিয়ার দিকে ফিরাইয়া বলিল,—"টানিয়াকে তোমার ম'নে আছে? সেই লাল চুল দুষ্টুমীভরা মুখ।"—ভানিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানায়, মনে আছে। মিলোচ্‌কা আবার বলিতে সুরু করে, "টানিয়া আর আমি কতদিন ধ'রে এই দিনটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলুম। আমরা ঠিক করেছিলুম যে, সে পরবে তার গোলাপী রংয়ের ফ্রক, আর আমি পরব আমার সাদা মস্‌লিনের ফ্রক, কিন্তু মা আজ সকালে বল্লে, মস্‌লিনের ফ্রক হয়ত আসতে পারে কিন্তু নাচে যাওয়া চলতেই পারে না, মা নাকি তার ভাল কাপড়-চোপড় সব বেচে ফেলেছে"। মিলোচ্‌কা কুশনে মুখ লুকাইয়া আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভানিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বোনটাকে কাঁদিতে দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে দালানে আসিল। দালান হইতে সে সৎমা এন্নার ক্রুদ্ধকণ্ঠ শুনিতে পাইল—"আমাকে জ্বালাতন কোর না, বারবার বল্‌ছি না যে এবার খ্রীষ্টমাস ট্রী হবে না। যদি কান্না বন্ধ না কর, তাহলে ঘর থেকে বের ক'রে দেব।" একটু চুপচাপ কাটিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার এন্নার স্বর শোনা গেলো, "ফের কাঁদছো! শুনবে না আমার কথা! ওঠ, ওঠ, যাও নার্সারীতে।" এন্না রোরুদ্যমানা মেয়েটার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে দরজা খুলিয়া দাঁড়াইতেই চোখে পড়িল ভানিয়া নিঃশব্দে সুরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।

এন্না কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বেরুনো হচ্ছে শুনি।" ভানিয়া থতমত খাইয়া বলিল, "আমি এক্ষুণি ফিরছি।"

এন্না কঠোর স্বরে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমি চাই না যে তুমি সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও। আমি বুঝতে পারি না, তুমি বাইরে সব সময় কোথায় থাক। আজ দু'মাস ধ'রে দেখছি, শুধু খাবার সময় বাড়ী আস। কোথায় থাক, কি করো কিছুই বলো না, কিন্তু জানো ত যে তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর। আর লোকেই বা বলবে কী? বলবে, সৎমা কিনা, তাই ছেলেটা কি ক'রে না ক'রে কোন খোঁজই রাখে না।"

ভানিয়া বলিল, "আমি তো অন্য কোথাও যাই না মা। আমি যাই আমার পড়া তৈরি করতে।"

এন্না বলিল, "আজ তোমার না গেলেই ভাল হত, বাড়ীতে অনেক কাজ, তুমি থাকলে তবু কিছু সাহায্য পাওয়া যেত। হ্যাঁঃ, আজকাল তোমার ঘরে সব সময় তালা বন্ধ থাকে কেন?"

ভানিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "সোনিয়া আর মিটিয়া পাছে আমার বই খাতাপত্তর ছিঁড়ে দেয়, সেইজন্যে তালা দিই।"

এন্না শ্লেষের সুরে কহিল, "তবু ভাল এত সাবধানী হয়েছ।" বলিয়া সে কন্যাকে লইয়া নার্সারীতে ঢুকিল।

খাবার ঘরে বসিয়া মিলোচ্‌কা তখনও কাঁদিতেছিল। নার্সারিতে সোনিয়া আর মিটিয়া চোখের জলে ভাসিয়া নার্সকে বলিতেছিল, আগে তাহাদের কত সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী হইত। ভগবান তাহাদের বাবাকে তাহাদের কাছ হইতে নিজের কাছে লওয়ার দরুণ এবার আর তাহাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী হইল না। বুড়ী নার্স ইহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। শত শত বৎসর আগে একটী দেবশিশু কেমন করিয়া আস্তাবলের ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই গল্প বুড়ী ইহাদের

শুনাইতেছিল। ছেলেরা নিজেদের দুঃখ ভুলিয়া, হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সেই অদ্ভুত শিশুটীর কথা শুনিতে-লাগিল।

এন্‌যা বিছানার উপর বসিয়া তাহার জীবনের সুখ, শান্তিপূর্ণ দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেছিল। মনে পড়িতেছিল বাল্যের সেই আনন্দের দিনগুলির কথা—এতদিন সে মনের আনন্দে সঙ্গিনীদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত। কলেজের উচ্ছ্বসিত লীলাচঞ্চল দিনগুলি। সহপাঠিনীদের সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিনগুলি কাটিয়া যাইত। অবশেষে সে ষোল বছরে পড়িল এবং সকলের মত লম্বা ফ্রক পরিতে পাইল। তাহারই মাত্র এক বছর বাদে অর্থাৎ সতের বছর বয়সে ভানিয়ার বাপের সহিত তাহার বিবাহ হইল। ভানিয়া তখন মাত্র এক বছরের শিশু। স্বামীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং তাহাদের বিবাহিত জীবন সুখেরই হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে যে খুঁটীনাটী বাধিত, তাহা ভানিয়াকে উপলক্ষ করিয়া। এন্‌যা কিছুতেই ভুলিতে পারিত না যে, অল্প কিছুদিন পূর্বেই তাহার স্বামী আর একজন রমণীকে তাহারই মত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সেই ভালবাসার চিহ্ন, ভানিয়া আজো বর্ত্তমান। আর এদিকে ভানিয়াও ছিল একরোখা—এন্‌যাকে সে কিছুতেই মা বলিয়া ডাকিত না, তাহার কাছেও আসিত না। সে তাহার যত অভিযোগ, অভিমান, আব্বার বাবার কাছেই প্রকাশ করিত। এই মাতৃহারা পুত্রটীকে পিতা—পত্নীর চক্ষের আড়ালে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন।

এন্‌যা ভানিয়াকে কোনদিন ভালবাসে নাই, ভালবাসিবার চেষ্টাও করেন নাই এবং তাহার জন্য কোনদিন তাহার মনে কোন অনুতাপই আসে নাই। আজও তাহার চিন্তা ভানিয়াকে লইয়া নহে, তাহার নিজের পুত্র-সন্তানদের লইয়া। যে দারিদ্র্য রাক্ষসী হাঁ করিয়া গিলিতে আসিতেছে, সে তাহার করাল গ্রাস হইতে কেমন করিয়া তাহাদের বাঁচাইবে। কয়েক বছর আগেও সে তাহার পরিচিত মহলে রূপবতী বলিয়া গর্বিত ছিল। তাহার বিলাসিতার প্রাচুর্য্য ছিল। বিরাট বাড়ীতে ঝি চাকর পরিবেষ্টিত হইয়া রাণীর মত থাকিত। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার লইয়া কত তর্ক করিয়াছে। কত জোরের সহিত বলিয়াছে, আজিকার যুগে পুরুষের নারীকে দাবাইয়া রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার।

কিন্তু আজ! এন্‌যা অশ্রু-সজল চোখে ঠোঁট কামড়াইয়া ভাবে, স্বাধীনতা আর সমান অধিকারটুকুই আছে, আর সব কবরে গিয়াছে। আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বাহিরে যত সৌন্দর্য্যই থাক না কেন, ভিতরটা একেবারে বুড়াইয়া গিয়াছে। আজ সে তাহার স্বামার ভালবাসার দান-গুলিকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া বাঁচাইবার চিন্তাই করিতেছে। এন্‌যার মনে পড়িল, তাহার স্বামীর বাঁচিয়া থাকিবার দিনগুলি। মনে পড়িল সেই মানুষটীর স্বহস্তনির্মিত সেই বিরাট খ্রীষ্টমাস ট্রী। কত লোক আসিত উৎসবে যোগ দিতে, ঘটা করিয়া চলিত আহার পানের পর্ব।

হঠাৎ এন্‌যার মনে পড়িয়া গেল খাবার সময় হইয়াছে। খাবার ঘরে আসিয়া এন্‌যা দেখিল ভানিয়া তখনও আসে নাই। সোনিয়া আর মিটিয়া পুরাণো তোলা পোষাকগুলি পরিয়াছে। মিলোচ্‌কার মুখ তখনও গম্ভীর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটী লাল হইয়া রহিয়াছে।

এন্‌যা ছেলেদের সুপ্‌ পরিবেশন করিতে করিতে অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভানিয়ার মন কেবল বাইরে বাইরেই থাকে।" ছেলেরা মায়ের মেজাজের উষ্ণতা বুঝিয়া চুপচাপ খাইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে কেবল ছুরি কাঁটার টুং টাং শব্দই নীরবতা ভংগ করিতে লাগিল। হঠাৎ মিটিয়া তাহার গোলাপী গালদুটীকে দোলাইয়া এবং ফোলাইয়া ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজিতে লাগিল এবং ঘরে কাহাকেও না পাইয়া চেয়ারের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, "নিয়ানিয়া, ভগবান কি তাঁর এঞ্জেলদের এতক্ষণে পাঠিয়েছেন?" নার্স বলিল, "হ্যাঃ, পাঠিয়েছেন বৈকি। তুমি চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও, নইলে আবার তারা উড়ে পালিয়ে যাবে।" হঠাৎ এঞ্জেলের নাম শুনিয়া এন্‌যার দমিত ক্রোধ আবার জাগিয়া উঠিল। সে বলিল—"নিয়ানিয়া, খাবার টেবিলে আমি পরীর গল্প-টল্প ভালবাসি না।"

নার্স বলিল, "না, না—আমিতো পরীর গল্প বলছি না। আমি বলছিলুম ওরা যদি কান্নাকাটি না ক'রে, বেশ ভাল ছেলের মত থাকে তাহলে ওরা বেশ ভাল খ্রীষ্টমাসট্রী পাবে।"

এস্তা রাগিয়া বলিল—"খ্রীষ্টমাস ট্রী পায় আর না পায়, তার সংগে এঞ্জেলদের সংগে কি সম্বন্ধ আছে ?"

বৃদ্ধা নার্সের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিল, সে বলিল, "সে কি কথা মা, আপনি ওকথা বলছেন কেন ? আপনি কি জানেন না যে খ্রীষ্টমাস উৎসবের আগের দিন ভগবানের দুতেরা ধার্মিক লোকদের উপহার দিতে আসেন।"

এস্তা কিছু বলিবার আগেই সোনিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—"মা—মা, ভানিয়া এসেছে।" মা রাগিয়াই ছিলেন, সোনিয়ার চীৎকারে আরো রাগিয়া কহিলেন, "এসেছে তো এসেছে, তোমার অমন ক'রে চেঁচানোর কি আছে।" ইতিমধ্যে ভানিয়া ঘরে আসিয়া তাহার চেয়ারে বসিয়াছে। এস্তা ভানিয়ার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?" ভানিয়ার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিল,—"আজকে বছরকার দিনে তোমার অন্ততঃ একটু পরিস্কার ভদ্রভাবের কাপড় পরা উচিৎ ছিল। আজকের ডিনারে কোন অতিথি নেই বলে কি তোমায় একটু ভদ্রলোকের মত থাকতে নেই ? কি অদ্ভুত তোমায় দেখাচ্ছে দেখ ত।" এস্তা তাহার ছেঁড়া, ছোট কোটটার দিকে আঙুল দেখাইতেই ভানিয়া লজ্জায় লাল হইয়া গেল। নিজের প্লেটের সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"আমার যে আর পরার কিছু নেই, সবই ছোট হয়ে গ্যাছে আর ছিঁড়ে গ্যাছে।"

এস্তা বলিল, "পাচ্চ তো কুড়ি রুবলেরও বেশী। বলি পড়াশোনা হচ্ছে কেমন ?" ভানিয়া আহত হইয়া এস্তার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কিন্তু আমি যা পাই তার সবই তো তোমায় এনে দিই।" এস্তা ইহার কোন জবাবই দিল না, ছেলেদের খাওয়ানোর দিকে মন দিল। সোনিয়া আবার নিস্তব্ধতা ভংগ করিল, বলিল—"মা, ভানিয়ার ঘরে আমি একটা সুন্দর ছবি দেখেছি। ভানিয়া সেটা মেঝেতে ফেলে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে কি সব আঁকছিল। ভানিয়া যদিও তার ঘরে আমায় ঢুকতে দেয় না—তবুও আমি সব জানি।"

এস্তা বিদ্রুপের স্বরে বলিল, "ভানিয়া কি আজকাল ছবি আঁকা ধ'রেছ নাকি ? সিক্সথ ফরমের ছেলে, যার পরীক্ষা আসন্ন, তার পক্ষে পড়াশোনা ছেড়ে ছবি আঁকাই উপযুক্ত বটে। অবিশ্যি সেজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

ভানিয়া কোন কথা বলিল না, প্লেটের উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িল। মায়ের বাক্য যন্ত্রণা তাহার কাছে নূতন নয়। জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে ইহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে। ভানিয়া যে আশা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল তাহা ভাংগিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। একটী দিনের তরেও সে মায়ের স্নেহ পায় নাই, বাপের বাড়ীতে তাঁহাকে চির-অপরিচিতের মত কাটাইতে হইয়াছে। বাবা তাহাকে ভাল খুবই বাসিতেন, কিন্তু গভর্ণমেন্টের এঞ্জিনীয়ার হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ সময় তাঁহাকে বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হইত। কাজে কাজেই বাপের সংগ পাওয়া ভানিয়ার দুষ্কর ছিল। ভানিয়ার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা থাকিলেও বাহিরে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। যখন তিনি দেখিতেন ভানিয়া বিনাদোষে অন্যায় ব্যবহার পাইতেছে তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কথা দ্বারা আদর করিতেন, বুঝাইতেন। বড় হইয়া ভানিয়া বুঝিল, পিতার সংসারে তাহার স্থান কোথায় ? সংসার সহিত সম্পর্কের যদিও কোন উন্নতি হয় নাই তথাপি সে সংঘর্ষের আভাষকেও বাঁচাইয়া চলিত। প্রাণপণে চেষ্টা করিত তাঁহাকে খুশী করিবার। ইতিমধ্যে বাবা চিরদিনের মত তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া পৃথিবী ছাড়িলেন।

সমস্ত পরিবারের ভিতরেই একটা বিরাট পরিবর্তন আসিল। সেই বিলাসবহুল জীবন, ধনী বন্ধুবান্ধব, দাসদাসী সবই যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হইল। বাবার বহু টাকা রোজগার থাকিতেও মৃত্যুকালে পেনসনের অর্থ ছাড়া কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আজ তাহাদের বড় বাড়ী ছাড়িয়া একটী ছোট ফ্ল্যাটে বাস করিতে হইতেছে। ভানিয়া সংসারের এই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া অবসর সময় কিছু কিছু রোজগার করিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে তাহার স্কুলের বেতন ও তাহার ঘরের ভাড়াটা পোষাইয়া যায়। এস্তা অবশ্য প্রথমে ভানিয়ার রোজগারের কিছু লইতে চায় নাই, কিন্তু তাহার একান্ত অনুরোধে সে লইতে বাধ্য হইয়াছে। ছোট ভাই বোনগুলিকে সে নিজের চাইতেও বেশী ভাল বাসিত। স্কুলের পড়া শেষ করার জন্য সে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল। ভানিয়া ঠিক করিয়াছিল, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া সে কোন টেক্‌নিকাল স্কুলে শিক্ষা লইয়া বাপের চাকুরী গ্রহণ

করিবে, বাপের মত অর্থ রোজগার করিয়া তাহাদের পরিবারকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ছিল তাহার স্বপ্ন, এই ছিল তাহার জীবনের আশা।

মায়ের কাছে অন্যায়ভাবে তিরস্কৃত হইয়া মনে সে অত্যন্ত ব্যথা পাইল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না, যাইবার সময় ভক্তিভরে মায়ের হাতে চুমা খাইয়া চলিয়া গেল। ভানিয়ার চুপচাপ স্বভাব দেখিয়া এন্না ভাবিতেছিল পিতার সহিত পুত্রের কোথাও মিল নাই। ছেলেটা বোধ হয় তাহার মায়ের স্বভাব পাইয়াছে। হঠাৎ ভানিয়ার মায়ের কথা মনে পড়িতেই এন্নার বুকে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহাই এতদিন তাহার মনের অগোচরে তুষের আগুনের মত তাহাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করিতেছিল। এন্না সকল কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজের ঘরে যাইবার জন্য খাবার ঘরের দরজায় আসিতেই ভানিয়ার গলা শোনা গেল—"মা, মিলোচকা—শীগ্‌গীর আমার ঘরে এসো। দেখ তোমাদের জন্যে একটা ভারী মজার জিনিষ করেছি। সোনিয়া আর মিটিয়াকে ডাক, তাদের জন্যে আমি খ্রীষ্টমাস ট্রী তৈরী করেছি, বাতিগুলো এখুনি জ্বালিয়ে দিচ্ছি।" এন্না যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যেন সে কিছু ভুল শুনিয়াছে, বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি খ্রীষ্টমাস ট্রী করেছ?"

মায়ের কণ্ঠস্বরে লজ্জিত হইয়া ভানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মা। তোমাদের আশ্চর্য করব ব'লে লুকিয়ে রেখেছিলুম, বলিনি।" বলিয়া সে নিজেই নার্সারি হইতে সোনিয়া আর মিটিয়াকে আনিতে গেল। এন্না তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। যে ছেলের দিকে সে এতদিন ফিরিয়াও চাহে নাই, যাহাকে সে সংসারের প্রতি উদাসীন বলিয়া ভাবিয়াছে, সে ছেলে তাহাদের আনন্দের জন্য গোপনে এমন একটী আয়োজন করিয়াছে।

ভানিয়া ইতিমধ্যে নার্সারিতে চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে "সোনিয়া, মিটিয়া শীগগীর এসো, দেখে যাও ভগবান আমাদের খ্রীষ্টমাস ট্রী পাঠিয়েছেন।" ঘরের ভিতর সকলে ঢুকিয়া দেখিল, আলোয় আলোকিত হইয়া একটী সুন্দর খ্রীষ্টমাস ট্রী সাজান রহিয়াছে। সোনিয়া ও মিটিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। মিলোচকা নিজের দুঃখ ভুলিয়া ভাইয়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ভানুয়া, দুষ্টু ছেলে, তুমি কি ক'রে এ সব জোগাড় করলে?"

"আরো কিছু আছে" বলিয়া, ভানিয়া একটী প্যাকেট খুলিয়া একটী খুব সুন্দর পোষাক-পরা বড় পুতুল সোনিয়ার হাতে দিয়া বলিল—"সোনিয়া এটা তোমার। আর মিটিয়া এটা তোমার চড়বার ঘোঁড়া" বলিতে না বলিতেই মিটিয়া চাকা-লাগানো কাঠের ঘোঁড়ায় চড়িয়া বসিল এবং চাবুক মারিয়া চাকার সাহায্যে চালাইতে লাগিল। ভানিয়া কৃত্রিম ভয়ে বলিল, "সোনিয়া সাবধান, ঘোড়ার কাছে দাঁড়িও না—এখুনি চাপা দেবে," বলিয়া সে নিজেই ভীতভাবে জড়সড় হইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইল। সারা ঘরে যেন আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়া গেল।

এন্নার মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার প্রতি তাহার চিরাভ্যস্ত কঠোর দৃষ্টি কোমল হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এ কি! এতদিন তো সে ইহা দেখে নাই। আনন্দের উত্তেজনায় ভানিয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, ঘন আঁখি পল্লবের ভিতর দিয়া চক্ষুর দীপ্তি আনন্দে উত্তেজনায় উছলাইয়া পড়িতেছে; ইহা যে তাহারই মৃত স্বামীর হুবহু প্রতিমূর্ত্তি। চোখ থাকিতেও এন্না ইহা দেখে নাই বলিয়া মনে মনে নিজে বারবার ধিক্কার দিতে লাগিল। যে হিংসার বরফ জমা হইয়া তাহার মনকে শীতল কঠোর করিয়া তুলিতেছিল,—আজ বসন্তের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে তাহা গলিয়া মাতৃস্নেহের রসে মনকে ভরিয়া দিল। সে অধীরভাবে ভানিয়ার কাছে আগাইয়া গেল। ভানিয়া বলিল, "মাগো, তোমার জন্যে এইটা" বলিয়া এন্নার হাতে সে একটী ছোট ভেলভেটের কেস দিল। কৌতূহলী এন্না সেটি খুলিয়া দেখিল, লাল রংয়ের ভেলভেটের ভিতর একটী সোনার ব্রোচ্, তাহার মাঝখানে স্বামীর মূর্ত্তি অংকিত করা।

সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে এন্না এই প্রথম মাতৃস্নেহে ভানিয়াকে চুমা খাইলেন। ভানিয়া আনন্দে মাতার দুইহাত ঠোঁটে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে একটী প্যাকেট লইয়া মিলোচ্‌কার হাতে দিয়া বলিল, "আর কাঁদবে না তো? এইবার তুমি 'বল্' নাচের মজলিসে যেতে পারবে। আর মায়ের জন্যে

সাটিনও এনেছি।" মিলোচ্‌কা ততক্ষণে প্যাকেট খুলিয়া তাহার অতি সাধের অতি সূক্ষ্ম সাদা মসলিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। মিলোচ্‌কা এইবার আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভানিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ভানুয়া, কত লক্ষ্মী ভাই।" ভাইয়ের গলা ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল সে, তাহার অত সাধের মসলিন মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। এন্না হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি বুঝি একলাই তোমার ভাইকে আদর করবে, আর আমি বুঝি আমার ছেলেকে আদর করতে পাব না?"

এন্না জীবনে এই প্রথম বলিল, আমার ছেলে। তাহার চোখ দুইটীতে মাতৃস্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে। ভানিয়ার মাথাটী বুকের ভিতর রাখিয়া বলিল, "ভানিয়া বাবা আমার।" তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া ভানিয়াকে মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে তাহার বাল্যের আনন্দহীন দিনগুলির কথা ভুলিয়া গেল। যে মাতৃস্নেহের জন্য সে তৃষিতের মত ঘুরিতেছিল, তাহা পাইয়া আজ সে আনন্দ, প্রীতির দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। মা ও ছেলে নির্বাক আনন্দে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহ ও প্রীতি দিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা নার্স নিয়ানিয়া এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া একান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে পরিবারের এই আনন্দ মিলন দেখিতেছিল। সে চোখ বুজিয়া হাত দুইটি বুকের উপর রাখিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

এন্না ভানিয়াকে কাছে বসাইয়া বলিল, "তুমি এসব জোগাড় করলে কি ক'রে বাবা?" ভানিয়া বলিল, "মা, তোমার দুঃখ দেখে ভাবতুম কি ক'রে আমি তাড়াতাড়ি টাকা রোজগার করব। বাবার এক বন্ধুর কাছ থেকে আমি কিছু কিছু প্ল্যান আঁকার কাজ জোগাড় করেই আমি এসব করেছি।" এন্না প্রশ্ন করিল, "সোনিয়া যাকে ছবি আঁকা বলছিল সেকি তোমার প্ল্যান?"

"হ্যাঃ মা।" এন্নার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িল, অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিল, "তুমি আর এতো খেটো না, এতে যে তোমার শরীর ভাল থাকবে না" ভানিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি ভাবছ কেন মা। এতে আমার কিছু হবে না। দেখ না আমি বাবার মত শক্ত হয়েছি, আমি বাবার মতন কাজ শিখছি। আর বাবার মত টাকা রোজগার ক'রে তোমাদের সবাইকে সুখে রাখবো।" মিলোচ্‌কার দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক কিনা বল মিলোচ্‌কা?"

একটী সুন্দর সুমিষ্ট অনুভূতি এন্নার মনকে আবিষ্ট করিয়া দিল! ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে দুঃখ, ভয়, নিরানন্দ তাহাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা যেন হঠাৎ কোন্‌ যাদুকরের মন্ত্রে দূর হইয়া আনন্দ আলোয় তাহাকে ভরিয়া তুলিল। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভানিয়াকে দেখিতেছিল, ঠিক তাহার বাপের মত শক্তিশালী পুরুষোচিত চেহারা, তেমনি পদবিক্ষেপে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। তেমনি বলিষ্ঠ দৃঢ় বাহু তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিতেছে, "তুমি ভয় খাচ্ছ কেন মা? আমি বাবার মতই শক্তিশালী হয়েছি।"—

মৃত্যুর পারে

রায় বাহাদুর শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(২)

আত্মা যে অবিনশ্বর এ বিশ্বাস বর্ত্তমানে প্রত্যেক ধর্মের জনগণের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কিন্তু মানব ইতিহাসে এই বিশ্বাসের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। আদিতে সকল ধর্ম্মে এই বিশ্বাস ছিল না। হিন্দুর প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে অবশ্য পরলোকের কথা আছে। প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ার ধর্ম্মেও ছিল। কিন্তু ইহুদীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে পরলোকের কথা পাওয়া যায় না। মুসা পরলোক সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। মুসার পরবর্ত্তী পয়গম্বরদিগের উপদেশের মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ থাকিলেও বন্দীভাবে বেবিলনে নীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহুদীদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পার্থিবজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাইরাস কর্ত্তৃক বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ইহুদীদিগের মধ্যে স্যাডুকি ও ফ্যারিসি নামে দুই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুসার উপদেশের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধে কোনও কথা নাই বলিয়া স্যাডুকিগণ পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু ফ্যারিসিগণ উক্ত মত গ্রহণ করে এবং সেই অবধি উহা ইহুদী ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো ও তাঁহার শিষ্যগণ কেবল যে মানবাত্মার মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন তাহা নয়, জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সে বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। রোমে সিসিরো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাধারণ মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য অনেক যুক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন—বলিয়াছেন মৃত্যু মানবকে সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তি দেয়, কিন্তু স্বর্গে সুখভোগের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, একথা বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন মৃত্যুতে সত্তার বিনাশ হয়, যাহাদের সত্তা নাই তাঁহাদের দুঃখভোগও নাই। গিবন বলেন, সিসিরো এবং প্রথম কয়েকজন সম্রাটের রাজত্বকালে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আচরণে কখনও পরলোকে বিশ্বাস এমন ভাব প্রতিপন্ন হয় নাই।

কিরূপে পরলোকে বিশ্বাসের উৎপত্তি হয় সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বপ্নে মৃত মানবের দর্শন হইতে এই ধারণার উৎপত্তি। মানুষ যখন স্বপ্নে মৃত আত্মীয়কে দর্শন করে, তখন মৃত্যুতে যে আত্মীয়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই, তাহার এক অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, এই কথাই তাহার মনে উদিত হয়। তাহারা মনে করে মানবের একই আকৃতিবিশিষ্ট দুইটী দেহ, মৃত্যুতে মাত্র একটীর বিনাশ হয়, স্বপ্নে দ্বিতীয়টির দর্শন পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় অংশটাই কালক্রমে "আত্মা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) এই মতাবলম্বী। আচার্য্য মার্টিনো প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "স্বপ্নে তো কেবল মৃত মানুষই আমরা দেখি না, নশ্বর অনেক দ্রব্যও তো দেখিয়া থাকি। শীতের সময় নিষ্পত্র বৃক্ষসম্বলিত উদ্যানকে যখন স্বপ্নে পত্রপুষ্পশোভিত অবস্থায় দেখি, তখন তো কল্পনা করি না, পত্র ও পুষ্পের দ্বিতীয় দেহ আছে। বাস্তবিক জীবাত্মার উৎপত্তি হয় আমাদের স্বকীয় অনুভূতি হইতে। আমাদের মধ্যে যে এক অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্ব আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা তাহা অনুভব করি। আমরা দেখিতে পাই, সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা আমাদের সমগ্র জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের অনুভব, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও ইচ্ছা সমস্তই সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাতে আরোপ করি। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত আমাদের দেহে ও মনে প্রভূত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের personal identity অটুটই থাকিয়া যায়। এই অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে আমরা দেহ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে অভ্যস্ত এবং ক্রমে বুঝিতে পারি—আমাদের দেহ "আমি" নয়, যিনি আমাদের মধ্যে "আমি" পদবাচ্য দেহ তাঁহারই। দেহ হইতে বিমুক্ত করিয়া যখন "আমি"কে দেখিতে আরম্ভ করি, তখনই আত্মার ধারণা হয় এবং তখনি প্রশ্ন উঠে—"মৃত্যুর পরে 'আমি'র কি হয়? দেহের সঙ্গে চিতার আগুনেই কি তাহার লয় হয়, অথবা তাহার পরিণাম ভিন্ন?"

জড়বাদিগণ বলেন, প্রত্যেক মানুষই অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ দৃশ্য প্রোটোপ্লাজম কণা (Protoplasm) হইতে উৎপন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজম কণা ও জীবজগতের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এক কোষবিশিষ্ট জীবের শারীরিক গঠনে কোনও পার্থক্য নাই। সেই সূক্ষ্ম প্রোটোপ্লাজম্ কণা মাতৃগর্ভে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া মানব-শরীরে পরিণত হয়। এই পরিণতি কালের মধ্যে ঠিক কোন সময়ে অবিনশ্বর আত্মা আসিয়া শরীরে অধিষ্ঠান করেন? তবে কি ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে আত্মা আসিয়া শিশুর দেহ অধিকার করে? অথবা পরবর্ত্তীকালে শিশু যখন নিরাধার গুণের (abstract thought) চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, তখনই আত্মার আবির্ভাব হয়? আত্মা কি বাহির হইতে আসিয়া দেহে প্রবেশ করে, না ভ্রূণ অথবা শিশুর মধ্যে অবস্থিত কোন কিছু ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া আত্মায় পরিণত হয়? ইহা প্রত্যেক মানব শরীরে আত্মার আবির্ভাবের কথা। প্রোটোপ্লাজম্‌এর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। আত্মা কি প্রাণের সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিল, না প্রোটোজোয়া হইতে মানবে পরিণতি লাভ করিতে যে বিপুল সময় লাগিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোনও এক সময়ে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল? যদি মানবেই আত্মার প্রথম আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মা কি সম্পূর্ণ নূতন কোনও পদার্থ অথবা জীবশরীরে বর্ত্তমান কোনও পদার্থের পরিণতি?"

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর নানা ভাবে দেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় মতদ্বারা প্রভাবিত পাশ্চাত্য জগতে মানবাত্মার জন্ম-পূর্ব্ব অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না। ইতর জীবের আত্মা আছে, ইহা স্বীকার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত। সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তিগুলি সহজেই উত্থাপিত হইতে পারে। তাঁহাদের পক্ষ হইতে ঐ সমস্ত আপত্তির উত্তর আছে, আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। তাঁহারা বলেন, ইতর জীবে যে চৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছিল, মানবাত্মা তাহারই পরিণতি, ইতর জীবের চৈতন্য তাহাদের প্রাণশক্তি হইতে উদ্ভূত এবং প্রাণশক্তি রাসায়নিক (Chemical) ও ভৌতিক (physical) শক্তির অভিব্যক্তি। ভৌতিকশক্তি বহুযুগ অতিক্রম করিয়া যখন মানবে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, তখনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন সময় ছিল, যখন পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি ছিল না। পৃথিবীর উত্তাপ তখন এত বেশী ছিল, যে রাসায়নিক শক্তির প্রকাশিত হইবার অবকাশ ছিল না। তাপ বিকীরণ দ্বারা যখন পৃথিবী শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল, তখনি রাসায়নিকরূপে নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। ইহার পর যুগের পরে যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, অবশেষে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও অবস্থা প্রস্তুত হইলে প্রাণশক্তিরূপ আর এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। আবার যুগের পরে যুগ অতিক্রান্ত হয়, প্রাণ উন্নত হইতে উন্নততররূপ পরিগ্রহ করে। অবশেষে যখন সময় পূর্ণ হইল, তখন প্রজ্ঞা, অহংকার ও নৈতিকজ্ঞান সহ মানবাত্মা আবির্ভূত হইল। কিন্তু এই মতের সহিত অমরত্বের সামঞ্জস্য কোথায়, বুঝিতে হইলে "আকস্মিক অথবা অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিবাদ" নামক নূতন দার্শনিক মতটি বুঝিতে হইবে।

গ্যালিলিওর সময় হইতে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুবাদ দ্বারা জগতের

সমস্ত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মতে বর্ণ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি গৌণ গুণ সকল (Secondary qualities) পরমাণু সমূহের অদৃশ্য কম্পনের ফল। জড় পদার্থ অদৃশ্য অণু পরমাণুর (molecules, atoms, protons, electrons প্রভৃতি) সমষ্টি, এবং অণুদিগের কম্পনের সঙ্কেত। জড়ের গৌণ গুণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (Perception) সম্বন্ধ যে আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে অণুর নির্দিষ্ট সংখ্যক কম্পন দ্বারা নির্দ্দিষ্টবর্ণ বা শব্দে, অথবা তাপের প্রত্যক্ষজ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে অণ্ডাকার (elliptical) কক্ষে কেন ভ্রমণ করে, গণিতের সাহায্যে তাহা বোধগম্য হয়। Binomial Theorem এর সত্যতা অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু বায়ু বা কম্পন দ্বারা শব্দের জ্ঞান কেন উৎপন্ন হইবে, ইথারের কম্পনে কেন আলোর প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে, তাহা এরূপ কোনও যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় না, কেননা বায়ু ও ইথারের কম্পন ও উত্তাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ। তারপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের নিয়মদ্বারা রাসায়নিক (Chemical) নিয়মের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। রসায়ন শাস্ত্রের বলে দুই আয়তনের জলজান (Hydrogen) এবং এক আয়তনের অম্লজান (oxygen) মিলিত হইলে জলের উৎপত্তি হয়। ইহার ব্যাখ্যার জন্য বলা হয় একটী অম্লজান পরমাণুর সহিত দুইটী জলজান পরমাণুর (affinity) আছে ; এইজন্য অম্লজানকে বলা হয় দ্ব্যণু সংসক্ত এবং জলজানকে বলা হয় একাণু সংসক্ত। কিন্তু ভৌতিক বিজ্ঞান অম্লজান ও জলজান পরমাণুর বৈদ্যুতিক গঠন সম্বন্ধে এমন কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহা দ্বারা জলজান একাণুসংসক্ত হইবে এবং অম্লজান, দ্ব্যণু-সংসক্ত হইবে, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভৌতিক নিয়ম দ্বারা যেমন রাসায়নিক কার্য্য বোঝা যায় না তেমনি ভৌতিক ও রাসায়নিক নিয়ম দ্বারা প্রাণ ও চৈতন্যের ব্যাপার সকল ব্যাখ্যা করা যায় না। ভৌতিক বিজ্ঞানে ও রসায়নে 'উদ্দেশ্যের' কোনও স্থান নাই। কোনও ভৌতিক কার্য্য বা রাসায়নিক কার্য্য কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘটিত হয় না। কিন্তু প্রাণের যাবতীয় কার্য্যই উদ্দেশ্যমূলক, প্রত্যেক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কৃত হয়। জীবজগতের যে জীবন সংগ্রাম Darwin জীবন-অভিব্যক্তি ব্যাখ্যার প্রথম সূত্রে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই জীবন যে উদ্দেশ্য-মূলক তাহা প্রমাণিত হয়। ভৌতিক ও রাসায়নিক বিজ্ঞান হইতে এই ব্যাপারের যে আলোচনা হয় তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা হইতে যুক্তি দ্বারা এই জীবন-সংগ্রামের অস্তিত্ব উৎপাদন করা যায়, যাহাকে জীবন-সংগ্রামের কারণরূপে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। মস্তিষ্কের ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে আমাদের মানসিক ব্যাপারের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—অবশ্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আগে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু কেন এ সম্বন্ধ—কেন বহির্জগতের সহিত আমাদের সে অনুপম সম্বন্ধকে আমরা "জ্ঞান" বলি, মস্তিষ্কের পরমাণুর গতি দ্বারা তাহা উৎপন্ন হয়—এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে Samuel Alexander প্রমুখ চিন্তাশীল দার্শনিকেরা জড় ও জড় পরমাণুর স্পন্দন দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে যদিও চৈতন্যের আবির্ভাবের জন্য দেহাত্ম ও প্রাণের প্রয়োজন, প্রাণের আবির্ভাবের জন্য রাসায়নিক সংযোগের প্রয়োজন, রাসায়নিক সংযোগের জন্য পরমাণুর প্রয়োজন, তথাপি এই সকলের মধ্যে কোন একটীর আবির্ভাবেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের ব্যাখ্যা করা যায় না। নূতনের এই আবির্ভাবকে তাঁহারা Emergent Evolution নাম দিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে চৈতন্য ও জ্ঞান জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও জড় কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয় না। অভিব্যক্তির ইতিহাস ব্যক্তিগঠনের ইতিহাস। অসীম শূন্য মধ্যে অসংখ্যপ্রটোন ও ইলেক্‌ট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্‌ট্রনের সঙ্গে গাঢ়ভাবে মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের (element) যখন সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন হইতে ব্যক্তিগঠন আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে নূতন দ্রব্য সৃষ্টি ব্যক্তিগঠনের দ্বিতীয় ক্রম। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমবায়ে উদ্ভিদও জীবদেহ সৃষ্টি তৃতীয় ক্রম ; সর্ব্বশেষ ক্রম অহংকারিক একত্ব ও নৈতিক জ্ঞান সমন্বিত মানবের আবির্ভাব। ইহার জন্য যুগযুগান্তর ব্যাপী অভিব্যক্তি ধারা প্রবাহিত। যুগযুগান্তর ধরিয়া দারুণ যাতনায় প্রকৃতি গর্ভে মানবভ্রূণ শায়িত ছিল। পিতৃ শোণিত কণা মাতৃগর্ভে যেমন ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, মানব ভ্রূণ ও তেমনি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া প্রকৃতির গর্ভে পরিপুষ্ট হইতেছিল। রাসায়নিক শক্তি ও প্রাণশক্তির আবির্ভাবে ভ্রূণের আবির্ভাবের ক্রম। ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতৃ-গর্ভস্থ শিশু যেমন মাতৃশরীরের অংশ মাত্র থাকে, নাভি নাড়িদ্বারা মাতার শরীর হইতে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। মানব ভ্রূণও তেমনি প্রকৃতি-গর্ভে প্রকৃতির অংশ রূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। অকস্মাৎ তাহার নাভি নাড়ি ছিন্ন হইয়া গেল, প্রকৃতির সহিত যোগসূত্র কাটিয়া গেল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া সে প্রজ্ঞা ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানবরূপে দাঁড়াইয়া উঠিল। ব্যক্তিত্ব গঠন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছে। দেহ ও মস্তিষ্ক যখন প্রজ্ঞা ও অহংকারকে প্রকাশিত করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই প্রজ্ঞা ও অহংকার অবধি পূর্ণ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিল, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করিয়া অবিনশ্বর অনন্ত জীবন দান করিয়াছিল। প্রজ্ঞা ও অহংকারের আবির্ভাবের পর হইতে দেহ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার অধীন হইল। সদ্যপ্রসূত শিশুর শরীরের গঠনের সহিত সম্যক পুষ্ট ভ্রূণের শারীরিক গঠনের বিশেষ পার্থক্য নাই ; প্রসবের অব্যবহিত পরেই শিশু সত্তার সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেখানে সে মাতৃ শরীরের অংশ নয়, স্ব-প্রতিষ্ঠ।

এই পরিবর্ত্তন তাহার প্রগতির জন্ম অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাবের সময়েও শারীরিক গঠনের পরিবর্ত্তন তেমন বেশী কিছু ছিল না, অভিব্যক্তি ধারায় যে জীবদেহ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection) ও আকস্মিক পরিবর্ত্তন সূত্রে মানব দেহে পরিণত হইয়াছিল, তাহার সহিত নূতন দেহের হয়তো বেশী ভেদ ছিল না, মানসিক গঠনেও ভেদ হয়তো সামান্যই ছিল, কিন্তু মানসিক জগতের যে স্তরে এই নূতন জীব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রগতির বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমানে শিশুর জন্মকালেও অতীতে মানবত্বের প্রথম উন্মেষকালে, উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই নূতন শক্তিবিশিষ্ট নূতন জীবের আবির্ভাব, পুরাতন জগৎ হইতে নূতন জগতে প্রবেশ, উচ্চতর জগতে জাগরণ। একমাত্র মানবই প্রকৃতি হইতে পৃথক জীবন ধারণে সমর্থ। পৃথক হইলেও প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নয়, প্রকৃতি গর্ভধারিণী মাতা না হইলেও ধাত্রী বটে। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাকে প্রকৃতির স্তন্য পান করিতে হয়, মৃত্যুর পরে হয়তো পূর্ণ স্বতন্ত্রতা।

অহংকার অথবা আত্মজ্ঞানের মূল ব্যক্তিত্ব। প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ীর সংযোগ যখনি ছিন্ন হয়, তখনই অহংকারের উদ্ভব হয়। অহংকার হইতেই স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্ব বোধের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের সহিত স্বকীয় সম্বন্ধের অনুভূতি এবং সীমাহীন উন্নতি লাভের সামর্থ্য জন্মে। ব্যক্তিত্বের অর্থ স্বতন্ত্র আত্মিক জীবন ও অমরতা। কোনও জীবজন্তুর মধ্যে শিক্ষা দ্বারা যদি আমিত্ব জ্ঞান উৎপন্ন করা সম্ভব হইত তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই সে নৈতিক দায়িত্ব-বিশিষ্ট জীবে পরিণত হইত এবং অমরতা লাভ করিত।

উপরি উক্ত আলোচনায় জড়বাদীদিগের প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গেল তাহা এই :—

(১) ইতর জীবে আত্মা নাই, অমরত্বের দাবীও তাহাদের নাই। তাহাদের চৈতন্য আছে সত্য কিন্তু আমিত্ব নাই, আমিত্বই অমরতা দান করে।

(২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যখন আমিত্বের জ্ঞান প্রকৃতি হইতে স্বাতন্ত্র্যভাবে লাভ করে তখনি তাহাকে আত্মা বলা যায়।

(৩) অভিব্যক্তি ধারাতেও যখন আমিত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখনই আত্মার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে নয়।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহিত এসিয়া মহাসম্মিলনকে সমপর্য্যায়-ভুক্ত করিতে আমার এতটুকু সঙ্কোচ নাই। সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের নৈকট্য সপ্রমাণ করিতেও আমাকে আদৌ কষ্ট পাইতে হইবে না। মূল মহাভারত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতকামী বহু ব্যক্তি বহুবার রাজাকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও বিফলকাম হইয়াছিলেন। সাবধানী রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার দিগ্বিজয়ী সহোদরদ্বয় ভীমার্জ্জুনের আগ্রহাধিক্যসত্বেও মনস্থির করিতে পারেন নাই। দ্বারকায় তাঁহার একজন হিতৈষী বান্ধব বসতি করেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতিরেকে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই এই সংবাদ প্রকাশ পাইবামাত্র দ্বারকায় দূত প্রেরিত হইল ; দ্বারকাবাসী বন্ধুও অনতিবিলম্বে খাণ্ডবপ্রস্থের নবীন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, ভাই, সকলে আমাকে বলিতেছেন রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ; কিন্তু আমি যজ্ঞাধিকারী হইয়াছি কিনা তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এই জন্যই আমি তোমার পরামর্শ যাচ্ঞা করি। তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব।

বস্তুতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন প্রবলপ্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহার, যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একচ্ছত্র সম্রাট। যুধিষ্ঠির 'দ্বারকাবাসীন্' বন্ধু-শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহাই জানিতে চাহিলেন, আমি কি অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আমি কি সম্রাট?

শ্রীকৃষ্ণকে এ প্রশ্ন করার কারণ ছিল। তদানীন্তন সমাজে তিনি ছিলেন সমাজপতি, রাজারও উপরে, সম্রাটেরও উর্দ্ধে ; অধিকন্তু তিনি নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সত্যদর্শী। সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরের তাঁহার উপর অশেষ নির্ভর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, মহারাজ, মগধসম্রাট জরাসন্ধ থাকিতে আপনার বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ত দেখি না। আপনার রাজসূয় যজ্ঞের আহ্বান সাধুগণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না এবং আমার আশঙ্কা হয়, সম্রাট জরাসন্ধও তাহাতে বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারেন।

আমাদের এই ভারতবর্ষ একদা এসিয়ার অধিনায়কত্ব করিতেন। বহু মিথ্যার বেসাতি করিলেও ইতিহাস ইহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। তারপর, একদিন ভারতের মত এবং ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশাল এসিয়ার উপরও দুঃখনিশার ঘনান্ধকার নামিয়াছিল। তথাপি, এসিয়া পরিব্যাপ্ত দুঃখ, দুর্য্যোগ ও পরাধীনতার মধ্যেও অস্মদ্দেশে এসিয়া সম্মিলনের প্রস্তাব নানা সময়ে নানাভাবে উঠিয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদালি, চিত্তরঞ্জন দাশ, এমন কি পণ্ডিত জওহরলালও এসিয়া ফেডারেশনের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু 'দ্বারকাবাসী'র সম্মতির অভাবে

প্রস্তাব 'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে'। সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনের সর্ব্বপ্রধান স্বপ্ন ছিল, একত্রিত এসিয়া। 'দ্বারকাবাসী'র অলিগার্কি-দরবারে তিনিও দরবার করিয়াছিলেন; কিন্তু গান্ধীজীর মুখ দিয়া ক্ষুদ্র একটি একাক্ষরের 'হাঁ' বাহির করা সম্ভব হয় নাই। তা না হোক, সুভাষ তাঁহার সাধনায় স্বপ্নকে ক্ষেত্রান্তরে ও রূপান্তরে সার্থকতা দান করিয়া ধরায় যে কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া অনন্ত কালসমীপে যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, অনন্ত জগত অনন্ত কাল তাহা স্মরণ করিয়া ধন্য হইবে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে 'দ্বারকাবাসী'র সম্মতি মিলিয়াছে; জরাসন্ধ "কুইট ইণ্ডিয়া" প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। ১৯৪৭ সালের ২১এ মার্চ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ সংলগ্ন ক্ষেত্রে দিল্লীর পুরাণ কেল্লায় এসিয়ার রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল।



রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান

জওহরলাল রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও এই রাজসূয় জওহরকে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটত্বে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য আহুত হয় নাই। ইহাকে এসিয়ার রাজসূয় বলাই সঙ্গত। এসিয়া এসিয়ার রাজচক্রবর্ত্তী; এসিয়া এসিয়ার সম্রাট; এসিয়ায় এসিয়ার সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং এসিয়ারই এই যৌবন অভিষেক। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, যৌবনে রাজটীকা কে আর তেমন করিয়া দিতে পারিবে? এসিয়াকে দুর্ব্বল, অসহায় ও নাবালক বোধে পাশ্চাত্যের বুভুক্ষু অপিচ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কখনও একক, কখনও সঙ্ঘবদ্ধভাবে এসিয়ার উপরে শাসন ও শোষণের কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। কালক্রমে, সাগরে জলোচ্ছ্বাসের মত, বর্ষাগমে নদীর বালির বাঁধের মত, যৌবনাগমে যুবতী নারীর লজ্জা সঙ্কোচের প্রাচীরের মত একটির পর একটি নাগ পাশ ছিন্ন করিয়া এসিয়া তাহার লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধৃত করিয়াছে। কেহ সম্মুখ যুদ্ধ, কেহ গেরিলা যুদ্ধ, কেহ কূটনৈতিক যুদ্ধ করিয়াছে, হয় ত বা এখনও করিতেছে; আর কেহ বা অভিনব ও অপূর্ব্ব অহিংস যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছে। লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য অভিন্ন; স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার। বিশাল মহাদেশ এসিয়ায় আজ বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অস্ত্র শস্ত্র অক্ষম, ও অকর্ম্মণ্য। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিমা নিরঞ্জনান্তে এসিয়া আজ বিজয়া সম্মিলনীতে মিলিত হইয়াছে। বিজয়া সম্মিলনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, শান্তিবারি সিঞ্চন। পুরোহিত ভারতে; তাই এসিয়ার সমাবেশ, ভারতবর্ষে।

এ যেন সেই—

"ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?"

প্রবাস-শেষে, এসিয়ার সন্তান-সন্ততির উৎস-মূলে এই শুভ-সমাগম! এসিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা অভিনব ও অবিস্মরণীয়। এসিয়া এক ও অখণ্ড, এ তারই শুভ সূচনা।

এসিয়া মহাসম্মিলনের ক্ষেত্র ভারত ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে? অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, বর্ত্তমানেও বিশাল বিশ্বে ভারত যে প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়াছে তাহারই বা তুলনা কোথায়? তবু আজ ভারত পুরাপুরি স্বাধীন হয় নাই, তথাপি ভারতের সৌহার্দ্দ্যকামনায় বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের আগ্রহাকুলতা কে না দেখিতেছে? আমেরিকা, চীন, রাসিয়া, ফ্রান্স ভারতের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময়ে যে তৎপরতা দেখাইয়াছে, পৃথিবী কি অন্ধ, তাহা দেখে নাই? ভারতের আত্মিক ও নৈতিক বল যে শত সূর্য্যের কিরণচ্ছটায় দিগ্দেশ প্রভাসিত করিয়াছে; সমগ্র বিশ্বে যাহার বন্দনা গীত হইল, ভারতের নিকটতম প্রতিবাসী এসিয়ার দেশসমূহের নিকট কখনই তাহা অজ্ঞাত, অদৃশ্য ও অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। পৃথিবীর সহিত এসিয়াও প্রেম, সত্য ও অহিংসারচিত সে মহা-সঙ্গীত শুনিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির অতল তল হইতে পূর্ব্বস্মৃতি সোনার আখরে জাগিয়া উঠিয়াছে; ভারতের নেতৃত্ব তাহার কাম্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভারত এসিয়াকে দেখাইয়াছে, বিনা অস্ত্রে, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, শুদ্ধমাত্র নৈতিক বলে প্রবলের প্রভঞ্জন-সদৃশ অভিযানও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ভারতই পৃথিবীকে দেখাইয়াছে যে অর্দ্ধবিশ্ববিজয়ী সম্রাটের সাম্রাজ্য-প্রাসাদও নিঃসহায় নিরস্ত্রের বাসনাবাষ্পের ভর সহিতে পারে না, ভূমিকম্পে অট্টালিকার মত ভূমিসাৎ হয়। যে যুগে এ্যাটম্ বম্বের মন্ত্রগুপ্তির জন্য অর্দ্ধবিশ্ব সন্ত্রস্ত এবং অপরার্দ্ধ অপহরণোদ্যোগে, উদ্‌গ্রীব অধীর, সেই যুগে সেই পৃথিবীতে এমন এক কটীবাসসম্বল শীর্ণকায় জীর্ণকর নিঃস্ব মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে—যে লোক একত্রিত এসিয়াকে দিগ্বিজয়ের বর দান করিতেছে, অথচ কাহারও হাতে একখানি অস্ত্র দেয় নাই, মুখে হিংস্র বা ধ্বংসাত্মক একটি শব্দ দেয় নাই! এসিয়া সেই বার্ত্তা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছে; ইয়োরোপ আমেরিকাও শুনিয়াছে। স্বর্গে যদ্যপি দেবতারা আজও থাকিয়া থাকেন তাঁহারাও শুনিয়াছেন। যে কালে প্রবল অহর্নিশ দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া রাজকীয় বিশুদ্ধ গালভরা অভিধান প্রয়োগে অপকর্ম্মগুলিকে রাষ্ট্রীক আভরণে আবরিত করিতেছে, যে



প্রবেশ তোরণ—পুরাণো কিল্লা

ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

কালে নরপশুতে নরহত্যা, নারীহত্যা, শিশুহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় বর্ব্বরোচিত পাশবিক অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যক্ষে পরোক্ষে রাজনৈতিক প্রেরণা লাভে বঞ্চিত হয় না, হায়! সেই কালেও, এবং সেই মনুষ্যালয়েও অত্যাচারিত ও নিগৃহীত মানুষকে প্রেম ও অহিংসার শান্ত স্নিগ্ধ ও অভয় মন্ত্রে নির্ভয় করিবার মানুষ যে কেবলমাত্র ভারতেই বিদ্যমান, সেই ভারতে, মহামানবের সেই লীলাক্ষেত্রে এসিয়ার সুধীসমাগম হইবে না ত কোথায় হইবে? সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তথাগত বুদ্ধ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে বীজ আজ বপন করিলেন, তাহাই একদিন মহামহীরুহের আকার ধারণ করিয়া রণক্লান্ত লোভক্লান্ত পৃথিবীকে অভয় ও আশ্রয় দান করিবে, এসিয়া মহাসম্মিলনের বসন্ত-সন্ধ্যার ইমন কল্যাণে তাহারই পূর্ব্বরাগ সঙ্গীত গীত হইতে শুনিলাম।

বিজয়া সম্মিলনী উদ্বোধন প্রসঙ্গে জওহরলাল্ বলিয়াছিলেন, "এখানে আমরা রাজনীতি চর্চ্চা করিব না।" এত বড় কথা বলিতে ইংলণ্ডের বেভিন পারেন না, ফ্রাঁসের বিদোলে পারেন না, মার্কিন মার্সেল পারেন না, সোভিয়েটের মলোটভও পারেন না; কিন্তু ভারতের জওহর নিঃসঙ্কোচ। ভারত নির্লোভ, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার; ভারতের ধর্ম্ম নিষ্কাম। সিংহাসন অধিরোহণ ও বনবাস ভারতের নিকট তুল্যমূল্য ও অভিন্ন। ভারতের জওহরলাল ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেনের টেবিলে বসিয়া খানা খাইয়া ভাঙ্গী বস্তিতে আসিয়া ছিন্ন চ্যাটাইয়ে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতে দ্বিধা করে না। বিরাট ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ভার (যদিচ আংশিক) স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া এই জওহরলালই অস্থয়াবিচ্ছিন্ন ধরিত্রীকে অভয় বাণী শুনাইয়াছিল, ভারতের অপ্রমেয় ধনবল, জনবল, ভারতের বক্ষে অফুরন্ত ধনরত্ন, মৃত্তিকাভ্যন্তরে অপরিমিত খনিজ সম্পদ। অদূর ভবিষ্যতে সেদিন আসিবে যেদিন ভারত, শুদ্ধমাত্র এসিয়ারই নহে, সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্বাধিকারও পাইতে পারে; কিন্তু নেতৃত্বের যে মূর্ত্তি আজ বিশ্বে প্রকট, ভারত কোন দিন সে নেতৃত্ব কামনা করে না। শক্তিমান ভারত অশক্তকে গ্রাস করিবে না, রক্ষা করিবে; বিশাল ভারত প্রতিবাসী রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করিয়া আত্মোদর স্ফীত করিবে না, প্রতিবাসীকে সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ করিবে; শক্তিমত্ততার দাবা-খেলায় বড়ের চাল চালিবে না; আর্ত্ত দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা মোচনেই আত্মোৎসর্গ করিবে।

বিপুলা চ পৃথ্বীর মানুষের আজ ত আর এ সত্য আদৌ অবিদিত নাই যে ভারতের আশা-আকাঙ্খা কামনা বাসনা এই একটি মানুষের আননে ও নয়নে প্রতিবিম্বিত; ভারতের আত্মার ভাষা এই একটিমাত্র মানুষের ভাষণেই প্রতিধ্বনিত! মহা-সম্মিলনে সম্মিলিত এসিয়া যে এই মানুষটির সান্নিধ্য কামনায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনই কারণ নাই। গান্ধীজীর অদর্শনে এসিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সান্ত্বনা ছিল যে গান্ধীর শাশ্বত আদর্শে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রভাসিত হইতে তাহারা দেখিয়াছে। বুদ্ধকে কয়জন লোক দেখিয়াছে? তথাপি বুদ্ধ চিরপ্রদীপ্ত। প্রথম দিনের সভাধিবেশনের শেষাংশে পণ্ডিত জওহরলাল যখন আশ্বাসিত করিলেন যে হয়ত মহাত্মাজী একদিন আসিতেও পারেন, তখন সেই বিশাল সভাস্থল যেন আশাতীত কল্পনাতীত হর্ষোল্লাসে হতবাক্ হইয়া গেল। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের কথা কেতাবেই পড়িয়াছি, বিদ্যুৎ প্রবাহে বাস্তবে জীবের কি দশা হয় সেদিন প্রত্যক্ষ করিলাম। অকস্মাৎ এক সময়ে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে সেই যে লক্ষ করতালি ধ্বনি ধ্বনিত হইল, তাহার আর বিরাম নাই। যেন বর্ষার বারি বক্ষ, থর থর কাঁপে, ঢল ঢল নাচে, থর বেগে ধায়—সে দৃশ্য দেখিবার, অনুভব করিবার।

কিন্তু গান্ধী তখন কোথায়? জওহরলালই জানাইলেন, মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ভারতের পথে প্রান্তরে সেই লুপ্ত মনুষ্যত্বের উদ্ধার মানসে নরোত্তম মানুষটি নগ্ন দেহে নগ্ন পদে ভারতের পল্লী পরিক্রমা ব্রত উদযাপন করিতেছেন। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।' পৃথিবীর শক্তিমানগণ এ্যাটম-থোরিয়াম খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আর গান্ধী মানুষের লুপ্ত মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া ফিরিতেছেন। কে জানে, কবে

কোথায় ও কেমন করিয়া হারাধন পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিবে; অথবা আদৌ ঘটিবে কি-না!

শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু সভাধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কন্তা পদ্মজার সঙ্গে তাহার শয়ন কক্ষে উপনীত হইয়া দেখিলাম, প্রবল জ্বরাক্রান্ত। তখন ভাবিয়াই পাই নাই যে দুঃসহ হৃদয়বেদনায় কাতর এই বর্ষীয়সী নারী পরদিন সন্ধ্যায় পঁচিশ সহস্রাধিক নরনারীকে মেঘমন্দ্ররবে ভারতের রূপরসগন্ধামোদিত ত্রিপথগা ভাগীরথীর পূতপবিত্র বারিসম নির্ম্মল আত্মার তীর্থ সলিলে অবগাহনে আহ্বান জানাইতে সমর্থ হইবেন। আমাদেরই ভুল। ভারতের নারী, দ্রৌপদীর অংশে উদ্ভূত,



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নায়ডু

তপস্বিনী উমার বরে উজ্জীবিত, এত অল্পে কাতরতা সম্ভবে না। পুরাণের দ্রৌপদী ও দুর্গাকে আমার বড় ভাল লাগে। একজন পাষণ্ড জয়দ্রথ-দলনী, অপরজন মহিষমর্দ্দিনী। সীতা, দময়ন্তী, কুন্তী, তারাকে আমি পূজা করিতে পারি; কিন্তু দুর্গা ও দ্রৌপদীকে আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজন! দুঃখ এই যে সরোজিনী দেবী ও বিজয়লক্ষ্মী মাত্র দু'টি। তবে দুঃখই বা করি কেন? এক সূর্য্য ও এক চন্দ্র কি পৃথিবীর তমিস্রা দূর করে না?

দুই শতবর্ষকাল বৃটিশ অসীম যত্ন ও অনন্ত অধ্যবসায় সহকারে বিষময় বহু রামায়ণ মহাভারত রচনা ও প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়াছে যে সভ্যতাভব্যতাবর্জ্জিত ভারতে নারীতে ও গৃহপালিত গবাদি পশুতে কোনই পার্থক্য নাই। এসিয়া মহাসম্মিলন বৃটিশের সত্যবাদিতার যোগ্য উত্তর নহে কি? শ্রীমতী সরোজিনী সভানেত্রীর অভিভাষণে সেই অপপ্রচারের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিতেই বোধ করি বলিলেন, আমি নারী; ভারতে নারীর আসন মহোচ্চ; কারণ, ভারতে নারীই গৃহকর্ত্রী। অতিথিকে আমন্ত্রণ দিবার, অতিথি সৎকার করিবার অধিকার একান্তরূপেই আমার। অন্য দেশে যাহাই হোক, ভারতবর্ষে এ অধিকার চিরদিন নারীর। সেই জন্যই এত বিদ্বান, এত জ্ঞানবান লোকবিখ্যাত পুরুষ বর্ত্তমানেও এই আসনে নারী উপবিষ্টা।" ইহার পরেও কি হ্যালিফক্সের জাতি গোষ্ঠী ভারত নারীকে ধেনুপদবাচ্য করিয়া বেণু বাজাইবে? তবে আর বোধ করি তাহার প্রয়োজন হইবে না। ১৯৪৮ সালেই অষ্টাদশ পর্ব্বাবসান।

"আমার শাশ্বত ও সনাতন অধিকার বলে আমি এসিয়াকে আহ্বান দিতেছি। আমার দেশে যাহা সত্য, যাহা শিব, যাহা সুন্দর অতিথিকে তাহা দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার আবেদন আমিই জানাইতেছি। ভারত চিরদিন দান করিয়াছে, কুণ্ঠাভরে নহে, কৃপণকরেও নহে, অকাতরে অবলীলায় সাগ্রহে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত হয় নাই। একদিন দানশৌণ্ড ভারতের দানে এসিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিল, আজ আবার সেইদিন আসিতেছে, ভারত তাহার কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছে। কে আছ আর্ত্ত, এসো অমৃতময় এই ভারতে; কে আছ জ্ঞানপিপাসু, দেখো জ্ঞানমন্দাকিনী প্রবাহিত এই ভারতে। আর কে আছ সত্যপ্রেমত্যাগ-তিতিক্ষানুরাগী, এসো এই ভারতে, দেখিবে, কৌপীনে সাম্রাজ্যের ষড়ৈশ্বর্য্য! সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী বিশ্বে মহৈশ্বর্য্য বিলাইয়া ভাঙড় ভোলার বেশে শ্মশানে মশানে গান্ধীর বিহার।" এই উদ্বোধন সন্ধ্যার কথা কেহ কোনদিন ভুলিবে না। ভারতের নারী যে সত্যই ভারতের গৃহকর্ত্রী, তাহার কর্তৃত্বের উপরে কর্তৃত্বাধিকার যে কাহারও নাই, সরোজিনীতে সেই মহিয়সী সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিই ফুটিয়াছিল। ভাব ও ভাষার কমনীয় মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যের সহিত ভারতের অক্ষয় অব্যয় আত্মস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে স্বভাবজ আদরসোহাগের কি সে ত্রিবেণী সঙ্গম। ছার রাজনীতি! রাজনীতি কি হিমালয়ের উচ্চতা, হিমালয়ের অপরিম্লান পবিত্রতা, হিমালয়ের মধুর শৈত্য দিতে পারে! সার্থক নাম সরোজিনী! আর সার্থক এসিয়া মহাসম্মিলন।

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা হাসির কথা বলি। সরোজিনীর স্নেহসম্ভোগের সুযোগ আমার দীর্ঘকালের। সম্মিলন শেষে একদিন বলিলাম, দিদিভাই, এই সভামাঝে তোমায় বাঙ্গালী বলিয়া বন্দনা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন, খবর্দ্দার, ও কাজ করিও না, এখানে হায়দ্রাবাদের অনেক লোক আছে, তুমি কৃশকায় ব্যক্তি তোমাকে অতিশয় উত্তম মধ্যম দিয়া ফেলিবে। হাসির কথা থাক, "বঙ্গের বধু বুক ভরা মধু," আমি জানি অন্তরটি বঙ্গনারীর মতই মধুর।

সরোজিনীর কণ্ঠস্বরে মেঘগর্জ্জন করে, আবার সজলস্নেহে রুদ্ধ হইয়া আসে। শেষকালে যখন বলিলেন, "এসো এসিয়া, আমি আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার, ধনের ভাণ্ডার, গুণের ভাণ্ডার খুলিয়া দিই, অবাধে অসঙ্কোচে পূর্ণানন্দে তোমার ঈপ্সিত রত্নরাজি আহরণ করো, আমি তোমায় সে অধিকার দিলাম" তখন বিশাল সভাস্থল সত্যই চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এসিয়া শ্রদ্ধাবনতশিরে মহান নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া ধন্য জানিল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আখ্যান দিয়া আমি এই আখ্যায়িকার অবতরণিকা করিয়াছিলাম, অন্যায় করি নাই; কথাটা আর একবার আসিয়া পড়িতেছে। হস্তিনায় যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞশালে শিশুপাল স্বভাবসুলভ দুর্ব্বুদ্ধিবশে কিছু উৎপাত করিয়াছিল, আধুনিক হস্তিনায় যাহারা উপদ্রব করিল তাহারা শিশুপালের বংশধর কি-না বলিতে পারিব না বটে, তবে আকার প্রকারে অদ্ভুত সামঞ্জস্য। বিজয়া সম্মিলনে রাজনীতির স্থান নাই জানিয়াও যজ্ঞভঙ্গের পণ্ডশ্রমে শ্রান্তি দেখিলাম না। শেষ পর্য্যন্ত বিফলযত্ন হইয়া দৈত্যদানা হস্তে ছুরি দিয়া রাজপথে ছাড়িয়া দিল। দিন কয়েক ধরিয়া রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে গুপ্ত ঘাতকের কর্ম্ম-কুশলতা প্রখর হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্য জহ্লাদদলের সঙ্ঘ সংগঠন! যেন টেলিগ্রাফের তারের টরে টক্কা ধ্বনি। দিল্লীর তারঘরে খটাখট করিলে কলিকাতা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, আসাম, সীমান্ত, নোয়াখালি ও কানপুর একই সঙ্গে ছুরিকা ঝলসে।

রাষ্ট্রতন্ত্রে ও রণশাস্ত্রে ঘাতক ও ছুরির স্থান চিরদিন আছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের ভারতও যে তাহার ব্যতিক্রম এমন কথা খুব জোর করিয়া বলা যায় না। তবু যে আজ ভারতের একটি বিশাল ও বিশিষ্ট অংশ ঘাতকের ছুরির নামেই ধিক্কার দেয়, নিঃসন্দেহে ইহা গান্ধী-প্রভাবের অব্যবহিত ফল। গান্ধীবাদের অসামান্য শান্ত ও সিদ্ধ প্রভাব সত্ত্বেও আজিকার হিন্দু-ভারতের ক্ষুদ্রাংশ সাময়িকভাবেও ছুরিকার চাকচিক্যে আকৃষ্ট যদি হইয়াও থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক নির্য্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করিয়াই সেই স্ব-ধিক্কৃত পথে তাহারা পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তাহাতে সে সুখী নহে। সাময়িক প্রয়োজনে ও আপদ্ধর্ম্মে পশুবৃত্ত হইলেও পরমুহূর্ত্তেই আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মধিক্কারে প্রায়শ্চিত্তানুশীলনে আত্মশুদ্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছে। ইহাও কথার কথা নহে, অন্তরেরই সত্য অভিব্যক্তি। ভারতের রাষ্ট্রনীতি যে তাঁহার জীবদ্দশাতেই ঘাতকের ছুরিকাগ্রে আবর্ত্তিত হইবে ভারতের রাষ্ট্রনায়ক কি কুস্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন? ইহা ছিল, তাঁহার দুঃস্বপ্নেরও অতীত।



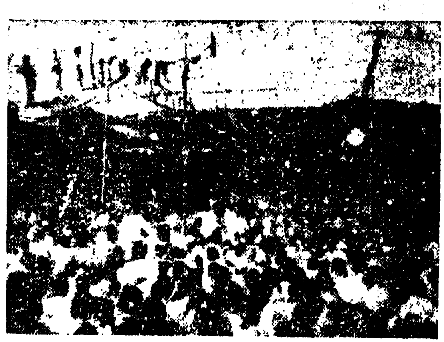
শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রভৃতি

শিবহীন যজ্ঞের কথা, গান্ধীবিহীন এসিয়া মহাসম্মিলনের দুঃখ আগেই বিবৃত করিয়াছি। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পুরুষোত্তমের অদর্শনে মনস্তাপের অন্ত থাকে না। আশার ক্ষীণ সূত্র ধরিয়াই আলাপ আলোচনা চলিতেছিল এবং দিনান্তে একটি করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস নিত্য সন্ধ্যাবায়ুতে লীন হইতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, আরও একটি মানুষের অভাব মহাসম্মিলনকে পীড়িত করিতেছিল। সত্যঃ-স্বাধীন

ভারতেনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুলতান শারিয়রকে সান্নিধ্যে প্রাপ্তির আশা এক সময়ে এমনই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল যে স্বয়ং ভারত-রাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্টকেই একদিন হাওয়াই জাহাজের আফিসগুলির সামনে হাওয়াই জাহাজের সন্ধানে ছুটাছুটি করিতে দেখিলাম। বর্ত্তমান পৃথিবীর শিলাখণ্ডে দুইজন সার্থক সাধকের নাম খোদিত হইয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের স্বাধীনতা-সাধনার সার্থকতা তাঁহাদের স্ব স্ব জীবদ্দশাতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। ভারতে গান্ধীজী ও ভারতেনেশিয়ায় সুলতান শারিয়র সাহেব। সম্মিলনের সৌভাগ্য, সার্থক সাধকদ্বয় একই দিনে একই সন্ধ্যায় একই মঞ্চে উপস্থিত হইয়া এসিয়ার সুধী-সমাজকে সাদর সম্ভাষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সেদিনের সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, এ জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না ; আমি ত জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না। বলিতে লজ্জা নাই যে, আমি পৌত্তলিক হিন্দু, পৌত্তলিকের মনের বর্ণে সেদিনের পরিচয় আমি লিখিতে পারি। যে গৃহ-বিগ্রহের আমি চিরদিন পূজা করি, আমার ভাগ্যবশে যদি কোনদিন আমার পাথরের দেবতা প্রাণবন্ত হইয়া আমার বিগ্রহ মন্দির ধন্য করেন দেখি, তাহা হইলে আমার কি দশা হয় জানি-না বটে ; তবে একটা কিছু যে হয় তাহা নিশ্চিত জানি। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষের যদি শত চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে গান্ধীকে দেখা সম্পূর্ণ হইত ; যদি সহস্র কর্ণ থাকিত, তবেই গান্ধীর অমৃত-বাণী শ্রবণ সার্থক হইত। সহস্র সহস্রের পরিতৃপ্ত নবেন্দ্রিয় নিঃশব্দে যেন এক বাক্যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, এই সেই গান্ধী !

যাক্। বিজয়া সম্মিলন আখ্যা যখন দিয়াছি তখন মিষ্টমুখ অথবা খানা-দানার কথা না বলা অশোভন হয়। প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর উদ্যান সভার কথা বলি। আচার্য্য-দম্পতীর 'কুটীরে' স্থানাভাব, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যানে এসিয়া জলপানে আমন্ত্রিত হইলেন। খাদ্য-সচিবের উদ্যান হইলে কি হয়, খাদ্যবিস্থা শোচনীয়। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে জলের অভাব হইবার নহে, অনায়াসে প্রাপ্তব্য, শীতল, উষ্ণ কোনটাই দুর্লভ নহে। সভানেত্রীর অভিভাষণে অতিথিপরায়ণা নারী সাধে কি আর কপালে করাঘাত করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, হায়, আমার সে ভারত কি আজ আছে ! অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণার অন্নসত্র আজ নিঃশেষে শূন্য হইয়া গিয়াছে ! সাগরেও আজ বারি নাই ! পণ্ডিত জওহরলালও জলসত্র দিয়াছিলেন। বলা বোধহয় বাহুল্য, তথাপি বলিয়া রাখা ভাল যে জল বলিতে সেই জল বুঝিতে হইবে, যে "নির্ম্মল জলের কোন বর্ণ নাই, গন্ধও নাই।" এইখানেই 'ইম্প্রেসারিও' হরেন্দ্র ঘোষ নয়নাভিরাম ছউ নৃত্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। জওহর-আবাসে, জওহর-বিরচিত, ভারতাবিষ্কারের ছন্দোবন্ধে লীলায়িত নৃত্য ঝঙ্কার মহিয়সী ভারতের মহিমময়ী মূর্ত্তিটিরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সারাজীবন জেলখাটা জওহরের সহিত ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সুরুচির কি অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ! শ্রীমান হরেন্দ্র ঘোষের সাধনাও সার্থক। জওহরলাল আবিষ্কারের ইতিবৃত্তই লিখিয়াছিলেন—ইতিহাসকে নৃত্যচ্ছন্দে রূপায়িত করিতে হরেন্দ্রই পারেন।

বড়লাটপত্নী সুন্দরী লেডী মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁহাদের কন্যা সুন্দরী প্যামেলা পণ্ডিতজীর ভবনে সান্ধ্য-সভার শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় মূর্খ লোক আশা করিতেছিলাম যে ভারতের শেষ ভাইসরয়ও হয়ত বা পেচকাভিজাত্য-সংস্কারের শ্রীমুখে নুড়ো জ্বালিয়া দিয়া 'ভারতাবিষ্কার' নৃত্য বাসরে হাজিরা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু, বৃথা আশা। যদিচ মাউণ্টব্যাটেন মহোদয় দুইশত বৎসরের পুরাতন আভিজাত্য-গর্ব্বের গগনস্পর্শী বিফল প্রাচীরের ইষ্টক ভাঙ্গিতেই আসিয়াছেন, তবুও, প্রবাদের হিসাব অনুযায়ী লক্ষ্মী ছাড়িলেও 'চাল' ছাড়া সম্ভব হয় না। আমাদের আশা করিবার কারণটি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই যোগান্ দিয়াছিলেন। যে চন্দ্রমাশালিনী মধুরহাসিনী শুক্লা যামিনীতে জওহরাবাসে অতীতের খুসরোজের সুসংস্কৃত মেলা বসিয়াছিল, সেইদিন অপরাহ্নেই বড়লাট এসিয়ার সুধী-সমাজকে সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই ? অসূর্য্যম্পশী না হোক্ অভারতীয়স্পর্শী সমগ্র রাজ-প্রাসাদটির অন্ধ রন্ধ্র পর্য্যন্ত দর্শনের ব্যবস্থাও তাঁহার ইচ্ছাতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় যে আশা



সুধীসঙ্ঘের একাংশ ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

আমরা করিয়াছিলাম তাহা কি খুবই আব্দারজনক অন্যায় ? লাট-ভবন প্রাঙ্গণে মলয়ানিলান্দোলিত বাসন্তী-সন্ধ্যায় সদ্যঃসমুত্থিত পূর্ণচন্দ্রের দিব্য বিভায় যিনি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এসিয়ার সেই বিজ্ঞতম সুধী জওহরলালের আতিথ্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহা মনে করা আর যাহাই হোক, মূঢ়তা নিশ্চয়ই নহে। এসিয়া মহাসম্মিলনকে লর্ড মহোদয় যদি আদৌ নস্যাৎ করিতেন, তাহাতেই বা কাহার কি বলিবার থাকিত ? তাঁহার 'পূর্ব্বপুরুষ' লর্ড ওয়াভেল 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' থাকিলে তাহাই যে করিতেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ ছিল না। মুস্লীম লীগ বর্জ্জিত সম্মিলনকে পাত্তা দিবেন, লর্ড ওয়াভেল এমন কঠোরহৃদয় শাসক ছিলেন না ইহা সকলেই জানে। প্যারিটি রাখিতে ভদ্রলোক কি প্রাণান্তই না হইতেন, আহা ! কিন্তু নূতন লাটের ত "বিল্বমঙ্গল নাটকের" 'কোথ' চিন্তামণি' দশাপ্রাপ্তির খবর আজও পাওয়া যায় নাই !

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রমতে শেষ দৃশ্য আলোকোজ্জ্বল ও মিলনান্ত হইতে বাধ্য। ভারতবর্ষীয় অনুষ্ঠানে শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধতা না হওয়াই স্বাভাবিক; এবং শেষদিনে গান্ধীজী শাস্ত্রাচারের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই "ভারত বাক্য" উচ্চারণ করিয়াছিলেন, দিল্লীর স্মৃতি ভুলো না, ভুলো না।

স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, দিল্লীর স্মৃতি কি? গান্ধীজীই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। ভারতবর্ষ এসিয়াকে প্রেমের আমন্ত্রণ দিয়াছে, এসিয়া প্রেমের আহ্বানেই ভারতে আসিয়াছেন। প্রেমের আদান প্রদানের জন্যই এই মহাসম্মিলন আহূত হইয়াছিল; আবার প্রেমালিঙ্গনের ভিতর দিয়াই বিদায় সম্ভাষণ। ভারত এসিয়াকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছে, বিনিময়ে চাহিয়াছে, প্রেম। তাই গান্ধীজীর শেষ কথা, এই প্রেমমাখা স্মৃতিটুকু ভুলিয়ো না। আমার দুঃখ হইয়াছিল, এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

"প্রেমে নর আপন হারায় প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয় না কো হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে মর্ত্ত্য স্বর্গে উঠে প্রেমে;
প্রেমের গান গগন ভরা প্রেমের কিরণ ভুবনময়।"



দাক্ষিণাত্যবিজয়িনী—শান্তা

ফটো—হরেন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে

গানটা কেহ গাহিল না! আমি অনেক দুঃখ সহিতে পারি কিন্তু আমার ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গভাষার অনাদর (আমার দেশে) দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। এসিয়া সম্মিলনে গাহিবার পক্ষে বাঙ্গলা গানের কুবেরের ভাণ্ডারে যে মহৈশ্বর্য্য সঞ্চিত আছে, শুধু ভারতে কেন, সমগ্র এসিয়াও তাহা কল্পনা করিতে পারে কি? কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির কত কথাই ত শুনি, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য যে কোহিনুর সম্ভারে সমুজ্জ্বল, এ কথাটা ত কেহ বলিল না। দুঃখ হয়, "সোনা বাইরে আঁচলে গেরো।" এসিয়াকে যদ্যপি বঙ্গসাহিত্যের অমৃত প্রস্রবণের সন্ধানই ভারত না দেয়, তাহা হইলে দান পূর্ণ হইবে কি? এসিয়া যদি বঙ্গ-সাহিত্যের সুস্বাদই না পাইল, তাহার প্রাপ্তর্ত্ত মিটিল কি?

আশা করি আমার কথাগুলির কদর্থ কেহ করিবেন না। সেই ভরসাতেই সশ্রদ্ধ নিবেদনে প্রশ্ন করিতেছি ভারতের সত্তা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভাবময়ী ভোগবতী-প্রবাহ বঙ্গসাহিত্যে যেমন মূর্ত্ত, যেমন সমৃদ্ধ, তেমন কি আরও কোথায়ও আছে? "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র কি আর কেহ দিতে পারিয়াছে? রবীন্দ্রনাথের মত ভারতের আত্মার নিষ্কলুষ মহিমার ঠিকানা কি আর কোথাও সম্ভব হইয়াছে? যে বিবেকানন্দের সাধনার সিদ্ধফল সুভাষচন্দ্র, বাঙ্গলার সাহিত্য ইতিহাস নাটক উপন্যাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই যে ভারতের উত্তর সাধনা সার্থক হইয়াছিল, ভাগ্যদোষে আজিকার ভারতে তাহার কোন স্থানই নাই! এসিয়া সেই 'মণি কোঠা'রই সন্ধান পাইল না; কিন্তু এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি এই দীন সাহিত্যসেবক অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীই আজ করিতেছে যে বঙ্গসাহিত্যের স্বর্ণ সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ না করিলে এসিয়ার ভারত পরিচিতি অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে। ইহা দম্ভোক্তি নহে, সত্য দর্শন!

লক্ষবিদ্যুৎ বর্ত্তিকায় আলোকসমুজ্জ্বল সভামণ্ডপে লক্ষ ব্যগ্র নয়ন শীর্ণকায় তপঃক্লিষ্ট প্রেম সাধকের পানে যখন নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া, ধীরে—অতি ধীরে সেই মোহাবিষ্ট মানব-সমাজ যে মুহূর্ত্তে আনতশিরে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধানতি জ্ঞাপন করিল—ধীরে—অতি ধীরে রঙ্গমঞ্চের রেশমী যবনিকা আনমিত হইল, রাজসূয় যজ্ঞাবসান ঘোষিত হইল। হয়ত স্বপ্ন—দিবাস্বপ্নও হইতে পারে, আশ্চর্য্য নহে। তা হোক, কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি আমার মানসনেত্রে মানসে মুদ্রিত যে মহা-ভারতের মহামহিমময় চিত্র অবলোকন করিলাম, সে নয়নাভিরাম মনোময় দৃশ্য কি জীবনান্তকালেও ভুলিতে পারিব? এতদিন আমরা বোম্বাই হইতে ব্রহ্মপুত্রতটে আসাম, হিমাচল হইতে নীলাচল, খাইবার গিরিবর্ত্ম হইতে কন্যাকুমারিকার কল্পনাতেই বিভোর ছিলাম, আজ রাজসূয় যজ্ঞাবসানের মিলনোজ্জ্বলদীপালোকে আরব সাগর হইতে ককেশাশ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহা-ভারতের মহাসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে দেখিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল। সেই মহা-ভারতের ভিত্তি প্রস্তর মহাভারতের হস্তিনাতেই আজ প্রোথিত হইল।

এই মহা-ভারত রচনায় এসিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলির আগ্রহ উৎসাহই সমধিক। এসিয়ায় মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যা সত্যই অধিক। স্বাধীন ভারতকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া এসিয়া মহারাষ্ট্রের অপরূপ রূপ-পরিকল্পনায় ভারতেনেশিয়া, ভারতচীন, তুরস্ক, পারস্য, আরব, আফগানিস্থান, কুর্দ্দিস্থান, ইরাণ, ইরাক, উজবেগীস্থানকে অবিচলিত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও, ভারতের কি অপরিসীম দুর্ভাগ্য যে ভারতের মুসলমান- সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ উদাসীন—বিরূপ। রামায়ণের বিভীষণ, মহাভারতের শকুনি মামা হইতে সুরু করিয়া একালের পরিচিত বন্ধুগণ পর্য্যন্ত অভাগিনী ভারতের ভাগ্য কি যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে, কল্পে কল্পে একই পঙ্কিল আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতেছে? মীরজাফরি-অনুশাসন কি ভারতের সঙ্গের সাথী? এই পাপ চক্রের অবসান নাই কি?

মাসখানেক পূর্ব্বে আমি আর একবার দিল্লী আসিয়াছিলাম। তখন আর এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। স্বাধীন ভারতের

শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পর্ব্বে, রাজধানীতে সদ্যআহুত গণতন্ত্র পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন চলিতেছিল। আশায় আনন্দে উৎসাহে উল্লাসে দিল্লী সুন্দরী যেন বিবাহের বধুর বেশ ধারণ করিয়াছিল। ভরা নদীতে বান আসিলে যেমন হয়, বসন্তের ফুল্লকুসুমিতা উপবনে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিলে যে শোভা হয়, শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলার নামে যে পুলকের প্লাবন প্রবাহিত হয়, সারা ভারতবর্ষের নরনারীর অসনে বসনে নয়নে আননে তাহাই প্রতিবিম্বিত। আর তাহারই মাঝে ম্লান মলিন মুখে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী বিশ্বের করুণার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী। রবীন্দ্রনাথের সেই "ভিখারিণী" কবিতাটি যেন দীন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণে সে যে কি মর্ম্মন্তুদ ব্যথা ও বেদনার পাষাণ স্তূপ সৃষ্টি করিতেছিল, বাঙ্গালী ভিন্ন কে তাহা বুঝিতে পারে?

বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হয়, কোথাকার কোন্ দৈত্যদানার দানবীয় পেষণে ও পীড়নে মৃতকল্প ও মুমূর্ষু বঙ্গদেশ আজ জীবিতে মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করিতেছে? বাঙ্গালীর স্বদেশ-সাধনার সমুদ্রমন্থনে এই হলাহলই কি তাহার ভাগ্যফল? শ্যামল বঙ্গের সে স্নিগ্ধ শ্যামলতা নাই; মৃত্তিকার সে সুরভিত সরসতা নাই; প্রাচুর্য্যভরা বঙ্গদেশে আজ নিত্য হাহাকার; বাঙ্গলার কুঞ্জবনে আজ পিক কূজন নাই; গীতি-বৃন্দাবন-বঙ্গে আজ গীতিরব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার পুরুষের প্রাণে আজ প্রাণের স্পন্দন শুনি না; মধুর আধার নারীর অধরের মধু আজ শঙ্কায় শুষ্ক হইয়াছে; বাঙ্গলার শিশু আজ মাতৃক্রোড়ে শুইয়াও আজ আহ্লাদে হাসে না, ভয়েও কাঁদে না, স্বপ্নেও দেয়ালা করে না। অভয় মন্ত্রের সিদ্ধ পীঠ বাঙ্গলার পানে ভারত আজ ভয়চকিত নেত্রে চাহিয়া থাকে! অদৃষ্টের এমন নিষ্ঠুর পরিহাস কি ইতিহাস অন্বেষণ করিলেও মিলিবে?

আজ এই মহা-ভারতের সৃষ্টিকালেও সেই কথাই বার বার মনে হইতে লাগিল, আমাদের কোন্ মহাপাপে বাঙ্গলা আজ বিশ্বের উপহাসের সামগ্রী হইল? ইহার শেষ কোথায় এবং কবে?

বেচারা

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে সকালের কাগজখানা নিয়ে বসেছিলাম। সকালে কাগজ পড়ার সময় হয় না—একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া চলে মাত্র। রাস্তার দিককার ঘরের আমার খোলা দোর দিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে দেখে খগেন ও ভোলানাথ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—বাঁচা গেল—বাড়ী আছ তুমি!

আমিও বাঁচলাম তোমরা আসায়। কারণ কাগজ নাড়াচাড়া করে আর চলছিল না। আশ্চর্য্য এই যে, খবরের কাগজে কোন খবর নেই—যত রাজ্যের বাজে কথা বোঝাই।

মেঝের পাতা মাদুরে বসতে বসতে ভোলানাথ বলল—আমরা কিন্তু খবর এনেচি একটা।

বাঁচিয়েচ ভাই। বল এখন কি খবর আনলে, শুনি। বলে কাগজ রেখে উৎসুকভাবে আমি ভোলানাথের দিকে ফিরে বসলাম।

সে আরম্ভ করল—শচীন একটা গল্প লিখেচে এবং ছাপায় বেরিয়েচে তার সে গল্পটা।

বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়েই আমি বলে উঠলাম—বল কি? শচীন গল্প লিখেচে? মিউমিউ করা ঐ লোকটির মধ্যে যে একজন কবি অজ্ঞাতবাসে আছেন—কে মনে করেছিল তা?

কিছু না; আমি ওকে কবি বলব না—কিছুতেই না। বলে' ভোলানাথ জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

কেন কবি বলবে না ওকে? কি অপরাধ ওর? কারণ বল, কেন বলবে না।

চোখে দেখে লেখা ওর গল্প—যত জানা কথা লিখেচে ও।

না—সব জানা কথা নয় ভাই। খগেন সংশোধন করে দিল ভোলানাথকে।

কিন্তু কি জানা কথাটা নিয়ে গল্পটা ও লিখল সেটা জানতে দাও আগে—শুনি আগে সে গোড়াকার কথাটা।

মাণিকের বিয়ের কথা নিয়ে গল্প লিখেচে ও। জানা কথা নয়?

হাঁ, কিছুটা ওর জানি বটে, তবে হয়ত অনেকটা জানিনে। বিশেষ শেষের দিকের প্রায় কিছুই জানিনে।

জানইত আমার সঙ্গে ও তেমনভাবে মিশত না কোনদিন—বেশ একটু আলগোচে থাকত যেন। যাক্ এখন বল কি হল শেষটা।

একবারে গোড়ায় গলদ করে বসেচে—

অর্থাৎ ?

যা করবার তা না করে, মাণিক করেছে যা করবার নয় তাই।

ও যা হয় করুক—শচীন কি করেচে তাই বল ?

সেই কথাই ত বলতে এসেচি—একবারে বিষ্ণে চটকেচে—যা হয়েচে তা লেখেনি—যা লিখেচে তা হয়নি।

তাতে দোষ হয়েচে কি ? গল্প ত ঐ করেই হয়। কতক যায় থাকে ঘটনায়—বাকিটা, অর্থাৎ বেশির ভাগটাই বায় থাকে লেখকের কল্পনায়।

কিন্তু তাই বলে যে ঘটনাটা নিয়ে গল্প আরম্ভ করল—যেমন যেমন ঘটল সেটা—তা লিখবে না ?

আরে—ঘটবার যা তা ত ঘটেই গেল—তার আর লিখবে কি ? কিন্তু ঐ যা ঘটল তা ঠিকমত ঘটল না—ঘটনার সংশোধন করে দিলেন কবি তাঁর গল্পে। এই হল গল্প—এ কবির নূতন সৃষ্টি। এই করেই গল্প লেখা হয়। নইলে লেখার মানেই হয় না কোন! ঘটনায় যা হয় তা দিয়ে গল্প হয় না। চোখের সামনে যা ঘটে, মন আমাদের ঠিক খুশি হয় না তাতে এবং মনকে খুশি করবার জন্যই সত্যের সঙ্গে স্বপ্নের ময়ান দিতে হয়।

কিন্তু মানিয়ে নিতে হবে ত সবটা ? খাপ খাইয়ে দিতে হবে ত এটার সঙ্গে ওটার ?

নিশ্চয়। তা না হলে ত গল্পই হবে না। শচীন কি তা পারেনি নাকি ? কিন্তু গল্প যখন ওর মাসিকে ছাপা হয়েচে, তখন অতটা গলদ হয়েচে বলে মনে হয় না।

হাঁ—গল্পটা ওর ছাপা হয়েচে বটে কিন্তু নিতান্ত বাজে একখানা কাগজে।

তাতে দোষ হয়নি। কারণ অজ্ঞাতকুলশীলদের লেখা নামকরা কাগজ প্রায়ই ছাপে না। তারা বরং জানা লোকের রাবিশ ছাপবে, কিন্তু অজানা লোকের ভাল লেখা ছাপবে না।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও ঠিকই হয়েচে শচীন যা লিখেচে।

তা কেমন করে বলব ? আগে শুনি ব্যাপারটা কি হয়েচে আর ঐ বা কি লিখেচে, তারপরে না মতামত বলব আমার ? বল—ঘটনাটা বল—শুনি কি হয়েচে ?

জানো তার অনেক কথাই। কিন্তু তবু সংক্ষেপে বলে যাই ব্যাপারটা। শোন—যে বছর মাণিক বি-এ দেয় সেই বছরের গোড়ার দিকে—সম্ভবত জানুয়ারি মাসে—কি একটা খবর নিতে একদিন সকালে ওকে কলেজ আপিসে যেতে হয়েছিল। বাইক চড়ে গিয়েছিল ও এবং রাস্তা থেকেই ও দেখল যে কয়েকটি মেয়ে আপিসের দিকে যাবার পথটায় দাঁড়িয়ে জটলা করচে। গেটের বাইরে থেকেই কিড়িং কিড়িং করে মাণিক তার বাইকের বেল বাজিয়ে দিল—মতলব এই যে মেয়েরা সরে যাবে তাকে পথ দেবার জন্য। কিন্তু মেয়েরা তা বুঝল না—কে যেন বাজাচ্চে—কেন বাজাচ্চে—কোন খেয়ালই করল না তারা এবং জটলা যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। এদিকে জানই ত, মাণিক কি রকম ব্যস্তবাগীশ। তার ওপরে সকালের পড়া ছেড়ে আসতে হয়েচে তাকে। একটু দাঁড়িয়েই অধীর হয়ে উঠল ও একবারে এবং বার-বার বেল বাজাতে লেগে গেল। কিন্তু যারা ওর পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল তারা ঠিক বুঝতে পারল না যে তাদের পথ ছেড়ে দিতে বলচে মাণিক—তর্ক করতেই মশগুল ছিল তারা, অন্য কোন কথা তাদের মাথাতেই আসে নি। দেখতে দেখতে মাণিকের মেজাজ তেতে উঠল এবং বাইক চড়েই যেন ওদের ফুঁড়ে চলে যাবে এইভাবে গেটের ভেতরে ঢুকে একবারে ঐ মেয়েদের ওপরে চড়াও হয়ে উঠবার উপক্রম করল। তর্ক ওদের থেমে গেল, কিন্তু পথ ওরা ছেড়ে দিল না—বরং যুদ্ধং দেহির ভাবে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ওরা সকলে মিলে সংহত হয়ে। জোর কথা কাটাকাটি চলতে লাগল—মাণিক ইংরিজিতে—ওরা বাংলায়।

মাণিক ইংরেজিতে তর্ক করল ওদের সঙ্গে ?

করবেই ত—বাহাদুরি দেখাবার সুযোগ ছাড়বার পাত্র ও নয়, জান না তুমি ?

আচ্ছা তারপরে কি হল ? এসব খবর আমি জানতাম না। কি হল শেষ পর্য্যন্ত—

শেষ পর্য্যন্ত আর গড়াল না কারণ ঠিক ঐ সময়ে

একজন প্রফেসার ওপর থেকে নীচে আসছিলেন। তাঁকে দেখে মেয়ের দল নিমেষের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

তা না হয় গেল—কিন্তু এর মধ্যে গল্প এল কোথা দিয়ে?

বলচি হে বলচি। ঐ যে মিনিট দু'তিনের জন্য ওদের দুপক্ষের তর্কাতর্কি হল তার মধ্যে যে মেয়েটি সব চেয়ে কড়া কথা ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল—মাণিক করল কি—এক ঘটক লাগিয়ে সেই মেয়েটির সঙ্গে নিজের বিয়ের ঠিক করে ফেলল।

বল কি? একবারে রোম্যান্টিক ব্যাপার যে!

তা না হলে আর গল্প হল?

কিন্তু এই সব কথা লিখেচে শচীন?

সব লেখেনি, তবে কিছু কিছু লিখেচে—খগেন বলল।

এইবার তাহলে তুমিই বল ভাই খগেন—আমি একটু জিরিয়ে নিই।

আমি বলতে পারি, কিন্তু চা না হলে একটি কথাও বেরোবে না আমার মুখ দিয়ে—সাফ বলে দিচ্চি ভাই। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই আমার কাছে।

নিমেষের মধ্যে উঠে পড়লাম আমি এবং নিজের কৈফিয়তে বললাম—একবারে ভুলে গিয়েছিলাম ভাই কথাটা। একটু বোস, আমি এক্ষুণি আসচি—বলে বরাবর রান্নাঘরে গিয়ে রাধাকে বললাম—চা করে দাও ত শিগ্‌গির তিন কাপ।

কিন্তু চা যে ফুরিয়ে গিয়েচে একবারে।

ফুরিয়ে গিয়েচে? আগে বলতে হয় কথাটা।

কি করে জানব যে এই রাত দুপুরে তিন কাপ চা চেয়ে বসবে তুমি?

কাল সকালে দরকার হবে—তা ত জানতে।

সকালের এক কাপ হয়ে যাবে—এমন একটু আছে।

এক কাপের যায়গায় দু'কাপ হলেও চলত উপস্থিতের মত।

মুখ বিকৃত করে ঘাড় নাড়তে নাড়তে রাধা বলল—এক কাপ কোন রকমে হবে। দু'কাপ হবার মত নেই চা—এই দেখ বলে কৌটো থেকে হাতের তোলায় ফেলে দেখালেন—চা যা আছে।

কিন্তু উপায় কি? চা যে চাই।

কিনে নিয়ে এস—আর কি উপায় আছে?

ভাববার সময় ছিল না। রাধাকে বললাম—সব ঠিক করে রাখ তুমি—চা নিয়ে আসচি—বলে বাক্স থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পেছনের দোর দিয়ে।

গলির মোড়েই চায়ের দোকান। যে চাটা আমি কিনি শুনলাম সেটা ফুরিয়ে গিয়েচে। তার চেয়ে বেশি দামের চা'টাই তাই কিনতে হল—তবে অবশ্য কোয়ার্টার পাউণ্ড ঐ ভাল চা কিনতেও খরচ আমার তেমন বেশি হল না। ভাবলাম, ভাল চা যে কিনলাম ভালই হল বরং সেটা। নাকের কাছে ঠোঙাটা তুলে বুঝলাম গন্ধটা ভালই বোধ হল।

চা নিয়ে ফিরছিলাম, দেখলাম সামনের খাবারের দোকানে সিঙাড়া ভাজচে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—ভাবলাম শুধু চা খেতে দেব—না দুখানা করে সিঙাড়া দেব তার সঙ্গে? কিছু কচুরি ও সিঙাড়া কিনে ফেললাম।

বাড়ী ফিরে দেখি কেটলিতে জল নিয়ে রাধা বসে আছেন—চামচে, ছাঁকনি, দুধ, চিনি, কাপ, ডিস সব হাতের কাছে নিয়ে। খাবারের ঠোঙাটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, আগে দুখানা রেকাবে কচুরি সিঙাড়াগুলো সাজিয়ে দাও। রসগোল্লা দুটো দিও না কিন্তু—ও এনেচি কাল সকালে খোকা খাবে বলে। দাও, শীগগীর করে দাও সাজিয়ে—রেকাব দুখানা ত দিয়ে আসি ওদের—ওরা খেতে থাক—ততক্ষণ তুমি চা করে ফেল দু-কাপ।

তবে বলছিলে তিন কাপ চা চাই?

আমি একটু খাব ভেবেছিলাম।

নাঃ, তোমার আর চা খেয়ে কাজ নেই এই এত রাত্রে।

না আমি খাব না আর। খেলে ত তিন কাপই করতে বলতাম। আর দুটোর বেশি ত কাপ নেই—আমি খেতে চাইলেই কি দিতে পারবে?

ক্ষিপ্রহস্তে রেকাবে খাবার সাজিয়ে দিলেন উনি। তাই নিয়ে বাইরের ঘরে ওদের দুজনের সামনে ধরে দিলাম।

এ কি? আমরা ভাবলাম, চা আনবে তুমি?

চা আনচি। কথাটা যে ভুলে গিয়েছিলাম এ তারই কৈফিয়ৎ।

অধিকন্তু তাহলে? বেশ।

কিন্তু চায়ের সঙ্গে এই সিঙাড়া কচুরি দেবার আইডিয়াটা কার? তোমার নয়—বোধ হয়?

ভোলানাথ জোর করে বলে উঠল—নিশ্চয় নয়। আমি হলফ করে বলতে পারি সে কথা। তেষ্টার জল চাইলে এক গেলাস জল তুমি এনে দিতে পার, কিন্তু গেরস্তর পক্ষে তৃষ্ণার্ত্তকে শুধু জল দিতে নেই—জল ভাল লাগবে বলে কিছু মিষ্টি অভাবে গুড়ও দিতে হয় সেই সঙ্গে। চা চেয়েচি বলেই সিঙাড়া এসেচে—জল চাইলে আসত সন্দেশ।

মাঝের দোরের শিকল ঠন ঠন করে উঠল। আমি উঠে গিয়ে দু'হাতে দু-কাপ চা নিয়ে রাখলাম দুজনের ওদের সামনে।

খাওয়া বন্ধ করে ভোলানাথ বলে উঠল—বাঃ দিব্যি গন্ধ বেরিয়েচে ত তোমার চায়ের।

কাপটা মুখের কাছে তুলে তাতে এক চুমুক দিয়ে খগেন বলল—শুধু গন্ধটি ভাল নয়, স্বাদে বর্ণে গন্ধে যেন প্রতিযোগিতা চলচে এই চায়ের মধ্যে—কোনটা যে বেশি ভাল—তা বলা শক্ত।

অতটা বলতে চাইনে কিন্তু চা'টা যে বেশ ভাল হয়েচে তা বলচি।

কিন্তু তুমি মনে করো না ভাই যে একটু বেশি দাম দিয়ে চা কিনেচ বলেই ভাল হয়েচে তোমার এই চা। এ ভাল হয়েচে তৈরির গুণে।

যেমন গল্প ভাল হয় বলবার কায়দায়—খগেন বুঝিয়ে দিল ঐ সঙ্গে।

ঠিক মনে করে দিয়েচ ভাই। গল্পের কথা ত প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বল কি হল তার পরে।

তার পরে শচীন লিখেচে যে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করেচে মাণিক। আসলে কিন্তু মাণিক বিয়ে করেচে আর একটি মেয়েকে এবং যতদূর বোঝা যায়, টাকার লোভেই সে করেচে ঐ বিয়ে। আমরা বারণ করেছিলাম তাকে ও বিয়ে করতে এবং তার বিয়েতে কেউ আমরা যাইনি।

বটে!

এখন কথা হচ্চে এই যে এ অবস্থায় তুমি বল—শচীনের কি উচিত ছিল না, বেশ করে দুটো কড়া কথা মাণিককে শুনিয়ে দেওয়া?

তা'তে অবশ্য একটা আঘাত করা হয় মাণিককে, কিন্তু গল্প খেলো হয়ে যেত ভাই।

কিন্তু অন্যায় যে করল তাকে আঘাত করব না?

আঘাত ত তোমরা করেচ। ওর বিয়েতে যে তোমরা যাওনি—ও কি বুঝতে পারেনি তার কারণটা?

বুঝতে পেরেচে, কিন্তু গ্রাহ্য করেনি সে আঘাত। গল্পের মধ্যে লিখলে অবহেলা করতে পারত না তার আঘাত।

কে বলল? কে জানত যে কাকে লক্ষ্য করে বলা হচ্চে? সে পক্ষের কোন লাভই হত না—মাঝে থেকে গল্পটা বাজে হয়ে যেত।

অর্থাৎ তোমার মত এই যে শচীন ঠিকই করেচে—মাণিককে যে ও আঘাত করেনি—ভালই করেচে তা না করে। কেমন?

ঠিক তাই। আঘাত যে শচীন করেনি তাতে শুধু গল্পের নয়, মাণিকের পর্য্যন্ত মর্য্যাদা বাঁচিয়ে গিয়েচে শচীন। আমার আরো মনে হয় তোমাদের কথায় যা হয়নি হয়ত শচীনের কথায়—কিছু না বলার ফল তার চেয়ে ভাল হবে। কিন্তু সে আলাদা কথা—গল্পের ভাল মন্দের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

তাইতে তুমি বলতে চাও যে ঠিক করেচে শচীন? নূতন করে খগেন জিজ্ঞাসা করল।

আমার ত তাই মনে হচ্চে ভাই তোমাদের মুখে শুনে। কিন্তু লেখা গল্প শুনে সব সময়ে ঠিক বোঝা যায় না—পড়ার দরকার। দাওনা পড়ে দেখি কি লিখেচে শচীন—বলে হাত বাড়ালাম আমি ভোলানাথের দিকে।

মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব করল—না আমার কাছে নেই কাগজখানা। ওরই হাতে ছিল। নিয়ে আসছিল ও তোমাকে দেখাবে বলে। গলির মোড়ের ঐ দোকানটায় সিগারেট কিনতে দাঁড়িয়ে গেল ও—আমরা আগিয়ে এলাম। খানিকদূর এসে পেছনে চেয়ে দেখি ও আসচে না। আগিয়ে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পার হয়ে বাড়ীর দিকে চলচে ও। ডাকলাম চেঁচিয়ে—শুনতে পেল না বোধ হয়—অন্তত ফিরত না সে ডাক শুনে।

কিন্তু এলে ভাল করত হয়ত—

নিশ্চয়—এমন ভাল চা'টা খেতে পেত। ভাগ্যে নেই—

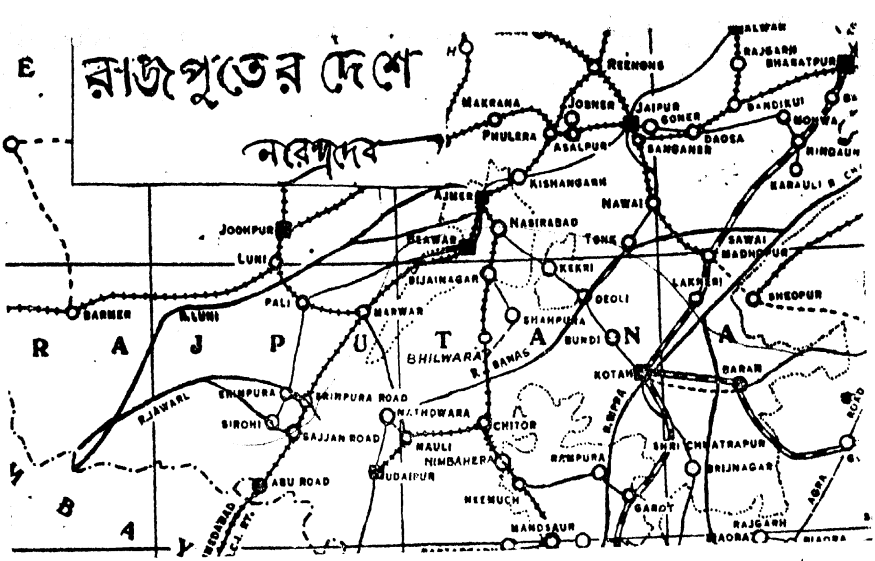
ও এক রকমের মানুষ—নিন্দা সইতে পারে কিন্তু সুখ্যাতি সইতে পারে না।

ঠিক বলেচ—দুঃখ হচ্চে বেচারার জন্য—বলতে বলতে খগেন উঠে পড়ল—বলল—আর না এইবার যাওয়া যাক, বলে কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল—দশটা বাজে।

দুজনে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব



সোমবার বেলা দুটোর মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার এসে গেল। তিনদিনের জন্য তিনি আমাদের মাউণ্ট আবুতে মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা ভারী খুশী। এইবার আরামে সব দেখে বেড়ানো যাবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ যে তখনও মুখটিপে হাসছিলেন এ কথা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। মনের আনন্দে ছুটে গেলুম আবু মোটর সার্ভিসের ম্যানেজারের কাছে। বললুম—এই নিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ঢালা হুকুম! তিনদিনই গাড়ী চাই আমরা। আজ এক্ষুনি বেরুবো 'দিলবারা মন্দির' আর 'অচলগড়' দেখে আসতে।

পণ্ডিতজী বললেন—গাড়ী আমি এখনি দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু, আমার গাড়ী নিয়ে তো আপনারা অচলগড় যেতে পারবেন না!

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম কেন? ও দুটো তো একই পথে পড়বে! আমরা 'দিলবারা' দেখে তারপর 'অচলগড়' যাবো!

পণ্ডিতজী বললেন—আমার সমস্ত গাড়ীর লাইসেন্স মাত্র আবু মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পর্য্যন্ত। দিলবারা মন্দির মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে। সে পর্য্যন্ত আমাদের গাড়ী যাবে। 'অচলগড়' সিরোহী রাজের এলাকায়। ওখানে "সিরোহী বাস এণ্ড মোটর সার্ভিস কোম্পানী" বলে পৃথক একটি কোম্পানী আছে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন অচলগড়ে যাবার গাড়ীর জন্য। ওদের গাড়ীর অচলগড় যাবার লাইসেন্স্ আছে।

কী ফ্যাসাদ!! যদিবা তিনদিন পরে কর্ত্তাদের কাছে আবেদন নিবেদনের ফলে মোটর চড়ে মাউণ্ট আবু ঘুরে বেড়াবার আদেশ-নামা পাওয়া গেল, মোটর কোম্পানী বলে কিনা কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যেই আমাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখতে হবে!

অথচ, পূর্ব্বেই বলেছি, অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে, অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাইরে। সুতরাং; মোটর গাড়ী পাওয়াও যা, আর না-পাওয়াও তাই! একেই বলে ভবিতব্য!

তবে কিনা, আমরা কিছুতেই হাল ছেড়ে ব'সে পড়তে রাজী নই বলে শেষ পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থাই করে ফেলা গেল! আবু মোটর সার্ভিসের গাড়ী আমাদের 'দিলবারা' মন্দির পর্য্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে সিরোহী মোটর সার্ভিসের গাড়ী নিয়ে আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো।

বেরিয়ে পড়লুম আমরা সদলবলে বেলা তিনটে না বাজতেই!

পথে যেতে যেতে মোটর চালক বামভাগের একটি মন্দিরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললে—ঐটি নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একটি বিরাট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মেয়েরা শুনেই শিব-সন্দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গাড়ী থেকে উঁকি মেরে দেখলুম অতি সাধারণ একটি মন্দির। স্থাপত্যকলার কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। বললুম—৬টা বাজলেই দিলবারা মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। আগে চলো দিলবারা দেখে আসি। ফেরার পথে নীলকণ্ঠ মহাদেবের সন্ধ্যারতি দেখে ফেরা যাবে। প্রস্তাবটা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হল। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো।

আবু মোটর সার্ভিসের রিটায়ারিং রূম্ থেকে দিলবারা মন্দিরের দূরত্ব দেড় মাইলের বেশী নয়। অধিকাংশ যাত্রীই পদব্রজে যাতায়াত করে। আমরা গাড়ীতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলুম।

মন্দিরের প্রবেশ পথের মুখেই 'টেম্পল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিস'। এইখানে মাথাপিছু পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে যাত্রীদের মন্দির দর্শনের অনুমতি পত্র নিতে হয়। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত মন্দির দেখবার সময় নির্দ্দিষ্ট।* যে কোনও ভারতীয় যাত্রীকে মন্দিরে প্রবেশ

করতে দেওয়া হয়। জাতি ধর্ম্মের কোনো বাধা নেই। কেবল অভারতীয় দর্শকদের আবুর ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আদেশ পত্র না আনলে মন্দিরের মধ্যে যেতে দেওয়া হয় না। মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি জিনিস নিয়ে যাওয়া নিষেধ—যেমন ভোজ্য, পানীয়, অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠি ছড়ি ছাতা, জুতা, চামড়ার কোনও জিনিস, যেমন ক্যামেরা, বাইনোকুলার, মণিব্যাগ, চশমার খাপ, রিষ্টওয়াচ ব্যাণ্ড, ইত্যাদি। মন্দিরের মধ্যে ধূমপান শুধু নিষেধ নয়—অপরাধ বলেও গণ্য।

দুঃখের বিষয় আমাদের সঙ্গে সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তুগুলিই ছিল। মন্দিরের দ্বারপালের কাছে আমরা একটি একটি করে সবাই সব কিছু জমা রাখতে তবে আমাদের অগ্রসর হতে দিলে। কেবল টর্চ্চগুলি নিয়ে যাবার অনুমতি পেলুম। বাবাজীর ক্যামেরাটার খাপটি ছিল চামড়ার, কিন্তু যন্ত্রটি ছিল রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল ধাতু নির্ম্মিত। দ্বারপালের সঙ্গে তর্ক ক'রে কেস্‌টি তার কাছে জমা রেখে ক্যামেরাটি বার



দিলবারা মন্দিরের মণ্ডপ বা নাটমন্দির

করে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেবার আগে তিনি সেটি নিয়ে বেশ করে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে দেখলেন তার মধ্যে কোথাও চামড়ার কোনওপ্রকার কিছু সংস্রব আছে কিনা; কারণ কোনও জিনিসের সঙ্গে এতটুকু চর্ম্ম সম্পর্ক থাকলেও তা নিয়ে যাওয়া নিষেধ। বুঝতে পারলুম—এদের প্রাচীন বর্ণ-বিদ্বেষটাই বর্ত্তমানে এই চর্ম্ম বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে।

যেখানে আমাদের কাছে দক্ষিণা নিয়ে প্রবেশপত্র দেওয়া হ'ল, ঠিক তার সামনেই একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে দেখে আমরা ভেবেছিলুম এইটিই বুঝি দিলবারা মন্দির। বিশাল দেউল। প্রশস্ত পাষাণ সোপান উঠে গেছে পথ থেকে প্রায় আধ তলা উঁচু পর্য্যন্ত। মন্দিরটির আকৃতি দেখে খুব পুরাতন বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সেটি প্রথমতঃ মর্ম্মর শিলায় নির্ম্মিত নয় এবং তার স্থাপত্য কলা ও কারু কার্য্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করতে পারে। কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে এ মন্দির কখনই সেই জগদ্বিখ্যাত দিলবারা মন্দির নয়।

আমাদের অনুমান যে ভুল নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল একজন পথপ্রদর্শকের কাছে। অত্যন্ত পরিচিতের মতো কাছে এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার হিন্দীভাষায় বললে—আসুন, মন্দির দেখতে যাবেন তো আপনারা? চলুন এই পথ দিয়ে। আমি সব মন্দিরগুলি আপনাদের ভাল করে দেখিয়ে দেব।

'সব মন্দির?' প্রশ্ন করলুম 'এখানে দিলবারা-মন্দির ছাড়া আরও অন্য মন্দির আছে নাকি?'

পথপ্রদর্শক হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, 'দিলবারা' বললে তো কোনও একটি বিশেষ মন্দিরকে বোঝায় না। 'দিলবারা' শব্দটির অর্থ হ'ল 'মন্দির ভূমি' বা তীর্থস্থান। এখানে পাশাপাশি পাঁচটি মন্দির আছে, তাই এস্থানের নাম 'দিলবারা' বা 'মন্দির-তীর্থ'। অবশ্য পাঁচটি মন্দিরই সমান নয়। ওর মধ্যে প্রধান হ'ল দুটি—'বিমলশাহী মন্দির' আর 'বস্তুপাল-তেজপাল মন্দির'

বুঝলুম দিলবারা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনি। লোকটিকে সঙ্গে নিতে হ'ল।

মন্দিরের সামনে গিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। ও হরি! এর নাম 'দিলবারা'? অতি সাধারণ চুণকাম করা উঁচু পাথরের সাদাসিধা প্রাচীর। মধ্যে একটি মাঝারি রকম প্রবেশ দ্বার। কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, শিল্পকলার চিহ্ন মাত্র চখে পড়ে না কোথাও। আমাদের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। যাব কি যাব না ভাবছি। মোটর খানা ছেড়ে না দিলেই ভাল হ'ত। আমাদের নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেছে। ৬টার পর আবার নিতে আসবে বলে গেছে!

পথপ্রদর্শক ডাক দিলে—ভিতরে আসুন।

বললুম—ভিতরে এর চেয়ে ভাল কিছু দেখবার আছে কি?

লোকটি হেসে বললে—এর ভিতর দিয়ে গিয়ে বহিরঙ্গন পার হয়ে তবে আসল মন্দিরে ঢোকবার প্রবেশ দ্বার পাবেন। এটাত কিছুই নয়। মন্দিরটিকে বিধর্ম্মী শত্রুদের দৃষ্টির আড়ালে রাখবার জন্য বাইরে দিকে এ একটা ছলনার আবরণ মাত্র! এটি না থাকলে কি আপনারা কেউ আজ 'দিলবারা' এমন অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেতেন? আহম্মদাবাদের সুলতান মহম্মদ বেগরা অচলগড় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। বার বার সিরোহী আক্রমণ করেছে তারা। দিলবারার সন্ধান পেলে কি রক্ষা ছিল?

কথাগুলো নেহাৎ বাজে বা যুক্তিহীন বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রবেশ করলুম তার পিছু পিছু। বহিরঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে আমরা যখন মূল মন্দিরের মর্ম্মর তোরণ দ্বারে এসে দাঁড়ালুম—আমরা একেবারে নিস্পন্দ! বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা থাকে বলে!

প্রবেশ দ্বার খুব বড় বা বিরাট কিছু নয়। কিন্তু শ্বেত পাথরে গড়া সেই মন্দির তোরণের প্রতি ইঞ্চিটি এমন নিখুঁত ও সূক্ষ্ম শিল্প কারুর রম্য নিদর্শনে সমাচ্ছন্ন যে তা দেখে নির্ব্বাক না হ'য়ে উপায় নেই! একটুও বোঝা যায় না যে এসব পাথর। মনে হয় যেন শাদা মোমের ছাঁচে গড়া সেই ফুল লতা পাতা ও মূর্ত্তিগুলির কমনীয় সুষমা প্রখর রৌদ্রতাপে এখনি গলে যাবে হয় ত!—এমনিই পেলব কোমল তার আবেদন!

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বিমল শাহের নামে এই মন্দিরটির নাম হয়েছে 'বিমলশাহী মন্দির'। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের প্রধান সচিব শ্রীযুক্ত বিমলশাহ বারো কোটী টাকা ব্যয় করে পৃথিবীর এই পরম বিস্ময়কর মর্ম্মর দেউল নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। কথিত আছে যে তদানীন্তন আবু পর্ব্বতের অধীশ্বর প্রামারা রাজের কাছে তিনি যখন মন্দির নির্ম্মাণ উপযোগী ভূমি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন প্রামারারাজ উপেক্ষার হাসি হেসে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—"ভীমদেবের উদ্ধত মন্ত্রীকে বোলো যে প্রামারা রাজ জমী বেচ্বার ব্যবসা করে না। কতটাকা আছে তোমাদের বিমল শাহের? সমস্ত জমীটা সে যদি রজত মুদ্রায় ঢেকে দিতে পারে তাহ'লে আমি দিতে পারিএ জমী তাকে।"

মন্দির নির্ম্মাণে দৃঢ় সংকল্প বিমলশাহ সেই মূল্য দিয়েই জমী সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু কারা সেই যাদুকর শিল্পী—কঠিন পাষাণকে নিয়ে যারা এমন কোমল মাখনের ন্যায় যদৃচ্ছা রূপান্তরিত করে তাকে অপরূপ রূপ দিয়েছিলেন? মহাকালের অতল বিস্মৃতির গর্ভে তাঁরা আজ মিলিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অসামান্য সৃষ্টি আজও অক্ষয় হয়ে আছে। মন্দির দ্বার উত্তীর্ণ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম একটি মাথা ঢাকা চকমিলানো চতুষ্কোণ অলিন্দ বা চত্বরে। সমস্ত মন্দিরটির চারিপাশ ঘিরে আছে এই প্রশস্ত চত্বর। চত্বরের কোলেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি গম্বুজাকৃতি মণ্ডপ এবং এই মণ্ডপের সমুখেই প্রধান মন্দিরটি স্থাপিত।

মন্দির প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ হ'লেও আয়ত ক্ষেত্রের (Oblong) আকার। চারপাশের অলিন্দটি অঙ্গন থেকে আন্দাজ একফুট উঁচু। মণ্ডপের সমতল ভূমিও অঙ্গন থেক অন্ততঃ একধাপ অর্থাৎ প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচু। আর প্রধান মন্দিরের চত্বর প্রায় দু ফিট উঁচু। তিনটি ধাপ বেয়ে তবে মন্দিরের চত্বরে উঠতে হয়। অঙ্গনটি দৈর্ঘ্যে ১৪০ ফিট এবং প্রস্থে ৯০ ফিট। চারপাশের অলিন্দ আন্দাজ ৮ফিট চওড়া। এই অলিন্দের ছাদটিকে ধরে আছে ৪৮টি স্তম্ভ।

পূর্ব্বেই বলেছি অলিন্দের কোলেই মন্দিরের প্রাঙ্গণ, কিন্তু অলিন্দের পিছনেই মন্দিরের উচ্চপ্রাকার বেষ্টনী। বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য প্রাকার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, কিন্তু মন্দিরে ঢুকে এই প্রাকারের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উল্টো পিঠে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পার্শ্ব পরিবৃত অলিন্দের পিছনে সারি সারি পরের পর ৫২টি ছোট ছোট প্রাকারগাত্রে



মণ্ডপের মধ্যে

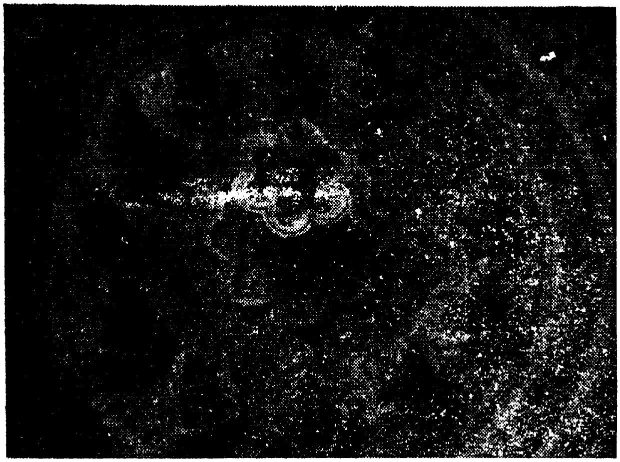
অন্তঃপ্রবিষ্ট মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের দরজার দুপাশে জোড়া জোড়া অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের থাম। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে।

আমরা প্রথমেই এই দীর্ঘ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে চারপাশের প্রত্যেক ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে ঢুকে ঢুকে সেই ৫২টি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দর্শন করলুম। অলিন্দের ছাদের নিম্নভাগ (cielings) এক একটি ছোট ছোট চতুষ্কোণ চন্দ্রাতপে বিভক্ত। ছাদের এই অভ্যন্তর ভাগের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণস্থাপত্যকারুগুলি, প্রত্যেক ছোট বড় শিল্প সমুৎকীর্ণ স্তম্ভটি এবং একস্তম্ভ থেকে অপরস্তম্ভের শীর্ষদেশে যে বিচিত্র কারুখচিত পুষ্পধনু আকারের তোরণ-মালা সংযুক্ত সে সব দেখতে দেখতে বিস্ময়বিমুগ্ধ ও মোহাভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়।

স্মৃতিপথে ভাস্বর হয়ে উঠছিল বহুকাল আগে পড়া Abbe Dubois

এর Memoirs of Travels in India. তিনি এই মন্দির দেখে লিখে রেখে গেছেন—"The sight alone of these enchanting beauties is sufficient to intoxicate the senses of the blessed and to plunge them into a perpatual ecstacy that is far superior to all mere earthly pleasures.

এই অধ্যাত্মলোকের ভাবুক সাধক, ধর্ম্মগতপ্রাণ বিদেশী সন্ন্যাসী—



অলিন্দের ছত্রতলের একটি চন্দ্রাতপ



প্রধান মন্দির

শতাব্দী আগে যা লিখে রেখে গেছেন তার একবর্ণও অতিরঞ্জিত মনে হয় না। যথার্থই এই মন্দিরের মোহিনীরূপ ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য শুধু একবার চোখে দেখবার সৌভাগ্য হবে যার, সে ভাগ্যবানের সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপমদে বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং তার সমস্ত চিত্ত এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে তন্ময় হয়ে পড়বে, কোনও পার্থিব সুখের সঙ্গেই সে অনুভূতির তুলনা করা চলে না। পরিপূর্ণ প্রসন্নতায় ভরা সে যেন এক লোকোত্তর পরমানন্দ!

আলোক চিত্রে এ অলোকসামান্য মন্দিরের সমগ্র সৌন্দর্য্য ধরা পড়ে না। কুন্দধবল তুষারশুভ্র শিলায় গড়া সৌন্দর্য্যে ঝলমল দেউলটি এই। মর্ম্মর-স্বপ্ন তাজমহলের অনুপম কারু-কার্য্যও এর পাশে যেন ম্লান হয়ে যায়। দিলবারার শিল্পীরা যেন সিদ্ধ কারুমন্ত্রে জড় পাষাণকে জীবিত করে তুলেছেন! কঠিন পাথর যেন তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া লেগে সদ্যবিকশিত পুষ্পগুচ্ছের মতো স্তরে স্তরে অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে উঠেছে! নবনীত কোমল যেন তার সুকুমার পরশ, পেলব কমনীয় যেন তার লাবণ্যের সুষমা। মনে হয় বুঝিবা—'সহেনা ভ্রমর চরণ ভর!'

প্রত্যেকটি পাষাণ স্তম্ভের মূলপ্রান্ত থেকে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত এত রকমের বিচিত্র কারুকার্য্যে মণ্ডিত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয়—না জানি শিল্পীর কত যুগযুগান্ত কেটে গেছে এই এক একটি স্তম্ভ উৎকীর্ণ করতে। প্রত্যেকটি মর্ম্মর-তোরণ-মালিকা এবং ছাদের নিম্নভাগের প্রত্যেক ছত্রী বা চন্দ্রাতপতল (ceiling) এমন বিভিন্ন কারুকার্য্য খচিত যে সেই শিল্প শোভার দিকে মাথাটি পিছনে হেলিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যায়, তবু যেন দেখে আশ মেটে না! সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়কর হল এই, যে—প্রত্যেকটির পরিকল্পনাই নূতন ও স্বতন্ত্র! কোনোটিই কোনোটির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়!

ক্রমশঃ

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—ছয়—

নাজীপুর থানা থেকে রঞ্জুর বাবা বদলি হলেন।

চাকরীতে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। মফঃস্বলের একটি ছোট থানা থেকে একেবারে সদরের অফিসার ইন্‌-চার্জ হলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল বাঁধাছাঁদার পালা। লীলাঞ্চলা আত্রাই, ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়ার গাছটা, স্কন্ধকাটার হাইতোলা মজে-আসা আলেয়াদীঘি, রবিশস্যে ভরা ইস্কুলে যাওয়ার মাঠটা, মশানীর মন্দির, কবিরাজের বড় আমবাগানটা আর অবিনাশবাবুর ভাঙা আশ্রম; বাদল, অশ্বিনী, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উমা, নিশিকান্ত আর অবিনাশবাবুর ওপর দিয়ে চিরদিনের মতো যবনিকা নেমে এল।

ছেড়ে আসতে খুব কি দুঃখ হয়েছিল রঞ্জুর? না। এই ছোট গ্রাম, এই থানা, এই গঞ্জ। এর বাইরে আর একটা বিশাল এত বিশাল, যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারে না—একটা দেশ আছে। তার উত্তর-পূর্বে কারাকোরাম, হিন্দুকুশ, হিমালয় আর খাসিয়া জয়ন্তীয়ার অলঙ্ঘ্য বিস্তার, তার দক্ষিণে গাঢ় নীল ঢেউ নিয়ে নেচে নেচে খেলা করছে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর। কলকাতা, কাশী, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। সে এক আশ্চর্য দেশ, সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। মানচিত্রের ওপরে নানা রঙের ছাপ আর নানা বিচিত্র নামের ভেতরে রঞ্জু তাদের নাজীপুরের নাম কোথাও খুঁজে পায়নি। এই বিপুল দেশের কাছে তাদের নাজীপুর কত ছোটো, কত নগণ্য!

মনে আছে রঞ্জু এই ভারতবর্ষের ডাক শুনতে পেয়েছিল। ডাক শুনেছিল হিমালয়, হিন্দুকুশ, কারাকোরামের, আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগরের। পৃথিবীর পথে যাত্রা সুরু হল তার। ধুলো-ভরা যে মেটে পথটা উঁচু উঁচু তালগাছের হাতছানিতে তার মনটাকে বারে বারে নিয়ে গেছে পাশাবতীর পুরীতে, শঙ্খমালার দেশে, একদিন সন্ধ্যাবেলা গোরুর গাড়ীতে করে সেই পথ দিয়ে রঞ্জু বেরিয়ে পড়ল মানচিত্রে আঁকা আশ্চর্য দেশটার সন্ধানে।

গোরুর গাড়ির পেছনে ছইয়ের ভেতরকার ছোট কাটা জানলাটা দিয়ে ঘুম-ঘুম বিহ্বল চোখ মেলে সে দেখছিল একটু একটু করে কেমনভাবে নাজীপুরের দুটো-চারটে মিটমিটে আলো ক্রমশ পেছনে সরে যাচ্ছে। শুধু অন্ধকারে কবিরাজের আমবাগানটাকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে এখনো, যেন শেষবারের মতো মাথা নেড়ে নেড়ে কারা যেন কী একটা কথা বলতে চাইছে রঞ্জুকে। রঞ্জুর গা ছম ছম করে উঠল, ভয় করতে লাগল। মুহূর্তে সে ছইয়ের ভেতরে মাথাটা টেনে নিলে, তার পর মার কোলে মুখ বুজে শুয়ে পড়ল। আর অনুভব করতে লাগল অসমতল এলোমেলো রাস্তায় গাড়িটা কেমন মাতালের মতো টলতে টলতে অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

অন্ধকার আর অনির্দেশ পৃথিবী। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ের তুষার তীর্থের পথে।

* * * *

শহর। যেখানে ঘোড়ার গাড়ী আছে, মোটর আছে, রেলের ইস্টিশন আছে। যেখানে দোতলা-তেতলা মস্ত মস্ত দালান, যেখানে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধানো, যেখানে রাস্তার পাশে পাশে রাত্তিরে আলো জ্বেলে দিয়ে যায়। যেখানে সাবধানে চোখ চেয়ে পথ না চললে তুমি গাড়ি চাপা পড়তে পারো, অন্য মানুষের সঙ্গে তোমার গায়ে ধাক্কা লাগতে পারে। রঞ্জুর জীবনে সেই প্রথম শহর। নাম—ধরা কি মুকুন্দপুর।

নিতান্তই মফঃস্বল শহর। শ্রী নেই, রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই। বর্তমানের চাইতে অতীতের জীর্ণ একটা সোঁদা গন্ধই যেন চারদিকে পাক খেয়ে বেড়ায়। ধুলো আর

অপরিচ্ছন্নতা। কাঁচা ড্রেনে দুর্গন্ধ সবুজ কাদা। পচা পুকুর আর জংলা আমের বাগান। পাড়াগুলো অনাবশ্যক ভাবে দূরবিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট—যেন একটা দেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে খামখেয়ালের বশে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলিকে এদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর কাছে সেই প্রথম শহর। এর জীর্ণ নিরানন্দ রূপ প্রথম দৃষ্টিতেই যেন তাকে জয় করে নিলে। নাজীপুরের তুলনায় কত বিরাট, কত বিচিত্র! তার কুন্দপুরের চাইতে বহু দূরের শহর কলকাতা অনেক বড়, অনেক আশ্চর্য—এ কথা তার বিশ্বাস হত না, এ কথা ভাবতে তার কষ্ট হত।

শহরের সঙ্গে পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠতে না উঠতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। একটা বিপ্লব দেখা দিলে সংসারে। এতদিনের নিশ্চিন্ত সহজ জীবনে জটিলতার গ্রন্থি-বন্ধন অনুভব করলে রঞ্জু।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় থানা থেকে বাবা যখন কোয়ার্টারে ফিরলেন তখন তাঁর সমস্ত মুখ থম থম করছে। শুভ্র বিস্তীর্ণ ললাটে কতগুলো কালো কালো রেখা ফুটে উঠেছে, একদিনের মধ্যে যেন কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে বাবার। সেদিন বাড়ির ছোট বোনগুলো পর্যন্ত চেঁচিয়ে কাঁদতে সাহস পেল না, আস্তাবল থেকে ঘোড়ার সহিসটার সিদ্ধি খাওয়া গলায় রামায়ণের সুর শোনা গেল না, বড়দার ঘরে সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত গানের মজলিশ বসল না, ঠাকুরমা গলা খুলে একবারও চেঁচিয়ে উঠলেন না। একটা অশুভ আর অনিশ্চিত আশঙ্কায় সমস্ত বাড়িটা ডুবে রইল স্তব্ধতার মধ্যে।

কয়েক মাসের ভেতরেই যেন অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে পাক খেয়ে গেল পৃথিবীটা। সেই সব দিনগুলো ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির মতো (রঞ্জু তখনো সিনেমা দেখেনি) পর পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অপসারিত হয়ে গেছে, একটার পর আর একটা জড়ানো—সবগুলো মিলে এইটে মনে পড়ে—বাবার চাকরী গেল।

আঠারো বছর সুখ্যাতি আর সুনামের সঙ্গে কাজ করে তাঁর চাকরী গেল। যতদূর মনে আছে এস্-পির সঙ্গে কী একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বাঙালী পুলিশ সাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল এবং তার ফলে যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

লজ্জায়, অপমানে এবং অবিচারের ক্ষোভে বাড়িতে মৃত্যুশোকের ছায়া নেমে এল। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল, বন্দুক রিভলবার রইল না, ঘোড়াটা বিক্রী করে দিতে হল। তারপর আশ্রয় নিতে হল শহরের প্রান্তে একটা ভাঙা বাড়িতে।

মা বললেন, এখানে থেকে আর কী হবে? চলো, দেশে চলে যাই।

বাবা কঠিনভাবে বললেন, না।

—কিন্তু এখানে থাকা কত বড় অপমান সে কি বুঝতে পারছ না?

বাবা বললেন, না। অপমান এতদিন ছিল, এবার সে অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সেইদিন রাত্রে রঞ্জুর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল একটা।

সন্ধ্যার পরেই বাড়ির যত বিলাতী কাপড়, পুলিশী ইউনিফর্মের অবশেষ, একগাদা টুপি, দু-তিনখানা রাজভক্তির সার্টিফিকেট স্তূপাকার করে উঠোনে জড়ো করা হল।

ঠাকুর মা আর্তনাদ করে উঠলেন: খোকা, এ তুই করছিস কী। এত দামি দামি সব কাপড় জামা—

বাবার গলার স্বর পাথরের মত শক্ত শোনাল: তুমি চুপ করো মা।

কিন্তু দু তিনশো টাকার জিনিস-পত্তোর—

—অপমানের শেষ চিহ্নটুকুও রাখব না। অনেক আবর্জনা জমেছিল, আজ পুড়িয়ে পরিষ্কার করে দেব।

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন ঠাকুরমা। তারপর জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে উঠে চলে গেলেন ঘরের মধ্যে। তাঁর আবার হাঁপানির টান উঠেছে। তবু সে অবস্থাতেও ঘরের ভেতর থেকে তাঁর একটা অব্যক্ত আর অস্পষ্ট কান্না-ভরা বিলাপ শোনা যেতে লাগল।

বাবা কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজের হাতে আধ টিন কেরোসিন এনে ঢেলে দিলেন কাপড়ের স্তূপের ওপর, জ্বেলে দিলেন দেশলাইয়ের কাঠি। আগুন নেচে উঠল।

অন্ধকার উঠোনটা উল্লসিত হয়ে উঠল অতি তীব্র খানিকটা আলোর দীপ্তিতে। উঠোনের বেঁটে পেয়ারা

গাছটার মাথা ছাপিয়ে শিখাগুলোর সরীসৃপ রেখা আকাশের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। কাপড়, আলপাকা, পট্টু, তুলো আর পোড়া কেরোসিনের দুর্গন্ধে বিস্বাদ হয়ে হয়ে উঠল বাতাস। অনেক অপমান, অনেক পাপ—এক সঙ্গে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

বাবা নিশ্চল একটা মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইলেন। আগুনের একটা লাল আভা এক একবার তাঁর মুখের ওপরে পড়ে সরে সরে যেতে লাগল, কেমন আশ্চর্য আর ভয়ঙ্কর মনে হতে লাগল তাঁকে। আর মাঝে মাঝে তাঁর চোখ সম্মুখের ওই আগুনটার চাইতেও শাণিত হয়ে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। সেই চোখ, ঠিক সেই চোখ—যে চোখ সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—সেই তিরিশ সালের বন্যার সময়। রঞ্জুর কেমন ভয় ধরেছিল, কেমন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে যেন অকারণে মনে হয়েছিল বাবা যেন আজ প্রকৃতিস্থ নেই। তাঁকে যেন আজ ভূতে ধরেছে, একটা প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। সেকি অবিনাশবাবুর প্রেতাত্মা?

যতক্ষণ আগুনটা জ্বলল ততক্ষণ বাবা তেমনি নিশ্চল হয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তারপর একটা উত্তপ্ত অন্ধকারে উঠোনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল, একটা রক্তাক্ত ক্ষতের মতো কিছুক্ষণ ধরে দপ দপ করতে লাগল বিস্তীর্ণ একটা অগ্নিশয্যা, বাতাসে পোড়া ছাইগুলো এলো-মেলোভাবে উড়তে লাগল।

সেই রাত্রেই বাবা ওদের তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

লণ্ঠনের আলোয় বাবার আর এক মূর্তি সেই যেন প্রথম চোখে পড়ল রঞ্জুর। মেজেতে একখানা হরিণের চামড়ার আসন পেতে তিনি বসেছেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গ দেহে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ধপ ধপ করছে, একটা অপূর্ব শুচিতায় প্রশস্ত কপাল জ্বল্ জ্বল্ করছে তাঁর। আঠারো বছরের জমাট গ্লানি থেকে সত্যিই আজ মুক্তিস্নান হয়েছে যেন। আঠারো বছর ধরে বাবার এইরূপ, এই ব্রাহ্মণোত্তম মূর্তি কোথায় লুকিয়েছিল?

সামনে বসে মা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব পড়ছিলেন। ছেলেদের পায়ের শব্দে তিনি বিষণ্ণ চোখ তুলে তাকালেন। তারপর মহাভারত বন্ধ করে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাবা বললেন, বোসো তোমরা।

তিন ভাই সভয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালো। কেমন অভিভূত হয়ে গেছে তারা। ঘরে ধূপ জ্বলছে, কোথা থেকে চন্দনের সুগন্ধ আসছে। যেন ঠাকুর ঘরের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একটা। তিন ভাই কুণ্ঠাভরে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্যদিন হলে হয়তো বাবা একটা প্রচণ্ড ধমক দিতেন। কিন্তু ওই হরিণের চামড়ার আসন, গলার ওই ধবধবে পৈতেটা, চন্দন আর ধূপের গন্ধ—সব মিলিয়ে যেন সব কিছুর একটা আশ্চর্য রূপান্তর হয়ে গেছে। প্রশান্ত স্বরে বাবা আবার বললেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো সব ওখানে।

সসঙ্কোচে তিনজনে বসল। বসল মাটিতে চোখ নামিয়েই। বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো শিক্ষা অথবা সৎসাহস ওরা এ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে নি।

—তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি।

তিন জোড়া কাণ উৎকর্ণ হয়ে রইল।

আস্তে আস্তে বাবা বললেন, আজ তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

তিন জোড়া চোখ একবারের জন্যে একটুখানি উঠেই আবার মাটির দিকে নেমে গেল। বিস্ময়ে ওদের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, একটা বিশ্রী অস্বস্তি ওদের পীড়ন করছে।

—প্রতিজ্ঞা করতে হবে জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না। আর মনে রাখতে হবে যাদের কাছে ন্যায় নেই, বিচার নেই, তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না।

যন্ত্রচালিতের মতো তিন ভাই উচ্চারণ করলে, প্রতিজ্ঞা করলাম।

প্রতিজ্ঞা! রঞ্জু জানে সবচেয়ে সার্থক প্রতিজ্ঞা, সব চাইতে বড় সংকল্প সেদিন সে উচ্চারণ করেছিল। এর গুরুত্ব সেদিন সে বুঝতে পারে নি, সেদিন এর বিন্দুমাত্রও তার পক্ষে অনুমান করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা ভুলতে পারে নি। ঠাকুর ঘরে ঢুকে দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মিথ্যা বলতে পারা যায় না, তেমনি

ধূপ-চন্দনের গন্ধে ভরা শুচিতার আবিষ্ট সেই ঘরটিতে, হরিণের চামড়ার আসনে বসে থাকা সেই উজ্জ্বল দীপ্ত মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে সংকল্প সে নিয়েছিল, তার অনিবার্য নির্দেশের লৌহ-তর্জ্জনা প্রসারিত হয়ে রইল তার আগামী ভবিষ্যতের দিকে।

শিলালিপিতে আর একটি আঁচড় পড়ল।

এইবারে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর মাটিতে পা দিল রঞ্জু।

এতদিন একটা গণ্ডি ছিল তার—নিষেধের একটা বেড়া টানা ছিল চারদিকে। এইবার খোলা পৃথিবী থেকে দমকা বাতাসের ঝাপটা এল একটা, যে বেড়ার আর চিহ্নমাত্র রইল না। প্রকাণ্ড জগৎটাকে দেখতে চেয়েছিল রঞ্জু, তাই সে প্রকাণ্ড জগতের মানুষগুলো তার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।

স্রোতের মতো চলে গেছে সময়, দু বছর বয়েস বেড়েছে রঞ্জুর। নতুন পরিবেষ্টনীর সঙ্গে অভ্যস্ততা পুরোণো হতে হতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বাবা একটা জমিদারী কাছারীতে ম্যানেজার হয়ে বসেছেন—মধ্যবিত্ত জীবনের অপ্রাচুর্য এখন আর কষ্ট দেয় না। ভাতের সঙ্গে গাওয়া ঘি না হলেও এখন রঞ্জুর খাওয়া হয়, ক্ষীরের মতো দুধ না হলে এখন আর কান্না পায় না, মাসে মাসে নতুন জামা জুতো এল কিনা সে সম্পর্কে এখন আর সজাগ থাকবার দরকার আছে মনে হয় না। ছেঁড়া প্যান্ট, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো—পাড়ার মধ্যবিত্ত ছেলেদের সঙ্গে সে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

পাড়ার নাম মনসাতলা। নামটা হওয়ার একটা কারণ আছে। এই পাড়ার চৌমাথার তিনকোণা একটা দ্বীপের মতো একফালি জমি ছিল। কতদিন আগে কে জানে—কোনো এক পুণ্যবান ব্যক্তি এখানে বট অশ্বত্থের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই দুটি গাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে, রচনা করেছে বিস্তীর্ণ একটা বিশাল ছায়াচ্ছন্নতা। এই জোড় গাছের তলায় প্রায় প্রতি বছর ঘটা করে মনসা পুজো করা হয়, বিষহরির গান হয়। তাই পাড়ার নাম হয়েছে মনসাতলা।

এই মনসাতলার শান্ত ছায়ার নীচে কী মনে করে মিউনিসিপ্যালিটি লম্বা একটা সিমেন্টের বেঞ্চি তৈরী করে দিয়েছে। ফলে এটা হয়েছে সকাল দুপুর সন্ধ্যায় পাড়ার সকলের একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই জায়গাটা ছেলেদের দখলে থাকে। বেঞ্চিটা যখন প্রথম তৈরী করা হয়, তখন কাঁচা সিমেন্টের ওপর কোনো এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা (ছেলেরা তাঁর কাছে অসীম কৃতজ্ঞ) ষোলো ঘুটি বাঘবন্দীর গোটা কয়েক ছক তৈরী করে রেখেছিলেন। ছেলেরা মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা থেকে খোয়া কুড়িয়ে এনে সেখানে দলে দলে খেলতে বসে যায়, ছাগলের চক্রব্যূহে বাঘকে বন্দী করে ফেলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে। বেঞ্চিটার নীচে মাটিতে সারি সারি ছোট ছোট গর্ত—বেশ যত্নসহকারে গর্তগুলোকে নিখুঁত গোলাকার করবার চেষ্টা হয়েছে। সকালে বিকালে এবং রবিবারের সমস্তটা দিন ধরে সেখানে মার্বেল খেলা চলে।

মার্বেল খেলার সে সব সাংকেতিক বাক্যগুলো আজও দুটো চারটে মনে পড়ে। ইংরেজি ভাষার অমন অপূর্ব সদ্ব্যবহার বোধ হয় আর কোনো ক্ষেত্রে কোনো দিন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'সিংগিল্ মেলালিং' মেলালিং এও না।

"উড্ডু কিপ্"—(মার্বেল মাটি উঁচু করে বসিয়ে দাও।)

"হাত ইস্টেট"—(হাত উঁচু করে ইচ্ছেমতো মারো।)

"ঠ্যাকাউন্স্ বাই ফর্‌টি ফিপ্‌টি হাণ্ড"—(আটকে দিলেই মার্বেল চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।) এই বিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠত মার্বেলের ঠকাঠক শব্দ। কে কতটা মার্বেল ফাটাতে পারত এই ছিল কৃতিত্বের সব চাইতে বড় পরীক্ষা।

সন্ধ্যার পরে যখন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বাঘবন্দীর 'কোট' আর মার্বেলের গর্ত ছেড়ে ছেলেদের বাড়ি ফিরে পড়তে বসতে হত, তখন এই মনসাতলায় এসে বসতেন পাড়ার অভিভাবকেরা। সাধারণ মফঃস্বল শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তদের মতোই তাঁরা আদালত আর কাছারী নিয়ে আলোচনা করতেন, রাজনীতির শ্রাদ্ধ করতেন, সুযোগমতো ফিস্‌ফাস করে পরের হাঁড়ির খবরাখবর নিয়ে গবেষণা করতেন, মিউনিসিপ্যাল্ কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা পর্যালোচনা করে আগামী নির্বাচনে সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করবার পরিকল্পনা নিতেন। আর মাঝে মাঝে মার্বেল

খেলার গর্তে পা পড়ে কেউ কেউ যখন হোঁচট খেতেন তখন তাঁদের উত্তেজনা আরো বেশি বেড়ে উঠত। জাতির এই সব অপোগণ্ড বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্গতি সম্বন্ধে তাঁরা দৈববাণী করতেন এবং স্থির করতেন, পরের দিন মার্বেল খেলতে এলেই হতভাগাগুলোকে ঠেঙিয়ে হাড়ভেঙে দেবেন।

কিন্তু আগের রাত্রির কথা পরের দিন তাঁদের মনে থাকত না। আর বেলা সাড়ে আটটা না বাজতেই হৈ হৈ করে মার্বেল নিয়ে ছেলের দল এসে পড়ত।

এই দলের যে পাণ্ডা ছিল তার নাম ভোনা।

বেঁটে চেহারার ছেলে, শরীরের ওপরের দিকটার চাইতে নীচের দিকটা বেশি মোটা। পায়ের পাতা দুটো এত বেশি বড় যে সেই বারো তেরো বছর বয়েসেই ভোনা তার বাবার একটা পুরোণো ছেঁড়া চটি পরে আসত। খেলার সময় যখন দৌড়োত, তখন হাতীর চলার মতো শব্দ উঠত থপ থপ করে। গালের ডানদিক দিয়ে সব সময়ে বেরিয়ে থাকত জিভের ডগাটা—মনে হত সারাক্ষণ যেন কাউকে ভেংচে চলেছে সে।

আর মুখখানা। ওরকম পাকামিভরা মুখ হাজারে একটি মেলে কিনা সন্দেহ। নীচের ঠোঁটে কয়েকটা কালো কালো দাগ পড়েছিল তার—ছেলেরা বলত ভোনা লুকিয়ে বিড়ি টানে। আর হিন্দুস্থানীরা খৈনি খেয়ে যেমন করে থুথু ফেলে, তেমনি করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলত সে। অভ্যেসটা কোত্থেকে আয়ত্ত করেছিল সেই জানে।

মার্বেল খেলায় ভোনার হাত ছিল পরিষ্কার। দৈনিক অন্তত দুগণ্ডা করে সে মার্বেল জিতত, ষোলো ঘুঁটি বাঘবন্দী খেলায় তাকে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। তা ছাড়া অজস্র কথাবার্তা বলতে পারত চোখেমুখে, আর কোমর দুলিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে নেচে নেচে আলিবাবার গান গাইত :

"ছি: ছি: এত্তা জঞ্জাল
এত্তা বড়া উঠানমে এত্তা জঞ্জাল—"

বলা বাহুল্য, ছেলেদের মধ্যে নেতা হওয়ার পক্ষে এই গুণগুলোই যথেষ্ট। বাপের জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে বাপের মতোই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ভোনা। কিন্তু সে গুণাবলী ক্রমশ প্রকাশ্য।

রঞ্জুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা যেভাবে হওয়া উচিত সেই ভাবেই হল। একটা প্রকাণ্ড লাট্টু নিয়ে বন্ বন্ করে ঘোরাচ্ছিল ভোনা, আর মাঝে মাঝে সেটাকে হাতের তেলোতে তুলে নিয়ে সকলকে গুণমুগ্ধ করে তুলছিল। তারপর হঠাৎ রঞ্জুর দিকে চোখ পড়তেই প্রশ্ন এল : এই গঙ্গাফড়িং, তোর নাম কিরে?

অপমানে কাণ লাল করে রঞ্জু ফিরে যাচ্ছিল, ভোনা এসে তার কাঁধে হাত দিলে।

—আরে চটছিস কেন? তোকে গঙ্গাফড়িং বললাম, তুই না হয় আমাকে ভোঁদড় বলবি। চটাচটির কী আছে ভাই? এই নে—কামরাঙা খাবি?

এরকম লোকের ওপরে রাগ করা শক্ত। রঞ্জু হেসে ফেলল।

—হাসি ফুটেছে? আ:—বাঁচালি। কারো গোমড়া মুখ দেখলে বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। নে—খা এই কামরাঙাটা। ভয় নেই, টক নয়। পিটার সাহেবের বাগান থেকে চুরি করা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি।

ভাব হয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় যেন বাধে রঞ্জুর। মনসাতলার অন্যান্য ছেলেদের মতো—ভোনাকে তার ভালো লাগে, একধরণের শ্রদ্ধাও আছে তার সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ওপরে। তবু কোথায় যেন মনের দিক থেকে মস্ত একটা বাধা আছে, ভোনাকে সে ঠিক গ্রহণ করতে পারে না!

বৈশাখের দুপুর। ইস্কুলে গরমের ছুটি—বাড়ি থেকে পালাবার সুযোগ এবং অবকাশের অভাব হয় না। আম-বাগানে ছেলেদের আড্ডা জমেছিল।

একরাশ কাঁচা আম জড়ো করা হয়েছে। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লঙ্কার গুঁড়ো আর লবণের সাহায্যে সেগুলোর সদ্গতি করা চলেছে। টকে আর আরামে একধরণের মুখভঙ্গি করে ভোনা বললে, এই থাঁদু, রায় বাড়ির বিমলি কী করেছে জানিস?

থাঁদু ভোনার প্রধান সহচর। আগ্রহভরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কী করেছে রে?

তারপর তেমনি চোখ আর মুখের ভঙ্গি করে, জিভটাকে বিচিত্র ধরণে বের করে কতগুলো কথা বলে গেল ভোনা। সে কথাগুলো রঞ্জুর কাছে অপরিচিত—

সে সব কথা মনে করতে গেলে আজও সর্বাঙ্গ যেন কুঁকড়ে আর শিউরে আসতে চায়। তাদের অর্থ সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা ভাবে কী একটা ইঙ্গিত তার চেতনার ভেতরে নাড়া দিয়েছিল সেদিন। রঞ্জুর কান গরম হয়ে উঠেছিল, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল, হৃৎপিণ্ডটা যেন আচম্‌কা ভয় পেয়ে ধক্ ধক্ করে উঠেছিল বার কয়েক। তারপর রঞ্জু আর সেখানে বসতে পারে নি, সোজা এক ছুটে পালিয়ে এসেছিল বাড়িতে। বহুদিন পরে মনে হয়েছিল, আজ যেন আবার পেছনে পেছনে সেই হাড়গিলা পাখিটা কক্ কক্ করে তেড়ে আসছে।

পেছন থেকে ভোনা, খাঁদু এবং অন্যান্য ছেলেদের অট্টহাসি ভেসে আসছিল। ওরা কৌতুক বোধ করেছে। বিদ্রূপ করে বলছে: কাপুরুষ!

কাপুরুষ! তা হোক। ও কথাটায় তখন লজ্জা হয়নি।

বাড়ি ফিরে এল রঞ্জু। খিড়কি দরজার পেছনে যেখানে ছাইয়ের মস্ত একটা গাদা জমেছে; রান্না ঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে চাল থেকে ঝরা বৃষ্টির রেখায় সবুজ ছ্যাত্‌লা ধরা জমিতে যেখানে গজিয়েছে ছোট বড় কতগুলো ব্যাঙের ছাতা; এলোমেলো কচু গাছের সঙ্গে ঢোঁড়া কাটা সাপের মতো লম্বা লম্বা বুনো ওলের ডাঁটা উঠেছে আর সবটা মিলে ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে নতুন ফুলে ভরা বড় বাতাবী লেবুর গাছটা—সেখানে, সেই নির্জনতা ঘেরা আবর্জনার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল রঞ্জু।

কান দুটো তখনো তার ঝাঁঝাঁ করছে, তখনো কপাল বেয়ে তার টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। ক্লেদাক্ত, অপরিচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে সেই প্রথম একরাশ কাদা ছিটকে লাগল মালঞ্চমালা, কঙ্কাবতী আর পাশাবতীর সাত রঙে আঁকা কল্পনার অপরূপ ছবিতে। নরনারীর ভেতরে সব চাইতে স্থূল, জৈবিক সম্বন্ধের কুশ্রী চিত্রটা কদর্য রূপ নিয়ে তার চোখের সামনে একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মতো ভাসতে লাগল।

রঞ্জুর মনে হল আজ সে পাপ করেছে। মিথ্যে কথা বলা নয়, পড়ার বইয়ের আড়ালে গল্পের বই লুকিয়ে মা-কে ফাঁকি দেওয়াও নয়। তার চাইতে এ অনেক বড় অন্যায়, ঢের বেশি অপরাধ। এ অপরাধের জন্যে তার ক্ষমা নেই—কারো চোখের দিকে সে আর চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। রঞ্জুর কান্না পেতে লাগল, হাতজোড় করে বলতে ইচ্ছে করল, ঠাকুর, আমায় মাপ করো, আর কোনোদিন আমি ভোনার সঙ্গে মিশব না।

নিজের অপরাধের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে অনেকক্ষণ সেই ছাই গাদার ওপরে বসে রইল রঞ্জু। তারপরে যখন খেয়াল হল তখন বাতাবী লেবু গাছটার হাল্‌কা ছায়া ঘন হয়ে এসেছে, ফুলের গন্ধে বাতাস যেন থেমে দাঁড়িয়েছে, তিন চারটে শালিক পাখি নেচে নেচে ব্যাঙের ছাতার তলায় তলায় কেঁচো খুঁজছে, আর একটু দূরের রেল লাইন দিয়ে বিকেল পাঁচটার প্যাসেঞ্জার গাড়িটা ঝরাং ঝরাং করে চলেছে কাটিহারের দিকে।

উঠোনে ঢুকতেই প্রথমে মায়ের নজর পড়ল।

এগিয়ে এসে মা কপালে হাত দিলেন: কি রে, তোর হয়েছে কি? চোখ ছল ছল করছে কেন? জ্বর আসছে নাকি?

—না।

মার তবু সংশয় যায় না।—না বললেই শুনব? যা বাঁদর ছেলে হয়েছে, সারা দুপুর খালি টো টো করে বেড়ানো, আর যত ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে কাঁচা আম খাওয়া। আজ রাত্রে আর ভাত পাবে না।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, না মা, আর আমি দুপুরে বেরুব না, ওদের সঙ্গেও মিশব না।

মা হেসে ফেললেন: খুব সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ভাত বন্ধ করার নামেই বুঝি? আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে, এখন হাত পা ধুয়ে পড়তে বোসো গে।

(ক্রমশঃ)



বঙ্গ-বিভাগ ও পশ্চিম বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জ্জন যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালাকে পৃথক করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন, সমগ্র বাঙ্গালাদেশ সেই ঘোষণার প্রতিবাদে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর ১৬ই অক্টোবর যখন সত্য সত্যই বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল, সেদিন সারা বাঙ্গালার বিক্ষুব্ধ নরনারীর মুখে অন্ন উঠিল না। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আশ্বিনের সেই অরন্ধনের এবং বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীর মিলিত অভিযানের প্রতীক রাখীবন্ধন উৎসবের কথা বঙ্গবাসী আজও ভুলিতে পারে নাই। জাতীয় জীবন উষার প্রথম অরুণোদয়ের রক্তাক্ত স্মৃতি আজও জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর মনে সোনার অক্ষরে লিখিত আছে।

সেই বাঙ্গালীই যে আবার বাঙ্গালাকে ভাগ করিবার জন্য সংগ্রাম সুরু করিবে, ইহা সত্যই ভাবা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থার সহিত যাঁহাদের এতটুকু পরিচয় আছে, তাঁহারা বুঝিবেন যে কতখানি বেদনা এবং হতাশা লইয়া বাঙ্গালার হিন্দুরা আজ মাতৃঅঙ্গচ্ছেদের দাবী জানাইতেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন বিদেশী শাসকসম্প্রদায়, বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে সেদিন কোন ভেদাভেদ ছিল না। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সেদিন হিন্দুনেতা সুরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি নেতৃত্ব করিয়াছিলেন মুসলিম নেতা লিয়াকৎ হোসেন ও আবদুল রসুল। আজ হিন্দুরা এই প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠতার লাঞ্ছনায় সকল দিক হইতে নিগৃহীত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে বাঙ্গালার মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৪.৭ জন এবং অমুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৪৫.৩ জন (ইহার মধ্যে ৪১.৬ ভাগ হিন্দু)। এই সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে মুসলমান জনসাধারণের প্রতিভূ সাজিয়া লীগদল বাঙ্গালার গদীতে গত ১০ বৎসর ধরিয়া কায়েমী হইয়া বসিয়াছেন এবং মুসলিম জনগণের হৃদয় জয় করিবার অস্ত্র হিসাবে হিন্দু-বিদ্বেষ মূলধন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে হিন্দুস্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। বাঙ্গালায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান নাই এমন নয়, এখনও এই প্রদেশে বহু মুসলমান আছেন যাঁহারা মনেপ্রাণে কংগ্রেসভক্ত এবং ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করিয়া যাঁহারা ভারতবাসী হিসাবে হিন্দুকে ভাই বলিয়া স্বীকার করেন ও অকৃত্রিম ভালবাসেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ এই শ্রেণীর মুসলমানের বাঙ্গালার শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনই ক্ষমতা নাই। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম বৎসর হইতেই বলিতে গেলে বাঙ্গালাদেশ লীগ মন্ত্রীসভার অধীনে রহিয়াছে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১.৬ ভাগ হইয়াও গণতন্ত্রের মাহাত্ম্যে এদেশে হিন্দুদের সত্যকার অধিকার বলিয়া গত দশ বৎসর কিছুই নাই। ইতিপূর্ব্বে অবস্থা তবু একটু ভাল ছিল, মাঝে মাঝে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জুলুম সাময়িকভাবে একটু কমাইয়াছিল, গত বৎসর হইতে কিন্তু হিন্দুদের পক্ষে বাঙ্গালার পরিস্থিতি একান্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন হইতেছে, পরিবর্ত্তনের এই সুযোগে ক্ষমতা লাভের লোভে আত্মহারা হইয়া লীগদল যেখানেই নিজেদের কিছু প্রতিষ্ঠা আছে, সেখানেই গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু তাহারা পূর্ব্ববঙ্গে। লীগ সচিবসঙ্ঘের আমলে সমগ্রভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠতার জন্য বাঙ্গালার হিন্দুরা সর্ব্বত্রই নিগৃহীত হইতেছে। লীগ সচিবসঙ্ঘের মুখপত্র ইত্তেহাদের পৃষ্ঠাতেই দেখা যায়, লীগ মন্ত্রীসভা বাঙ্গালার দেওয়ানী বিভাগে মুসলমানের জন্য শতকরা ৮০টি চাকুরী রিজার্ভ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে শতকরা ৮০ জন মুসলমান হাকিম পাঠাইয়াছেন, পুলিস হিসাবে দলে দলে পাঞ্জাবী মুসলমান আমদানী করিয়াছেন, কোটি কোটি টাকার কনট্রাক্ট বিতরণ ও দোকান বণ্টনের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করিয়াছেন, কলিকাতার অধিকাংশ থানায় মুসলমান অফিসার বসাইয়াছেন, 'ইসলামিয়া বাজেট' পাশ করাইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি বিহারের মুসলমানদের জন্য বাঙ্গালার সরকারী তহবিল হইতে অজস্র টাকা খরচ করিয়াছেন। বাঙ্গলার বাজেটে গত ৭ বৎসর যাবৎ ঘাটতি চলিতেছে এবং যুদ্ধশেষ হইলেও ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৯ কোটি টাকার বেশী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পে-কমিশন রিপোর্ট এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির ফলে ব্যবসাদির ক্ষতিতে রাজস্ব হ্রাস বিবেচনা করিলে মনে হয় ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘাটতি বাজেটের অনুমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে এবং উপরিউক্ত দুই বৎসরের মোট ঘাটতির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকার কম হইবে না। প্রাদেশিক অর্থনীতির হিসাবে এই অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, লীগ মন্ত্রীসভা যে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণ ও হিন্দুদের পীড়নসূচক ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার অধিকাংশই যোগাইতেছে বাঙ্গালার হিন্দু, আসিতেছে শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুসলমানপ্রধান, কিন্তু ইহা কৃষিপ্রধান এলাকা। এই এলাকায় সরকারের এমন কিছু আয় হইতে পারে না যাহাতে সচিবসঙ্ঘ গৌরীসেনের মত টাকা উড়াইতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গে যেটুকু আয় হয়, তাহারও একটি বড় অংশ হিন্দু জমিদার, ব্যবসাদার এবং আড়তদারগণ যোগাইয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও এখানকার হিন্দুরা মুসলমান প্রতিবেশীদের সহিত এত গণ্ডগোলের মধ্যেও একরূপ সদ্ভাবে বাস করিতেছে; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে মুসলমানেরা রাজকীয় মেজাজে

হিন্দুদের উপর চড়াও হইয়া যে সব অত্যাচার করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে সেই ব্যাপক অনাচারের তুলনা হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের নোয়াখালি, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় মোট জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানের সংখ্যা যথাক্রমে ৮১.৪, ৭৭.১ ও ৬৭.৩ জন। এই সব জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দু প্রতিবেশীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ আজ আর লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ সমগ্র প্রদেশবাসীর অভিভাবক, কিন্তু এই সব জেলার দুর্গত হিন্দুদের রক্ষায় তাঁহারা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হইয়াছেন। কাজেকাজেই সর্বদিক হইতে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার হিন্দু এখন এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছে যে, হিন্দুর কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সামাজিক ও আর্থিক জীবনের সংহতি রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে নিজস্ব একটি বাসভূমি সংগ্রহ করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ঠ সংখ্যাগুরু হইয়াও শুধু হৃদয়াবেগজনিত দৌর্ব্বল্যে তাহারা আর অখণ্ড বাঙ্গলায় বাস করিয়া চিরকাল নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে রাজী নয়। তা ছাড়া বাঙ্গালার হিন্দু জাতীয়তাবাদী, দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাহারা চিরকাল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের বাসভূমির সম্পর্ক দৃঢ় ও নিবিড় হোক, ইহাই তাহারা চায়। মুসলীম লীগ যে এলাকার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে, সেই এলাকার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ না হইবারই সম্ভাবনা। সে হিসাবেও বাঙ্গালী হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রদেশের প্রয়োজন।

অবস্থা এখন যেরূপ, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের আর্থিক সঙ্গতি পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় অবশ্যই অনেক আশাপ্রদ। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার আশে পাশে বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্পাগারে অসংখ্য লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গ পৃথক রাষ্ট্র হইলে আশা করা যায় শিল্পাদির স্থানীয়করণ সহজ হইবে বলিয়া এখানে আরও বহুসংখ্যক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষির দিক হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবহমান নদনদীর অভাবে চাষ-বাসের এখন কিছুটা অসুবিধা হইলেও এই অঞ্চলের নদীগুলি সংস্কার করিয়া চাষের অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। একমাত্র দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলেই পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ নদনদীর সংস্কার হইলে কারখানা চালাইবার উপযোগী প্রচুর পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা অনেক কলকারখানা চলিতে পারিবে। তাছাড়া কৃষির দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যদিইবা ঘাটতি অঞ্চল হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে তাহার সেই ঘাটতি প্রতিবেশী উড়িষ্যাদি উদ্বৃত্ত প্রদেশ অবশ্যই পূরণ করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বাঙ্গালার শিল্পসমৃদ্ধির জন্য এখানে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান যেমন সহজ হইবে, সেইরূপ প্রচুর কাজকারবারের মধ্যে অর্থের প্রচলনগতি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জনসাধারণের আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে। ব্রিটেন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ দেশ, কিন্তু ব্রিটেনও কৃষির দিক হইতে স্বাবলম্বী নয়। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষিসমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে এই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের পক্ষে রাষ্ট্রপরিচালনার সর্ববিধ ব্যয়সঙ্কুলান করা অবশ্যই কঠিন হইবে।

পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্পদ রাণীগঞ্জ—আসানসোল অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি। এই খনিগুলির কয়লার উপর শুধু বাঙ্গলার নয়, বোম্বাইয়ের কলকারখানাসমূহ পর্য্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। ব্রিটেনের কয়লা সম্পদই যে বরাবর তাহার শিল্পসমৃদ্ধির অনুপূরক হিসাবে কাজ করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিল্পসম্প্রসারণে লৌহ প্রভৃতি যেসব ধাতুর প্রয়োজন সেগুলি বাঙ্গালায় বিশেষ পাওয়া না গেলেও (লৌহাদি যাহা পাওয়া যায় সবই প্রায় সঞ্চিত আছে পশ্চিম বাঙ্গালার বরাকর অঞ্চলে) খনিজসম্পদ সংগ্রহের দিক হইতে পূর্ব্ববাঙ্গলার তুলনায় পশ্চিম বাঙ্গালারই সুবিধা বেশী। পূর্ব্ববাঙ্গলা আসামের সহিত সম্প্রীতি রক্ষা করিলে (এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে) তবেই কিছু কিছু খনিজসম্পদ পাইতে পারে; পক্ষান্তরে পার্শ্ববর্ত্তী ছোটনাগপুরের ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট, কোডারমা, হাজারিবাগ ও গিরিডির অভ্র, ময়ূরভঞ্জের লৌহমাক্ষিক, হাজারীবাগ অঞ্চলের টিন, সিংহভূমের তামা প্রভৃতি অনায়াসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করা পশ্চিম বাঙ্গালার পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না। পূর্ব্ববাঙ্গালায় পাট জন্মায়, কিন্তু বাঙ্গলায় যে ৯৯টি চটকল আছে তাহাদের সবগুলিই পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার আশপাশে অবস্থিত। নূতন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে চটকল বসাইয়া সমস্ত উৎপন্ন পাট কাজে লাগানো শীঘ্র সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। চটকল প্রতিষ্ঠার যন্ত্রপাতির সমস্যা ছাড়া চটকল চালাইবার মত কয়লারও পূর্ব্ববঙ্গে একান্ত অভাব। তাছাড়া কাঁচা পাটের জন্য পশ্চিম বাঙ্গালার চটকলগুলির ক্ষতি হয়তো হইতে পারে, কিন্তু এই শিল্প এখনও এত অধিক পরিমাণে বিদেশীদের করায়ত্ত যে চটকলগুলি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের তেমন কিছু আসিয়া যাইবে না।

কাপড়ের দিক হইতেও পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক সমৃদ্ধ। কাপড়ের হিসাবে শুধু পূর্ব্ববঙ্গ নয়, প্রস্তাবিত সমগ্র পাকীস্থানী এলাকাই অত্যন্ত অস্বচ্ছল। বাঙ্গলায় এখন যে ৩৯টি কাপড়ের কল আছে তন্মধ্যে ৩১টি পশ্চিমবঙ্গে। ইহা সত্ত্বেও কাপড়ের অভাব পড়িলে পশ্চিমবাঙ্গালার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজে বোম্বাই আমেদাবাদ হইতে কাপড় আমদানী করা যাইতে পারিবে। পশ্চিম বাঙ্গালায় সমরাস্ত্র উৎপাদন কারখানা যেভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে এই শিল্প শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় রাষ্ট্রের নয় সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইছাপুর ও কাশীপুরের কামান এবং

গালাবারুদের কারখানা পূর্ব্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকতর নিরাপত্তার বিধান করিবেই। পূর্ব্ববঙ্গে ইনজিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা যখন মাত্র ১৩ টি, তখন পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ২০৩ টি কারখানা আছে। এছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্পাগার টাটা কোম্পানী হইতে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা পাইবে। এক কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের এলাকাভুক্ত হওয়ায় ব্যাঙ্ক, বীমা হইতে ছোট বড় নানা কাজকারবারের দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট মৌলিক সুবিধা লাভ করিবে। রেলপথ ও বিমান পথের দিক হইতেও একই কথা বলা চলে। কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে কারখানাও পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

মোটের উপর, মিঃ জিন্না হইতে শুরু করিয়া লীগের ছোটবড় নানা নেতা যে বলিয়াছেন, বাঙ্গালা বিভক্ত হইলে পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুরাও আর্থিক বিপন্ন হইয়া পড়িবে,—একথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি বিলাতের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকাও পাকিস্থানী এলাকাগুলির কৃষিসমৃদ্ধির উপর জোর দিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের অধিবাসীদের সুবিধা অসুবিধা প্রায় সমান সমান হইবে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্প-প্রধান পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা যেমন ভাল হইবার সম্ভাবনা, সেই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং কলিকাতা বন্দর হাতে থাকায় বাণিজ্যশুল্ক ও আয়কর খাতে প্রচুর অর্থাগম হইবে বলিয়া এই রাষ্ট্রের রাজস্ব তহবিলও বিশেষ আশাপ্রদ হইবে! অবশ্য ঘটনাচক্রে পশ্চিম বাঙ্গলা সাময়িকভাবে অর্থাভাবগ্রস্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার আগ্রহের সহিত সাহায্য করিয়া তাহাকে বিপদ-মুক্ত করিবেন। এদিক হইতে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা সত্যই অত্যন্ত শোচনীয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজস্ব তহবিলে উপস্থিত দীর্ঘকাল ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা এবং পাকীস্থানী এলাকাসমূহের প্রায় সবগুলির অবস্থা একইরূপ হইবে বলিয়া পাকীস্থানী কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গত পূর্ব্ববাঙ্গালাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সক্ষম হইবেন না। দীর্ঘকালের জন্য এই তীব্র অনটনের সম্মুখীন হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আক্রাম খাঁ, ফজলুল হক হইতে সুরাবর্দ্দি সাহেব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার লীগের পরস্পর-বিরোধী নেতৃবৃন্দ সকলেই বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে সমবেতভাবে বাধা দিতে আগ্রহশীল।

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালার হিন্দু কংগ্রেসভাবাপন্ন, উপায় থাকিলে অখণ্ড ভারতে অখণ্ড বাঙ্গালাই তাহাদের একান্ত কাম্য। কিন্তু অবস্থাগতিকে ভারত বিভাগ যদি অনিবার্য্য হয় এবং স্বার্থবাদী লীগ নেতৃবৃন্দের হাত হইতে বহুসমস্যাপীড়িত বাঙ্গালার শাসনদণ্ড সরাইয়া লইবার কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর বিশাল সংস্কৃতি, সংহতি ও ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের বৃহৎ মর্য্যাদা বাঁচাইতে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত না করিয়া উপায় নাই। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত আলোচনা হইতেই উপলব্ধি করা যাইবে যে, পশ্চিম বাঙ্গলার নবগঠিত প্রদেশের বা সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা বা নিরপত্তার অভাবজনিত কোনপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না। বরং এইরূপ পশ্চিমবঙ্গে কর্ম্মসংস্থানের এত বেশী সুযোগ থাকিবে যে পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে যে সব শিক্ষা-সংস্কৃতি-অভিমানী ও রুচিমান ব্যক্তি নিজস্ব বাসভূমি জ্ঞানে পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিবেন, এখানে অন্নসংস্থান করা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইবে না।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্রর বাটীর বাহিরের দালান। বিক্রম ও অবনী।

বিক্রম। আজ্ঞে না, আর ছুটি পাবার আশা নেই। প্রয়োজনও নেই। আপনারা রইলেন, আমি নিশ্চিন্ত।

অবনী। এখানকার চিন্তা অবশ্য আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। তবে নিশ্চিন্ত আপনি থাকতে পারবেন না। আপনার চেয়ে বড়ো আত্মীয় এদের আর কে আছে।

বিক্রম। যাবার আগে জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না। আজও তো ফিরলেন না।

অবনী। জয়ন্ত—জয়ন্তর ফেরবার কথা আর বলবেন না।

বিক্রম। সে কী? কেন, ফিরবেন না?

অবনী। মানে, ফিরতে দেবে না ওকে। যাক্ সে কথা।

মধুর প্রবেশ

মধু। বাড়ীওলাবাবু এসেছেন।

অবনী। এসেছেন? চল, যাচ্ছি।

মধুর প্রস্থান

আপনাকে বলিনি বোধ হয় এ বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়ে এদের আমার ওখানেই নিয়ে যাব আজ। অবনীর প্রস্থান

বিপরীত দিক হইতে রাধার প্রবেশ

রাধা। ট্রেণ আপনার কখন বীরুবাবু?

বিক্রম। ঠিক কটায় তা জানিনে, তবে আর বেশি দেরি করবার সময় নেই এটা জানি।

রাধা। দেরি করতে বলছি না আমি। কিন্তু না খেয়ে যাবার মত তাড়া নেই নিশ্চয়।

বিক্রম। না, না, ওসব করবেন না। ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না—

রাধা। ব্যস্ত হই নি। আর যদি হই, একটু তা হলুমই বা। আর তো কখনও এ সুযোগ পাব না। আপনি আমাদের জন্যে এতদিন ব্যস্ত হলেন, আমি না হয় একদিন—

বিক্রম। ও কথা তুলো না রা—মাপ করবেন, মিসেস সেন।

রাধা। মাপ করব কেন? আপনি আমার চেয়ে বড়ো, তুমি বলবারই তো কথা। নাম ধরেই তো ডাকবেন। এবার থেকে ঐ সম্বোধন রইল। আমি আপনার ছোট বোন বইতো নয়।

বিক্রম নিরুত্তর

রাধা। কিন্তু জেঠামশাই আজও এলেন না, কী হবে?

বিক্রম। শেখরবাবু? নিশ্চয় আসবেন। আপনার বাবার চিঠি পেয়ে কি না এসে থাকতে পারেন?

রাধা। তাঁর বড়ো সাধ ছিল বাবাকে, আমাদের সবাইকে নিয়ে যান তাঁর কাশীর বাড়ীতে। কতবার বলেছেন। বাবারও এত ইচ্ছে ছিল তাঁর কাছে গিয়ে শান্তিতে কাটাবেন কটা দিন।

বিক্রম। অবনীবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা আছে, শেষ করে নি এইবেলা।

বিক্রমের প্রস্থান। রাধা অন্যমনস্কভাবে বিক্রমের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পিছন হইতে প্রবেশ করিল সুমিত্রা ও তৎপশ্চাতে অনুরাধা।

সুমিত্রা। একলাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন মা? কী ভাবছ?

রাধা। জেঠামশাই এখনও এলেন না, কী জানি তিনি যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন—তাই ভাবছি।

সুমিত্রা। তাতে ভাবনার কী আছে মা? নাই বা এলেন তোমার জেঠামশাই। আমি তো রয়েছি, আর নিয়ে যাচ্ছি যেখানে সেটা কি তোমাদের বাড়ী নয়?

রাধা। সেই তো ভাবনা মাসীমা? আমি হতভাগী যে ডাল আশ্রয় করি সেই ডালই কাটা পড়ে। এমনই কপালের ধার। আবার আপনার বাড়ী গিয়ে কী বিপদ টেনে আনব কে জানে।

সুমিত্রা। ছি রাধা! মায়ের সামনে অমন কথা মুখে আনতে নেই। তোমার দ্বারা কখনও কারও ক্ষতি হতে পারে না। আসুন তোমার জেঠামশাই, দুদিন বিশ্রাম করুন আমাদের বাড়ীতে। তারপর ঘরে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করে রেখে (এই কথা বলিতে বলিতে একহাতে অনুরাধাকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিল) খোকার আর আমার লক্ষ্মীমার হাতে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিয়ে মায়ে-ঝিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

অবনীর প্রবেশ

অবনী। বাড়ীওলার সরকার এসেছিলেন। তাড়াপত্তর চুকিয়ে দিলুম। আর বলে দিলুম বিকেলে দারওয়ানকে পাঠিয়ে দিতে বাড়ীটা চাবি দিয়ে যাবে।

রাধা। (সসঙ্কোচে) জয়ন্তবাবুর কোনও খবর এলো না মেসোমশাই?

অবনী। খবর? হাঁ, না, জয়ন্তর কাছ থেকে কোনও খবর আসে নি।

অনুরাধা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সুমিত্রা। তুমি বল না। খোকার কাছ থেকে না আসুক, কী খবর এসেছে বল। আমার শোনবার সাহস আছে।

অবনী। তাতে আমি সন্দেহ করি নি। সাহস আমারও আছে বলবার। এই যে ক'টা দিন তোমার খোকা বাড়ী ছাড়া, এই ক'দিনে আমার দর কতখানি বেড়ে গেছে জানো? গবর্ণমেন্টের সবগুলো চোখ আমার সদর দোরে ধরণা দিয়ে পড়ে আছে। পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ।

রাধা। পুলিশ? কেন, পুলিশ কেন?

সুমিত্রা। তাই আমার মন অমন ছটফট করতো। খোকা পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হল?

অবনী। সেই জয়ন্ত বোসের বাপ আমি। কত বড় গর্বের কথা বল তো? জয়ন্ত বোসের বাপ!

(সুমিত্রা নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া আছে, সেই মূর্তির পানে চাহিয়া)

জয় ফিরে আসবে গো, আসবে। তবে দেরি হবে। কতদিন তা জানি না, দেরি হবে। ভয় নেই।

সুমিত্রা। ভয় কী? ফিরে আসবে খোকা, সে কি তুমি আমাকে বলে দেবে তবে জানব? আর তুমি যা মনে করছ তা হবে না, দেরি হবে না। শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে খোকা, দেখো।

বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাধা। আপনি সব কথা ওঁকে বলেন কেন মেসোমশাই? যদি সত্যিই ধরা পড়েন জয়ন্তবাবু? সে কি মাসীমা সহ্য করতে পারবেন? এত কথা ওঁকে না বললেই হোতো।

অবনী। তুমি তো ওঁকে চেনো না মা। সত্যি খবর সহ্য করতে বরং পারবে, কিন্তু সহ্য করতে পারবে না মিথ্যে। মিথ্যে দিয়ে ওকে ভোলানো অসম্ভব। রাধার প্রস্থান

সুমিত্রা পুনঃ প্রবেশ করিল

সুমিত্রা। দেখ, মনে কোরো না আমি অহঙ্কার করে বললুম। আমার নিজের জোরে এ অহঙ্কার নয়। আমার জয়ন্তর জন্যে যে উমার মতো তপস্যা করছে ঐ মেয়েটা। তোমরা জানো না, আমি তো জানি। ঘুরছে ফিরছে, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে মাথা ঠুকছে। মা মা করে আমার পায়ে পায়ে ফেরে, আমার কাছটিতে শোয়। ঘুমোয় না সারারাত। থাকে থাকে বিছানার ওপর উঠে বসে হাত জোড় করে। দেখি আর সাহস বাড়ে আমার।

অবনী। কিন্তু ও প্রণাম প্রার্থনা কেন কার জন্যে, তা জানলে কী করে ?

সুমিত্রা। জানা যায়। আমি যে খোকার মা, আমার খোকার জন্যে কার প্রাণ কাঁদছে তা পাশে থেকেও আমি বুঝতে পারবো না ?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। একটা কথা বলবার ছিল। আপনার যখন সময় হবে—

অবনী। সময় তো আমার এখনও কিছু কম নেই বীরুবাবু। আপনি বসুন।

সুমিত্রা প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া বিক্রম বলিল—

বিক্রম। তা বলে এমন কোনও কথা নয় মা, যা আপনার সামনে বলা যায় না।

সুমিত্রা। তার জন্যে নয় বাবা, আমি খাবার আয়োজন করি গে।

প্রস্থান

বিক্রম। দেখুন মিসেস সেনকে বলি নি, মানে বলতে পারি নি, অভিলাষের কিছু টাকা আমার কাছে পড়ে রয়েছে, টাকাটা আপনার হাতে দিয়ে যাব। আপনি সময় মতো দিয়ে দেবেন।

অবনী। তা বেশ। কিন্তু আপনি রাধাকেই দিয়ে দেন না।

বিক্রম। না, না। সে উনি নিতে চাইবেন না।

অবনী। কেন ? নিতে চাইবে না কেন ? আপত্তি কিসের ?

বিক্রম। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) সে উনি, মানে সেন্‌টিমেণ্টাল আপত্তি আর কি। অর্থাৎ টাকাটা—অভিলাষের লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকা, স্ত্রীর বিশেষ অমত সত্ত্বেও সে পলিসি নিয়েছিল।

অবনী। ও। তা বটে ! স্বামীর জীবন বিনিময়ের টাকা।

বিক্রম। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে শেখরনাথ প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ হাতের লাঠি স্কন্ধের উপর রহিয়া প্রান্তভাগে একটি পুলিন্দা রক্ষা করিতেছে। বাম হাতে খাবারের ঝুড়ি একটি। আজানু-ধূলি-ধূসর দুইটি পা।

শেখর। কই হে মাহিন্দর, কোথায় গেলে ? এখনও ঘুমুচ্ছ নাকি ?

বিক্রমের প্রবেশ।

বিক্রম। (সাগ্রহে) এই যে আপনি এসেছেন ! (নমস্কার করিল)

শেখর। এসেছি তো বটেই। কিন্তু নমস্কার ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য নেই, হাত জোড়া।

বিক্রম। এত দেরি হল—চিঠি পেয়েছিলেন তো ?

শেখর। চিঠি পেয়েছি বই কি। কিন্তু দশ দিন পরে। ছিলুম না কাশীতে কিনা। তাইতেই তো এত দেরি হল। সে যাক, আমার মায়েরা গেলেন কোথা ? ক্ষিদেয় পেটের নাড়ী হজম হয়ে যাবার যোগাড় যে।

বিক্রম। আপনি বসুন। আমি অনুরাধাকে বলে আসি আপনার খাবারের জন্যে।

শেখর। শুধু খাবারে তো আমার—

বিক্রম। সে জানি। আপনার খোরাকও আনতে বলছি।

শেখর। না, সে কথা নয়। তবে বলি শোনো। সেবারে পালিয়ে গিয়ে অবধি মনটা অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। শেষে মহিন্দরের চিঠি পেলুম, ভাল আছে, আমার সঙ্গে কাশী আসতে চায়। তবে নিশ্চিন্ত হই। তা ভাবলুম, কাশীর বরফি খানিকটা নিয়ে যাই। একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে'খন। মহিন্দরটা ঘুমুচ্ছে বোধহয় ? ততক্ষণ বরং এক কল্কে—

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে অনুরাধার ও পিছনে গড়গড়া ও গাড়ু গামছা লইয়া মধুর প্রবেশ।

এই দেখ ! ভাগ্যবানের বোঝা শুধু ভগবান নয়, ভগবতীরাও বয়ে থাকেন। এসো মা এসো।

মধু গাড়ু ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। অনুরাধা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে নতমস্তকে চোখ মুছিতেছে দেখিয়া শেখর বলিল—

শেখর। আঃ, কেন তোরা কলকেয় ফুঁ দিতে যাস্ বল তো ? ওসব কী তোদের কাজ ? চোখে কয়লা পড়েছে তো ?

অনুরাধা। নীরবে মাথা নাড়িল।

শেখর। না তো কী। চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তবু স্বীকার করবে না। বুড়ো বলে ঠকাতে চাস ছোটমা, এখনও অত বুড়ো হই নি। (হাসিতে লাগিল)

অনুরাধা। হাত পা ধুয়ে নিন, জেঠামশাই। ওঃ, কী ধুলো লাগিয়েছেন পায়ে।

শেখর। তা রাস্তায় যা ধুলো তোদের।

বিক্রম। আপনি কি হেঁটে এসেছেন নাকি ?

শেখর। হুঁ।

অনুরাধা। হাওড়া থেকে হেঁটে এসেছেন জেঠামশাই ? একটা গাড়ী নিলেও তো হতো।

শেখর। নিয়েছিলুম একটা রিকশা। এক টাকা ভাড়া নিলে। তাতেই পুঁটলিটা ঝুড়িটা চাপিয়ে দিলুম। নইলে বোঝা ঘাড়ে করে আর কি চলতে পারি এ বয়েসে।

অনুরাধা ও বিক্রম মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল শেখরের মুখের পানে।

শেখর। হ্যাঁরে, বড় মা খুব রাগ করেছে, না ? সেবারে না খেয়ে পালিয়েছিলুম বলে এবারে খেতেও দেবে না, দেখাও দেবে না বুঝি ?

অনুরাধা। আপনি আগে কিছু না খেলে দিদি আসবে না বলেছে।

বিক্রম। তুমি এইখানেই কিছু খাবার এনে দাও অনু।

শেখর। না, খাবার আর আনতে হবে না। দুখানা রেকাব নিয়ে আয় ছোট মা। আর ডাক সেই ছোকরাকে। দুটো ছেলে বসে বসে খাই আর দুটো মায়ে পরিবেশন কর। তিনটে রেকাব আনিস, তুমিও বসে যাও বাবা।

অশ্রু গোপন করিতে অনুরাধা প্রস্থান করিল। শেখর খাবারের পুঁটুলির বাঁধন খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। দেখিতে পাইল না, ধীর নিঃশব্দ পদে রাধা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বিক্রম সরিয়া গেল।

শেখর। (গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে) কই হে, উঠেছ ?

রাধা। ও সব রাখুন জেঠামশাই, বাবা নেই।

শেখর। (মুখ তুলিবার পূর্বেই) নেই ? কোথা গেছে ?

(বলিতে বলিতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল। চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া শেখর দেখিল বিধবা বেশধারিণী রাধাকে। বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শেখর ভাষা খুঁজিয়া পাইল) এই রূপ দেখাবার জন্যে আসতে চিঠি লিখেছিলি মা ? আর এই কথা শোনাবার জন্যে ?

রাধা। যখন চিঠি লিখেছিলুম তখন ভাল ছিলেন—(আর সে বলিতে পারিল না)

শেখর। হঠাৎ পালিয়ে গেল ? লিখলে তুমি এস, একসঙ্গে যাব। সব মিথ্যে কথা। পালিয়ে গেল আগেই।

রাধা। ভেতরে আসুন জেঠামশাই। হাত পা ধুয়ে—

শেখর। না মা, আর নয়। আর আমাকে বলিসনি—

একপাশে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিতা সুমিত্রার প্রবেশ, সঙ্গে অনুরাধা

সুমিত্রা। রাধা, তোমার জেঠামশাইকে আমার প্রণাম দিয়ে বল ভেতরে না এলে তো চলবে না, বাড়ীর অপরাধ কী ?

শেখর বিস্মিত ও নীরব।

সুমিত্রা। রাধু, আমাকে তোমার জেঠামশাই চিনতে পারছেন না। বল, আমি অনুরাধার মা। এখন এ আমার সংসার। যদি বাড়ীর ওপর অভিমান করে এখানে স্নানাহার না করেন তা হলে আমাকেও উপবাসী থাকতে হবে।

শেখর উঠিল।

শেখর। চল মা।

সুমিত্রা, অনুরাধা ও শেখর ভিতরে গেল। রাধাও যাইতেছিল, এমন সময় বিক্রমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইল।

রাধা। বীরুবাবু, যাবার দিনে কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যেতে চান ? না, চুপ করে থাকলে চলবে না। চলুন, ঝগড়া করতে চান ?

বিক্রম। না।

রাধা। নিশ্চয় চান। আর আপনি না চাইলেও আমি চাই। এ কী কাণ্ড আপনার বলুন তো ? উনি কথখনো ইন্‌সিওর করেন নি। আপনি মিথ্যে কথা বলে আমার জন্য মেসো মশাইয়ের কাছে অতগুলো টাকা দিয়েছেন, কেন ?

বিক্রম। বাঃ, করে নি কী রকম ? আমি সাক্ষী ছিলুম কাগজ পত্তরে। আপনি কী করে জানবেন ? এসব খবর কি আপনাকে বলতে গেছে ?

রাধা। করলে নিশ্চয়ই বলতেন। আর তাছাড়া আমার পাওনা টাকা যদি হয়, আমার সই ছাড়া টাকা দিলে কী করে ?

বিক্রম। সে কোম্পানীর ডাইরেক্টর আমার বিশেষ বন্ধু। ও রকম হয়। আপনি বুঝবেন না।

রাধা। আমিই বুঝেছি। আর মিথ্যে কথা বলে আমার পাপের বোঝা বাড়াবেন না বীরুবাবু। আমি জানি তাঁর ইন্‌সিওর ছিল না। ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, ও আমি নিতে পারবো না।

বিক্রম। না নিতে পারেন, রাস্তায় ফেলে দিন, ভিখিরি কাঙ্গাল ডেকে দিয়ে দিন, আমি নেব কেন ?

রাধা। নেবেন, কারণ আপনার টাকা।

বিক্রম। আমার টাকা ? পাগল হয়েছেন আপনি ? অত টাকা আমি পাব কোথায় ? বিশ্বাস করুন, ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখুন, সাঁইত্রিশ টাকা ক আনা পড়ে আছে আজ কত দিন। তার ক্ষয়ও নেই, বৃদ্ধিও নেই। অত টাকা আমার আসবে কোত্থেকে ?

রাধা। সে আপনিই জানেন। এই সেদিন দেশে গিয়েছিলেন। হয়তো আপনার ভিটের অংশটুকুও বেচে এসেছেন। আপনার অসাধ্য কিছু নেই।

বিক্রম। না, না—

(তাহার প্রতিবাদের সুর ফুটিল না, ভাষাও খুঁজিয়া পাইল না।)

রাধা। নিশ্চয় তাই করেছেন। বলুন, সত্যি কি না ?

বিক্রম। আপনার চোখে এক্সরে আছে। মানুষের বুকের ভেতর পর্য্যন্ত দেখতে পান।

রাধা। সকলের পাব কেমন করে। যারা বুকের কপাট খুলে দেয় তাদেরই বুকের ভেতর দেখতে পাই। কিন্তু কেন একাজ করতে গেলেন আপনি ? আমার তো কিছু প্রয়োজন নেই। জেঠামশাইয়ের আশ্রমে থাকব। কিসের অভাব আমার ? দেখছেন তো, বাবার চেয়ে উনি আমাকে কম ভালবাসেন না। তবে কেন ?

বিক্রম। ওঁর বয়েস হয়েছে।

রাধা। সে অবস্থা যদি আসে, তখন আপনার কাছে চাইব। ততদিন—

বিক্রম। ততদিন আপনার কাছেই থাক না। (রাধা নিরুত্তর) না, আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। অভিলাষ থাকলে আমার টাকা তার কাছে রাখতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করত না ? কিন্তু সে তো নেই। আপনার মনে যদি গ্লানি বোধ হয়, তবে দরকার নেই রেখে। ফেরৎ দেবেন আমাকে।

রাধা। (একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, ফেরৎ দেব না। ও টাকা আমি নিলুম।

বিক্রম। এ দয়া আমি ভুলব না কোনদিন।

রাধা। দয়া বলবেন না। আমি আপনার স্নেহের দান মাথায় করে নিলুম।

বিক্রম। আমি চলি।

রাধা। সে কী ? এখনই চল্লেন ? অনুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ?

বিক্রম। না, ও বিদায়-টিদায় নেওয়া আমার আসে না। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। আর বলবেন, তার বিয়ের সময় আমি নিশ্চয় আসব।

রাধা। একটু দাঁড়ান।

বলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইল

বিক্রম। (ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়া) না, না, ও করবেন না—

রাধা। কেন করব না? আপনি আমার দাদা হন। দাদাকে প্রণাম—

বিক্রম। আগে দাদা হই, তার পরে প্রণামের যোগ্য হব।

বলিতে বলিতে যেন ছুটিয়া পলাইল। রাধা তাহার পলায়ন গ্রাহ্য করিল না, শূন্য ভূমিতলে উদ্দিষ্ট প্রণাম সাঙ্গ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। দিদি, জেঠামশাই প্রস্তুত হয়ে নিতে বল্লেন। এই দুপুরের গাড়ীতেই উনি চলে যাবেন। আমি এত বল্লুম, এত কষ্ট করে রাত জেগে এসেছেন, একটা দিন বিশ্রাম করুন।

রাধা। মাসীমা কী বলছেন?

অনুরাধা। মাসীমাও—

রাধা। মাসীমা আমার, তোর নয়। তোকে যা বলে ডাকতে বলেছেন তাই বলবি!

অনুরাধা। উনিও অনেক করে বললেন, জেঠামশাই শুনবেন না।

রাধা। বলা বৃথা। বাবা পালিয়ে গেছেন, সেই অভিমানে উনি এবাড়ীতে একটা বেলা টিকতে পারছেন না। চ, প্রস্তুত তো আমরা হয়েই আছি।

অনুরাধা। দিদি।

রাধা। কী?

অনুরাধা কথা কহিল না। লজ্জানত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধা। (সস্নেহে) কী বলবি বল? কী হয়েছে অনু?

অনুরাধা। দিদি, আমাকে তোমরা রেখে যাও এখানে।

রাধা। (সবিস্ময়ে) এখানে? এখানে কোথা থাকবি?

অনুরাধা। এ বাড়ীতে নয়।

রাধা। মাসীমার কাছে? এখন কেন ভাই? ওই তো তোর বাড়ী। কিন্তু জয়ন্ত ফিরে আসুক—

অনুরাধা। (নতমুখে) আমি এখানে থাকলে যদি শীগ্‌গির ফেরেন। আমার ওপর রাগ করেই ওপথে পা দিয়েছেন। তোমরা জানো না, আমিও তখন বুঝি নি—

রাধা। আর বলতে হবে না বোন। আচ্ছা জেঠামশাইকে বলি।

অনুরাধা। সকলে চলে গেলে মা বড় একলা হবেন দিদি।

রাধা। বুঝতে পেরেছি ভাই। তাই হবে।

অনুরাধা। বীরুদা কোথায় গেলেন দিদি?

রাধা। চলে গেছেন। না, চলে যান নি, পালিয়ে গেছেন।

অনুরাধা। পালিয়ে গেছেন? কেন?

রাধা। আমার পেন্নামের ভয়ে।

অনুরাধা। একটা কথা বলব দিদি? বীরুদা তোমাকে ভালবাসেন। তুমি দেখ নি ওঁর চোখ—

রাধা। (বাধা দিয়া) না, না, ও আমি দেখি নি। দেখতে নেই। ওকথা মুখে আনতে নেই। তুই থাম্।

রাধার দ্রুত প্রস্থান। অনুরাধা দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণপরে নেপথ্যে কণ্ঠ শুনিয়া অনুরাধা ভিতরে চলিয়া গেল। প্রবেশ করিল অবনী ও মজুমদার।

অবনী। ইম্পসিব্‌ল্। কেন তুমি একাজ করতে গেলে? এ আমি হতে দেব না, আমি আসল কথা প্রকাশ করে দেব।

মজুমদার। ইউ উইল্ ডু নাথিং অফ্ দি সর্ট। এ তোমার প্রভিন্স্ নয় অবনী, এখানে তুমি মাথা গলিও না বলে দিচ্ছি।

অবনী। কিন্তু এ আমি চুপ করে এলাউ করব কেমন করে? আমার ছেলের মুক্তির জন্যে তুমি জেলে যাবে, মিথ্যে করে, বিনা দোষে—

মজুমদার। ডোন্ট্ বি সো সেলফিস্ অবনী। স্বার্থে অন্ধ না হলে দেখতে পেতে যে এ আমি তোমার ছেলের জন্যে করছি না। করছি আমার ছেলের জন্যে, আমার মেয়ের জন্যে। আর সত্যি মিথ্যের প্রভেদ, দোষী নির্দোষের বিচার করতে লজ্জা করে না? ওসব সুপারস্টিশন তোমার শিকেয় তুলে রাখো। এই মরা শুকনো বুড়োটা ফটকের এপারে বসে বসে দিন গুণবে, আর ঐ জ্যান্ত তাজা ছেলেটা ফটকের ওপারে দিন দিন শুকিয়ে নিবে আসবে—সেইটেই কি সত্যি কাজ হবে? ও কুসংস্কার আমার নেই।

অবনী। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবেই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

মজুমদার। সে ব্যবস্থা আমার। ওদের আসামী পেলেই হ'ল। বামাল পেলেই হ'ল। তাহলেই জয়ন্তের ওপর ওয়ারেন্ট্ নাকচ হবে। বামালসমেত সে আসামীকে আজ ওরা পেয়ে গেছে। আমার রেকর্ড আমাকে সাহায্য করেছে। আরে বুঝছ না, ওদের একটা আসামী নিয়ে কথা। আমারও ও পার্ট করা আছে, ষ্টেজে বেমানান হব না। (হাস্য)

অবনী নীরবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।
মজুমদার সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল—

মজুমদার। তুমি ভেবে দেখ অবনী, একজন তোমার ছেলে, আর একজন তার মেয়ে। এরা আমারই ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া আর কী উপায় আছে বলতে পার? আই কান্ট এলাউ হিস্‌টরী টু রিপিট্ ইট্‌সেল্ফ,—দি ক্রুয়েল হিসটরী অফ্ থারটি ইয়ারস্ এগো। সেই দুর্ঘটনা আবার আমার ছেলেমেয়ের জীবনে ঘটবে, আমি বাধা দেব না?

অবনী তথাপি নীরব

মজুমদার। নাঃ, এই সব সেন্টিমেন্টাল ফুলদের নিয়ে আর পারা গেল না। হ্যাঁ, ভাল কথা। (হাত হইতে আংটি খুলিয়া) এটা ধর তো। নাও ধর। (অবনী আংটি লইল। মজুমদার পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া পাতা উলটাইতে উলটাইতে বলিল) তোমার

কাছে আমার দেনা—দেনা হল—(পাতা উলটাইতেছে এবং আঙ্গুলে গণিয়া হিসাব করিতেছে) দূর কর ছাই। ঠিকে ভুল হয়ে যায় কেবল। ও অনেক আছে। তুমি এইটে বেচে শোধ করে নিও।

অবনী। এই নীলা—

মজুমদার। (মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল) আঃ, থাম। (হাত তুলিয়া থামাইয়া দিল)

অবনী। না, তোমার আংটি আমি বেচতে পারবো না। কিছুতেই না। য়্যাব্‌সার্ড।

মজুমদার। পারবে না? কিন্তু আর তো কিছু নেই এখন। তাহলে তোমার দেনা—বাই জোভ্‌! হাউ ষ্টুপিড্‌ অফ্‌ মি! বেচতে হবে না তোমাকে। ওটা আমার ছেলেবউকে দিও। আমার মেয়ে জামাইকে দিও। আর তোমার দেনা? ও আমি শোধবার চেষ্টা করব না? আমি ঋণী থেকেই মরব।

অবনী। ইউ আর গ্রেট, মজুমদার!

মজুমদার। (দুই হাত দিয়া অবনীর দুই হাত ধরিয়া) য়্যাণ্ড্‌ ইউ আর এ সিলি ওলড্‌ গুজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ—(চক্ষে জল ঝরিয়া পড়িল, তথাপি হাসিতে লাগিল)

যবনিকা

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

মস্কো সম্মেলনে ব্যর্থতা

মস্কো-সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিণ-রুশ-ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই; সুদীর্ঘ দেড় মাসব্যাপী আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে পোট্‌সড্যাম্‌ সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, জার্ম্মানীর সমর-শিল্প কমাইয়া দিয়া তাহার আক্রমণ-শক্তি নষ্ট করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীতে প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনে উৎসাহ দিয়া তাহাকে আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করা হইবে। নাৎসী দলের আক্রমণমূলক নীতি সমর্থন করিয়া জার্ম্মান জাতি জগতের যে ক্ষতি করিয়াছে, সেজন্য তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে জার্ম্মানী সাধ্যানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে। পোট্‌সড্যামে নির্দ্ধারিত এই মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই মস্কোয় পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন।

মস্কোয় জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মার্কিণ প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন—এই আক্রমণমুখী দেশটিকে আর অখণ্ড রাখা হইবে না; ইহাকে বহু বিভাগে বিভক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বিভিন্ন স্বতন্ত্র অংশের (ষ্টেটের) প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ষ্টেট্‌ পরিষদ, জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সুনির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পাইবে; পক্ষান্তরে, স্বতন্ত্র ষ্টেটগুলির সর্ব্বাধিক ক্ষমতা থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসরে বৃটেন এখন সর্ব্ব ব্যাপারে আমেরিকার অকুণ্ঠ সমর্থক। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এই রাজনৈতিক প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ বেভিন চোখ বুজিয়া মিঃ মার্শালের কথায় সায় দিয়াছিলেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি অখণ্ড জার্ম্মানী ভাঙ্গিয়া দিবার বিরোধিতা করেন; তাঁহার যুক্তি—জার্ম্মানীকে হিট্‌লারবাদের প্রভাবমুক্ত করাই মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য; জার্ম্মাণ জাতির নিজস্ব রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মঃ মলোটভ্‌ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ৮টি সর্ত্ত সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রধান কথা—জার্ম্মানী অখণ্ড, শান্তিপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে; সমগ্র জার্ম্মানীর প্রতিনিধি লইয়া গঠিত দুইটি পরিষদ হইবে জার্ম্মানীর পার্লামেণ্ট। এই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। জার্ম্মানীর বিভিন্ন ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হইবে। জার্ম্মানীর পার্লামেণ্ট সমগ্র জার্ম্মানীর জন্য এবং প্রদেশগুলি তাহাদের নিজেদের জন্য গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে।

জার্ম্মানীর জন্য একটি পরামর্শ পরিষদ গঠনের প্রস্তাবও হইয়াছিল। এই পরিষদ ক্রমে জার্ম্মানীর অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টে পরিণত হইবার কথা। সোভিয়েট প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, কেবল বিভিন্ন ষ্টেটের ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি লইয়াই নহে—বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের, ট্রেড্‌ ইউনিয়নের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া এই পরামর্শ পরিষদ গঠিত হইবে।

মিঃ মার্শাল ও বেভিন্‌ জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির মূল প্রস্তাব এবং সাময়িক ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব, দুইয়েরই প্রবল বিরোধিতা করেন।

জার্ম্মানীকে খণ্ডিত করিবার পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধির যুক্তি—ইহাতে জার্ম্মানীর সমর-শক্তি নষ্ট হইবে; সে আর জগতের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিবে না। ইহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট প্রতিনিধির যুক্তি—একমাত্র বহু জাতি অধ্যুষিত রাজ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয়

ব্যবস্থা প্রযোজ্য। জার্ম্মানীতে বহু জাতি নাই—জার্ম্মানরা একটি অবিভাজ্য রাজনৈতিক জাতি; এই জাতিকে খণ্ডিত করা অন্যায়। মঃ মলোটভ্ বলেন যে, এই অন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে জার্ম্মানীতে পুনরায় একনায়কের উদ্ভব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে; "ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মানী চাই"—এই সঙ্গত দাবী তুলিলে নূতন "হিট্‌লার" অনায়াসে অসন্তুষ্ট জার্ম্মান জাতির সমর্থন পাইতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভার্সাইয়ের অন্যায়ই ছিল হিট্‌লারের রাজনৈতিক শক্তির নৈতিক উৎস। জার্ম্মান রাজ্য খণ্ডিত করিলে প্রকৃতপক্ষে আর এক "ভার্সাই"-ই সৃষ্টি হইবে। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখযোগ্য—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মানীকে খণ্ডিত করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এবার মলোটভ্ যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, কতকটা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াই তখন বৃটেন ও আমেরিকা ফরাসী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই—প্রথম মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব ঘটে। পূর্ব্ব দিক হইতে বলশেভিক প্লাবনের পশ্চিমমুখী গতি রোধ করিবার জন্য তখন ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জার্ম্মানীর প্রয়োজন ছিল। আর, এবার সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে ইতিমধ্যে জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়াছে; সেখানে জনগণের হাতে সকল ক্ষমতা গিয়াছে। এই অঞ্চলের প্রভাব হইতে জার্ম্মানীর অবশিষ্টাংশকে এখন বাঁচান প্রয়োজন। বৃটিশ ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম অঞ্চলে হিটলারী আমলের জমিদার শ্রেণী, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদিগকে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ইউরোপের প্রগতি-বিরোধী ঘাঁটী সযত্নে রচিত হইতেছে; ইহাকে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ছোঁয়াচ হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঁচাইবার আগ্রহ স্বাভাবিক।

ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য চায় না। কিন্তু জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ঐক্যের জন্য তাহারা কুম্ভীরাশ্রু পাত করিয়া থাকে। অথচ গত ডিসেম্বর মাসে তাহারা পূর্ব্ব জার্ম্মানীকে বাদ দিয়া বৃটেন ও আমেরিকার অধিকৃত পশ্চিম জার্ম্মানীকে অর্থনৈতিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদিগকে জার্ম্মানীর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দিবার জন্য এবং জার্ম্মান অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা হয়। মঃ মলোটভ্ দাবী করিয়াছিলেন—সমগ্র জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক মিলন ঘটাইবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলের মিলন বাতিল করিতে হইবে। বলা বাহুল্য—মিঃ বেভিন্ ও মিঃ মার্সাল তাহাতে সম্মত হন নাই।

বৃটিশ ও মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জার্ম্মানীর জন্য দরদে বিগলিত হইয়া বলিয়াছেন যে, রুশিয়া অসঙ্গতভাবে জার্ম্মানীর চল্‌তি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ লইতেছে; এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিবার শক্তি তাহার নাই। রুশিয়ার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে তাহারা প্রশ্ন করেন নাই। রুশিয়ার ১২ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ক্ষতির জন্য জার্ম্মানী দায়ী। রুশিয়া মাত্র ১ হাজার কোটী ডলার অর্থাৎ তাহার ক্ষতির শতকরা মাত্র ১০ ভাগের জন্য ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছে। এই দাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি চলে না; তাই বেভিন-মার্সাল বাঁকা পথ ধরিয়াছেন।

এই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকা মোটেই অনাসক্ত নহে। বিদেশে অবস্থিত জার্ম্মানীর বিপুল সম্পত্তি তাহারা আত্মসাৎ করিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত জার্ম্মানীর ৩ শত ৩০ কোটী ডলারের সম্পত্তি তাহাদের কুক্ষীগত হইয়াছে। জার্ম্মানীর ২ শত ২০ কোটী ডলার মূল্যের মালবাহী জাহাজ এখন ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির হাতে। জার্ম্মানীর পেটেণ্ট, বিভিন্ন আবিষ্কার বাবদ এবং স্বর্ণের মূল্য বাবদ ৫ শত কোটী ডলার ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি পাইয়াছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ জাতির এই দরদীরা তাহাদের ১ হাজার ৫ শত কোটী ডলার মূল্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। যুদ্ধে ইহাদের ক্ষতি সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতি অপেক্ষা অনেক কম; অথচ ক্ষতিপূরণ বাবদ রুশিয়ার মোট দাবী অপেক্ষা ৫ শত কোটী ডলার বেশী ইহারা লইয়াছে।

জার্ম্মানীর চলতি উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে আপত্তির প্রধান কারণ—এইভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্ম্মানীর সমর-শিল্প নষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার, শ্রমশিল্পক্ষেত্র হইতে ধনিকদের প্রভাব ও ধনিকদের জোটের (Cartel) উচ্ছেদ আবশ্যক। সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে এই সব ব্যবস্থা সম্পাদিত হওয়ায় এখন সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা ৭০ ভাগ পণ্য উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ মলোটভ্ বলেন যে, সমগ্র জার্ম্মানীতে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে এবং রপ্তানী-বাণিজ্যে উৎসাহ দিলে জার্ম্মানী অনায়াসে চল্‌তি উৎপাদন হইতে ক্ষতি পূরণ দিতে সমর্থ হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলে অধিকাংশ সমরশিল্প অটুট রহিয়াছে, ধনিকদের জোট ভাঙ্গা হয় নাই, রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না। কাজেই, সেখানে অনুমোদিত পরিমাণের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ উৎপন্ন হইতেছে।

রুঢ়ের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও মস্কোয় মতভেদ ঘটে। রুশিয়া রুঢ়ে চতুঃ-শক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাহিয়াছিল। বৃটেন্ ও আমেরিকার তাহাতে আপত্তি। এই অঞ্চলে জার্ম্মানীর লৌহ, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থিত। এই অঞ্চলে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা না হইলে সমগ্র জার্ম্মানীর অর্থনীতিকে সংহত করা অসম্ভব।

চীনের সঙ্গীণ অবস্থা

গত ২৫শে মে চীনের ডিমোক্রেটিক লীগের মুখপাত্র ডাঃ লো মন্তব্য করিয়াছেন, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যদি অবিলম্বে চীনকে আরও সাহায্য না করে, তাহা হইলে চিয়াং-কাই-সেকের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটিবে।" তিনি বলেন যে, আমেরিকা যদি আরও সমরোপকরণ সরবরাহ না করে, চীনের সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ চালাইয়া না যায় এবং আরও অন্যভাবে সাহায্য না করে, তাহা হইলে আমেরিকার পক্ষে পতনোন্মুখ চৈনিক গভর্ণমেণ্টকে টিকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না।

কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী য়েনান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর ফাঁকা মাঠে সৈন্য পরিচালনা করিয়া চিয়াং-কাই-সেকের সেনাপতিরা

কম্যুনিষ্টদের রাজধানী অধিকার করিয়াছেন বলিয়া বড় বেশী আস্ফালন করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে কম্যুনিষ্ট বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া উত্তর চীনে সান্‌সি হইতে স্যাণ্টাং পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রে পর পর অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চিয়ান্‌-চুন্‌ এখন বিপন্ন। কম্যুনিষ্ট বাহিনীর চাপে অতিষ্ঠ হইয়া মার্কিণ নৌ-সেনা-দল উত্তর চীনের চিন্‌ওয়াংটাও ত্যাগ করিয়াছে।

সামরিক অবস্থা যখন এইভাবে সরকার পক্ষের অত্যন্ত প্রতিকূল, সেই সময় চীনের অর্থনৈতিক অবস্থারও দারুণ অবনতি ঘটিয়াছে। গত ৪ মাসে সাংহাইর রাস্তা হইতে ৮ হাজার নিরাশ্রয় শিশুর মৃতদেহ কুড়াইয়া লওয়া হইয়াছে ; কেবল এপ্রিল মাসেই পাওয়া গিয়াছিল ৩ হাজার শিশুর মৃতদেহ। দুর্ভিক্ষ এত ব্যাপক যে, অনেক জায়গায় অনসনক্লিষ্ট জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া খাদ্য শস্যের দোকান লুণ্ঠন করিয়াছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও প্রবল বিক্ষোভ। আমেরিকা আজ পর্য্যন্ত নানাভাবে চীনকে সাহায্য করিয়াছে ৪ শত কোটী ডলার। ইহাতে চীনের অর্থ-নৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। মার্কিণ সাহায্যের একটা মোটা অংশ মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও চীনের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের পকেটে।

চিয়াং-কাই-সেক গভর্ণমেন্টের অব্যবস্থা, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং নিরর্থক গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত ১৫ই মে সর্ব্বপ্রথম সাংহাইয়ে ৫ হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ; তাহারা ধ্বনি তোলে—"গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ কর।" ক্রমে নান্‌কিং-এ এবং পিপিংএ ছাত্র আন্দোলন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া, কম্যুনিষ্টদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ছাত্রদিগকে শান্ত করা সম্ভব হয় নাই। গত ২০শে মে নান্‌কিংএ ৬ হাজার ছাত্রের এক শোভাযাত্রার সহিত সশস্ত্র পুলিস দলের সংঘর্ষ ঘটে। তাহার পর হইতে ছাত্র-আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেন্টের অত্যাচার, খাদ্যাভাব এবং গৃহ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য আগামী ২রা জুন চীনের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ সংবাদ (২৬শে মে)—চীনের পিপ্‌লস্‌ পলিটিক্যাল্‌ কাউন্সিলের ১ শত সদস্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, গৃহ-যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তির আলোচনা চালাইবার জন্য কম্যুনিষ্ট সদস্যদিগকে অনুরোধ জানান হইবে। এই কাউন্সিলের ২৫০ শত সদস্যের মধ্যে ৭জন কম্যুনিষ্ট ; তাঁহারা গত ২ বৎসর এই কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগ দান করেন নাই।

মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্‌ আজ অসুবিধায় পড়িয়া সময় লাভের জন্য যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করিতেছেন কিনা বলা যায় না। সামরিক অবস্থা প্রতিকূল হইয়া উঠিলে, তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তির কপট ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। তবে, এ কথা সত্য, তিনি যদি কম্যুনিষ্ট-দিগকে সামরিক বলে দমন করিবার দুরাশা ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চীনা জাতির দুঃখ ও লাঞ্ছনাই বাড়িবে ; তাঁহার নিশ্চিত পতন তাহাতে বন্ধ হইবে না।

জাতি-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া গেল। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ৭টি শক্তির প্রতিনিধি লইয়া একটি তথ্য-সংগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে এই কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইবে এবং প্রয়োজনানুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিয়া সেখানে পরোক্ষ ইঙ্গ-মার্কিণ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে চায়। তাহারা জাতি-সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনটি চাল চালিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত আলোচনা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হঠাৎ আরবদের জন্য দরদী হইয়া উঠেন এবং ইহুদীদের বক্তব্য শুনিতে আপত্তি করেন। কোন রকমে একটি কমিটী খাড়া করিয়া নিজেদের মনোমত রিপোর্ট লওয়া এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্যালেষ্টাইন বিভাগ সুসম্পন্ন করা ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ আসফ্‌ আলি এবং সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো এই চাল ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়পক্ষের পরিপূর্ণ বক্তব্য শুনিতে চাহেন। তাঁহাদের দাবীতে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের প্রথম চাল ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তথ্য-সংগ্রহ কমিটীর আলোচ্য বিষয়ে প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি বাদ দিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ দল জিদ করেন। মিঃ আসফ্‌ আলি ও মঃ গ্রোমিকোর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ভোটের জোরে ইঙ্গ-মার্কিণ দলের এই চাল সফল হইয়াছে। মিঃ আসফ্‌ আলি এই সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারত আজ কেবল দৃঢ়তার দ্বারাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য-বাদীর নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করিতেছে। প্যালেষ্টাইনবাসীরও প্রবল দৃঢ়তা আছে। কাজেই, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকারে বঞ্চিত করিবার শক্তি কাহারও নাই।" সর্ব্বশেষে, ইঙ্গ-মার্কিণ দল প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে দূরে রাখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়। এই জন্যই তাহাদের পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল—তথ্য-সংগ্রহ কমিটীতে বৃহৎ পাঁচটি শক্তির কোনও প্রতিনিধি থাকবে না। রুশিয়াকে বাদ দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্য হইতে সাতটি রাষ্ট্র লইয়া কমিটী গঠন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধি কমিটীতে না থাকিলেও এই তাঁবেদাররা যে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করিবে, ইহা জানা কথা। মিঃ আসফ্‌ আলি এই ব্যাপারে বাস্তব রাজনীতিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাবপ্রবণ গণতন্ত্রপ্রিয়তারই পরিচয় বেশী দিয়াছেন। তিনি বৃহৎ ৫টি শক্তিকে বাদ দিয়া কমিটী গঠনের প্রস্তাবই সমর্থন করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ দলের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ৭টি ছোট রাষ্ট্র লইয়াই কমিটী গঠিত হইয়াছে।

২৮।৫।৪৭



ভীমপলশ্রী

বনফুল

৮

অত্যুচ্ছ্বসিত সদারঙ্গ বিহারীলালের নমস্কারের প্রত্যুত্তরে সুশোভনকে প্রতিনমস্কার করতে হল, কিন্তু মনে মনে বিব্রত হয়ে পড়ল সে। সদারঙ্গবিহারীলাল? নামটা শোনা-শোনা ঠেকছে। অনীতারই সম্পর্কে কোথায় যেন শুনেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

"আপনার বিয়েতে যেতে পারি নি। সেটা আমার দুর্ভাগ্য। আমার 'তার'টা পেয়েছিলেন তো?"

সুশোভনের আবছাভাবে মনে পড়ল বিয়ের সময় অনীতাদের বাড়িতেই এ নামটা সে শুনেছিল যেন। কে যেন বলেছিল সদারঙ্গবিহারীলাল আসতে পারবে না।

"হ্যাঁ, আপনার 'তার' পেয়েছিলাম বই কি"—সান্ত্বনা জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, পেয়েছিলাম" সায় দিতে হল সুশোভনকেও। সুশোভনের দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল সুরু করলেন তখন।

"আপনার কথা অনেক শুনেছি"

"আমার কথা? আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বুঝি"

"হ্যাঁ আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে তো বটেই, আরও অনেক জায়গা থেকে। আপনাদের মতো লোক কি লুকিয়ে থাকতে পারে কখনও—হেঁ হেঁ হেঁ—"

এ কথা শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল সুশোভন। একটু ইতস্তত করে' চুপ করে' রইল, আড়চোখে সান্ত্বনার দিকে চাইলে একবার।

"আপনাদের বিয়ের আগে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার নাইট স্কুলে দেখা হয়েছিল, কেমন না?" প্রশ্নের ভঙ্গীতে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ভুরু নাচালেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ও,নাইটস্কুলে"—ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনি করলে সুশোভন।

"হ্যাঁ, নাইট স্কুলে। আপনারও সেখানে আসবার কথা ছিল, কিন্তু কি একটা ব্যাপারের জন্যে আপনার আসা হয় নি। সম্ভবত কোনও জরুরি মিটিংএ আটকে পড়েছিলেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল এমনভাবে চাইলেন সুশোভনের দিকে, যেন কোন দেবদুর্লভ ব্যক্তিকে দর্শন করছেন তিনি।

বিদ্যুৎ-চমক-বৎ সুশোভনের হঠাৎ মনে পড়ল এঁদের চক্ষে সে অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে (যিনি সম্প্রতি উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী হয়ে উঠেছেন)—অনীতার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, হয়েছে সান্ত্বনার সঙ্গে! অপ্রত্যাশিত নেপথ্যলোকে সহসা পরকীয়া লাভ করে' সুশোভনের অবচেতন মানসে বেশ একটু পুলক সঞ্চার হল। মন্দ কি! উৎসাহী কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে হবার সখ নেই তার, কিন্তু সান্ত্বনার স্বামী হওয়াটা—অদ্ভুতগোছের ঠেকলেও—লোভনীয়। বেশ, অভিনয় যদি করতেই হয় ভালভাবেই করতে হবে। বিব্রতভাবটা ঝেড়ে ফেলে বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সুশোভন।

সদারঙ্গবিহারীলাল মিনিট দশেকের বেশী ছিলেন না। কিন্তু সেই দশ মিনিটেই তিনি জটটি বেশ পাকিয়ে গেলেন। গোসাইজি বুঝলেন যে তাঁর নবাগত অতিথিটির নাম অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে, কথাবার্ত্তা থেকে এ-ও বুঝলেন যে ইনি একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী। অনেকদিন থেকে সদারঙ্গ-বিহারীলালের একটি বদ্ধ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধীর পাল্লায় পড়ে যদিও অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ম্মী অহিংসাকেই

স্বদেশ-উদ্ধারের পন্থা বলে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছেন কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ অহিংসায় আস্থাবান নন। সুযোগ পেলেই সবাই আস্তিন গুটিয়ে ঘুঁসি তুলতে প্রস্তুত অর্থাৎ মনে মনে সবাই সহিংস। তাই যদিও রাত অনেক হয়েছিল এবং তাঁর মোটর বাইকে 'মোবিল' ছিল না তবু এমন একটা সুযোগ ছাড়তে পারলেন না তিনি। এমন একজন নাম-জাদা কংগ্রেসকর্মীকে এত ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়া গেছে যখন, তখন এ সন্দেহের একটা নিরসন না করে' কি ছাড়া যায়? প্রশ্ন সুরু করলেন। প্রশ্নের ধরণ থেকেই কি উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল অবশ্য। বিশেষ বেগ পেতে হল না সুশোভনকে।

"আচ্ছা, সত্যিই কি আপনি অহিংস-পন্থায় বিশ্বাস করেন না কি? মানে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে বলছি। কাগজে অবশ্য আপনাদের পোষাকী বক্তৃতা অনেক পড়েছি, কিন্তু কাজ হাঁসিল করবার জন্যে বক্তৃতায় অনেক সময় অনেক কথাই বলতে হয়—অ্যাঁ, কি বলেন—কিন্তু সত্যি কি আপনি বিশ্বাস করেন যে নিছক অহিংসাতেই আমাদের দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে?"

"মোটেই না"—একটু হেসে সুশোভন উত্তর দিল—"কিন্তু ও কথা বলা ছাড়া আমাদের এখন গত্যন্তর কি আছে বলুন"

"দ্যাট্‌স্ ইট্! আপনাদের অহিংস মুখোসের তলায় তাহলে—কিছু মনে করবেন না উপমাটায়—মানে—"

"না, না মনে করবার কি আছে"

"আপনাদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থীদের আসল মনোভাব তাহলে ওই"

"আমার তো তাই বিশ্বাস"

"সত্যি? বাঃ! আমিও বরাবর ঠিক এই কথা ভেবে এসেছি। প্রকাশ্যে আপনারা অবশ্য স্বীকার করবেন না, করতে পারেন না—"

"তা পারি কি"

"চমৎকার, চমৎকার। যাক সন্দেহটা মিটে গেল। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বেশ খানিকটা ইয়ে আছে, মানে ভণ্ডামিই বলতে হবে—প্লীজ এক্‌স্‌কিউজ মি—ঠিক জুৎসই কথাটা মনে আসছে না। মানে, বুঝতে পেরেছেন আশাকরি আমার মনের ভাবটা"

সুশোভন স্মিতমুখে চুপ করে রইল। কথা বাড়াবার ইচ্ছে আর তার ছিল না।

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার স্বর খুব খাটো করে' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সুভাষবাবুর সম্বন্ধে মহাত্মাজির আসল মনোভাবটা কি বলুন তো"

"আমি—আমি ঠিক জানি না"

"আপনি জানেন না? বিশ্বাস করলাম না। অবশ্য বলতে বাধা থাকতে পারে। আছে না কি"

"তা আছে একটু। মাপ করবেন আমাকে"

"না, না, তাহলে জোর করতে চাই না। সার্‌টেন্‌লি—"

সদারঙ্গবিহারীলাল উদ্ভাসিত মুখে সান্ত্বনার দিকে চাইলেন—চশমার লেন্স থেকে আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল যেন।

"সত্যি ভারী আনন্দ পেলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে'। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে এমন সরলভাবে যে আলাপ করবেন তা কল্পনাতীত ছিল। বাঃ—বাঃ—ভারী আনন্দ হচ্ছে। সব দক্ষিণপন্থাই তাহলে মনে মনে বামপন্থী—বাঃ চমৎকার। রাগ করলেন না কি?"

"না রাগ করবার কি আছে এতে—ঠিকই তো বলেছেন"

"বাঃ বাঃ, ভারী খুশি হলাম। আচ্ছা এবার চলা যাক। গোঁসাইজি সত্যি তেল নেই আপনার? একটু হলেই হবে"

"সর্ষের তেল হলে হবে?"

"সর্ষের? রাম কহো। তা কি হয়? লুব্রিকেটিং অয়েল চাই"

"আজ্ঞে না, আমরা গেঁয়ো লোক, ওসব রাখি না"

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন, "বিপদে যে পড়তে হবে তা বুঝেছিলাম, বুঝলেন। কিন্তু বিপদ যে এমন ঘনীভূত হয়ে উঠবে তা ভাবি নি। একটু মোবিল না পেলে মারা যাব যে একেবারে। মাইল খানেক হেঁটে আসছি। বেশ গরম হয়ে উঠেছিল গাড়িটা। দুর্গতি যাকে বলে। পিস্টন থেকে এমন সব অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে বুঝলেন, মোটেই সুবিধাজনক নয়—শেষকালে কি —এইখানেই রাতটা—"

"আপনার হাজার অসুবিধা হলেও এখানে তো রাত্রে জায়গা দিতে পারব না আপনাকে"—একটু গলা-খাঁকারি

দিয়ে গোঁসাইজি বললেন—"আপনার সংকার করতে অক্ষম আমি আপাতত। একটিমাত্র ঘর ছিল সেটি ব্রজেশ্বরবাবুরা নিয়েছেন"

সুশোভন অস্বস্তিবোধ করল একটু।

"আপনি যাবেন কোথা"—সান্ত্বনা জিগ্যেস করলে।

"ছিপ-ছররামারি। ছিপছররামারিতেই থাকি আমি। ওই যে বললাম না, ক্যানভাস করতে বেরিয়েছি। উমেশ চৌবে লোকটা সুভাষ বোসের খুব প্রশংসা করত তাই ভেবেছিলাম লোকটা খুব ভাল, তারই হয়ে ক্যানভাস করেছিলাম প্রথমে। তারপর জনার্দ্দনবাবু আমার চোখ খুলে দিলেন—এখন দেখছি যদিও একটু ঘুঁতঘুঁতে ধরণের তবু বৈজুপ্রসাদ লোকটাই ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট। ভুল সংশোধন করতে বেরিয়েছি তাই। অনেক ঘুরতে হল। তা হোক। ব্রজেশ্বরবাবু আপনারও এ অঞ্চলটা একবার ঘুরে দেখা উচিত—ঐতিহাসিক মানুষ আপনি—এদিকের ইন্টিরিয়ারে চমৎকার চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, কতকগুলি মূর্ত্তিও। এসেছেন কখনও এদিকে আগে? আসা মুস্কিল অবশ্য। কাছে-পিঠে কোনও স্টেশন নেই কি না। আপনারা বাই রোড এসেছেন নিশ্চয়—"

"হ্যাঁ, আমাদের কারটা বিগড়ে পড়ে আছে কয়েক মাইল দূরে। আমরা হেঁটে এসেছি এখানে রাতটা কাটাবার জন্যে"

"আমাকেও আপনাদেরই সঙ্গী না হতে হয়, কি বিপদ দেখুন তো"

"না আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন" আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"আমিও আপনার সংকার করতে অক্ষম আপাততঃ" গোঁসাইজি বললেন।

"তা-ও বটে, ঘর খালি নেই আপনার। যদি থাকতেই হয় বারান্দায় পড়ে থাকতে হবে হয় তো—কিম্বা বাইরে—হা-হা-হা-হা"

"হা-হা-হা-হা"—জোর করে' হেসে উঠল সুশোভন। লোকটা সত্যি সত্যি থেকে না যায়!

গোঁসাইজি ভ্রূকুটি করলেন।

"পাঁচ মাইল তো মোটে"—সান্ত্বনা বললে।

কণ্ঠ-স্বরে প্রায়-অকৃত্রিম আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে উৎসাহ দিল সুশোভন—"হ্যাঁ, ঠিক পৌঁছে যাবেন আপনি"

সদারঙ্গবিহারীলাল এর পর যা বললেন তা আশ্বাসজনক। "হ্যাঁ, মোটে পাঁচ মাইল পৌঁছে যাওয়া উচিত তো। তাছাড়া গাড়িখানা এতক্ষণে ঠাণ্ডাও হয়েছে খানিকটা, গর্মে ছিল ভয়ানক। বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে, কি বলেন"

"হ্যাঁ, রাত হয়েছে, আর দেরি করা উচিত নয়"

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী। অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেলাম। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেন। ভাগ্যে গাড়িটা খারাপ হয়েছিল তাই দেখা হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। গাড়িটা কিন্তু ঘাবড়ে দিয়েছিল বেশ। মনে হচ্ছিল ইনলেট্ ভালভের স্প্রিংই গেছে বুঝি একটা। এখন বুঝতে পারছি ওভারহিটেড্ হয়েছিলাম। মিকশ্চারটা আর একটু রেগুলেট করে' নিতে হবে তার মানে। একটু 'রিচ্' হয়ে গেছি সম্ভবত। আচ্ছা, নমস্কার তাহলে, নমস্কার—"

ঝুল-কালি-মাখা হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"বড় আনন্দ পেলাম। আবার আলাপ আলোচনার সুযোগ ঘটবে আশা করি শিগগির। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে আলাপ করলে মনের রংই বদলে যায়। চমৎকার। আচ্ছা চলি, নমস্কার। নমস্কার সান্ত্বনা দেবী"

"নারায়ণের কৃপায় পৌঁছে যান ভালয় ভালয়। আমার এখানে স্থান নেই মোটে"

গলা-খাঁকারি দিয়ে কথাটা মনে করিয়ে দিলেন আবার গোঁসাইজি।

"খানিকটা গিয়ে বাইক যদি ফেল করে তাহলেও দেবেন না"

"আপনার হার্ট যদি ফেল করে তাহলেও দেব না, মানে দিতে পারব না। স্থানাভাব। গোড়া থেকেই বলছি আপনার সংকার করতে অক্ষম আমি আপাতত।"

"তাহলে যা থাকে কপালে বলে' বেরিয়ে পড়া যাক এইবার। কি বলেন! গাড়িটা ঠাণ্ডাও হয়েছে, আর বেগ দেবে না বোধ হয় আশা করি"

সদারঙ্গবিহারীলাল মরীয়া হয়ে অগ্রসর হলেন দ্বারের দিকে। একটু এগিয়েই ফিরলেন আবার।

"আচ্ছা তাহলে নমস্কার সান্ত্বনা দেবী, নমস্কার ব্রজেশ্বরবাবু। বা বা চমৎকার কুকুরটি তো—খাসা। কি সুন্দর লোম। আপনার কুকুর বুঝি সান্ত্বনা দেবী—বাঃ"

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে জানালে যে ঝুনু তারই কুকুর।

"বাঃ—"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু ঝুঁকে ঝুনুকে আদর করলেন। ঝুনু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে নিজের মনিবের দিকে তাকালে একবার। তারপর হাঁচলে।

"বাঃ, সুন্দর কুকুরটি। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার, নমস্কার। ঝুনু, চলি বুঝলে, নমস্কার"

গোঁসাইজি গলা-খাঁকারি দিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং দরজাটা খুলে দিলেন ভাল করে'।

"এতক্ষণে গাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে আশা করি। হওয়া উচিত অন্তত, আচ্ছা চলি এবার, নমস্কার তাহলে"

গোঁসাইজির রগের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। একটি কথা না বলে নীরবে তিনি তাঁর অনুগমন করলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হাসলে একটু। ভোজকাজের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর বাড়ির গিন্নির যে রকম মুখভাব হয় সান্ত্বনার মুখভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল। দড়াম করে' সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। গোঁসাইজি ফিরে এলেন। তাঁর দুই ভ্রূর মাঝখানে গভীর দুটি রেখা ফুটে উঠেছে দেখা গেল।

"আপনি তাহলে কংগ্রেসের লোক একজন"

সুশোভন রুমালটা বার করে' নাক ঝাড়তে লাগল। সান্ত্বনাই জবাব দিলে।

"হ্যাঁ, আমার স্বামী একজন কংগ্রেসকর্মী"

"ও, আমি ধরতে পারি নি ঠিক। আপনি কোন দিকে?"

"কিসের কোন দিকে—মানে আপনি যে দিকে—মানে"

"আপনি অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে না বিপক্ষে"

"অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের?

সুশোভন ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজির দিকে চকিতে দৃষ্টিপাত করলে একবার। তার মনে হল গোঁসাইজির মতো লোকের অফিস অ্যাক্‌সেপ্‌টান্সের স্বপক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

"আমি স্বপক্ষে"

"ও, স্বপক্ষে! বটে—"

ওষ্ঠ দ্বারা অধরকে নিষ্পিষ্ট করে' গুম হয়ে গেলেন গোঁসাইজি। তার চক্ষুর দৃষ্টি থেকে যা বিচ্ছুরিত হতে লাগল তা ক্রোধ ও ব্যঙ্গের এক অস্বস্তিজনক সমন্বয়।

"সিংহাসনে সবাই বসতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক" এইটুকু বলে' একটু থেমে "হ্যাঃ" বলে' গোঁসাইজি তার বক্তব্য শেষ করলেন। তার পর কি মনে হল হঠাৎ ঘুরে বললেন—"সিংহাসনে বসছেন বসুন, কিন্তু ঘুস নেওয়াটি বন্ধ করতে পারবেন? এই যে আপাদমস্তক সবাই চোর, দিনদুপুরে পুকুর চুরি করছে তার হিল্লে করতে পারেন যদি তাহলেও বুঝব কাজ করলেন একটা"

"আজ্ঞে হ্যা, ঠিক ওই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ঢুকতে চাই"

"ভাল। আমার অ্যাডমিশন রেজিস্টারে যখন নাম লিখবেন তখন নিজের পরিচয়টাও লিখে দেবেন দয়া করে'। একজন বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী আমার হোটেলে পদার্পণ করেছিলেন এ নজির পাঁচজনকে দেখাবার মতো"

পুনরায় অধর দিয়ে ওষ্ঠকে চাপলেন। সুশোভন সান্ত্বনার দিকে চেয়ে মুখে একটা প্রশংসা-সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু পারলে না ঠিক।

সান্ত্বনার দিকে চেয়ে গোঁসাইজি বললেন, "আপনারা শোবেন কখন। আমাদের এখানে সকাল সকাল শোওয়াই নিয়ম"

"বেশ তো, বলেন তো এখনি যেতে পারি"

সান্ত্বনা ঝুঁকে ঝুনুকে কোলে তুলে নিলে। গোঁসাইজি শিউরে উঠলেন।

"ও কি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন কোথা"

"শুতে"

"ও আপনার সঙ্গে শোবে!"

"হ্যা, কেন"

"এক বিছানায়?"

গোঁসাইজির কণ্ঠস্বরের গ্রাম দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।

"তাই তো শোয় বরাবর"

"আপনি ব্রজেশ্বরবাবু আর কুকুরটা সবাই এক বিছানায় শোয় বরাবর!"

"নিশ্চয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন। আপনার আপত্তি আছে না কি"

"আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন!"

তার পর সুশোভনের দিকে ফিরে প্রায় চীৎকার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"এই কুকুরটার সঙ্গে শোন আপনি!"

"আমি—মানে হ্যা, তা শুই বই কি। বাচ্চা বেলা থেকে পুষেছি কি না—"

গোঁসাইজির দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল। অষ্টধাতু-অঙ্গুরীশোভিত তর্জ্জনী তুলে বললেন—"এখানে শোবার ঘরে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ খৃষ্টান হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস। কোন ভদ্রলোক যে কুকুর নিয়ে এক বিছানায় শুতে পারেন তা ধারণারই অতীত ছিল আমার—

সুশোভনের ধৈর্য্যরক্ষা করা এমনিতেই কঠিন হয়ে উঠছিল, এ কথা শুনে সে ঈষৎ চটেই উঠল। বলে উঠল—"আপনার ধারণার সীমা সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল নেই আমাদের। আমাদের কুকুর নিয়ে শোয়াই অভ্যাস"

"অভ্যাস? এই ম্লেচ্ছ অভ্যাসের কথা জোরগলায় বলছেন আবার! আপনি একজন কংগ্রেসকর্ম্মী না? এ কথা বলতে লজ্জা করে না আপনার"

"কেন, কংগ্রেসকর্ম্মীর কুকুর নিয়ে শুতে বাধা কি"

"এই কি স্বদেশী আচরণ? যাই হোক আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, আমার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না সোজা কথা"

"অদ্ভুত হোটেল আপনার!"

"এটা হোটেল নয়, হিন্দু পান্থনিবাস—দয়া করে' মনে রাখবেন সেটা"

(ক্রমশঃ)

সীমান্তে লীগ আন্দোলন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন, এইরূপ প্রচার করিয়া তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলবিরোধী আন্দোলন সুরু করে। লীগ সমর্থকরা মর্দানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। এই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিতে গিয়া সীমান্ত পরিষদের বিরোধী দলের নেতা খান আবদুল কোয়ায়ুন খান, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খান সামিন জান খান ও অপর চার জন লীগ নেতা প্রথম দিনেই গ্রেপ্তার হন।

পেশোয়ারের লীগপন্থীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া পরদিন আগ্নেয়াস্ত্র, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর বাংলোর নিকটে গিয়া উপস্থিত হয়। প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বাংলোর জানালা ও শার্সির ক্ষতি করে এবং বাংলোর অলিন্দে দণ্ডায়মান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও শিক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ ইয়াহিয়া জানের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে। লীগপন্থীদের এই বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য পুলিশ ঐদিন সীমান্ত প্রাদেশিক লীগের প্রাক্তন সভাপতি খান বখৎ জামাল খান ও পেশোয়ার সিটি লীগের সম্পাদকসহ অপর ১৪ জন লীগনেতাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে।

ক্রমে এই আন্দোলন ডেরাইসমাইলখান, বান্নু, টঙ্ক প্রভৃতি সহরে ছড়াইয়া পড়ে ও সহর ছাড়াইয়া গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং লীগের মন্ত্রীমণ্ডল বিরোধী আন্দোলন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনেও পরিণত হয়। সীমান্তের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইহাদের হাতে নিহত হইতে লাগিল, তাহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল, ধর্ম্মস্থান কলুষিত হইল এবং তাহাদিগকে জোরপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইল।

মার্চ মাসে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড দেখা দিলে সীমান্তের এই উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। লীগপন্থীরা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাত্রা আরও চড়াইয়া দিল। ৯ই মার্চ পেশোয়ারের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া এবং স্থলপথেরও যোগাযোগে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কয়েক দিনের জন্য পেশোয়ারকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। ইহার পর হইতে বিক্ষোভকারীরা সরকারী আদালত ও অফিস সমূহের সম্মুখে পিকেটিং, সরকারী ভবনে লীগ পতাকা উত্তোলন, অফিসের নথিপত্র বিনষ্ট করা, রেল লাইন তুলিয়া ফেলা, ট্রেনের গতিরোধ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে হত্যা করা, ষ্টেশনে জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া পাকিস্থানী টিকিট বিক্রয় করা, গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি বে-আইনী কার্য করিতে থাকিল। মাঝে মাঝে বোর্থা পরিহিত মহিলারাও শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কোথাও কোথাও পিকেটিং আরম্ভ করিল।

২১শে মার্চ নমাজের পর এক জনতা হাজারা জেলার মনসেরায় একটি

বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। তাহাতে একশত দোকান ভস্মীভূত হয় এবং কয়েক ব্যক্তি হতাহত হয়।

১৫ই এপ্রিল এক অগ্নিসংযোগের ফলে ডেরাইসমাইলখান বাজারে প্রায় চারশত দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া একটি সিনেমা হল, টাউন হল, দুইটি ধর্মস্থান, একটি কলেজ, একটি বিদ্যালয় ও একটি সরাই ভস্মীভূত হয়। ডেরাইসমাইলখান জেলায় ১৫ই হইতে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে ১১৮ জন নিহত ও ৮১ জন আহত হয়। ডেরাইসমাইল-খান সিটি কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভগবান দত্তওয়াধা বলেন যে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত ডেরাইসমাইলখান সহরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২ কোটী টাকা এবং মালপত্রসহ ভস্মীভূত দোকানের সংখ্যা এক হাজার।

ডেরাইসমাইলখান জেলার কোল সাহাম, শের কোট, বুন্দ, খান্দুখেল, টাকওয়ারা, হাথালা, পোরী প্রভৃতি গ্রামে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্মান্তরিতকরণ চলিতে থাকে। আন্দোলনকারীরা কয়েকজন মন্ত্রীর প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে।

সীমান্তের অবস্থা এইভাবে চরমে উঠিলে ২৮শে এপ্রিল বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একদিনের জন্য সীমান্ত সফরে বাহির হইলেন। তিনি সীমান্তের আন্দোলন সম্পর্কে গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং স্থানীয় লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিলেন। এমন কি কয়েকজন বন্দী লীগ-নেতাকে বিমানযোগে নয়াদিল্লী গিয়া হাঙ্গামা সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত পরামর্শ করিবারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মিঃ জিন্নার সহিত লীগ নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সত্ত্বেও কিছুই হইল না। মে মাসের প্রথম দিকে সীমান্তের লীগ নেতারা আন্দোলন প্রত্যাহার না করিবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিন্নাও নয়াদিল্লী হইতে এক বিবৃতিতে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন।

লীগের আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা স্থানীয় লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন। উপদ্রুত স্থানে যথেষ্টসংখ্যক পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করিয়া এবং খোদাইখিদমদ্‌গার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আনাইয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীমান্তের এই ধ্বংসাত্মক বে-আইনী কার্যকলাপ অতি সহজেই দমন করা যাইত, যদি না সীমান্ত গভর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারো মন্ত্রীমণ্ডলীকে ডিঙাইয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে যাইতেন। তিনি মন্ত্রীদের কাজে বরাবর বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। এমন কি বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং লীগের সন্তুষ্টিসাধনের জন্য প্রদেশে পুনরায় নূতন নির্বাচনের যাহাতে ব্যবস্থা করিতে পারেন, বড়লাটের সহিতও এসম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারীরা এক দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর, অপর দিকে গবর্ণরের এই দ্বৈত আনুগত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়ায় দুষ্কৃতকারীরা তাহাদের কাজে আরও সুবিধা পাইল। ইহা ছাড়া আন্দোলনকারীদের অনেকে উপজাতি এলাকায় আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে লাগিল এবং নিজেদের প্রচারের দ্বারা অনেক উপজাতিকেও বিভ্রান্ত করিয়া দলে ভিড়াইল। এই উপজাতি অঞ্চলে সীমান্ত গবর্ণরের এক বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে, এখানে মন্ত্রীসভার কোনও হাত নাই। পলিটিক্যাল এজেণ্টেরা এই সকল উপজাতি এলাকায় খোদাইখিদমদগার বাহিনীকে মোটেই প্রবেশ করিতে দেয় না, অথচ লীগপন্থীদের প্রচারের সুযোগ দিয়া থাকে।

সীমান্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গিয়া ৯৩ ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকিলে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এসম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলেন এবং সমগ্র দেশব্যাপী ইহা লইয়া আন্দোলন করিবারও আভাষ দিলেন। কারণ মাত্র একবৎসর পূর্বে যাহারা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছে, সেখানে পুনরায় নির্বাচনের কোনও প্রশ্নই থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া সীমান্তের ব্যবস্থা পরিষদে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন কংগ্রেসী সদস্য, ২জন স্বতন্ত্র, ১জন আকালী শিখ ও মাত্র ১৭ জন লীগপন্থী। এখানে কংগ্রেস অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

গবর্ণর স্যার ওলাফ ক্যারোর নূতন নির্বাচনের আগ্রহ সম্পর্কে খান আবদুল গফুর খান বলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি সত্যই আগামী বৎসরে ভারত ত্যাগ করে তাই গভর্ণর লীগের খান ও নবাবদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ খোদাই খিদমদ্‌গার আন্দোলনের সময় উহারাই বৃটিশকে সর্বোপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। লীগবন্ধু স্যার ক্যারো, বড়লাট পেশোয়ারে যাইলে লীগপন্থীদের দ্বারা সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। খান আবদুল গফুর খান আরও বলেন যে ১৯৩০ সালে পেশোয়ারে 'কিস্‌খানি' হত্যাকাণ্ডের সময়ে এই ক্যারোই তখন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য যুগল কিশোর ও দেওয়ান চমনলাল সীমান্তের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহারা সীমান্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতে তাঁহারা বলেন, সীমান্তে লীগের আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে শত শত লোক খুন হইয়াছে, শত শত দোকান ও গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন স্থানে বহুলোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে। তাঁহারা বিবৃতিতে আরও বলেন যে, বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত সহযোগিতা করিয়া কার্য করিতে পারেন, স্যার ওলাফ ক্যারোর পরিবর্তে সীমান্তে এখনই এরূপ একজন গবর্ণর নিয়োগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সীমান্তে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লীগের আন্দোলন চলিতে থাকিলেও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব সীমান্তের লীগ পন্থীদের উদ্দেশ করিয়া বলেন, আমরা যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম, তখন উহারাই বৃটিশের সহায়ক হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে মতলব আঁটিত। তাহা সত্ত্বেও আমি এখন বলিতেছি যে উহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নাই। আমরা সকলেই পাঠান সন্তান, আমাদের লক্ষ্য বৃটিশকে ভারত হইতে তাড়ান, তখন সেই স্বাধীন ভারতে প্রত্যেকেরই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা বিষয়ে সমান অধিকার থাকিবে।

এই সময়ে ভারতে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের জন্য বড়লাটের উদ্যোগে গান্ধী-জিন্না আবেদন প্রচারিত হইলে সীমান্ত সরকার প্রদেশের সকল লোককেই এই আবেদনে পূর্ণ সহানুভূতি প্রদানের কথা বলেন এবং জানান যে, যে সকল রাজনৈতিক বন্দীর বিরুদ্ধে কোন হিংস কার্যকলাপের অভিযোগ নাই, অবস্থা একটু শান্ত হওয়া মাত্রই তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে। এরূপ রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। কিন্তু সীমান্তের লীগ আন্দোলনে গান্ধী-জিন্না আবেদন কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না এবং দাঙ্গাও এতটুকু শান্ত হইল না। সমগ্র প্রদেশ জুড়িয়াই একপ্রকার হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি লাগিয়া রহিল।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বরাবরই অহিংসায় বিশ্বাসী। ইহা দেখিয়া সীমান্তের জনসাধারণ লীগের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে এবং উহার নাম দেয় "জালেমি পাখতুন" (তরুণ আফগান)। ইহার লক্ষ্য হইল শুধু আত্মরক্ষা, আক্রমণ নহে। ইহা অহিংসায় বিশ্বাসী খোদাই খিদ্‌মদ্‌গার বাহিনী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জালেমি পাখতুনের পাল্টা জবাব হিসাবে লীগও এক সশস্ত্রবাহিনী গঠন করিল এবং তাহার নাম দিল গাজী পাখতুন।

মিঃ জিন্না সীমান্তের লীগ নেতাদের আন্দোলন প্রত্যাহার না করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা হিন্দু বা শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছি না, আমরা সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত গ্রহণ করিবার জন্যই লড়াই করিতেছি। কিন্তু মিঃ জিন্না ভুলিয়া যান যে মাত্র একবৎসর পূর্বেই সীমান্তের অধিবাসীরা তাঁহাদের প্রকৃত অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন। নির্বাচনে লীগকে অধিকাংশ স্থলেই পরাজিত করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন তাহারা কংগ্রেসেরই সমর্থক। আর মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুচরেরা সীমান্তের লীগ আন্দোলনকে শুধু মন্ত্রিমণ্ডল বিরোধী আন্দোলন বলিয়া প্রচার করিলেও ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে ইহা সেই সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনও বটে। তাহা না হইলে ভারতের মধ্যে যে প্রদেশে হিন্দু ও শিখরা সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অল্প ও মুসলমানরাই সর্বাধিক সংখ্যায় গরিষ্ঠ সেখানে এত হিন্দু ও শিখকে হত্যা করা হইল কেন। লীগ সীমান্তের হিন্দু ও শিখদের হত্যা করিয়া বিহারের প্রতিশোধ বলিয়া হয়ত কিছুটা আত্মপ্রসাদলাভ করিতে পারে কিন্তু ভুয়া ও মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তাহারা সহজে বীর পাঠানদের উপরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩রা জুনের বৃটিশ পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে, লীগ সভাপতি মিঃ জিন্না ঐ দিন নয়াদিল্লী হইতে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় সীমান্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী ৪ঠা জুন সীমান্ত লীগ সমর—পরিষদ আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই ভাবে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সাড়ে তিনমাস কাল সীমান্তে লীগের আইন অমান্য আন্দোলন চলিবার পর তাহা বন্ধ হইল। লীগ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার দিনই ৪০০ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরে আরও বন্দীদের মুক্তি দান করা হয়।

৩রা জুনের বৃটিশ প্রস্তাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যদিও উক্ত প্রদেশের নির্বাচিত ৩ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ইতিমধ্যেই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; তথাপি পাঞ্জাবের অধিকাংশ সদস্য বর্তমান গণপরিষদে যোগদান না করায় এই প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া, সীমান্তের জনসাধারণ বর্তমান গণ-পরিষদ না পাকিস্থান গণ-পরিষদ কোনটিতে যোগদান করিবে তাহা জানিবার জন্য গণ-ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

লীগ ইতি মধ্যেই সীমান্তের গণ-ভোটে যাহাতে জয় লাভ করিতে পারে তাহার তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছে। লীগ নির্বাচনে জিতিবার জন্য হিংসা পথ অবলম্বন করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তাই এই লইয়া সীমান্তে আবার না একটা হাঙ্গামা হয়, ইহাই আশঙ্কা হইতেছে।　　৬।৬।৪৭

দেউলিয়া

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

মনের আড়ালে
যাহা কিছু মোর
সঞ্চিত হ'য়েছিল,
এক এক করি
আজি এ প্রভাতে
নব সাজে দেখা দিল।

বিচারক হ'য়ে
বসিয়াছি আজ
সঞ্চিত স্মৃতি মাঝে।
পরখ করিতে
পাথের বলিয়া
কোন্ স্মৃতিটুকু আছে।

সঞ্চিত যাহা
ছিল এতদিন
সারা জীবনের সাথে।
কিছুই তাহার
লাগিল না কাজে
ওপারে যাবার রাতে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৫

আমরা সেই প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম যে, ধ্বংস স্তূপের মধ্য দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ নিম্নদিকে ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়াছে। পথটি এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার, কিন্তু এত সঙ্কীর্ণ যে কেবল একজন ব্যক্তিমাত্র সহজে এই পথ দিয়া গমন করিতে পারে। দুই পার্শ্বে প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড, বালুকা ও ধূলারাশি উচ্চ প্রাকার রচনা করিয়াছে। আমরা একৈক শ্রেণীবিন্যস্ত হইয়া এই পথ বাহিয়া ভগ্ন দুর্গের মধ্যে আমাদিগের অস্ত্রাগারাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সর্ব্বাগ্রে ছিল নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, তাহার পশ্চাতে ছিলেন আর্য্য অর্হতপাদ মহাস্থবির, তৎপরে ছিলাম আমি এবং আমার পশ্চাতে প্রজ্ঞা-শেখর-প্রমুখ নায়কগণ। আমরা সকলে এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে আমরা একটি নাতি-ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। এই অঙ্গনের তিন দিক অত্যুন্নত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ পরিবৃত।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে সাতটি প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া অস্ত্রাগারে পরিণত করা হইয়াছে। কক্ষগুলি দীপালোকে উদ্ভাসিত। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততম কক্ষে আমরা সকলে প্রবেশ করিলাম। সমগ্র কক্ষতল পশুলোম নির্ম্মিত পেলব সুকোমল আস্তরণ বিমণ্ডিত। আমরা সকলে কক্ষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। আমাদের সম্মুখে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বসিল। তাহার পার্শ্বে পড়িয়াছিল কুণ্ডলীকৃত দুইটা মনুষ্য নামধেয় জীব। তাহাদের হস্তপদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ এবং তাহাদের চক্ষু বস্ত্রদ্বারা অতি সতর্কতার সহিত সম্পূর্ণরূপে আবৃত—অনুমান হয় বাহিরের আলোকের ক্ষীণ রেখাও তাহাদের নয়ন স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আমি কীর্ত্তিবর্ম্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি?"

যে কক্ষে আমরা বসিয়াছিলাম তাহার দ্বারদেশে বাহিনীর দুইজন সদস্য কোষমুক্ত অসি হস্তে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং আরও নয়জন সদস্য সশস্ত্র হইয়া সম্মুখের প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছিল। তাহারাও প্রহরীর কার্য্যে ব্যাপৃত এবং বাহিরের অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের অনধিকার আগমন প্রতিরোধে সম্যক্ প্রস্তুত ও সম্পূর্ণ সজাগ।

আমার প্রশ্নের উত্তরে কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি মন্ত্রণা সভায় যথা সময়ে যাইতেছিলাম, পথে এই দুই ব্যক্তিকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখিতে পাই। প্রথমে একজনকে বনের মধ্য দিয়া আমাকে অনুসরণ করিতে দেখিতে পাই। আমাদের বাহিনীর মন্ত্ররক্ষামণ্ডলী সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ এই অরণ্যের মধ্যে এবং সর্ব্ব সময়ে, কয়েকজনকে যে কোনও প্রকার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত রাখিয়া থাকে। আমি দাঁড়াইলাম এবং পিছনে চাহিয়া দেখিলাম কে—যেন একটা বৃক্ষের উপর হইতে একটা ভগ্ন শাখা নাড়িয়া আমাকে সঙ্কেত করিল যে, এই গুপ্তচর আমাদিগের মণ্ডলী নিযুক্ত প্রহরীর লক্ষ্য এড়াইতে পারে নাই। আমি একটা সুদীর্ঘ বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া আন্দোলন পূর্ব্বক আমাদের মণ্ডলী-নিযুক্ত সঙ্কেতকারী প্রহরীকে আমার নিকট ডাকিলাম। সে নিঃশব্দে আমার নিকটে আসিয়া অনুচ্চস্বরে আমাকে জানাইল যে, দূরে আরও একজন চর বনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে; তাহাকেও একজন প্রহরী লক্ষ্য করিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিতে ও চরদিগকে বন্দী করিতে আজ্ঞা দিলাম। আমাদের রক্ষামণ্ডলীর সদস্যগণ বন ঘিরিয়া ফেলিল এবং

এই দুই ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিল। ইহাদের বন্দী করিয়া আনিতে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা ব্যতীত আর কেহ ইহাদের যে সহকর্ম্মী কোথাও লুক্কাইত ছিল না বা নাই, তাহার নিশ্চয়তা আছে কি?"

—আমাদের মন্ত্ররক্ষামণ্ডলী সমগ্র অরণ্য পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিয়া আর কাহারও সন্ধান পায় নাই।

—ইহাদের বন্দী করিবার সমস্ত ব্যাপারটা আমরা শুনিতে চাই। কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ইহাদের বিচার কার্য আরব্ধ হইবে।

—ইহারা সশস্ত্র ছিল এবং ধৃত হইবার পূর্ব্বে অস্ত্র বাহির করিয়া আমাদের মণ্ডলীর সদস্যগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা স্বল্পায়াসেই ইহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া ও হস্ত-পদ রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া এখানে আনিয়া ফেলিয়াছি। ইহারা আমাকে অনুসরণ করিবার সময়ে গমন পথে ও বনের মধ্যে যে সকল নিদর্শন নিজেদের সপক্ষ কর্ত্তৃক ইহাদের অনুসন্ধান সুগম করিবার জন্য, অথবা ইহাদের আপনার পথ চিনিয়া বন হইতে বাহির হইবার জন্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল, তাহাও আমরা সযত্নে ও সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এই ব্যাপারের জন্য আমাকে অনেকক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল এবং এই কারণেই আমি অদ্যকার সন্ধ্যার মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম হইয়াছিলাম।

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "প্রথমে নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতির বিচার হউক। আমার মতে বর্ত্তমান চর প্রতিরোধ কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনায় কীর্ত্তিবর্ম্মণের অদ্যকার মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি মার্জ্জনীয়।"

সকলের ঐক্যমতে কীর্ত্তিবর্ম্মণের মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিতি অপরাধ বলিয়া গণনা করা সমীচীন হইল না। সকলেই বলিল যে, কীর্ত্তিবর্ম্মণ গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের জন্য মন্ত্রণা সভায় অনুপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং যেহেতু সে কোনও অপরাধই করে নাই, তখন তাহাকে মার্জ্জনা করারও কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই প্রস্তাব সর্ব্বানুমোদিত হইলে শেখর বলিল, "কীর্ত্তিবর্ম্মণের সতর্কতার দ্বারা এবং সে তাহার কর্ত্তব্যের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়ায় সংঘ একটা ঘোর বিপদ হইতে আজ মুক্তিলাভ করিল। এই ঘোর আকস্মিক বিপদ হইতে সংঘকে মুক্ত করিবার জন্য সংঘ কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ রহিল এবং অতঃপর কীর্ত্তিবর্ম্মণ মন্ত্ররক্ষণ মণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষরূপে বৃত হউক।"

সংঘকর্ত্তৃক এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইল এবং মহাস্থবিরের অনুজ্ঞা ও উপদেশ মত, সর্ব্বানুমতিক্রমে আমি নায়কের কপালে শ্বেতচন্দনের টীকা রচনা করিয়া দিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে বলিলাম "এখন চরদিগের বিচারকার্য্য আরম্ভ হউক।"

মহাস্থবির বলিলেন "হাঁ, তাহাই হউক!" নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহাদিগকে সংঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া দাও এবং ইহাদের স্বপ্রথানুযায়ী সংঘকে অভিবাদন করিতে আদেশ কর!

একজন সংঘসৈন্য কীর্ত্তিবর্ম্মণের ইঙ্গিতে বন্দীদিগের পদ রজ্জুমুক্ত করিল এবং দুইজনের এক একটা পদে এক একটা লৌহবলয় দৃঢ়রূপে পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর ঐ বলয় দুইটি একটি সার্দ্ধ একহস্ত দীর্ঘ শৃঙ্খল দ্বারা যুক্ত করিয়া ঐ শৃঙ্খলের মধ্যভাগে আর একটা দীর্ঘ শৃঙ্খল সংযুক্ত করিয়া উহার অপরপ্রান্ত গৃহপ্রাচীরে প্রোথিত একটা দৃঢ় লৌহ-শলাকায় সংলগ্ন করা হইল।

ইহাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলে ইহারা তাহা পালন করিতে অস্বীকার করিল। তখন কীর্ত্তিবর্ম্মণ সংঘের অনুমতিক্রমে লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ইহাদের দেহে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে অতি অল্পক্ষণ পরেই বীরদ্বয় উঠিতে বাধ্য হইল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাবনিকপ্রথায় সংঘকে অভিবাদন করিল। আমরা হাসিলাম।

আমি আর্য্য মহাস্থবিরকে অনুরোধ করিলাম বন্দীগণের পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য। দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকার ব্যক্তি আমার পরিচিত এবং আমার প্রাক্তন

গৃহশিক্ষক। সে পুরুষপুর নগরে ডেমিট্রিঅস নামে খ্যাত। তাহার সমগ্র ইতিহাস সভায় জ্ঞাপন করিলাম।

মহাস্থবির প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, বন্দীগণ, এখন তোমরা কি স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রভাবে তোমাদের পরিচয় সংঘের নিকট জ্ঞাপন করিবে? না, তাহার জন্য আবার কীর্ত্তিবর্ম্মণকে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে?"

বন্দী ডেমিট্রিঅস্ বলিল, "আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন তাহা করিতে পারেন, আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

মহাস্থবির বলিলেন, "বেশ! তোমাদের সুমতি হইয়াছে দেখিতেছি! আচ্ছা, বলত ভাই তোমাদের নাম কি।"

ডেমিট্রিঅস্ বলিল, "আপনি কি আমাদের সকলকে একত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেছেন? আমরা কয়জন এই অবস্থায় আছি তাহা ত আমি জানি না। আমার চক্ষু খুলিয়া দিলে আমি বুঝিতে পারিব আপনি কাহার উদ্দেশ্যে আপনার প্রশ্ন করিতেছেন।"

মহাস্থবির বলিলেন, "চক্ষুর বন্ধনী এখন খুলা হইবে না। আমি তোমাকেই প্রশ্ন করিতেছি। তোমার নাম বল।"

—আমার নাম "জেনোফিলস্ পলিক্রিট্টস্।"

—মিথ্যা বলিতেছ।

—না, মিথ্যা বলি নাই।

—আমরা তোমার যথার্থ নাম জানি। তুমি তাহা বলিবে কি? না, তোমাকে তোমার যথার্থ নাম আমরা বলাইব? কিন্তু, তাহা তোমার পক্ষে, অন্ততঃ তোমার শরীরের পক্ষে বড় শুভ বা স্বস্তিপ্রদ হইবে না।

—আমি আমার নাম গোপন করি নাই।

—আমরা তোমার পরিচয় জানি।

—আমার যে পরিচয় আপনারা জানেন তাহাই যে আমার যথার্থ পরিচয়, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

—তাহা পরে জানিবে। এখন সহজে তোমার যথার্থ নাম সংঘকে জানাইবে কি? না, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে?

—আমি আমার যথার্থ নামই বলিয়াছি।

—তুমি যে ডেমিট্রিঅস্ নামে পুরুষপুরে অনেকের নিকট পরিচিত আছ তাহা কি তোমার যথার্থ নাম নহে?

—আমি নগরে কাহারও নিকট ডেমিট্রিঅস্ নামে পরিচিত নহি এবং ছিলাম না।

—তুমি কি এই নগরে কোনও বৌদ্ধ গৃহপতির বাটীতে তাঁহার পুত্রকন্যার গৃহশিক্ষকরূপে কখনও নিযুক্ত ছিলে না?

—না, ছিলাম না।

—মনে করিয়া দেখ দেখি—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তাহার পর সেই গৃহপতিই তোমাকে আবার ক্ষত্রপের শাসন-বিভাগে এক মণ্ডলেশ্বরের অধীনে এক কর্ম্মে নিযুক্ত করাইয়া দিয়াছিলেন। এখনও অবধি সেই কার্য্যেই তুমি নিযুক্ত আছ।

—না, সেরূপ কোনও কথা আমার স্মরণ হয় না।

—এই চারের কর্ম্ম তোমার অন্নসংস্থানের জন্য সর্ব্বজন-বিদিত কার্য্য নহে; তুমি চারের কার্য্য তোমার অবকাশ মত করিয়া থাক এবং তাহার জন্য তুমি স্বতন্ত্র বেতন ও পুরস্কার পাইয়া থাক। কেমন? ঠিক না? অস্বীকার করিবে কি?

—না, ঠিক নহে; ইহা ভ্রান্ত অনুমান মাত্র।

—বনের মধ্যে ঢুকিয়াছিলে কেন?

—উদ্দেশ্য ছিল মৃগয়া এবং এই বনভূমি মৃগয়ার উপযোগী কিনা তাহাই আমরা পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত ছিলাম।

—তোমরা সশস্ত্র ছিলে, কেমন?

—ছিলাম।

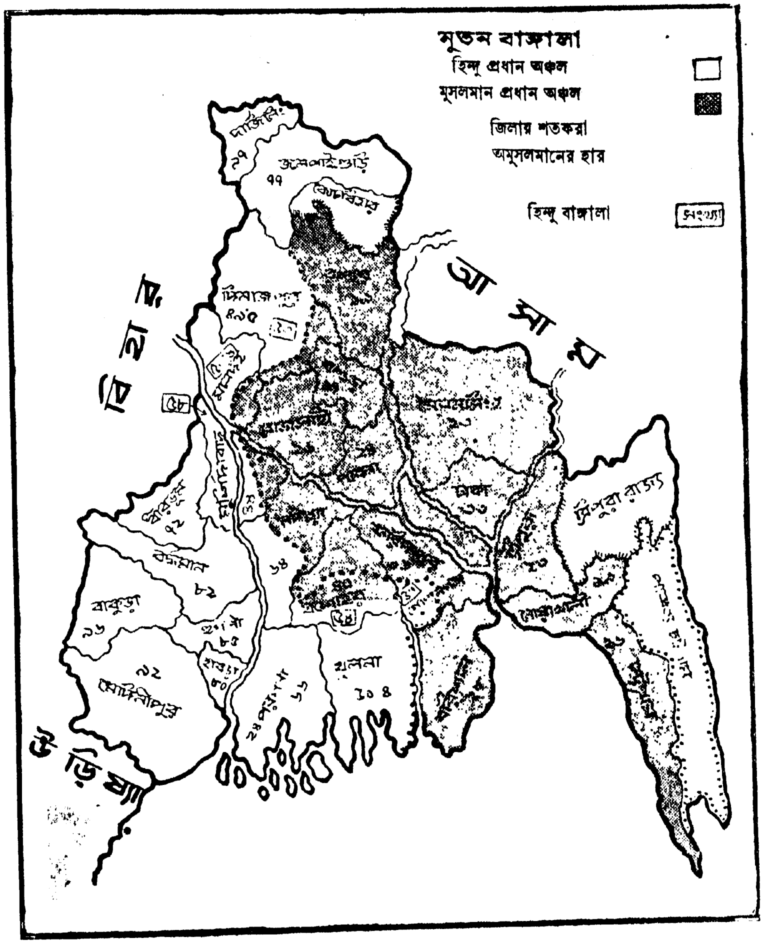
—কি কি অস্ত্র তোমাদের ছিল?

—শরপূর্ণ তূণ, ধনু, ভল্ল, শূল, পরশু ও তরবারি।

—এই সকল অস্ত্র কি মৃগয়াভূমি পর্য্যবেক্ষণ বা মৃগয়ার জন্য আবশ্যক হয়?

—না হইতে পারে, কিন্তু অপরিচিত বনভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে একটু সতর্ক হইতে হয়, তজ্জন্য আমরা অজ্ঞাত ও আকস্মিক কোনও বিপদের আশঙ্কায় বিশেষভাবে সাবধান হইয়া আসিয়াছিলাম। বনভূমিতে দস্যু ত থাকিতে পারে; আমাদের এরূপ সম্পূর্ণরূপে সশস্ত্র হইয়া আসার উদ্দেশ্য বন্যপশু, দস্যু ও অপর কোনও অজ্ঞাত আততায়ীর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা।

ক্রমশঃ



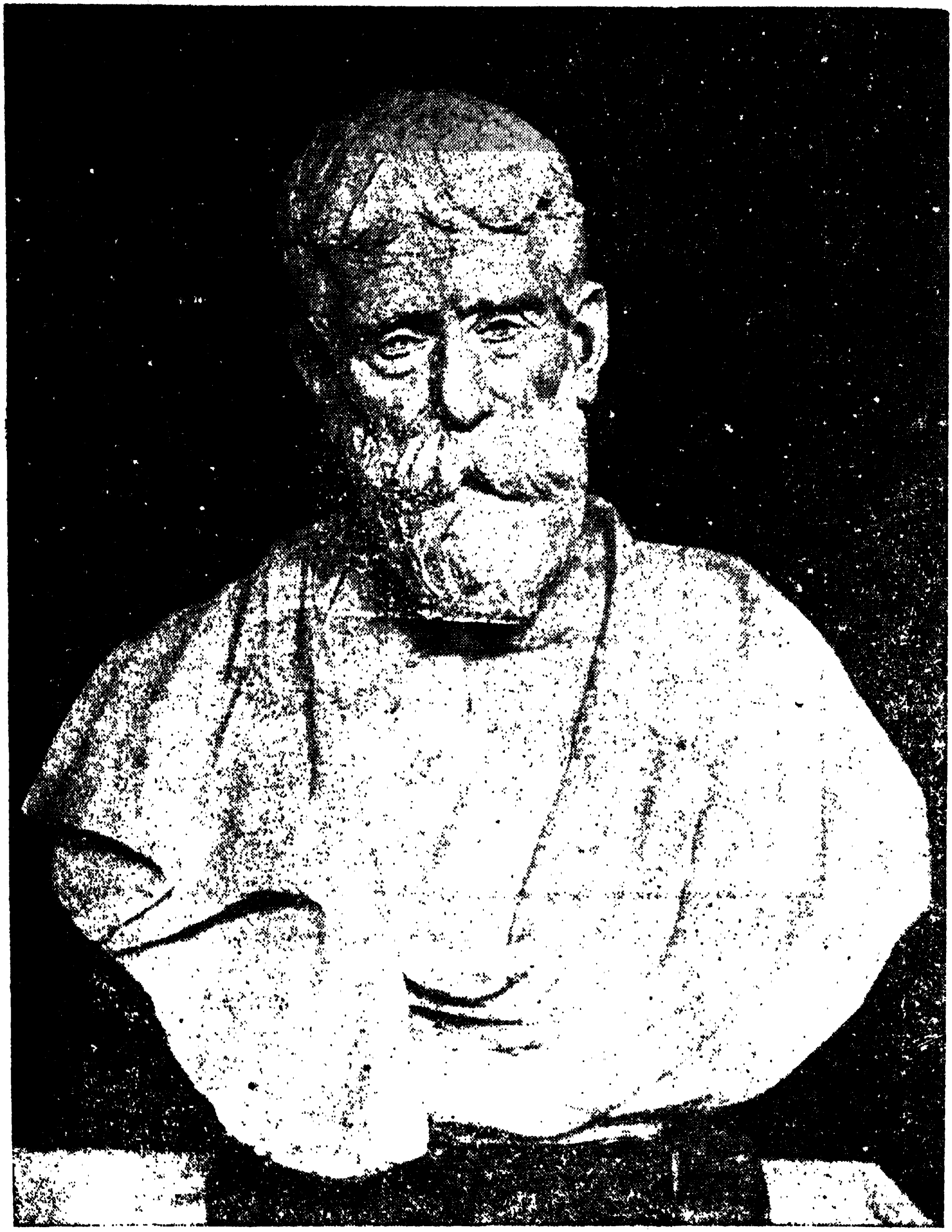
এই সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের—'নূতন বাঙ্গালা প্রদেশের পরিকল্পনা' নামক প্রবন্ধের ম্যাপ

টুক্‌রো কবিতা

(মিনতি)

শ্রীলীলাময় দে

অধরের সনে অধর মিলনে
আঁকিল যে প্রেমচিহ্ন
সেই ত আমার পূজার কুসুম
করো না তাহারে ছিন্ন।
অবসর ক্ষণে মুকুরের মুখে
তুলিয়া অধরখানি
ওষ্ঠের রেখা সাদরে সোহাগে
অন্তরে নিও টানি।
সে যে সরমের শঙ্কিত শিখা
স্বপ্নে জাগিয়া রয়
আমার প্রেমের চিহ্ন যেন গো
তোমারেই করে জয়।



আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্রোঞ্জমূর্ত্তি

(বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের জন্ত প্রস্তুত)   শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—মাদ্রাজ

সাময়িকী

বড়লাটের ঘোষণা—

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কয়দিন বিলাতে থাকিয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের সহিত ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি ভারতে ফিরিয়া ২রা জুন ভারতের ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শের পর ৩রা জুন নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করেন—

"গত মার্চ্চ মাসের শেষে এদেশে আসিয়া পৌঁছিবার পর আমি প্রায় প্রত্যহই নানা সম্প্রদায় ও দলের বহুসংখ্যক প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে যে সকল তথ্য এবং পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সদ্ভাব সহকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি একটি অবিভক্ত ভারতীয়রাষ্ট্র বজায় রাখিতেন তবে তাহাই হইত সমস্যার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সমাধান—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত কয় সপ্তাহে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। গত একশত বৎসরের উপরে আপনারা ৪০ কোটি লোক এক সঙ্গে বসবাস করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ একটি গোটা দেশ হিসাবেই শাসিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দেশের জন্য একই চলাচল ব্যবস্থা, একই দেশরক্ষা, ডাক ও মুদ্রানীতির ব্যবস্থার কাজ চলিতেছে। ইহার ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক ও বাণিজ্যঘটিত কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই; ইহার জন্যই একটি অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে এই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে না—আমার মনে এই প্রত্যাশা প্রবল ছিল। সেইজন্যই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মন্ত্রী মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি পুরাপুরিরূপে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মানিয়া লইয়াছেন এবং আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সমুদয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী মিশনের কিংবা ভারতের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল—যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যবিশিষ্ট গভর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতে বাধ্য করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বলপ্রয়োগে বাধ্য করার পরিবর্ত্তে যে উপায় আছে তাহা হইল অঞ্চল বিভক্তকরণ। কিন্তু মুসলীম লীগ যখন ভারত বিভাগের দাবী তুলিল তখন কংগ্রেসের তরফ হইতে ঠিক একই যুক্তির দ্বারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশ বিভাগের জন্য দাবী উঠিল। আমার মতে এই যুক্তি অখণ্ডনীয়। বস্তুতঃ কোন পক্ষই নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বৃহৎ অঞ্চলকে অন্য সম্প্রদায়ের গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাখিতে সম্মত হন নাই। অবশ্য আমি নিজে ভারত বিভাগেরও যেমন পক্ষপাতী নই, প্রদেশ বিভাগও তেমনি সমর্থন করি না। উভয় ক্ষেত্রেই না করিবার কারণ এক এবং মৌলিক। সাম্প্রদায়িক মত-বিরোধের উর্দ্ধে, যেমন ভারতীয় মনোভাব আছে বলিয়া আমার ধারণা, তেমনি বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী মানসিকতা বলিয়া একটা মনোভাব আছে যাহা প্রদেশের প্রতি জনগণের আনুগত্য বোধ জাগাইয়াছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয়, ভারতবাসীদের নিজেদেরই ভাগাভাগি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসন-



বড়লাট ভবনে নিমন্ত্রিত গণপরিষদের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

ক্ষমতা এক বা একাধিক গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন তাহার উপায় এক বিবৃতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা পরে দেওয়া হইল। কিন্তু সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পাঞ্জাব, বাংলা ও আংশিকভাবে আসামের লোকের মনোভাব জানিয়া লইবার জন্য ঐ সকল প্রদেশের মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও বাকী অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে, সীমানির্দ্ধারণ কমিশনই উভয় এলাকার মধ্যে চূড়ান্তভাবে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। সাময়িকভাবে

নির্দ্ধারিত এই সাম্প্রতিক সীমারেখা এবং চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত সীমারেখা একই হইবে না ইহা প্রায় নিশ্চিন্তরূপেই বলা যায়। শিখদের অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হইয়াছে। এই বীরজাতির জনসংখ্যা সমগ্র পাঞ্জাবের জনসংখ্যার প্রায় এক অষ্টমাংশ। কিন্তু তাহারা এমন ছড়াইয়া আছে যে, পাঞ্জাবকে যেমনভাবেই ভাগ করা হউক না কেন, সকল অংশেই কিছু না কিছু শিখ থাকিয়া যাইবেই। আমরা যাহারা অন্তরের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মঙ্গলই কামনা করি, তাহারা ইহা ভাবিয়া দুঃখিত যে শিখসম্প্রদায়ের নিজেদেরই অভীপ্সিত পাঞ্জাব বিভাগের ফলে তাঁহারা নিজেরাই অল্পাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা কত কম বা কত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরেই তাহা নির্ভর করিবে। অবশ্য এই প্রতিনিধি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি থাকিবে। আলোচ্য পরিকল্পনার সবটাই একেবার নিখুঁত নাও হইতে পারে, অন্যান্য সকল পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার সাফল্যও ইহার পরিচালনার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে তাহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত, ইহাই আমার মত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যদি সমগ্র ভারতের জন্য সর্ব্বসম্মত শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি প্রদেশ বিভাগেরও সিদ্ধান্ত হয়। পক্ষান্তরে গণপরিষদগুলি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বেই যদি শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই নাই। এই সঙ্কটপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি যে, আবশ্যক ব্যবস্থাদি করা হইয়া গেলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনই এক বা একাধিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনশীল গবর্ণমেণ্টের হাতে বৃটিশ ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করিবেন। আশা করা যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে। সুখের বিষয়, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করিবার জন্য এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইণ্ডিয়া অফিসের আর বিশেষ কিছু কাজ থাকিবে না। ভবিষ্যতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত কাজকর্ম্মের ভার কোন নূতন দপ্তরের উপর দেওয়া হইবে। সমগ্র ভারতের কিম্বা বিভক্ত হইলে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রস্তাবিত আইনে কোনপ্রকার বাধা নিষেধ



পেশোয়ারে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটন—পার্শ্বে ডাঃ খান সাহেব

আরোপ করা হইবে না ইহা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই। আমাদের মধ্যে চরম আশাবাদীদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবার পথ এখন পরিষ্কার হইয়াছে; অথচ ভারতবাসীগণের উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের ভার রহিল। ইহাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত বৃটিশ ভারতেরই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বলিয়া আমি দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে কোন কিছু বলি নাই।

শান্তি ও শৃংখলার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শেষ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। গত কয়েকমাস যাবৎ যেভাবে বিশৃংখলা ও বে-আইনী ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে তাহা



আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিংএর আগমনে হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনতা   ফটো—শ্রীপান্না সেন

আর চলিতে দেওয়া ত দূরের কথা, এ সময়ে কোন প্রকার দ্বন্দ্বের বা মনোমালিন্যের প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হইবে না। আমরা কিরূপ খাদ্য-সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাওয়া কাহারও উচিত নয়। হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া ত চলিতে পারে না। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত। ভারতবাসীদের সিদ্ধান্ত যে প্রকার হউক না কেন, আমার স্থির বিশ্বাস, বৃটিশ অফিসারদিগকে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে বলিলে তাঁহারা এদেশে থাকিয়া ভারতবাসীদের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। মহামান্য সম্রাট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমাকে ভারতীয়দের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমি ভারতীয়দের মধ্যে আছি বলিয়া আমি গর্ব্ব বোধ করি। ভারতবাসিগণ বিশেষ বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন এবং মিঃ গান্ধী ও জিন্নার মিলিত আবেদনের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কার্য্যকরী করিয়া তুলুন—আমি এই কামনা করি।

পরিকল্পনা

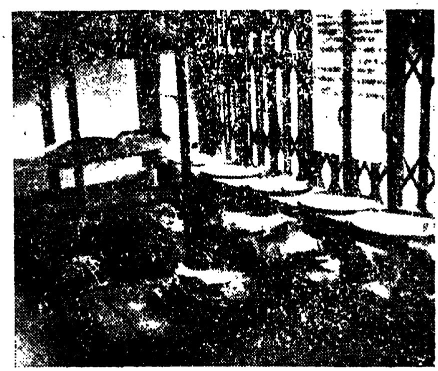
(১) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ-ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিবেন। ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে মন্ত্রী (কেবিনেট) মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন, ভারতীয় প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতায় তাহা কার্য্যকরী করা যাইবে এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র গঠন করা সম্ভবপর হইবে এরূপ আশা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। (২) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং দিল্লী, আজমীঢ়-মাড়বার ও কুর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ ইতিমধ্যেই একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কার্য্যে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং বৃটিশ বেলুচিস্তানের প্রতিনিধিসহ মুসলিম লীগ দল গণপরিষদে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৩। ভারতীয় জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ইচ্ছা। ভারতীয় রাজনৈতিকদলসমূহ একমত হইতে পারিলে এই কাজ অনেক সহজ হইতে পারিত। ঐরূপ ঐক্যের অভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা যাহাতে জানা যাইতে পারে সে উপায় নির্দ্ধারণের ভার বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উপরেই পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একথা বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্পষ্টরূপে জানাইয়া রাখিতেছেন যে, ভারতবর্ষের চরম শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই; ভারতীয়েরা নিজেরাই তাহা করিবেন। এই পরিকল্পনায় এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা



আমেরিকায় ভারতীয়গণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত মিঃ আসফ আলি

ভারতকে অবিভক্ত রাখিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা দ্বারা ঐক্য স্থাপন এবং ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখার পথও এই পরিকল্পনাতে খোলাই রাখা হইল। ৪। বর্ত্তমান গণপরিষদের কাজে বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নাই। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস, নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে যখন বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে, তখন এই ঘোষণার পরে যে সকল প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে ইতিমধ্যেই যোগদান করিয়াছেন সেই সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ-প্রতিনিধিরাও উহাতে যোগ দিয়া উহার কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্র দেশের যে-সকল অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ঐ সকল অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের শাসনতন্ত্র (ক) বর্ত্তমান গণ-পরিষদ কর্তৃক রচনা করিবার পক্ষপাতী কিম্বা (খ) বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নূতন ও পৃথক একটি গণ-পরিষদের মারফতে তাঁহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহা নির্দ্ধারণের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায় হইল নিম্নে বর্ণিত পন্থাটি,—এবিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। এই বিষয়টি স্থির হইয়া গেলে পরে কোন্ এক কিম্বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে। ৫। বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক আইনপরিষদকে (ইউরোপীয় সদস্যদের বাদ দিয়া) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন

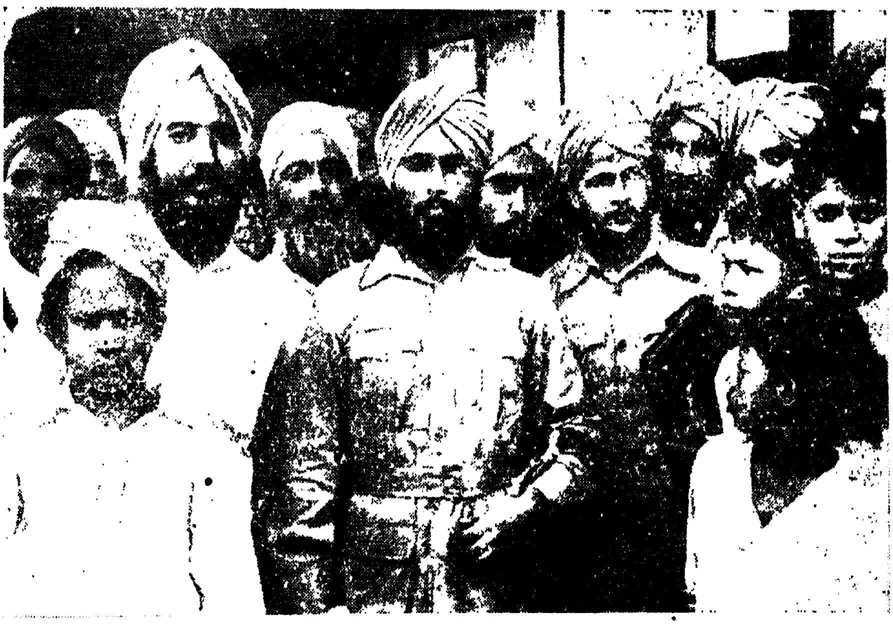


চিনির অভাবে কলিকাতার একটি বিশিষ্ট খাবারের দোকানের অবস্থা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

করিতে বলা হইবে;—এক অংশে থাকিবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিগণ, অন্য অংশে থাকিবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলার লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য ১৯৪১ সনের আদমসুমারিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে। (এই ঘোষণার পরিশিষ্টে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে)। ৬। প্রদেশ বিভক্ত হইবে কি না সে সম্বন্ধে, মতামত দিবার ক্ষমতা উভয় প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের পৃথকভাবে মিলিত প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে। বিভক্ত ব্যবস্থা পরিষদের কোন একটি অংশ সাধারণ ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেই প্রদেশ বিভক্ত হইবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হইবে। ৭। পরিণামে যদি প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়, তবে ঐ অবিভক্ত প্রদেশ কোন্ গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রাদেশিক আইন-সভার মুসলমান-প্রধান ও অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের জানা দরকার।

সুতরাং উভয় আইন পরিষদের কোনও প্রতিনিধি যদি দাবী করেন, তাহা হইলে, ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে আইন সভার সমুদয় সদস্যদের লইয়া এক পূর্ণ অধিবেশন বসিবে এবং সেখানে ভোটের দ্বারা স্থির হইবে—প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমগ্র প্রদেশটি কোন্ গণ-পরিষদে যোগদান করিবে। ৮। প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রদেশের নিজ নিজ অংশের প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন, উপরে লিখিত ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) ও (খ) এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। ৯। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে, সিদ্ধান্ত করার সুবিধার জন্য বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন সভার সদস্যগণ মুসলমান-প্রধান (পরিশিষ্টে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) ও অবশিষ্ট গায়ে গায়ে সংযুক্ত অঞ্চলগুলি অন্য অংশে পড়ে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে, বিবেচনা করিতেও কমিশনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। বাংলার সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কেও সীমানির্দ্ধারক কমিশনকে অনুরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যে প্রযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্প্রতি যে রূপ (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) ভৌগলিক সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাই মানিয়া চলা হইবে। ১০। সিন্ধুর প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ (ইয়োরোপীয় সদস্যগণ বাদে) এক বিশেষ বৈঠক করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। ১১। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র ধরণের। এই প্রদেশের নির্ব্বাচিত



কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—'আই এন এ'র প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

জেলার প্রতিনিধি হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে আইন সভায় বসিবেন। ইহা প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং নিছক সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উভয় প্রদেশকে পাকাপাকি বিভাগ করিতে গেলে ভৌগলিক সীমা নির্দ্ধারণের কাজে খুঁটিনাটি বিচারের প্রয়োজন হইবে। প্রদেশ দুইটির যে কোন একটি বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই মাননীয় বড়লাট একটি সীমা নির্দ্ধারক কমিশন বসাইবেন। এই কমিশনের বিচার্য্য বিষয়গুলি এবং সদস্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে। এই কমিশনকে পাঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমানা নির্দ্দেশ করিতে হইবে যাহাতে যে সকল অঞ্চল জনসংখ্যায় মুসলমানপ্রধান ও গায়ে গায়ে আছে সেগুলি এক অংশে এবং অমুসলমান প্রধান ও তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে দুই জনই বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, সমগ্র পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের কোনও অংশ যদি বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আর একবার পুনর্ব্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী অর্থাৎ পাঞ্জাব কিম্বা পাঞ্জাবের অংশ বিশেষ বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগ না দিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্ত্তমান আইন সভার নির্ব্বাচনে ভোটদাতাদের মতবাদ জানিবার ব্যবস্থা করা

হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে এই গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। ১২। বর্ত্তমান গণ-পরিষদে বৃটিশ বেলুচিস্থানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি একজন থাকিলেও তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশকেও তাহার অবস্থা পুনর্ব্বিবেচনার এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইবে। কী উপায়ে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা বড়লাট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ১৩। আসাম বহুলরূপে অমুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার অন্তর্গত বাংলাদেশের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলাটিতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে শ্রীহট্টকে বাংলার মুসলিম অংশের সহিত যুক্ত করিতে হইবে বলিয়া দাবী উঠিয়াছে। সুতরাং বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে শ্রীহট্ট জেলাটি আসামের সহিতই থাকিয়া যাইবে অথবা নব-গঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সম্মতিক্রমে ঐ প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইবে

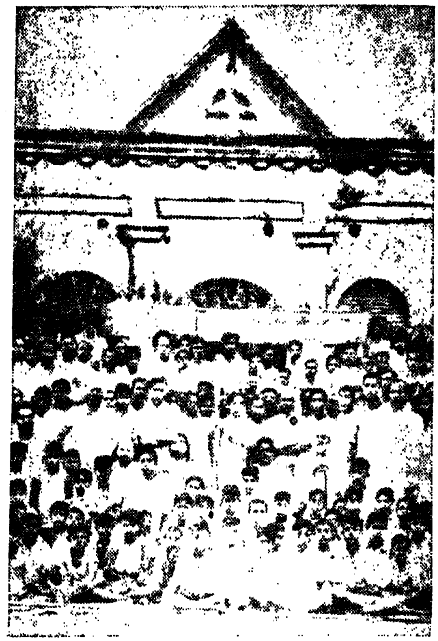


উত্তর কলিকাতার একটি অঞ্চলে প্রতিগৃহে খানাতল্লাসীরত সৈন্যদল

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এ বিষয়ে শ্রীহট্টের জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে ইহা করা হইবে। জনমত যদি শ্রীহট্টকে পূর্ব্ব-বঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করার অনুকুল দেখা যায় তাহা হইলে পাঞ্জাব ও বাংলার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত কমিশনের ন্যায় শ্রীহট্ট জেলার মুসলমানপ্রধান অঞ্চল ও উহার সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তাহার পরে ঐ অঞ্চলগুলিকে আসামপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্ব-বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইবে। সকল অবস্থাতেই আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমানে গণ-পরিষদের কাজে যেরূপ যোগ দিতেছেন সেরূপই যোগ দিতে থাকিবেন। ১৪। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থাই যদি সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মে (১৯৪৬) পরিকল্পনার নীতি অনুযায়ী বিভক্ত অংশের জনসংখ্যার প্রতি দশ লক্ষের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি পুনরায় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সেখানেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এলাকা হিসাবে নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে :—

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
শ্রীহট্ট জেলা	১	২	—	৩
পশ্চিম বঙ্গ	১৫	৪	—	১৯
পূর্ব্ব-বঙ্গ	১২	২৯	—	৪১
পশ্চিম পাঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৬	৪	২	১২



বাঁকুড়া হিন্দু-মিলন-মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—পি-দালাল

১৫। বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিগণ প্রাপ্ত নির্দ্দেশ অনুসারে হয় বর্ত্তমানের গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন অথবা পৃথকভাবে নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিবেন। ১৬। বিভক্তকরণ স্থির হইলে যথাসম্ভব সত্বর বিভক্ত অংশগুলির শাসন পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু করা দরকার হইবে :—(ক) দেশরক্ষা, অর্থ, চলাচল ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ; (খ) ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের

মধ্যে ; (গ) যে প্রদেশগুলি বিভক্ত হইবে সেগুলির বেলায় প্রাদেশিক কর্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি যথা দেনা-পাওনার অংশ বিভাগ, পুলিশ, হাইকোর্ট, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৭। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পর্কে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী যথাযোগ্য শাসন কর্তৃপক্ষের মারফতে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে। ১৮। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছেন যে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি শুধু বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ১৯৪৬ সনের ১২ই মে তারিখের মন্ত্রীমিশনের স্মারক-লিপিতে যে নীতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। ১৯। যাহাতে পরবর্ত্তী শাসন কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আগামী ১৯৪৮ সনের জুন মাসে অথবা সম্ভব হইলে তাহার আরও পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন। তদনুযায়ী যথাসম্ভব সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত এবং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কার্য্যকরী উপায় হিসাবে তাঁহারা এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে (এই ঘোষণার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ স্থির করিবেন) উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চলতি বৎসরেই আইন রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রহিবে কিনা তাহা স্থির করিবার যে অধিকার সেই অংশের গণ-পরিষদের আছে এই আইনের দ্বারা তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না। ২১। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য অথবা অন্যান্য



শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কলিকাতাবাসীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ফটো—শ্রীপান্না সেন

যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন, সেজন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যে পরিণত করা প্রয়োজন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার সর্ত্তসমূহের ব্যত্যয় না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ বা উহাদের বিভক্ত অংশগুলি যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু করিতে পারিবে। বর্ত্তমান গণ-পরিষদ এবং নূতন গণ-পরিষদ (যদি গঠিত হয়) ও নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন। নিজেদের জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়নের অধিকারও তাঁহাদের থাকিবে। ২০। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অবিলম্বে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানাইয়াছেন। এই দাবীর প্রতি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা বিষয় সম্পর্কে বড়লাট প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিবেন।

পরিশিষ্ট

১৯৪১ সনের আদমসুমারী অনুসারে বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুসলমানপ্রধান জেলাগুলির নাম :—

পাঞ্জাব—লাহোর বিভাগ :—গুজরাণওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা ও শিয়ালকোট।

" রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ—এটক, গুজরাট ও ঝেলাম, মিয়ানওয়ালি, রাওয়ালপিণ্ডি, ও শাহপুর।

" মুলতান বিভাগ—ডেরাগাজিখান, ঝাং, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, মুলতান ও মজঃফরগড়।

বাংলা—চট্টগ্রাম বিভাগ :—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

" ঢাকা বিভাগ—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ।

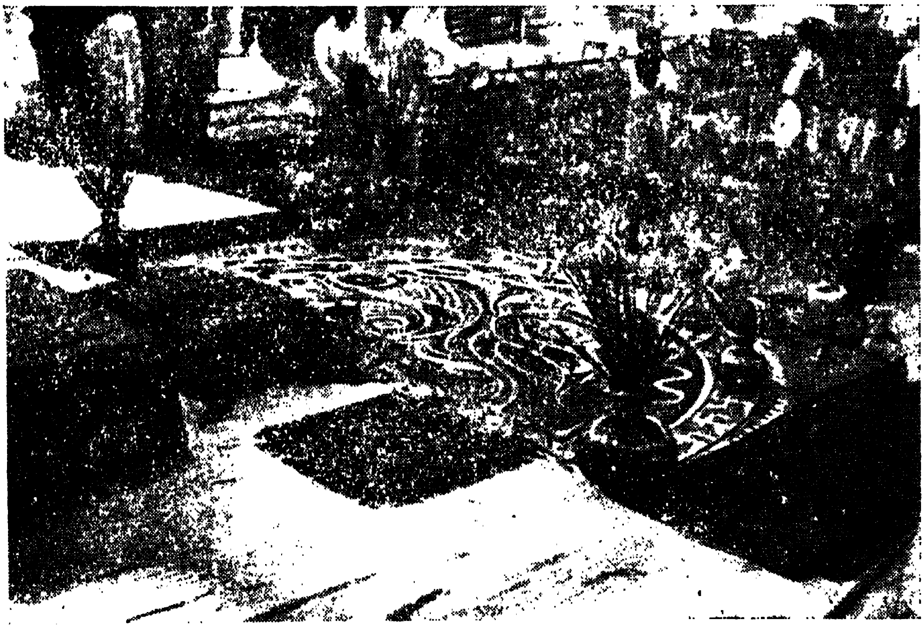
" প্রেসিডেন্সি বিভাগ—যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া।

" রাজসাহী বিভাগ—বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী ও রংপুর।

পরিবর্ত্তে আমাদের পাথর দেওয়া হইয়াছে। আমরা যে পাকিস্থান চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই।" এখন বড়লাট প্রদত্ত এই 'সোনার পাথরবাটী' লইয়া দেশবাসী ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।'

বাঙ্গালা বিভাগ সুনিশ্চিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদকে বড়লাটের ঘোষণা মত দুই



রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে বিশ্বকবির জন্মস্থানের বিশেষ সজ্জা ফটো—শ্রীপান্না সেন

বড়লাটের ঘোষণা ও নেতৃবৃন্দ—

নূতন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বড়লাটের ঘোষণায় দেশবাসী কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; তবে সকলেই 'মন্দের ভাল' হিসাবে এই ঘোষণা মানিয়া লইয়া কাজ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এই প্রসঙ্গে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত কে-এন-যোগলেকার বলিয়াছেন—"নূতন ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসীকে আরও বহুদিন সাম্রাজ্যবাদীদের করতলগত হইয়া থাকিতে হইবে।" আর বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মিঃ মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন বলিয়াছেন—"আমরা মাংস চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার

ভাগে বিভক্ত করিলে পশ্চিম বাঙ্গালায় যে অংশ হইবে তাহার সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে। কাজেই বাঙ্গালা বিভাগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইবে।

হিন্দু সদস্য—সাধারণ—	৪২
জমীদার (প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ)—	২
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—	১
শ্রমিক (দার্জ্জিলিং চা-বাগান ও রেল শ্রমিক প্রতিনিধি (কম্যুনিষ্ট) ব্যতীত—	৬
বণিক—	৪
মহিলা—	১
মোট—	৫৬

ভারতীয় খৃষ্টান—	১
এংলো-ইণ্ডিয়ান—	৪
মুসলমান সদস্য—সাধারণ—	১৮
শ্রমিক—	২
(নৌ-শ্রমিক ও হুগলী-শ্রমিক)	
ব্যবসায়ী—	১
মহিলা—	১
মোট—	২২

শ্রীযুত ভি-ভি-গিরি—

শ্রীযুত এম-এস-আনে সিংহলে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীযুত ভি-ভি-গিরি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত গিরি খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও বহু বৎসর শ্রমিক আন্দোলনে নিযুক্ত ছিলেন।



ভারত সেবাশ্রম-সংঘ পরিচালিত বাঁকুড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে রক্ষিদল পরিবৃত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফটো—পি-দালাল

বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন—

গত ১৭ই ও ১৮ই মে বর্দ্ধমান জেলার বৈঁচিপুরে গণ-পরিষদের সদস্য খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে বর্দ্ধমান জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ নন্দী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা জেলা ভাণ্ডারের জন্য ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের জন্য সম্মেলনে আবেদন করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার দুরবস্থা—

ঢাকা জেলার গ্রামাঞ্চলে কোথাও কাপড় পাওয়া যায় না। চাউলের দাম ভীষণ রকম বাড়িয়া গিয়াছে—অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও দুর্লভ হইয়াছে। তাহার ফলে গত ৬ মাসে ঢাকার গ্রামাঞ্চল হইতে অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় বা বাঙ্গালার বাহিরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে শুধু বাসগৃহগুলি জনশূন্য হয় নাই—চাষের কাজও কমিয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর, নারায়ণগঞ্জ ও সদরের গ্রামে চাউলের মণ কমপক্ষে ২৫ টাকা। কোথাও বা ৩০ টাকা। চিনি ও আটা ৬ মাস যাবৎ কোথাও পাওয়া যায় না।



ঢাকা "সোনার বাংলার" সহকারী সম্পাদক স্বর্গত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

ফটো—কে-ভদ্র

চোরাবাজারের সন্ধান—

গত ৩রা জুন মঙ্গলবার নয়া দিল্লীতে প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী সারা ভারতে চোরাবাজারের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"ভারতের কয়েকজন ব্যবসায়ী শুধু চোরাবাজারের কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, আসল চোরাকারবারীদের সন্ধান আজ সরকারী অফিসেও

পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট সত্যই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা আজ দুর্নীতিপরায়ণ, তাহারা ইউরোপীয় অথবা ভারতীয়, হিন্দু অথবা মুসলমান হউক না, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। যদি সরকারী অফিসে এইরূপ দুর্নীতি ও ঘুসের কারবার চলিতে থাকে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ সত্যই সন্দেহজনক। দেশবাসী যদি এ বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য না করে, তবে রাজাজী বা রাজেন্দ্রবাবুর পক্ষে এই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে না।



ওরিয়েনট্যাল সেমিনরী স্কুলের প্রাঙ্গণে নববর্ষ উৎসবে বালিকাদের প্যারেড ফটো—জে-কে-সান্যাল

সে জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে সকলের সকল শক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছে।" চোরাবাজারে কারবার করিয়া ও তাহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য দান করিয়া ভারত আজ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গান্ধীজির কথায় কেহ কর্ণপাত করিবে কি না, কে জানে?

শরৎচন্দ্র স্মৃতি ব্যবস্থা—

স্বর্গত অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা কমিটী' হইতে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি ৩ বৎসর অন্তর বাঙ্গালা বক্তৃতা এবং পুরস্কার ও পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। যিনি বক্তা নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে অন্তত ৩টি বক্তৃতা দিতে হইবে ও তজ্জন্য ৫ শত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে এক হাজার টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হইবে। এত দিন পরে যে শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করা হইল, ইহাই আনন্দের কথা।

ঢাকায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৩শে মে শ্রীযুত মাখনলাল সেনকে সঙ্গে লইয়া সকালে বিমানযোগে ঢাকায় গমন করেন। তিনি সারাদিন তথায় নেতৃবৃন্দের ও জনসাধারণের সহিত বঙ্গ-ভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনার পর সন্ধ্যায় বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। জগন্নাথ হলে এক জনসভাতেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

খুলনা সম্মেলন—

বাঙ্গালা'র বিভাগ দাবী করিবার জন্য গত ২৭শে মে খুলনা সহরে নীলা হলে এক জেলা সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অবসর প্রাপ্ত আই-সি-এস শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় জেনারেল মোহন সিং—

প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল মোহন সিং গত ২২শে মে প্রথম কলিকাতায় আগমন করায় তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনিই বিদেশে প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন এবং মুক্তিলাভের পর এই প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় মহিলা সম্মেলন—

গত ১১ই মে রবিবার উত্তর কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীতে এক মহিলা সম্মিলনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত



কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মহিলা সভায়
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার
ফটো—জে-কে-সান্যাল

হইয়াছে। মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থ যুবকদিগকে বদ্ধ পরিকর হইতে আহ্বান করিয়া তথায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির কাশ্মীর ভ্রমণ—

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী কাশ্মীর রাজ্যে ভ্রমণের পর ২৭শে মে তারিখে লাহোরে ফিরিয়া জানাইয়াছেন—শীঘ্রই রাজনীতিক বন্দীরা (কাশ্মীরে) মুক্তি লাভ করিবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জাতীয় দলের আপোষ হইবে। রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরে মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রী উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়া সকল রাজনীতিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতি ১০ দিন কাশ্মীর রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন।

সেনভূম সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া, বাকুলিয়ায় সেনভূম সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন তোরণ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বাড়ায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হিরন্ময় সেনের ভাষণের পর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর চৌধুরী সম্পাদকীয় বিবৃতি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকৃষ্ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাপদ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বক্সী প্রমুখ অনেকে আলোচনা করেন। মানভূম, মধুতটীতে আগামী বৎসর সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হইবে। টাটানগর, আসানসোল, ধানবাদ, পুরুলিয়া, রাঁচি, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বার্ণপুর, কুলটি, ঝরিয়া, হাজারিবাগ, রাণীগঞ্জ, সীতারামপুর, গিরিডি, মধুপুর ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া—

গত ২৮শে মে কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র দাশ প্রকাশ করেন যে,



শ্রীভবেশ দাশ

সহরে আটা কম সরবরাহের ফলে আটার সহিত তেঁতুল বীচির গুঁড়া মিশাইয়া বিক্রয় করা হইতেছে। তিনি একটি কারখানায় তেঁতুল বীচি গুঁড়াইতে দেখিয়া আসিয়াছেন।

যে সকল কারখানা ঐ কাজ করে বা যে দোকান উহা বিক্রয় করে, তাহাদের শাস্তি দিবার জন্ত দেশে কি শাসক নাই। দেশ কি আজ অরাজক হইয়াছে ?

নূতন মেয়রের কার্য্যদক্ষতা—

কলিকাতা সহরকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত আলোচনার



শ্রীসুধীরকুমার রায়চৌধুরী

পর অবিলম্বে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট পরে কর্পোরেশনকে আরও ৩ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। কর্পোরেশনকে এইভাবে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দাঙ্গার জন্ত গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে ১০০ সশস্ত্র প্রহরীও দিয়াছেন। নূতন মেয়র সুধীরবাবু এই কর্ম্মতৎপরতার জন্ত সহরবাসীর ধন্তবাদভাজন হইবেন।

কলিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় যে দাঙ্গা চলিতেছে, সে জন্ত গত ২০শে মে পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সরকার বড়বাজার, বড়তলা, জোড়াসাঁকো ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানার অধিবাসীদের উপর মোট ৬১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এই জরিমানা ও ক্রমাগত সান্ধ্য আইন জারি করিয়াও দাঙ্গা বন্ধ করা যায় নাই। উপরের ৪টি থানার লোক ছাড়া অন্ত কোন থানার লোক কি দাঙ্গায় যোগদান করেন নাই ?

সাহিত্য বাসরে সম্বর্দ্ধনা—

সম্প্রতি কলিকাতা চৌরঙ্গী ওয়াই-এম-সি-এ হলে সাহিত্য বাসরের এক সভায় বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক



শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন

শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন ও নবদ্বীপনিবাসী সাহিত্যিক ও দেশসেবক শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়

দুর্গামোহনবাবু প্রায় ৫০ বৎসর কাল বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। জনরঞ্জনবাবু সাহিত্য সাধনা ছাড়াও ৩০ বৎসরের অধিক কাল নবদ্বীপের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অন্ত নাই। রেশনের দোকানে প্রায়ই আটা ও চিনি পাওয়া যায় না—বাজারে তরকারী বা মাছ আসে না—যাহা আসে তাহারও মূল্য অত্যন্ত অধিক। দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ। ইহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

নেতৃবৃন্দের অভিমত—

বড়লাট দিল্লীতে ফিরিয়া নিম্নলিখিত ৭ জন নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন—কংগ্রেসের পক্ষে—রাষ্ট্রপতি কৃপালনী, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার পেটেল। লীগের পক্ষে—মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও মিঃ আবদর রব নিস্তার। শিখ পক্ষে সর্দ্দার বলদেব সিং। ৩রা জুন বড়লাটের ঘোষণার পরই রেডিও সাহায্যে মিঃ জিন্না, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দ্দার বলদেব সিংকে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে দেওয়া হয়। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী বড়লাটের ঘোষণায় সম্মতি প্রকাশ করেন। মিঃ জিন্না মুসলেম লীগ কাউন্সিলের নির্দ্দেশ সাপেক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেন।



নববর্ষ উৎসবে ওরিয়েনটাল সেমিনরী স্কুল প্রাঙ্গণে ব্যাণ্ড পার্টি বালকবালিকাদের প্যারেড ও ড্রিল

ফটো—জে-কে-সান্যাল

কলিকাতার হাঙ্গামা—

গত ২১শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতা সহরে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও গোপনভাবে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজিও একেবারে শান্ত হয় নাই। গত ৩১শে মে শনিবার উহা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও সহরে একদিনে কয়েকশত লোক হতাহত হয়। তাহার পর ২রা জুন হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় সর্ব্বত্র বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হাঙ্গামার সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। হাঙ্গামার ফলে সহরের ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ, ফলে সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার

দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা—

গত ২১শে মে ভারতসচিব লর্ড লিষ্টোয়েল বিলাতে ভারতের দাঙ্গায় হতাহতের নিম্নরূপ হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের ১৮ই নভেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে পর্য্যন্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রদেশ	হত	আহত
মাদ্রাজ	০	১৩
বোম্বাই	৩২১	১১১৯
বাঙ্গালা	১৮৬	৯৬৫
যুক্তপ্রদেশ	১৭	৫৩
পাঞ্জাব	৩০২৪	১২০০
বিহার	৭	৩৫
মধ্যপ্রদেশ	২	১২
আসাম	১৪	০
সীমান্ত প্রদেশ	৪১৪	১৫০
দিল্লী	২৯	৬৯
মোট	৪০১৪	৩৬১৬

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টেনিস ঃ

আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যে টেনিস খেলা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে তার উৎপত্তি প্রথম হয়েছিল ফ্রান্সে। তবে সে সময়ের টেনিস খেলার পদ্ধতি এবং খেলার নিয়মাবলী আজকের টেনিস খেলা থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের ছিল। সে সময়ের টেনিস খেলার নাম ছিল 'লে পাম' (Le Paume) অর্থাৎ the Palm (the hand)। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্সের উৎসাহী খেলোয়াড়দের হাতে দাস্তানা লাগিয়ে বল নিয়ে এই 'the Palm' খেলতে প্রথম দেখা যায়। তারপর দাস্তানা বাদ দিয়ে খুন্তির আকারে কাঠের ব্যাট এবং পরবর্ত্তীকালে টেনিস র‍্যাকেটের প্রচলন হয়েছে। ঘরের দেওয়াল ব্যবহার করা হ'ত বলে এই 'লে পাম' খেলা ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই খেলাকে ঘরের বাইরে চালানোর চেষ্টা চলে। উন্মুক্ত জায়গায় দেওয়াল তুলে প্রথম প্রথম খেলা চলতে থাকে ; কিন্তু এই ভাবে দেওয়াল তুলে যখন খেলা সম্ভবপর হ'ল না তখন নেটের প্রচলন হ'ল। ১৩ শতাব্দীতে টেনিস খেলাকে পুরোপুরি 'indoor game' হিসাবেই গ্রহণ করা হ'ল। ফলে ফাঁকা জায়গায় টেনিস খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। ফ্রান্সের রাজা ঘরের মধ্যে 'কোর্ট' তৈরী ক'রে টেনিসকে 'ঘরোয়া খেলা' হিসাবে মর্য্যাদা দিলেন। পরবর্ত্তীকালে ঐ খেলাই বর্ত্তমানের 'কোর্ট টেনিসে' রূপান্তরিত হয়েছে। ফ্রান্সে তখন এই খেলাকে বলা হ'ত 'Royal Tenez'। ইংরেজরা ১৩৬৫ সালে ফ্রান্সের এই 'Royal Tenez' খেলা ইংলণ্ডে প্রচলন করে এবং এই টেনিস নাম ইংরেজদেরই দেওয়া। ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত এই 'কোর্ট টেনিস' ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। ১৪ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে বহুদিন পর্য্যন্ত টেনিস খেলা ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, জনসাধারণের পক্ষে টেনিস খেলা তখন আইনবিরুদ্ধ ছিল। ক্রমশঃ আইনের কঠোরতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জনসাধারণ খুশিমত টেনিস খেলতে পায়। ফলে দেখা গেল, ১৬ শতাব্দীতে এক প্যারিসেই ২০০০ 'ইন-ডোর টেনিসক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সারা ফ্রান্সের ক্লাব সংখ্যা তখন ২,৫০০ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজপরিবার যেমন জাঁকজমক দেখিয়ে টেনিস খেলতেন—জনসাধারণের খেলায় তা সম্ভব ছিল না এবং দর্শকেরা তাদের খেলায় সেই পরিমাণ উৎসাহ পেত না। পনের এবং ষোল শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহু খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়ের জন্ম হ'ল, যার ফলে ইংলণ্ডে একাধিক আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। কেবলমাত্র 'সখের' টেনিস খেলোয়াড়দেরই ঐ সব প্রতিযোগিতায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হ'ত। সতের শতাব্দীতে দেখতে দেখতে অনেক সখের খেলোয়াড় 'পেশাদার' খেলোয়াড় শ্রেণীভুক্ত হ'লেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের যুবশক্তি টেনিস খেলায় ঝুঁকে পড়ল। জনসাধারণ শারীরিক দক্ষতা এবং আমোদ-প্রমোদ হিসাবে ব্যাপক ভাবে টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে। এদিকে টেনিসের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে একদল জুয়াড়ী টেনিস খেলাকে লাভজনক ব্যবসায়ে খাটাতে আরম্ভ ক'রে দেয়। ভাল ভাল টেনিস খেলোয়াড়রা মোটা দামে বিক্রী হ'য়ে হাত পাল্টে যেতে থাকেন। দেশে অসৎ ব্যবসায়ীর দল ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে শেষে দেখা গেল, টেনিস খেলা তাদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের টেনিস খেলাকে জনসাধারণের নির্দ্দোষ আমোদের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা অসম্ভব হ'ল। দেশের

রাজপরিবার, সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় টেনিস খেলা একেবারে বর্জ্জন করলেন। খেলায় তাঁদের আগ্রহ আর রইল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল ইংলণ্ডে জনসাধারণের আর কোন টেনিস কোর্ট নেই, প্যারিসের দু'চারটিতে তখন টেনিস খেলা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বড় বড় রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ টেনিস কোর্টগুলি ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে বহুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রইল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে টেনিস খেলা যে একদিন জনসাধারণের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার সমস্ত নিদর্শনই যেন নিশ্চিহ্ন হ'তে লাগলো।

এরপর ১৮৭৩ সালের কথা। বৃটিশ সৈন্যবিভাগীয় কর্ত্তা মেজর ওয়াল্টার সি উইংফিল্ড একদিন বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করলেন, গ্রীস থেকে তিনি Sphairistike নামে এক অভিনব আমোদ-উদ্দীপক খেলা শিখে এসেছেন এবং এই খেলা তিনি 'পেটেন্টের' জন্য আবেদন করতে মনস্থ করেছেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর বন্ধুরা ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বাড়িতে সমবেত হ'ন এবং তাঁদের মেজর ওয়াল্টার গ্রীসের Sphairistike অর্থাৎ বল খেলায় ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখিয়ে প্রশংসা লাভ করেন। এই খেলাই শীঘ্র tenis-on-the laon নামে দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হ'ল, এবং পরবর্ত্তীকালে 'Lawn Tennis' নামে আখ্যা লাভ করেছে। ১৮৭৩ সালে টেনিসের মূল কোর্ট লম্বায় ৬০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে 'Base line পর্য্যন্ত ৩০ ফিট ছিল। মাঝখানের জায়গার মাপ ছিল ২১ ফিট। নেট লম্বায় ৭ ফিট, নেটের মাঝখান ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি। নেট থেকে কোর্টের মাঝখানের একটি চিহ্নিত স্থান থেকে খেলোয়াড় বল সার্ভ করতো।

১৮৭৪ সালে মেজর উইংফিল্ড কোর্টের মাপ পরিবর্ত্তন করলেন—দৈর্ঘ্য হ'ল ৮৪ ফিট, প্রস্থ ৩৫ ফিট। নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমে গিয়ে ৪ ফিট দাঁড়ালো। কয়েক বছর পর কোর্টের দৈর্ঘ্য ৩৯ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৫ সালে মেরী লিবোন ক্রিকেট ক্লাব টেনিস খেলার নতুন নিয়মাবলী প্রস্তুত করে। এই নিয়মানুসারে কোর্টের দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট (আজও এই মাপে কোর্ট তৈরী হচ্ছে) এবং প্রস্থ ৩০ ফিট দাঁড়াল। পোষ্টের কাছে নেট ৫ ফিট এবং মাঝখানে ৪ ফিট করা হ'ল।

১৮৭৫ সালে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে অগ্রবর্ত্তী হ'ল All-England Croquet Club. এই প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি টেনিস খেলার মাঠ তৈরী ক'রে রীতিমত টেনিস খেলার চর্চ্চা আরম্ভ করে দেয়।

১৮৭৭ সালে প্রথম টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিযোগিতায় মাঠের প্রস্থ কমিয়ে ২৮ ফিট করা হয়, নেটের মাঝখানের উচ্চতা কমিয়ে ৩ ফিট ৩ ইঞ্চি রাখার ব্যবস্থা হয়।

১৮৮২ সালে অল্-ইংলণ্ড ক্লাব দেশের টেনিস খেলা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে এবং সর্ব্বত্র টেনিস খেলার মাঠের সীমানা ৭৮ × ২৮ ফিট, নেট পোষ্টের কাছে ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি উচ্চতায় এবং মাঠের মাঝখানে উচ্চতায় ৩ ফিটের জন্য সুপারিস করে। সেই থেকে আজও ঐ মাপে টেনিস খেলার সীমানা তৈরী হচ্ছে।

১৮৮৮ সাল লন্ টেনিস খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ বছর ইংলিস লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়।

এদিকে বেরমুদার জনৈক বৃটিশ অফিসার ছুটি উপলক্ষে যখন দেশে অবস্থান করছিলেন, ১৮৭৩ সালে মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক আহূত এক প্রীতিভোজ সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হ'ন। উক্ত অফিসার মেজর উইংফিল্ড কর্ত্তৃক প্রদর্শিত 'Sphairistike' খেলা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন এবং চাকরীতে পুনরায় যোগদানের সময় ১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে তিনি ঐ খেলার সরঞ্জাম বেরমুদায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর সহকারীদের মধ্যে তার প্রচার করেন। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি আমেরিকান মহিলা মিস মেরী ইউইং আউটারব্রিজ বেরমুদায় (Bermuda) বেড়াতে গিয়ে ঐখানের অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁদের একান্ত আগ্রহে টেনিস খেলা শিক্ষার চেষ্টা করেন। মিস আউটারব্রিজ টেনিস খেলায় বিশেষ উৎসাহিত হয়ে পড়েন ; স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি একসেট টেনিস খেলার সরঞ্জাম অফিসারদের কাছ থেকে উপহার পান। আমেরিকার কাষ্টমস বিভাগ খেলার এই সরঞ্জামগুলি হস্তগত ক'রে এক সপ্তাহ আটক রাখে। কারণ আমেরিকায় তারা এই প্রথম টেনিস খেলার সরঞ্জাম হাতে পাবার সুযোগ পায়। শেষে বিনা মাশুলেই

আউটারব্রিজকে টেনিস খেলার সরঞ্জামগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়। মিস আউটারব্রিজের পরিবারবর্গ, ষ্টেটেন আইল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাবের সভ্যবৃন্দ বেসবল ক্লাব ক্রিকেট মাঠে একটি টেনিস খেলার মাঠ তৈয়ীর অনুমোদন লাভ করেন। মিস আউটারব্রিজ তাঁর এক বান্ধবীকে টেনিস খেলার নিয়মাবলী শিখিয়ে দিলেন। আউটারব্রিজের বাবা, তাঁর দুভাই, আউটারব্রিজ এবং তাঁর বান্ধবী আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেলে আমেরিকায় টেনিস খেলার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁরা ২নং টেনিস কোর্ট তৈরী করলেন। ১৮৮০ সালের বহু পূর্ব্বেই চিকাগো এবং ফিলাডেলফিয়াতে টেনিস খেলার প্রচলন হয়েছিল। দেখতে দেখতে আমেরিকার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে টেনিস খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করলো। ১৮৮১ সালে মিস আউটারব্রিজের ভাই মিঃ ই এইচ আউটারব্রিজ সমস্ত টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নিউ ইয়র্কে সমবেত করেন। ১৮৮১ সালে ৩৩টি বিভিন্ন টেনিস ক্লাবের প্রতিনিধি একত্রিত হয়ে খেলায় এক ধরণের আইন অনুসরণের সুপারিশ করেন এবং ঐ বছরেই একটি টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ঐ বছরেই ইউনাইটেড ষ্টেটস লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং সেই থেকেই আমেরিকার সখের টেনিস খেলা এই প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে।

টেনিস খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ যোগ্য যে, রোমের Lusio Pularis খেলার সঙ্গে প্রাচীন টেনিসের অনেক সাদৃশ ছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক দাবী করেন। ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারস্যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা ছড়ির মুখে জালের থলি নিয়ে এক রকম বল খেলা হ'ত বলে জানা গেছে। 'পোলো' খেলার প্রধান ঘাঁটি ছিল এই পারস্য এবং ঐ সময়ে প্রায় বার রকমের পোলো খেলা হ'ত। তার মধ্যে পূর্ব্বের বর্ণিত খেলা 'Salvajan' নামে পরিচিত ছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে আর 'Salvajan' খেলা হ'ত না, তখন ঘোড়া বাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে কোর্ট তৈরী করে খেলা হ'ত। এ খেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'Chigan'। অনেকের মতে এ খেলাও অনেকটা টেনিসের মতনই ছিল, তবে অপরিণত অবস্থায়। তবে যে ফ্রান্স বর্ত্তমান টেনিসের জন্মভূমি সে সম্বন্ধে কারও সন্দেহ করার নেই।

টেনিস খেলায় রেকর্ড :

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী সানফ্রান্সিস্কোতে মিসেস হেলেন উইলস মুডী এবং ভূতপূর্ব্ব ডেভিস কাপ খেলোয়াড় হাওয়ার্ড কিনসে (বর্ত্তমানে পেশাদার খেলোয়াড়) টেনিস খেলায় একটি রেকর্ড ক'রেছিলেন। তাঁরা উভয়ে ১৮ মিনিটকাল একটানা বল খেলেছিলেন—কোন রকম বলটি না 'ফস্কে'। ঐ সময়ে তাঁরা সর্ব্বসমেত ২,০০১ 'সট' মেরেছিলেন। তাঁরা এ রেকর্ড জানতেই পারেন নি; রেফারী তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই রেকর্ডের কথা উল্লেখ করলে উভয়কেই বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সগরল"—২॥০

অধ্যাপক সনৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৩৲

শীতল বর্ধন প্রণীত কবিতা গ্রন্থ "বুলবুল্ নামা"—২॥০

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রণীত "আগষ্ট আন্দোলন ও আমাদের শিক্ষা"—৶০ "পঞ্চায়েত কি ও কেন ?"—৶০

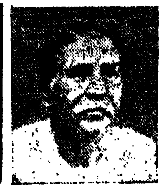
সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





ভারতবর্ষ



শ্রাবণ—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

এরই লাগি

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্‌-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

এরই লাগি এ তপস্যা করেছি কি যুগ যুগ ধরি ?
ফাঁসীমঞ্চে ঝুলিয়াছি, আন্দামানে রহি দ্বীপান্তরে
রাজদণ্ড হাসিমুখে অকাতরে লইয়াছি বরি'
হে জননী বঙ্গমাতা, দ্বিখণ্ডিতা দেখিতে কি তোরে ?···

ঝরেছে মায়ের অশ্রু, পিতারে করেছি সুখহারা,
স্নেহহান গৃহহীন ঘুরিয়াছি তস্করের বেশে,
বন্দিয়া জননী তোরে হাসিমুখে বরিয়াছি কারা
শুকায়নি রাজবর্ত্মে তাজা খুন অহিংস এ দেশে।···

এরই লাগি চিরদিন কল্পনায় আঁকিয়াছি ছবি,
হাস্যময়ী শস্যভরা প্রীতিফুল্ল দেশজননীর।
মলিন অঞ্চলতলে ছায়াঘন আম্রবনচ্ছায়ে
কাটাইতে যে বাসনা সে কি শুধু কল্পনা কবির ?···

ভালবাসি বঙ্গভাষা, ভালবাসি বঙ্গভাষাভাষী
ভালবাসি বাঙ্গালীরে সুখেদুঃখে উত্থানে পতনে।
ভালবাসি পল্লীছায়া হেমন্তের শস্যপূর্ণ ধরা,
বাঙ্গালী হয়েছি বলে শত গর্ব্ব আমি রাখি মনে।···

হে জননী বঙ্গমাতা, আপন আয়ত্তাধীনে আসি,
লভিবে যে স্বাধীনতা এই তার যথার্থ স্বরূপ ?
একি তার প্রতিকৃতি অথবা এ কঙ্কালের ছায়া
আমি যারে ভালবাসি শতছিন্ন এই তার রূপ !···

সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ ভালমন্দ যাহা হয় হবে,
তোমারে বিমাতা জানি কাটাইব বাকী দিনগুলি,
সে যেন না সত্য হয়, জ্যোতির্ম্ময়ী আপন গৌরবে
হও রাজ-রাজেশ্বরী ! সত্য হোক্ কল্পনার তুলি।···

তুমি হও পরিপূর্ণা তোমার সন্তানদের মাঝে,
হোক্ তারা বহুধর্ম্মী, তবু তারা বাঙ্গালী বলিয়া—
দেয় যেন পরিচয় সগৌরবে মনুষ্য সমাজে,
বাঙ্গালার পরিচয়ে ওঠে যেন হৃদয় দুলিয়া।

বাঙ্গালার ভূমি ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার জমি

একদিন ছিল বাঙ্গালীর ধান দুধ মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান, নিজের জমি গরু পুষ্করিণী ও বাগান হইতে সংগ্রহ হইত। আর গ্রামের শিল্পীরা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন। মাঝে মাঝে মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের আত্মকলহ এবং সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি বিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিত এবং সাধারণ লোককে বিব্রত করিয়া ফেলিত। এইরূপ বাঙ্গালী জীবনের পক্ষেরও বিপক্ষের অবস্থাগুলি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিকরা তৎকালীন বাঙ্গালী সংসারের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সুবিধার দিকে বেশী অঙ্ক উল্লেখ করিয়া থাকেন।

কৃষি ও শিল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যে সমাজ চলিতেছিল, তাহা ইংরাজ আমলে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংরাজ মুসলমান বাদশাহ নবাবদিগের মত কেবল দেশ শাসন করিল না, ক্রমে ক্রমে তাহার আদিমরূপ বণিকবৃত্তিকে রাজশক্তির সহায়তায় অতি কদর্য্যরূপে প্রকাশ করিল। প্রথমে বাঙ্গালার মাল রপ্তানি করিয়া চালাইল, পরে বাঙ্গালায়, তথা ভারতবর্ষে, জমি লইয়া আবাদ করিয়া মূল উৎপাদন হইতে বিদেশী বাণিজ্যের সমস্ত ভার ও লাভ একচেটিয়া করিয়া রাখিল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা যে সকল মাল ভারতবর্ষে আমদানি করিতে পারিত, এখানে উৎপন্ন মাল যাহাতে তাহার প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিল। যেখানে তাহার শিল্পদ্রব্য স্থানীয় দ্রব্যাদির সহিত গুণে ও দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, নানা নির্য্যাতনে সেই শিল্প ধ্বংস করিতে ইংরাজ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত কিছুই হয় নাই। ফলে লোকে ক্রমেই কৃষির উপর অধিকমাত্রায় নির্ভর করিতে বাধ্য হয় এবং জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতে থাকে। যাহার দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন, সংসার প্রতিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী জাতি, সেই জমিকে "মা" বলিয়া মনে করে এবং মাতার ন্যায় ভিটাকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। পিতৃপিতামহের ভদ্রাসন হইলে সেই ভিটার টান আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভদ্রাসনের এক টুকরা রক্ষা করিতে, দাঙ্গা ও মামলায় যে অর্থ ব্যয় করে, তাহা দ্বারা ভিন্ন স্থানে সমস্ত ভদ্রাসনের পরিমাণ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর জমি ক্রয় করা সহজ। সাধারণতঃ শক্তি ও সামর্থ্য থাকিতে সে ভিটা ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। জমি আঁকড়াইয়া অনশনে থাকিবে, তথাপি অন্যস্থানে যাইতে সম্মত হইবে না।

বাঙ্গালার ভূমি স্বত্ব

জমির উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকিবার পক্ষে বাঙ্গালীর অন্য কারণ আছে। বাঙ্গালী, এমন কি সাধারণ প্রজা বা রায়ত নিজ জমিতে স্বত্ববান হইয়া ভোগদখলীকারসূত্রে একই জমিতে নিবদ্ধ থাকিয়াছে সাধারণতঃ প্রজা বদল করা বা জমি হইতে উচ্ছেদ করা নীতি বাঙ্গালা বিশেষ প্রচলন ছিল না। ইংরাজও স্থানীয় জমিদারদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী জমি ব্যবস্থার সময় যতদূর সম্ভব সে নীতি পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

পুরাতন কথা

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইংরাজ বাঙ্গালা দেশের অংশ বিশেষে নবাব সরকারে জমিদার অথবা প্রজা হিসাবে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের ভিত পত্তন করিয়াছে। ১৬৯৮ সালে মুসলমান জমিস্বত্ব আইনে নির্দ্দিষ্ট খাজনায় তদানীন্তন নবাব আজিম-উল্-সান-এর নিকট কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর তিনটী গ্রামের জমিদারী স্বত্ব গ্রহণ করে। তৎপূর্ব্বে তাহারা সুতানুটীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের মধ্যে প্রজা হিসাবে জমি পাইবার আশায় স্থানীয় জমিদারের নিকট আবেদন করে। কিন্তু "becouse they were a powerful people" ইংরাজরা শক্তিমান এবং পরে তাহাদের দেশীয় প্রজার ন্যায় উচ্ছেদ করা সম্ভব নয় বলিয়া জমিদার সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইংরাজ নবাব সরকারে দরখাস্ত করিয়া সফল মনোরথ হয়। খাজনার হার,—ডিহি কলিকাতার জন্য ৪৬৮৷৵৯ পাই, সুতানুটীর ৫০১৸৶৩ পাই, পাইকান পরগণার গোবিন্দপুর ১২৩৸৶৩ পাই এবং কলিকাতা গোবিন্দপুর অংশ বাবদ ১০০৷৴১১ পাই, একুনে বাৎসরিক ১১৯৪৸৶৫ পাই, ধার্য্য হয়।

বাঙ্গালার জমি স্বত্ব আইনের একটী বিষয় এই ব্যাপারেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মুসলমান বাদসাদিগের আমল হইতেই বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি বিলি হইত এবং ইংরাজ সেই ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া জমিদারী ইজারা লয়। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে তাহারা নিজ প্রজাদের নিকট খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা—

"Received a peremptory Perwannah from the soubah (Governor) forbidding them ; in which the Soubah told them that they were presuming to do a thing which they had no power to do ; and if they persisted they would by the laws of the Empire forfeit their lands."

অর্থাৎ তাহারা নবাবের নিকট হইতে যে জরুরি পরোয়ানা পায় তাহাতে বুঝিতে পারে যে, তাহারা মোগল সাম্রাজ্যের আইন বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে এবং তাহাতে তাহারা সম্পত্তি হইতে বেদখল হইবার দায়ী হইয়া পড়িতেছে।

তাহার পর ১৭১৫ সালে ইংরাজ চব্বিশ পরগণার মধ্যে আরও

আটত্রিশটী গ্রামের ইজারা লইবার চেষ্টা করে। সম্রাট ফারোক্‌শিয়ার সম্মত হইলেও বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলি খাঁ দুরন্ত ইংরাজের আরও শক্তি বৃদ্ধি করিতে অসম্মত হন। পরে ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরাজ নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট এই সম্মতি লাভ করে। রাজনৈতিক গোলমালের মধ্যে তাহারা নিজের স্বার্থ একটু ভুলে নাই। পাছে পরে আপত্তি হয়, সেই কারণে ১৭৫৭ সালের ৩রা জুন তাহারা মিরজাফরের নিকট আবার সেই দলিল পাকা করিয়া লয়। পলাশী যুদ্ধের পর দখল কায়েম করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই জমিদারের জন্য বাৎসরিক ২,২২,৯৫৮৲ খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। ১৭৫৯ সালে ১৩ই জুলাই চব্বিশ পরগণার জমিদারী ক্লাইভকে জায়গীর হিসাবে দান করা হয়। তাহার পর ১৭৬৫ সালের ২৩শে জুন আরও দশ বৎসরের জন্য এই জায়গীরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং আরও স্থির হয়, এই মেয়াদ অন্তে সমস্ত সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে আসিবে এবং মোগল রাজসরকারে আর কোনও খাজনা দিতে হইবে না।

বাঙ্গালার মসনদ লইয়া যে গোলমাল চলিতে থাকে, ইংরাজ তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়াছে। মীর কাশিমকে সাহায্য করিবার অঙ্গীকারে তাহারা ১৭৬০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর বিনা খাজনায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করে এবং মিরজাফর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৭৬৩ সালের ৬ই জুলাই ইংরাজ তাঁহার নিকট ঐ পত্তনী কায়েম করিয়া লয়। তাহাতেও নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট দিল্লীর বাদশাহের সম্মতি সংগ্রহ করে।

১৭৬৫ সালে বাদশাহ সাহ আলমের নিকট লর্ড ক্লাইভ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ইংরাজের নিকট নিয়মিত টাকা পাইবার আশায় বাদশাহ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালার শাসন বিভাগে দুইটী স্বতন্ত্র প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজস্ব সম্পর্কে দেওয়ান ও রাজ্যশাসন বিভাগে নাজিম ছিলেন। ইংরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাদশাহকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয় এবং এই অঞ্চলের নাজিমের সংসার খরচ বাবদে ১৭,৭৮,৮৫৪৲ এবং সমস্ত নিজামতের খরচ চালাইবার জন্য ৩৬,০৭,২৭৭৲ দিবার প্রতিশ্রুতি থাকে। তখন বাঙ্গালার নামমাত্র নাজিম মিরজাফরের জারজ পুত্র নাজমদ্দৌলা ; আর রেজা খাঁ—নায়েব ও দেওয়ান। নাজিমের শক্তি হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ তাহার গৃহস্থালী ও অপরাপর খরচ কমাইয়াছে।

বলা বাহুল্য কলিকাতার জমিদারী হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পর্য্যন্ত সমস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে ইংরাজ স্বত্বলাভ করিয়া আসিয়াছে।

পরিবর্ত্তনের চেষ্টা

খাজনার নিরিখ বৃদ্ধি লইয়া ইংরাজ একবার নবাব সরকার হইতে বাধা পাইয়া অনেকদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। দেওয়ানী প্রভৃতি লইয়া এবং সামরিক শক্তিতে আস্থাবান হইয়া ইংরাজ নূতনভাবে জমি বিলি ও খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরাজ প্রভুর যে কয়েকটী নায়েব বা দেওয়ান নির্ব্বাচিত হন, তাঁহারা প্রজার উপর অত্যাচার করার জন্য আজও নিন্দিত হইয়া আছেন। প্রথম রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে ও রাজা সীতাব রায় ১৭৭০ সালে পাটনার নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। প্রজা বিলি করিবার নানা পরীক্ষা চলিয়াছে। কখনও ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের তত্ত্বাবধানে খাজনা আদায়ের চেষ্টা হইয়াছে। কখনও বাৎসরিক, কখনও ত্রৈবার্ষিক বিলি করিয়া দেখা হইয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই জমিদার ও প্রজার উপর দারুণ অত্যাচার হইয়াছে। পূর্ব্ব মর্য্যাদাবশে যে সকল জমিদার নিজেরা ইংরাজের নিকট পত্তনী লইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা আদায়ের জন্য ইংরাজ নিজেদের মনোনীত ইজারাদার নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিনাজপুর জমিদারীতে দেবী সিংহ, রাজসাহীতে দুলাল রায় এবং বর্দ্ধমানের ব্রজকিশোর যে অমানুষিক অত্যাচার এবং জমিদারদিগের অসম্মানজনক আচরণ করে, তাহা ইংরাজ রাজস্ব বিভাগের ইতিহাসের এক অত্যন্ত মসীলিপ্ত অধ্যায়। এই সময় ইংরাজের (বোর্ড অফ রেভিনিউর) মূল দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ বর্দ্ধমান জমিদারদিগের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এমন গুরু কর চাপাইয়া যান, যাহার তুলনা অন্য কোনও জমিদারীতে আজ পর্য্যন্ত নাই।

জমিদার যাঁহারা নবাব বাদশাহ আমলে রাজ সম্মান লাভ করিয়াছেন, একের পর একটী করিয়া লোপ পাইতে লাগিলেন। এত অত্যাচারেও নিয়মিত এবং আশানুরূপ খাজনা আদায় হইল না। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা ভুল পথে চলিয়াছেন। জমিদার প্রজা কাহারও শান্তি নাই ; বাঙ্গালার প্রতি চাষীই কোনও না কোনও শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের শিল্প নষ্ট হওয়ায় আয় কমিল ; তাহারা নিয়মিত খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইলেই নূতন "জমিদার" দেখা দিতে লাগিল ; প্রাণপণে তাহারা ইংরাজ সরকারের খাজনা মিটাইতে এবং আপনাদের লাভের অঙ্ক ভারি করিতে চেষ্টা করিয়া দেশের দুর্দ্দশা চরমে আনিয়া উপস্থিত করিল। তখন বৃটিশ পার্লামেণ্টের টনক নড়িল এবং আইন দ্বারা অত্যাচার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। ১৭৮৪ সালে মন্ত্রী পিট এই আইন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহণ করাইলেন। সম্রাট ভারত শাসনের ভার লইলেন। সাধারণতঃ প্রজার খাজনা বৃদ্ধি করিবার উপায় ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; অথচ নীলামের ডাকে খাজনা বৃদ্ধি করিয়া জমিদারি পত্তনের ব্যবস্থায়, অনিশ্চিত এবং ক্রমবর্দ্ধিত হারে খাজনা চলিতে থাকায় জমিদারকুল লোপ পাইবার উপক্রম হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভাষ

তখন জমিদারদিগের সহিত নির্দ্দিষ্ট জমায় বিলি করিবার জন্য কলিকাতা এবং পরে ব্রিটেনে বিতণ্ডা চলিতে থাকে। কলিকাতায় মিঃ

ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরে সেই মতই পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৭৮৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর (Court of Directors) ১৭৮৬ সালের ১২ এপ্রিলের এক নির্দ্দেশ লইয়া আসেন। সেই অনুশাসনে জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের পরামর্শ দিয়া দেশের অনুপযোগী নূতন উপায় অবলম্বন করার জন্য কলিকাতার কর্ম্মকর্ত্তাদের তিরস্কার করেন। এই নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া ১৭৯০ সালে প্রথমে দশ বৎসরের মেয়াদে জমিদারদিগের সহিত জমির রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। তিন বৎসর যাইবার পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং আজ দেড়শত বৎসরেরও অধিক সেই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

রাজস্বের পরিমাণ

জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইবার সময় বাঙ্গালা বিহার ও ও উড়িষ্যার (মেদিনীপুর) আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ লইয়া বড়ই অসুবিধা হয়। মীর কাসিমের সময় (১২৬২-৬৩) এক বৎসর ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা, পরের দুই বৎসর মিরজাফরের আমলে ৭৬ লক্ষ ১৮ ও ৮১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আদায় হয়। অত্যাচারী রেজা খাঁ (১৭৬৫-৬৬) ইংরাজের তরফে যে খাজনা আদায় করিয়াছিল, তাহা ও ১ কোটী ৪৭ লক্ষ টাকার অঙ্ক অতিক্রম করে নাই। তাহার পর ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ গেল, তাহাতেও ইংরাজের রাজস্ব কম পড়িতে পারে নাই। অত্যাচারের সাহায্যে তাহা বাড়িয়া গিয়াছে। যখন জমিদারদিগের সহিত খাজনা নির্দ্দিষ্ট হইল, ইংরাজ কোনও হিসাবেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। সে দেখিল ১৭৯০-৯১ সালে মোট ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। কত দেবী সিং, দুলাল রায়, ব্রজকিশোর এবং তাহাদের "গুরুজী" গঙ্গাগোবিন্দ সিং মিলিয় রাজস্বের পরিমাণ সকল হিসাব অতিক্রম করিয়া দাঁড় করাইয়াছে তাহা দেখা হইল না। অন্য কোনও যুক্তির প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়াই জমিদারদিগের সহিত ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা খাজনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া গেল। রাজসম্মানের অধিকারী বহু জমিদার প্রতি সন পরিবর্দ্ধিত রাজস্বের অনিশ্চয়তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই বন্দোবস্তে সম্মত হইয়া গেলেন প্রকৃতপক্ষে এইরূপ খাজনা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না সে কথা চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। অধিকাংশ জমিদারদিগের পক্ষে ইহা মঙ্গলজনক না হইলেও বাঙ্গালা দেশের অসংখ্য প্রজা ও জমিদার তখনকার মত রক্ষা পাইয়া গেলেন।

প্রয়োজন

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এ

সকাল হইতে বিহারী মণ্ডল সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া বাড়ির পথ ধরিল। পরিশ্রমের বেদনা বিহারীকে পীড়া দিতেছিল প্রচুর, ততোধিক পীড়া দিতেছিল তাহাকে তাহার এই বিফলতার লজ্জার গ্লানিতে। তাহাদের গ্রামে কোন স্কুল নাই, নিজে সে তাহাদের গ্রামে একটা স্কুল স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দিয়া আসিয়াছে জমিদারবাবুর কাছে। আজ স্কুল আরম্ভ হওয়ার কথা, কিন্তু সারাটি গ্রামের কোন বাড়ি হইতেই একটী ছেলেকেও পাওয়া গেল না। নোতুন পাড়ার বাঁশবনের এধার হইতে সে শুনিতে পাইল, ওধারে দোল ভিটার সামে কদম গাছের ছায়ায় একপাল ছেলে কলরব করিয়া খেলা করিতেছে। এতগুলি ছেলেকে এক জায়গায় হাজির পাওয়া যাইবে এবং চেষ্টা করিলে দলের ভিতর হইতে দুই 'একটিকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে, এই কথা মনে হইতে বিহারী উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বাঁশবনের আড়াল ছাড়াইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেই তাহার সমস্ত আশা কর্পূরের মত উবিয়া গেল বেহারীকে দেখা মাত্রই ছেলের দল যে যেদিকে পারি ছুটিয়া পালাইল। এক নিশ্বাসে নাম ধরিয়া বিহারী—মং যাদব, কেষ্ট, সুধাময়—ছয় সাত জনকে ডাকিয়া ফেলিল কিন্তু ওপক্ষ হইতে কোন সাড়াই মিলিল না। মধ্যাহ্নে নীরবতার মাঝে বায়ুকম্পিত বেনুকুঞ্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয় তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল উদাস দৃষ্টিতে বিহারী সামের শস্যহীন মাঠের দিকে তাকাই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

বিহারী কদমগাছে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল —ইস্কুল খুললে কি হবে খুড়ো, ছাত্র হবে না—বলিতে বলিতে নোতুন পাড়ার নোতুন মাতব্বর বনমালী বালা আসিয় ঘাসের উপর গামছাখানি পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

বিহারী চমকাইয়া উঠিল। সহসা ফাটিয়া-পড়া বেলুনের মত চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল—হবে না কেন শুনি!

—গ্রামের কেউ ইস্কুলে ছেলে পাঠাবে না।

—আলবৎ পাঠাতে হবে। পাঠাবে না—তবে কাল এক গাঁয়ের লোক সভা ক'রে মত দিলে কেন? আমাকে আজ এমনি ক'রে জব্দ করার জন্ত?

—কিন্তু গ্রামের লোক ভয় পাচ্ছে—তারা মুর্খু, তারা ত সব বোঝে না—

—বুঝুক আর না বুঝুক—জমিদারের হুকুম, এ হুকুম তাদের মান্‌তেই হবে। ইস্কুলটা কি বাপু আমার ইচ্ছেয় হচ্ছে, যে তোমরা ছেলে পাঠাবে না বলেই খালাস?

—তাদের ভয়টাই ত সেইখানে। জমিদার আর তুমি দুজনে পরামর্শ করে ইস্কুল ক'রছ। ছেলেপিলেদের ইংরেজী পড়াবে, তারা সব পর হয়ে যাবে—

বনমালীর এই অজ্ঞতায় বড় দুঃখেই বিহারীর হাসি পাইল। সে হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ বনমালী শুধু তাকাইয়া থাকিল বিহারীর মুখের দিকে।

পরদিন বড়তলার বাবুদের কাচারী ঘরে জমিদার রামনারায়ণ লাহিড়ী তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। অপরাধীর মত মাথা নিচু করিয়া সামে দাঁড়াইয়াছিল বিহারী। রামনারায়ণবাবু বলিতেছিলেন—তোমাদের নিয়ে আমাকে চ'লতে হবে। তোমাদের মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার শান্তি নেই। ইস্কুল আমাকে একটা করতেই হবে, আর তোমারই যখন বেশি ইচ্ছে তখন তোমার গ্রামেই সেটা আগে হবে বিহারী!

জমিদারবাবুর এই উক্তি ব্যর্থ হইল না। রামনারায়ণবাবু নিজে গিয়া হাজির হইলেন চতুরিয়া গ্রামে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরেই চতুরিয়া স্কুলের প্রথম উদ্বোধন হইল। বলা বাহুল্য জমিদারবাবুর ভয়ে সকলেই ছেলে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

দশ বছর পরের কথা। চতুরিয়ার সেই স্কুলের চেহারা আজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের অমানুষিক পরিশ্রম আর জমিদারবাবুর অযাচিত অর্থব্যয়ের ফল ফলিয়াছে। বিহারী মণ্ডলের কাচারী ঘরের সেই পাঠশালা আজ আর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে বারোয়ারী তলার দোল ভিটার পাশে প্রকাণ্ড একখানি দোতালা টিনের ঘরে আজ বসিয়াছে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। আজ আর ছাত্র সংগ্রহের জন্ত বিহারী মণ্ডলকে প্রচার কার্য্যের ভার লইতেও হয় না—বা জমিদারবাবুকেও শক্তির ভয় দেখাইতে হয় না। আজ শতাধিক ছাত্র বুকে লইয়া গর্ব্বোন্নতশিরে চতুরিয়ার স্কুল দাঁড়াইয়া আছে, নোতুন যুগের নোতুন দিনের জয় পতাকার প্রতীক।

জেলার মধ্যে প্রথম হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে, এই স্কুল হইতেই বনমালীর ছেলে সুধাময়। আনন্দ সংবাদ বাতাসের আগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। জমিদারবাবু চতুরিয়ায় আসিয়া হাজির হইলেন। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কীর্ত্তনের আসর পড়িল। ঘটা করিয়া হরির লুট হইল। গানের শেষে বিহারী মণ্ডল সভায় দাঁড়াইয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় বক্তৃতা করিল। এক কথাই বার বার সে বহু কথার মধ্য দিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—সমাজের এই যে গৌরব, আজিকার এই যে আনন্দ উৎসব, এ সকলের মূলে গ্রামের পিতৃতুল্য জমিদার রামনারায়ণবাবু। ঘন ঘন হাততালি আর হরিধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইয়া গেল।

বনমালী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া জমিদারবাবুকে আভূমি প্রণাম করিল। সুধাময়ের মাথায় হাত রাখিয়া রামনারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—

—তুমি আরও পড়বে সুধাময়—

সুধাময় মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। কিন্তু হতাশ ভাবে বনমালী বলিল—সহরের ইস্কুলে কী ক'রে ওকে পাঠাই? জানেন ত বাবু আমার অবস্থা।

—যতদূর ইচ্ছে, তুমি পড়তে থাক, আমি তোমার সব খরচ জোগাব।

জমিদারবাবু ঘোড়ায় চাপিলেন। বনমালী ছেলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া শুধু ভাবিতেছিল।—রামনারায়ণবাবুই তার পুত্রের সত্যিকারের পিতা। সুধাময়কে শুধু সংসারে আনিবার ভারই বনমালী লইয়াছিল, কিন্তু সেই ভ্রূণ শিশুকে বড়ো করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছেন, জমিদারবাবু নিজে।

সুধাময় তাহার চলার পথে চতুরিয়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে বহু পিছনে রাখিয়া বছরের পর বছর আগাইয়া চলিয়াছে। সম্মুখে বহুদূরে তাহার দৃষ্টি।

আট বছর পরে। বি-এ পরীক্ষার পর সুধাময় তিনমাস বাড়ীতেই আসিয়া বসিয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে সে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা সেদিন যেন বনমালীর কাছে তাহার বাড়িখানা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগিতেছিল। সে আস্তে আস্তে বিহারীর বাড়ীর দিকে চলিল।

বেগুনের চারাগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। গাছগুলি ঘিরিবার জন্য বিহারী বাঁশ চাঁচিয়া চটা বানাইতেছিল। কাচারীর বারান্দা হইতে তামাক সাজিয়া লইয়া বনমালী আসিয়া তাহার পাশে বসিল। বিহারী গুন গুন করিয়া গান ধরিল। সে গানের দিকে বনমালীর মন ছিল না। সে বলিতে লাগিল—

—ছেলেকে কাছে পেয়েও, খুড়ো কেমন যেন ভয় ভয় করে; তার সাথে কথা কই কিন্তু সব সময়ই মনে হয়, আমার ছেলে আমার যেন কেউই নয়। সুধাময় যেন পর হয়ে গেছে। এই বাড়ি, এই ঘর, এই গ্রামের সে যেন কেউ নয়।

বিহারী বনমালীর কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিল। অর্থহীন সে হাসি।

কাচারীর প্রাঙ্গণে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। দুজনেই ছুটিয়া সেদিকে আসিল। দেখিল, ঘোড়ার উপর বসিয়া জমিদার রামনারায়ণবাবু নিজে। বিহারী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। জমিদারবাবু বলিলেন—

—সুধাময় বি-এ পাশ করেছে বনমালী, এইমাত্র আমি টেলিগ্রাম পেলাম। বিহারীর বুকখানা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বনমালী তবুও এ সংবাদে খুসী হইতে পারিল না। তাহার বুকখানা বার বারই শুধু খালি হইয়া আসিতে লাগিল।

বারোয়ারীতলায় বহু পুরাতন কদম গাছের শীতল ছায়ায় স্কুল ঘরটি। সম্মুখে দক্ষিণে দিগন্ত-জোড়া নল ময়দানের মাঠ। শ্যামল স্নেহে পরিপূর্ণ এই মাঠখানির বুক। আষাঢ়ের প্রথম। আউস ধানে পাক ধরিয়াছে। ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে পাটের জমিগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিস্তীর্ণ মাঠখানির একটি পাশ ঘিরিয়া দক্ষিণ সীমান্তে ক্ষীণ সরলরেখার মত বড়তলা গ্রামখানি। বিহারী আর বনমালীকে সাথে লইয়া রামনারায়ণবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন কদম গাছের ছায়ায়। রামনারায়ণ-বাবুর দৃষ্টি দূরে ঐ দিক্ চক্রবালের দিকে নিবদ্ধ। ভবিষ্যতের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাইয়াই যেন তিনি বলিতেছিলেন—

—বলতে পার বনমালী, ক'দিন আর বাঁচব?

বনমালী বলিল—ওসব অলক্ষুণে কথা কেন মুখে আনেন কর্ত্তা?

—কিন্তু তার আগে যে একটা কাজ করে যেতে হবে। আমার চতুরিয়ার এই মাইনর ইস্কুলকে আমি হাই ইস্কুল ক'রব। আর আমার সেই ইস্কুলের হেড্ মাষ্টার হবে সুধাময়। তা হ'লেই আমি হতে পারব নিশ্চিন্ত।

সেবীরও সুধাময়ের পাশের সংবাদ লইয়া গ্রামের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সেবারও সভা, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন আর হরির লুটে বারোয়ারী তলা হয়ে উঠ্‌ল মুখরিত।

এই ঘটনার পরে আবার দশটি বছর কাটিয়া গেল। সুখে দুঃখে কাটিয়া গেছে সুদীর্ঘ এই দিনগুলি। বড়তলার জমিদার রামনারায়ণবাবু বুড়া হইয়া গিয়াছেন। চতুরিয়ার বিহারী মণ্ডল, বনমালী বালাও বুড়া হইয়া গিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে রামনারায়ণবাবুরও যৌবনে ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। কত স্বপ্ন তাঁহার সফল হইয়াছে। বিফলতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে আরও কত। নিজের অর্থ, নিজের শক্তি, নিজের রক্ত নিঃশেষে অঞ্জলি পুরিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, রামনারায়ণবাবু চতুরিয়ার স্কুলের বেদীমূলে। তাই চতুরিয়ার সেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় একদিন সত্য সত্যই পরিণত হইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। সুধাময় কিন্তু হেড্ মাষ্টার হইয়া গ্রামে আসিল না। কোন এক সরকারী অফিসে চাকুরী লইয়া সে কলিকাতাতেই থাকিয়া গেল। এই স্কুলকে লইয়া বিহারীরও উৎসাহের অবধি ছিল না। কেবল শান্তি ছিল না বনমালীর—উৎসাহ ছিল না তাহার। তাহার একমাত্র পুত্র বিদেশমুখা হইয়া গেল। তাই তাহার শুধু মনে হয়—এই ইস্কুল, এ শুধু পর করিয়া দিতেছে গ্রামের সব ছেলে-গুলোকে। তবু তাহাকে উৎসাহ দেখাইতেই হইবে।

উপায় কিছু ছিল না তাহার। জমিদারবাবু নিজে গ্রামে আসিয়া বিহারীর সাথে তাহাকেও এই স্কুল কমিটির সভ্যরূপে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন। বাইরের আস্ফালন দিয়া তাই তাহাকে নিয়ত গোপন করিতে হইতেছে তাহার অন্তরের আর্ত্তনাদকে।

সেবারকার শীতান্তে চতুরিয়া গ্রামে নোতুন করিয়া নোতুন বসন্তের সাড়া পড়িয়া গেল। মুকুলিত আম্রমঞ্জরী, প্রস্ফুটিত ভাঁটী ফুলের গন্ধ, বহন করিয়া আনিতেছিল যেন কত যুগ আগেকার কত পুরাতন গন্ধ। তিন মাসের ছুটি লইয়া সুধাময় বাড়িতে আসিয়াছে। তাহার উপস্থিতিতে গ্রামে যেন নোতুন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল। রোজ সন্ধ্যায় স্কুলে, কাচারীতে, খেলার মাঠে সভা বসিতে লাগিল। বিহারী, বনমালীকে কিন্তু কেউ ডাকে না সে সভায়। নোতুন যুগের নবীন ছেলেদের উৎসাহদীপ্ত জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় সভা প্রাঙ্গণ। বনমালী উদাসকণ্ঠে তাই সেদিন বলিতেছিল—

শুনেছ খুড়ো, সুধাময় কী সব বলে বেড়াচ্ছে আজকাল?

বিহারী সবই জানিত, বলিবার মত কিছু না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। পুরণো দিনের কথা মনে পড়িতেই তাহার বুক চিরিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

বনমালী বলিতে লাগিল—সুধাময় ব'লে বেড়াচ্ছে, এই ইস্কুল আমাদের, আমাদের ছেলেদের দেওয়া মাইনে নিয়েই এই ইস্কুল চল্‌ছে। অন্য গ্রামের অন্য লোক কেন এসে এ ইস্কুলে মাতব্বরী ক'রবে? দক্ষিণ পাড়ার নবীন রায় রামনারায়ণবাবুর সমান টাকার লোক। রামনারায়ণবাবুকে বাদ দিয়ে তাকে করা হবে এবার ইস্কুলের সেক্রেটারী।

বিহারী শুধু বনমালীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

স্কুলের মাঠে প্রকাণ্ড সভা বসিয়াছে। সভাপতির আসনে বসিয়াছিলেন মাননীয় মহকুমাপতি। তাঁহার একদিকে এক চেয়ারে সুধাময়। অপর দিকের চেয়ারে রামনারায়ণবাবু। রামনারায়ণবাবুর পাশে বিহারী আর বনমালী পাশাপাশি বসিয়াছিল। সুধাময় বক্তৃতা দিতে উঠিল—

—বাইরের জগৎ আজ জেগে উঠেছে। যার যার নিজের পথ, নিজের ভালমন্দ নিজে বুঝে নেওয়ার দিন আজ এসেছে। পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌লে চলবে না আজ। বন্ধুর মুখোস পরে উপকার যারা ক'রে আস্‌ছে এতদিন, পরোক্ষে তারা তোমাদের প্রাণশক্তিকে চুষে নিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের এ সর্ব্বনাশের দিকে আজ চোখ দিতে হবে—

ঘন ঘন হাততালির মধ্যে সুধাময় তাহার বক্তব্য শেষ করিল। রামনারায়ণবাবু বিহারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সুধাময় কিন্তু বেশ দু'কথা বল্‌তে শিখেছে।

বিহারী আর বনমালী দু'জনেই তখনও যন্ত্র-চালিতের মত হাততালি দিতেছিল। রামনারায়ণবাবুর কথায় এতক্ষণে তাহাদের চমক ভাঙ্গিল।

সভ্যপদপ্রার্থীদের ভোট গ্রহণের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিহারী আর বনমালী সবিস্ময়ে দেখিল—রামনারায়ণ বাবুর নাম সভ্য পদ হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে।

সভা শেষ হইল। রামনারায়ণবাবু গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। বনমালী আসিয়া প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। রামনারায়ণবাবু সুধাময়ের পিঠে হাত রাখিয়া ক্ষণিক পরে একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—তুমি ভাবছ সুধাময়, আমি হেরে গেছি, না? কিন্তু আমি যে আজ কত বড় বিজয়গর্ব্বে ফিরে যাচ্ছি, সেটা তুমি বুঝবে কিছুদিন পরে। বিহারীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—আমি তা হ'লে যাই বিহারী।

বিহারী নির্ণিমেষ-নেত্রে অপসৃয়মান পাল্কীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মনে মনে ভাবিল—চতুরিয়ায় আসিবার প্রয়োজন রামনারায়ণবাবুর ফুরাইয়া গিয়াছে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ জনশূন্য। দিনান্তের আবছা অন্ধকারে সেই কদম গাছের তলায় বসিয়াছিল শুধু বিহারী আর বনমালী। বিহারী আর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া বনমালীর হাত ধরিয়া কহিল—চল বনমালী আমরাও যাই, আমাদের কাজও ত শেষ হয়ে গেছে।

দুজনে চলিতে লাগিল। তাহাদের কাণে ভাসিয়া আসিল বহুদূরের স্তব্ধ প্রান্তরের মধ্য হইতে রামনারায়ণবাবুর পাল্কীর বেহারাদের চলারপথের একটানা গান।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে অভয়-বাণী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সাহসের বাণী মুক্তির বাণী। মুক্তিপথের যাত্রী, চিত্তে শঙ্কার বিভীষিকা পুষে অগ্রগমন করতে পারে না। স্বাধীনতা-কামীর অন্তঃকরণ নির্ভীক হওয়া চাই। তাই ভীত, ত্রস্ত এবং নিষ্পেষিত স্বদেশবাসীর পক্ষ হ'তে কবি প্রার্থনা করেছিলেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোক-ভয়, রাজ-ভয়, মৃত্যু-ভয় আর।

কারণ চির-অবমানিত, অন্তরে বাহিরে দাসত্বের রজ্জুতে বাঁধা, সহস্রের পদপ্রান্ততলে লুণ্ঠিত, চিরদিন মনুষ্য-মর্য্যাদা-গর্ব্ব বর্জ্জিত সলজ্জ মানুষ মুক্ত হ'তে পারে না। তাই কবির প্রার্থনা—

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

রাজ-ভয়, লোক-ভয় বা মৃত্যু-ভয় পরিহারের উপদেশ সাধারণ। কোনো গুরুতর কার্য্য মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে সম্পাদিত হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব মাত্র শব্দঝঙ্কারে বা ভাষার দ্যোতনায় নয়। তিনি এ তিন ভয় বিসর্জ্জনের সপক্ষে আধ্যাত্মিক হেতুর যুক্তি দেখিয়েছেন। লোক-ভয় কোন্ লোকের ভয়? যাঁর সঙ্গে চির-দিবসের পরিচয় তিনি যে সনাতন সর্ব্বাশ্রয় লোক-পাল। তাঁর পরিচয়ে মন্ত্র-জগতের লোকের ভয় ভিত্তি-হীন কুহেলিকা। রাজ-ভয়ও অলীক। কারণ—

জগতের যত রাজা মহারাজ কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ
সকালে ফুটিছে সুখদুঃখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
আসল কথা, রাজ-রাজেশ্বর ভগবান
যার বিরাজে অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়—স্বাধীন সে বন্দীশালে।

মৃত্যুভয় আবার কি? তিনি যে অমৃত! এ দুদিনের প্রাণ তাঁরি দান।

দু'দিনের প্রাণ—
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান?
এত প্রাণ-দৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রবো?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি। বিশ্ব-প্রাণের সমাচার যুগ-যুগান্তর তাঁর জন্ম-ভূমির সংস্কৃতিকে শুদ্ধ করেছে। সেথায় তার নির্ভীকতার উৎস-মুখ। সাহস অবিবেচকের অসার দুঃসাহস মাত্র নয়। এ সাহসের বিশদ হেতু পাওয়া যায় অন্য গাথায়। নির্ভীকতা, আত্ম-মর্য্যাদা, পৃথিবীর তুচ্ছ মান বা সম্পদের ভ্রান্ত-গর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ—

মোর মনুষ্যত্বসে যে তোমারি প্রতিমা
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

সুতরাং প্রবলের প্রভুত্ব আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করলে, অবমাননা হয় আত্মার মহিমার। অত্যাচারের বিপক্ষে বিদ্রোহ নিজের তুচ্ছ ব্যক্তিত্বের অহমিকা বা দম্ভ নয়। আত্মার মহিমা শাশ্বত। অতএব—

সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হোক্ না সে মহারাজ বিশ্ব মহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেব-দ্রোহী ব'লে
সর্ব্বশক্তি লয়ে মোর।

পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা-যজ্ঞের মহাপ্রাণ হোতাদের সাথে একমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতের ঋত্বিক কবি। মানুষ মানুষের উদ্ধত দম্ভের নিষ্পেষণ কেন সহ্য করবে? কেন করবে না তার কারণ বিবৃত করেছেন উভয় ভূখণ্ডের নরের হিতকামীরা বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। সে কারণের উৎস-মুখের সন্ধান পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে।

অবদমিত জন-গণ-মনের মুক্তির সাধক রুশো, তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মানুষের আদিম অধিকারের ভিত্তিতে। মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে, তার মুক্তির দাবী সহজ। তাঁর প্রাণে ও লাঞ্ছিত, পদানত, দীন-প্রাণ-দুর্ব্বলের চির-পেষণ-যন্ত্রণা অরুন্তুদ মর্মবেদনা সৃষ্টি করেছিল। মুক্তি অভিলাষী জর্জ্জ ওয়াশিংটন সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের দাম্ভিক শাসন অবলুপ্তির মানসে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তাঁরও যুক্তির মূলে ছিল মানুষের অধিকার, নাগরিকের ন্যায্য রাজনৈতিক মুক্তি। কার্ল মার্ক্স মানুষের প্রাণশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতির হিসাব নিকাশের ফলে সাম্যের দাবীর অমোঘ যুক্তি দেখিয়েছেন। মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার ক'রে লেনিন রুশিয়ার মুক্তি সাধন করেছেন। এঁদের চিত্তের কৃপা এবং সমরনিষ্ঠুরতা প্রশংসনীয়। এঁরা বরণীয়, এঁরা স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সাম্যের নির্দেশে লেনিনবাদী বা মানবের কোনো হিতৈষী মলিনতা লক্ষ্য করবার অবকাশ পাবে না।

বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী, বারেকের তরে ভুলাও জননী—
কে বড় কে ছোট, কে দীন কে ধনী, কেবা আগে কেবা পিছে।
কার হ'ল জয়, কা'র পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি, কার হ'ল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়, কেবা আগে কেবা পিছে।

অবশ্য রাজনীতির প্রসঙ্গে একথা বলা হয় নি। এ সরস্বতীর বন্দনা। বিদ্যার আদর্শ যদি এই শুভ চিত্তবৃত্তি হয় তা'হলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকে না। সেই তো উদার অভয় বাণী, মুক্তির বাণী। কবির আদর্শ—

গাঁথা হয়ে থাক্ এক গীতিরবে, ছোট জগতের ছোট বড় সবে
সুখে পড়ে থাক্ পদপল্লবে যেন মালা একখানি।

বলছিলাম, পাশ্চাত্য দেশ-হিতৈষী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই সাম্যবাদী, নরের মুক্তির দাবীদার, কিন্তু পাশ্চাত্যের দাবী নরের পক্ষ হ'তে,তার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সেই অধিকার—প্রয়াস মানব-আত্মার মুক্তির কামনায়। নরনারায়ণ। পুণ্য-তীর্থ ভারতবর্ষে প্রথমে তিনি দু'বাহু বাড়ায়ে নর-দেবতারে নমস্কার করেছেন !

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর পুণ্য মাতৃ-ভূমির সংস্কৃতিতে।

হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি।

পৃথিবীর সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। অত্যাচারীর প্রতাপ হাস্যাস্পদ বাতুলতা। ভারত শিখায়েছে, নরদেহ আত্মার মন্দির। নরের অবমাননায় দেবতার অবমাননা। আত্মা দুর্ব্বলের লভ্য নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো। তাই কবির অভয় বাণীর সুর উদাত্ত। তাই নিজের প্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন স্বদেশবাসীকে উপনিষদের বাণীতে। মুক্তকণ্ঠে তিনি দেশবাসীকে নির্ভয়ে বলতে উপদেশ দিয়াছেন—

ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মতো।

যারা অমৃতের সন্তান, মানুষের দম্ভের বিলাসে তাদের কী ভয়? অতএব মানবের অধঃপতনে কবি মহতী বিনষ্টির বিভীষিকার করাল ছায়ায় শিহরেছেন। দাসত্ব রজ্জুতে বাঁধা যার অন্তর বাহির, তার পক্ষে মুক্তির সাধনা অসম্ভব। বাঁধন খুলতে সাহস চাই। কারণ এ বাঁধন ছেদন, মাত্র রাজনীতিক্ষেত্রে অধিকার লাভ নয়—তার পটভূমিতে আছে আত্মার চরম মুক্তির সঙ্কেত। তাই রাজাধিরাজ ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন—

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীন প্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। দুর্ব্বল আত্মার
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ় নিষ্ঠা ভরে।

কবি বহু গানে, নানা ছন্দে, অশেষ মনোরম ভঙ্গিতে, আত্মার মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। মুক্তি কেবল সাম্রাজ্যবাদের বন্দী-শালা হ'তে নয়। আত্মা মুক্তি চায় সকল সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হ'তে। রাষ্ট্রে সমান অধিকার না থাকিলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম হয় বৃথা। বৃক্ষের ভূমি—বন্দী শালা হ'তে উদ্ধারে তিনি উল্লসিত। স্বপ্ন-ভাঙ্গা নির্ঝর যখন মুক্তির কামনায় পাগলের প্রায় মেতে উঠ্‌লো, তারও মুখে ফুটলো অভয় বাণী—

ভাঙ্‌রে হৃদয়, ভাঙরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর।

যে কবি জড় নির্ঝরকে অভয় বাণী শুনিয়েছেন, তিনি স্নেহার্ত্ত জননী বঙ্গভূমিকে বড় অভিমানে বলেচেন—

সপ্তকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি
রেখেছ বাঙালী করি মানুষ করনি।

কবির মাতৃ-ভক্তি সু-গভীর, তাই মায়ের সন্তানের সদা সহায়তার আবেগে কবির প্রাণ ভরপুর। তিনি বাঙলার দিগন্ত-প্রসার ক্ষেত্রের উদার শান্তি ভালবাসতেন। তাই বলেছেন—

করো আশীর্ব্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কাজে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

কেবল পরাধীনতার ফাঁসই ভারতবাসীর অগ্রগমনে প্রতিরোধক নয়। বহু নিরর্থক শাসন অনুশাসন সমাজকে পঙ্গু করেছে। কর্ম্মের অন্তরাত্মা বিদায় নিয়েছে, অবশিষ্ট আছে বাঁধনের দড়ি। দেশ, মান, পাত্রের উপযোগিতা আজ সমাজ বিস্মৃত। বলেছি রবীন্দ্রনাথের মুক্তির সঙ্কেত, আত্মার মুক্তির প্রয়াসে। যেমন আত্মা বলহীনের লভ্য নয়, তেমনি

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

স্বরাজ্য সাধনা স্বাধীন চিত্তের অনুবর্ত্তিনী শক্তি সাপেক্ষ। ভক্তি মার্গেরও সেই কথা। কবিরাজ গোস্বামী মনোরম ভাষায় শুদ্ধা ভক্তির পরিপন্থী আচারের বাঁধন নির্দেশ করেছেন। একান্ত আন্তরিক পরিশ্রমে ভক্তিলতার পরিপুষ্টি। উপশাখার কবল হ'তে তাকে সংরক্ষণ না করলে, আশ্রিত-লতার মূল-শাখা শুষ্ক হয়।

কিন্তু　যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা
ভুক্তি মুক্তি পাঞা যত অসংখ্য তার লেখা।
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ
যে সকল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়
শুদ্ধ হইয়া মূল-শাখা বাড়িতে না পায়
প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন
তবে মূল-শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।

আমাদের বহু দেশাচার প্রাচীন। যে কালে তারা প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল, তাদের উপযোগিতা ছিল সে যুগে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না ক'রে মাত্র বাহ্যিক বিধান মানা জ্ঞান বা বলের প্রসারের পরিপন্থী। ধানের শাঁস ফেলে তুঁষ খেলে দেহ পরিপুষ্ট হয় না। তেমনি নিরর্থক বিধানের নিগড় উন্নতির অন্তরায়। ভক্ত বলেছিলেন—

ফলমূল খাকে হরি মিলেতো বাদুড় বান্দর হোই
নিত নাহনেসে হরি মিলেতো জলজন্তু হোই

তুলসীদাস বলেছিলেন—

পাথর পুজ্‌নে হরি মিলে তো ম্যঁয় পুজে পাহাড়।

সত্যই

বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দ-লালা।

কবি রবীন্দ্রনাথ শিখায়েছেন যে নিরর্থক দেশাচারের বাঁধন অনর্থ-কর। তাদের অত্যাচারও পেষণ-যন্ত্রণা বাড়ায়।

দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা গতি-পথে বাধা
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।

কবি সত্যই বলেছেন—

কর্ম্মেরে করেছ পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছ হত শাস্ত্র কারাগারে,
আপন কক্ষের মাঝে বৃহৎ ভুবন
করেছ সঙ্কীর্ণ, রুধি দ্বার বাতায়ন—
তারা আজ কাঁদিতেছে।

আত্ম-দর্শনই তো আর্য্যঋষির বাণী। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য এইখানে। সামাজিক অনুশাসন সবাই মানে। কিন্তু মনের উন্নতি বা জ্ঞানের প্রসার হয় মুক্ত চিন্তা ধারায়। তাই অধিকারী ভেদের ব্যবস্থা, স্বরাজ্য সিদ্ধির আয়োজন। কবির বলেছেন—

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ
তব্‌ কয়লা কী ময়লা ছোটে যব আগ ক'রে পরবেশ।

হজরত আলি বলেছেন—

মন্‌ আরাফা নফ্‌সে ফকদ্‌ আরাফা রব্বে।

যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাই প্রাণে সুরের আগুন লাগাতে চেয়েছিলেন।

উন্নতির পথ-প্রদর্শক বরণীয়। কিন্তু সাধনা প্রত্যেক মানুষের নিজের ধর্ম্ম। কর্মের অবহেলায় মানুষ বৃক্ষ-সম হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ মানুষের নিজের প্রাধান্যের বাণী প্রচার করেছেন

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের পরে
দিয়েছ শাসন-ভার, হে রাজাধিরাজ।

তাই তিনি অভয় বাণী শুনিয়েছেন

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।

বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্য গদ্যে পদ্যে, স্পষ্ট কথায়, উপমায়, সঙ্কেতে ও ইঙ্গিতে স্বাধীনতার অভয়-বাণীতে পরিপূর্ণ। স্বাধীনতা চাই মনের। বিলাস-বাসনা স্বাধীনতার উপাধি নয়। ভারতের জীবন সরল, ভাবনার পথ উদার। তার ভাষা মিষ্ট, অন্তরে শোনে সে উদাত্ত স্বর। মাভৈঃ তার ইষ্ট মন্ত্র। কবির কথায় বলি—

কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তি মদমত্ত এই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি' শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মথিত নকল রত্নকে কবি হলাহল বুঝেছিলেন। তাই তাঁর উক্তি—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর, ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।

আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে নটরাজের বাঁধন খোলা, বাঁধন পরার দিন আগত ঐ। আজ চাই দুর্দমনীয় সাহস। আজ আত্ম-অবিশ্বাস কঠিন ঘাতে নাশিতে হবে, পুঞ্জিত অবসাদ ভার অশনি পাতে হানতে হবে। আজ বলতে হবে—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগবো আমি দাও মোরে সেই কান।

বল্‌তে হবে—

আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।

আজ যদি অগ্রগতির ডাকে কেহ না সাড়া দেয়, রক্ত-মাখা চরণতলে পথের কাঁটা দল্‌তে হ'বে।

যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা!)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে।



দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর্য্য মহাস্থবির একটু অধীরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ও কিঞ্চিৎ কঠোরতা দেখাইয়া বলিলেন, "ভীরু কাপুরুষ! মিথ্যা কথায় কি তোমরা দণ্ড হইতে নিস্কৃতি পাইবে ভাবিয়াছ?"

—আমি সত্যই বলিতেছি!

—ঘটনার সমাবেশে তোমার সকল কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি তোমাকে প্রশ্ন করিলে বৃথা সময় নষ্ট হইবে। কীর্ত্তিবর্ম্মণ, ইহারা যে সকল নিদর্শন ইহাদের অভিযানের পথনির্দ্দেশক সঙ্কেতরূপে বা ইহাদিগের অনুসন্ধিৎসুগণের অনুসন্ধান কার্য্যের নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে অভিযান পথে ও বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল সে সকল সংগৃহীত নিদর্শনাদি কোথায় রক্ষিত আছে?

কীর্ত্তিবর্ম্মণ, গৃহকোণে রক্ষিত একটি বস্ত্রাচ্ছাদিত পোট্টলিকা দেখাইয়া দিয়া বলিল, "সংগৃহীত নিদর্শন সকল ঐ বস্ত্রাবৃত পোট্টলিকায় রক্ষিত আছে।"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "ইহারা ত স্বেচ্ছায় আপনাদিগের পরিচয় জ্ঞাপন করিতে অনিচ্ছুক দেখিতেছি। ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু অবগত হইয়া ভবিষ্যতের কোনও রূপ অনাগত বিপদের পথরোধের প্রচেষ্টায় অবহিত হওয়া আবশ্যক।"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল, "আমি সংগৃহীত নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাদের আবাসস্থলের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। জানিয়াছি যে, ইহারা এক বাটীতেই বাস করে এবং আমি মন্ত্ররক্ষা-বাহিনীর পঞ্চদশ কর্ম্মীকে, একজন কর্ম্মাধ্যক্ষের অধীনে ইহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়াছি। ইহাদের আবাসস্থলে গিয়া যাহা কিছু ইহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সম্বন্ধে নিদর্শনাদি পাওয়া যায় এবং ইহাদের তৈজসপত্রও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে বলিয়া দিয়াছি। তাহারা সকলেই মুখচ্ছদ ধারণ করিয়া গিয়াছে। তাহারা অনেকক্ষণ গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে, এইরূপ অনুমান হয়।"

এমন সময়ে প্রেরিত মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর কর্ম্মীগণ অধ্যক্ষের সহিত বন্দীদিগের বাসস্থানের লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা যে কক্ষে বসিয়াছিলাম তাহারা সে কক্ষের দ্বার সম্মুখের প্রাঙ্গণে আসিয়া সামরিক রীতিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং আমাদিগকে সামরিক রীতিতে অভিবাদন পূর্ব্বক একে একে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুখচ্ছদ-গুলি খুলিয়া গৃহকোণে অবস্থিত একটা দারুনির্ম্মিত আধারে রক্ষা করিল, অতঃপর একে একে বাহিরে চলিয়া গেল। তাহারা বাহিরের প্রাঙ্গণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল এবং কীর্ত্তিবর্ম্মণের তূর্য্যধ্বনির সহিত তাহারা, একে একে সকলে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। রহিল কেবল মন্ত্ররক্ষামণ্ডলীর নেতা চণ্ড সেন। সে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সমূহ কক্ষতলে রক্ষা করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মণের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কীর্ত্তিবর্ম্মণ তাহাকে বলিল, "তুমি এখন এইখানেই থাক!"

কীর্ত্তিবর্ম্মণ চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "চণ্ডসেন, কোনওরূপে কেহ তোমাদের চিনিতে পারে নাই ত?"

চণ্ডসেন উত্তর দিল, "না, কেহই আমাদিগকে চিনিতে পারে নাই—এইরূপ ত আমার অনুমান হয়।"

—কেহ কি তোমাদের বাধা দিয়াছিল?

—হাঁ, দুইজন আমাদের কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের যবন বলিয়াই মনে হয়। আমরা তাহাদের মুখ, হাত, পা ও চক্ষু বাঁধিয়া জড়পিণ্ডের মত ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদেরই বস্ত্রে তাহাদের বাঁধিয়াছি।

এই দুইজন বন্দী একই স্থানে এবং একই গৃহে বাস করে ?

—হাঁ, ইহারা একই স্থানে এবং একই গৃহে স্বতন্ত্র কক্ষে বাস করে।

—ইহাদের কাহারও কি কোনও আত্মীয়-স্বজন সেখানে আছে ?

—গৃহে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল—তাহাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের কোনও কথা হয় নাই। আমরা পরস্পরের মধ্যে আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলাম ; কেহ তাহা শুনিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে নাই।

আমি চণ্ডসেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের—এই বন্দীদের—পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছ কি ?"

চণ্ডসেন বলিল, "হাঁ, ইহাদিগের গৃহে বা আবাসস্থলে সংগৃহীত দ্রব্যাদির মধ্যেই ইহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে।"

—ইহাদের কি নাম বল ত !

—ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ডেমিট্রিঅস্, অপরের নাম থিওফিলস্—তবে কে ডেমিট্রিঅস এবং কে থিওফিলস্ তাহা আমি বলিতে পারি না।

আর্য্য মহাস্থবিরকে আমি বলিলাম, "ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বোধ হয় আর কিছু আবশ্যক করে না। ইহারা যে গুপ্তচর ও যবন এবং ইহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও মন্ত্রভেদ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

বিচার সভার সকলেই আমার সহিত একমত হওয়াতে আমি পুনর্ব্বার প্রস্তাব করিলাম, "গুপ্তচরের যে চরম শাস্তি, ইহাদিগকে তাহাই দেওয়া হউক। ইহাই আমার প্রস্তাব।"

আমি আর্য্য মহাস্থবিরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি মত ?"

আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সংঘ যেরূপ যুক্তিযুক্ত ও যথাবিধি বিবেচনা করিবেন আমার তাহাতে অন্যমত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না।"

আমাদের মধ্যে শেখর অর্থশাস্ত্রবিদ্ রাজনীতিবিজ্ঞান ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে পারদর্শী সুপণ্ডিত। সে তাহার পিতার নিকট এখনও এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত এবং এই আলোচনায় তাঁহার সহিত সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে। আমি বিচার সংঘের অনুমোদনক্রমে শেখরকে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ দিলাম।

শেখর ইহাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল বিবৃতি গ্রহণ-পূর্ব্বক বিচার করিয়া বলিল, "ইহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা ইহাদের সপক্ষে কোনও প্রকার দোষ স্খালনের যুক্তি বা বিবৃতি নাই। ইহাদের গৃহ হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী ও পত্রাদি হইতে ইহাদের অপরাধ ও ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ সপ্রমাণ করিতেছি।"

আমি বলিলাম, "তবে দণ্ডনীতি অনুসারে বন্দীদিগের চরমদণ্ড সম্বন্ধে বিচার সংঘের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব কর। আরও এই সকল সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাদেরই বা কি ব্যবস্থা করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও একটা প্রস্তাব বিচার সংঘের নিকট আলোচনার জন্যও উপস্থাপিত করা আবশ্যক। তাহাও তুমি কর।"

শেখর কিছুক্ষণ মৌন ছিল—বোধ হয় বিচার্য্য বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে শেখর বলিল, "শত্রুদ্বারা মন্ত্রভেদ উদ্দেশ্যে নিযুক্তকারের শাস্তি প্রাণদণ্ড—ইহাই দণ্ডনীতির ব্যবস্থা এবং তদনুসারে আমি বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিতেছি এবং আরও প্রস্তাব করি যে, সংগৃহীত দ্রব্যাদিসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ্ন করা হউক। তাহা না করিলে আমাদের ত্রাণ সংঘের বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

বিচার সংঘের সকল সদস্যই এই দুই প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদন করিলেন। আরও স্থির হইল যে বন্দীদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড বিধান করা হইবে এবং সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ অগ্নিদাহ করিয়া তাহাদিগের ভস্মরাশি ইহাদের দেহাবশেষের সহিত এই বিধ্বস্ত দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত একটা গভীর জলহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি দ্বারা এই পুরাতন কূপটাকে পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে।

বন্দীগণের হস্তপদ পুনরায় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া ধ্বংসস্তূপের প্রান্তে পুরাতন একটা শুষ্ক কূপের নিকট পশুর ন্যায় টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদের জন্য

প্রস্তুত করা হইল। অস্ত্রাগার হইতে দুইটি শাণিত কুঠার আনীত হইল এবং ত্রাণসংঘের দুইজন সদস্যকে এই প্রাণদণ্ড বিধানের নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইল। চল্লিশজন অপর সদস্য খনিত্র গ্রহণ করিয়া, বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৃত্তিকারাশি ও প্রস্তরখণ্ডসমূহদ্বারা ঐ কূপ পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত রহিল। সংগৃহীত দ্রব্যসমূহে অগ্নি প্রদত্ত হইল এবং উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করিবার জন্য বাহিনীর একজন সৈন্য নিযুক্ত হইল।

স্বল্পকাল মধ্যে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। বন্দীদিগের শাস্তি বিধানের সময় তাহাদের মুখের ও চক্ষুর বস্ত্র খুলিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের সভয় কাতর চীৎকারে সেই ভগ্নাবশেষ প্রাচীন দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাও নিতান্ত অল্পক্ষণের জন্য। শাণিত কুঠারের আঘাতে তাহাদের জীবনের সহিত সেই করুণ ক্রন্দনও শেষ হইয়া গেল।

বন্দীদিগের মৃতদেহ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহের ভস্মরাশির সহিত মৃত্তিকা ও প্রস্তরখণ্ডসমূহ দ্বারা কূপ পূর্ণ করা হইল। চল্লিশজন সদস্যের দ্বারা এই কূপ পূর্ণ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আমরা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলাম যে, অদ্য রজনীতে বাহিনী পরীক্ষণ স্থগিত থাকুক। চারদিগের অনুসন্ধানে অদ্য ক্ষত্রপ কর্ম্মচারীদিগের এই বন মধ্যে আগমন অসম্ভব নহে।

এখানকার কার্য্য শেষ হইলে শেখর তূর্য্যধ্বনি করিল। একজন নায়ক আসিলে তাহাকে বলিল যে, বিশেষ কারণ-বশতঃ অদ্য বাহিনী পরীক্ষণ হইবে না। সে বাহিরে গিয়া তিনবার বংশীধ্বনি করিল। পরীক্ষণ প্রাঙ্গণে সমবেত প্রায় পঞ্চশত বাহিনীসদস্য নিঃশব্দ ছায়ার মত কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিত জ্যোৎস্নালোকে বিলীন হইয়া গেল। আমরাও গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তখন যামিনী দ্বিপ্রহরের প্রথম পাদে উপনীত হইয়াছে।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মন্ত্ররক্ষা
নামক পঞ্চদশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

বাংলার মাছ ও মাছধরা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম্-এস্‌সি

"মাছ ত কেবল জলেই করে না খেলা
খেলে বাঙালীর স্মৃতিসরে সারাবেলা।"—মাটির মায়া।

বাংলাদেশে নদী, নালা, খাল, বিল, ডামস, কোল, নদীমুখ প্রভৃতির প্রাচুর্য্যবশতঃ এখানে যত বিভিন্ন প্রকারের অপর্য্যাপ্ত মাছ দেখা যায় ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তাহা লক্ষিত হয় না।

চিংড়িকে সচরাচর মাছ বলিলেও উহা যে প্রকৃত মৎস্যশ্রেণীভুক্ত নয় তাহা অনেকেই জানেন। এই চিংড়ির মধ্যেও যে অনেক শ্রেণী আছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মাছের মধ্যে সাধারণতঃ দুই ভাগ করা যাইতে পারে—আঁইশযুক্ত এবং আঁইশহীন মৎস্য।

কই, রুই, কাতলা, ইলিশ প্রভৃতি অধিকাংশ মৎস্যই আঁইশযুক্ত; পক্ষান্তরে সিঙ্গি, মাগুর, আড় প্রভৃতি মৎস্য আঁইশহীন।

আমাদের পরিচিত মাছগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

ডানকানা, পুঁটি, মৌরালা, সরলপুঁটি, তিনকাঁটা, খলসে, কই, টেংরা, রামটেংরা, আড়, চেলা, ভেদা বা মেনি, বাটা, ক্যাঁসা, কাজলি বা বাঁশপাতা, খয়রা, খরসোলা, সোল, গজার, টাকি, শিঙ্গি, মাগুর, পারসে, তপসে, ভেটকি বা কোরাল, ইলিশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, মহাশোল, ভোল, রিঠা, চাঁই, পাঙাস, বাগাড়, বোয়াল, গুরজালি, পাবদা, ফলি, চিতল, গাংদাঁড়া বা স্বর্ণ খিড়কি, কালবোস, বাচা, ভাঙ্গন, কুঁচো, বাইন, চাঁদা ও পিয়েলি বেলে প্রভৃতি। অবশ্য স্থানভেদে উল্লিখিত অনেকগুলি মাছের স্বতন্ত্র নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেকে এই প্রবন্ধ দেখিয়া মনে করিতে পারেন লেখক কি লিখিতব্য বিষয় খুঁজিয়া পাইলেন না যে এই অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে চাই বর্ত্তমানে দেশে দুধ ঘি যেরূপ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণে বাঁচিতে হইলে মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দুধের অভাব মাছের দ্বারা যতটা পূরণ হইতে পারে অন্য কোন সহজপ্রাপ্য খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে তাহা সম্ভবপর নয়। শিঙ্গি, পারসে, বাঁটা, মাগুর প্রভৃতি মাছের আমিষ পদার্থ দুধের আমিষ পদার্থের মতই সহজপাচ্য ও উপকারী বলিয়া খাদ্যবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ কালিপদ বসু মহাশয় এবিষয়ে বহু পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমিষ পদার্থের প্রধান কাজ আমাদের শরীরের আমিষ অংশ অর্থাৎ মাংস পেশী রক্ত প্রভৃতির আমিষাংশ গঠন ও পুরাতন পেশী প্রভৃতির

ক্ষতিপূরণ করা। যে সব আমিষ খাদ্য এই কাজে বেশী উপযোগী সেগুলিকে উচ্চস্তরের আমিষ খাদ্য বলা হইয়া থাকে। এই গুণকে পুষ্টিমান (Fiological Value) বলে। আদর্শ আমিষ পদার্থ হইবে যাহার শতকরা একশত ভাগই আমাদের শরীরের কাজে লাগে। বলা বাহুল্য, এরূপ পদার্থের সন্ধান জানা নাই। কতকগুলি পরিচিত আমিষ খাদ্যের পুষ্টিমান হইতে মাছের উপযোগিতা ভাল ভাবে বুঝা যাইবে :—

খাদ্যদ্রব্য	পুষ্টিমান	খাদ্যদ্রব্য	পুষ্টিমান
গোটা ডিম	৯৬	শিঙ্গিমাছ	৮৮
টাটকা গো-দুগ্ধ	৯০	কই	৮৬
ছানা	৬৯	সরপুঁটি	৮২
ছানার জলের আমিষ	৮৪	রুই	৭৯
মাংস	৭৬-৮০	কাতলা	৭৮
ডাল	৪০-৫০	ইলিশ	৭০

এস্থলে জানিয়া রাখা ভাল যে মাছের প্রায় বার আনাই জল—আমিষ পদার্থ শতকরা প্রায় ২০ অংশ মাত্র। মানুষের শরীরের ওজন যত সের প্রায় তত গ্রাম (১১ গ্রামে ১ তোলা) আমিষ পদার্থের প্রয়োজন। যাঁহার ওজন ১ মণ ২৬ সের তাঁহার ৬ তোলা নির্জলা আমিষ পদার্থ আবশ্যক। অর্থাৎ ডাল ডিম দুধ মাংস না খাইয়া শুধু মাছ খাইতে হইলে তাঁহাকে ৬ ছটাক মাছ খাইতে হইবে। অবশ্য তরিতরকারী এমন কি ভাত রুটি হইতেও আমরা খানিকটা আমিষ পদার্থ পাইয়া থাকি। বলা বাহুল্য, শরীরের পক্ষে দৈনন্দিন আবশ্যক আমিষ পদার্থের অতিরিক্ত যদি খাওয়া যায় ও তাহা হজম করিতে পারা যায় তবে তাহাতে ভাত রুটির মত শরীরের শক্তি সরবরাহের কাজ হইয়া থাকে। সুতরাং চাউল ময়দার নিদারুণ অভাবের সময় যাঁহাদের মাছ পাইবার সুযোগ আছে তাঁহারা উহা বেশী পরিমাণে খাইতে যেন দ্বিধা না করেন। অনেকে বলিতে পারেন মাছ না খাইলে কি চলে না? খুব চলে, যদি উপযুক্ত পরিমাণে দুধ প্রত্যহ খাওয়া যায়। তাহা যখন অসম্ভব তখন মাছ খাইতেই হইবে। কেহ বা তৃণলতাপুষ্ট গবাদি পশুর কথা তুলিতে পারেন। খাদ্যবিদ্গণ দেখিয়াছেন—ঐ সব প্রাণীর পাকস্থলী এত বৃহৎ যে সেগুলি যেন কারখানা বিশেষ। সেখানে অনেক প্রকার ভিটামিন, আমিষ পদার্থ প্রভৃতি ঘাস পাতা হইতে গৃহীত নিম্নস্তরের আমিষ ও অন্যপদার্থ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষ যখন গরু নয় তখন সে কথা না তুলাই ভাল। উপমা কাব্যেই শোভা পায়, রূঢ় বাস্তবতার নিকট তাহার স্থান নাই। শুধু শাক ভাত ডাল খাইয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে তবে সেরূপ ভাবে বাঁচা "মরে বেঁচে কিবা ফল ভাই" বাক্যটির দ্বারাই ভালরূপে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ আমরা অনেকেই এইরূপভাবেই ক্ষীণজীবী, স্বল্পায়ু হইয়া বাঁচিতেছি, তবে যাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাঁহারা নিছক গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতায় প্রশ্রয় দিতে গিয়া শরীরকে ব্যাধিমন্দির ও পরিবারের অশান্তির কেন্দ্র করিয়া না তোলেন, ইহাই আমার সবিনয় বক্তব্য।

মাছের তেলও অতিশয় উপকারী। বর্ত্তমান তেলের দুর্ভিক্ষের দিনে মাছ খাইলে অনেকটা ভাল তৈলজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় তারপর মাছের তেল, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ছোট বড় সকল মাছের যকৃত তৈলই ভিটামিন এ বি১, নিকোটিনিক অ্যাসিড, রিবোফ্ল্যাভিন এবং ডির প্রধান উৎস বলিয়া আমাদের ও অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে—সুতরাং নিয়মিতভাবে মাছ খাইলে এইসব ভিটামিনের অভাবজনিত ব্যাধির জন্য—কড্ লিভার অয়েল বা হ্যালিবাটলিভার অয়েল কিনিয়া পয়সা খরচের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। মায়েদের এবং বাড়তির বয়সে ছেলেমেয়েদের এই সব ভিটামিনের চাহিদা খুব বেশী। ডিম এবং দুধে এসব ভিটামিন থাকে, কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা যখন ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে তখন মাছের শরণ লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ছোট মাছের যকৃত তেল পৃথক করা যায় না তবে সাধারণতঃ রান্নার সময় সে তেল মাছের সঙ্গেই ওতোপ্রোতভাবে থাকিয়া যায়। যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারা বড় মাছের তেল বাজার হইতে পৃথক কিনিয়া আনিয়া বড়া করিয়া অথবা পালং বা অন্যবিধ শাকের সঙ্গে ঘণ্ট করিয়া খাইতে পারেন। ইহাতে মাছের তেলের ভিটামিন এ ব্যতীত শাকের ক্যারোটিনগুলিও তেলের সঙ্গে মিশিয়া শরীরে গ্রহণযোগ্য হয় এবং ঐ ক্যারোটিন শরীরের মধ্যে ভিটামিন 'এ'তে পরিণত হইয়া শরীরের সৌকর্য্য সাধন করে। ভিটামিন এ-র অভাবে রাতকানা রোগ এবং ডি-র অভাবে বাড়তির বয়সে ও প্রসূতীদের রিকেটস রোগ জন্মে। ভিটামিন এ এবং রিবোফ্ল্যাভিন চোখের পক্ষে অতিশয় উপকারী। নিকোটিনিক অ্যাসিড-এর অভাবে নানারূপ চর্ম্মরোগ জন্মে এবং ভিটামিন বি, স্নায়ু সতেজ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে এবং কার্বোহাইড্রেট খাদ্য অর্থাৎ ভাত রুটি প্রভৃতিকে শরীরের কাজে লাগাইতে সাহায্য করে। যদিও শাক পাতার ক্যারোটিন স্নেহ পদার্থের সহিত উদরস্থ হইলে মানুষের লিভারে গিয়া উহা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়—তবে বহুমূত্র প্রভৃতি ব্যারামে এবং অনেক প্রকার শারীরিক অবস্থায় উহা সম্যক হইতে পারে না। Vitamins in Medicine—পুস্তকে ইহা লিখিত আছে। সুতরাং প্রাণীজ খাদ্য হইতে ভিটামিন এ পাওয়া দরকার। দুধের পরিবর্ত্তে মাছ খাওয়া এই হেতু অপরিহার্য্য।

মাছের তৃতীয় উপকারী পদার্থ উহার কাঁটা। অনেকেই জানেন আমাদের হাড়, দাঁত প্রভৃতি পদার্থ চূণজাতীয় উপাদান বা ক্যালসিয়মের লবণপদার্থে গঠিত। দুধ ক্যালসিয়মের একটি বড় উৎস। অনেক-প্রকার শাকেও ক্যালসিয়ম লবণ থাকে তবে কোনও কোনও শাকে অক্স্যালিক অ্যাসিড বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঐ ক্যালসিয়ম শরীরে ভাল গৃহীত হইতে পারে না। আমরা পানের সঙ্গে যে চূণ খাই উহাতে অনেকটা ক্যালসিয়ম পাওয়া যায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মায়েদের এবং বাড়তি বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্যালসিয়মের চাহিদা খুব বেশী। এঁদের পক্ষে ক্ষুদ্র মৎস্য খুবই উপকারী। অনেকেই হয় তো জানেন বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ছোটমাছকে চুণোমাছ বলা হইয়া

থাকে। আমরা খাদ্যবিজ্ঞান পড়িয়া যাহা শিখিতেছি আমাদের দেশের লোকেরা সেকালে সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলেই তাহা জানিতেন। সুতরাং পুঁটি, টাংরা, বাঁশপাতা, খল্‌সে, পিয়েলি, পাবদা, ফাঁসা, খয়রা প্রভৃতি মাছ যে নগণ্য নয় তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই সব মাছের অনেকগুলিই ভাজিয়া খাইতে বেশ উপাদেয় ও মুখরোচক এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া চিবাইয়া খাইলে উহাদের কাঁটা অক্লেশেই গলাধঃকরণ করিয়া উপকার পাওয়া যাইতে পারে। বিবেচনা মত এই সব চুনোমাছ প্রভৃতি বা ছেলেমেয়েদের খাওয়ান হইলে বহুব্যয়সাধ্য ক্যালসিয়ম ইন্‌জেকশন বা ক্যালসিয়ম ঘটিত ঔষধের ধার ধারিতে হয় না। আশা করি বিজ্ঞানসম্মত এই আলোচনা অনেকেই মনে রাখিবেন এবং তাহা দৈনন্দিন জীবনে পালন করিয়া এই দারুণ দুর্দিনে কথঞ্চিৎ শান্তিময় জীবন যাপনের চেষ্টা করিবেন।

এক্ষণে মাছধরা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। জালের ব্যবহার না করিয়া মোটামুটি যে সকল উপায়ে মাছধরা হইয়া থাকে এখানে তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

বিনা জালে মাছধরার মধ্যে বড়শিতে মাছধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুইল বা ছোটছিপের সাহায্যে সুতার সঙ্গে ফাতনা সংযুক্ত বড়শি ফেলিয়া মাছধরার কথা সকলেই জানেন। মাছধরা থেকে বাংলা ভাষায় অনেক কথা আসিয়াছে 'টোপ গেলা' কথাটি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পদ্মা বা বড় নদীর ভাঙ্গনের মুখে জলের আবর্ত্তের মধ্যে বহু লম্বা এবং মোটা সুতার সঙ্গে সাধারণতঃ কেঁচোর টোপযুক্ত একগোছা বড় বড়শি ফেলিয়া বোয়াল, আড়, মৃগেল, চিতল প্রভৃতি ধরা হইয়া থাকে। এই বড়শিতে কোনও ফাৎনা থাকে না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুতা ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, যখন মাছে টান দেয় তখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হেঁচকা টান দিয়া মাছ গাঁথিয়া কিছুক্ষণ খেলাইয়া ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় তুলিয়া থাকে। এই প্রকার বড়শিকে 'তাগি' বলে। বহুক্ষণ অনন্যমনে একদৃষ্টে সুতার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া বাংলায় কোনও কোনও অঞ্চলে একাগ্র মনে কোন বিষয়ের সাধনাকে চলতি ভাষায় 'তাগি ফেলে' বসা বলা হইয়া থাকে। পদ্মার অনতিগভীর অল্পস্রোতযুক্ত স্থানে পশ্চিম দেশীয় এক শ্রেণীর লোকে ছোট নৌকাযোগে বড়শির সাহায্যে মাছ ধরিয়া থাকে। তাহারা একস্থানে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া তৎসংলগ্ন মোটা দড়ি প্রায় একমাইল দূরবর্ত্তী অপর খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া দেয় এবং সেই দড়ি হইতে অসংখ্য বড়শি ৩।৪ হাত লম্বা দড়ির সাহায্যে মোটা দড়ির ১৫।২০ হাত ব্যবধানে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেয়। এই সব বড়শিতে এঁটেল মাটি, (পচা গোবর) পচা খৈল প্রভৃতি একত্রে মাখিয়া বড়শিতে গাঁথিয়া টোপরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়েকঘণ্টা পর পর ছোট নৌকাযোগে বড় দড়ি অনুসরণ করিয়া বড়শিগুলি তুলিয়া দেখা হয়। টোপ না থাকিলে নূতন টোপ লাগাইয়া দেওয়া ও কোনও বড়শিতে মাছ গাঁথিলে তাহা খুলিয়া নৌকায় রাখা হয়। রিঠা, আড়, বোয়াল, পাঙাস প্রভৃতি মাছ এইভাবে ধরা হইয়া থাকে।

এতক্ষণ নির্জীব টোপ সাহায্যে বড়শিতে মাছ ধরার কথা বলা হইল। সজীব টোপ সাহায্যে বড়শিতে মাছ ধরার বিষয় বলা যাইতেছে। বড় নদী সংলগ্ন কোল, ডামস, খাল বা বড় বিলে যখন প্লাবনের জল প্রবেশ করে তখন শক্ত বাঁশের ডগায় শক্ত দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্তে মোটা বড়শিতে ব্যাং, টাকিমাছ, টাংরা বা অন্য ছোট জীবিত মাছ গাঁথিয়া ছিপটি এমন ভাবে জলের কিনারে বা হাঁটু জলে পুঁতিয়া রাখা হয় যাহাতে ছিপের অপর প্রান্তের দড়ি সংলগ্ন বড়শিবিদ্ধ মাছটি অপেক্ষাকৃত গভীর জলে ঠিক জল ছুঁয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে ছল্ ছল্ করিয়া নড়িতে থাকে। বোয়াল, আড় প্রভৃতি বড় মাছ শিকার ধরিতে আসিয়া যেই হাবল দেয় অমনি উহা বড়শিতে আটকাইয়া যায় এবং তীরস্থ বড়শির মালিক আসিয়া ঐ মাছ তাড়াতাড়ি খুলিয়া লয়। স্রোতস্বতী নদীর তীরে প্রখর স্রোতের মুখে অনেক সময় ঐরূপভাবে জীবিত মৎস্য সংযুক্ত বড়শি স্থাপন করিয়া নিকটে পাড়ের উপরে জুতি হাতে করিয়া লোক বসিয়া থাকে। ঐ মাছের লোভে কোন বৃহৎ মৎস্য বড়শির মাছ ধর ধর করিতেছে দেখিলেই জুতি নিক্ষেপ করিয়া ঐ বৃহৎ মৎস্য ধরা হইয়া থাকে। এইরূপ বড়শিকে মধ্য বাংলায় স্থান বিশেষে 'জিয়ালা' দিয়া মাছ ধরা বলা হইয়া থাকে। 'পুঁটি মাছ দিয়া রুই মাছ ধরা'—নামে যে প্রবাদটি প্রচলিত আছে তাহা এই জিয়ালা দিয়া বা জীবিত ছোট মাছের সাহায্যে বড় মাছ ধরা ব্যাপার হইতেই আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, পুঁটি মাছ অতিশয় ক্ষীণজীবী বলিয়া উহা কখনও জিয়ালারূপে ব্যবহৃত হয় না।

উদ্ভিজ্জ টোপের সাহায্যে বিনা বড়শি ও সুতায় মাছ ধরার খবর বোধ করি অনেকেই জানেন না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই ব্যাপারটি বিবৃত করিতেছি। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে শরৎ ও হেমন্তকালে হাটে এক রকমের শেওলা কিনিতে পাওয়া যায়—শুকনো লম্বা লতার স্থানে স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ সূক্ষ্ম সুতার গোছের মত কালো কালো শেওলা। বিল বা ঠিক ডোবার ডাঙ্গায় তীরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া একটি হাঁড়ি জলের দিকে ঈষৎ কাৎ করিয়া বসান হয়; হাঁড়ীর মধ্যে জল না ঢুকিতে পারে তজ্জন্য হাঁড়ীর মুখ ও জলের ধারে কাদার ছোট বাঁধ দেওয়া হয়। সেই বাঁধের নিকট হইতে জলের মধ্যে পাঁচ ছয় হাত বা তার বেশী দূর পর্য্যন্ত পাটকাঠি আড়াআড়িভাবে অঙ্কের গুণ চিহ্নের মত বসান হয়। দুই দুটি পাটকাঠি গায়ে গায়ে এমনভাবে জলের উপরে থাকে যে তাহার উপর দিয়া লম্বালম্বিভাবে ঐ শেওলা বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং শেওলার অগ্রভাগ জল ছোঁয়া ছোঁয়া হইয়া থাকে। ঐ শেওলার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া—টাকি প্রভৃতি মাছ ক্রমশঃ তীরের দিকে অগ্রসর হয় এবং শেওলার শেষপ্রান্তে অর্থাৎ হাঁড়ির মুখের বাঁধের নিকট আসিয়া লাফ দিয়া হাঁড়ির মধ্যে পড়িতে থাকে। সকালে গিয়া হাঁড়ি ভর্ত্তি মাছ ও শেওলার গোছাটি বাড়ি আনা হয়। গ্রামের লোকেরা ইহাকে 'হাঁড়া পেতে' মাছ ধরা বলে। একটি শেওলা অনেকদিন এইরূপে ব্যবহার করা চলে। বিনা জালে মাছধরার অবশিষ্ট প্রচলিত প্রণালী এবং বিভিন্ন জালের বিষয় পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নাঃ—রঞ্জু সত্যিই আর ওদের দলে নয়। ওরা সত্যই বদ ছেলে, খারাপ ছেলে।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে মনসাতলায় মার্বেল খেলা চলছে। শব্দ উঠছে ঠকাস্ ঠকাস্। তেম্‌নি উল্লসিত চীৎকার কানে আসে : উড্ডু কিপ্, হাত ইস্টেট—অল্—ফিপ্ টিন—টুয়েন্টি—

ভোনা ডাকে, রঞ্জু—রঞ্জু—উ—উ—

মন ছল ছল করে ওঠে—প্রতিজ্ঞা বুঝি আর টেঁকে না। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লে নেয় রঞ্জু। তারপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসে বাড়ির ভেতরে, খিড়কি দুয়োর পেরিয়ে এসে বসে নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। নিজের নিঃসঙ্গতাটাকে কেমন ভালো লাগতে সুরু করেছে আজকাল। বাতাবী গাছের ছায়ায় বসে হলদে পাখির ডাক শোনে, নিজের মনে ব্যাঙের ছাতাগুলোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে, একটুকরো বাঁকারি কুড়িয়ে নিয়ে ওগুলোর তলায় খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজে দেখে রাজছত্রের নীচে সত্যি সত্যিই কোনো ব্যাঙ্ ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে কিনা।

তারপর আস্তে আস্তে এই নিঃসঙ্গতার ভেতর দিয়ে নিজের একটা নতুন রূপ আবিষ্কার করল রঞ্জু। দুপুরের রৌদ্রে আমবাগানের আড্ডাটা তাকে ডাকল না, ওই রৌদ্রটাই তাকে ডাক দিলে। ঝরাং ঝরাং শব্দ করে যেদিকে কাটিহারের গাড়িগুলো চলে যায়, সন্ধ্যেবেলায় গাঁয়ের লোক শহরের কাজকর্ম শেষ করে জুতো হাতে করে যেদিকে জঙ্গলে ঘেরা মেঠো পথটা দিয়ে অদৃশ্য হয়, আশ্চর্য স্বরে ডাক দিয়ে যেদিকে হল্‌দে পাখি উড়ে যায়—শহর ছাড়িয়ে সেই বুনো বিশৃঙ্খল অজানা রাস্তাটা রঞ্জুর নাড়ীতে নাড়ীতে একটা দুর্বার আকর্ষণ জাগিয়ে তুলল।

রঞ্জু শুনেছে, ওই পথের শেষে, অনেক দূরে আছে কাঞ্চন নদী। বৃষ্টি ধোয়া ভিজে আকাশের মতো ছলছলে নীল তার জলের রঙ, তার পাঁচ হাত নীচে নুড়িগুলোকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তার দুধারে অনেক দূর অবধি সাদা বালি ঝক ঝক করছে, সেই মিহি মখমলের মতো নরম বালির ওপরে বক আর কাদা খোঁচার পায়ের ছাপে যেন আল্‌পনা আঁকা। অজস্র বঁইচির বন সেখানে যেন ফলে ফলে একেবারে ভেঙে পড়তে চায়। তার ওপর দিয়ে রেলের মস্ত বড় পুল—কেউ বলে এক মাইল, কেউ বলে আধ মাইল লম্বা।

ছোট নদী কাঞ্চন—নামটির মতোই মিষ্টি। তবু ওই নদীটাকে কেন্দ্র করে একটা অদ্ভুত ভয়ের সংস্কার আছে লোকের মনে। তার আশেপাশে বহুদূর জুড়ে একটা নির্জনতা থম থম করে। লোকে বলে কালী বাস করেন নদীর জলে। লোহার পুলটার ঠিক মাঝখানে—যেখানে বড় বড় থামগুলোকে পাক খেয়ে খেয়ে তীব্র বেগে পাহাড়ী নদীর জল গর্জন জাগিয়ে চলে যাচ্ছে, ওখানে নদীর মস্ত একটা দহ আছে। আর সময়ে অসময়ে সেই দহ থেকে নাকি বিশালকায় একখানা কালীমূর্তি ভেসে ওঠে জলের ওপরে। লক লক করছে তার রক্তাক্ত দীর্ঘ জিহ্বা, তার হাতের খড়্গ থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অমন শান্ত নিস্তেজ নদী তাই প্রতি বছর দুটি একটি করে নরবলি নেয় দেবীর তৃপ্তির জন্যে, অতি সতর্ক সাঁতারুও কেমন করে যে নদীর জলে ডুবে মরে এ একটা আশ্চর্য রহস্য।

লোকে আরো বলে, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস পুরোণো—যখন এদিকে প্রথম রেলের লাইন হয় সেই তখনকার কাহিনী। তখন কাঞ্চন নদী এমন করে মরে যায়নি। তার স্রোত ছিল প্রচণ্ড, তার গর্জন ছিল ভয়ঙ্কর। হাজার হাজার মণ পাথর ঢেলেও

কোম্পানি নদীকে কাবু করতে পারল না। স্রোতের মুখে কুটো পড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই রাশি রাশি পাথর কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল তার আর ঠিক ঠিকানাই নেই।

তখনকার দিনে ইংরেজ এমন ম্লেচ্ছ ছিলনা, তাদের দেব-দ্বিজে ভক্তি ছিল বলে শোনা যায়। তাই সাহেব এঞ্জিনিয়ার স্বপ্ন দেখলেন, রাত্রির কালো জলের ওপর অতিকায় একটা কালীমূর্তি শোভা পাচ্ছে। সে মূর্তি সাহেবকে ডাক দিয়ে বললে, আমার পুজো দাও, তাহলে পুল বাঁধতে পারবে। সাহেব প্রণাম করে বললে, আচ্ছা মা তাই হবে, তোমার পুজো দেব।

পুজোর আয়োজন হল। পুরুত এলেন, পাটা বলি হল। কিন্তু অমন জাগ্রত দেবতা, তিনি মেটে আর মেঠো-কালীর মতো শুধু পাটার মুড়ো চিবিয়েই খুশি থাকলেন না। নিজের প্রাপ্যটা নিজের হাতেই তিনি যথাসময়ে আদায় করে নিলেন।

ঘটনাটা ঘটল এরই দিনকয়েক পরে। জলের ভেতরে কুলিরা মস্ত বড় একটা লোহার ফাঁপা চোঙ্ বসাচ্ছিল, ওই চোঙ্‌টার ভেতর দিয়ে তারা পিলারের গাঁথ্‌নি তুলবে। সব ঠিক আছে, দিব্যি সাফসুফ কাজ চলছে—এমন সময় কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল, অতবড় চোঙটা দেখতে দেখতে ঠিক দুমিনিটের মধ্যে যেন চোরাবালির টানে নিশ্চিহ্ন হয়ে অতলে মিলিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে পনেরো ষোলোজন কুলিরও কেউ সন্ধান পেলনা। সার্থক হল রক্তলোলুপা দেবীর পুজো।

তার পরে বিনা বাধায় পুল গড়ে উঠল। মস্ত বড় লোহার পুল। কেউ বলে আধমাইল, কেউ বলে তার বেশি, আবার কেউ বলে পুরো এক মাইলের কম নয়। ঝম ঝম করে ওর ওপর দিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায়, যাত্রীরা নিশ্চিন্তে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে, কেউ ঘুমোয়, কেউ তাস-পাশা খেলে। এ পুলের ইতিহাস তারা জানেনা।

কিন্তু সেই যে শুরু—সেই থেকেই ধারাটা চলে আসছে। প্রতি বছর কালী তাঁর নিয়মিত বলি আদায় করে নেন। দলবল না থাকলে লোকে নদীতে স্নান করতে নামেনা, একা একা দুপুরে সন্ধ্যায় নদীর কাছে যেতে তারা ভয় পায়। নির্জন বালির চর আর বৈচিবন নিয়ে রহস্যময়ী কাঞ্চন কলচঞ্চলা ধারায় বয়ে যায়।

ছেলেবেলায় আত্রাইকে দেখেছে রঞ্জু, দেখেছে তিরিশ সালে ক্ষ্যাপা নদীর সেই বানের দৃশ্য। তার রক্তের ভেতরে আমের জামের ছায়ায় ঘেরা সেই নদীর সুর আছে, সেই জলের গান বাজে উল্লসিত ছন্দে। রঞ্জু জলকে ভালোবাসে, নদীকে ভালোবাসে। তাই ভয়ের জাল দিয়ে ঘেরা এই বিচিত্রস্রোতা কাঞ্চনও তাকে ডাক দিলে।

একদিন দুপুরে যখন আবার তেমনি করে ডাক দিয়ে একটা হলদে পাখি পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল, তখন রঞ্জু আর থাকতে পারলনা। অবিনাশবাবুর সেই নিশির ডাকের মতো কেমন বিহ্বল হয়ে গেল সে—ছায়ায় ঘেরা বাতাবী লেবু গাছের নীচেকার আসনটি ছেড়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

ধুলোয় ভরা পথটা দিয়ে খানিকটা যখন এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল খাঁদুর ডাক।

—রঞ্জু, এই রঞ্জু ?

রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো।

—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?

রঞ্জু আর জবাব দিলেনা, নীরবে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ঠাট্টা করে উঠল খাঁদু: ইস্, বড্ড ভালো ছেলে হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে আর কথাই কইবেন না!

রঞ্জু চলতে লাগল। এ ধরণের পথ তার অচেনা নয়, এর সঙ্গে তার শৈশবের নাজীপুর একাকার হয়ে গেছে। এ শহর মুকুন্দপুর নয়, এখানে দোতলা-তেতলা বাড়ি নেই, এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, এখানে পথের পাশে পাশে সরকারী আলো জ্বলেনা। এখানে বন-জঙ্গল, আমের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি। রঞ্জুর মনে হারানো দিনগুলোর নেশা লাগল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া মাটির ছোঁয়া লেগে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার।

রেল লাইন পাশে রেখে রঞ্জু চলল। বেশ লাগে অজানা পথ দিয়ে চলতে, অদ্ভুত মোহ জাগে একটা। মনের ভেতরে হারিয়ে যাওয়ার কেমন একটা নেশা আছে লুকিয়ে। যা চেনা সে তো চিরদিনই চেনা। তার

ভেতরে বিস্ময় নেই, তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে দেখে তুমি বলতে পারো এ আমার—এ একান্তই আমার। এই শহর, এই বাড়ি ঘর, ওই ল্যাম্পপোষ্টগুলো, আমের বাগান, ভুপাল রায়ের প্রকাণ্ড পোড়ো বাড়ির পেছনে মজা পুকুর আর আদ্যিকালের সেই অতিকায় জাম গাছটা—এদের ওপরে নিজস্ব কোনো দাবী নেই রঞ্জুর। এ ভোনার, এ খাঁদুর—এ আর সকলের। কিন্তু এই পথটা—যা সহরের সীমা ছাড়িয়ে জংলা বাগান, বিলাতী পাকুড়ের বন আর উঁচু নীচু অসমতলের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেছে, এ পথে আফ্রিকার দুর্গমের ভেতর দিয়ে অভিযানের মতো বিচিত্র আস্বাদন আছে একটা। হয়তো কোনো নতুন ফুল চোখে পড়বে, যা পৃথিবীর আর কেউ কোনোদিন দেখেনি; কোনো নতুন পাখি—যে পাখি দূর মেঘলোকের ওপারে মেঘমালার পুরীর রূপোর দাঁড় থেকে সোনার শেকল কেটে বেরিয়ে এসেছে। এখানে যা দেখবে সব একান্তভাবে তোমার—যা পাবে সব তোমার নিজস্ব। এ পথচলা নয়, এ আবিষ্কার।

চলতে চলতে—বাঃ, এই কি কাঞ্চন! এই কি সেই ভয়ে থম্ থম্ করা আশ্চর্য নদী!

কিন্তু রঞ্জুর ভয় করল না, ছম ছম করে উঠল না শরীর। রঞ্জু আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুপুরের রোদে অনেকটা জুড়ে ধবধবে মিহি বালি রূপোর মতো ঝিকমিক করছে, তার ওপরে দেখা যায় এক ফালি নীল জল। এত শান্ত, এত মৃদু যে স্রোত বইছে কিনা সন্দেহ। একটু দূরে রেলের পুলটা টানা রয়েছে, তার বারো আনিই শুকনো ডাঙা বালির ওপর দিয়ে! সব স্বাভাবিক, সব সহজ। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে, দুটি চারটি করে বালি উড়ছে, ছোট-খাটো দু একটা বালির ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে। ডেকে ডেকে জলের ওপরে ঘুরছে মাছরাঙা। এ নদী ভয় জানায় না, নেশা ধরায়।

গরম বালির ওপর দিয়ে জলের দিকে চলল রঞ্জু। পায়ের নীচে যেন ফোশ্‌কা পড়ে যাচ্ছে এম্‌নি মনে হয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগছে না। এগিয়ে এসে জলের কাছে বসল। বসল ভিজে ভিজে নরম বালির ওপরে, জলের ভেতরে পা ডুবিয়ে। পায়ের ওপর দিয়ে তির্ তির্ করে স্রোত বয়ে যেতে লাগল, শির শির করতে লাগল শরীর। কী চমৎকার ঠাণ্ডা জলটা! বসে বসে রঞ্জু দেখতে লাগল কেমন করে এক একটা ছোটো ছোটো রূপোলি মাছ জলের ওপরে অকারণ আনন্দে ঝিলিক দিয়ে উঠছে, আর কেমন করে মাছরাঙারা মাথা নীচু করে তাদের ওপরে তীরের মতো পড়ছে ছোঁ দিয়ে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমক লাগল একটা। পেছন থেকে মৃদু গলায় কে ডেকেছে, রঞ্জু!

রঞ্জুর মুখ দিয়ে ভয়-বিহ্বল একটা স্বর বেরুল আপনা থেকেই: মা কালী! কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে তার সাহস হল না—ভয়ে হাত পা পাথর হয়ে আসতে চাইছে।

যে পেছন থেকে ডেকেছিল সে এবার মিষ্টি গলায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

—মা কালী কি রে! এখানে বসে তুই কালী-সাধনা করছিস নাকি?

স্বরটা চেনা। লজ্জিত হয়ে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল তাদের পাড়ারই একটা ছেলে। পরিমল।

—পরিমল—তুই!

—হ্যাঁ আমি। ভয় নেই—ভূত নই।

—তুই এখানে কেন?

—সে কথা পরে হবে। কিন্তু তার আগে তোকেই ওই কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।

—আমি—রঞ্জু ঢোঁক গিলল একবার: আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

পরিমল আবার হেসে উঠল। তার পর রঞ্জুর পাশেই বালির ওপরে বসে পড়ে বললে, তাই বলে এই দুপুর রোদে! বেড়াবার আর সময় পেলি না নাকি।

রঞ্জু জবাব দিলে না।

তরল গলায় পরিমল বলে চলল, এখানে ভয় আছে, তুই জানিস?

—জানি।

—তবু আসতে ভয় করল না?

—না।

—না কেন?

—এখানে তো ভূত নেই, মা কালী আছে। দেবতাকে কেন ভয় করব?

পরিমল আরো জোরে হেসে উঠল। স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি—এত সহজে ছেলেটা এমন করে হাসতে পারে—আশ্চর্য! বললে, সব গাঁজা, ও-সব বিশ্বাস করিস কেন?

—বাঃ, দেবতা বিশ্বাস করব না?

—কচু! দেবতা থাকলে তো?

—কী যা তা বলছ সব। এই নদীতে মা কালী আছেন।

—তোর মুণ্ডু আছেন!—পরিমল একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলে: আমি তো সময়ে অসময়ে প্রায়ই আসি এখানে। কোনোদিন কোনো কালী-ফালীর টিকির ডগাটিও দেখতে পাইনি। কালী যদি কোথাও থাকে তবে মন্দিরে আছে, এখানে নদীতে ডুবে মরতে আসবে কোন্ দুঃখে?

কী ভয়ঙ্কর কথা! এমন কথা মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে আছে নাকি! অবাক বিস্ময়ে রঞ্জু তাকিয়ে রইল পরিমলের দিকে! পরিমল হাসছে, কিন্তু জোরে নয়। মুচ্‌কি মুচ্‌কি দুষ্টুমির হাসি।

—তুই তো সাংঘাতিক ছেলে পরিমল।

—সেই জন্যেই তো তোদের ভোনা অ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে আমার বনি-বনা হয় না।

কথাটা ঠিক। মনশাতলার ছেলে হয়েও পাড়ার কারো সঙ্গে খুব সম্প্রীতি নেই পরিমলের। মাঝে মাঝে আগে মার্বেল খেলতে আসত, কিন্তু এত খারাপ খেলত যে পাঁচ মিনিট পরে ভোনা তার সব মার্বেলগুলো পকেটস্থ করে ফেলত। সেজন্যে কোনোদিন ক্ষোভ করেনি, মুখ কালো করেনি একটুও। তা ছাড়া পাড়ার দলবলের সঙ্গে মেশামেশি তার একেবারেই নেই। তার বাবা শহরের বড় উকিল। মস্ত বাড়ী তাদের। সে বাগানে হরিণ আছে, ময়ূর চরে। বিকেলে দেখা যায় পরিমল আর তার বোন সেই বাগানে হরিণের পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

ভোনা মুখ ভেংচে তার অভ্যস্ত রীতিতে বলেছে, ওরা বড়লোক, অহঙ্কারে একেবারে চারখানা হয়ে ফেটে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে ওরা মিশবে কেন?

রঞ্জুরও তাই ধারণা ছিল। সত্যিই কোথায় যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে পরিমলের, আছে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমা রেখা—যে রেখা ওরা যেন অতিক্রম করতে পারে না। বয়সের তুলনায় পরিমল একটু বেশি লম্বা—সুন্দর সুগঠিত শরীর, ভোনার একেবারে বিপরীত। টকটকে ফর্সা রঙ, আর রঙটা অত ফর্সা বলেই মাথার চুলগুলো কেমন লালচে, চোখের তারা দুটোয় কপিল বর্ণ। কথা বলার চাইতে হাসে বেশি, আর যখন হাসেনা তখনও চোখ দুটো যেন হাসিতে জ্বল জ্বল করতে থাকে তার। সে বড়লোক—এই অপরাধে ভোনা অবশ্য সুযোগ পেলেই তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু পরিমল ভ্রূক্ষেপ করে না—যেন এই সব তুচ্ছতাকে অবহেলা করবার মতো সহজাত কবচ-কুণ্ডল নিয়েই সে জন্মেছে। তাই পরিমল পাড়ার ছেলে হয়েও পাড়ার সকলের থেকে আলাদা।

এই সময়টুকুর ভেতরে এক সঙ্গে এতগুলো কথা ভেবে নিলে রঞ্জু।

—কিন্তু তুই এখন এখানে কেন পরিমল?

পরিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, সে কথা আজ বলব না।

—কেন?

—সময় হয়নি।

—কিসের সময়?

—সব কথা বলবার।

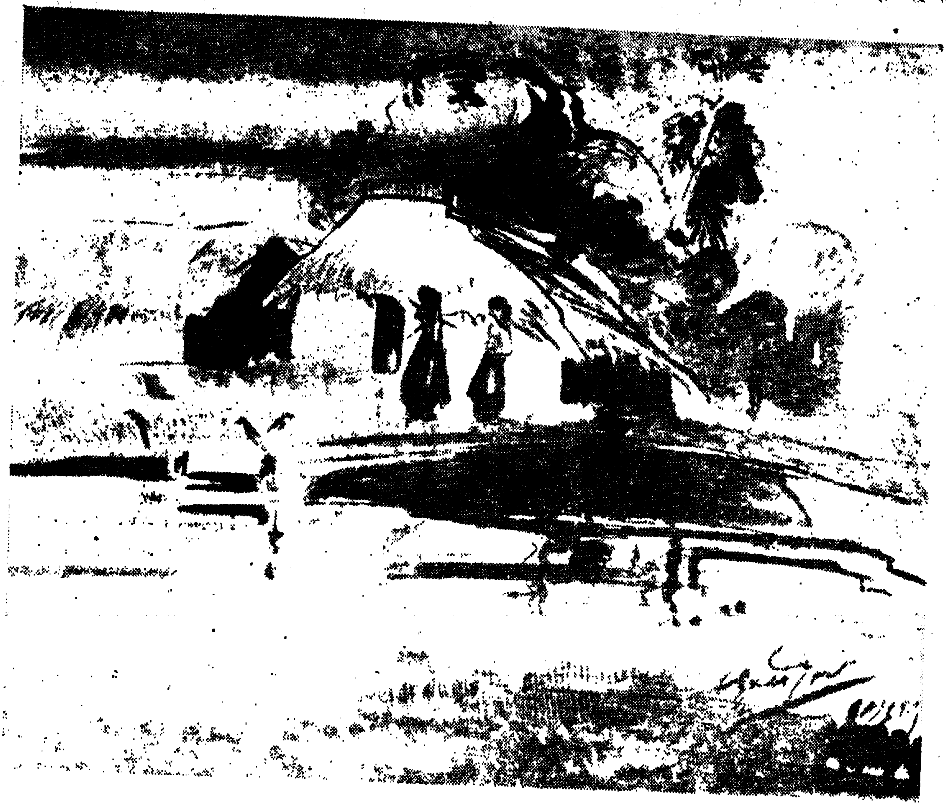
—কী এমন কথা?—রঞ্জুর যেমন বিস্ময় তেম্‌নি কৌতূহল বোধ হল।

পরিমল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেল। বললে, আর এখানে বসে রোদে চাঁদি পুড়িয়ে লাভ নেই রঞ্জু। বাড়ির দিকে যাবি তো চল।

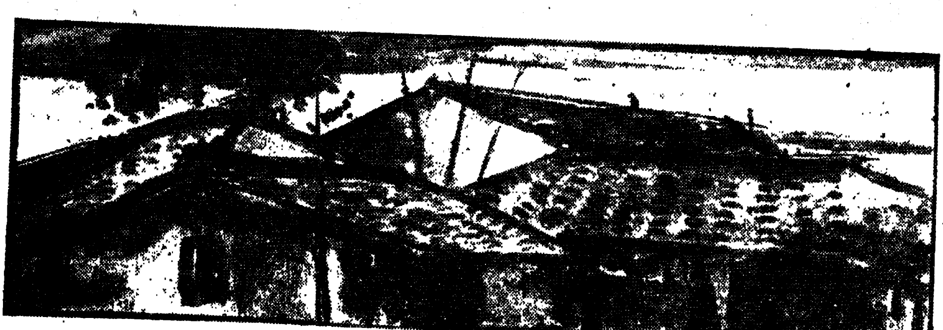
নীরবে রঞ্জুও উঠে দাঁড়ালো। পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে নতুন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল না। শুধু তখন যেন মনে হল, পরিমল এমন একটা জগতে বাস করছে যা তার পরিচিত পরিবেশের চাইতে বহুদূরে—যে জগতের দরজা আজও তার কাছে অবরুদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাহিরে শিল্পকলা প্রচারের জন্য দায়ী অল্প কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙ্গালী শিল্পীর মধ্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় একজন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া মাদ্রাজে যান শিল্পশিক্ষা করিতে। ছাত্রাবস্থায় বহু বাধা



"পল্লীদৃশ্য"



"বস্তী"

বিপত্তি এবং অত্যন্ত আর্থিক অনাটন সত্ত্বেও তিনি সসম্মানে আর্টস্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আজ সুশীলকুমারের শিল্প আমাদের দেশের শিল্পী এবং শিল্পরসিক সমাজে সুপরিচিত। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও ইঁহার শিল্প সৃষ্টি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে।



"বোহেমিয়ান্স্"—(শিল্পীবন্ধু ল্যাম্বার্টের ষ্টুডিও)



'গ্রাম'

গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সরকার, প্যারিস সহরে ইউনেস্কো (U. N. E. S. C. O) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য সমসাময়িক বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত পঞ্চাশটি চিত্র সংগ্রহ করেন। সুশীলকুমারের একখানি চিত্র এই বিশিষ্ট সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি এই চিত্র সংগ্রহ লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিশুশিল্পের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মন তৈয়ারী করিতে শিল্প শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সুশীলবাবু কার্য্যকরী পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ সম্প্রতি মাদ্রাজ শিক্ষা বিভাগ সে bifurcated course in art সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে তাহার অধিকাংশ গৌরব সুশীলকুমার দাবী করিতে পারেন। এই ব্যাপারে মাদ্রাজ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ প্রাদেশিকতার ঝাপসা পরিপ্রেক্ষণে কর্ম্মকুশলতার অন্ধবিচার না করিয়া বাঙ্গালী শিল্পী সুশীল-কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতামত এবং সাহায্য গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাসে নানা-রূপ বাধা বিপত্তি এবং বিরুদ্ধ ভাব ও মতের মধ্যে থাকিয়াও সুশীলবাবু মাদ্রাজের শিল্পী, শিল্পরসিক—শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছেন, তাহা ইঁহার কর্ম্মকুশলতা ও নির্ভীক চরিত্রের পরিচায়ক।

পার্থিব সাফল্য এবং লোকখ্যাতি বহু উদীয়মান শিল্পীর কর্ম্মজীবনে অন্তরায় ঘটাইয়াছে। সুশীলকুমার এবিষয়ে সচেতন। তাঁহার মতে "জন সমাজে পরিচিত হওয়া একটা বিরাট কিছু নয়। সত্যকার শিল্পী শুধু বিজ্ঞাপন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার অবিমিশ্র আনন্দ



শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

—বিশেষ সাফল্য হ'ল সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে। মনের মতকাজই যদি করতে না পারলাম, ত হাজার লোকের সস্তা বাহবায় কি মন ভরে ?"

এই সঙ্গে আমরা সুশীলবাবুর যে সকল কালোসাদায় অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রকাশ করিলাম তাহা তাঁহার একেবারে আধুনিক কাজ না হইলেও—বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠতায় পরিপূর্ণ।



"আলো ছায়া"

সেনবংশের প্রাচীন রাজধানী

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী এম-এ

বাংলার ইতিহাসে সেন নৃপতিগণের রাজ্যকাল একটী গৌরবময় অধ্যায়। পাল-রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেন প্রভুত্ব বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয় সেন সেন-বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা কর্ণাট দেশ হইতে বাংলাদেশে আগমন করিয়া রাঢ় অঞ্চলে বসতি করেন এবং পাল রাজগণের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হন।

রাঢ় দেশে ইঁহাদের রাজধানী কোথায় ছিল? সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিতে পালভূপতিগণের সামন্ত স্বরূপে নিদ্রাবলের অধিপতি বিজয় রাজের নামোল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকই মনে করেন যে, নিদ্রাবলপতি বিজয়রাজ ও বিজয় সেন অভিন্ন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপির ১৯ সংখ্যক শ্লোকও এই মতের সমর্থন করে।

এক্ষণে বিবেচ্য নিদ্রাবল রাঢ় দেশের কোন অংশে অবস্থিত ছিল।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে কাটোয়ার সন্নিকটে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সীতাহাটী-নৈহাটী গ্রামে যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেনের রাজত্বের একাদশবর্ষে বিজয়পত্নী ও বল্লালজননী শূরবংশোদ্ভবা রাজ্ঞী বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্ব-মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী বালহিট্ট গ্রাম শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করেন। বালহিট্ট গ্রামের বর্ত্তমান নাম বালুটিয়া; ইহা সীতাহাটী হইতে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, রাজমাতা বিলাসদেবী সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াই উক্ত দানকার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে যে তিনি নিদ্রাবল হইতেই স্নান করিতে আসিয়াছিলেন—কেন না রাঢ় দেশের অনেক স্থানের লোকই গঙ্গাস্নান করিতে আজিও সীতাহাটী আসিয়া থাকেন। এই অনুমান হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নিদ্রাবল এমন কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল যেখান হইতে গঙ্গাস্নান করিতে হইলে সীতাহাটী আসিতে হইত। আরও উক্ত নিদ্রাবল যখন রাঢ় দেশের অন্তঃপাতী তখন উহা সীতাহাটীর পশ্চিমেই হইবে এবং সীতাহাটী হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী না হওয়ারই সম্ভাবনা; কেননা তখনকার দিনে রাজধানী সাধারণতঃ নদীতীর হইতে অধিকদূরে স্থাপিত হইত না—হইলে ব্যবসাবাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা হইত।

সীতাহাটী হইতে সাত-আট মাইল পশ্চিমদিকে নিরোল বা নিড়োল নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি সমৃদ্ধ ও তদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে আহম্মদপুর কাটোয়া রেল পথের একটী ষ্টেশনও আছে। অনুমান হয় নিড়োলই প্রাচীন নিদ্রাবল। নিদ্রাবল হইতে হইয়াছে নিদ্‌বল—তাহা হইতে নিদোল এবং তাহা হইতে নিড়োল।

আমি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহোদয়কে এ বিষয় জানাইয়াছিলাম—তিনি তদুত্তরে আমায় লিখিয়াছেন যে, "নিদ্রাবল" অতি স্বাভাবিক ভাবেই "নিড়োল"-এ পরিণত হইতে পারে।

নিড়োল ব্যতীত এতদঞ্চলভুক্ত আরও কয়েকটী স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যে নৈহাটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছি ইহাতে কোনও এক নৃপতির রাজধানী ছিল তাহার কিছু ধ্বংসাবশেষ আজিও পাওয়া যায়। শ্রীজীব গোস্বামীচরণ লিখিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া নৈহাটী গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও চৈতন্য-চরিতামৃতে স্বীয় জন্মভূমি ঝামটপুরের পরিচয় প্রসঙ্গে নৈহাটীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। নৈহাটীর রাজপ্রাসাদ সেন ভূপতিগণের ছিল অথবা দনুজমর্দ্দন রাজের ছিল ইহা ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হওয়া উচিত।

ল'ড়েই লহ ইন্দ্রপ্রস্থ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

স্বর্ণ লঙ্কা বানিয়ে রাবণ চালিয়েছিল বেশ
যতদিন না হরণ ক'রে ধরলো সীতার কেশ;
'অতিদর্পে হত লঙ্কা' সাক্ষ্য রামায়ণ—
মহাভারত হাঁকছে "সামাল্! দামাল দুঃশাসন!"
যাজ্ঞসেনী মুক্ত বেণী—কোথায় গো ভীমসেন?
শ্রীভগবান্ সারথি কই? "আসবো" বলেছেন॥
জাগো দেশের জড় ভরত, ভোলো লজ্জা ভয়
'জাতিস্মর' না হয়ে, হও বিজাতীর বিস্ময়.
রাজ্য তরে খুনোখুনি এ নহে নূতন
কিন্তু এ যে মূষিক বৃত্তি—কামড়ে, পলায়ন!
তেজস্বী যে, ধর্ম্মান্ধ সে হোক্ না, নাহি ভয়
বীরের মত লড়াই করে করুক বিশ্বজয়!
কাঁদাও কেন মা বহিনকে, বাচ্ছা শিশুকেই;
শান্তি প্রিয় নিরীহ যে—ধুঁকছে এম্‌নিতেই?
সাজাও চমূ, বাজাও ভেঁপু, নাচাও সৈন্যদল,
যুযুৎসু যে মিটাও তাহার বুকের দাবানল—
ক্ষান্ত দেহ শান্তি প্রিয়ে, নারী, শিশু, বুড়ায়,—
ল'ড়েই লহ' ইন্দ্রপ্রস্থ, উজল রাখো চূড়ায়!

বিচারের ঘণ্টা

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

মুঘল সম্রাট্ জহান্‌গীর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) 'তুজুক্-ই-জহান্‌গীরী' সংজ্ঞক স্বরচিত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, সিংহাসনলাভের অব্যবহিত পরেই তিনি একটি ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল ঝুলাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। শৃঙ্খলটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং ত্রিশ গজ দীর্ঘ ছিল; উহার সহিত ষাটটি ঘণ্টা সংলগ্ন ছিল। উহার ওজন ছিল ভারতীয় মাপের চারি মণ এবং ইরাক দেশীয় মাপের বিয়াল্লিশ মণ। শৃঙ্খলের একদিক আগ্রাদুর্গের শাহীবুরুজের প্রাকারে আবদ্ধ করা হয় এবং অপরদিক যমুনাতীরবর্ত্তী একটি শিলাস্তম্ভে সংবদ্ধ থাকে। বাদশাহের উদ্দেশ্য ছিল যে, বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীরা যদি সুবিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণের মোকদ্দমা সম্পর্কে কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করে অথবা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লয়, তবে সেই প্রার্থীরা শৃঙ্খলটি আন্দোলিত করিয়া সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। ঘুলাম হুসেন রচিত 'সিয়র্-উল্-মুৎখেরিন্' হইতে জানা যায়, ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট্ মুহম্মদশাহ্ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) জহান্‌গীরের অনুকরণে অনুরূপ একটি সুবিচারের শৃঙ্খল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের সহিত একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ করা হয়। শৃঙ্খলটি অষ্টকোণ বুরুজের বহির্ভাগের নদীতীরবর্ত্তী অংশে ঝুলান হইয়াছিল। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা পাইত, তবে সে ঐ শৃঙ্খল টানিয়া ঘণ্টা বাজাইতে পারিত। ঘণ্টাধ্বনিতে বাদশাহের মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। তিনি বিচারার্থীকে ডাকাইয়া তাহার মোকদ্দমার সুমীমাংসার ব্যবস্থা করিতেন।

কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, সুবিচারের প্রসারোদ্দেশ্যে ঘণ্টাসংযুক্ত শৃঙ্খল স্থাপনের ব্যবস্থা সম্রাট্ জহান্‌গীরের স্বকপোলকল্পিত। আবার অনেকে মনে করেন যে, তিনি পারস্য বা ইরাণ দেশের জনৈক প্রাচীন নরপতির অনুকরণে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুইটি সিদ্ধান্তের কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জহান্‌গীরের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক ভারতীয় মুসলমান নরপতি কর্ত্তৃক অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি দাসবংশীয় সুল্‌তান ইল্‌তুৎমিশ (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)। সুল্‌তান মুহম্মদ-বিন্-তুঘলুকের (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ) শাসনকালে ইব্‌ন্-বতুতা নামক একজন মরোক্কো দেশীয় পর্য্যটক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে সুল্‌তান ইল্‌তুৎমিশ কর্ত্তৃক বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইল্‌তুৎমিশ প্রথমে আদেশ দেন যে, অবিচারপীড়িত ব্যক্তি রঙীণ পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রাসাদে সাধারণতঃ শ্বেতপরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইত বলিয়াই ঐরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার কার্য্যকারিতায় সুল্‌তান সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি প্রাসাদের দ্বারদেশে দুইটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত সিংহস্থাপন করেন। সিংহদ্বয়ের গলদেশে একটি লৌহশৃঙ্খল সংবদ্ধ হয় এবং উহাতে একটি বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত হয়। অবিচারপীড়িত ব্যক্তিগণ রাত্রে প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া ঐ ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র সুল্‌তান বিচারার্থীর সন্ধান লইতেন এবং তাহাকে সুবিচারে সন্তুষ্ট করিতেন।

সুবিচারের কাহিনীগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের মুসলমান রাজগণ অনেকে সুবিচার বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই। অবশ্য তাঁহাদের বিচার-ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্ম্মীদিগের প্রতি পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, সুবিচার আয়াসলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঘণ্টাস্থাপনের ব্যবস্থা আধুনিক মানদণ্ডে ত্রুটিবিমুক্ত বলিয়া বোধহয় না। কারণ প্রবলকর্ত্তৃক অত্যাচারপীড়িত দুর্ব্বলের পক্ষে বিচারের ঘণ্টা বা তৎসংলগ্ন শৃঙ্খলের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করা সর্ব্বক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল, এরূপ মনে করা কঠিন। যাহা হউক, মধ্যযুগের মানদণ্ডে বিচারের ঘণ্টা স্থাপনকে উৎকৃষ্ট বিচার ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা যায়। সুতরাং যে সকল মুসলমান নরপতি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রশংসার্হ। যদি তাঁহাদিগকে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভাবয়িতা প্রমাণ করা যায়, তবে তাঁহারা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বিচারের ঘণ্টা স্থাপন মুসলমান বিচারব্যবস্থার উপর ভারতীয় প্রভাবের ফল। প্রাচীন ভারতে এবং ভারতীয় সভ্যতায় সমৃদ্ধ প্রাচ্যদেশসমূহে যে বিচারের ঘণ্টা স্থাপন বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। সুতরাং বিচারের ঘণ্টা উদ্ভাবনের প্রশংসা প্রাচীন ভারতীয় রাজগণের প্রাপ্য।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ ন্যায়বিচারকে প্রজাপালক নরপতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলিয়াছেন, "উপস্থানগতঃ কার্য্যার্থিনামদ্বারাসঙ্গং কারয়েৎ। দুর্দ্দর্শো হি রাজা কার্য্যাকার্য্যবিপর্য্যাসম্ আসন্নৈঃ কার্যতে। তেন প্রকৃতিকোপম্ অরিপরবশং বা গচ্ছেৎ।" অর্থাৎ, "সভাসীন রাজা বিচারার্থী ব্যক্তিগণকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না। রাজদর্শন যদি প্রজাদিগের পক্ষে দুর্লভ হয় এবং রাজকার্য্যের ভার সহকারী কর্ম্মচারিবর্গের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তবে বিচারাদি কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। ফলে রাজাকে প্রজার বিরাগভাজন এবং শত্রুর বশবর্ত্তী হইতে হয়।" এই উচ্চ আদর্শ কার্য্যে পরিণত করার জন্য অনেক প্রাচীন ভারতীয় নরপতি আগ্রহপ্রদর্শন করিতেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী' সংজ্ঞক কাশ্মীরদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংকলিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কাশ্মীরপতি হর্ষ (১০৮৯-১১০১ খ্রীঃ) সম্বন্ধে লিখিত আছে—

সিংহদ্বারে মহাঘণ্টাশ্চতুর্দ্দিশমবন্ধয়ৎ।
জ্ঞাতুঃ বিজ্ঞপ্তিকামান্ স প্রাপ্তাংস্তদ্বাদ্যসংজ্ঞয়া ॥
আর্ত্তাং চ বাচমাকর্ণ্য তেষাং তৃষ্ণানিবারণম্।
প্রাবৃষেণ্যঃ পয়োবহশ্চাতকানামিবাকরোৎ ॥

অর্থাৎ, "রাজা হর্ষের প্রাসাদের সিংহদ্বারে বিশাল ঘণ্টাসমূহ লম্বিত ছিল। বিচারার্থী প্রজাগণ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা রাজদর্শন কামনা বিজ্ঞাপন করিত। বর্ষাকালীন মেঘ যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের পিপাসা নিবারণ করে, সেইরূপ প্রজাগণের আর্ত্তবাক্য শ্রবণমাত্র রাজা হর্ষও তৎক্ষণাৎ তাহাদের সন্তোষবিধান করিতেন।" কাশ্মীরপতি হর্ষ প্রজাপালকের ভারতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, 'রাজতরঙ্গিণী'র বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাঁহার সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় নরপতিকেও তাঁহারই ন্যায় বিচারের ঘণ্টাবন্ধন করিতে দেখা যায়।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলের প্রচলিত বৌদ্ধকাহিনীসমূহ সঙ্কলিত করিয়া 'মহাবংশ' নামক পালি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে এড়ার নামক জনৈক সিংহলপতির বিবরণ লিখিত আছে। এড়ার চোলদেশ অর্থাৎ আধুনিক তাঞ্জোর-ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চলের অধিবাসী এবং তামিল অর্থাৎ দ্রাবিড়জাতীয় ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৪৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন এবং আনুমানিক ১০১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ধার্ম্মিক রাজা এড়ারের শয্যার শীর্ষদেশে একটি ঘণ্টা সংবদ্ধ ছিল; ঐ ঘণ্টাসংলগ্ন একগাছি সুদীর্ঘ রজ্জু প্রাসাদের বহির্ভাগে লম্বিত ছিল। যে কেহ সুবিচারের প্রার্থী হইয়া রজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক ঘণ্টাটি বাজাইতে পারিত। রাজা এড়ারের ন্যায়বিচার এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়। একদা রাজা এড়ারের একমাত্র পুত্র রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পথে বৎসসহ একটি গাভী বিশ্রাম করিতেছিল। দৈবক্রমে রাজপুত্রের রথচক্র বৎসটির গ্রীবার উপর দিয়া চলিয়া যায়। ফলে উহার মৃত্যু ঘটে। পুত্রশোকে অধীর হইয়া গাভীটি রাজার ঘণ্টাবিলম্বিত রজ্জু আকর্ষণ করিল। রাজা এড়ার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপরাধী পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। রাজপুত্রকে রথচক্রের নীচে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। একবার এক সর্প তালবৃক্ষে উঠিয়া একটি পক্ষিশাবক ভক্ষণ করিয়াছিল। শোকাতুরা পক্ষিমাতা রজ্জু টানিয়া ঘণ্টা বাজাইল। রাজা সর্পটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার উদর হইতে শাবকটিকে বাহির করিলেন। আর একদিন এক বৃদ্ধা বিচারের ঘণ্টা বাজাইল। রাজা এড়ার বৃদ্ধার অভিযোগ শুনিয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধা কিছু তণ্ডুল রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিল; কিন্তু অকালবৃষ্টিতে অকস্মাৎ উহা ভিজিয়া যায়। রাজা স্থির করিলেন, তাঁহারই কোন পাপের ফলে অকালে বৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি উপবাসের দ্বারা পাপক্ষালন করিলেন। অতঃপর শক্রদেব সন্তুষ্ট হইয়া পর্জ্জন্যকে আদেশ দিলেন যে, রাজা এড়ারের রাজ্যে সপ্তাহে মাত্র একবার রাত্রিকালে বৃষ্টি হইবে। উল্লিখিত কাহিনীগুলি সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক না হইতে পারে; কিন্তু উহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'মহাবংশ'রচিত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে এবং সিংহলদেশে বিচারের ঘণ্টা বন্ধন অজ্ঞাত ছিল না।

দক্ষিণ দিক্স্থিত সিংহলের ন্যায় পূর্ব্বদিকের হিন্দুচীন ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেও প্রাচীনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে যেমন সুবিচারক নরপতি কর্ত্তৃক ঘণ্টা স্থাপনের কাহিনী দেখিতে পাই, হিন্দুচীনের অন্তর্গত শ্যাম ও ব্রহ্ম দেশের ইতিহাসেও তদ্রূপ উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্যামদেশের সুখোথৈ অর্থাৎ সুখোদয়বংশীয় নরপতি রামরাজ বা রাম খম্‌হেং খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একটি বিচারের ঘণ্টা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মদেশের তুংগুরাজবংশে অনক্‌পেৎলুন্ (১৬০৫-২৮ খ্রীঃ) নামক জনৈক প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তিনি মুঘল সম্রাট্ জহান্‌গীরের সমসাময়িক। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে, জহান্‌গীর কর্ত্তৃক বিচারের ঘণ্টা সংযুক্ত শৃঙ্খল স্থাপনের প্রায় ১৭ বৎসর পরে, ব্রহ্মরাজ অনক্‌পেৎলুন তদীয় রাজধানী পেগুনগরস্থিত রাজপ্রাসাদে একটি বৃহৎ ঘণ্টা বন্ধন করেন। উহার গাত্রে ব্রহ্ম ও তলৈঙ্ ভাষায় লিখিত ছিল যে, যে কোন বিচারপ্রার্থী ঐ ঘণ্টা বাজাইয়া রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে। যদিও হিন্দুচীনের রাজগণ পূর্ব্ব হইতেই বিচারের ঘণ্টা স্থাপনের প্রথা অবগত ছিলেন, তবুও জহান্‌গীরের ঘণ্টা বন্ধন বার্ত্তা ব্রহ্মরাজ অনক্‌পেৎলুনকে আংশিক ভাবেও প্ররোচিত করে নাই, একথা জোর করিয়া বলা সম্ভব নহে। কারণ এই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বয়িন্নঙের দূতগণ ফতেপুরসিক্রীর প্রাসাদে মুঘল সম্রাট্ আক্‌বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। যাহা হউক, অনক্‌পেৎলুন কর্ত্তৃক স্থাপিত বিচারের ঘণ্টাটির প্রতি অদৃষ্ট বিরূপ ছিল। অল্পকাল পরে আরাকানের অধিপতি থিরিথুদম্ম অর্থাৎ শ্রীসুধর্ম্ম (১৬২২-৩৮ খ্রীঃ) পেগু অধিকার করেন। বিচারের ঘণ্টাটি তৎকর্ত্তৃক আনীত হইয়া তদীয় রাজধানী ম্রোহঙের একটি মন্দিরে স্থাপিত হয়। কথিত আছে, প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় (১৮২৪-২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রিটিশপক্ষীয় অশ্বারোহী সেনাদলের জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী ঐ ঘণ্টাটি ম্রোহং হইতে ভারতবর্ষের আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলিগড় শহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।



হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

ডাক্তারের মুখে যুধিষ্ঠিরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কথা শুনে মাণিক স্তম্ভিত। বলবার কিছু না পেয়ে কেবল বললে—"বলেন কি? wonderful lampকেও নিবিয়ে দিলে যে!—তারপর?"

বিনোদ হেসে বললে—"এখনো তারপর? তারপর আর শুনে কাজ কি—সে আরো wonderful—এখন কম্বলখানা মেজেয় পেতে দাও—একটু গড়াই। জেলে তো আর খাট বিছানা কেউ দেবে না!"

মাণিক ভেবড়ে গেলো। শেষে বললে—সে চিন্তা করছি না Sir, ভগবানের দয়ায় যে বাসা খুঁজে বার করতে পেরেছিলুম, সে জেলের ওপর যায়। কোথাও আমাদের আর কষ্টের কারণ হবে না। যাক্—তারপর যুধিষ্ঠির কি বললে, সেইটাই বলুন।"

"বলেছি তো—সে আরো wonderful। বিপদে ভদ্রলোকে যেমন অভয় দেয়, উৎসাহ দেয়—যুধিষ্ঠির ভদ্র না হলেও, ভদ্রতা জানে, রাখেও। সে বললে—"কোন' চিন্তা রাখবেন না, ভাববেন না। আমি আছি, ওসব ঠিক্ হয়ে যাবে।—শুনলে? পাপীও রামনাম করে!"

মাণিক সোৎসাহে বললে—"তবে আপনি এতো ভাবছেন কেনো?"

তার কথা শুনে বিনোদ এবার সত্যই বিরক্ত হয়ে বললেন—"তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি? তুমি আমাকে ওই খুনে দুরাত্মাদের বিশ্বস্ত এজেণ্টের কথা বিশ্বাস করতে বলো নাকি?—যে লোক আমাকে চোর প্রমাণ করবার ভার স্বীকার করে এখানে এসে রয়েছে ও আমার পশ্চাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলের মতো টাকা ছড়াচ্ছে—আবশ্যকে নরহত্যা পর্য্যন্ত যাদের সহজসাধ্য, তোমার যুধিষ্ঠির তাদেরি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। যাদের ওই সব কার্য্যসিদ্ধির ওপর মান মর্য্যাদা, মাইনে বাড়ে—উন্নতি নির্ভর করে, তাদেরই একজন আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছে, অভয় দিয়েছে। তা জেনেশুনেও তুমি বলছো—"তবে এত ভাব্‌ছেন কেনো?" বেশ, তাহলে আমাকে মেনে নিতে হয়—নির্ভাবনায় থাকাই আমার উচিত। এই না?"

মাণিক করজোড়ে সবিনয়ে বললে—"আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তা হ'লে আমি এখনো তাই বলবো Sir—না হয় চুপ করেই থাকবো। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনি যেমন একটা অনুমানসিদ্ধ কথা শুনিয়েছেন—"ও অপয়া হার যদি কোনো বেগমের হয়—ও তা চুরি গিয়ে থাকে এবং তিনি ওটাকে তাঁর হার বলে নিজে সাক্ষ্য দেন, তার পর আর প্রমাণের প্রশ্ন থাকে কি" ইত্যাদি। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমিও বলি—"বেগম যদি বলেন"—কিছুদিন পূর্ব্বে আমার যখন কঠিন ব্রংকাইটিস হয়, আমি ডাক্তার বিনোদবাবুকেই call দিয়েছিলুম (ডেকে ছিলুম); তিনি বিশেষ যত্নে আমাকে রোগমুক্ত করেন। তখন আমার গলায় ওই হারছড়াটি থাকতো। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে—আমি খুশি হয়ে, তখনকার মতো তাঁকে সেই হার present করি—উপহার দি, ও অনেক করে' তাঁর পত্নীর ব্যবহারের জন্যে তা নিতে রাজি করি'। অমন নিঃস্বার্থ অমায়িক মানুষ আমি দেখিনি;" ইত্যাদি। তাতেও প্রমাণের প্রশ্ন আর থাকে কি? সে কথা আপনিও বোঝেন, সাহেবও বুঝবেন।—যাক্, এ সব বাজে কথা—অনুমানের বৃথা কথা আর বাড়াবেন না। মায়ের কৃপায় সব মিটে যাবে, ওসব কিছুই হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"অর্থাৎ—যুধিষ্ঠিরের অভয়বাণী স্বীকার করে' শুয়ে পড়ি!"

"ক্ষমা করবেন, আমি এখনো তাই বলব Sir—"

ডাক্তার সত্যই একটু চিন্তিত হলেন। শেষ জিজ্ঞাসা করলেন—"কারণ?"

মাণিক ইতস্ততঃ না করেই বললে—"সেটা কিন্তু এ মূর্খের মুখে শোভা পায় না। আপনার অনুমতি পেয়ে বলছি। কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমার নয়।"

"বেশ—তাই বলো—আমি উৎকর্ণ।"

মাণিক আরম্ভ করলে—"শুনেছি যারা অতি বড় পাষণ্ড নরপিশাচ, যাদের কোনো অমানুষিক কাজই আটকায় না, হত্যাকাণ্ড যাদের কাছে খেলার মতো, তারা নিজেকে বীর ভেবেই থাকে, সেই গর্ব্বই তাদের সবার বড় সম্পত্তি। প্রাণকেও তুচ্ছ করে—তা রক্ষা করে। হঠাৎ কোনো বিপন্নের ব্যথা প্রাণে আঘাত দিলে, আকস্মিক মুহূর্ত্তে সাময়িক ঝোঁকের বশে তাকে অভয় দিয়ে ফেললে জীবনপণে তা রক্ষা করে। সে যে কথা দিয়ে ফেলেছে—বীরের কাছে কথা দিয়ে ফ্যালা মানেই কথা রাখা—এই বীরজনই পোষণ করে ও পালন করে। নইলে সে কিসের বীর? ভবিষ্যতের চিন্তা তারা রাখে না—ততো হিসিবি বুদ্ধি তারা ধরে না। দিয়ে ফেলা কথা তাকে রাখতেই হয়—সোজাসুজি এই—"

—"তার পর লীলাময় আছেন, তখন তাঁর রহস্য আরম্ভ হয়। সেই ঝুটো বীরকে 'সত্য' পেয়ে বসে! বিপন্নকে শাস্তি দিতে গিয়ে বা দিয়ে, সে তখন এমন একটা শান্তি ও আনন্দ অনুভব করতে থাকে, যার সুখাস্বাদ তার ভাগ্যে পূর্ব্বে কোনোদিন ঘটেনি। সে ভাবে—এ কি! এতদিন অ্যাতো বড় বড় ভীষণ ভীষণ কাজ করেও এমন আনন্দ তো কোনো দিন সে পায়নি! এর মানে কি? একজনকে বিপদ মুক্ত করা—এই সামান্য কাজে এমন আরাম কোথা থেকে এলো!" এই ভাবে তার প্রথম পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। এই নাকি স্বাভাবিক।

—মনে হয় যুধিষ্ঠির আপনাকে বাঁচাবে, নিজেও বাঁচবে, তাই আপনাকে বার বার বলেছে—নিশ্চিন্ত থাকুন। এই আমার ধারণা Sir—যে হত্যাকারী বা মহাপাপী, মূর্খতা-বশতঃ নিজেকে বীর ভেবেছে সে নিজের প্রাণ রক্ষার্থে মিথ্যাকথা কয়ে বাঁচতে চায় না, ছোট হয় না, বীরের গুমোর বজায় রাখে। আপনি "নিশ্চিন্তই" থাকুন।

ডাক্তার মাণিকের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বললেন—"কবে কার কাছে এত শিখলে? শুনে আমি সত্যই বড় খুশী হয়েছি। গুরুটা কে?"

"আমার সবই আপনি। নিজের বেলা এত ভুলে যান কেনো, এই তো সেদিনের কথা। সিভিল সার্জ্জনের কথা শুনে এসে—"

"থাক হয়েছে। সময় মতো কত কি বলতে হয়। যাক্ তুমি তো এতক্ষণ যুধিষ্ঠিরকে বীর বানালে, কিন্তু তারা কথা দেয় কাকে? কেনো? যাকে তাকে নাকি?"

"তা কি সম্ভব হুজুর? যাকে তার ভালো লেগেছে, মনে ধরেছে। সেখানে ও প্রশ্ন থাকে না, বিচারও থাকে না। ওসব লোক যে স্বাধীনপ্রকৃতি রাখে—"

বিনোদ বললেন—"হয়েছে, এখন কম্বলটা তুলে খাটেই পাতো। তিনটে বাজলে আমাকে তুলে দিও। সাহেবের কাছে একবার Finalটা শুনে আসতে চাই, তারপর আমারও Final."

বেলা তিনটের পর মাকে স্মরণ করে ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন।—"তবে হয়ে আসি মাণিক?"

"যাবেন বইকি, ভালো খবরই পাবেন।"

"আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। ধোঁকা দিতেও অমন আর দুটি নেই।" বলে' হাসতে হাসতে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।

মাণিক আপন মনে—"এমন মানুষের এ কি দুর্ভোগ?" মাণিক চোখ মুছলে।

পথে বেরিয়ে ডাক্তারের মনেও—সেই মাণিক।—"তাকে কি এই জন্যই এনেছিলুম? তার তরে যে কত কি ভেবেছিলুম! তার পরিণাম কি এই! আমার জন্যে সে যেন না বিপন্ন হয় মা। তুমি কি তার মুখ দিয়ে, যুধিষ্ঠির সম্বন্ধে কথাগুলো আমাকে শোনালে?

পথে কে দু'জন লোক কথা কইতে কইতে ষ্টেশনের দিকে চলেছিলেন। একজন কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। অপরটি দ্রুত পা বাড়াতেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন—"ভুলনা, ওর একটি কথাও মিথ্য নয় জেনো।"

শুনে বিনোদ চমকে গেলো—ও ওকি আমাকেই শোনালে?" বিনোদ বিভ্রান্তের মতো এগুলেন।

হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে কানে এলো—এই যে, নমস্কার। কবে এলেন ডাক্তারবাবু?

"একি—কিশোরী? কেমন আছ ভাই? শুনলুম সাহেব এসে গেছেন, আমার দেরী হল' নাকি?"

"না, ঠিকই এসেছেন। সাহেব নামেমাত্র গিয়েছিলেন। প্রায় দু'হপ্তা হবে—মেমসাহেবকে নিয়ে ফিরেছেন। তাঁবে

কলকেতার হাঁসপাতালে রেখে এসেছেন। তাঁর নিদ্রা নাকি একেবারেই নেই! সাহেব সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন। ঘোরাঘুরিও তেমনি বেড়েছে, একদণ্ড স্থির নন্। চাঞ্চল্যও বেড়েছে।"

"আমাকে খুঁজেছিলেন কি?"

মেমসাহেবকে আনবার পরই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"ডাক্তারবাবু এসেছেন কি?"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে বললেন—"এতো কি কাজ পড়লো কিছু জানো?"

"তা ঠিক জানি না। ম্যাডামের অসুখই প্রধান বলে' মনে হয়। বলেন কি—বৎসরাধিক তাঁর নিদ্রা নেই, কত বড়ো চিন্তার কথা। তবে হ্যাঁ—এর মধ্যে দু'দিন আপনাদের বোর্ডের সেই চেয়ারম্যান এসেছিলেন বটে, তাঁকে নিয়েও বেরিয়েছিলেন। সাহেবকে খবর দেবো কি? দেখা করবেন তো?"

"অমনভাবে জিজ্ঞাসা করলে সে?—সেলাম দিতেই তো এসেছি।"

কিশোরী তাড়াতাড়ি বললে—"দেবেন বই কি, নিশ্চয়ই দেবেন। এসময় তাঁর প্রাইভেট কামরায় একজন আছেন কি না, প্রায়ই থাকেন—তাই। ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর তিনি যান। তাঁর যাবার সময়ও হয়েছে। আপনি এসেছেন শুনলে—"

ডাক্তার চিন্তিতভাবে—"নিত্য আসেন? কে বলো দিকি? কোনো অফিসার নাকি? কোন' সাহেব?"

কিশোরীর মুখে এতক্ষণে হাসি এলো, বললে—তাঁর কাছে আমরাই সাহেব। এমন কালো লোক দেখেনি!

জুতোর শব্দ শুনে—"সাহেব আসছেন বোধ হয়। জানেন তো আগন্তুকদের এগিয়ে দেওয়া সাহেবের অভ্যেস। আপনি থাকুন—আমি একটু সরে যাই।"

যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি অন্যমনস্ক। ডাক্তার থাকতে না পেরে দ্রুত এগিয়ে—"একি, আপনি এখানে?" বলেই তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

বললেন—"আমাকে খুঁজতে নাকি? আমি এখানে তাই বা আপনি জানলেন কি করে?"

তিনি বললেন—"আমি না জানি, ভাগ্য তো সঙ্গে রয়েছে, তার চরের অভাব নেই। জানতুম রিটায়ার করা মানে কাজকর্ম্মের শেষ, অর্থাৎ খতম্। তারপর বেশীদিন বেঁচে থাকাটাই মুখ্যুমি। পাপ বলতেও পারো। এটা আমার তারি সাজা ভোগ হে! ছেলেপুলে নেই তাই রক্ষে, নইলে তাদের কোলে করেই দিন কাটতো—"মিনসে বসে বসে খাবে কেনো" সে মধুর কাকুলি ত শুনতেও হোত—

—কিন্তু এ কি করলে বলো দিকি—তোমাদের ওই কিশোরীটি?—শান্তিপুরে থাকতে কিছুদিন আমার কাছে পড়া বলে নিতে আসতো, "Moral class book" পড়তো। তখন ওই বইখানির চলন বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই ছিল—ইংরেজদের বিষ্ণুশর্ম্মার বুলি বা হিতোপদেশ। সেই শান্তিপুরের কিশোরী কিনা এতদিন পরে তারি শোধ তুললে, এই অশান্তিকর immoral কাজ করলে। তোমাদের সাহেবের নায়েব হয়ে, আমার মাষ্টার বলে এই আখেরটি করলে। আমাকে তাঁর একটা বেয়াড়া কাজে জুটিয়ে দিলে।

—"আমি আর ও কাজ করব না, এখানেও থাকব না, বলায়—ভয় দেখিয়ে আমার হিতার্থীর মতো, লম্বা সদুপদেশ আরম্ভ করে দিলে! তার মর্ম্মটাই আমার সহজ ভাষায় তোমাকে বলি। তার সে জ্যেষ্ঠতাতামির ভাষা আমার আসবে না, তুমিও বুঝবে না। বললে—"খবরদার অমন ছেলেমানুষী করবেন না। সাহেব অতি চমৎকার লোক, কিন্তু রেজিমেণ্টের O/C, 'ওসি' বোঝেন তো! কিছুদিন চুপচাপ কাজ করুন। তারপর হঠাৎ একদিন—ময়লা কাপড়, জামার একটা হাতের আধখানা নেই—কাঁদতে কাঁদতে এসে—শ্রীমতী সম্বন্ধে তাঁর বিপন্ন অবস্থা জানালেই আপনাকে ছেড়ে দেবেন। বেশ করে শুনে রাখুন—মেয়েদের কথা কিনা—এই যেমন—Her son coming। very আসন্ন Sir—Belly badly heavy—No one to un-son her, বলে কেঁদে ফেলবেন। বাপ মার কথা sin like ত্যাগ করবেন, মুখে আনবেন না। wipএর কথাই ফি হাত থাকবে, আর ওই কান্নাটা। সেটা সুর বদলে যেন 'ভ্যাঁক, পর্য্যন্ত যায়।" সংক্ষেপে তার মর্ম্মটা এই ছিল। আমার প্রতি কিশোরীর কৃতজ্ঞতার বহরটা শুনলে? সে বিলিতি হিতোপদেশের moral ঝাড়তে বাকি রাখেনি!

তাকে বললুম—"ষ্টুপিড্ বলছিস্ কি? আমার বয়েসটা

যে Black market রেট্‌কে হাটিয়ে দিয়েছে রে পাজি। এ বয়সে না কারো বাপ মা থাকে, না পরিবার বিওয়। একি ওদের লয়েড জর্জ পেলি নাকি ?"

কথা আর বাড়লো না। সাহেব একটু আড়াল থেকেই আন্দাজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন, বেরিয়ে এলেন—"Hallo doctor কবে এলে ? খবর ভালো তো ?"

"আজ সকালে এসেছি Sir—খবরটা আপনার কাছেই শুনবো।"

সে কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন—"তুমি এঁকে চেনো নাকি ?" ডাক্তার বললেন—He is my uncle Kalachand—

My খুড়ো Sir—

সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—"You too have a খুড়ো, তোমারও খুড়ো আছে ? খুড়ো তোমাদের দেশে বড় সস্তা দেখছি—very cheap !

"Yes Sir—ওঁদের দয়াতেই তো আমরা সাবধান হয়ে চলতে শিখি। সর্ব্বদা আমাদের সতর্ক থাকতে ওঁরাই তো শিক্ষা দেন। আপনাদের বিসমার্কের চেয়ে বেশী "মার্কের" লোক।"

হো হো কোরে হেসে খুড়োর দিকে চেয়ে সাহেব বললেন—"আমার Doctor সম্বন্ধে তোমার opinion জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

খুড়ো বললেন—"By all means—in a word. He is my pride—এক কথায় ডাক্তার আমার গর্বের বস্তু—But too good, for this world, which is awfully civilized—I mean-amounts to 'good for nothing'—am therefore always afraid—He may someday invite trouble and suffer for nothing—may God help him—

অত ভালমানুষ এত চতুর জগতে চলে না, কোনদিন বিপদে পড়ে যাবে। ভগবান ওকে রক্ষা করুন।

সাহেব হেসে বললেন—আচ্ছা, এখন তোমাদের কথা সত্বর সেরে নাও। ডাক্তারকে আমি চাই। Good day বলে ভেতরে চলে গেলেন। (ক্রমশঃ)

মেদিনীপুরের তমলুক

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

বহুদিনের আকাঙ্খিত মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহর পরিদর্শনের সৌভাগ্য এবার ঘটিয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের দেয় এই সুযোগকে লাভ করিয়া নিজকে যথেষ্ট ধন্য মনে করি। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে গত মার্চ্চ মাসে মহিষাদল থানার লক্ষ্যা গ্রামে একটি জেলা হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল—সেই সম্মেলনের প্রচার কার্য্যের দায়িত্বই আমার তমলুক পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটাইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রচার কার্য্যের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমতঃ মেদিনীপুর সহরে কিছু প্রচার কার্য্য করিলাম। তারপর তমলুক সহরে আসিলাম। সহরটী রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। হাট, বাজার, দোকান-পাট সবই গ্রাম্য-ধরণে সজ্জিত। সহরটী পাঁশকুড়া রেল ষ্টেশন হইতে ১৬ মাইল দূরে—বাসে যাইতে হয়। যাওয়ার পথে বাস হইতেই বহু প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলির কোন কোনটী তিনশত বা চারিশত বৎসর পূর্ব্বের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। অধিকাংশ মন্দিরই সংস্কার করা হয় নাই—জীর্ণ। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে বাস তমলুকে পৌছিল। পূর্ব্ব হইতেই আমার তমলুকে যাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা ছিল—তাই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই উঠিলাম।

তমলুক খুবই প্রাচীন শহর। এই শহরটীই প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বলিয়া পরিচিত। সমুদ্রতটে সহরটী আধুনিক কলিকাতার ন্যায়-বন্দর ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাণিজ্য-তরণীতে তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ বহুদূর ভরিয়া থাকিত। বিভিন্ন দেশের বিচিত্র নিশান বায়ুবেগে আন্দোলিত হইয়া এক অভিনব শ্রী ধারণ করিত, এ-বর্ণনা আমরা প্রাচীন ইতিহাসে পাই। পদ্ম-পুরাণে বেহুলার উপাখ্যানে এই তাম্রলিপ্ত সহরের সহিত প্রাকৃতিক সাদৃশ্যসম্পন্ন একটি সহরের উল্লেখ আছে। উপাখ্যানে আমরা পাই—সর্পাঘাতে মৃত স্বামী লখিন্দরের শব ভেলায় রক্ষা করিয়া সতী সাধ্বী বেহুলা ভাসিয়া চলিয়াছেন দামোদরের বক্ষ বাহিয়া। ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে ভেলা একটি বন্দরে পৌছিল—সেখানে নেতী ধোপানী কাপড় কাচিতেছিল। এই বন্দরের বর্ণনার সহিত তমলুকের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য

আছে। সুতরাং এই তাম্রলিপ্তি শুধু ঐতিহাসিক যুগেও নয়, পৌরাণিক যুগেও যে অস্তিত্ব লইয়া জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যে পুষ্করিণীর ঘাটে বেহুলার তরণী লাগিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ সেই পুষ্করিণীটিও আমি দেখিয়াছি।

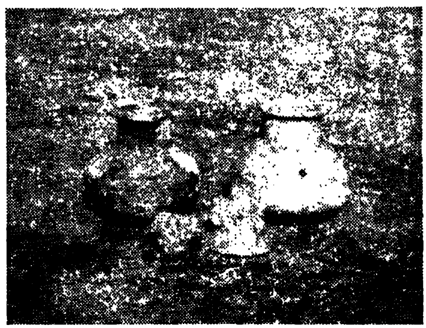
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখি—বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েণ যখন ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারত ত্যাগকালীন তাঁহার বর্ণনায় পাই যে, তিনি ৪১০ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করেন এবং এই সহরের বিদ্যা, অর্থ, সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যখন তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—তখনও তিনি এই বন্দরেই জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি এই স্থান হইতে সিংহলে



ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি—তমলুক

গমন করেন এবং তাঁহার সময় লাগিয়াছিল ১৪ দিন। তারপরও প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ চীন, শ্যাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ হইতে বহুশত বণিক, শিক্ষার্থী, ধর্ম-যাজক, তাম্রলিপ্তিতে অবতরণ করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতির বিদ্যাগার ও সঙ্ঘারামে আসিত। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং শ্রীবিজয় হইতে নাককবরম্ হইয়া আরও পনের দিনে তাম্রলিপ্তি বন্দরে পৌছিয়াছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান, বিদ্যাগার, সঙ্ঘারামগুলি পরিদর্শনের পূর্ব্বে এক বৎসর এই তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা পাই—যে তখন হইতেই সমুদ্র হটিয়া যাইতে আরম্ভ করে, ফলে তাম্রলিপ্তি সহরের অবনতি ঘটিতে থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে এই তাম্রলিপ্তির অদূরবর্ত্তী গ্রামে যে তাম্রশাসনটী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্য শাসনের অনেক কথাই পাই। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্বকালের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

বৈকালে আমি বিখ্যাত শ্রীশ্রীবর্গভীমা মাতার মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটী সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। মন্দিরের গঠন পদ্ধতি খুবই প্রাচীন। অভ্যন্তর ভাগের গঠন পদ্ধতি আরও বিচিত্র ধরণের। তমলুকে আরও একটি প্রাচীন মন্দির আছে সেটী শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দির। শ্রীশ্রী-বিষ্ণুহরির বিগ্রহ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসখা অর্জ্জুনের মূর্ত্তি সমন্বিত। প্রবাদ, যখন তমলুকের মহাপরাক্রমশালী রাজা তাম্রধ্বজ রাজত্ব করিতেন তখন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং অর্জ্জুন এই সহর জয় করেন।



কূপ হইতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র—তমলুক

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজা তাম্রধ্বজ এই মূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করান। শ্রীশ্রীবর্গভীমা ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুহরির মন্দিরের গঠনপদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের, তাহাতে মনে হয় দুইটী মন্দির সমসাময়িক।

পরদিন প্রাতে আমি তমলুকের রাজা শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া বিভিন্ন প্রকারের আলোচনায় প্রায় ২ ঘণ্টা কাটিল। রাজবাড়ীর সম্মুখে একটি বৃহদায়তনের দীঘি আছে। সেই দীঘির মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ মন্দির আছে। এক বৎসর এই দীঘিটীর জল প্রায় শুকাইয়া যায়। সেই বৎসর দীঘির সংস্কারোদ্দেশ্যে খনন কার্য্য করা হয় এবং অল্প কিছু খুঁড়িতেই একটি বৃহৎ কূপ আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন সহরের সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু স্বর্ণ মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা, মৃৎপাত্রাদি পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি সিংহল ও অন্যান্য প্রদেশের এবং এই গুলির অনেকগুলিই খৃঃ পূর্ব্ব ৪০০ শতের আমলের। এইরূপ মুদ্রা বা অন্যান্য নিদর্শনও বর্ত্তমানে গ্রামসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে অপর একটি পুষ্করিণী খনন করিবার সময় একটি প্রস্তর মূর্ত্তি

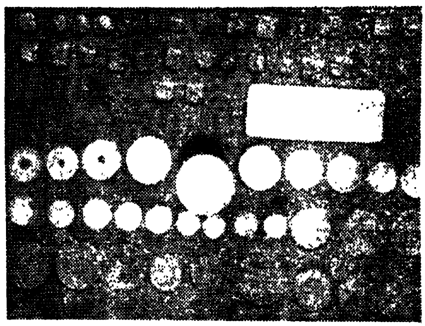
পাওয়া গিয়াছে। যে স্থলে এই সকল সুপ্রাচীন দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার দূরত্ব হিসাব করিলে মনে হয় যে সহরটী পূর্ব্বে প্রায় ৪।৫ মাইল বিস্তৃত ছিল।

বৈকালে আমি সহরের অন্যান্য প্রান্ত ও গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিলাম। সহরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। আমি মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য সহর বা জনপদসমূহ ঘুরিয়াছি কিন্তু এইরূপ ঘনবসতি আর কোথাও দেখি নাই। এই ঘনবসতিই প্রাচীন সহরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

তারপর স্থানীয় স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে স্কুলে সংরক্ষিত মুদ্রা, প্রস্তর-মূর্ত্তি, একটি স্তম্ভ, একটি ফসিল এবং আরও কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন দর্শন করাইলেন।

প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষী হিসাবে বাংলার বক্ষ হইতে যে সমস্ত নিদর্শন মিলিয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও তমলুকের ভূগর্ভ হইতে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা উপেক্ষার বস্তু নহে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার বৈদেশিক মুদ্রা তাম্রলিপ্তি বন্দরে পাওয়া যায়। আড়াই নাক্ কবরম্, সুমাত্রা, যাভা হইতে যে সমস্ত বণিক বাণিজ্য করিতে আসিত তাহাদের আনীত মুদ্রা সকলই এখন আবিষ্কৃত হইতেছে। সে যাহা হউক, এই তমলুকই যে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৭ই মার্চ্চ প্রাতে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মোদক, শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মোহন রায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে তমলুকে যাই এবং তাঁহাদের সকলকেই তমলুকের প্রাচীন দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাই; রূপ-নারায়ণ নদ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ার ফলে সহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার নদী পশ্চিমদিকে ক্রমশঃ সরিয়া আসিতেছে এবং সহরটী বর্ত্তমানে একেবারে নদীর উপকূলে। নদী যে ভাবে তাহার ধ্বংস কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে অনুমান হয় যে, ৮।১০ বৎসরের মধ্যেই তমলুক সহরের কিয়দংশ নদীর বক্ষে বিলীন হইবে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইয়া স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি কতকগুলি বহুমূল্য স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং কলিকাতার যাদুঘরে তাহা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তারপর সরকার পক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহায়তায় তমলুক সহরের নিকটবর্ত্তী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—যে স্থান হইতে প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে।



তমলুকে আবিষ্কৃত কয়েকটি মুদ্রা…মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ ৫০০ শতের বলিয়া প্রমাণিত

কিন্তু দুর্ভাগা বাংলার। তাই আজ পর্য্যন্ত তাহার খনন কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। নদী যে ভাবে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয় খনন কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সহর নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তাই যাহাতে অবিলম্বে উক্ত খননকার্য্য আরম্ভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ, ভূতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিকগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অনুরাধা—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা হইতেছে—এ বিষয়ে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ নাই। ব্রিটিশ সরকার এই জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তক। ভাগ্যে জমিদারি প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—তাই বাংলা কথাসাহিত্যের একটা প্রধান উপজীব্য পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্য্যন্ত অধিকাংশ কথা-সাহিত্যিকেরই প্রধান অবলম্বন জমিদার যুবক। যে শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের লইয়া কথাসাহিত্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহার রচনাবলীতে জমিদার নায়কের সংখ্যাই বেশি। ইহার একটা কারণ, প্রেমলীলা দেখাইতে হইলে প্রেমিক-প্রেমিকাকে অন্নবস্ত্রের সমস্যা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার প্রয়োজন। অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেখানে প্রবল, জঠরের দাবি যেখানে প্রবলতর, সেখানে হৃদয় লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলে না। আর একটি প্রয়োজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে সন্তান-সন্ততির দায় হইতে নিষ্কৃতি দান। সন্তান-সন্ততি প্রেমের প্রজাপতি জীবনের অন্তরায়।

অনুরাধা গল্পটির নায়ক বিজয় একাধারে জমিদার ও ব্যবসাদার। বিজয়কে ধনী এবং জমিদার বানাইবার সার্থকতা ছিল, নেহাৎ অন্নবস্ত্রের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এখানে বিজয়ের

সন্তানটি প্রেমলীলার অন্তরায় না হইয়া প্রেমলীলার সংঘটক হইয়াছে। অনুরাধা গল্পে ইহাতেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইয়াছে। বিলাতফেরতা উদ্ধত ধনী জমিদার যুবক গ্রামে আসিয়াছিল একটি কুমারী যুবতীকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য। সঙ্গে আনিয়াছিল নিজের মাতৃহীন শিশুপুত্রটিকে। এই মাতৃহীন শিশুই ঐ যুবতীর মধ্যে নিজের জননীর অনুকল্প লাভ করিল—সে তাহার মধ্যে নিজের মাতাকে আবিষ্কার করিল। অনুরাধা শিক্ষিতা নয়, সুরূপাও নয়, প্রেমের ছলাকলাও জানে না, প্রেম নিবেদনও করে নাই, নিজের দারিদ্র্য ও অসহায়তা লইয়া সে সরিয়া থাকিতেই চাহিয়াছিল। আর বিজয় বিলাতফেরতা নব্যযুবক, একজন সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট মহিলার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াই ছিল। তবু অনুরাধা বিজয়ের হৃদয় জয় করিল। শরৎচন্দ্র অনুরাধার প্রতি বিজয়ের প্রেম সঞ্চারের দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথম, শিশুপুত্র কুমার অনুরাধার স্নেহাতিশয্যে তাহার বশীভূত হইয়া অনুরাধার মধ্যে তাহার মৃতা জননীকে খুঁজিয়া পাইল। যে শিশু কখনও মাতৃস্নেহ পায় নাই—তাহার আকর্ষণ হইল দুর্গম। সে স্নেহের আকর্ষণে অনুরাধাকে বিজয়ের হৃদয়ের কাছে আনিয়া দিল। বিজয়ও নারীহস্তের পরিচর্য্যা বহুকাল পায় নাই, তাহার তৃষিত হৃদয় অনুরাধার আন্তরিক সেবা পরিচর্য্যা লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। শরৎচন্দ্র ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন—বিজয়কে আর রোগে শয্যাগত করিয়া অনুরাধাকে শয্যাপার্শ্বে আনিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

এই গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই—যুবক-যুবতীর প্রেমসঞ্চারের মামুলী উপকরণ এই গল্পে পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ অভিনব ভঙ্গীতে পরস্পর-বিসংবাদী বহুদূরবর্ত্তী দুইটি হৃদয়কে এই গল্পে মিলাইয়াছেন। রচনায় কলাশ্রী কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গল্পটি যেভাবে উপসংহৃত হইয়াছে তাহাও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরই উপযুক্ত। অলিখিত পরিচ্ছেদটি যে ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর কবল হইতে অনুরাধার উদ্ধার এবং সবৎসা ধেনুর মত অনুরাধাকে কুমারের সহিত গৃহে আনয়ন—তাহা যদি কেহ না বুঝিয়া থাকেন—তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া তিনি যেন বারবার বৃথা ক্ষুণ্ণ না হ'ন।

মন্দির—মন্দির গল্পটিতে বেশ একটি গীতিকবিতার সুর আছে। গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। শরৎচন্দ্র শক্তিনাথের জীবনে একটি আর্টিষ্টের মানস সঞ্চারিত করিয়াছেন। শক্তিনাথ কুমারবাড়ীতে পুতুল তৈরির কাজে সহায়তা করিয়া আনন্দ পাইত কিন্তু তাহার বড়ই ক্ষোভ—পুতুলের গায়ে কুমারদাদা বড় অযত্ন করিয়া রঙ দিত—কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। কুমারের কৈফিয়ৎ—ভাল ক'রে এঁকে ফল কি, এক পয়সার পুতুল ত আর কেউ চার পয়সায় কিনবে না। সত্যই ত! পুতুল কিনিবে বালকে, দুদণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে, তারপর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত? আর্টিষ্টের মন কোনদিন তাহা বুঝে নাই। তাই শক্তিনাথ যখন পুতুলে রঙ দিবার অধিকার পাইল—তখন সে একবেলা ধরিয়া একটি পুতুলকে চিত্রিত করিল।

পিতার মৃত্যুর পর শক্তিনাথকে ঠাকুর গড়া ছাড়িয়া ঠাকুর পূজা করিতে হইল। এ যেন আর্টিষ্টকে সমালোচকের কাজে নিয়োগ করা। "পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন রঙ বেশি মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়—কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্রে জপ করিতে হয় এসব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না।"

শরৎচন্দ্র এই শক্তিনাথের জীবনের দ্বারা দেখাইতে পারিতেন মূর্ত্তি-রচনার আনন্দময় সাধনা হইতে মূর্ত্তিপূজার জীবন আবেষ্টনীতে নীত হইয়া শক্তিনাথের শিল্পিমনের কিরূপ Tragedy ঘটিল—শরৎচন্দ্র এই প্রত্যাশা দিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার কল্পনায় অপর্ণাই প্রাধান্যলাভ করিল—শক্তিনাথ একটা উপকরণে পর্য্যবসিত হইল। শক্তিনাথের জীবনকে আর আগাইতে দেওয়া হইল না। জীবন্ত মানুষের প্রতি বিরাগিণী জড় দেবমূর্ত্তির অনুরাগিণী অপর্ণার উদাসীন চিত্তকে আঘাত দেওয়ার জন্য শক্তিনাথের মৃত্যু ঘটাইলেন।

মন্দিরের মধ্যেও নূতন শিল্প সাধনার অবকাশ ছিল—শক্তিনাথের শিল্পিমানসের সার্থকতাও তিনি মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে দেখাইতে পারিতেন।

শরৎচন্দ্র কাশীনাথের জ্ঞানাসক্ত প্রকৃতিকে অপর্ণার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন—কেবল জ্ঞানের স্থলে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। জ্ঞান-চর্চ্চা ঐন্দ্রিয়িক আকর্ষণের পরিপন্থী হইতে পারে, কিন্তু ভক্তির আবেদন ত তাহা নয়। যাহাই হউক, অপর্ণা নিজের প্রেমে অমরনাথকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করে নাই। অপর্ণার দাম্পত্যজীবনে একটা বিপ্লব ঘটিল—কিন্তু শরৎচন্দ্র সে বিপ্লব লইয়াও অগ্রসর হইলেন না। অমরনাথ চিত্তে ক্ষোভ লইয়াই মারা গেল। ইহাকে ঠিক দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার পরিণাম বলা যায় না। দেবমন্দিরের প্রতি অপর্ণার অনুরাগ এতই অধিক যে অতিসহজেই সে বিধবা হইয়া দেবমন্দিরেই ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্যজীবনকে ভুলিয়া গেল। অমর-নাথ জানিয়াছিলেন—অপর্ণা পাষাণী। পাষাণ মন্দির যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—সে ভাবিল দেবতার আহ্বানে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ভাবিল ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবন্ত মানুষের প্রতি যাহার দরদ নাই, পাষাণ মূর্ত্তিই যাহার সব, শরৎচন্দ্র তাহার চিত্তে শেষ আঘাত দিবার জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত পূজাপুষ্পের মত সুরভি ও শুচি শক্তিনাথের জীবনাবসান ঘটাইলেন। দীসখোসের লিপি দুটি লইয়া অপর্ণা দেবতার পায়ে রাখিয়া বলিল—"ঠাকুর, আমি যাহা লইতে পারি নাই—তাহা তুমি লও। নিজের হাতে আমি কখন পূজা করি নাই আজ করিতেছি! তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

ফেলারামবাবুর চিঠি-সমস্যা

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বি-এল

আচ্ছা মশায়; আপনারা রোজ কে ক'খানা করে চিঠি পান বলুন ত ? আর লেখেন ক'খানা করে ?

আপনারা হয়ত আমার প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে যাবেন। বলবেন : ভদ্রলোক বলে কি ? আমরা কে ক'খানা করে চিঠি পাচ্ছি, আর লিখছি—সে খবরে তোমার দরকার কি বাপু ? চিঠিপত্রের আদান প্রদানটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অথবা আপিস সংক্রান্ত হলে সেটা আরো বেশি গোপনায়। বাইরের লোকের সেখানে মাথা গলাতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা মাত্র।

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন ? আমি নজির খুঁজছি। মানে, পত্রজগতে আমার মনের ভাব এক এবং অদ্বিতীয়, না তার কোনো দোসোর আছে ? অর্থাৎ আমার সম-মনোভাবাপন্ন আর কেউ আছেন কিনা, তাই আমার জ্ঞাতব্য।

নববিবাহিত দম্পতিকে আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি না। কারণ আমার বিবাহিত জীবনের নবীনতা অনেক-দিন কেটে গেছে। সে যুগের ভাবের বাহনগুলোকে (উভয় পক্ষের) গৃহিণী তাড়া-বন্দী করে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন। ভয়, পাছে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল দৃষ্টি গিয়ে তাদের উপর পড়ে। মজা দেখুন ত! একদিন যে চিঠির জন্য উভয় পক্ষ তীর্থের কাকের মত পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকা যেত, চিঠি এলে আনন্দের সীমা থাকত না, একই জিনিস বার বার পড়েও সাধ মিটত না, না পেলে জগতকে অন্ধকার মনে হত,পরস্পরের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত, মান-অভিমানের অন্ত থাকত না—প্রথম যৌবনের সেই রঙিণ চিঠিগুলোর আজ এই দুর্দশা। একেই বলে 'কালের কুটিল গতি'—আর কি।

আমার মত হয়েও যাঁদের থেকেও নাই, অর্থাৎ প্রথম যৌবনকে পিছনে ফেলে রেখে এসেও যাঁদের সপরিবারে সব সময় একত্র বাস করবার দুর্ভাগ্য হয় নাই, তাঁদেরও আমার কোনো জিজ্ঞাস্য নাই। বিরহী যক্ষের মত তাঁরা শুধু বর্ষা কেন, ষড় ঋতুতেই ষোড়শ প্রকারে বিরহের আনন্দে মিলনের দুঃখ স্মরণ এবং উপভোগ করুন, এবং পত্রদূতের সাহায্যে অভাব ও অসুবিধার চিরন্তন কার্য্যের আদান-প্রদান করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হতে পারে ; কিন্তু মশায়, পুরানো জুতো পরে আরাম আছে। যেখানে বরাবর পা দুটি থাকে, ঠিক সেই-খানে গিয়ে পড়বে। দু'একটা পেরেক যদি একটু আধটু খোঁচাও দেয়, তাও কড়াপড়া জায়গায় বিঁধতে পারবে না। নূতন জুতা কিনবার সামর্থ্য নাই বলার চেয়ে পুরানো জুতার আরাম অনেক বেশি, এই কথা বলাই ভাল নয় কি ? তাই তাঁরা মহা আরামে বিরহের সুখে কাতর হোন, আর পত্র-দূত এলেই সশঙ্কচিত্তে দুরু বক্ষে তার হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করুন, আমার কিছু বলবার নাই। তাঁদের আমি কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

আর, আপিসের গোপনীয়তার কথা বলছেন ? না মশায়, আপিসের কোনো কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। ও যারা আপিসে কাজ করে, তাদের কাছেই ভালো। আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে কাজ নাই।

আমি তাঁদেরই একথা জিজ্ঞাসা করছি, যাঁদের আমার মত চিঠি-বাই আছে—না পেলে মন কস্‌ কস্‌ করে, পেলে অস্বস্তি বাড়ে, উত্তর দিতে গিয়ে সংসার খরচে টান পড়ে।

উত্তর দিলেই প্রত্যুত্তর পাবার আশঙ্কা থাকে এবং আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা যদি অন্ততঃ দশজনও হয়, তা'হলে চিঠির আদান-প্রদান ব্যাপারটা প্রাত্যহিক কর্মেরই সামিল হ'য়ে পড়ে। চায়ের সময় চা-টি না পাওয়া গেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, ডাকের সময় চিঠি না আসলে মনের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যায়। তারপর চিঠি আসুক আর না আসুক, চিঠি একখানা করে না লিখলেও মনে শান্তি আসে না। বন্ধুদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা অসামাজিক জীব ভেবে কথার চাবুক মেরে সামাজিকতায় নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন ; গুরুজনদের চিঠির উত্তর না দিলে তাঁরা ভক্তিশ্রদ্ধা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়বেন, আর স্নেহাস্পদ স্নেহাস্পদাদের ত কথাই নাই।

তারপর ধরুন, আপনার যদি একটু আধটু লেখার সখ থাকে—মানে, সাহিত্য জগতে একটুখানি আসন পাবার জন্য যদি আপনি উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে ঐ দশজনা ছাড়াও আরো কয়েকজন অতিরিক্ত লিখন-বন্ধু জুটবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত লিখন-বন্ধুরা বড় নির্দয়। নববধূকে চিঠি লিখবার সময় যেমন খামের ভিতর ডাক-টিকিট পুরে দিতেন, এঁদের চিঠি লিখবার সময়ও তেমনি উত্তর পাবার প্রত্যাশায় ডাকটিকিট অথবা ঠিকানা-লেখা খাম দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কেউ উত্তর দেন, কেউ দেন না। টিকিট দেওয়া সত্ত্বেও বধূ চিঠির উত্তর না দিলে মান-অভিমান রাগরোষ করা চলত; কিন্তু এঁদের উপর তা করবার জো নাই। এঁরা হলেন সাহিত্যিক জগতে প্রবেশ পথের দ্বাররক্ষক। এঁদের চটালে সাহিত্যিক যশ-প্রার্থীর আখেরে ভালো হয় না। এ কথা তাঁরা ভালো করেই জানেন এবং আপনি আমিও ঠকে শিখেছি। তাঁরা উত্তর দেন আর না দেন, আপনাকে প্রাণের তাগিদে লিখতেই হয়, আর উত্তর পাবার প্রত্যাশায় প্রত্যহ ডাক আসবার সময় ছেলেকে ডাক ঘরে পাঠাইতেই হয়।

না, যুদ্ধের বাজারে আমার চাকর বাকর রাখবার মত আর্থিক সংস্থান নাই। ছেলেটা আট পেরিয়ে নয়ে পা দিয়ে লায়েক হয়ে উঠেছে। সেই গিন্নীর আর আমার ফাই ফরমাস খেটে থাকে। ফরমাসগুলো গিন্নীরই বেশি, আমার কেবল রোজ সকাল নটার সময় একবার করে ডাক-ঘর যাওয়া আর আসা। কিন্তু কেমন অবিচার দেখুন, গিন্নীর তাতেই রাগ। বলেন, তোমার ঐ চিঠি-চিঠি করে ছেলেটার নাওয়া খাওয়া গেল। ওকে আর পড়তে শুনতে হবে না, না?

আধ ঘণ্টার জন্য ডাকঘর যাওয়া আর আসা। তাতেই যদি ছেলেটার মাথা খাওয়া যায়, তাহ'লে তার মাথায় যে কিছু নাই, এই কথাই বলতে হবে। কিন্তু বলবার উপায় নাই। বলতে গেলেই এখনি বলে বসবেন, কাগজে লেখা ছাপা হলেই যেন এখনি দেশ উদ্ধার হয়ে যাবে। কাগজের অভাবে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারছে না, আর উনি দিস্তার পর দিস্তা কাগজে ছাই ভস্ম লিখে চলেছেন, আর গাঁটের পয়সা খরচ করে সেগুলো খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাচ্ছেন। তাও যদি সবলেখা ছাপত, কিম্বা ছাপা হলে কাগজের দামটাও দিত—

না মশায়, মেয়েমানুষের সঙ্গে বাজে তর্ক করতে নেই। তাই আমি চুপ করেই থাকি। কাজ কি ঘাঁটিয়ে। সাহিত্যিক হতে হলে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, তা অসাহিত্যিক হয়ে উনি কি বুঝবেন!

তারপর আবার ব্যাপার দেখুন। আমার চিঠিপত্র এলে গেলেই ওঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠে, সংসার খরচে টান পড়ে। কিন্তু চিঠিপত্র বিষয়ে উনিও যে আমার কাছা-কাছি যান, সে কথা আর বলে কে? অর্ধাঙ্গিনী যখন তখন দশজনের অর্ধেক, মানে পাঁচজন পর্যন্ত আমার বরদাস্ত করাই উচিত। কিন্তু তাঁর তিন সহোদরা, দুই সহোদর, এক গঙ্গাজল, এক ব্রজধূলি, তারপর তাঁর নিজের মাতা—এইগুলি আবশ্যকীয়। অতিরিক্ত কেউ নাই, তাই রক্ষা। তাঁর সহোদরা-পতিরা এবং শ্বশুরমশায় আমার ভাগে পড়েছেন। সাম্যের যুগ বলেই চুপ মেরে থাকতে হয়। চুপ মেরেই আমি থাকি, কিন্তু আমার এই একা চিঠি লেখার জন্যই সংসার খরচে টান পড়ছে, একথা যখন শুনি তখন সত্যিই অসহ্য ঠেকে। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন যদি ঠিক হয়, তবে আটে দশে পার্থক্য কোথায়, অঙ্কে তাঁর মাথা পরিষ্কার থাকলেও এ সামান্য কথাটা কেন যে তাঁর মাথায় ঢুকে না তা ভেবে আমি অবাক হই। আমার অতিরৈক্তিক লিখনবন্ধু আছে, তাঁর নাই। তার জন্যও কি আমি দায়ী?

এই যুদ্ধের ধাক্কায় খরচপত্র নিয়ে কে বেসামাল না হয়ে পড়েছে বলুন? মসীজীবীদের ত হাড়মাস ক্ষয়ে গেল। কাগজ মিলে ত কালি মিলে না, কালি মিলে ত কাগজ মিলে না। কালি কলম কাগজ মিলল ত অভাব অনটনের কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল, লিখতে বসে খেই হারিয়ে গেল। কোনো মতে লেখাটা যদি বা খাড়া করা গেল ত মাসিকে স্থানাভাব। নিজে খরচ করে ছাপতে যাবেন ত প্রেস-ওয়ালারা লোকাভাব এবং কাগজের অভাব জানিয়ে সাফ্ জবাব দিয়ে বসবে। লেখা ছেড়ে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টারীর খোঁজ করব কিনা যখন ভাবছি তখন হঠাৎ যুদ্ধ গেল থেমে। এতে আর আমার অপরাধ কোথায় বলুন?

অথচ হিসাবটা খুব জটিল নয়। অংকে আমার ভালো

মাথা না থাকলেও আমি এটুকু বুঝি যে, চিঠি লেখা বাবদ দৈনিক গড়পড়তা দু'আনা করে খরচ করলেও বার্ষিক সেটা পঁয়তাল্লিশ টাকা দশ আনায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই টাকাটা যদি যুদ্ধের পূর্বে দশ বছর ধরে জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে যুদ্ধের সময় কোনো একটা ব্যবসা করা যেত, অথবা কোনো কণ্ট্রাক্টারী নেওয়া যেত—তাহলে সেই চারশ একষট্টি টাকা বার আনা কোন্ না আজ কমপক্ষে চার হাজার ছ'শ চৌদ্দ টাকায় এসে দাঁড়াত। কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি। আগামী দশ বছরের মধ্যে যদি আবার যুদ্ধ বাধে—সেই আশায় আবশ্যকীয় এবং অতিরিক্ত সব রকম চিঠির আদান প্রদান বন্ধ করে দিব কিনা ; সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। সেই জন্যই আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমার মত অবস্থায় আপনারা কেউ পড়েছেন কিনা ? পড়ে থাকলে আমি যেমন ভাবে ভাবছি ঠিক সেই রকমভাবে ভাবছেন কিনা ? ভাবলে আমি যে সম্ভাবনার ইঙ্গিতটা করছি, তা কাজে খাটানো চলতে পারে কিনা, তাই অনুগ্রহ করে বলবেন আমাকে। ধরুন, যুদ্ধটা যদি আর না-ই বাধে তবু আপনার জমানো টাকাটা মাঠে মারা যাবে না। আপনার অবর্তমানে ছেলেরা নিশ্চয় সে টাকাটা কোনো না কোনো কাজে লাগাবে।

"ওগো শুনছ ?"

এমন মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর বহুদিন কানে প্রবেশ করে নাই। লেখা ছেড়ে অর্ধাঙ্গিনীর দিকে তাকাইতেই দেখি তাঁর হাতে একখানা চিঠি। সাগ্রহে বললাম, "ডাকঘর থেকে ফিরল ছেলেটা ? মোটে একটা চিঠি এসেছে আজ ?"

তিনি হাসিমুখে বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু তোমার নয়, আমার। 'চলতি জগৎ' মাসিকের অফিস থেকে এসেছে। আমার একটা গল্প মনোনীত হয়েছে, তার সংবাদ।"

খবরটা পড়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। উনিও যে আবার সাহিত্য-সাধনায় মন সংযোগ করেছেন,তা জানতাম না। আর আমার ভাববার কোনো কারণ নাই। এ এমন এক নেশা যে, একবার ধরতে আরম্ভ করলে আর ছাড়বার যো থাকে না। নাম আমার ফেলারাম হলেও কথাটা কিন্তু ফেলনা নয়। তবু নেহাৎ কর্ত্তব্যবোধে সতর্ক করবার জন্য বললাম, "দেখ, তোমার নামে লেখা ছাপা হবে, এতে অবশ্য আমারও গৌরব বোধ হবে। কিন্তু লেখা ছাপিয়ে লাভ নাই কিছু। অনর্থক কতকগুলো অপব্যয় মাত্র।"

বুঝতেই পারছেন, এর উত্তরে আমি কি পেলাম। যাক, বাঁচা গেল। আর হিসাব পত্রে কোনো কাজ নাই। যুদ্ধ না বাধলে সামান্য টাকাতে বড়লোকও হওয়া যায় না। তবে আর মিছামিছি কেন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করি। যাঁর আপত্তি ছিল তাঁর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের টানাটানির কথা বললে, এর পর আমিও কিছু মুখ খুলতে কসুর করব না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার বাণী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সত্যসন্ধ আচার্য্যের তিরোভাবের সহিত ঊনবিংশ শতাব্দীর গৌরবময় স্মৃতির শেষ অধ্যায় রচিত হইলেও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দর্পণের কলঙ্ক, অন্যায় অনাচার ও দুর্নীতিতে রাহুগ্রস্ত নরনারীর নিকটে আচার্য্যের জীবনবেদ, ষোল আনা সত্যের গবেষণার কথা, অমৃত সমান। আচার্য্যদেব ছিলেন তিনপুরুষ বাঙ্গালীর দরদী আদর্শ গুরু। বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্কের অপব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা তিনি চিরকাল জানাইয়াছেন, দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী যুবক কিসে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবে তাহার জন্য এই শিক্ষাব্রতী "আপনি আচরি ধর্ম্ম" অপরকে শিখাইবার জন্য পরিণত বয়সেও আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ঝড় ঝঞ্ঝা-বন্যায় বিপন্ন নরনারীকে, গৃহহারা পরিশ্রান্ত দুঃস্থকে একমুষ্টি অন্ন ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলিহস্তে উল্কাপিণ্ডের মতন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং দেশের যুবকদিগকে মনুষ্যত্বলাভ করিয়া শান্ত ও সমাহিত জীবনযাপন করিবার আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতি, জীবনসংগ্রামে বিধ্বস্ত, আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর নিকটে আজও অপূর্ব্ব বিস্ময়। আচার্য্যদেবের স্বপ্নের "এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ" বাঙ্গালী শতবৎসরের সংগ্রামের পরেও "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হইয়া উপলবহুল বন্ধুর পথে যাত্রা সুরু করিতেছে। আচার্য্যের অসাম্প্রদায়িক বাণী তাই আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়, ও সকল আদর্শবাদীর আশাপ্রদীপ।

টাঙ্গাইলে, জীবন সায়াহ্নে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটুকুরা রত্ন তাঁহার শান্তক্লান্ত দিশাহারা ভাইভগিনীদের জন্য এখানে উপস্থিত করি।

ছত্রিশ রকমের পরস্পর বিরোধী, বিভিন্ন মতাবলম্বী বিবদমান জাতির মধ্যে আচার্য্যের মহাসমন্বয়ের আদর্শ, মন্দির মসজিদে এবং দেউলের বিভিন্ন চৌহদ্দীর মধ্যে বিশাল ও বৈচিত্র্যময় পৃথিবীই ব্রহ্মের মন্দির, সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং। আচার্য্যদেব বলিতেন মানুষের মনের নোংরামি তখনই লোপ পাওয়া সম্ভব, যখন মানুষের মনে এই শাশ্বত, অবিনশ্বর ও চিরন্তনী সত্যের উদয় হয়। মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে এই সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ মানবদেহই ক্ষুদ্র মন্দির এবং মানুষের জীবন্ত মনই এই মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পূজারি তখন সে কেমন করিয়া এই দেহকে পাপে মলিন ও কলঙ্কিত করিতে সক্ষম হইবে। ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণময় পূজাপদ্ধতি আচার্য্যদেব মনপ্রাণ দিয়া "হৃদামনীষা মনসাভি ক্লিপ্তঃ" গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব বলিতেন এই সাধনায় মানুষের মনে দুর্নিবার শক্তির সৃষ্টি হয়। ইহাকেই তিনি মানবজীবনের Storage battery বলিতেন। রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চার সহিত তিনি ধর্ম্মজীবনকে তুলনা করিয়া বলিতেছেন—গবেষণার মূলসূত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান। গবেষণায় যেমন ফাঁকি চলে না ধর্ম্মজীবনেও ঠিক তাই। সারাজীবনের কাজে উপাসনার ছন্দ যদি ফুটিয়া না উঠে তবে সকল কিছুই বৃথা "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম চ তদুপসনামেব", সুদীর্ঘ জীবনে জীবন বিধাতার প্রিয়কার্য্যের সাধনাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তিনি বলিতেন আমি মার্কামারা তিলকধারী ব্রাহ্ম নই এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমি একটি hidebound, creedbound, লোহার ছাঁচে ঢালা হার্ত পা বাঁধা dogmatic religion বলিয়া কোনও দিন বুঝি নাই এবং গ্রহণ করি নাই। চিরগতিশীল এবং চিরচলিষ্ণু মনুষ্য সমাজ, জলস্রোতের ন্যায় অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতেছে ইহা ছিল তাঁহার বিশ্বাস ; তাই ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে ever wakeful ever progressive and ever expanding। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিতে দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে হতাশ হইতেন এবং বলিতেন যুক্তির দ্বারা সত্যমিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। তিনি বলিতেন যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় মনের গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতেছে, অথচ বাহিরে জন সমাজে এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহস নাই, সে জাতি কেমন করিয়া জগতের নিকটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। তিনি বলিতেন, এদেশে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শিবনাথ প্রভৃতি দেশকাল—লোকাতীত মহামানবসকল এই সত্যের উপরেই জীবনকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, ঠিক এই কারণে মহাত্মা গান্ধীকে তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং "বার সেপাহীর তের হাঁড়ি" লইয়া তিনি বহু বক্তৃতা ও বহু চীৎকার করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বিস্মৃত হইয়া M. Sc. পাশ বরকে পালটী ঘরের উপযুক্ত যৌতুক লইয়া বিবাহের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা প্রায় বলিতেন। "স্নেহলতার" আত্মহত্যা তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল, এই সকল সামাজিক পাপের জন্য বাংলার যুবশক্তিকে দায়ী করিয়া তিনি তীব্র কশাঘাত করিয়াছিলেন। নরনারীর সমানাধিকারে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ আদর্শের ভনিতা করিয়া যাহারা পাশ্চাত্যের দুষ্টব্যাধি আমদানী করিতেছেন তাহাদের নিন্দা করিতে গিয়া Co-education, Birth control, Nudist Colony স্থাপন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের খোসাভুসি অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড টিটকারী করিয়া গিয়াছেন। বিদেশের চালচলন, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব প্রভৃতির বাহ্যিক অনুকরণকেই তিনি ধারকরা খোসাভুসি বলিতেন, তাঁহার মতে মানুষের সত্য পরিচয় তাঁহার অন্তরাত্মার পবিত্রতায়। উচ্চ আদর্শের নামে আপোষকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং উদ্দেশ্যমূলক মিতালীর তিনি বিরোধী ছিলেন। স্বার্থরক্ষার অজুহাতে হরিজন আন্দোলনের প্রতি তাঁহার তেমন প্রীতি ছিল না, "সকল মানবই এক বিধাতার সন্তান এবং এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ" এই সত্যাদর্শের উপর স্থির হইতে পারিলেই হরিজন ও বর্ণহিন্দুর ভেদাভেদ বিদূরিত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

নরনারী সকলের সমান অধিকার
(যার) আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাতবিচার।

হিন্দুসমাজ এই আদর্শ গ্রহণ করিলে Communal Award এর প্রয়োজন হইত না ইহা তিনিই বলিয়াছেন। দুঃখ করিয়া তিনি বলিতেন, কত তিলি, তাম্বুলী, সুবর্ণবণিক ও বৈশ্য সাহা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, চেহারা, শীলতা এবং সংস্কৃতিতে এমন লোক রহিয়াছেন যাঁহারা আভিজাত্যগর্ব্বিত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা কায়স্থদের চেয়ে কোন অংশে কম নহেন। এই সম্পর্কে দেশবিখ্যাত কতিপয় পণ্ডিতদের নামও তিনি উল্লেখ করিতেন। হিন্দুসমাজকে বাঁচিতে হইলে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ বর্জ্জন করিবার উপদেশ তিনি বহুভাবে দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুসমাজের অন্যতম পাপ দ্বিধাহীনভাবে বর্জ্জন। স্ত্রীকে দস্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ পুরুষের স্ত্রীত্যাগকে তিনি নির্লজ্জ কাপুরুষোচিত কাজ বলিতেন। আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, হিন্দুসমাজ ছুতা পাইলেই বর্জ্জন করিতে জানে—কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে জাতি ও শ্রেণী বিভেদের ফলে বিবাহাদির অসুবিধার জন্য সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, যাহারা থাকিতেছে তাহাদেরও নৈতিক স্বাস্থ্য নানাকারণে দুষ্ট ও নৈতিক শুভবুদ্ধি হৃত। এই সকল কারণে তিনি প্রায় জাপানের সামুরাই জাতির উল্লেখ করিয়া বলিতেন, সামুরাইদের মতন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যদি তাহার সামাজিক বিশেষ অধিকার ও আভিজাত্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে একাধারে পুরাতন ব্রাহ্মণদের মতন ত্যাগী, ক্ষত্রিয়দের মতন বীরব্রতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ না হয় তবে এ জাতির মুক্তির আশা এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বিড়ম্বনা মাত্র। আচার্য্যদেব দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, চামার যদি পেটের জ্বালায় একমুঠো ভাতের জন্য আমার দুয়ারে আসে তাহাকে হৃদয়হীনের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করি না সত্য, কিন্তু পাতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন দিয়া তাহাকে সমঝাইয়া দিই যে সে মুচি, সে

অস্পৃশ্য ; তাহাকে বলি ঐ দূরে বাগানের কোণে গিয়া বস্, সকলের খাওয়া হলে পাত্ কুড়ানো সব পাবি। এই সকল অশিক্ষিত মূক, নির্য্যাতিত নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে গুটীকয়েক আত্মপ্রতারিত শিক্ষিত যুবকদিগকে বৃক্ষের মূলোচ্ছেদন করিয়া উপরে জল ঢালিতে দেখিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন আর বলিতেন

হে মোর জননি
সাত কোটী বাঙ্গালীরে
রেখেছ বাঙ্গালী করে
মানুষ কর নি।

দধীচির মতন তিল তিল করিয়া আচার্য্যদেব আমাদের জন্যই শেষ রক্তবিন্দুও দান করিয়া গিয়াছেন, বিংশশতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক এই মহান গুরুর সাধনায় আমাদের অনেকটা অধিকারগত, স্বাধীনতার দ্বারে উপস্থিত হওয়ায় যৌবনের তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহুও বাঙ্গালী যুবকের করায়ত্ত। ভবিষ্যতের বাঙ্গালীকে আচার্য্যদেবই পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের চলার পথের সকল বাধাবিপত্তি বিদূরিত হউক। আচার্য্যদেব বলিতেছেন,

এস কে আছো হৃদয়বান, কে আছ প্রেমিক, কে আছ কর্ম্মী, কে আছ বীর, উহাদিগকে—সহস্র বৎসরের সামাজিক অত্যাচারে পশুত্বে যাহারা পরিণত—উহাদিগকে উঠাও, তোল মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া দাও, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, পাঠশালায়, বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে বাটে, ঘাটে, বাজারে বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার মৃতসঞ্জীবনী লইয়া যাও, আর বল মহানিশার অবসান হইয়াছে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্ নিবোধিত।

সংস্কৃতিরক্ষার উপায়

পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

মোগল, পাঠান দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে টিকিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ বেশীদিন পারিল না।

রাজনীতির দিক্ হইতে ইহার একটা ব্যাখ্যা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আর একটা দিক্ দিয়া আলোচনা না করিলে ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝা যাইবে না।

পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতি এ দেশ হইতে ইংরাজকে তল্পীতল্পা গুটাইতে বাধ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, ইংরাজ এ দেশের সঙ্গে নিজেকে মোটেই খাপ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়াই এত শীঘ্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

মোগল পাঠানও হিন্দুস্থানে বিদেশীর মতই আসিয়াছিল, নানা অত্যাচারের কলঙ্ক আজও তাহাদের স্থায়িত্বের অনেক অংশ মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাপি তাহারা একটা দরদ দেখাইয়াছিল—ভারতবর্ষকেই তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আর ভারতবাসীর প্রাচীন সমাজজীবনকে তাহারা কোনদিনও ওলোট্-পালোট্ করিতে চাহে নাই। দুই একজন সম্রাট দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া আঘাত হানিতে গিয়া ব্যাহত হইয়াছিলেন। এই যে সমাজজীবন অব্যাহত ধারায় চলিতে পাইয়াছিল, ইহারই ফলে ভারতে সুদীর্ঘকাল মুসলমানের টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুর এই সমাজ-জীবনে আঘাত হানিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধতার চূড়ান্ত চিত্র তাই ভারতের মানচিত্র হইতে মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈভব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে যে সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া বর্ব্বরতাকে বীরত্বের নামে অর্দ্ধসহস্র বৎসর মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছিল, সেই সোমনাথ আজও রহিয়াছে—যাহারা ভাঙ্গিয়াছিল, আজ তাহারাও তুল্য গোলাম হইতে বাধ্য হইয়াছে। সোমনাথ হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গা যায়, কিন্তু সোমনাথের যে অধিকার যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের হৃদয়মন্দিরে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, সে অধিকার অক্ষুণ্ণই রহিল।

গাজ্নীর সহিত নাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়া মুসলমান যেদিন এদেশেরই মাটিকে মা বলিয়া ডাকিল, আমরা সোমনাথের ব্যথা ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু সোমনাথকে ভুলি নাই। তাই মোগল পাঠানের মৃত্যুতে আনন্দ পাই নাই। আজও সিরাজদ্দৌলা, টিপু সুলতানের জন্য স্মৃতিসভা হয় ; নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে বাহাদুর সার সমাধিক্ষেত্রে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা যে ভয়ানক ভাবপ্রবণ, এতটুকু আত্মীয়তার গন্ধ পাইলেই যে আমরা স্নেহান্ধ না হইয়া পারি না। ইংরাজ আমাদের এদিক্টা বুঝিয়াও বুঝিল না। সাংঘাতিক শোষণী-বুদ্ধি তাহাদিগকে এতকাল শুধ্ পর পর করিয়াই রাখিল। তাহারা চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া কাহারও তাই এতটুকুও দুঃখ হইতেছে না ; নানা ছলে পাছে না যায়, বরং এই আশঙ্কাই অনেককে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস কবে আসিবে—ইহারই জন্য দিন গণিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। একফোঁটা অশ্রুজলও সে আজ জনাকয়েক vested interest ছাড়া কাহারও চক্ষে সঞ্চিত করিয়া রাখে নাই। এতবড় বুদ্ধিমান হইয়াও ইংরাজ আজ সত্যসত্যই নিতান্ত বুদ্ধিহীন সাব্যস্ত হইয়া গেল।

শুনিয়াছি ৺গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন—"ইংরাজ, তুমি সত্যসত্যই ভারি বীর। তোমার বুদ্ধিও আছে, গৌরবও

আছে। তুমি অখাদ্য ভোজনটা ত্যাগ করিয়া এদেশেই যদি স্থায়ীভাবে বাস করিতে পার, তবে তোমায় ক্ষত্রিয় বলিয়া চালাইয়া লইবার চেষ্টা করিব। এদেশের সমাজে যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একবার ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হইতে পার, তবে আর তোমার মার নাই। তুমি এদেশেই চিরকাল টিকিতে পারিবে।" একজন টিকিধারী পণ্ডিতের কথাটার তাৎপর্য্য তাহার মগজে ঠিকমত প্রবেশ করে নাই। বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধিই তাহাকে বড় করিতে লাগিল। শিখ, গুর্খা, মারাঠা, রাজপুত—একের দ্বারা অপরকে দমন করিবার কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি দেখিয়া ইংরাজ তাহার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিল। বল-নাচে নাচিয়া নাচিয়া বীরত্বের সমাধি রচনা করিল। ডান্‌কার্কের কেলেঙ্কারী তাহার মুখ দেখানো ভার করিয়া তুলিল। ভারতকে দাবাইয়া রাখিবার মত আজ আর না আছে তাহার বীর্য্যবল, না আছে ধনবল, জনবল। আর সর্ব্বোপরি তাহার মনোবল পর্য্যন্ত ঘুচিয়াছে।

ধনজন কাহারই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু মনোবল তাহার নষ্ট হইল কেন? ইংরাজ ভারতকে আত্মীয় করিতে পারে নাই, বরং ভারতীয় মহত্ত্বকে চূর্ণ করিবারই চক্রান্ত করিয়া আসিয়াছে। মোগলের অত্যাচারের কথাগুলিই ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিতে পারিয়াছে, কিন্তু আজও শা' আলম্ বাদ্‌শার ফার্ম্মান্ দ্বারা অধিকার গৌরীদাস স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমন্দিরে যে হরিনাম সংকীর্ত্তন হইতেছে, তাহার কথা কোথায় লিখিয়াছে? সুখে দুঃখে এদেশের ভালো মন্দের সঙ্গে মোগল যেমন করিয়া কতকটা আপনার হইতে পারিয়াছিল, ইংরাজ কুত্রাপি তাহা পারে নাই।

ইংরাজ ভাঙ্গিতে শিখাইয়াছে—গড়িতে চাহে নাই। ফলে ভারতের শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন দ্রুত উপদ্রুত হইয়াছে। ঠগীদের বিচারের রিপোর্ট দাখিল করিবার সময় কর্ণেল শ্লীমান্ বিস্মিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"উহাদের মধ্যে এমন অসংখ্য ঠগীকে দেখিয়াছি, যাহারা সামান্য একটা মিথ্যা কথা বলিলেই হয়ত তাহাদের ধন, সম্পত্তি এমন কি জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা পাইতে পারিত, কিন্তু একজনও মিথ্যা কথা বলে নাই।" ভারতের এই সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া ইংরাজ বিস্মিত হইয়াছিল—তারপর কি করিয়া কি হইল, সে সুদীর্ঘ ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। ফল হইয়াছে এই যে, ইংরাজ যাইবার সময় দেখিতেছে—ধর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবর্ষে অধর্ম্মের বন্যা বহিতেছে, সত্য আত্ম-গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, মিথ্যা নানা আবরণে রাজসম্মানে বিভূষিত। এ অবস্থায় ইংরাজ যাইতেছে বলিয়া দুঃখ করিবার কিছুই থাকিল না। বরং ইংরাজের আমলে আমাদের সংস্কৃতির ধারা যে ভাবে উৎসাদিত হইতে চলিয়াছে, কেমন করিয়া এখন তাহা রক্ষা করিতে পারা যায়, সেই ভাবনাতেই ভারতবাসী আকুল হইয়াছে।

এতকাল যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে; কিন্তু যাই যাই করিয়া এইবার ঠিক জাহাজ ভাসাইবার আগে ইংরাজ যেভাবে এদেশের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ উৎখাত হইবার অবসর করিয়া দিল, যাহারা সংস্কৃতি রক্ষায় এতটুকুও দরদী, তাহারা কোনদিনই তাহা ক্ষমা করিতে পারিবে না। Eastern Express (৬, মার্চ ১৯৪৭) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—

We hear so much about the efficiency of British administration in India and the ability of British officers. But is not Calcutta where there is so little security of life and property at the present moment still administered by a British Police Commissioner? Does not the ultimate responsibility for the maintenance of law and order and the investigation of crimes lie upon him? Is not Calcutta the seat of the Chief Secretary and the Home Secretary, both of whom are British? The pretention of provincial autonomy can not absolve them of their responsibilities

প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার এখন যে তাহার ভাণমাত্র এ কথাও পরবর্ত্তী ছত্রেই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

If the Minister's words are so sacred, then how did the officers in the Civil Service and the Imperial Police flout the Ministers' instructions during the 1942 movements?

এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ১৯৪২ সালেও ইংরাজের আশা ছিল, আরও কিছুকাল ভারতে সাম্রাজ্য সুখভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু আজ আর তাহার সে আশা নাই। পার্লামেণ্টে চার্চ্চিলের দল চীৎকার করিতে থাকিলেও, ইংরাজজাতি আর ভারতকে ধরে রাখিতে যে অশক্ত, শ্রমিক সরকার অকুণ্ঠ কণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজকে এদেশ ছাড়িয়া যাত্রা করিতেই হইবে।

কিন্তু এই মহাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিরও যে মহাযাত্রার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথা তো আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এ দেশের যে শিক্ষাপদ্ধতি যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের সমাজ জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার বন্যা প্লাবনে তাহার মূলোচ্ছেদ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, এ দেশের টোলগুলি প্রায়ই সব উৎসাদিত হইয়াছে। প্রাচীন গৌরবের অবদানপরম্পরা যাহারা বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহাদের অধিকাংশেরই বংশ নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহারা মরে নাই, তাহাদের খুবই কঠিন 'জান্' সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারাও কতক না খাইয়া তিলে তিলে মরিতেছে, আর কতক 'বুদ্ধিমান্' ইংরাজীয়ানার আওতায় আত্মরক্ষা করিয়া সাময়িক পরিত্রাণের পথ করিয়া লইয়াছে। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা-পরম্পরা এখন কেমন করিয়া যে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে, তাহাই এখনকার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম সমস্যা।

দেশে এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত রাজনৈতিক গুণ্ডামী চলিবেই। ১৯৪৮ সালের জুন মাস তো দূরের কথা—তাহার পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার ভরসা নাই। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী সময়টি অত্যন্ত

সঙ্কটপূর্ণ। এই সময় একদল ত্যাগী দেশসেবক চাই, যাহারা আমাদের সংস্কৃতি রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিবে। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনায় কারাবরণ—এমন কি ফাঁসীর মঞ্চে মরণ স্বীকারেও এ দেশের ছেলেরা পশ্চাৎপদ হয় নাই, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া তিলে তিলে মরণ স্বীকার করিয়া লইয়াও নিজেদের সংস্কৃতির ধারা রক্ষায় উৎসাহী দল কোথায়? এই দলের অভাব হইয়াছে—সাহসের অভাব জন্য নয়, সংস্কৃতির প্রতি ঐকান্তিক প্রেমেরই অভাবজন্য।

অথচ এই সংস্কৃতি ঘুচিয়া গেলে, আমাদের রহিল কি? মোগল পাঠানের মতো ইংরাজের রাজ্যও হয়তো ঘুচিল। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি—আমাদের যুগ যুগ-সঞ্চিত জগন্মঙ্গল সংস্কৃতির পবিত্র ধারা মুছিতে দিব কেন? যাঁহারা আজ সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যশোকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, তাঁহারা তো জানেন, রাশিয়া আজ পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রাচীন সংস্কৃতির গৌরব নিদর্শনগুলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমরাই তবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিব কেন? ভারতের গর্ব্ব গৌরবের অনেক কিছু ঘুচিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহাও কি পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু নয়?

বাঙ্গালোর হইতে এই সেদিনও তো সংবাদ বাহির হইয়াছে—৮৫ বৎসর বয়স্কা এক বিধবা ভিখারিণী তাহার সারা জীবনের ভিক্ষালব্ধ সঞ্চয় মোট ১ হাজার টাকা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়া বলিয়াছে যে, এই টাকার উপস্বত্ব যেন উলসুরের ঠাকুর শ্রীসোমেশ্বর স্বামীর মন্দিরে পূজায় ব্যয় করা হয়।

টাকার পরিমাণ বেশী নয়, কিন্তু প্রাণের পরিমাণ কতখানি?

এত কাণ্ডকারখানার পর আজও এই চিত্র লোপ পাইল না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া ভিখারিণী তাহার হৃদয়-স্বামী সোমেশ্বর স্বামীকেই ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে।

ভিখারিনী যাহা করিল, ভিখারীর দলের তাহা দেখিয়া কি চৈতন্যোদয় হইবে? আমাদের পবিত্র সংস্কৃতি বাঁচাইয়া রাখিতে একদল কি অগ্রসর হইবে?

নির্লিপ্ত মৌলিকগণ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণ কমল রায়

আমাদের পৃথিবীটা বিরানব্বইএর আওতার মধ্যে আছে। ইহার যাবতীয় শরীর—বৃক্ষলতা, গাছপালা, পশুপক্ষী, পাহাড়পর্ব্বত, জল-বায়ু একান্তভাবে ঐ বিরানব্বইটা মৌলিকেরই পরিণতি। মৌলিকদের মধ্যে কোন কোনটা একা থাকিতে ভালবাসিলেও প্রয়োজনমত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, ইত্যাদি এই শ্রেণীর মৌলিক। আবার উহাদের কোন কোনটা মোটেই একা থাকিতে পারে না, যুক্তাবস্থায় থাকাই উহাদের স্বভাব। ঐ যুক্তাবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের কতকগুলি আইন্ কানুন মানিয়া চলিতে হয়। উহাদের বলে রাসায়নিক গঠন প্রণালী। মৌলিকগণ যখন উহা রাসায়নিক প্রণালী মাফিক পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয় তখন আমরা ঐ যুক্তফলকে 'যৌগিক' আখ্যা দিয়া থাকি। কাজেই এ বিশ্ব সংসার যৌগিক ও ও মৌলিকেরই রাজত্ব। মৌলিকদের মধ্যে কিছু দিন হয় একটি তৃতীয় শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহারা কখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে রাজি নয়। মৌলিকদের যুক্ত হওয়াটা আমাদের সংসারক্ষেত্রে প্রবেশের সামিল। মৌলিকদের মধ্যে কতকগুলি ঘোর সংসারী, কতকগুলি অর্দ্ধসংসারী, আবার কতকগুলি মোটেই সংসারী নয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুগুলি সংসারী হইলেও নির্লিপ্ত। সংসার জীবন গ্রহণ করিয়াও ইহারা মহান। পটাসিয়াম, সডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিণ, ব্রোমিন্, ইত্যাদি মৌলিকগণ ভীষণ সংসারী। এক মুহূর্ত্ত সংসার ধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত হইতে ইহাদের বাসনা নাই। দুনিয়াটা প্রকৃতপক্ষে রক্ষা ক'রে ইহারাই। তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকগণ জীবনে কখনও সংসার আস্বাদন করে নাই। উহারা নিত্যমুক্তের মত। শুনিয়াছি নিত্যমুক্তেরা অজর, অমর হইয়া শূন্যে বিরাজ করেন। আমাদের এই নিত্যমুক্তগণও আকাশে থাকিতেই ভালবাসে।

মহাত্মা লর্ড র‍্যালে (Rayleigh) এই মুক্ত মৌলিকদের আবিষ্কার করেন। সম্ভবতঃ আজ আর কাহারও অবিদিত নাই যে আকাশে বায়ুর $\frac{৪}{৫}$ ভাগ নাইট্রোজেন ও $\frac{১}{৫}$ ভাগ অক্সিজেন। এই যে বিভাগ ইহা যথার্থ বিভাগ নয়। চুলচেরা বিচার করিলে উহাদের ছাড়াও বায়ুতে ৫টী মৌলিকের অবস্থান দেখা যায়। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কেভেনডিস, এক সময় তাহার পরীক্ষাগারে ইহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর হন নাই। কেভেনডিস্ কতকটা পরিমিত বায়ু হইতে নেত্রজান ও অক্সিজেনকে একদম অপসারণে চেষ্টিত হন্ কিন্তু দেখা যায় তাহার সমস্ত চেষ্টাতেও বায়ুর $\frac{১}{১২০}$ ভাগ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই শেষাংশ অক্সিজেনও নয়, নাইট্রোজেন ও নয়। প্রায় ৫০ বৎসর পরে লর্ড র‍্যালে কেভেনডিসের পরীক্ষণ ব্যাপারটীতে মনসংযোগ করেন এবং প্রমাণ করেন যে ঐ অবশিষ্ট গ্যাসটুকু নিশ্চয়ই কোন নূতন মৌলিক। পণ্ডিতপ্রবর স্যর উইলিয়াম র‍্যামজে এ সময় র‍্যালের সহায়ক ছিলেন। দুইজনের আপ্রাণ চেষ্টায় অবশেষে আর্গণ নামক মৌলিকটা ধরা পড়ে (১৮৯৪), প্রথমতঃ পণ্ডিত-সমাজ উহাদের ঘোষণাকে অবহেলা করেন, কিন্তু ক্রমশঃ উহাদের যুক্তি তর্কের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হন্। সকলেই ইহা মানিয়া

লইয়াছেন যে, বায়ুতে আরগণের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ। ইহা বর্ণহীন, অক্সিজেন ও নেত্রজান হইতে দেড়গুণ ভারী।

পরবর্ত্তী শীতকালে র‍্যামজে যখন আরগণ অবস্থিতির নূতন সূত্র খুজিতেছিলেন ঠিক্ সেই সময় সার হেন্‌রি মায়ারস্ তাঁহাকে একটি খনিজ পদার্থ পরীক্ষা করিতে দেন্। র‍্যামজে ইহা নিয়া পরীক্ষা করিতে যাইয়া অপর একটি মৌলিকের সন্ধান পাইলেন। ইহার নাম "হিলিয়াম"। ইহাও একটি বর্ণহীন নির্লিপ্ত মৌলিক। হাল্‌কা হিসাবে ইহার স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ হাইড্রোজেনের পরেই। ইহা বায়ুতে ২০০,০০০ ভাগে এক ভাগ আছে।

আরগণ ও হিলিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতদের বদ্ধ ধারণা জন্মে যে বায়ুতে নিশ্চয়ই আরও কয়েকটী নির্লিপ্ত মৌলিক আছে। কারণ দেখা গিয়াছে—কোন পরিবারই একটি দুইটী মৌলিক দ্বারা সাধারণতঃ গঠিত নয়। এই ধারণায় উৎসাহিত হইয়া র‍্যামজে ও তাহার সঙ্গীগণ বায়ুতে উহাদের তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে থাকেন এবং ১৮৯৮ খৃঃ উহারা সত্য সত্যই ক্রিপটন্, জেনন্ ও নিয়নের সন্ধান পান। কিন্তু শেষোক্তকে পাওয়ার জন্য ডর্ণ নামক পণ্ডিতের ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ক্রিপটন্ আছে বায়ুতে ৬৫০০০ ভাগে এক ভাগ; জেনন্ আছে ১,০০০,০০০ ভাগে ১ ভাগ ও নিয়ন আছে ১১,০০০,০০০ ভাগে এক ভাগ। প্রথম দিক দিয়া উহারা সকলেই পণ্ডিতদের নিকট কৌতুহলের বস্তু ছিল, ব্যবসাক্ষেত্রে নিয়োগ করার কোন সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে তখন কেহই উহাদিগকে বেশী প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হয় নাই। তৎপর প্রায় ২০ বৎসর পরে প্রমাণিত হয় যে নির্লিপ্ত হইলেও আরগণ একদম অকর্ম্মণ্য নয়। আরগণের স্ফুটানাঙ্ক নাইট্রোজেনের ১০ ডিগ্রি বেশী, অক্সিজেনের ৩ ডিগ্রি কম। বায়ুকে তরল করিলে,তরল বায়ু হইতে জেনন্ সর্ব্ব প্রথম উড়িয়া যায়, তৎপর ক্রিপটন্, অক্সিজেন, আরগণ, নেত্রজান ও সর্ব্বশেষে নিয়ন ও হিলিয়াম একে একে বাহির হয়। ইহাদের কাজেই বাষ্পীকরণ দ্বারা পরিশুদ্ধ করা যায়। নির্লিপ্ত আরগণকে পাইয়া মানুষ ধন্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা বিদ্যুৎ আলো গোলোকের মধ্যে বিরাজ করিয়া ইহার প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে। এখন পূর্ব্বের মত গোলকের তার ততটা নষ্ট হয় না। একমাত্র এই ব্যাপারেই প্রচুর আরগণ লাগে।

আমেরিকাতে স্থানে স্থানে ভূগর্ভ হইতে হিলিয়াম প্রায়শঃ উত্থিত হয়। ইহাও নির্লিপ্ত, কাজেই দাহ্য নয়, অথচ বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা; এই সমস্ত গুণের সাহায্য পাইয়া বৈজ্ঞানিক ইহাকে ব্যালুন, বা উড়োজাহাজে ব্যবহার করেন। নিয়ন্ গ্যাসটী ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যুৎবাহী গোলক নিয়ন পূর্ণ থাকিলে ইহা হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সময় কমলা বর্ণ আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই উজ্জ্বল আলো দ্বারা বর্ত্তমানে ব্যবসায়ীগণ রাত্রিতে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কেহ কেহ বলেন গত যুদ্ধের পূর্ব্বে ফ্রান্সে আরগণের পরিবর্ত্তে ক্রিপটন্ ও জেনন্, বিদ্যুৎ গোলকে ব্যবহৃত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে ইহাতে গোলকের জীবন ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ১২০০ টন্ তরল বায়ু হইতে ১ পাউণ্ড জেনন্ পাওয়া যায়।

বিষকন্যা

শ্রীআশা দেবী এম-এ

হে রূপসী তব উষর বুকের মাঝে,
ফোটে নাকি সেথা কামনার শতদল—
অকারণে কভু বিমনা হও না সাঁঝে?
গোধূলি আঁধারে হও নাকি বিহ্বল?
তুলসীর মূলে জ্বালো নাকি তুমি আলো,
সন্ধ্যা-শঙ্খ বাজে না তোমার ঘরে?
নিশার আঁধারে শুধু ছায়া কালো কালো
ঘুরে মরে শুধু তব অঙ্গন পরে।
চক্ষে তোমার যে নীল-কাজল-রেখা,
সে যে মরীচিকা—সাহারার মায়া রাগ,
লীলালক্তকে কার শোণিতের লেখা,
আলুল-বেণীতে গর্জায় কাল-নাগ।
হে বিষকন্যা, একি খেলা অভিনব!
ছলনা তোমার নিত্য নূতনতরা।

একি অভিসারী সজ্জা রচেছ নব,
হে মৃত্যুরূপা—মানসী মূরতি ধরো।
হে ছলনাময়ী, হে অভিশপ্তা নারী!
তুমি চিরদিন জ্বালো মরু বুকে তৃষা,
বাঁধ নাকো ঘর তুমি চিরপথচারী,
তোমার আকাশে ঘন দুর্যোগনিশা।
তব অভিমানে অশ্রু বারি যে ঝরে,
ধারা নয় সে তো তরল বহ্নি-জ্বালা,
তব নিশ্বাস ওড়ে বৈশাখী ঝড়ে,
ঝরা-উল্কায় তোমারি ছিন্নমালা।
হে স্বর্ণমৃগ, তোমার বিনাশ নাই,
তিল তিল বিষে তুমি যে তিলোত্তমা,
কত ট্রয় কত কুরুবর্ষেতে তাই,
জ্বলে তব রূপ কৃষ্ণ-বহ্নি সমা।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

বিমলশাহী মন্দির পরিবেষ্টনীস্বরূপ অলিন্দ প্রদক্ষিণ ক'রে ও তৎসংলগ্ন ৫২টি তীর্থঙ্করের গুহামন্দিরগুলি দর্শনান্তে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে তার মধ্যস্থলে নির্ম্মিত সেই মর্ম্মর মণ্ডপটিতে গিয়ে উঠলুম। এটি যেন অনেকটা সেই গর্ভ মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরের মতো।

মর্ম্মরনির্ম্মিত বৃহৎ আটটি স্তম্ভের উপর সেই নাটমণ্ডপের বিশাল গম্বুজ। এক একটি দিন উদয় অস্ত যদি কেবল এক একটিমাত্র স্তম্ভ গাত্রে সেই নিপুণ শিল্পীদের উৎকীর্ণ মূর্ত্তি ও কারুকলার বৈচিত্র্য অনন্যমনে অনুধাবন করবার অবকাশ পেতুম তাহ'লে হয়ত সেগুলি আশ মিটিয়ে দেখা হ'ত। কিন্তু সময় ছিল না। ৬টায় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হ'য়ে যাবে।

"একরাত্রি শুধু পরমায়ু—!
তারি মাঝে শুনে নিতে হবে—
ভ্রমর গুঞ্জন গীতি,
বনান্তের আনন্দ মর্ম্মর !"

স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্য শিল্প ভারতে যে একদিন চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল একথা দিলবারা মন্দির ও তাজমহল দেখবার পর আর অস্বীকার করবার উপায় নেই ! ভারতবাসীদের যারা বর্ব্বর ও অসভ্য বলে পৃথিবীর লোককে বোকা বুঝিয়ে এসেছেন, তাঁদেরও এখানে এলে আর বাক্যস্ফূরণ হবে না !

সুচারু স্থাপত্যকলা ও সুরম্য ভাস্কর্য্য শিল্পের এখানে একেবারে রাজযোটক হয়েছে যেন ! কারু ও কলার মহামিলনের ঐক্যতান ছন্দ বেজে চলেছে যেন এই মন্দিরের দিকে দিকে। যুগে যুগে কালে কালে তা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে বিস্ময়াভিভূত দর্শকের বিহ্বল মনে আনন্দের তালে তালে ! অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরণ করে ওঠে এই মর্ম্মর সঙ্গীতের মর্ম্মগীতি। অনুরণিত হয়ে ওঠে মুগ্ধ হৃদয়ের দিক্‌দিগন্ত—

"তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী !
আমি শুনি—শুধু অবাক হয়ে শুনি !"

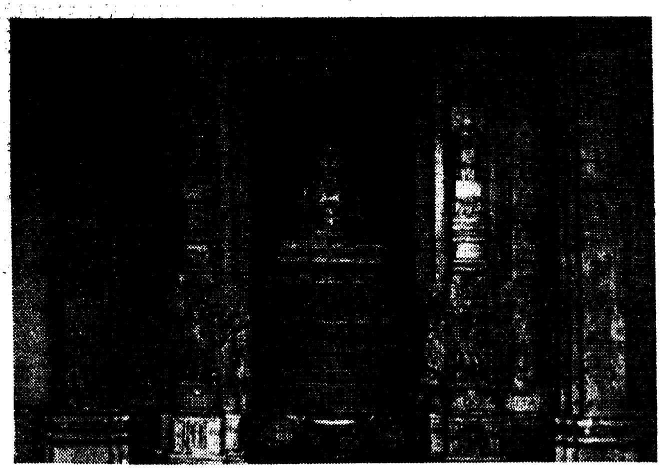
কারুকার্য্যখচিত তিনটি প্রশস্ত মর্ম্মর সোপান ব'য়ে আমরা উঠলুম গিয়ে প্রধান মন্দিরের চত্বরে। প্রশস্ত চত্বর, উন্মুক্ত দ্বারপথেই দেখা যাচ্ছে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত জৈন তীর্থংকর আদিনাথের সমুজ্জ্বল বিরাট মূর্ত্তি। মণিময় তাঁর নয়নে মাণিক্যপ্রভার দ্যুতি, বিবিধ মহামূল্য রত্নাভরণে ভূষিত তনু। কিন্তু মূর্ত্তিটি বিবসন। পূর্ব্বদৃষ্ট ৫২টি তীর্থংকরেরও প্রত্যেকটির মূর্ত্তিই বিবসন, কিন্তু নিরাভরণ নন কেউই ! প্রত্যেকেরই চক্ষে বক্ষে নাভিকুণ্ডে স্কন্ধদেশে ভুজমধ্যে ও পাদপদ্মে মূল্যবান মণিরত্ন সন্নিবেশিত রয়েছে।

নাটমন্দিরের গম্বুজটির অভ্যন্তরভাগে চক্রাকারে পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা আছে অপ্সরী বিদ্যাধরী ও গন্ধর্ব্বকন্যাদের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীতে গঠিত প্রতিমূর্ত্তি। অলিন্দেরও প্রত্যেক চন্দ্রাতপে (ceiling) কোনোটিতে উৎকীর্ণ করা আছে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কমলকলির সঙ্গে কল্পলোকের ফুলকারি। কোনোটিতে ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী মেনকাদের লীলায়িত নৃত্য। কোনোটিতে তেত্রিশ কোটী দেবতাদের সমাবেশ ! রামায়ণ, মহাভারতের কত কাহিনীই না উৎকীর্ণ রয়েছে প্রত্যেক স্তম্ভ গাত্রে ! স্তরে স্তরে খোদিত আছে নানা বিচিত্র শিল্প কলার সুচারু পরিকল্পনার সঙ্গে—দেবাসুরের যুদ্ধ, সমুদ্রমন্থন, শিবতাণ্ডব, মদনভস্ম, মোহিনীরূপ ইত্যাদি নানা পৌরাণিক কাহিনীর মূর্ত্ত আলেখ্য মন্দিরটির সর্ব্বত্র ! যেদিকে চাইবে চোখ পড়বে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী,

গণপতি, কার্ত্তিকেয়, বীণাপাণি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, যক্ষ, বিদ্যাধর, কমলা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর নয়নাভিরাম দিব্য মূর্ত্তি। আর আছে—নিখুঁত বাস্তব রূপে গতিবেগ-সমুদ্ভাসিত ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবা, বৃষ, গরুড়, হংস,



প্রধান মন্দিরের চত্বরে



প্রথম জৈন তীর্থংকর—আদিনাথজীর মূর্ত্তি

মকর, ময়ূর, মৎস, মৃগ প্রভৃতি দেববাহন ও কল্পতরু, মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি দেবতরু। ধ্বজপতাকাসমন্বিত কত রথ, কত যুদ্ধরত সৈনিকের দল ও কিন্নর কিন্নরীর কমনীয় মূর্ত্তি।

বিমলশাহী মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে অম্বাদেবীর মন্দির। প্রবাদ যে এই অম্বাদেবীর মন্দিরটি অতীব প্রাচীন। বিমলশাহী মন্দির নির্ম্মিত হবার বহুপূর্ব্ব হ'তে এই মন্দিরটি এখানে ছিল। এই প্রাচীন মন্দিরটিকে অক্ষত রাখবার জন্যই নাকি বিমলশাহকে তাঁর মন্দিরের নক্সা বাধ্য হয়েই এইরূপ আয়তক্ষেত্রাকারে করতে হয়েছিল। অম্বাদেবীর মহার্ঘ বসনপারিপাট্য যে কোনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মন্দির দ্বারে এক ভৈরব মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, এক হাতে অসি আর এক হাতে সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। পাশেই একটি কুকুর রুধির পানের জন্য লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিমলশাহি মন্দির দেখে আমরা বেরিয়ে এলুম পার্শ্ববর্ত্তী বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি দেখতে।

এই উভয় মন্দিরের সংযোগস্থলে আছে বিমলশাহের হস্তীশালা। এই হস্তীশালার প্রবেশ পথে স্থাপিত আছে স্বয়ং বিমলশাহের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তি। হস্তীশালার মধ্যে দশটি বড় বড় মার্ব্বেল পাথরে তৈরী শ্বেত হস্তী রয়েছে। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে এক একজন আরোহী ছিল। তাদের অধিকাংশই আজ অদৃশ্য হয়েছে। কে বা কারা সেগুলি ভেঙে নিয়ে গেছে জানা নেই। পাছে বাকীগুলিও অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভয়ে হস্তীশালাটি আজকাল সুরক্ষিতভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে।

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি ১২৩১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়েছে। দ্বাবিংশতম জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথজীর নামে ধনী শ্রেষ্ঠী বাস্তুপালও তেজপাল দুই ভাই মিলে এই মন্দির স্থাপন করেছিলেন। প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর মন্দির যেমন বিগ্রহের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাতার নামে 'বিমলশাহী মন্দির' বলে পরিচিত, এ মন্দিরটিকেও তেমনি লোকে 'নেমিনাথের মন্দির' না বলে বাস্তুপাল তেজপালের মন্দির বলে।

এ মন্দিরটিরও প্রতি ইঞ্চি অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য শিল্পের পরিচয় বহন করছে। 'বিমলশাহী মন্দির' নির্ম্মাণের প্রায় দু'শো বছর পরে এই

বাস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরটি তৈরী হয়েছে, কিন্তু দেখলে মনে হয় দুটি মন্দিরই যেন একই শিল্পীর হাতে গড়া! দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ব্যবধানেও ভারতের অতুলনীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের যে এতটুকুও অবনতি ঘটেনি এটা বড় কম বিস্ময় ও গৌরবের কথা নয়! সব চেয়ে আশ্চর্য্য হ'তে হয় এই ভেবে যে, আবু পর্ব্বতের ধারে কাছে কোথাও মর্ম্মর-শিলার অস্তিত্ব মাত্র নেই! না জানি কত দূরদূরান্তর থেকে বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা এই মর্ম্মর প্রস্তর এত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল এবং সেগুলিকে টেনে তোলা হয়েছিল এই পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পর্ব্বতে উঠবার যে কোনও ভাল ও সুগম পথঘাট ছিলনা একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কেমন করে তাঁদের পক্ষে এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল ভেবে দিশেহারা হ'তে হয়। যে মন্দিরের এক একটি স্তম্ভ, এক একটি তোরণধনু, এক একটি গম্বুজ ও ছাদের নিম্নভাগের বিভক্ত ছত্রী বা চন্দ্রাতপগুলির অপরূপ ভাস্কর্য্য শিল্প ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে একটা পুরোদিনেও কুলিয়ে ওঠেনা, না জানি এ মন্দির শেষ করতে কতগুলি শিল্পীর কতকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করতে হয়েছিল!

নেমিনাথের মূর্ত্তিও মহামূল্য মণিরত্নালঙ্কারে ভূষিত। সর্ব্বত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে এত মূল্যবান রত্নাভরণে মণ্ডিত করে রাখার তাৎপর্য্য বা সার্থকতা, কিছু বুঝলুম না! জৈন ভক্তদের অস্বাভাবিক জহরপ্রীতি ছাড়া এ পুঞ্জ পুঞ্জ রত্নাঞ্জলির আর কি অর্থ হ'তে পারে?

পূর্ব্বেই বলেছি পরিকল্পনার দিক থেকে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দিরের সঙ্গে দু'শো বছর আগের তৈরী প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দিরের বিশেষ কোনও পার্থক্য চখে পড়ে না। তবে, এ মন্দিরটির গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ বা নাটমন্দির বিমলশাহী মন্দিরের চেয়ে বড় ও অনেকটা উঁচু, স্তম্ভগুলিও দীর্ঘতর, এবং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া জৈনধর্ম্ম পুরাণোক্ত কয়েকটি মূর্ত্তি ও দৃশ্যাবলীও উৎকীর্ণ আছে এর মন্দিরছত্র বা চন্দ্রাতপতলে। নানাদিক দিয়ে এ মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য আরও সুসঙ্গত, সাবলীল, সূক্ষ্ম রুচির পরিচায়ক এবং সুসম্পূর্ণ ও উন্নত ধরণের বলা চলে। সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীর নিয়ত অনুশীলনের ফলে ভাস্কর্য্য শিল্পের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের এ উৎকর্ষ লাভ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিকল্পনার কোনও নূতনত্ব না দেখতে পেয়ে বোঝা গেল এদের হাত এগিয়েছে, কিন্তু মাথা পিছিয়ে পড়ে আছে।

দিলবারা

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরাভ্যন্তরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য্য শিল্প বলা যায় মণ্ডপের চন্দ্রাতপতলে উৎকীর্ণ বসন্তোৎসবের একটি দৃশ্য। মধুঋতুর আবির্ভাবে মিলনব্যাকুল তরুণতরুণী যেন সারা প্রকৃতির আনন্দ স্পন্দনের সঙ্গে তাদের যৌবনের ছন্দকে বন্ধহীন করে মুক্তি দিয়েছে! ধনদাত্রী লক্ষ্মী ও জ্ঞানদাত্রী বাণীকে উপেক্ষা করে তারা ঋতুরাজ বসন্তের অনুগত হয়ে মন্মথের উপাসনায় প্রমত্ত!

অগণিত পশুপক্ষী, ফুলফল, মাল্য, মুকুট ইত্যাদি ছাড়া প্রসারিত বেদীপৃষ্ঠে বিবিধ ভঙ্গীতে অসি-চর্ম্ম-ধনুর্ধর অনেকগুলি বীর যোদ্ধার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

নেমিনাথের প্রধান মন্দিরের দু'পাশে দুটি বৃহৎ কুলুঙ্গী আকারের প্রাচীর গাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এ দুটির স্থানীয় নাম "দুরানী-জিঠানী-কি-আলিয়া"। প্রবাদ যে বাস্তুপাল ও তেজপাল দুই ভাইয়ের পত্নীদ্বয় তাঁদের নিজেদের অর্থকোষ থেকে সত্তর লক্ষ টাকা এক একজন ব্যয় করে এ দুটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। চমৎকার এর পরিকল্পনা। নিখুঁত এর গঠনভঙ্গী। আমরা দেখি আর ভাবি যে মন্দিরের দেওয়ালে দুটি কুলুঙ্গী নির্ম্মাণ করতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, সে মন্দিরটি গড়তে না জানি কত কোটী টাকাই ব্যয় হয়েছে!



মর্ম্মর মাল্য-তোরণ

বাস্তুপাল ও তেজপাল মন্দিরের আশ্চর্য্য নিদর্শনগুলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য বস্তু হ'চ্ছে—পাল ও মাস্তুল শোভিত সাগর-গামী সুদৃশ্য তরণী নিচয়! এই অর্ণবপোতগুলির অস্তিত্ব দর্শকদের কাছে এই কথাই সপ্রমাণ করে যে 'একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়!' কথাটা মিথ্যা নয়। নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধনী শ্রেষ্ঠী বাস্তুপাল ও তেজপাল হয়ত, সমুদ্রে বাণিজ্য জাহাজ ভাসিয়ে দেশ দেশান্তরে আমদানী-রপ্তানীর কারবার চালিয়েই এমন অগাধ অর্থশালী হয়েছিলেন, যে অর্থ বলে শ্রেষ্ঠী বিমলশাহের মতো তাঁরাও একদিন রাজা বীরধবলের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিলেন।

বিমলশাহী মন্দির ও বাস্তুপাল-তেজপাল মন্দির, দিলবারার পরম বিস্ময়কর এই দুটি মন্দির দেখে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভারতীয় শিল্পকলার একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ফার্গুসান্ সাহেব স্থাপত্য কলাও ভাস্কর্য্য সৌন্দর্য্যের তুলনামূলক বিচারে কোনটি অধিকতর সুন্দর বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"Were twenty persons asked which of these two temples is the more beautiful, a large majority would, I think, give their vote in favour of the more modern one, which is rich and exhuberant in ornament to an extent not easily conceived by one not familiar with the usual forms of Hindu Architecture.……I prefer infinitely the former, but I believe that nine tenths of of those that go over the building prefer the latter."



একটি স্তম্ভের কারুকার্য

সুতরাং কোনটি বেশী ভালো, এ বিচার আমাদের মতো আনাড়ীদের না করাই ভালো।

বাকী আর তিনটি মন্দিরের একটি হ'ল 'চৌমুখীজীর'র ত্রিতল মন্দির। এ মন্দিরের মর্ম্মর স্তম্ভগুলির ও উৎকীর্ণ মূর্ত্তি কয়েকটি স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্য শিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয়টি 'শান্তিনাথজী'র মন্দির, আর তৃতীয়টি বাচ্ছাশাহী মন্দির। এ ছাড়া দিগম্বর জৈনদেরও একটি মন্দির আছে। কিন্তু, শেষোক্ত গুলির মধ্যে স্থাপত্য কলা বা ভাস্কর্য্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নিদর্শন পাইনি।

অচলগড়

দিলবারা মন্দিরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে যেন আমাদের আশা আর মিটছিল না। কিন্তু শিল্পীর মূর্ত্তকল্পনার সেই মর্ম্মর-স্বর্গ ছেড়ে আমাদের আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতেই হল। গাইড স্মরণ করিয়ে দিলে ৬টার ঘণ্টা পড়ে গেছে। আমাদের এতক্ষণ সেদিকে কোনও খেয়ালই ছিল না।

মন্দিরের বাইরে পা দিতেই নবনীতা বললে—তৃষ্ণা পেয়েছে। জল খাবো।

তাকে ধমক দিয়ে তৃষ্ণা ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। এই পাহাড়ের মন্দির-চত্বরে জল কোথা পাবো?

গাইড বললে—খুব ভাল জল পাওয়া যায়। একটু অপেক্ষা করুন, এখনি এনে দিচ্ছি।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি বড় পিতলের গ্লাস ভর্ত্তি জল নিয়ে এল সে। পার্ব্বত্য কূপের সুশীতল পানীয়। খুকুকে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই জল পান করতে দেখে আমরা সকলেই পিপাসা বোধ করলুম।

একে একে সকলকেই গাইড আমাদের জলদানে তৃপ্ত ক'রে বখ্শিসের মাত্রাটা বাড়িয়ে নিলে।

আমরা দ্বার-রক্ষীর নিকট গিয়ে আমাদের গচ্ছিত সমস্ত চর্ম্ম-সম্পদ যে-যার বুঝে ফেরত নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

মন্দিরের নির্গমন পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পৌঁছে দেখি, একটি চমৎকার চা'য়ের আড্ডা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দলের চা-চাতকদের গতি সেখানে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মন্দিরের প্রবেশপথে এটির অস্তিত্ব কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কারণ, মন্দিরের আগম-নির্গমের পথ দু'টি ভিন্ন। মন্দিরের মধ্যে দেখা হয়েছিল যাঁদের সঙ্গে সেই পার্শী পুরুষ ও মহিলার দল এবং কয়েকজন গুজরাটি সহযাত্রী সেখানে ইতিমধ্যে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল।

চা পানের অবসরক্ষণে তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় হল। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর এবং কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। নোয়াখালি ত্রিপুরা চাঁদপুরের খবর তখন সারাভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার ১৬ই আগষ্ট ও ২৬শে অক্টোবরের হাঙ্গামাও তাঁদের কাণে পৌঁছেচে। তাঁদের সঙ্গে অল্প আলোচনায় বুঝলাম বাংলাদেশের বুকে যে মর্ম্মন্তুদ আঘাত বেজেছে, তার গুরুবেদনার রক্তাক্ত তরঙ্গ সুদূর রাজপুতানার এই প্রত্যন্ত সীমার মানুষগুলিকেও বিচলিত করে তুলেছে। অখণ্ড ভারতের এই আত্মিক যোগ, এই অন্তরের ঐক্যের আন্তরিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলুম। মনের মধ্যে গুঞ্জন করে উঠলো—

"…ইঙ্গিতে এনেছ বহে তুমি—
খণ্ড নহে এ ভারত, অখণ্ড এ মানবের মহাজন্মভূমি!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত মিথ্যারে করেছে বরণীয়,
মানুষ নহেক পর, পরস্পর পরম আত্মীয়!

জাতিধর্ম্ম নহে তার আপনার সত্য পরিচয়,
প্রাণের অন্তর্লোকে মানুষ কোথাও ভিন্ন নয়।
ভিন্ন জাতি—ভিন্ন ভাষা—ভিন্ন বর্ণ—বাহিরের রূপ ;
মানুষের দেশ নহে মৃত্তিকার তলে খণ্ড ক্ষুদ্র মণ্ডূকের কূপ !"

আমরা বহুদিন দেশছাড়া। বললুম—হালের খবর সঠিক জানিনা। আপনাদের মতোই সংবাদপত্র থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি তাই আমাদের পুঁজি। তবে ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু আছে। তারই সঠিক বিবরণ তাঁদের কিছু কিছু শোনালুম।

সমস্ত শ্রোতার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় আরক্তিম হয়ে উঠতে দেখেছি। অসীম সহানুভূতি ও সমবেদনা ফুটে উঠেছিল তাদের বিস্মিত ও বিস্ফারিত চোখে।

আমাদের গাড়ী এসে হয়ত অপেক্ষা করছে ভেবে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ঘনঘন হর্ণ দিয়ে বাস্‌ওয়ালারা যাত্রীদের ডাক দিচ্ছিল। তারাও ছুটোছুটি করে এসে যে যার সব বাসে উঠে পড়লো। ওদের বাস ছেড়ে দিলে। মেয়েরা হেসে রুমাল নেড়ে বাসের জানালা থেকে বিদায় জানালে। ছেলেরা হাত নেড়ে জানালে—চললুম।

যাত্রী নিয়ে সেদিন দিলবারায় দুখানি বাস এসেছিল। দুখানিই বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ীর তখনও দেখা নেই।

যাঁরা পায়ে হেঁটে এসেছিলেন তাঁরা পদব্রজেই রওনা হলেন। পড়ে রইলুম শুধু আমরা। অর্থাৎ আমাদের দল এবং আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত, তাঁদের বৃদ্ধা জননী এবং দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু !

সন্ধ্যা দ্রুত এগিয়ে এসেছে। পাহাড়ের উপর হঠাৎ ঝপ ক'রে অন্ধকার হয়ে যায় ! এদিকের পথে আলো নেই। আবুশহরের সীমানা পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক আছে, তারপর অন্ধকার ; শ্রীমতী গুপ্ত ফেরবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিশু দুটির খাবার সময় হয়েছে, এখনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়বে। রাত্রে এই খোলা পার্ব্বত্য পথে ঠাণ্ডা লেগে যাবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বললেন—মা বুড়োমানুষ, উনি থাকুন আপনাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাবেন। আমি আর উনি ছেলেদের নিয়ে হেঁটে চলে যাই।

বললুম—পাহাড়ী পথ প্রায় দেড় মাইল দু'মাইল হবে। ছেলেদের কোলে নিয়ে এতটা রাস্তা হাঁটতে পারবেন কি ? কষ্ট হবে যে !

শ্রীযুক্ত গুপ্ত হেসে বললেন—"সেদিন সানসেট্ পয়েণ্টে হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরে ওঁর সাহস বেড়ে গেছে। এখন পথচলার প্রতিযোগিতায় উনি আপনাদের সকলকে হারিয়ে দিতে পারবেন।"

শ্রীমতী গুপ্ত বললেন—দেড়মাইল দু'মাইল অনায়াসে যেতে পারবো এ বিশ্বাস নিজের উপর আছে—বলতে বলতে ছোট বাচ্ছাটিকে নবনীতার হেপাজাত থেকে কোলে তুলে নিলেন এবং তারই মাত্র বৎসরাধিক কালের অগ্রজ বড় শিশুটিকে স্বামীর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত অগ্রসর হলেন।

যতক্ষণ দেখা যায় আমরা সবিস্ময়ে এই দুঃসাহসী তরুণ যাত্রী দম্পতির দিকে চেয়েছিলুম।

একটা পথের বাঁকে তাঁরা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ফিরে দেখি সেখানে আমরা শুধু একা। মন্দিরপথ ইতিমধ্যেই একেবারে নিস্তব্ধনির্জ্জন হয়ে পড়েছে।

আমাদের গাড়ীর তখনও কোনও চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। বললুম—



পথ প্রদর্শিকা

—চলো, এখানে এভাবে অপেক্ষা করা আর নিরাপদ নয়। এখনি অন্ধকার নেমে আসবে। অল্পদূর গেলই আমরা 'সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর মোটর ষ্টেশন পাবো। সেখানে গিয়ে আবু মোটর সার্ভিস-ওয়ালাদের ফোন্ করে দিইগে গাড়ী পাঠাবার জন্য।

মহা উৎসাহে আমরা সবাই অগ্রসর হলুম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সিরোহী বাস্ ষ্টেশনে এসে পড়া গেল।

যাক্ ! নিশ্চিন্ত। এইবার একটা ব্যবস্থা হবে। আমাদের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা না ক'রে এঁদের একখানা গাড়ী নিয়েই চলে যাওয়া যাবে।

ক্রমশঃ

খয়রাগড়ের পুরাকীর্ত্তি

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

"সাহেব ভার্গব ঋষিনে কহাথা হাম্ সরযূকা উস্তরফ চলে যানেসে সহর উলট যায়গা। লেকিন উনোনে যব পৌঁছা সহর খাড়া রহে গৈ। ইধারকা 'চণ্ডাল' হাঁসনে সুরু কিয়া। তব ঋষিজীনে কহা চেলাকো মেরে আশ্রম পর কুছ্ ছোড়কর আয়াহৈ। চেলা আকে দেখা লোটা পড়া হায়। লোটা লেকে চেলা যব নদীপর পৌঁছা, আর সহর তমাম উলট গৈয়া।" (অর্থাৎ সাহেব—ভার্গব ঋষি বলিয়াছিলেন যে তিনি সরযূর পারে পৌঁছিবার পর পাপের ভারে সহর উল্টাইয়া যাইবে। পাষণ্ড প্রকৃতির নাগরিকরা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ভার্গব তখন তাহার জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমার মনে হয়



খয়রাগড়ের সূর্য্যমূর্ত্তি

আমি কোন বস্তু ফেলিয়া আসিয়াছি। শিষ্য আসিয়া দেখিল যে, তাঁহার ঘটি আসনে পড়িয়া আছে। ঘটি লইয়া শিষ্য সরযূর পরপারে পৌঁছিলে পর নগর ভূমিসাৎ হইল।) খয়রাগড় বালিয়া জেলার অন্তর্গত গণ্ডগ্রাম। ঋষি ভার্গবের জন্মস্থান। সম্মুখে খরস্রোতা সরযূ প্রবাহিতা। দিগ্বলয়ে রংয়ের ক্ষীণ রেখা। প্রভাতের তরুণ তপন তখন চক্রবালের উপর উঠেন নাই। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত যব, গম ও অড়হর ক্ষেত। দূরে নদীবক্ষে বালুচর, সুষুপ্তিমগ্ন অতিকায় জীবের ছায় দৃশ্যমান।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর তখনও পূর্ণবেগে চলিতেছে। সমরকালীন অতি কষ্টলব্ধ ছুটী যাপন করিবার জন্য, গাঙ্গেয় প্রদেশের একান্তে অবস্থিত, অর্দ্ধলুপ্ত সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে আসিয়াছিলাম। জাতির উত্থান, প্রগতি ও পতনের সহিত, সমতলে পা ফেলিয়া জাতীয় কৃষ্টি চলে। যখন শৌর্য্যসম্পন্ন জাতি, বৈদেশিক শত্রু হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া, স্বরাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত করে, তখন দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নতির চরম সীমায় নীত হয়। সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী, অর্থশালী বণিক সম্প্রদায়, সুশিক্ষিত নাগরিক, জাতির বৈভবের পরিচয় প্রদান করে। ভারতের গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস এই মহাসত্যের সাক্ষ্য দেয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবস্থিতিকালে, প্রাচীন কোশল, মগধ, অনুগঙ্গা, প্রয়াগ, অন্তর্বেদী, অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ়া, পুণ্ড্র,



খয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে গণ্ডকশালা

ঠিক এই কারণে সুদৃশ্য নগরীসমূহে সুশোভিত হইয়াছিল। সেই সময়ে পুণ্যতোয়া সরযূর পূর্ব্বতীরে এই নগরীর অবস্থিতি ছিল। সাধারণ অনুসন্ধানে ইহার যে ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। আত্মবিস্মৃত জাতি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় ও দর্শনের আলোচনায় মগ্ন হইয়া, অসার সংসারের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সুতরাং এই মহাজাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা আয়াসসাধ্য নহে। সেইজন্য, ভারতের ইতিহাসবেত্তাগণ পাথুরে ঐতিহাসিকে পরিণত হইয়াছেন। কারণ কাব্য, পুরাণ বর্ণিত অলিক উপাখ্যানসমূহের উপর বিস্মৃতপ্রায় জাতীয় ইতিহাসকে দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কল্পনার উদ্দাম বেগ ইহার পবিত্রতা

নষ্ট করে। সেইজন্য মৃন্ময় পাত্র, পাষাণ লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি ইতিহাসের উপকরণ।

খয়রাগড়ের যে ভাগ এখন সরযূর তীরে অবস্থিত সেই স্থল এখন নদীগর্ভ হইতে একুশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। খরস্রোতা নদীর স্বচ্ছন্দ গতি ইহার তটভূমি প্রতি বৎসর গ্রাস করিতেছে। তাহার ফলে ভূগর্ভস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ নদী তীরে দৃষ্ট হয়। হর্ম্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষ, পয়ঃপ্রণালী, কূপ, গণ্ডকশালা, প্রভৃতি নদীর স্রোতে মানবদৃষ্টি গোচর হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্ন স্তরে, মৌর্য্য যুগের কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল পালিশযুক্ত মৃৎপাত্রের খণ্ড প্রমাণ করে যে, এই নগরের ভিত্তি প্রাক-মৌর্য্যকালে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও মৌর্য্যকালে বোধহয় হইয়াছিল। তাহার পর ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহা বর্ত্তমান ছিল। শুঙ্গ যুগে নির্ম্মিত মৃৎপাত্রের চক্র, শুষ্কপ্রায় সরযূ গর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কুষাণ যুগের শেষার্দ্ধে কিংবা গুপ্ত যুগের প্রথমাংশে নির্ম্মিত একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাচীন খয়রাগড়ের সুরুচির পরিচয় দেয়। ইহা ব্যতীত প্রাকার সদৃশ খয়রাগড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত, মৃৎপাত্রের খণ্ড গুপ্তযুগের বৈভবের পরিচায়ক। সরযূর তীর দিয়া অর্দ্ধ মাইল গমনের পর আমরা একস্থলে নীত হইয়াছিলাম, যেখানে পর্ব্বত প্রমাণ প্রায় ২১ ফিটউচ্চ, পশুর কঙ্কাল রাশি দৃষ্টিগোচর হইল। অনুমিত হয় সহরের একান্তে অবস্থিত এই অংশ অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক 'মশান' রূপে ব্যবহৃত হইত এবং বৎসরের পর বৎসর এই স্থলে মৃত জন্তুর মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইবার পর, মধ্যযুগে ক্ষীয়মান সহরের একাংশ বোধহয় ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ ১৮ ফিট মাটির উপরে দুই সারি ইটের অবস্থিতি প্রমাণ করে যে ধ্বংসাবশেষের অন্য স্থলে অবস্থিত বিভিন্ন হর্ম্ম্যরাজির ন্যায়, এই অংশ অধিককাল বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে অট্টালিকা শ্রেণীর বিভিন্ন স্তর দৃষ্ট হইত।



সরযূ গর্ভ হইতে খয়রাগড়ের ধ্বংসাবশেষ

মুসলমান যুগের কোনও নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই। অতীতের কোন সময়ে এই সহরবাসীদের ভাগ্যে প্রলয় বিষাণ একবার বাজিয়াছিল। সহরের অবস্থানকালে সরযূ নদী পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেন, হঠাৎ কোন কারণে, হয়ত প্রাবৃটের কোন অত্যধিক বারিপাতে, বিক্ষুব্ধ হৃদয় সরযূর তরঙ্গমালা নূতন পথের অনুসন্ধানে চেষ্টিত হইয়াছিল। গাঙ্গেয় প্রদেশে, নদী ও নদের এই গতি পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে। গঙ্গার পলি মাটিতে উৎপন্ন ভূমি বর্ষার স্ফীত ফেনিল জলরাশির উদ্দাম বেগ বাধা প্রদান করিবার ক্ষমতা লাভ করে নাই। সেইজন্য, ইহার বক্ষে অবস্থিত বহু নগর ও নগরীর অকস্মাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সমৃদ্ধশালী জনাকীর্ণ নগরী এক রাত্রেই ধরণীর বক্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। নদ ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু বহু বন্দর বিত্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। গাঙ্গেয় প্রদেশের বিভিন্ন নদী সমূহের মধ্যে পদ্মার ন্যায় খরস্রোতা এবং দামোদরের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নদী, সরযূর ন্যায় একটীও নাই। ইহার প্রধান কারণ যে, গতিবেগধৌত বালুকণা ও মৃত্তিকারাশি ইহার গর্ভকে মজাইয়া দেয়। সুতরাং অর্দ্ধপূর্ণ গর্ভে প্রতিহত হইয়া ইহার বারিরাশি নূতন নূতন পন্থা অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হয়। ঠিক এই কারণে অতীতের কোন অজ্ঞাত দিনে ক্ষুব্ধ সরযূর তরঙ্গমালা ইহার পশ্চিমভাগের খাত পরিত্যাগ করিয়া, ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত আর একটি প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করে। ফলে প্রাচীন নগরটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় এবং মধ্যভাগে প্রচণ্ড নদী প্রবাহিত হইতে থাকে ; তাহারই জন্য নগরীর উত্তরাংশ এখন গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ভাগলপুর নামক গণ্ডগ্রাম হিসাবে পরিচিত। অপরার্দ্ধ বালিয়া জেলার খয়রাগড় নামে খ্যাত। সরযূর পরিত্যক্ত গর্ভে এখন কৃষক কুলের যব, গম, ডাল উৎপন্ন হয়। যে সকল অংশ বর্ষায় প্লাবিত হইয়া যায় সেই সকল অংশে ধান্য জন্মায়। তাহার অনতিদূরে শ্যামশস্পাচ্ছাদিত ক্ষেত্রসমূহ, বোধহয় প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। খনন ব্যতীত ইহার উদ্ধার অসম্ভব। পুরাতন স্মৃতিচিহ্ন তিন মাইল অবস্থিত তুর্তিপার নামক গ্রাম পর্য্যন্ত

বিস্মৃত। যদি সরযূর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার দ্বারা গ্রাসিত হইবার পূর্ব্বে ইহার খনন সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে হয়ত প্রাচীন মগধের প্রাদেশিক কৃষ্টির অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগে তুর্তিপারের কাঁসার বাসন যুক্তপ্রদেশের একটি মহামূল্য বস্তু ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত খাগড়ার শিল্পগুলির ন্যায় ইহাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোরাদাবাদ জেলায় নির্ম্মিত বাসন জনপ্রিয় হইবার পূর্ব্বে তুর্তিপারের শিল্প সম্ভার খরস্রোতা সরযূর সাহায্যে, নৌকা দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। যন্ত্র যুগে যন্ত্র দানব কেবল মানুষগুলোকে পশুত্বে পরিণত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের আহার্য্যও কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার দ্বারা যন্ত্র



মৃত্তিকা-স্তূপের মধ্যে ইষ্টকপ্রাকার—খয়রাগড়, বালিয়া

নির্ম্মিত বস্তু মানবীয় শ্রমে উৎপন্ন বস্তু অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রিত হয়। উনবিংশশতাব্দীর ভারতবর্ষীয়গণ স্বদেশী শিল্পের মূল্য বুঝিতেন না। তাহার ফলে তুর্তিপারের অন্নহীন, বস্ত্রহীন কাঁসারী কুল, সমাজতন্ত্রবাদী হইয়া দেশউদ্ধারে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে।

খয়রাগড়ের সূর্য্যমূর্ত্তিটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া ধরিলে অত্যুক্তি হইবে না। সূর্য্যপূজা আর্য্যাবর্ত্তে স্মরনাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋকবেদে সূর্য্যদেবের বহুল উল্লেখ আছে কিন্তু তখন সূর্য্যমূর্ত্তি ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সন্দিহান। বৈদিক আর্য্যেরা বোধহয় সূর্য্যগ্রহের উপাসনা করিতেন; হয়ত বৈদিক সভ্যতার শেষ যুগে চক্রাকার পিত্তল অথবা স্বর্ণখণ্ড দেবালয়ে পূজিত হইত। অনুমিত হয় যে খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দীতে উত্তর দিকস্থ কোনও দেশ হইতে সম্ভবতঃ শকস্থান হইতে সূর্য্যমূর্ত্তি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। পুরাণে এবং শিল্পশাস্ত্রে ইহার বেশ উল্লেখ আছে। ইহার পূজা শাকদ্বীপী নামক এক সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ হারজফেল্ডের মতে শাকস্থানের বর্ত্তমান নাম 'সিস্তান'। সর্ব্ব প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি পুণা জেলার অন্তর্গত ভাজা নামক গিরিগুহায় খোদিত হইয়াছিল। অনন্তগুম্ফা ও লাহুলের সূর্য্যমূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য। ভারতে কুষাণ অধিকারের সময় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ক্রমাবর্ত্তনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। প্রায় চারিশত বৎসর বিভিন্ন যবন জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবার পর উত্তরপথে এক নবযুগ সূচিত হইয়াছিল। পুরাণে আমরা যে সব মূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করি, সে সকল তখন লিখিত হয় নাই। সুতরাং কুষাণ যুগের মূর্ত্তিতত্ত্ব পুরাণের মূর্ত্তিতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন। এই মহাসত্যের প্রথম প্রমাণ ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাগোড রাজ্যের অন্তর্গত ভূমারার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিস্কৃত করেন (Siva temple at Bhumara M.A. S. I. no 16) রাজঘাটে প্রাপ্ত ১৫৭ গুপ্তাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর অবতার মূর্ত্তি বিশ্লেষণ করিবার সময় ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ত্তমান লেখক দেন। (Journal of the G. N. J. Research Institute, vol. iii, pp, 1-9.) খয়রাগড়ের মূর্ত্তিটি এ বিষয়ে যথেষ্ট মূল্যবান।

ইহা একটি দণ্ডায়মান সূর্য্যমূর্ত্তি। চুণারের বেলেপাথরে খোদিত; ভাস্বরের একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি অনন্যসাধারণ মনোহর দেবমূর্ত্তি; সর্ব্ব অবয়বে কৈশরের কমনীয়তা রূপকারের দক্ষতা অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহার পরিচ্ছদ উত্তরাপথবাসীর ন্যায়। মস্তকে করণ্ডমুকুট, কয়েকগুচ্ছ কেশ গণ্ডের দুইপার্শ্বে দিয়া স্কন্ধদেশে ক্রীড়া করিতেছে। দীর্ঘউন্নত নাসা। গলদেশে রত্নমালা। মূর্ত্তির দুই হস্তে সমৃণালপদ্ম। চরণ দুইটি পাদুকায় আচ্ছাদিত। দুই পার্শ্বে দণ্ডী এবং পিঙ্গল। নানা কারণে মূর্ত্তিটি গুপ্ত যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। প্রথম ইহার তক্ষণ রীতি। দ্বিতীয় ইহার 'কাক পক্ষের' ন্যায় কেশের ব্যবস্থা আমাদের ভারতকলাভবনে রক্ষিত কার্ত্তিকেয় এবং গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণ এবং সারনাথে রক্ষিত অর্দ্ধভগ্ন মৈত্রেয় মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অপূর্ব্ব লালিত্য এবং ভাবের অনবদ্য অভিব্যক্তি গুপ্ত যুগের বৈশিষ্ট্য। ভক্তিভাবের প্রভাব আমাদের দেশীয় শিল্প সমূহে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল—এইমূর্ত্তি তার অন্যতম প্রমাণ।



বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেগতিক দেখে সান্ত্বনা বললে—"বেশ তো এত আপত্তি যখন, আপনার ঘরে না হয় না-ই নিয়ে গেলাম। কিন্তু ঝুনুসোনার শোবার ব্যবস্থা করে দিন একটু"

"ঝুনুসোনা! ওই কুকুরের নাম নাকি"

"হ্যাঁ। রাত্রে কোথায় রাখি একে"

"পিছনে একটা পোড়ো গোয়াল আছে তাতেই থাকতে পারবে স্বচ্ছন্দে"

"বেচারা!"

ঝুনুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গোঁসাইজি বললেন, "গোয়ালের কোনে খড়ও আছে কিছু। খাসা থাকবে। আপনাদের বিছানায় ঢুকে গুঁতোগুঁতি করার চেয়ে আরামে থাকবে। কি আপদ"

ঝুনুর লোমে হাত বুলিয়ে একটু অবাদারের সুরে সান্ত্বনা শেষ চেষ্টা করলে আর একবার।

"একা থাকা অভ্যেস নেই, কাঁদবে হয়তো"

"কাঁদুক। গোয়াল ঘর থেকে ওর কান্না শোনা যাবে না"

"আমাদের ঘরের মেঝেতে যদি শোয়াই?"

"না, শোবার ঘরে আমি কুকুর ঢুকতে দেব না। ফদকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে ওটাকে গোয়ালঘরে রেখে আসুক গিয়ে। আর আপনি অ্যাডমিশন রেজিস্টারে নাম সই করে' তবে শুতে যাবেন"

কমানো বাতিটা উসকে দিয়ে সুশোভনের দিকে চেয়ে গোঁসাইজি ফদকাকে ডাকতে গেলেন।

"দেখ সান্ত্বনা, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তোমার স্বামীর নাম আমি জাল করতে পারব না। সীমা অতিক্রম করছে"

"বেশ, আমিই লিখে দিচ্ছি। অর্দ্ধাঙ্গিনীর আশা করি স্বামীর নামে নিজেকে চালাবার অধিকার আছে, অর্দ্ধেক অধিকার অন্তত থাকা উচিত আইনত"

"নিশ্চয়"

"খাতাটা কোথা—"

"এই যে। তবে আমি আর এক কাজ করলেও পারি। এমনভাবে হিজিবিজি করে' লিখে দিতে পারি যে কাউকে আর তা পড়তে হবে না"

"দরকার নেই, আমিই লিখে দিচ্ছি"

খাতাটা খুলে সান্ত্বনা লিখতে লাগল।

"ব্রজেশ্বর দে: তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর—বাস্"

"নামের পর উইদিন ব্র্যাকেট লেখ কংগ্রেস কর্ম্মী। না লিখলে ভয়ানক কাণ্ড করবে"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে তাও লিখে দিলে।

"রুম নম্বরের ঘরে কি লিখি? নম্বর তো জানি না"

"চেপে যাও"

চেপে যাওয়ার কিন্তু উপায় রইল না। কলমটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজি এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রবেশ করেই ঝুঁকে অ্যাডমিশন রেজিষ্টারটি পর্য্যবেক্ষণ করলেন। তারপর সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন, "এই ঘরে লিখুন—টু। আপনাদের রুম নম্বর টু"

সুশোভন কলমটি তুলে ভালমানুষের মতো 'টু' লিখলে, তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে সলজ্জভাবে হাসলে একটু।

"ওরে ফদকা, কোথা গেলি আবার, কুকুরটাকে গোয়ালে রেখে আয়। কামড়াবে না তো"

"না ঝুমু ভারী লক্ষ্মী। আহা বেচারীকে কোথায় পাঠাচ্ছেন নির্ব্বাসনে"

বলা বাহুল্য সান্ত্বনার ঈষৎ আনুনাসিক আবদারমাখা এই অনুযোগে গোঁসাইজি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

ফদকা এসে ঝুমুকে নিয়ে চলে গেল। গোঁসাইজি ধূমাঙ্কিত হ্যারিকেনটি সুশোভনের দিকে তুলে ধরে' বললেন, "এবার তাহলে শুয়ে পড়ুন আপনারা। এটা নিয়ে যান, কমিয়ে রেখে দেবেন, তেল বেশী নেই। আপনারা ওঠেন কটায়?"

"আজ বোধহয় দেরি হবে উঠতে। সমস্ত দিন পরিশ্রান্ত আছি কি না"

"শুয়ে পড়ুন তাহলে, আর দেরি করবেন না"

হরিমটর হিন্দু পান্থনিবাসের রুম নম্বর 'টু'টি গঠনশিল্পের একটি অদ্ভুত দিনর্শন বলে' মনে হল সুশোভনের। দ্বারটি সঙ্কীর্ণ। এত সঙ্কীর্ণ যে দুজন লোকের পক্ষে পাশাপাশি ঢোকা অসম্ভব। জানালাগুলি চতুষ্কোণ ঘলঘলি বিশেষ। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত এবং অদ্ভুত উপায়ে এই ঘরের মধ্যেই বৃহদাকৃতি এত আসবাবপত্র সমাবিষ্ট হয়েছে যে মেজে বলে' কোনও কিছু আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে তা খাট আলমারি ড্রেসিং-টেবল প্রভৃতির মাঝে মাঝে গলির মতো জায়গা। সম্ভবত আসবাবপত্রগুলি খণ্ডীকৃত অবস্থায় ঘরে ঢুকিয়ে তারপর ফিট করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলির নিরেট চেহারা দেখলে সে সম্ভাবনার কথাও মন থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। মেজের অধিকাংশ স্থানই দখল করে' আছে জগদ্দল একটি ছাপ্পর খাট। মজবুত কাঁটাল কাঠের তৈরি। খাটের উপর আছে একটি গদি, গদির উপর একটি পাংশুবর্ণের চাদর। গদিটির প্রকৃত অবস্থা যে কি—তা চাদর না তুলেই স্থানে স্থানে উটের পিঠের মতো উঁচু উঁচু টিবিগুলি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ। দেওয়ালে ছবি ছিল। ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে নেওয়া দেব-দেবী মূর্ত্তি। বিছানার শিয়রের দিকে মজবুত-ফ্রেমে-বাঁধানো অন্য আর একটি বেশ বড় ছবিও ছিল অবশ্য—রুদ্রমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

সুশোভন এবং সান্ত্বনা পরস্পরের দিকে নীরবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর একসঙ্গে হেসে উঠল দু'জনেই। সুশোভন বলে উঠল—"বাপ্ স্ শুতে এসেও নিস্তার নেই। শিয়রের কাছে ওই দুর্ব্বাসা তর্জ্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কি সর্ব্বনাশ"

"শুনুন" সান্ত্বনা বললে, "গোঁসাইজি শুয়ে পড়লেই আপনি নেমে যান আস্তে আস্তে। যে ঘরটায় আমরা খেলাম সেই ঘরেই রাতটা কাটিয়ে-দিন কোনক্রমে। আশা করি আপনার খুব বেশী কষ্ট হবে না"

"তোমারও হবে না আশা করি। কিন্তু দেখ সান্ত্বনা, আমার খুব ভাল ঠেকছে না। ব্যাপার যদি গড়ায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে কিন্তু"

"কি যে বলেন! এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসছেই বা কে, আর এলেও এই হোটেলের খাতা উলটে দেখতেই বা যাচ্ছে কে। আর দেখলেই বা কি, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে এখানে একরাত্রি কাটিয়ে গেছি এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু জানতে পারলে কি ভাববেন"

"কি আবার ভাববেন, আমাদের কাণ্ড শুনে বড় জোর হাসবেন একটু"

"দেখ ঠিক তো"

"এটা ঠিক যে আপনি যা ভয় করছেন সে রকম কিছু তিনি মনে করবেন না। ব্যাপারটা বুঝবেন"

সান্ত্বনা ঘাড়টা একদিকে হেলিয়ে সুশোভনের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে' গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "আশা করি অনাতা দেবীও বুঝবেন"

"অনীতা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বাঃ নিশ্চয়ই সমস্ত শোনবার পর বুঝবে বই কি"

"বাস তবে তো মিটেই গেল। ব্যাপার গড়ালেই বা" সুশোভন তবু যেন কেমন নিশ্চিন্ত হল না।

"কিন্তু ওই দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিটি—ওই জগঝম্প না কি নাম ভদ্রলোকের—"

"সদারঙ্গবাবু? ওর জন্তে ভাবনা নেই। এর পর দেখা হলে সব খুলে বলব ওঁকে। খুশী হবেন, ভারী আমুদে লোক—"

"আমার কিন্তু দেখে মনে হল, উনি ঠিক সেই জাতীয়

বেকুব অথচ মহাপুরুষ লোক যাঁরা অস্থানে অকারণে অকার্য্য করে' অঘটন ঘটিয়ে বেড়ান। অর্থাৎ 'অ' এর অনুপ্রাস আরও অনুসরণ করলে বলতে হয় আস্ত একটি অজ। তাছাড়া আমার আর একটা সন্দেহ হচ্ছে, উনি অনীতা এবং অনীতার বাপের বাড়ির লোকেদের চেনেন। মনে হচ্ছে…"

"অনীতার বাপের বাড়ির লোকদের ?"

সান্ত্বনার অধরে মৃদু একটা হাসির ঢেউ উঠেই মিলিয়ে গেল।

"তা চিনলেই বা ক্ষতি কি। ওর জন্যে আপনার চিন্তা নেই। সদারঙ্গবাবু সব খুলে বললে তিনি কি বুঝবেন না? সে ভার আমার উপর রইল"

"তোমার জন্যেই আমার চিন্তা" সুশোভন বললে।

"চিন্তা করবার দরকার নেই তাহলে"—হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা—"আপনি বরং আস্তে আস্তে বেরিয়ে দেখুন একটু গোঁসাইজি শুলেন কি না। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, একটু হাত পা ছড়াতে পারলে বাঁচি"

কেবল সুশোভন এবং সান্ত্বনাই যে সদারঙ্গবিহারীলালের সম্বন্ধে চিন্তা করছিল তা নয়, গোঁসাইজিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। বাইরের কপাটে তালা লাগিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ক্ষণকাল। কি মনে হওয়াতে তালাটা খুললেন আবার। কপাট খুলে গলা বাড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে রইলেন। না, মোটরবাইকের কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গোয়াল ঘর থেকে ঝুনুর করুণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও শব্দ কানে এল না। কপাট বন্ধ করে' পুনরায় তালা লাগালেন এবং সম্ভবত: সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার জন্য বৈঠকখানা ঘরটাতেও তালা লাগিয়ে, তালাটা টেনে দেখে চাবির গোছাটি নিয়ে উপরে উঠে গেলেন নিজের শোয়ার ঘরে।

৯

সুশোভন সন্তর্পণে বাইরে এসে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খড়মের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোঁসাইজি উপরে উঠছেন। ঘরে ঢুকে কপাট বন্ধ করলেন। খিল দেওয়ার শব্দও পাওয়া গেল।

"ভদ্রলোক শুলেন বোধ হয় এবার, বুঝলে"—কপাটের বাইরে দাঁড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে এইটুকু জানিয়ে সুশোভন নীচে নেমে গেল। সান্ত্বনা ইতিমধ্যে অন্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। কাপড় চোপড় না ছেড়ে শুলে ঘুমই হয় না তার। যে সুটকেসটি সুশোভন বয়ে এনেছিল সেটি ফস্কা দিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। তার থেকে কাপড় ব্লাউজ প্রভৃতি বার করে' পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ সেমিজের বোতাম-খোলা-জাতীয় কাজগুলি সবে শেষ করেছে, এমন সময় কপাটের কাছে খুট করে শব্দ হল। এক লাফে সে একটা আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"কে সুশোভনবাবু"

"হ্যাঁ। আসব ভেতরে ?"

"না। আসবেন মানে ?"

"গত্যন্তর নেই"

"থামুন একটু তাহলে"

"বেশ"

"গত্যন্তর নেই মানে ? বুঝতে পারলাম না"

"যে ঘরে আমরা খেয়েছিলাম সে ঘরে শোওয়া যাবে না"

"কি যে বলেন"—সান্ত্বনার কণ্ঠস্বরে একটু উত্তাপ সঞ্চারিত হল যেন—"এর মধ্যেই কি করে' বুঝলেন যে শোওয়া যাবে না। মিনিট তিনেকও তো হয় নি এখনও। চেষ্টা করে' দেখুন ঠিক ঘুমুতে পারবেন"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করবার 'স্কোপ' নেই। গোঁসাইজি সে ঘরটিতে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিয়ে শুতে গেছেন। সে চাবি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বালিশের তলায়"

"ওমা, তাই না কি ? মুসকিল হল তো। কোথায় শোবেন তাহলে"

"তাই তো ভাবছি"

"করতেই হবে যা হোক একটা ব্যবস্থা। এ ঘরে তো আসা চলবে না"

"কপাটটা খুলি একটু ? একটু—"

"না"

"কথা কইবার সুবিধে হত। আর কিছু নয়"

"কথা ক'য়ে কাটাবেন না কি সারারাত"

"একটু খুলি কি বল। চোখ বুজে থাকছি না হয়। সামান্য একটু খুলতে আপত্তি কি"

"না, না যতক্ষণ না বলি খুলবেন না। দাঁড়ান না একটু। আমি কাপড় ছাড়ছি"

"উঃ কি যন্ত্রণা"

অস্ফুটকণ্ঠে বললে সুশোভন।

"সিঁড়ির উপরে গিয়ে একটু বসুন না, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হয় যদি"

"কতক্ষণ"

"মিনিট পাঁচেক"

"ঠিক করব কি করে', আমার হাত ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে"

"তাহলে এক থেকে পাঁচশ' পর্য্যন্ত গুনুন বসে বসে"

"বল কি। ছেলেবেলায় উদ্দালকের গল্প শুনেছিলাম, তাই করলে দেখছি শেষ পর্য্যন্ত"

"কি যে ছেলে মানুষি করছেন। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখুন"

"মাথা আমার ঠিকই আছে, তার জন্যে ভাবনা নেই"

"তাহলে অমন করছেন কেন, সিঁড়িতে বসুন গিয়ে"

"কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে একটা জোরে"

"সিঁড়ির উপরই কাটাতে হবে হয়তো আজ রাতটা। তবে ভিতরে এসে গল্প করতে পারেন একটু। একটু থামুন, আমি কাপড়টা ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ি তারপর আসবেন"

"গোঁসাইজি যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে দেখেন আমি সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে বসে' এক দুই গুণে যাচ্ছি, কি ভাববেন তিনি"

"ঢেউ দেখেই নৌকা ডোবাচ্ছেন কেন আগে থাকতে"

"নৌকাডুবির ব্যাপার যাতে না ঘটে, সেই চেষ্টাই তো করছি সকাল থেকে"

বিরক্ত হয়ে সুশোভন সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল। সিঁড়ির উপর বসে' একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে বেচারা। নৈশ-সমীরণ বাহিত হয়ে এই দীর্ঘনিশ্বাসটি যদি পূর্ব্বদিকে ভেসে যেত তাহলে আর একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হয়তো দেখা হত তার। কোলকাতায় তার বাড়ীর সিঁড়িতে বসে' অনীতাও ঠিক এই সময় দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করছিল।

······সিঁড়িতে বসে' বসে' সুশোভনের বাঁ পাটায় খাল ধরে' গেল। একটু চটেই উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণেও শোয়া হয় নি? হোক মেয়ে মানুষ······বিছানায় শুতে এত দেরী হবে······আশ্চর্য্য কাণ্ড! উঠে গিয়ে দুয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়ালে। কড়া নাড়তে এমন কি টোকা মারতেও ভয় করছিল। গোঁসাইজি যদি উঠে পড়েন। সান্ত্বনার কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করতেই—

"থামুন, হয় নি এখনও। বসুন না গিয়ে আর একটু—"

"আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি, তোমার যখন হবে বোলো"

"অত শব্দ কিসের"—পরমুহূর্ত্তেই প্রশ্ন করলে সে—"কি হল"

"আমি বিছানায় উঠছি। স্প্রিং দেওয়া গদি, তারই শব্দ"

"বাসন্তী শব্দ? বাবা!"

"বাসন্তী শব্দ মানে"

"বি-এ পাশ করেছ, স্প্রিং মানে বসন্ত জান না!"

"আসুন আপনি"

সান্ত্বনা বিছানার উপর বসেছিল। চুলটি আঁচড়ে শাদা শান্তিপুরে শাড়িটি পরে' বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। একটু সানুকম্প হাসি হেসে ডাগর চোখের দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে সে। সুশোভনের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হল শিল্প-সমালোচকের কৌতূহল। বিছানার একপ্রান্তে অনাহূতই বসল গিয়ে সে।

"কাপড় ছেড়ে বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে"

"তা হয়তো দেখাচ্ছে, কিন্তু এই কথা বলতেই আসেন নি আশা করি"

"না, না, কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সত্যিই তোমায় মানিয়েছে ভালো। তোমার প্রসাধন-রুচি সরল হলেও শিল্পীজনোচিত—"

"সমস্ত দিনের এত দুর্গতির পরও আপনার রসবোধ অক্লান্ত আছে দেখছি। আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে"

"বেশ তো ঘুমোও না, মানা করছে কে। সাদা শাড়িটা হঠাৎ ভাল লেগে গেল তাই বললাম। অনীতা কখখনো শাদা শাড়ি পরে না, ডগমগে রং ছাড়া পছন্দই হয় না তার। সেদিন একখানা শাড়ি কিনেছে মেরুন রংয়ের, সোনালি জরির পাড়-বসানো। জমকালো ব্যাপার। বললে বিশ্বাস করবে না, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে

যাবে বলে ছ'খানা শাড়ি নিয়েছে সবগুলোই রঙীণ, আর কোনটাই ফিকে রং নয়—"

সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' ঘাড়টা কাত করলে একটু।

"একটা কথা আপনার মনে রাখা উচিত। অনীতা যা করে, আপনাকে খুশি করবার জন্যেই করে। তার এত মাথা ঘামিয়ে শাড়ি পছন্দ করা যে এমন ভাবে মাঠে মারা গেছে তা বোধহয় বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না"

সুশোভনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। উসখুস করে' নড়ে' চড়ে' বসল সে।

"আমাকে কি তাহলে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঝুনুর সঙ্গে শুতে হবে?"

"তাই যান তবে। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে—"

সুশোভন নিজের ডান কানটা টানতে টানতে অভিনিবেশ সহকারে সান্ত্বনার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আচ্ছা, ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দুই এই ঘরের মেজেতে যদি একটু গড়িয়ে নি—

—"কি যে বলেন—"

"আচ্ছা, এ কি কুসংস্কার তোমাদের! আমি তোমাকে 'কারে' লিফ্‌ট্ দিলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে দোষ হয় না, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতেও দোষ নেই। কেবল এই মেজেতে শুলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে! আশ্চর্য্য! তোমার খাটের উপর পা তুলব না, সত্যি বলছি খাটের ত্রিসীমানায় যাব না"

"যা হয় না—হতে পারে না—তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন"

"কমরেডদের মধ্যেও হয় না? রাশিয়ায় তো হয় শুনেছি"

"এটা রাশিয়া নয়, বাংলা দেশ"

"ও"

সুশোভন নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। মাথার কাপড় সরে' গেছে খোঁপাটা এলিয়ে পড়েছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাকে। মনে হচ্ছিল একটা নিষ্ঠুর আনন্দে চোখ দুটো জলজল করছে তার। সত্যি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"আচ্ছা, চললাম তাহলে—"

"বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার—"

"হ্যাঁ, তোমার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে—"

"কি করব বলুন উপায় নেই। সমাজে বাস করি যখন, লোকাচার মেনে চলতেই হবে"

"এখন এই ঘরে সমাজ কোথায়। ঘণ্টা খানেক বড় জোর ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করলেই আমার—"

"না মাপ করুন সুশোভনবাবু। একবার এই করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছিলাম মনে নেই। আপনার তো মনে থাকা উচিত"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। বুঝেছি। আচ্ছা যাচ্ছি আমি। হ্যাঁ—ঠিক। কি বিপদ—আচ্ছা চলি—"

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

রূপসীর রূপ দেহের প্রদীপে
গরবের শিখা জ্বলে,
তারি উত্তাপে প্রেমের পাঁপড়ি
শুকায় চিত্ত তলে।

আর রূপহীনা রহিয়া অজানা
মৌন মিনতি গানে
প্রেমের পূজায় প্রাণের দেউলে
প্রিয়তমে টেনে আনে।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যে যুগল প্রতিভার প্রোজ্জ্বল আলোকে বিশ্বসভায় বিশ্বমানবের সম্মুখে দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবজ্ঞাত ভারতের প্রদীপ্ত মহিমা প্রভাসিত হইয়াছে, তাহার একটির কথা বিগত পৌষ মাসে "ভারতবর্ষে" লিখিয়া লেখনী ধন্য করিয়াছিলাম ; আজ অপরটির বেদীমূলে শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহ ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিবার মানস করিয়াছি। আষাঢ় সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রের নিচোলে যে বিজয়িনী নারীর বহুবর্ণরঞ্জিত সুশোভন প্রতিকৃতি শোভিত হইয়াছে,আমি আজ সেই মহীয়সী বিজয়লক্ষ্মীর কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি। জওহরলালজীর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, প্রয়াগতীর্থ-সন্নিকটস্থিত এই জনপদটিতে প্রতিভা ঠাকুরাণী অকৃপণ করে সর্ব্বস্ব দান করিয়া হরিশ্চন্দ্রের মত নিঃস্ব-রিক্তহস্তে বিদায় লইয়াছিলেন। নতুবা এক পরিবার মধ্যে, এক পিতামাতার অঙ্কে এই দিগ্বিজয়িনী প্রতিভাধিকারিণী পুত্র কন্যা, জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মী সম্ভব হইল কিরূপে ?

"ভাই" জওহর ও বিজয়লক্ষ্মীর মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। সেই দীর্ঘকাল নিঃসঙ্গ বালক জওহর একটি ভ্রাতার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল ; বারো বছর পরে ভাই না আসিয়া ভগ্নীর আগমনে জওহর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। জনৈক ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চাহিয়াছিলেন যে, এ তো ভালই হইল জওহর। তোমার ভাই হইলে তোমার পিতার ঐশ্বর্য্যের ভাগীদার হইত, তোমার ভাগ কমিয়া যাইত। ভগ্নী হওয়ায় পণ্ডিত মতিলালের ধনৈশ্বর্য্যের তুমিই একচ্ছত্রাধিপতি রহিলে। বারো বছরের বালক যে উত্তর দিয়াছিলেন সেই কথাগুলির মধ্যে আজিকার বিশ্ব-চিত্তজয়ী জওহরলালের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। জওহর বলিয়াছিলেন, আমি ধনৈশ্বর্য্যের লোভ রাখি না ! আমি একা ! ভাই হইলে আমার কেমন সঙ্গী হইত ! ডাক্তার আত্মসংশোধন করিয়া বলিলেন, তোমার সুন্দর বোনটিও তোমার সঙ্গী হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। শুধু যে বাল্যে খেলায়, কৈশোরে বিদ্যাশিক্ষায় সঙ্গিনী হইয়াছিল তাহা নহে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে, ভারতের সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয়েও "ভাই" জওহরের যোগ্য সঙ্গিনীরূপে বিজয়লক্ষ্মী আজ পৃথিবীর সুধী সমাজের শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন বৃটিশের বদ্ধকরপুটের মধ্য হইতে শাসনরশ্মি গ্রহণের সাধনায় সমাহিত, ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী তখন আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিধান-ভবনে বিশ্বের বিড়ম্বিত, চিরজীবন বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত নির্য্যাতীত মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিবেদিতপ্রাণ। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে একদা এক সৌম্যদর্শন তেজঃপুঞ্জ কলেবর ভারতীয় সন্ন্যাসী ভারতের উদার অত্যুদার হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া অন্ধ পৃথিবীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়াছিলেন, আর অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই সেদিন সেই আমেরিকাতেই নিপীড়িত ও নিগৃহীত কৃষ্ণকায় মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুমধুরভাষিণী ভারতনারী স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে যে আলোড়ন উদ্বেলিত করিলেন, তাহার তুলনা বিশ্বপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তনের প্রলয় যুগে বিশ্বেও বিরল। পৃথিবী ভারতবর্ষকে বৃটিশের চশমার সাহায্যে দেখিতেই অভ্যস্ত ; বৃটিশের প্রচারিত সত্যই বাইবেল, বেদ ও কোরাণ বলিয়া গৃহীত হইত ; ভারত ও ভারতবাসীর হিতার্থ বৃটিশ, অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষাদানার্থ বৃটিশ, অধঃপতিত ভারতবাসীর উন্নয়নকল্পে বৃটিশ বিষম গুরুভার বহন করিয়া পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেছে, পৃথিবী এই সংবাদই জ্ঞাত ছিল। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর অভিভাষণ শেষে পৃথিবী যেন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই বৃটিশের ও আফ্রিকার বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতবর্ষকে জয়মাল্য দিয়া স্বস্তি অনুভব করিল।

পণ্ডিত মতিলাল পুত্র কন্যাদের বিলাতী শিক্ষা দিয়াছিলেন। গান্ধী-যুগের পূর্ব্বে ভারতের ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সমাজে ইহা কৌলীন্যের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইত। বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর মুখেও শুনিয়াছি, বাল্যকালেও ভুল ইংরাজী শিখিলে অথবা উচ্চারণে দোষ ঘটিলে পিতার নিকট পুত্র কন্যার লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। ঐশ্বর্য্য-পালিত, বিলাসে লালিত মতিলালের পুত্র কন্যা যে বৃটিশের জেলের মধ্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিবে, নেয়ার-দড়ি বয়ন করিবে, কয়েদীর কদন্ন খাইয়া জীবনধারণ করিবে, সেকালে ইহা ছিল কল্পনারও অতীত। বিষ্ণুর চরণোত্থিত হইয়া, ব্রহ্মার কমণ্ডলু ভেদ করিয়া হরজটায় নৃত্য করিয়া হিমালয় শিখর হইতে ভাব-জাহ্নবীর ভীমপ্রবাহ ভীমগর্জ্জনে যেদিন ধরণীতল প্লাবিত করিল, সেদিন তাহাতে কেবল পুত্র-কন্যাই ভাসিয়া গেল না, মতিলালের মত পিতাও সে পুণ্য সলিলোচ্ছ্বাসে ইন্দ্রের ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেলেন।

নেহেরু বংশ কাশ্মীর হইতে সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের যশস্বী সপ্রু পরিবারও কাশ্মীরাগত ; যুক্তপ্রদেশের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী মোরার পণ্ডিত বংশও ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতবংশ কুলে শীলে সম্পদে ও সমৃদ্ধিতে নেহেরু বংশেরই সমতুল্য। মতিলাল এই পণ্ডিত পরিবারের রণজিৎ সুন্দরকে জামাতৃ নির্ব্বাচন করিয়া সুন্দরী সুরূপার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রণজিৎ ব্যারিষ্টারী করিয়া অর্থ ও যশঃ কতখানি অর্জ্জন করিয়াছিলেন জানি না, তবে ভারতের স্বাধীনতা রণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া অকালে আত্মদান করিয়া রণমৃত্যুর গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ত চোখের উপরেই দেখিয়াছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে, জওহরজায়া কমলা অকালে আত্মাহুতি দিয়া জওহরের গৃহ শূন্য

করিয়াছিলেন, সুন্দর, সুরূপ রণজিৎও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া ভরা যৌবনেই বিজয়লক্ষ্মীর জীবন তরণীর ভরাডুবি ঘটাইলেন। তিনটি কন্যা লইয়া বিজয়লক্ষ্মী বৈধব্য বরণ করিলেন। সংসার বন্ধনটুকু ছিন্ন হইল, বিজয়লক্ষ্মীর রাজনীতিতেই আত্ম নিমগন হইল।

১৯১৯ সাল হইতে ভারতে গান্ধীযুগ আরম্ভ। গান্ধীযুগ-প্রবর্ত্তিত অভিনব সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ত্যাগ ও ক্লেশ বরণই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্বীকৃত ও আদৃত হইয়াছে। শুধু স্বীকৃত হইয়াছে বলিলে কথা অসম্পূর্ণ থাকে, তাই আদৃত বলিলাম। আদৃত না হইলে কি উৎসাহে উল্লাসের প্লাবন আনিতে পারিত? আদৃত না হইলে কি আনন্দে হাসিমুখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অন্ধকারার দিকে অগণিত নরনারীর অসংখ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত? আদৃত না হইলে কি একমাত্র সন্তান জননীকে ফেলিয়া, পতি প্রিয়তমা পত্নীকে ছাড়িয়া, পিতা পুত্রকন্যা ফেলিয়া তীর্থযাত্রা করিত? কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করিবেই। রণজিৎ পণ্ডিতের মত সুখী ধনী পরিবারের যুবাপুরুষ বন্ধকারার কষ্ট যত হাসিমুখেই বরণ করিয়া লউক না কেন, দেহ ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিফলিত হইল। রণজিৎ সুন্দর তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত শ্যালকের মত এক কারাগারে একত্র অবস্থান করিয়াও কারা-ক্লেশকে পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া বিজয়গর্ব্বে আপনার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না; স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইল এবং শেষ বার, কারাগার হইতে যে ব্যাধি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতেই অকাল বিয়োগ ঘটিল। রণজিৎ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেরাদুন কারাভ্যন্তরে বসিয়া প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিনী কাব্যের ইংরাজী ও সহজ হিন্দী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শৌর্য্যের ও বীর্য্যের লীলাক্ষেত্র ভারতে রণমৃতের মরণ নাই, রণজিতও মৃত্যুঞ্জয়ী।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় ১৯৩৭ সালে ভারতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সময়েই সাধারণের গোচরীভূত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ত্যাগী সজ্জন লইয়াই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে, অকস্মাৎ কাণাঘুষায় বিজয়লক্ষ্মীর নামও শুনা গেল। অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কংগ্রেস বরাবর যোদ্ধজনোচিত কাঠিন্যের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে; মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে অনিচ্ছুক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাধাহীনতার সর্ত্ত আদায় করিয়া লইয়া তবে গভর্ণমেণ্ট গঠনে সম্মত হইয়াছে, সেই কঠিন কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় কোমলাঙ্গী নারীর স্থান হইতে পারে বলিয়া অনেকে ভাবিতেও পারেন নাই; কিন্তু যাঁহারা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নীতির মর্ম্মার্থ জানিতেন এবং নেহেরু পরিবারের পরিচয় অবগত ছিলেন তাঁহারা অবিশ্বাসের কারণ খুঁজিয়া পান নাই। বিজয়লক্ষ্মী স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব পরিচালনায় যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ছয় বৎসর কালের প্রলয়ের পরে পুনরায় প্রদেশে যখন গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব হইল তখন পূর্ব্বাধিকৃত আসন খানিতে এই লক্ষ্মী প্রতিমারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল।

গান্ধীজী ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার স্বাধীনতার অভিযানে তিনি গৃহিণী গৃহমুচ্যতে-গণকেও আহ্বান দিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই। মানুষের সংসার যেমন নারী ও পুরুষের সহযোগিতার ফলেই সুগঠিত হয়, মানুষের বৃহত্তর সংসার দেশকেও তিনি উভয়ের সহায়তাতেই গড়িতে চাহিয়াছিলেন। তাই চাহিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সরোজিনী দেবীকে পাইয়াছি, বিজয়লক্ষ্মীকে পাইয়াছি; কমলা নেহেরুকেও পাইয়াছিলাম। আমি একবার শ্রীমতী সরোজিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কবিকুঞ্জ হইতে কঠিন রাজনীতির ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িলেন কেমন করিয়া? উত্তরটি ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য বলিয়াই এ কথা এখানে বলিতে উদ্যত হইলাম। সরোজিনী বলিলেন, কি জানি, ঠিক বুঝিতে পারি না। তবে এইটুকু মনে আছে গান্ধীজী যখন নিপীড়িত মনুষ্যত্বের জন্য অশ্রু মোচন করিলেন, আমার মধ্যেকার মনুষ্যত্ব বোধ হয় কাঁদিয়াছিল; নির্য্যাতীত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে গান্ধীজী যখন শঙ্খধ্বনি করিলেন, আমার অন্তরের সদ্যজাগ্রত মনুষ্যত্ব বুঝি বা তূর্য্যনাদে মাতিয়া উঠিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, বৃটিশের কারাগারে শুইয়া আছি। বিজয়লক্ষ্মীর উত্তর আরও মধুর।

"বাবা ভাইকে (বিজয়লক্ষ্মী জওহরলালকে দাদা বলেন কি-না জানি না, আমাদের সঙ্গে আলাপে 'ভাই' 'ভাই'-ই ত শুনি!) ও আমাদের একই রকম শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম শিক্ষা মানুষ হইবার; দ্বিতীয় শিক্ষা পৌরুষ অর্জ্জনের। কাজেই দেশের পুরুষ সব যখন কারাভ্যন্তরে তখন নারীর অন্তরমধ্যে আহত পৌরুষ গর্জ্জন করিয়া বলিত, দেশ ত তোরও, তুইও ত দেশের! তবে? এই 'তবে'র উত্তর কমলা-বৌদি ভালই দিয়াছেন, আমরাও দিতে চেষ্টা করিয়াছি। চমক ভাঙ্গিতে দেখি, নইনী জেলে। নইনী বাড়ীর কাছে, চেনা যায়গা। বেশ আনন্দ। ভারতবর্ষে জেলের বাহিরে ও ভিতরে পার্থক্যই বা কতটুকু যে জেল যাইতে ভয় হইবে? সমস্ত ভারতবর্ষই ত জেলখানা। বৃটিশের বিরুদ্ধে একটি সত্য কথা বলিয়াও যখন অব্যাহতি নাই, তখন জেলের ভিতরে থাকাও যা, বাহিরে থাকাও ত তাই।"

যুদ্ধাবসানে বিশ্ববিধান ভবনানুষ্ঠানের (UNO) পূর্ব্বে স্যানফ্রান্সিস্‌-কোতে একদা বিশ্বরাষ্ট্রসম্মিলন হইয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী তখন কন্যা রিতার শিক্ষাব্যবস্থাব্যপদেশে আমেরিকায় ছিলেন। সম্মিলনে বিপ্লবী-বিদ্রোহী বিজয়লক্ষ্মীর প্রবেশাধিকার ছিল না, তিনি তাঁহার বাস-ভবনে অথবা নিকটস্থ হলে বা উদ্যানে ভারতবর্ষ বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি বিশ্বরাষ্ট্র সম্মিলনের শ্বেতাঙ্গ উদ্যোক্তারা নাকি তাহাতে বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলেন। সম্মিলনে আমন্ত্রিত দেশ-নেতৃবর্গের অনেকে নাকি রাষ্ট্রসম্মিলনের গুরুগম্ভীর আলোচনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকায়া (বৃটিশের চোখে কৃষ্ণ বৈ কি! পরাধীন মানুষমাত্রই 'ব্ল্যাকি'! ভারতবাসীর চোখে, বিজয়া বসরার গোলাব) নারীর চুটকি শুনিতে ছুটিত। বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন, বৃটিশ ভারতবর্ষকে কারাগারে পরিণত করিয়াছিল। আমরা সে কারাগার চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছি। "কারাগার" শব্দটি বৃটিশের মরমে বড় দাগা দিয়াছিল। একটি বিজয়-লক্ষ্মীর প্রতিপক্ষরূপে ভারত হইতে, ইংলণ্ড হইতে, ধনজনসমৃদ্ধ এক বিরাট

শক্তিশালী প্রচারক বাহিনী আমেরিকা পর্য্যটনে প্রেরণ করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়লক্ষ্মীর মুখে শুনিয়াছি ঐ কারাগার শব্দটি বিলোপ করিতে ন্যূনাধিক নব্বই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য ঐ 'সামান্য' কয়টি টাকা গৌরী সেনের আবাস ভারতবর্ষই দিয়াছিল!

ইত্যবসরে ভারতবর্ষে ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। যুদ্ধকালে বিশ্ববাসীকে জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে চতুর্ব্বর্গ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবে যে কয় মহারথী মহাসমারোহে স্বর্ণমুখলেখনীমুখে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই একজন দিগ্বিজয় কুক্ষীতলগত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা-বাসী ভারতবর্ষীয় নরনারীর বসবাস নিয়ন্ত্রিত করিয়া এক অপরূপ আইন রচনা করিলেন। এক কথায় আইনটির রূপ এই: ধরুন, যেন, কলিকাতার চৌরঙ্গী, থিয়েটার রোড, মিডলটন ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষীয় নরনারীর প্রবেশ নিষেধ করা হইল! ভারতবর্ষীয়গণ বর্ণবৈষম্যমূলক আইনটির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; ভারতবর্ষেও জনমত অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল; দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নরনারী লাঞ্ছিত মর্য্যাদাবিক্ষুব্ধ হইয়া আইন অমান্য করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। স্মাট্‌স ও তাঁহার স্ববর্ণ ও স্বজাতীয়গণ কৈফিয়ৎ দিলেন, কেন হে বাপু, শ্যামবাজার রহিয়াছে, রাজাবাজার রহিয়াছে, পাণিবাগান কলাবাগান রহিয়াছে সেইখানে থাকগে না! চৌরঙ্গী পাড়ায় আসিয়া, যে চমৎকার তোমাদের গাত্র বর্ণ—আমাদের চক্ষু পীড়া ঘটাও কেন! আইনটি এতই কদর্য্য ও গ্লানিকর যে, স্মাটসের জ্ঞাতিবর্গ পরিচালিত তদানীন্তন ভারত গভর্ণমেণ্টও এতখানি ঔদ্ধত্য বেবাক্ বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, প্রতিবাদ করিয়া এবং আরও কিছু কিছু করিয়া ভারত-বর্ষের মান রাখিয়াছিলেন। ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিধান ভবনে সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। তারপর, বিশ্বসনদ রচয়িতৃগণের মধ্যে অকৃত্রিম ভারতবন্ধু চার্চ্চিলের উচ্চাসন থাকা সত্ত্বেও জওহরলাল প্রকাশ্যে বিশ্ববিধান ভবন (UNO) সম্পর্কে ভারতের আস্থা ও নিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিলেন। চার্চ্চিলগোষ্ঠির শাঠ্য যত শঙ্কাপ্রদই হোক, আমেরিকা, ফ্রান্স—বিশেষ করিয়া রাশিয়ার চোখে ধূলি নিক্ষেপ যে সহজ নহে তাহা ত সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারি। বোধ করি পণ্ডিতজীরও সেই কারণেই গভীর আস্থা; এবং ভাবিতেও আনন্দ হয় যে বিশ্ববিধান ভবন এই বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষে সওয়াল করিতে যাইবে কে? প্রতিদ্বন্দ্বী স্মাট্‌স্ ও তন্মাসীত পুত্র কলত্র চার্চ্চিল এণ্ড কোং আন্-লিমিটেড্। ১৯৪৬ পূর্ব্বকালে হইলে "যে খুশী সে যাক্ ভুনি খিঁচুড়ি যে খুশী সে খাক্" (স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষমা করিবেন) কিন্তু যে ভারত আজ বিশ্বসভায় যোগ্যাসন গ্রহণে উদ্যত তাহার মর্য্যাদা রক্ষার প্রশ্ন আজ সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বাগ্রগণ্য। নির্ব্বাচনের ভার জওহরলালের। "ভাই" জওহর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মীর ললাটে ভারতের জয়টীকা পরাইলেন। সহোদরা বলিয়া নহে, যোগ্যতার প্রশ্নও যথেষ্ট নহে, নবীন ভারতে বৃটিশ-বর্ণিত অবলার স্থান নির্দ্দেশ করিবার শুভক্ষণে জওহরলাল ভারতের মর্ম্মবাণীকেই মূর্ত্তি দান করিলেন। বিশ্বের দরবারে বিচারে বিশাল বিশ্বের বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়ন অনন্য-সাধারণ রূপগুণযুতা নারী পানে নিবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষীয় পুরাণের কাহিনী আর একবার প্রাণবন্ত হইল। শান্তশীলা গৃহলক্ষ্মী বিজয়লক্ষ্মী মহিষমর্দ্দিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। জয় অনিবার্য্য, বিজয়িনী বিশ্ববিজয় করিলেন।

বাগ্মীতার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন দেখি না; রাজনৈতিক জ্ঞান বুদ্ধির তারিফ করারও দরকার নাই; লিপিচাতুর্য্যের সুখ্যাতিও অনাবশ্যক; কিন্তু সভান্তে যে আচরণ পৃথিবীর রাষ্ট্র নায়ক সমাজকে মোহিত ও অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, সেই ঘটনাটির উল্লেখ না করিলে এই ভুবনমোহিনী নারীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমার শ্রীমতী পাঠিকার স্মরণ আছে, বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতবর্ষের জয় ও স্মাট্‌সের পরাজয় ঘটে। দম্ভোল্লাসে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেও দোষাবহ হইত না; চার্চ্চিল বা স্মাট্‌স হইলে তাহাই করিতেন; কিন্তু ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জয় পরাজয়কে অনিত্য পদবাচ্য করিয়াছে; ভারত শিক্ষা দিয়াছে, কর্ম্ম মানুষের, ফলাফল তাহার নহে—ঈশ্বরের! তাই বিজয়িনী তন্মুহূর্ত্তে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের কর প্রত্যাশায় কর প্রসারণ করিয়া বলিতে পারিলেন, আমরা (ভারতবর্ষ) আপনার সৌহার্দ্দ যাচ্ঞা করি।

যে পুণ্যভূমিতে গীতার উদ্ভব সেই পুণ্য পবিত্র ভারতবর্ষের মানুষই পরাজিত প্রতিপক্ষের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। গল্পে পড়িয়াছি, দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট উত্তর ভারত জয় করিয়া শতদ্রুতীরে রাজা পুরুকে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি আমার নিকটে কিরূপ আচরণ আশা করেন? পুরু উত্তর দিয়াছিলেন, রাজার প্রতি রাজার আচরণ।

বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীও সেদিন বিশ্ববিধান ভবনে বীরের প্রতি বীর-নারীর যোগ্য ব্যবহারই করিয়াছিলেন।

মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞাবসানে কলিকাতায় ফিরিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় সতেরো নম্বর ইয়র্ক রোডে চা খাইতেছি, বিজয়িনী বলিলেন, আমার বড় ইচ্ছা রাশিয়ায় যাই, কিন্তু "ভাই" রাজী হইয়াছেন এবং বিশ্ববাসীও জানিয়াছে নবীন ও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-দূতের মুকুটখানি বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর শিরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বিরাট সোভিয়েট, বিশ্বের বিস্ময় সোভিয়েট, ধরিত্রীর ত্রাস সোভিয়েট কিন্তু ভারতের সহিত তাহার নিষ্কলুষ সৌহার্দ্দ! স্যান-ফ্রান্সিস্কোয় এই বিজয়লক্ষ্মীই সেই সূক্ষ্ম স্বর্ণ হারগাছি রচনা করিয়াছিলেন, আজ সেই সুবর্ণ রাখী দিয়া ভারত সোভিয়েট-রাশিয়াকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধিবার ভার সেই বিজয়লক্ষ্মীর উপরই অর্পিত হইল। ভারতবর্ষ আজ আর একবার লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভিনব ও প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইল।

ধন্য ভারত!

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

মন্বন্তরের মুখে

ভারতবর্ষে আবার দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মহামন্বন্তরের পর দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশন যখন তাঁহাদের রিপোর্ট রচনা করেন, তখন তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে পঞ্চাশী মন্বন্তরই ভারতের শেষ দুর্ভিক্ষ এবং ইহার পর আর কখনো দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতসরকারকে কোন কমিশন বসাইতে হইবে না। বেশী দিন নয়, মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের এই আশা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের নানাস্থানে এখন যে প্রচণ্ড অন্নাভাব দেখা দিয়াছে তাহাকে দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর বলা চলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর অন্নের দিক হইতে দেশ একদিনের জন্যও স্বচ্ছল হয় নাই, হইলে ৪ টাকা মণের চাউল রেশন এলাকায় অনায়াসে ১৬ টাকা মণদরে বিক্রীত হইতে পারিত না। তাছাড়া যেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ভারতবাসীর দৈনিক ২৬০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার, সেখানে এতদিন ভারতবাসী মাথাপিছু উর্দ্ধপক্ষে ১২০০ ক্যালোরীযুক্ত ১২ আউন্স খাদ্যশস্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দৈনিক এই ১২ আউন্স খাদ্যবরাদ্দ বজায় রাখাও ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না এবং ইতিমধ্যেই মাদ্রাজাদি কয়েকটি প্রদেশে দৈনিক খাদ্যবরাদ্দ ১২ আউন্সের স্থলে ১০ আউন্সে নামিয়া আসিয়াছে এবং বাঙ্গলায়ও এই ১০ আউন্স বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু হইতেছে। মাদ্রাজের কয়েকটি জেলায় দুর্ভিক্ষ সুরু হইবার কথা সরকারীসূত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে। বাঙ্গলার, বিশেষ করিয়া পূর্ববাঙ্গালার খাদ্যপরিস্থিতিও অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন যুদ্ধোত্তর মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকার সমস্যার যুগ। দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের আজ জীবিকার্জ্জনের খুব অল্প পথই খোলা আছে। এ সময় চাউলের দর প্রতি মণ ফরিদপুরে ৩১।০ আনা, সন্দীপে ২৮ টাকা, বরিশালে ৩০ টাকা ও মাণিকগঞ্জে ৩০ টাকা।* ইউনাইটেড প্রেস জানাইয়াছেন যে জুন মাসের শেষে প্রতি মণ চাউলের দর উত্তর বাখরগঞ্জে ৩২ টাকা, চট্টগ্রামে ৩০ টাকা (সাতকানিয়ার ন্যায় কোন কোন স্থানে ৪০ টাকা), ফরিদপুরে ৩৬ টাকা ও পাবনার মফঃস্বল অঞ্চলে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বিহারের অবস্থাও শোচনীয়, বিহারে চাউলের দর মণ প্রতি ২৫ টাকায় উঠিয়াছে। সুতরাং অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা চলে যে, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের চাপে অর্দ্ধমৃত ভারতবাসী এই বর্দ্ধিত অন্নমূল্যের চাপে ক্রমেই সামগ্রিক এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতে পুনরায় যে এই গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হইল, ইহার কারণ দেশের খাদ্যপরিস্থিতির উন্নতির জন্য দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন ভারত সরকারকে যে সব মূল্যবান পরামর্শ দিয়াছিলেন, ভারত সরকার সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। দেশে এখনও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই এবং বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া ভারত সরকার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য হাতে মজুত করিতে পারেন নাই। ভারতসরকারের এই অকৃতকার্য্যতার কারণ অবশ্য বিদেশে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের অভাব এবং এদেশে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা। এ ছাড়া প্রকৃতিও যে ভারতের প্রতি সদয় নন, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ধান ও গম গাছের শীষে একপ্রকার রোগ দেখা দেওয়ার (Rust) ফলে এ বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টন ফসল নষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় অর্দ্ধ কোটি লোক বাড়ে, কাজেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতি বৎসর বাড়িয়া যাওয়া দরকার। এ বৎসর সিন্ধু পাঞ্জাব ও উড়িষ্যায় সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে, ভারতের বাকী সব প্রদেশে (ইহার মধ্যে স্বভাবতঃ স্বচ্ছল মধ্যপ্রদেশও আছে) ঘাটতির জন্য বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানীরই প্রয়োজন। মোটের উপর অন্তর্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসদস্য ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাঙ্গালোরে প্রদত্ত এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই প্রকাশ যে, ভারতে এবার ৪৫ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য ঘাটতি হইবে। এ বৎসর (১৯৪৬-৪৭) ভারতবর্ষের খাদ্যশস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহা শস্য উৎপাদনের নিম্নের তালিকা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে :—

	১৯৪৫-৪৬	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা উৎপাদন
ধান	২,৬৩,৫৪,০০০ টন	২,৭২,৮৬,০০০ টন	২,৭০,৯৩,০০০ টন
গম	৮৯,০০,০০০ টন	৮০,০০,০০০ টন	১,০০,৫৪,০০০ টন
বাজরা	৮৯,৪০,০০০ টন	৯৩,০০,০০০ টন	৯৪,৮৩,০০০ টন

আসন্ন এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ভারতবর্ষকে যে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এদিক হইতে ভারতবর্ষের একমাত্র আশা সম্মিলিত খাদ্যবোর্ডের সাহায্য। সম্মিলিত খাদ্যবোর্ড ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধের জন্য ৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের বেশী খাদ্যশস্য ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। মে ও জুন মাসে যদি আরও এক লক্ষ টন আসিয়া থাকে, তাহা হইলেও খাদ্যবোর্ডের প্রতিশ্রুতির অর্দ্ধাংশের কিছু বেশী খাদ্যশস্য মাত্র নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে।

* অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫শে জুন, ১৯৪৭।

এই অবস্থা নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নৌ-ধর্ম্মঘটের ফলেও ভারতের আমদানী ব্যবস্থা কিছুটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এখনও মিটে নাই এবং এই দেশ হইতে ভারতে এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী হইতে পারিতেছে না। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে বৎসরে গড়ে ১৫ লক্ষ টন চাউল যোগাইত, যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মদেশের কৃষিব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল তাহা এখনও কিয়দংশে বজায় আছে বলিয়া ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষকে তেমন বেশী খাদ্যশস্য সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির জন্য ব্রহ্মে চাউলের দর এমনি বেশী, সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মসরকার চাউল বেচিয়া শতকরা ১৫ টাকা হারে মুনাফা লুটিতেছেন। এইরূপ নানা কারণে ব্রহ্মদেশ হইতে এখন একমণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ১৬ টাকা খরচ পড়িতেছে; ইন্দোনেশিয়া হইতে অনুরূপ পরিমাণ চাউল আনাইতে ভারত সরকারের ব্যয় হইতেছে ১২৸০ আনা।

ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত, দেশের খাদ্যব্যবস্থার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁহাদের আগ্রহশীল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ এই দুই বৎসরে সরবরাহকৃত খাদ্যশস্যে সরকারী সাহায্য বাবদ তাঁহারা ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া জনস্বার্থরক্ষার আগ্রহই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সদস্যবৃন্দ ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ হইলে কি হয়, যাঁহাদের হাতে দেশে খাদ্যবণ্টনের ভার তাহাদের অযোগ্যতা (কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক মনোবৃত্তি) বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। এই দুঃসময়ে খাদ্যবিভাগের এইরূপ ত্রুটিসমূহ কঠোরহস্তে সংশোধন করা অত্যাবশ্যক। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের করুণ অভিজ্ঞতার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের চরম খাদ্যসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিশীল দেশবাসী বা সরকারী কর্ম্মচারীদের শায়েস্তা করিতেই হইবে, অন্যথায় আগামী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে এদেশে অগণ্য বুভুক্ষুর মৃত্যুমিছিল কিছুতেই বন্ধ করা যাইবে না।

ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকীস্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ

কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃপক্ষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ৩রা জুনের প্রস্তাব গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ উপস্থিত পাকীস্থান ও হিন্দুস্থানে (ভারতীয় ইউনিয়ন) বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে ভারতে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিলে রাষ্ট্র দুইটির আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া সারা দেশে বিরাট জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। অবশ্য তুলনায় হিন্দুস্থান যে সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র হইবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে হিন্দুস্থানের সহিত পাকীস্থানের তুলনাই চলিতে পারে না, তবে প্রস্তাবিত পাকীস্থানে বাণিজ্য-সম্প্রসারণের সুযোগ আছে যথেষ্ট এবং ভারতের বিখ্যাত দুইটি বন্দর চট্টগ্রাম ও করাচী এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। লীগদল যেরূপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল, তাহাতে বিলাতী মূলধনে এই রাষ্ট্রে কিছু কিছু শিল্পাদি গড়িয়া উঠাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু পাকীস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া খাদ্যশস্যের দিক হইতে পাকীস্থান অনেকটা স্বাবলম্বী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পাট লইয়া তো পাকীস্থানীরা ইতিমধ্যেই হৈ চৈ সুরু করিয়া দিয়াছেন। তবে কৃষিজাত পণ্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইলেও খনিজ সম্পদের দিক হইতে পাকীস্থানের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বিখ্যাত শিল্পপতি মিঃ জি ডি বিড়লা সম্প্রতি "হিন্দুস্থান ও পাকীস্থান সম্পর্কে মৌলিক তথ্য" (Basic facts relating to Hindusthan and Pakisthan) শীর্ষক একখানি পুস্তিকায় উভয় রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ বিড়লার এই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ না হইতে পারে, ইহাতে কিছু কিছু সংখ্যাতত্ত্বগত ভুল ও থাকা সম্ভব, তবে দায়িত্বশীল অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত এই বিবরণী উপেক্ষার বস্তু নয়। এই বিবরণী হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রস্তাবিত পাকীস্থান এলাকার আর্থিক বনিয়াদ মোটেই দৃঢ় নয় এবং এই বনিয়াদ সত্যসত্যই যুগোপযোগী দৃঢ় করিয়া তুলিতে বিপুল অর্থব্যয়, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য লোক সংখ্যা এবং কৃষি সমৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যবস্থা ভাল হইলে পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ হইবে না। কৃষি-জীবী ভারতের দুর্গতি তাহার লোক বাহুল্যের জন্য, পাকিস্থানে ভূমি হিসাবে লোকসংখ্যা হিন্দুস্থানের তুলনায় এমনি অনেক কম। তাছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীরা সুস্থ, সবল ও কর্মঠ; কৃষিশ্রমিক বা শিল্পশ্রমিক, দুই হিসাবেই তাহারা গড়পড়তা ভারতবাসীর তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা দেখাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। জনবিরল অষ্ট্রেলিয়ার কৃষিগত আর্থিক স্বাচ্ছল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইউরোপেরই কৃষিজীবী দেশ ডেনমার্কের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বা জীবনযাপনের মান মোটেই হীন নয়। যাহাহউক, মোটের উপর যাঁহারা এখনো অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেন এবং যাঁহারা আশা করেন যে, অনতি-বিলম্বে পাকীস্থানী কর্তৃপক্ষ দারুণ আর্থিক অনটনের জন্য পাকীস্থানকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিয়া অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইবেন, মিঃ বিড়লার নিম্নলিখিত হিসাব পড়িয়া তাঁহারা আশান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

শিল্প অঞ্চল (১৯৩৯—৪০)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
কাপড়ের কল	৩৮০	৯
পাটকল	১০৮	—
চিনির কল	১৫৬	১০
লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা	১৮	—
সিমেণ্টের কারখানা	১৬	৩
কাগজের কল	১৬	—
কাঁচ কল	৭৭	২

ব্যবসা ও পেশাগত আয় (টাকায়)

	হিন্দুস্থান	পাকিস্থান
খনি ইত্যাদি	৯,৪১,৪৭,৬২৪	২,৩৫,৪০,৮৮০
বস্ত্রশিল্প	৪৪,৮৬,৮১,৮৬০	২,৭২,১৮,২২৩
ধাতু ও ধাতব পণ্য	৬,৫২,৪৪,৮৩৫	১,৮৬,৩৩,৯৭৪
গৃহ নির্ম্মাণ ও বিবিধ পণ্য তৈয়ারী	৭,৮৬,৬৭,৪৬২	১,৯১,৭৩,২৭৩
বণ্টন ও যোগাযোগ	১০৪,৬৩,৫৪,৪৭২	১৮,৪৭,৪৬,৭২১
অর্থ ব্যবস্থা (Finance)	২০,৬২,১১,৫১৯	৩,৮৮,০৭,৪৭২

কৃষি ও খাদ্য সম্পদ

কাঁচা পাট	৯, ৮৩, ৫১৯ একর	১৪, ০৩, ৭০০ একর
কাঁচা তুলা	১, ৩৭, ৭০, ০০০ একর	১৬, ৩০, ০০০ একর
চা	৬, ৪১, ২৪৩ একর	৯৬, ৬৫৭ একর
ধান	১, ৭২, ২৯, ০০০ টন	৫৩, ৭৬, ০০০ টন
গম	৪১, ৯৯, ৭৪০ টন	২৭, ৮৫, ২৬০ টন
চীনা বাদাম	২২, ৭৪, ০০০ টন	নগণ্য

খনিজ সম্পদ

কয়লা	২, ৫০, ৭৯, ৮০২ টন	১, ৯৮, ৪৭৬ টন
পেট্রোল	৬, ৫৯, ৬৮, ৯৫১ গ্যালন	২, ১১, ১৩, ৪২০ গ্যালন
ক্রোমাইট	৫, ১ ৯৪ টন	—
তামা	২, ৮৮, ০৭৬ টন	—
লৌহ	১৪, ২১, ৭০১ টন	—
ম্যাঙ্গানিজ	৭, ৬৬, ৩৪১ টন	—
অভ্র	১, ০৮, ৮৩৪ হন্দর	—

যোগাযোগ

(১) রেলপথ		
দৈর্ঘ্য	২৫, ৯৭০ মাইল	১৪, ৫৪২ মাইল
মূলধন	৬২৪' ৬৮ কোটি টাকা	২৩৩' ৮১ কোটি টাকা
(২) রাজপথ	২, ৪৬, ৬০৫ মাইল	৪৯, ৮৬৩ মাইল
সম্ভাব্য জলশক্তি	১৩,৪৩,০০০ কিলোওয়াট	২৮,৪৭,০০০ কিলোওয়াট

রাজস্বের হিসাব

প্রাদেশিক		
আয়	১৪৩'৩৮ কোটি টাকা	৪৪'৭৯ কোটি টাকা
ব্যয়	১৪২'২৭ কোটি টাকা	৪৯'৪৭ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+), ঘাটতি (−)	+১'১১ কোটি টাকা	−৪'৬৮ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয়		
আয়	২৭৭'২১ কোটি টাকা	৮২'৯৫ কোটি টাকা
ব্যয়	৩৮৯'৩২ কোটি টাকা	১১৬'২৯ কোটি টাকা
উদ্বৃত্ত (+), ঘাটতি (−)	−১১২'১১ কোটি টাক	−৩৩'৩৪ কোটি টাকা

গ্রামাঞ্চলের একটি সমস্যা

শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। শিল্পবাণিজ্যের দিক হইতে প্রস্তাবিত হিন্দুবাঙ্গলা কিছুটা সমৃদ্ধ হইলেও খাদ্যশস্য এবং জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে মুসলিম বাঙ্গলার অবস্থা যে অধিকতর আশাপ্রদ, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য সমগ্রভাবেই বাঙ্গলা খাদ্যশস্যের হিসাবে ঘাটতি প্রদেশ এবং মুসলিম বঙ্গও যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তাহাতে এই নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে হিন্দুমুসলমান সকল অধিবাসীকে প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যশস্য যোগান সম্ভব নয়।

হিন্দুবাঙ্গলা বা পশ্চিম বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে এই অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তিবৃদ্ধির তথা কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধনের একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অবলম্বনে অকারণ বিলম্ব বহু-সম্ভাবনাময় পশ্চিম বঙ্গবাসীর আত্মহত্যারই সমতুল হইবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রধান অনুপূরক হইল পশ্চিমবাঙ্গলার নদনদীগুলির সংস্কার। সকলেই জানেন দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে পশ্চিমবাঙ্গলার ৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে এবং বহু কারখানা চালাইবার উপযোগী ৩ লক্ষ কিলোয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। এছাড়া নদীটির সংস্কার হইলে উপর্য্যুপরি বন্যা প্রতিরুদ্ধ হইবার সহিত নদীপথে অবাধ নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় দামোদরের পার্শ্ববর্ত্তী বন্দরগুলির উন্নতি হইবে ও গ্রামবাসীদের প্রভূত সুবিধা হইবে। এইভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে লক্ষ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গবাসী অবশ্যই রক্ষা পাইবে। শুধু দামোদর, অজয় ময়ুরাক্ষী বা দারকেশ্বরের ন্যায় অপেক্ষাকৃত বড় নদী নয়, সরস্বতী, যমুনা প্রভৃতি ছোট ও মাঝারি নদীর সংস্কারের আবশ্যকতাও এখন অত্যধিক। এইসব নদী যে মজিয়া যাইয়া অসংখ্য গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়াইতেছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী জমিগুলির উৎপাদিকাশক্তি কমাইয়া দিতেছে, রেলওয়ে ও জেলাবোর্ডের পরিকল্পনাহীন সেতুগুলিই তাহার প্রধান কারণ। প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করা বা সংস্কার করা দায়িত্বশীল কর্ত্তৃপক্ষের আশু-কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এই ধরণের সেতু নির্ম্মাণে সামান্য কয়েকটি টাকা বাঁচাইবার জন্য কিরূপ মারাত্মক অবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি। ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমায় পদ্মা নামে একটি মাঝারি ধরণের নদী আছে। নদীটি চারঘাটে যমুনার সঙ্গে মিলিয়াছে। চারঘাট হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণে চাতরা পর্য্যন্ত নদীটি কমপক্ষে ৪২৫ ফুট চওড়া, কিন্তু জেলাবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ খাসপুর-মছলন্দপুর রাস্তায় দক্ষিণ-চাতরায় যে সেতুটি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেটি মাত্র ৭৫ ফুট এবং এই সেতুটির মাঝে আবার তিন ফুট চওড়া দুটি থাম গাঁথা হইয়াছে। এই সেতু হইতে আরও ৪ মাইল দক্ষিণে কলসুর গ্রামের পাশে মছলন্দপুর-খোলাপোতা রাস্তায় মগরায় আর যে একটি সেতু আছে সেটি মাত্র

২০ ফুট লম্বা। বলা বাহুল্য সেতুবন্ধনের সময় খরচ বাঁচাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ এইভাবে নদী বাঁধিবার যে পাকা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে নদীটি একেবারে মরিয়া যাইতেছে এবং বর্ষার কয়েকটি দিন ছাড়া নদীর স্থির জল সারা বৎসর কচুরীপানার স্তুপে বোঝাই থাকে। বর্ষার দিনগুলিতেও কচুরি পানা এমন কিছু সরিয়া যায় না যাহাতে নৌকা চালান চলে। এই ধরণের নদীর উপর এভাবে সেতু বাঁধা না হইলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্য ও জমির উৎপাদিকাশক্তি যে অনেক বাড়িতে পারিত, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এইসব নদীতে স্রোত থাকিলে কচুরী পানা জমিতে পাইত না, রীতিমত নৌকা চলাচলের ফলে মাল ও যাত্রী আসা যাওয়া করিতে পারিত, ম্যালেরিয়ার উৎপাত কমার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের অধিবাসীদের অনেকটা সুখসুবিধা এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টি হইত। একটু বাহিরের জমিতে জলসেচের বা শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাতেও সেক্ষেত্রে এই নদী অবশ্যই প্রভুত সহায়তা করিত। ১-৭-৪৭

দেশীয় রাজ্য ও গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২৮শে এপ্রিল গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন বসিলে, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য সর্বপ্রথম গণ-পরিষদে যোগদান করে। বরোদা, কোচিন, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ১৬ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। এই ১৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন নির্বাচিত ও মাত্র ৫ জন মনোনীত। ইহার পরে ছোট বড় করিয়া আরও অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য একে একে গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগদান করিল না তাহাদের মধ্যে কয়েকটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণার পর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অপর কয়েকটি রহস্যজনকভাবে চুপ করিয়া রহিল।

প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র অর্ধেকের কম লইয়া নরেন্দ্রমণ্ডল। তাহা হইলেও নরেন্দ্রমণ্ডলের অনেকেই গণ-পরিষদে যোগদান করায় এবং অনেকে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় ভূপালের নবাবের পক্ষে আর নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার পদে থাকা সম্ভব হইল না। তিনি গণ-পরিষদে যোগদান সমর্থন করিলেন না। তিনি নিজে আশা করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলেই ভূপালকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তাই তিনি চ্যান্সেলারের পদে ইস্তফা দিলেন।

ভূপালের দেখাদেখি ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এক ঘোষণায় বলিলেন—১৫ই আগষ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিলে ১৫ই আগষ্ট হইতেই ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণ যেন ইহাতে মহারাজাকে সমর্থন করেন। এই স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য মহারাজা যে কোনও অবস্থার সম্মুখীন হইতে বা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

১২ই জুন হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরও এক ফার্মানে ঘোষণা করিলেন যে—হায়দরাবাদ হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কোনও গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় রাজ্যের উপর হইতে তাঁহাদের সার্বভৌমত্বের অবসান হইবে, তখন হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই সময় নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশন চলিতে থাকে। যে সব দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সমালোচনা করিয়া উক্ত অধিবেশনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে বলা হয়—কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন না, অধিকন্তু তাঁহার রাজ্যের প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিবেন। তাঁহার এইরূপ কার্যে বাধাপ্রদান করিতেই হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিলে সার্বভৌম ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের উপরেই আসিবে, তখন নৃপতিগণকে প্রজাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে অবস্থান করিতে হইবে।

হায়দরাবাদ স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিলে হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থ হায়দরাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু নিজাম বাহাদুর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৬ই জুন হায়দরাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে। ইহাতে নিজাম বাহাদুর স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্কল্প করিয়া যে ফার্মান প্রকাশ করেন তাহার সমালোচনা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—নিজাম বাহাদুর জনসাধারণের সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া এবং জনমত গ্রহণ না করিয়াই এই ফার্মান প্রকাশ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার চেষ্টা করিলে ষ্টেট কংগ্রেস সর্বপ্রকারে বাধাদান করিবে।

ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত পট্টমথানু পিল্লাই ও ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে জানাইলেন,—ত্রিবাঙ্কুর যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গণ-পরিষদে যোগদান না করে, তাহা হইলে প্রজা-সাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবে। আমরা ইহার জন্য ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইব। আমাদের এই অহিংস আন্দোলন দমন করিতে গবর্ণমেণ্ট যত কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, আমরা কিছুতেই দমিব না।

১৪ই জুন হইতে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন বসে তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বলা হয়—কোন দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, সেই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা আদৌ স্বীকার করা হইবে না। কোন বিদেশী শক্তি উহাদের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে তাহা বন্ধুত্ব-বিরোধী কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

গণ-পরিষদ ও উহার বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য স্যার এন, গোপাল-স্বামী আয়েঙ্গার, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট জেনারেল স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কোচিনের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্যার আর, কে, সম্মুখম্ চেট্টি, মিঃ কে, এম, মুন্সী, ডাঃ আম্বেদকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, উহাদের স্বাধীনতা ঘোষণার শাসনতান্ত্রিক বা আইন-সম্মত কোনও অধিকার নাই। মহাত্মা গান্ধীও কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে দেশীয় রাজ্যের এই অসঙ্গত দাবীর কথা উত্থাপন করিলেন। ১৬ই জুন নয়াদিল্লীতে প্রার্থনা সভায় তিনি বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ফলেই ভারত বিভক্ত হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ভারতকে আরও বিভক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে যোগদান করা উচিত। ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদ যে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। কোনও দেশীয় রাজ্যের পক্ষেই এরূপ মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বর্তমানে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। নৃপতিবৃন্দ যদি সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। পরদিন পুনরায় গান্ধীজী ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন—ত্রিবাঙ্কুরে গণ-ভোট গ্রহণ করা হইলে জনসাধারণ সকলেই স্যার রামস্বামী আয়ারের স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধেই ভোট দিবে। ১৫ই জুন তারিখে ত্রিবাঙ্কুরের এক প্রতিনিধি দল মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে জানান যে, ত্রিবাঙ্কুরে জনমতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা ইতিমধ্যে সুরু হইয়া গিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের এক জনসভায় পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া ৩৫জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গান্ধীজী এই দিন প্রার্থনা সভায় বলেন—স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের স্বাধীনতা ঘোষণার কোনও মূল্য নাই, ইহা ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই সামিল। বর্তমানে ইহা কল্পনাতীত।

দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের বিষয় লইয়া, দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ ও দেশের নেতৃবৃন্দ যখন এইভাবে আলোচনা করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে মিঃ জিন্না এক বিবৃতি দিয়া জানাইলেন যে, মন্ত্রিমিশনের ১২ই মের স্মারকলিপিতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোনও নির্দ্ধারিত নীতির কথা বলা হয় নাই। পাকিস্থান কি হিন্দুস্থান একটি গণ-পরিষদে তাহাদিগকে যোগ দিতে হইবে ইহা ঠিক নহে। আমার মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় ১৮নং অনুচ্ছেদে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়, ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখের স্মারকপত্রে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই বলবৎ থাকিবে।

১২ই মে তারিখের উক্ত স্মারকলিপিতে নির্দেশ থাকে যে, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে, তাহা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহারা অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

উক্ত নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন হওয়ার কোন কথাই ইহার মধ্যে নাই। তাহাদের যাহা করিবার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই করিতে হইবে। মিঃ জিন্না কিন্তু ভেদ-নীতির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভারতকে আরও খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিলেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে সবল পাকিস্থান রাষ্ট্রের আশা তিনি পোষণ করিতেন। কিন্তু কার্যতঃ তাহা না হইয়া এক "কীটদষ্ট" ক্ষুদ্র পাকিস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। মিঃ জিন্না দেখিলেন, দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইলে উহা আরও সবল হইয়া উঠিবে। তাই তিনি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীন হইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে ভেদনীতির চালও চালা যাইবে।

তাই যে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীনতা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করায় কংগ্রেস তাহা অস্বীকার করিবার প্রস্তাব করেন, মিঃ জিন্না সেই ত্রিবাঙ্কুরকে স্বাধীন স্বীকার করিয়া তাহার সহিত চুক্তি করিতে অগ্রসর হইলেন। মিঃ জিন্না হয়ত ভাবিলেন, একটা হিন্দু দেশীয় রাজ্য ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান গেল। মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে যে আলোচনা হয়, ২১শে জুন ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম হইতে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন। তাহাতে বলা হয়—মিঃ জিন্না ও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাহাতে পাকিস্থান ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র স্থাপিত হইলেই ত্রিবাঙ্কুরের একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে ও পরস্পরের মধ্যে সুবিধামূলক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে মিঃ জিন্না স্বীকৃত হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ইনেসপেকটর জেনারেল অফ পুলিশ খানবাহাদুর আব্দুল করিম সাহেবকে পাকিস্থান ডোমিনিয়নের জন্য প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছে। এই চুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা দ্বারা ত্রিবাঙ্কুর

পাকিস্থান হইতে চাউল এবং পাকিস্থান বন্দর করাচীর মধ্য দিয়া মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোল পাইবে, আর ত্রিবাঙ্কুর পাকিস্থান রাজ্যে চা, মশলা, নারিকেল প্রভৃতির বাজার পাইবে।

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে যুক্তি দেখান যে, ত্রিবাঙ্কুর কোনও দিন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিজিত হয় নাই। বৃটিশের সহিত ত্রিবাঙ্কুরের সন্ধি একটা স্বেচ্ছামূলক মাত্র। অথচ বাটলার কমিটির রিপোর্ট, যাহাকে প্রায় সকল দেশীয় রাজাই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন দেশীয় রাজ্যগুলির সংস্পর্শে আসে তখন উহারা কেহই স্বাধীন ছিল না। উহাদের অনেককে অপরের অধীনতা হইতে উদ্ধার করা হয়, বাকীগুলিকে সৃষ্টি করা হয়।

যাহাই হউক, ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান যিনি ত্রিবাঙ্কুরের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এতখানি আগ্রহান্বিত, তিনি কিন্তু আসলে বৃটিশ ভারত, মাদ্রাজের অধিবাসী। ইনি পূর্বে ভারতীয় জাতীয়তা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানে ইনি ভারতীয় ঐক্যের বিঘ্নসৃষ্টিকারী মিঃ জিন্নার সহিত হাত মিলাইয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাহিরে থাকিবার জন্য যতই ষড়যন্ত্র করুন না কেন, রাজ্যের প্রজারা তাঁহাকে ও তাঁহার স্বেচ্ছাচারী মহারাজাকে এ বিষয়ে মোটেই সমর্থন করিবেন না। তাঁহারা ইহার জন্য যে কোনও রূপ দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত, একথা জানাইয়া দিয়াছেন। আর হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীনতা ঘোষণা অথবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তাঁহার রাজ্যের শতকরা ৮৯জন হিন্দু। ইহাদের মিলিত দাবীর বিরুদ্ধে নিজামের টিকিয়া থাকা অসম্ভব। মধ্য ভারতে অবস্থিত ভূপাল রাজ্যেও অধিকাংশ প্রজাই হিন্দু। এই জাগ্রত প্রজাসাধারণ ভূপালের নবাবের স্বেচ্ছাচারিতায় সায় না দিয়া তাহারাই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ভারতের সংহতি ও মর্যাদার বিঘ্নসৃষ্টি না করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির আশু কর্তব্য হইল—বর্তমান গণ-পরিষদ অথবা পাকিস্থান গণ-পরিষদ যে কোনও একটিতে অবিলম্বে যোগদান করা। ত্রিবাঙ্কুর, হায়দরাবাদ, ভূপাল ছাড়া আরও কয়েকটা দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে, তাহারা কোন গণ-পরিষদে যোগদান করিবে কিনা এখনও কোন মতামত জ্ঞাপন করে নাই। যাহা হউক, তবে এখন পর্যন্ত ইহা ঠিক হইয়াছে যে মাত্র এই কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতের প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যের অধিকাংশই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিবেই।

৩০।৬।৪৭

অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ফসলবিহীন অসহায় মাঠে বকের পালক ঝরে,
অতীত দিনের স্বাক্ষর মনে পড়ে।
নীরবতাভরা নির্জ্জন নদী নির্জ্জীব নিশ্চল
উতলা উদাস সমীরণে দোলে সবুজ পত্রদল ;
পাশবিকতার ধূমকুণ্ডলী গাঁয়ে ওঠে অবিরত
কে জানে কখন জ্বলিবে বহ্নি দুরাশার প্রলোভনে
হিংসার আবাহনে !
হৃদয় হরিণ ভ্রমিয়াছে হোথা প্রতিদিন নির্ভয়ে,
মৃণ্ময়ী মার জীবন সূর্য্যোদয়ে।
সে মাতা আমার মরণের কোলে আশ্রয় নিয়ে রয়,
ধূলি আবর্ত্তে মানব যাত্রী পদে পদে পায় ভয় ;
সংঘাত-ঘেরা রৌদ্র-জ্যোছনা মুখরিত দিনরাত,
মরু সভ্যতা ভুলায় কৃষাণে পরাণ হরণ করি
নির্ম্মমরূপ ধরি।

যেথায় শুনেছি জনকলরব মিলনের মোহানায়
স্নেহের কুটীরে প্রীতি আর মমতায়,
ছায়া ফেলে ফেলে মনের ভাবনা চলে চারিদিক চেয়ে,
আমার জীবন-গোধূলি বেলায় মেঘভাঙা পথ বেয়ে।
মসজিদ আর দেউলের চূড়া দেখা যায় তরু শিরে,
সরিষা ক্ষেতের পাশে গ্রামখানি তেপান্তরের পারে
পাগ্‌লা নদীর ধারে।
চিত্ত আমার সরসীর সম ছিল একদিন গাঁয়ে,
প্রথম প্রণাম পরায়েছি ওর পায়ে।
কত পার্ব্বণ উৎসব ফুল সমাহিত বীথিকায়,
কোথায় গিয়েছে মানবতা ওর মানুষের গীতিকায়' !
বিস্মৃত কত পলাশী যুগের প্রেতায়িত ইতিকথা
শ্যামা বনানীর অঞ্চলে ঢাকা পোড়ো ভিটাদের মাঝে
মাটীর স্বপন রাজে।

আমাদের গ্রামের পাখী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোকিলের ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙিত। কাক কি মোরগের ডাকে নয়। প্রভাত হইবার বহুপূর্ব্বে কোকিল, পাপিয়া এবং অন্যান্য পক্ষীর সুদীর্ঘ সুমধুর কনসার্ট চলিতে থাকিত। আমাদের গ্রামে মুসলমান নাই, কুনুর নদীর পারে মোরগের ডাক কচিৎ শোনা যাইত। কাক দূর গ্রাম হইতে ভোর বেলাতেই আসিত বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বেই বিহগ-কুলের ঐক্যতান আরম্ভ হইত।

কাক রূপহীন এবং তাহার কণ্ঠ কর্কশ, কিন্তু তাহাদের সহিত যেমন মহরম মহরম, এমন আর কোনো পক্ষীর সঙ্গে নয়—তাহারা প্রায় গৃহ পরিজনেরই মত। যাহাদের ঘরে যুগে যুগে পিকরাজ পালিত হইতেছে, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা তো চলে না! আমার উহাদিগকে চিরদিনই ভাল লাগে—পরিণত বয়সেও সে প্রীতি কমে নাই। একবার বর্দ্ধমান ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটী বাড়ীতে রাত্রি কাটাই, সমস্ত দেবদারু বৃক্ষগুলি সন্ধ্যায় অসংখ্য কাকের সমাগমে একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। জ্যোৎস্না রাত্রি যত গভীর হইতে লাগিল, কাকগুলি ততই ডাকিতে লাগিল—কাকের ডাক যে এত মিষ্ট হইতে পারে তাহা কখনো ভাবিতে পারি নাই।

"আজ পেরেছি জানতে আমি সন্দেহ নাই আর,
কোকিল কেন কাকের গৃহে কণ্ঠ সাধে তার?
কোকিল নহি—কিন্তু ভরে আনন্দেতে বুক,
কাকের বাসায় একটী ছোট রাত্রি জাগার সুখ।"

আমাদের বাড়ীতে চার পাঁচটী কাক নিয়মিত আসিত, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিত—এখনো থাকে এবং দল বৃদ্ধিই হইয়াছে।

আমার শৈশবে আমাদের পরিচারিকা 'মানদা'—'সোনার কেউও' 'কাগা' মামা ও 'বগা' মামার গল্প বলিয়া কাক ও বকের প্রতি একটা অহেতুকী ভালবাসা আনিয়া দিয়াছিল। 'সুয্যি' মামা ও 'চাঁদা' মামার পরই ঐ দুটী পাখীর সঙ্গে আত্মীয়তা। বকের সম্বন্ধে রসিকতা করিয়া সংস্কৃত কবি লিখিয়াছেন—

"দেখছি আমি হে বক তুমি
চাঁদের চেয়ে ভালই দাদা।
শুক্লপক্ষ একটা চাঁদের
দুটী পক্ষ তোমার সাদা" (অনূদিত)

বলাকা দলের একসঙ্গে মাঠে অবতরণ ও সন্ধ্যায় শুভ্র যূথিকার মালার মত একসঙ্গে ঊর্দ্ধাকাশে প্রয়াণ বড়ই সুন্দর। আমাদের গ্রামে একটী তেঁতুলগাছে অসংখ্য বক বাস করিত, গাছটী সাদা করিয়া রাখিত, কেহ বিরক্ত কি হিংসা করিত না।

আমাদের গ্রামে কোকিল ও পাপিয়ার সংখ্যা খুব বেশী, পাপিয়াও কোকিলের ন্যায় বাসা বাঁধে না—ছাতার পাখীর বাসায় ডিম পাড়ে।

"পাপিয়া কি গাইতে পারে
রচতে হলে বাসা?"

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমে কাক ও ছাতারের বাসা হইতে কোকিল ও পাপিয়া সংগ্রহ করার চেষ্টা অনেকে করিত।

শালিক, ঘুঁটকে, ফিঙা, দোয়েল, বুলবুলি, চড়াই, মুনিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া ঘুরিত। অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একটী শালিককে 'আহার' অন্বেষণ করিতে দেখিতাম—

"এত বাদল—তবু সাঁজে
একটী শালিক চরে,
নিশ্চয় ওর আছেই আছে
খোটেল ছেলে ঘরে।
ছোট্ট ছেলে রাগে,
বকতে বুকে বাজে।
জননী তার তাই এসেছে
'আহার' নেবার তরে।'

'গোলা পায়রা' প্রত্যেক বাড়ীতে আসিত এবং বাসা করিত। ছানাগুলি একটু বড় হইলেই বড় পায়রাদের সঙ্গে খুব অহঙ্কার করিয়া সোহাগে ঘাড় উঁচু করিয়া 'বকম' 'বকম' করিবার চেষ্টা করিত, যেন বলিতে চায়—

"দেখ আমার বাপ বকে না
সোহাগ করে মা,
দুনিয়াতে কাউকে আমি
কেয়ার করি না?'

হলুদ পাখী 'বউ কথা কও' গ্রামের স্থায়ী অধিবাসী ছিল না, মাঝে মাঝে আসিত। হলুদ পাখী সম্বন্ধে গ্রাম্য গল্প আছে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার বিবাহের পাকা কথাবার্ত্তা হয়, গায়েহলুদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়—কন্যা মনোদুঃখে পাখী হইয়া গেল এবং—'কৃষ্টের পোকা হোক', 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলিয়া ডাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে বালক মনে ব্যথা পাইতাম। নীলকণ্ঠের গানে আছে—

"কারে সুখে রেখেছ হে সুখময়?
মা যশোদার কি সুখ বলো?
নন্দ কেঁদে অন্ধ হলো,
দেবকীর যে যাতনা
দেব কি তার পরিচয়?"

কতকগুলি পাখী অকারণে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ছিল—যেমন দাঁড়কাক, গোচিল, ঘুঘু, কালপেঁচা। ঘুঘু অতি নিরীহ পক্ষী, কিন্তু ঘুঘুকে গ্রামবাসী ভাল চক্ষে দেখে না—'ভিটায় ঘুঘু চরা' একটা গালাগালি। ঘুঘুকে বাড়ীর কাছে বাসা বাঁধিতে দেয় না, 'ঘুঘুর বাসা' মানে দুষ্ট ও অনিষ্টকারীর আড্ডা। এই অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই বোধহয় কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সুদূর অতীত যুগে এই পক্ষীদের সম্বন্ধে গল্প রচনা করিয়াছিলেন: শাশুড়ী ও বৌ থাকিত, বৌএর নাম 'চিতু', চিতুকে ছাতু কুটিতে দিয়াছিল, কোটা হইলে শাশুড়ী মাপিয়া দেখিল কাঠা পূর্ণ হয় নাই, খালি আছে, তাই রাগিয়া তার গালে চপেটাঘাত করিল, চিতু মারা গেল। শাশুড়ী পরে দেখিল, কাঠা পূর্ণ হইয়াছে, ভুল তাহারই। শোকে অনুতাপে সে ঘুঘু হইয়া উড়িয়া গেল, আর বনে বনে ডাকিতে লাগিল—

'ওঠো চিতু, কাঠা পু পু পু।'

ঘুঘুর সুরটী বিষাদমাখা বটে।

শৈশবে একটী শরাহত বন্য কপোতকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়াছিলাম, তার রাঙা আঁখি দুটীর ম্লান চাহনী আমাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, এখনো ভুলিতে পারি নাই—

"দিনু গায়ে হাত বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কাল হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'
তার সে চাহনী যে কথাটী হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাই না খুঁজিয়া বিশ্বের অভিধানে।"

টাকশোনা (নীলকণ্ঠ) ও শঙ্খচিল পল্লীবাসীর ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে; গোচিল বেচারীর দুর্ভাগ্য—লোকে বলে,

'শঙ্খ চিলের ঘটি বাটী
গোচিলকে কুড়ুলে কাটি'

লক্ষ্মী পেঁচা আদর পায়, লক্ষ্মীর বাহন; কিন্তু কালপেঁচা ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। দাঁড়কাক যমের দূত।

'মাণিকজোড়' পাখী দুটিতে এক সঙ্গে ওড়ে, ডাঙ্গাতে এক সঙ্গে চরে, কখনো কাছ ছাড়া হয় না—এক সঙ্গে দুইজনকে সর্ব্বদা দেখিলেই তাই লোকে বলে "যেন মাণিক জোড়'। 'শামখোল' মাণিক জোড়ের মতই, তবে তাদের চেয়ে কিছু বড় এবং দেখিতে তত সুন্দর নয়। তিতির পাখী গ্রামে অনেক। লোকে বলিত—

"তিতির পাখী বলছে ডেকে
ফকির হ তুই ফকির হ"

এ অঞ্চলে ফকিরেরা এ পাখী বেশী পোষে বলিয়াই বোধ হয় এই জনশ্রুতি।

কাঠঠোকরা পাখী দেখিতে ভাল, বাগানে ও বনে থাকে, প্রখর মধ্যাহ্নে তাহাদের শব্দ বনের নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে এবং দুপুরকে রহস্যময় ও ভীতিময় করে—তাই ছেলেরা বলে

"ঠিক দুপুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।"

বাবুই পাখী গ্রামের তাল গাছের শাখায় সুন্দর বাসা বানায়, কিন্তু বর্ষার বৃষ্টি ধারায় তাহারা নীড়ের বাহিরে থাকিয়া ভিজে, বোধ হয় 'ধারাস্নান' ভালবাসে। কথায় বলে "ঘর থাকতে বাবুই ভেজে'। টুনটুনি পাখী বিচিত্র রঙের বিভিন্ন জাতীয়—ছোট ছোট সুন্দর নরম বাসাগুলি ছোট গাছের শাখাতে নির্ম্মাণ করে। তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ।

বনটিয়া কখনো কখনো দল বাঁধিয়া আসিত। তবে সেগুলি ছোট, মধ্যে মধ্যে বড় টিয়া পাখীও দেখা যাইত তবে তাহারা আগন্তুক মাত্র। হরিয়াল পাখী ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে, আমাদের গ্রামে শিকার নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ তাহাদিগকে হিংসা করিতে আসিত না। শিকারী (শ্যেন) পাখী পায়রা এবং হাঁস প্রায়ই মারিত। মুসলমান ফকিররা শিকারী পাখী পোষে এবং তার দ্বারা বক ও ঘুঘু প্রভৃতি ধরে।

জলচর পক্ষীর মধ্যে, ডাকপাখী, বুনো হাঁস, মাছরাঙা, খঞ্জন, কাদাখোঁচা, টিটিভ দেখিতাম। 'বেনেবুড়ি' ডুবিয়া মাছ ধরে, ছোট ছেলেরা "বেনেবুড়ি বেনেবুড়ী আমার হয়ে একটী ডুব দে" বলিত আর সে ডুব দিত। ছেলেদের কথায় নয়, নিজের দরকারে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া ঐরূপ অনুরোধ করিতে থাকায় মনে হইত, এত অনুরোধ আর এড়াইতে পারিল না। টিটিভের ডাক ডাকাতির অগ্রদূত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। জলাভূমিতে আলো দেখিলে ঐ পাখীগুলি গ্রামের দিকে ছুটিয়া আসে—তীক্ষ্ণ ডাকে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙাইয়া দেয়—সজাগ করে। গ্রামবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রাজু ঘোষ নামে এক গোপ যুবক বহুবিধ পক্ষী পুষিত—সে গ্রামের পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ছিল—পাখীদের সম্বন্ধে সে অনেক সত্যমিথ্যা বলিত এবং তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারে এই ভান করিত।

পক্ষীজাতির মধ্যে অনেকে দেবদেবীর বাহন, তাহারা মানবের হিত করে এবং ভবিষ্যৎদর্শী এই সব লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী তাহাদিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র করিয়া তুলিত। তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। গ্রামের বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতিগুলি তাহাদের গৃহ ছিল, পল্লীকে তাহারা শব্দময়ী ও সঙ্গীতময়ী করিয়া রাখিত।

আমার মাতৃদেবী টিয়া ময়না পুষিতে ভালবাসিতেন। একটী টিয়া পাখী সুন্দর বুলি বলিত। ২।৩ বৎসর পর সেটী মারা যায়, মা নিজে হাতে তুলসীতলে তার সমাধি দেন—আমি সজল নয়নে তাঁর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কত দিন হইল কিন্তু মনে হইতেছে যেন সেদিনকার ঘটনা। কাশ্মীর হইতে তিনি বহু খরচ ও ক্লেশ করিয়া ২।৩ বার টিয়া পাখী আনিয়াছিলেন, দুটী পাখীই অনেক দিন ছিল—আমি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"তোমরা ছিলে কাশ্মীরেতে
জাফ্রাণেরি ক্ষেতে,
নিত্য রঙিণ ফুল পরাগে
রইতো বাতাস মেতে।

কমল যখন ফুটতো "মানসজলে"—বলে
লাগ্‌তো ফুলের গন্ধ জলে স্থলে,
রাঙা আপেল বাগান ভরা
ডাকতো কাছে যেতে।
নিশাদ বাগে পীয়ার চেখে
ফুটতো মধুর বোল,
আঙুর বনে অলস হয়ে
লতায় পেতে দোল।
'ঝিলাম নদীর দুকূল করি আলা
উড়তে নদীর মরকতের মালা
লাগতো ভাল স্নিগ্ধ উজল
নীল আকাশের কোল।"

যখন অজয়ে ঢল নামিত, জলচর স্থলচর পাখীর এক বিরাট বহর অজয় ও কুনুরের বুক ছাইয়া ফেলিত। চারিদিকে রাঙা জল, তাহার উপর ভাসমান শুভ্র ফেনের স্তবক, তাহাতে অসংখ্য পোকা মাকড়—জলের গভীর কলকলের সহিত বিহগদলের সম্মিলিত ধ্বনি বরষাকে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিত—'অতি ভৈরব হরষেই বর্ষার আগমন হইত।

বর্ষার এত ফড়িঙ, পোকা, তৃণগুল্ম সবই যেন নবজাত পক্ষীশাবকগণকে পুষ্ট করিবার জন্য। ভগবানের দান অকুণ্ঠিত—তাহাদের আহার মুখের কাছে যেন পঁহুছাইয়া দিতেন।

প্রতি ঋতুতে কত বিভিন্ন কত বিচিত্র পক্ষী গ্রামে আসিত—তাই লিখিয়াছিলাম—

'এত পাখী আসে যায় সহি এত ঝক্কি,
যদি পথ ভুলে আসে সে গরুড় পক্ষী।
সে পাখার হাওয়া রে
যদি যায় পাওয়া রে,
মোরা, থাকি শুধু তার আশা পথ লক্ষি'।

নব বঙ্গ ও তাহার সীমান্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

অখণ্ড বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন করা সাব্যস্ত হইয়াছে। শীঘ্রই সীমানির্দ্ধারণ কমিটী উভয় প্রদেশের সীমান্ত পাকাপাকি হিসাবে স্থির করিয়া দিবে। উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের যে সকল অংশে হিন্দু কিম্বা জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের সংখ্যা বেশী সেই সকল ভূখণ্ড লইয়া নূতন বঙ্গ গঠিত হইবে। কিন্তু বাংলা দেশের এমন অনেক অংশ আছে যেখানে হিন্দু মুসলমানের বাস পাশাপাশি, এমন কি একই গ্রামে এপাড়া ওপাড়ায় স্মরণাতীত কাল হইতে সুখে শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। রোগে, শোকে, বন্যা-ঝঞ্ঝা কিম্বা মহামারীতে গ্রামের কৃষক দেউল কিম্বা মসজিদে একইভাবে অভয় প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থের সংঘাতে মনান্তর যে না হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক গ্রামের লোক পাশের গ্রামে "বিদেশী" গণ্য হইবে এমন উদ্ভট কল্পনা কেহ করে নাই; আজ মুসলিম লীগের অপপ্রচারে এবং "যুদ্ধং দেহি" রবে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। একই জাতির মধ্যে সীমাহীন ফাটল আজ দেখা দিয়াছে। চলার পথ হইয়াছে বিপরীতমুখী। জাতিগঠনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হয়তো সকল বিভেদ ও পার্থক্য একদিন একই ভাবপ্রবাহে সম্মিলিত হইবে। সেই ভাবী শুভদিনের অপেক্ষায় প্রেমের সহিত আজ "ভাই ভাই" "ঠাঁই ঠাঁই" হইতে পারিলেই মঙ্গল।

দুই প্রদেশের সীমারেখা যতদূর সম্ভব প্রাকৃতিক সংস্থান, নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত হওয়াই বিধেয়। সমতল ভূমির উপর আঁকা বাঁকা সীমানা হইলে পরস্পর উভয় রাষ্ট্রেই খবরদারী খুব ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক হইবে। নদ নদী নালা কিম্বা পর্ব্বত সীমানায় না থাকিলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় শত্রুর আক্রমণে বাধা দেওয়া কিম্বা সামরিক সৈন্য বাহিনী পরিচালনা ও গুপ্ত খবর সংগ্রহ বন্ধ করা কষ্টদায়ক; শান্তির সময় বাধা নিষেধ কিম্বা শুল্ক ফাঁকি দিয়া অবৈধ আমদানী রপ্তানী ব্যবসা চালান সুবিধা। অনেকের ধারণা বর্ত্তমানের যান্ত্রিক যুদ্ধে নদী আর বাধা নহে। রুঢ়প্রদেশ দখলের সময় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পরপার হইতে বিধ্বস্ত জার্ম্মান যান্ত্রিক বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ কিম্বা জলপ্লাবিত হলাণ্ডের রণভূমি অথবা ওডার নদীর পশ্চিম তীরে পলায়নপর জার্ম্মান যান্ত্রিক বাহিনীর শেষ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা স্মরণ করিলে যান্ত্রিক যুদ্ধে নদ-নদীর সুবিধা ও অসুবিধা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ভারত ও নববঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা একই হওয়ায় এই সীমান্ত নির্দ্ধারণের গুরুত্ব অনেক বেশী হইয়াছে। প্রান্তদেশ ও সীমান্তে সাম্প্রদায়িক শক্তির বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া অসঙ্গত। দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ থাকিলে "পঞ্চম বাহিনী" উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা; গত যুদ্ধে দেখা গিয়াছে "পঞ্চম বাহিনীর" গোপন যুদ্ধের ফলাফল সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের জয় পরাজয় অপেক্ষা কম উল্লেখযোগ্য নহে। লোক সংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত ভূখণ্ড যাহাতে অপর পক্ষের হস্তগত না হয় তাহা ও দেখা দরকার। বর্ত্তমান ব্রিটীশ বাংলার আয়তন ৭৭৪৪২ বর্গ মাইল, অমুসলমান জনসাধারণের সংখ্যা শতকরা ৪৫ জন। কিন্তু জমির অব্যূঢ় মালিকানা স্বত্ব হিন্দুদের শতকরা ৭০ ভাগ অপেক্ষাও অনেক বেশী।

সৌহার্দ্দ ও প্রীতির সহিত পৃথক হইলে ভবিষ্যতে পরস্পরের মানসিক বৈক্লব্য না বাড়িয়া সন্তোষ ও সহানুভূতি জাগ্রত হইবে এই আশায় হিন্দু জনসাধারণের ন্যায্য দাবী সরেজমিনে হাজির করাই ভাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাংলা দেশের অনেক জায়গায় হিন্দু মুসলমানের বাস এমন ভাবে মিলিত যে সীমারেখা স্থির করা দুঃসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রেই দুই পক্ষ আপোষক্রমে লোক বিনিময় না করিলে সংহতিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। উপরন্তু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এমন উৎকট ব্যাধি হইয়া উঠিয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে নোয়াখালির ঘটনা পুনরাবৃত্তি সর্ব্বদাই সম্ভব। মাৎস্যন্যায়ের ভয়ে বহু হিন্দু যে পৈত্রিক ভদ্রাসন, ঘর বাড়ী, পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় বঙ্গে চলিয়া আসিবে ইহা কল্পনাতীত নহে। এই সকল গৃহচ্যুত নরনারীকে পুনরায় যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় এইরূপ ভূখণ্ড হাতে থাকা প্রয়োজন।

বাংলা দেশের প্রাকৃতিক মানচিত্রের দিকে নজর করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে সীমানার চতুঃপার্শ্বের প্রাকৃতিক দান, উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের খণ্ডগিরি এবং পূর্ব্বে গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়। এই সকল পাহাড় পর্ব্বতবিনির্গত ক্ষীরতোয়া গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, আত্রেয়ী, দামোদর, অজয় ও গোমতী এবং ইহাদের সহস্র শাখাপ্রশাখায় বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ। বহুশত বৎসরের অবহেলায় আমাদের সমুদয় নদনদী হাজামজা হইয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর সুখ ও স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিকোন বর্ত্তমান নদ নদীর দুরবস্থা দেখিয়া সঙ্কীর্ণ হওয়া সঙ্গত নহে, বরং যতদুর সম্ভব প্রাকৃতিক দানকে কেন্দ্র করিয়াই যাহাতে নববঙ্গ গঠিত হয় তজ্জন্য অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই কথা বলিবার সময় পূর্ব্ববঙ্গের দাবী ও আমাদের স্মরণে আছে। দুই বঙ্গেরই ভবিষ্যৎ সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়াইতে হইলে নদী শাসন হওয়া দরকার হইবে। বর্ষার জলরাশি নদনদীর উৎপত্তিস্থলে উপযুক্ত ভাবে নির্ম্মিত জলাধারে রক্ষিত হইয়া জলসেচ প্রণালীতে সমস্ত বৎসর বিতরণ সম্ভব হইলেই কৃষি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যবসা বাণিজ্যের পত্তন হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপজাত লভ্য হিসাবে বিদ্যুৎশক্তি আমাদের যুগোপযোগী বর্ত্তমান সভ্যতার মান উন্নয়নে সাহায্য করিবে।

সরকারী শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কর্তৃত্ব মোটেই না থাকায় গত ১৭৫ একশত পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে নদনদীর উল্লেখযোগ্য কোনও সংস্কার হয় নাই, শিক্ষিত দেশবাসী ও চিন্তাহীন ভাবে সহরাভিমুখী হওয়ায় নদনদীর সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আন্দোলন হয় নাই, ফলে অধিকাংশ নদনদী হাজামজা হইয়া খাল বিলে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা জলপ্লাবনের প্রাবল্যে নদীর খাতই পাল্টাইয়া গিয়াছে, ভূকম্পনে নদীর খাত উচ্চ হইয়া যাওয়ায় স্রোত, উপস্রোত ও জলধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; উত্তরবঙ্গে ত্রিস্রোতা ছোট ও বড় সকল নদীকে জল সরবরাহ করিত। জলপ্লাবনে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায়, ত্রিস্রোতার খাত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হওয়ায় নূতন নদী সৃষ্টি করিয়াছে; ফলে ত্রিস্রোতা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্ভরশীল নদনদী মজিয়া যাওয়ায় উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের আবহাওয়াই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ধনধান্যে ভরা বরেন্দ্র ভূমির অবস্থা শোচনীয়, ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তাণ্ডবে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। মধ্য বঙ্গের অবস্থাও তদ্রূপ। ভাগীরথী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, মধুমতী প্রভৃতি নদনদী শুষ্ক হওয়ায় মধ্য বঙ্গের স্বাস্থ্য অত্যন্ত হীন। এইরূপ অবস্থায় স্বাধীন নববঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের স্রষ্টাদের নদনদী শাসন হইবে প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার বিপুল জলরাশি বিফলে বহিয়া যাইতে না দিয়া পূর্ব্বোক্ত নদনদীর খাতের মধ্যে প্রবহমান হইলে পুনরায় উভয় বঙ্গই সুখ স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই উভয় কারণেই বঙ্গ ভঙ্গের সময় নদনদীকে প্রাকৃতিক সীমানা ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

সীমানা ধার্য্য করিবার সময় ভৌগলিক কারণ ব্যতীত প্রাচীন ইতিহাস, গাথা নৃতত্ত্ব অবগত হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গের পলিয়া, রাজবংশী কৈবর্ত্ত; মধ্যবঙ্গের পোদ, বাগ্দী, নমশূদ্র এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা, টিপরা প্রভৃতি জাতি অত্যন্ত অনগ্রসর। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নমশূদ্র জাতি শিক্ষা দীক্ষায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর বলিয়া অপেক্ষাকৃত সংহত ও শক্তিশালী; তত্রাচ নোয়াখালীতে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা স্মরণ করিলে অনগ্রসর জাতির পাকিস্থানে অবস্থান ভীতিপ্রদ। হিন্দুসমাজের সত্যিকার আসল "শক্তি" এই কৃষকসম্প্রদায় পাকিস্থানী "নেকড়ে"র খপ্পরে পড়িলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর নিস্পৃহতা ও দূরে থাকার নীতির জন্য এবং প্রতিবেশী মুসলমান-সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংঘর্ষ, বিপরীত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মধ্যে বসবাস করিয়া এই সকল নিরীহ কৃষকসম্প্রদায়ের ২।১টী পরিবার প্রতিদিনই মুসলমান হইতে বাধ্য হইতেছে। সামান্য কারণেই একঘরে ও "হুঁকা তামাক" বন্ধ, কিম্বা সামাজিক দণ্ড এঁদের মধ্যে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। হঠাৎ পদস্খলিতা, বিপদগামিনী নারী কিম্বা অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার "সাতঘাট" ঘুরিয়া "বৈষ্ণব" হওয়ার চেয়ে মুসলমান হইয়া গৃহ পরিবার এবং আশ্রয় পাওয়া অনেক সুবিধাজনক। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর হীন দৃষ্টির জন্য এই সকল সম্প্রদায়ের বহুল ক্ষতি হইয়াছে। এখন দৃষ্টিচক্রের আবর্ত্তন হইলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন পাকিস্থানী হিন্দুসমাজ আক্রমণশীল মৌলভীদের প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কিনা বিবেচ্য বিষয়, কাজেই বঙ্গ ভঙ্গের সহিত অল্পাধিক লোকবিনিময় করিতেই হইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের সাম্প্রতিক নাটকীয় দুর্ঘটনাসমূহ অদুর সম্ভাব্য লোক চিনিয়া সমর্থন করে, অন্যথায় হিন্দুকেই চলিয়া আসিতে হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা কিন্তু বিপরীত। এখানকার চাক্‌মা, টিপরা প্রভৃতি জাতীয় লোকদের স্বগোত্রীয় নরনারীরা স্বাধীন ত্রিপুরা ও কাছাড় অঞ্চলে বসবাস করে। ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারেও নৈকট্য বন্ধনে আবদ্ধ, কাজেই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আসাম ও স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ অন্য কারণেও উজ্জ্বল, এই অঞ্চলের দুই ধারেই পেট্রোলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বাস হয় এখানেও পেট্রোল আছে, তুলা ও কাঠের জন্য পাকিস্থান এই অঞ্চল

পাইতে ব্যগ্র হইবে। আসাম সরকার মারফৎ ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের এই অঞ্চলের ভার লওয়া দরকার। পরে প্রতি বিভাগের সীমানা, আয়তন ও লোকসংখ্যা দেওয়া হইল।

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাচীনতম উপনিবেশ হইল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি। আর্য্যগণের আগমনের পরে ঐতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলের রাষ্ট্রের নাম হইয়াছিল বরেন্দ্রভূমি। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কিম্বা বরেন্দ্রভূমি পালরাজাগণের নানা কীর্ত্তি, রামপালের রামাবতী, লক্ষ্মণ সেনের লক্ষ্মণাবতী, অশেষ স্মৃতিবিজড়িত গৌড় নগরী, বিদ্রোহী ভীম ও দিব্যকের জন্মভূমি, রাজা গণেশের জন্মস্থান, রাজা কংসনারায়ণের তাহিরপুর, রাণীভবানীর নাটোর, দার্শনিক ও বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ সনাতনের জন্মস্থান রামকেলী, দাসনরোত্তমের খেতুর, বহু যুদ্ধের স্নায়ুকেন্দ্র ও স্মৃতিবিজড়িত মহানন্দা, আত্রেয়ী ও করতোয়া প্রভৃতি নদনদী বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নববঙ্গের জয়যাত্রার সহিত বাঙ্গালী এই পুরাকীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইতে অশক্ত। এই সকল পবিত্র স্থান ও পুণ্যতোয়া নদীর কিয়দংশ যাহাতে নূতন বঙ্গের অধিকারভুক্ত হয় তাহার জন্য প্রবল আন্দোলন এখন হইতে সুরু হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গের নদনদীর বেশীর ভাগ হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মহানন্দা গোদাগাড়ীর নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে, নিম্ন বরেন্দ্রভূমিতে কয়েকটী নদী আড়াআড়ি পদ্মা হইতে উত্থিত হইয়া পদ্মা কিম্বা যমুনায় পতিত হইয়াছে। কাজেই কোন একটা নদী অবলম্বন করিয়া সীমারেখা করার অসুবিধা আছে, উত্তর বঙ্গের যে অঞ্চলে (বরেন্দ্রীর মাঠে) একই নদীতে সীমানা টানা যায় না—সেখানকার উচ্চতা সমুদ্র গর্ভ হইতে প্রায় সর্ব্বত্রই কম বেশী সমান, কাজেই নদী দ্বারা সোজা রেখা বর্ত্তমানে পাওয়া অসুবিধা হইলেও পুরাতন খাত উদ্ধার করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা সহজেই সম্ভব। ইহাতে একাধারে সীমানা ও জলসেচ প্রণালী দুইই সম্ভব হইবে। আত্রেয়ীর পূর্ব্বতটে বালুরঘাট সহর ও মহকুমা হিন্দুপ্রধান, কাজেই আত্রেয়ী * নদীকে সীমানা করা হইলে একটী হিন্দুপ্রধান অংশ হারাইতে হয়। সেই জন্য যদি আত্রেয়ীর সমান্তরাল শাখা নদীকে (ইহার নামও যমুনা) পূর্ব্ব সীমানা ধরা যায়, ইহাতে দিনাজপুর জেলার মুসলমান প্রধান অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই যমুনা রাজসাহী জেলার নওগাঁর নীচে আত্রাই ষ্টেসনের নিকটে আত্রাই নদীর সহিত মিশিয়াছে। পরে আত্রাই নদীর উজান ধরিয়া মান্দা থানার নিকটে শিব নদীতে পড়িয়া নওহাট্টার নিকটে বারানই নদীতে আসা যায়। এই নওহাট্টা রাজসাহী নগরীর উপকণ্ঠ। তদনন্তর পদ্মার উজান বহিয়া মালদহের নীচে গঙ্গায় আসিলে জাতীয়তাবাদী উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের সীমানা পাওয়া যায়। † এই সীমানার মধ্যে প্রাপ্ত কতিপয় পুণ্যশ্লোক নদনদী ও কয়েকটী প্রাচীন কৃষ্টির ধ্বংসোন্মুখ তীর্থক্ষেত্র, ভাবী ভাবধারার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা। এই অঞ্চলের মধ্যে কয়েক জায়গায় মুসলমান অধ্যুষিত স্থান আছে। নিরবচ্ছিন্নতা ও নৈকট্যজনিত স্থানগুলি দরকার। এই সকল অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসী যদি জাতীয় বঙ্গে থাকিতে অসম্মত হয় তবে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া পাকিস্থান অঞ্চলের হিন্দুদের সহিত লোক বিনিময় করা সঙ্গত। লোক বিনিময় কষ্টসাধ্য হইলেও রাষ্ট্রের সংহতি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা বিদূরিত করিবার জন্য প্রয়োজন হইবেই হইবে। ১৯৪১ সালের লোক গণনা রাজনৈতিক চাতুর্য্যপূর্ণ বলিয়া সন্দেহ হয়। রাজসাহী জেলার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালের লোক গণনায় ৪.৬% ভাগ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৪১ সালের লোক গণনায় উক্ত হ্রাস বন্ধ হইয়া ১৩.৩% বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ সাল অপেক্ষা মুসলমান বাড়্তির হার অনুপাতে বেশী বলিয়া, অথচ রাজসাহীর স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বলিয়া এই বাড়্তি রাজনৈতিক চালবাজী মনে হয়।

দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী—প্রধানতঃ হিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের এখানে বাস। সামাজিক সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য সমসমাজ প্রতিষ্ঠা ও নির্ব্বিচারে লোকশিক্ষার প্রচার হইলে এতদঞ্চল শক্তিশালী জনপদে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। ত্রিস্রোতা শাসিত হইলে সস্তাবিদ্যুতশক্তিতে সমস্ত অঞ্চলে ব্যবসার পত্তনে অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

রংপুর—রংপুর মুসলমানপ্রধান জেলা। হিন্দুর মধ্যেও অনগ্রসর রাজবংশী ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিই বেশী। কোচবিহারের সংলগ্ন ডিমলাও হাতীবাঁধা হিন্দুপ্রধান, ইহার সহিত প্রায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত ডোমার ও কালীগঞ্জ থানা নববঙ্গে আসিতে পারে। শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর অমুসলমান রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণী রক্ষার জন্য এই অংশকে হিন্দুবঙ্গে আনা দরকার। এই এলাকার নিম্নেও সংখ্যালঘিষ্ঠ বহু রাজবংশীর বাস, তাহাদের ভবিষ্যৎ আশা ও আশ্রয় হইবে এতদঞ্চল।

দিনাজপুর—মুসলমানপ্রধান ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ী ও চিরিরবন্দরের পূর্ব্বাংশ এবং খানসামা থানার পূর্ব্বাংশ যমুনা নদীর পূর্ব্বধারে থাকায় যমুনা নদী সীমান্ত হইলে অবশিষ্ট দিনাজপুর জেলার অমুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। থানা হিসাবে দেখিলে এই জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণে কয়েকটী থানায় মুসলমান আধিক্য আছে। কিন্তু এই থানাগুলি হিন্দু অঞ্চল পরিবেষ্টিত এবং অন্যান্য হিন্দুজনপদের সান্নিধ্যজনিত নববঙ্গে থাকা দরকার। নূতন দিনাজপুর জেলার অমুসলমানের সংখ্যা ৫৩%জন হইবে।

মালদহ ও রাজসাহী—সামান্য ন্যূনতাবশতঃ মালদহ জেলা মুসলমান প্রধান। মুসলিম প্রধান কয়েকটী থানা হিন্দুপ্রধান মালদহ ও বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত; বাকী কয়েকটী থানা মুর্শিদাবাদ ও মালদহের মধ্যস্থলে সংযোগ সেতুরূপে থাকায় হিন্দুবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বাতিল করা সম্ভব নহে। নববঙ্গের উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগ এবং একমাত্র রেল লাইন লালগোলা ও গোদাগাড়ী ঘাট এই সীমান্তে স্থিত বলিয়া গোটা মালদহ জেলাকেই নববঙ্গে আনয়ন দরকার। মুসলিম জনসাধারণের জাতীয়

---

* আত্রেয়ীর বর্ত্তমান নাম আত্রাই।

† সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গের সীমানা অনুরূপ হওয়া উচিৎ বলিয়া স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

নববঙ্গে অবস্থান আপত্তিমূলক হইলে ২।৩ লক্ষ জনবিনিময় করিলেই এতদঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হয়। যাঁহারা মালদহের মহানন্দা নদীকে পূর্ব্বসীমান্ত করিতে চাহেন তাঁহারা দিনাজপুরের বালুরঘাট অঞ্চলের সহিত মালদহের সীমান্ত রক্ষা করিবেন কিরূপে? কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত যমুনা, আত্রেয়ী, শিবনদী, বারানই, বড়ল এবং পদ্মা উত্তর বঙ্গের পূর্ব্ব সীমানা হওয়া সঙ্গত। এই সীমানার মধ্যে বরেন্দ্রভুক্তির কয়েকটী ঐতিহাসিক জনপদের কিছু কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া স্বাধীন জনসাধারণের তীর্থস্থানরূপে ভাবী কর্ম্মীদের প্রেরণা দিবে সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং যশোহর জেলার নদনদীর কথা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অনগ্রসর জাতির অবস্থা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তর বঙ্গের ত্রিস্রোতার ন্যায় মধ্যবঙ্গের নদনদী পদ্মার জলেই পুষ্ট থাকিত, ব্রহ্মপুত্রের গতি পশ্চিমাভিমুখী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা বিগতযৌবনা, শাখা প্রশাখাও কাজেই মৃতা। অপর কারণ পদ্মার পাড় উঁচু হইয়া যাওয়ায় নদীর খাত মৃত্তিকায় জমিয়া গিয়া জলপ্রবাহ বন্ধ হইয়াছে। এই সকল ঘটনা দুই এক বছরে ঘটে নাই, শত শত বৎসরের মধ্যে কোন সংস্কার না হওয়ায় পলি জমিয়া কিম্বা চর পড়িয়া নদীর গতি বদলাইয়া গিয়াছে, ধারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সহজেই পলিপূর্ণ হইয়া মজিয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নদনদী সবই মৃতকল্প। গোবরা বলিয়া একটা পুরাতন নদী রাণাঘাট লালগোলা রেল লাইনের পূর্ব্বদিকে অনেকটা সমান্তরাল ভাবে পূর্ব্ব দক্ষিণ বাহিনী হইয়া শূটী নামক একটী ক্ষুদ্র নদীর সহিত মিলিত হইয়া নওয়াদা থানার সমীপবর্ত্তী পাটকাবাড়ীর নিকটে জলঙ্গী নদীতে পড়িয়াছে। এই গোবরা নদীর উত্তর পাড়ে মুসলমান আধিক্য অত্যন্ত বেশী। গোবরাকে সীমান্ত ধরিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার হিসাব নিম্ন তপশীলে বর্ণিত হইল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের মধ্যে সান্নিধ্য, নৈকট্য ও নিরবচ্ছিন্নতার জন্য জঙ্গীপুর মহকুমার কয়েকটী থানা ধরা হইয়াছে।

	আয়তন		মুসলমান	অমুসলমান
কান্দী মহকুমা	৪৫৪	বর্গ মাইল	১৪৭৯০৯	২০৭৩৭০
জঙ্গীপুর মহকুমা	৪৩৪	"	২৩৮৩৮৮	১৭৩২৩৩
জিয়াগঞ্জ থানা	২০	"	২৬৮৫	২০৪৬২
নবগ্রাম থানা	১১৮	"	২২৪২৯	৩৪১৯২
বহরমপুর টাউন ও থানা	১২৬	"	৪২৭৭৭	৬৭১৯৭
বেলডাঙ্গা	১৪৩	"	৭৭৩০০	৩৭৩৩৪
নওয়াদা (শূটী নদীর নিম্নাংশ)	৪৩	"	১৬১৪৭	১১৫৭৮
লালবাগ থানা (গোবরার নিম্নাংশ)*	১৮	"	১০০০০	১০০০০
ভগবান গোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৩৯	"	২১৪৩২	৪৯৪৩
লালগোলা (গোবরার নিম্নাংশ)*	৪২	"	২৬৬০৮	৮৭২৩
	১৪৩৭		৬০৫৬৭৫	৬০,৫০২ ৯

নদীয়া—গোবরা নদী মুর্শিদাবাদ জেলায় জলঙ্গীতে পড়িয়াছে, ভৈরব নদ মুর্শিদাবাদের দমকল থানার নিকটে জলঙ্গী নদীকে আড়াআড়ি ভেদ করিয়া নদীয়া জেলাকে প্রকৃতপক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। এই জেলায় ভৈরবের নিম্নাংশ হিন্দুপ্রধান এবং উত্তরাংশ মুসলমানপ্রধান। নিম্নে আয়তন ও লোকসংখ্যা দেখান হইল।

	আয়তন	মুসলমান	অমুসলমান
রাণাঘাট মহকুমা	৫৪১	১১৯৯৫৬	১৪৬১৮৪
সদর মহকুমা	৫৬২	১৫৩২০৪	১৮৭৭৭৯
তেহাট্টা থানা	১৭৫	৫২৬৩৭	৩৯৯০২
সহর সমেত মেহেরপুর থানা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৭০	২২০০০	২৪০০০
করিমপুর (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৮২	৩৯০০০	১১০০০
কৃষ্ণগঞ্জ থানা	৫৮	১৫০৭৫	১৯৩২৫
ডামুর হুদা (ভৈরবের নিম্নাংশ)*	৫৯	১৭০০০	১৭৫০০
	১৫৪৬	৪১৮৮৭২	৪৪৫৩৯—

যশোহর—মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ থানায় ভৈরব নদকে লম্বালম্বি ভেদ করিয়া মাজদিয়া ষ্টেশনের নিকটে যশোহর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, যশোহর জেলায় একই নদী কপোতাক্ষ নামে পরিচিত, মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি বক্ষে নিয়ে কপোতাক্ষও বঙ্গদেশে ধন্য। যশোহর মুসলমানপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের সহিত অভয়নগর, শালিখা, কালিয়া, নড়াইল এবং নবগঙ্গা নদী বিচ্ছিন্ন লোহাগড় থানার লোকসংখ্যা একত্র করিলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, ১৯৩১ সালে যশোহর জেলা ক্ষয়িষ্ণু ছিল, লোকসংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল, যশোহরের বিখ্যাত ম্যালেরিয়া ও মহামারীর তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস না পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের গণনায় লোকসংখ্যা ৯.৪ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে, কাজেই লোকগণনায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, এই অঞ্চল পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুপ্রধান ২৪ পরগণার ও খুলনার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এবং জাতীয় বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রাজনৈতিক কারণেও জাতীয় বঙ্গে থাকা দরকার; মুসলমানদের আপত্তি থাকিলে লোক বিনিময় প্রথায় উত্তর যশোহরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের এতদঞ্চলে আনয়ন করিলে সংহতি বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

	আয়তন	মুসলমান	অমুলসমান
বনগ্রাম মহকুমা	৬৪৯	১৬৬৫১৪	১০৩৫৬৮
ঝিকরগাছা থানা (কপোতাক্ষ নদীর দক্ষিণাংশ)	৭৯	৩০৫৩২	১৩০১৪
কেশবপুর থানা	১০০	৪৯৩২২	২৭৭৫৪
অভয় নগর "	৯৫	৩০৫০৫	৩৯৭৪৩
নড়াইল "	১৪৮	৪৮০৯৩	৬২৫৯০
কালিয়া "	১১৮	৬১৫৩৫	৬১৬৩৪
শালিখা "	৮৮	২৩৮৯৩	২২৪১০
লোহাগড় থানা (নবগঙ্গার দক্ষিণাংশ)	সংখ্যা জানা নাই		
	১২৭৭	৩০৭৩৯৪	৩৩০৭২৩

* থানার উপরে হিন্দুই সংখ্যাগুরু, কাজেই থানার বর্হিভাগে বিচ্ছিন্ন অংশে উপরের সংখ্যা হইতে মুসলমান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা।

ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ—ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ, রাজৈর, কলকিনী ও মাদারীপুর থানার পশ্চিমাংশ (আড়িয়ল খাঁর পশ্চিমে) হিন্দুপ্রধান অঞ্চল। ইহার সহিত বাখরগঞ্জের গৌড়নদী থানা, উজীরপুরথানা, বাবুগঞ্জ থানার অংশ বিশেষ, বরিশাল কোতোয়ালীর অংশবিশেষ, নলচিঠি সহর সহ নলচিঠি থানার অংশ বিশেষ, স্বরূপকাঠি থানা, বানরিপাড়া থানা এবং নাজিরপুর থানা এই সকল জায়গার স্বাভাবিক পূর্ব্ব সীমানা আড়িয়াল খাঁ, পাণ্ডব, বিশখালী, কাচা, ধলেশ্বর নদী, সম্পূর্ণ ভূখণ্ডের আয়তন ও সীমানা দেওয়া হইল। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য দুই জেলার বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের সহিত যশোহর জেলার পূর্ব্বাঞ্চলের অংশগুলি যোগ দিয়া দুইটী বিভিন্ন জেলা হইতে পারে। এই অঞ্চলের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫৭।

গোপালগঞ্জ	৬৭২ বর্গ মাইল	২৬৮২৩৩	৩৪৮৭৭৯
রাজৈর থানা	৮৭ ”	৫৭৭৩৮	৬০৪৫৯
মাদারীপুর ও কলকিনী (আড়িয়ল খাঁর নিম্নাংশ)	সংখ্যা ঠিক হদিশ জানা নেই		
হিন্দু প্রধান বাখরগঞ্জ	৭০০	৫৬০৫৭৯	৫৭৭৫৬৩
	১৪৪৯	৮৮৬৫৫০	৯৮৬৮০১

বঙ্গ দেশের লোকসংখ্যা, আয়তন, জাতীয় বঙ্গ ও পাকিস্থানের হিসাব ও আলাদা তপশীলে দেখান হইল, জাতীয় বঙ্গের আয়তন দাঁড়াইতেছে ৪৪৭৪৬ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের হিসাব বাদ দিলে দাঁড়ায় ৩৯৭৩৯ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গের মাত্র ৫৪.৮৫ ভাগ ভূখণ্ড জাতীয় বঙ্গে পড়ে। ইহার ভিতর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩০০০০ বর্গ মাইলেরও কম। বর্ত্তমান হিন্দুর অধিকৃত সম্পত্তির অপেক্ষা এই পরিমাণ অনেক কম। জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, খুলনা, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের লঘু বসতি ও পাহাড় পর্ব্বত অরণ্যসঙ্কুল অনুর্ব্বর স্থান বিবেচনায় হিন্দুবঙ্গের এই পরিকল্পনা আপোষ ও শান্তির পরিচায়ক। ভাই ভাই বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় এক পক্ষের দাবী সহজ না হইলে আপোষমূলক মনোভাবের প্রকাশ হৃদয় স্পর্শ করে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন বঙ্গে হিন্দুর বাস হইবে ৬৯·৩% এবং মুসলমান থাকিবে ৩০·৭%। পাকিস্থানে মুসলমানের বাস হইবে ৭৩% এবং অমুসলমান থাকিবে শতকরা ২৭। নিম্নে তপশীলে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।*

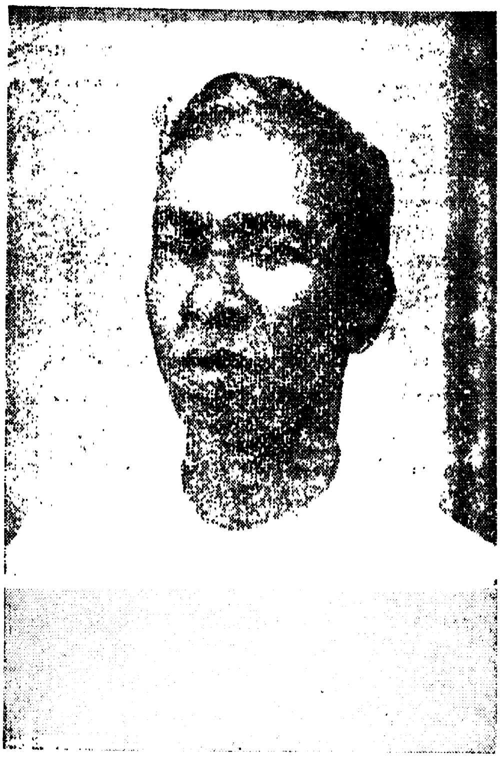
* প্রবন্ধ প্রেসে যাওয়ার পরে কলিকাতা পৌরসভার মেয়র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় বঙ্গের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহা অনেকটা অনুরূপ।

		মুসলমান	অমুসলমান	আয়তন		
অখণ্ড বাংলা		৩৩০০৫৪৩৪	২৭৩০১০৯১	৭৭৪৪২		
৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী নববঙ্গ	প্রেসিডেন্সী বিভাগ	২১০৭৩৫২	৩৩৭২২৫২	৮৫০১		
	বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪২৯৫০০	৮১৫৭৮৬৯	১৪১৩৫		
	রাজসাহী বিভাগ	২৬০৫৮৫	১৪৫৮৭৫৭	৪২৪২		
	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭২৭০	২৩৯৭৬১	৫০০৭		
		৩৮০৪৭০৭	১৩৯২৮৬৩৯	৩১৮৮৫		
বাউণ্ডারী কমিশনের নিকটে উত্থাপিত পরিকল্পনা	নদীয়া জেলা হইতে	৪১৮৮৭২	৪৪৫৩৯০	১৫৪৬		
	মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে	৬৫৬৭৫	৬০৫০২৯	১৪৩৭		
	যশোহর হইতে	৩০৭৩৯৪	৩৩০৭২৩	১২৭৭		
	রাজসাহী হইতে	৩০৪২৮৬	১৭৭৩৫৬	১১৪৪		
	দিনাজপুর হইতে	৮০৬৫৪৮	৮৮৬৯৪৬	৩৪৯২		
	রংপুর হইতে	১৮২২৪১	১৮০৫৬৩	৫০২		
	বরিশাল হইতে	৫৬০৫৭৯	৫৭৭৫৬৩	৭০৩		
	ফরিদপুর হইতে	৩২৫৯৭১	৪০৯২৩৮	৭৫৯		
	মালদহ হইতে	৬৯৯৯৪৫	৫৩২৬৭৩	২০০৪		
		৪২১১৫১১	৪১৪৫৪৮১	১২৮৬১		
প্রস্তাবিত নববঙ্গ		৮০১৬২১৮	১৮০৭৪১২০	৪৪৭৪৬	৩০·৭%	৬৯·৩%
প্রস্তাবিত পাকিস্থান		২৪৯৮৯২১৬	৯২২৬৯৭১	৩১৮৭৬	৭৩·৯%	২৭·০%

সাময়িকী

বাঙ্গালা বিভাগের সিদ্ধান্ত—

গত ২০শে জুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ বাঙ্গালা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বাঙ্গালা বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—প্রস্তাবের পক্ষে ৫৮ জন ও বিপক্ষে ২১ জন সদস্য ভোট দেন। পক্ষে ৫৮ জনের মধ্যে ৪৯ জন কংগ্রেস দলের, ৪ জন এংলো ইণ্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ২ জন কম্যুনিষ্ট ও ১ জন স্বতন্ত্র দলভুক্ত ছিলেন। বিপক্ষের ২১ জন সদস্যই মুসলেম লীগ দলভুক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যগণ মিলিত হইয়া বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য গ্রহণ করেন—পক্ষে ১০৬ জন ও বিপক্ষে ৩৫ জন সদস্য ভোট দেন—পক্ষের ১০৬ জনের মধ্যে ১০০ মুসলেম লীগ, ৫ জন তপশীলী ও ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান। বিপক্ষের ৩৫ জনের মধ্যে ৩৪ জন কংগ্রেস দলের ও ১ জন কম্যুনিষ্ট। পক্ষের ৫ জন তপশীলী সদস্য ছিলেন—(১) দ্বারিকানাথ বারোরী মন্ত্রী (২) নগেন্দ্রনাথ রায় মন্ত্রী (৩) ভোলানাথ বিশ্বাস পার্লামেণ্টার সেক্রেটারী (৪) হারাণচন্দ্র বর্ম্মণ পার্লামেণ্টারী (৫) গয়ানাথ বিশ্বাস মৈমনসিংহ। উভয় দল মিলিত হইয়া সভা করিলে বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ৯০ জনও বিপক্ষে ১২৬ জন সদস্য ভোট দেন—৩ জন কম্যুনিষ্ট নিরপেক্ষ ছিলেন।



ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীতারক দাস

হরিদ্বারে জহরলাল ও গান্ধী—

গত ২১শে জুন মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভোরে মোটরযোগে দিল্লী হইতে বাহির হইয়া হরিদ্বার গিয়াছিলেন ও রাত্রি ৯টায় উভয়ে মোটরে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গা ভয়ে ভীত ৩৫ হাজার লোক হরিদ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গান্ধীজি সকলকে পশুবলের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া সাহসের উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

নূতন ভারত শাসন আইন—

বিলাতের মন্ত্রিসভা যে নূতন ভারত শাসন আইন রচনা করেন, সে বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত জানিবার জন্য উক্ত বিল ১লা জুলাই বড়লাটের নিকট প্রেরিত

হইয়াছিল। বড়লাট তাহা ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দেখিতে দেন। ৩রা জুলাই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার পেটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী, সার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ কে-এম-মুন্সী ও সার বি-এন-রাও বড়লাটের সহিত মিলিত হইয়া আইনের সংশোধন সম্বন্ধে প্রস্তাব আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁও স্বতন্ত্রভাবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন। ৪ঠা জুলাই ঐ আইনের খসড়া বিলাতের কমন্স মহাসভায় উপস্থিত করিয়া প্রচার করা হইয়াছে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় নুতন মন্ত্রিসভা—

গভর্ণর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে ১১জন সদস্য লইয়া নুতন মন্ত্রিসভা শ্যামাপ্রসাদবাবু মন্ত্রী হইতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার স্থানে কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্নে ৯জনের নাম ও কে কোন বিভাগে কাজ করিবেন, তাহা দেওয়া হইল—(১) ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—প্রধান মন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র ও আবগারী (২) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (তাহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা) অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (৩) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—শিক্ষা, সেচ ও জল সরবরাহ (৪) ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম (৫) শ্রীরাধানাথ দাস—বেসামরিক সরবরাহ (৬) শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—বিচার ও ব্যবস্থা (৭) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—কৃষি, বন ও মৎস্যের চাষ (৮) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব ও জেল (৯) শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—সমবায়, সাহায্যকার্য্য ও পূর্ত্ত।



পশ্চিম-বঙ্গের নূতন মন্ত্রীগণ—কার্যভার গ্রহণের পর (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র লস্কর, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস, শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বর্মণ এবং শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

ফটো—শ্রীতারক দাস

গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা সংযুক্ত বাঙ্গালার পুরাতন মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত কাজ করিবেন। ১১জনের মধ্যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বর্ত্তমানে আমেরিকায় আছেন, তিনি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ডাঃ ঘোষ প্রথমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অন্যতম মন্ত্রী স্থির করিয়াছিলেন—

সম্মেলন নিষিদ্ধ—

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের অধিবাসীরা গত ২২শে জুন রাণাঘাটে সকলে সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নসিরুদ্দীন ও রাণাঘাটের মহকুমা হাকিম মিঃ ইয়াকুব আলি খাঁ সম্মিলনের

পূর্ব্ব দিন এক আদেশ জারি করিয়া সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য—হিন্দুগণই সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়—

পূর্ব্ব কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রায় বিনা বাধায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কালীপদবাবু দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেসের সেবা করিতেছেন।



নেতাজীর অগ্রজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুর বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ভোটদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

এম-এল-এ দণ্ডিত—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর ফরিদ আহমদ চৌধুরী ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রতারণা করার অভিযোগে আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইবিউনালের বিচারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। টাকা না দিলে আরও এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার ম্যানেজার আবদুল গণিও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভারত বিভাগের কার্য্যারম্ভ—

গত ১২ই জুন হইতে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কমিটীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ও সর্দ্দার আবদার রব নিস্তার উক্ত কমিটীর সদস্য হইয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের নেতা—

নব গঠিত হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশে ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব অমুসলমান দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি—

বিলাতের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ ভারতের সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা উভয় স্থানেই সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীতে নেতৃত্ব করিবেন।



বর্দ্ধমানাধিপতি কর্তৃক মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান জেলাগুলির প্রতিনিধিদের সভায় বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ভোটের ফলাফল ঘোষণা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

মিলন প্রচেষ্টা—

ভারতে নূতন রাজনীতিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একত্র মিলিত হইবে—উভয় প্রতিষ্ঠানই শ্রমিকদের কল্যাণ চেষ্টায় নিযুক্ত। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতারাও নিজেদের দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কংগ্রেসে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিবেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও শ্রীযুত জয়প্রকাশনারায়ণ উক্ত দলের প্রধান কর্ম্মী।

পশ্চিম পাঞ্জাব ও গণ-পরিষদ—

পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) মিঃ এম-এ-জিন্না, (২) মিঃ আবদুর রব নিস্তার (৩) রাজা গজনফর আলি (৪) মামদোতের খাঁ ইফ[illegible]র খাঁন (৫) মালিক

ফিরোজ খাঁ নুন (৬) মিয়া মমতাজ দৌলতানা (৭) মিয়া ইফতিকার উদ্দীন (৮) বেগম সাহ নওয়াজ (৯) সর্দ্দার সৌকত হায়াৎ খান (১০) চৌধুরী নাজির মহম্মদ খান (১১) শেখ কেরাম আলি (১২) ডাঃ ওমর হায়াৎ খাঁ—১২জনই মুসলমান। শিখদল হইতে নিম্নলিখিত ২জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং (২) জ্ঞানী কর্ত্তার সিং।

পাকিস্থান সংখ্যালঘুদের সমস্যা—

সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ চৈৎরাম গিদোয়ানির উদ্যোগে শীঘ্রই দিল্লীতে পাকিস্থান অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের এক সভায় তাঁহাদের দাবী-সমূহ স্থির করা হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ এবং পাকিস্থান হইতে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ সম্মেলনে



বঙ্গ বিভাগ দিবসে ব্যবস্থা-পরিষদ ভবনের প্রবেশ পথে উৎসুক জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

যোগদান করিয়া নূতন ভিত্তিতে কংগ্রেসের কার্য্য করিবার জন্য নূতন নীতি নির্দ্ধারণ করিবেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সকল উপায়ের কথাই সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

পূর্ব্ব পাঞ্জাব গণ-পরিষদ—

পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত ১২জন সদস্য গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার বলদেব সিং (২) সর্দ্দার গুরুমুখ সিং মুসাফর (কংগ্রেস) (৩) বকসী সার টেকচাঁদ (কংগ্রেস) (৪) দেওয়ান চমনলাল (কংগ্রেস) (৫) চৌধুরী রণবীর সিং (কংগ্রেস) (৬) পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব (কংগ্রেস) (৭) অধ্যাপক যশোবন্ত রাও (কংগ্রেস) (৮) মিঃ বিক্রমলাল সোহনী (কংগ্রেস) (৯) মহবুব এলাহি (লীগ) (১০) মহম্মদ আজম (লীগ) (১১) সুফী আবদুল হাসি খাঁ (লীগ) (১২) মৌলনা দাউদ গজনভী (লীগ)।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ—

দিল্লীতে বড়লাটের সভাপতিত্বে ভারত বিভাগ কাউন্সিলের সভায় সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের কথা আলোচিত হইতেছে। সভায় কংগ্রেস পক্ষে সর্দ্দার পেটেল ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মুসলেম লীগ পক্ষে মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি ছাড়াও দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং, প্রধান সেনাপতি লর্ড অচিনলেক ও উড়িষ্যার গভর্ণর সার চন্দুলাল ত্রিবেদী উপস্থিত থাকিতেছেন। সার

চণ্ডুলাল গত যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ভারতীয় সৈন্যদলের কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষজ্ঞ বলা যায়। ১৫ই আগষ্ট হইতে যাহাতে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান পৃথক সৈন্যদল রাখিতে পারে, কমিটী তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

চন্দ্র মজুমদার (৮) শ্রীমতী রেণুকা রায় (৯) উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ (১০) দেবীপ্রসাদ খৈতান (১১) ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (১৩) মুকুন্দবিহারী মল্লিক (১৪) ঈশ্বরসিং গুরুং (১৫) মিঃ আর-ই-প্লাটেন। লীগ হইতে নিম্নলিখিত ৪জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—



বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রাক্কালে লীগ সদস্যদের মধ্যে মিঃ সুরাবর্দ্দী ফটো—শ্রীপান্না সেন

(১) রাখিব আসান (২) জসিমুদ্দীন আহমদ (৩) নাজিমুদ্দীন আমেদ (৪) আবদুল হামিদ।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বসু—

ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনসংস্থাপন সমিতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্র সংঘের বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা, লণ্ডন ও ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর যুদ্ধের সময় ইরাণ, ইরাক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও ইটালীতে কাজ করিয়াছিলেন।

পশ্চিম বাঙ্গালা ও গণ-পরিষদ—

গত ৪ঠা জুলাই পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—কংগ্রেস হইতে ১৫জন—(১) প্রফুল্লচন্দ্র সেন (২) অরুণচন্দ্র গুহ (৩) মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (৪) পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (৫) সতীশচন্দ্র সামন্ত (৬) বসন্তকুমার দাস (৭) সুরেশ-

পশ্চিম পাঞ্জাবে নেতৃত্ব—

মুসলমান প্রধান নবগঠিত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে ৫৭জন মুসলেম লীগ সদস্যের মধ্যে ৫৩জনের সম্মতিক্রমে মালিক ফিরোজ খাঁ নুনকে লীগদলের নেতা নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। পাঞ্জাব মুসলেম লীগের সভাপতি মামদোতের খাঁ ঐ নির্ব্বাচনে বিরোধিতা করিয়াছেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—

১৫ই জুন নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় বড়লাটের ৩রা জুনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মোট ২১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ৩২ জন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। গ্রহণের পক্ষে ১৫৭ ও বিপক্ষে ২৯ জন

সদস্য ভোট দিয়াছেন। ১৪ই জুন গান্ধীজি স্বয়ং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সাধারণ-তন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা—

১৪ই জুলাই হইতে দিল্লীতে গণ-পরিষদের যে পক্ষকালব্যাপী অধিবেশন হইতেছে, তাহাতে ভারতের নূতন সাধারণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত করা হইবে। সেজন্য গণ-পরিষদের বিভিন্ন সাব কমিটীগুলির কাজ শীঘ্র শেষ করা হইতেছে। বৃটেন ১৫ই আগষ্ট উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করার পূর্ব্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের শাসন ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবেন।

দেশবন্ধু দাশ ও আচার্য্য রায়—

গত ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় উভয় মনীষীর মৃত্যুতিথি সাড়ম্বরে পালিত



নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্দেশে নাগরিকদের শ্রদ্ধা নিবেদন ফটো—জে-কে-সান্যাল

হইয়াছিল। সকালে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে দেশবন্ধু দাশের ও নিমতলা শ্মশানঘাটে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রায়ের স্মৃতিসভা হয়। বিকালে স্যার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে এক সভায় আচার্য্য রায়ের এবং মহাবোধী



নিমতলা শ্মশান ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব ফটো—জে-কে-সান্যাল

সোসাইটি হলে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার সভানেত্রীত্বে একটি সভায় দেশবন্ধু দাশের জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে রুসিয়ার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্রাট এই নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ আসফ আলি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ভারতবাসীর সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই।

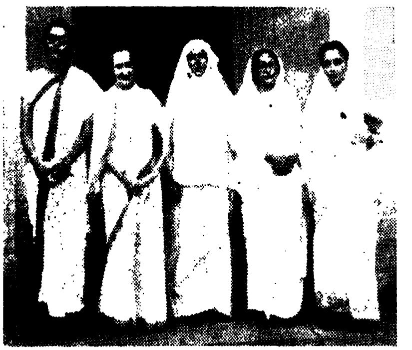
বাঙ্গালা বিভাগ আরম্ভ—

২৬শে জুন হইতে বাঙ্গালাকে দুই ভাগে ভাগ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং লীগের পক্ষ হইতে মিঃ এচ-এস সুরাবর্দ্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীন গভর্ণরকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের ৫ জনকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন 'আই-সি-এস'কেও পরামর্শদাতা হিসাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে—মিঃ এস-এন রায় সি-আই-ই ও মিঃ এন-এম খাঁ।

গণ-পরিষদ ও দেশীয় রাজ্য—

দিল্লীতে ২৬শে জুন এক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে মোট ৯ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। তন্মধ্যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বর্ত্তমান গণ-পরিষদে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের নূতন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।



আইন সভার মহিলা সদস্যগণ…(বাম হইতে) শ্রীমতী বীণা দাস, মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা, মিসেস্ হাসানারা বেগম, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন ও আনওয়ারা খাতুন ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তপ্রদেশে নূতন গভর্ণর—

লেপ্টেনাণ্ট জেনারেল সার রবার্ট লকহার্ট গত ২৬শে জুন উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের নূতন গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থায়ী গভর্ণর সার ওলাফ কেরো ২ মাসের ছুটী লইয়া কাশ্মীরে গিয়াছেন। সীমান্তের অবস্থা এখন দুর্য্যোগপূর্ণ। সীমান্ত গান্ধী দেশবাসীকে গণভোটে যোগদান করিতে নিষেধ করায় তথায় এক দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। সীমান্তবাসী জাতীয়তাবাদীরা 'হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান' সমস্যায় ভোট দান করিবে না—'পাঠানীস্থান ও পাকিস্থান' সমস্যা উপস্থিত করা হইলে ভোট দিবে। এ বিষয়ে গত ২৬শে জুন বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হইল না।

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে অবস্থা—

২৫শে জুন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক বিভাগ ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক ইস্তাহার পাঠাইয়া জানাইয়াছেন—তাঁহাদের বর্ত্তমানে কেবল প্রাত্যহিক শাসনসংক্রান্ত কার্য্য চালাইতে হইবে। কোন নূতন ধরণের কার্য্য 'প্রাত্যহিক ব্যাপার' বলিয়া গণ্য হইবে না। বাঙ্গালার দুইটি ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।



কলিকাতার পৌর সভায় সান ফ্রান্সিসকোর মেয়রের ভাষণ—পার্শ্বে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ফটো—শ্রীতারক দাস

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি-আই-ই ১৪ই জুন শনিবার সকালে কলিকাতা গার্ডেনরীচে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৪ সালে আই-সি-এস হইয়া কলিকাতায় ১০ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া তথায় তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন।

খাদ্যবরাদ্দ হ্রাস—

৩০শে জুন যে সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে সেই সপ্তাহ হইতে গভর্ণমেণ্ট রেশন অঞ্চলে খাদ্যবরাদ্দ কমাইয়া দিয়াছেন—পূর্ব্বে সপ্তাহে সাধারণ লোক ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য পাইত—এখন সে স্থানে ২ সের ৩ ছটাক খাদ্য পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই লোকের উদর পূর্ণ হয় না—ভবিষ্যতে কি হইবে ?

কলিকাতার দাঙ্গা—

গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় যে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও বন্ধ হয় নাই। জুন মাসের প্রথমে কয়েকদিন হাঙ্গামা কম ছিল বটে, কিন্তু গত ২১শে জুন হইতে হাঙ্গামা ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার শেষ কোথায় কে জানে ?

লীগ ও গণ-পরিষদ—

লীগ কর্ত্তৃপক্ষ নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত ২৯ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—(১) আবদুল্লা আল মামুদ (২) এ-এম-এ হামিদ (৩) আবুল কাসিমখাঁ (৪) এ-কে ফজলল হক (৫) ইব্রাহিম খাঁ (৬) ফজলর রহমন (৭) গিয়াসুদ্দীন পাঠান (৮) এচ-এস সুরাবর্দ্দী (৯) হামিদ-উল হক চৌধুরী (১০) ডাক্তার ইস্তিয়াক হোসেন কোরেশী (১১) এম-এ-এচ ইস্পাহানি (১২) লিয়াকৎ আলি খাঁ (১৩) ডাঃ মামুদ হোসেন (১৪) মৌলানা আবদুল্লা বাকী (১৫) খাজা নাজিমুদ্দীন (১৬) সিরাজুল ইসলাম (১৭) মৌলানা সাব্বীর আমেদ ওসমানী (১৮) খাজা সাহাবুদ্দীন (১৯) বেগম এক্রামুল্লা (২০) তামিজুদ্দীন খাঁ (২১) মফিজুদ্দীন আমেদ (২১) নুরুল আমিন (২৩) মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ (২৪) হবিবুল্লা বাহার (২৫) মহম্মদ আলি (২৬) ডাঃ এ-এম মালেক (২৭) নুর আমেদ (২৮) আজিজুদ্দীন আমেদ (২৯) ফরহৎ রেজা চৌধুরী।

নূতন প্রদেশ গঠন—

যুক্তপ্রদেশের মীরাট বিভাগ, আগ্রা বিভাগের আগ্রা, মথুরা ও এটা জেলা, রোহিলখণ্ড বিভাগের বিজনৌর, মোরাদাবাদ ও বাদাউন জেলা এবং গারোয়াল জেলাকে উক্ত প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্ন আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগের ১২টি জেলার সহিত একত্র করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। উহাই এখন সীমান্তপ্রদেশ রূপে গণ্য হইবে।

বাঙ্গালা বিভাগে শিক্ষার অবস্থা—

এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট প্রায় ২৩০০ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও ১১৬টি কলেজ ছিল। বাঙ্গালা বিভাগের ফলে ১২০০ বিদ্যালয় পাকিস্থানে ও ৩০০ বিদ্যালয় আসাম প্রদেশে যাইবে। বাকী ৮ শত বিদ্যালয় বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকিবে। ৩৪টি কলেজ পাকিস্থানে ও ২৩টি আসামে যাইবে এবং বাকী ৫৯টি কলেজ পশ্চিম বঙ্গে থাকিবে। এ বৎসর ৬০ হাজারেরও অধিক ছাত্র ম্যাট্রীক পরীক্ষা দিয়াছে—আগামী বৎসর ৩০।৩৫ হাজারের বেশী ম্যাট্রীক পরীক্ষার্থী ছাত্র পাওয়া যাইবে না।



রাইটার্স্ বিলডিংএর ক্যাবিনেট রুমে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ মহম্মদ আলি ফটো—শ্রীতারক দাস

কলিকাতায় পাইকারী জরিমানা—

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত কলিকাতায় যে সকল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার জন্য কলিকাতার

পুলিস কমিশনার নিম্নলিখিত ৭টি থানার অধিবাসীদের উপর মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৫ শত টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৬২ হাজার, বড়বাজার ৩৮ হাজার, জোড়াসাঁকো ২৩ হাজার ৫ শত, বড়তলা ১০ হাজার, তালতলা ৮ হাজার, মুচিপাড়া ৫ হাজার ও হেয়ার ষ্ট্রীট ৫ হাজার।

সিন্ধু ও গণপরিষদ—

গত ২৬শে জুন সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে ৩৩-২০ ভোটে সদস্যগণ পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কংগ্রেসী সদস্যরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন; ২ জন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য নিরপেক্ষ থাকেন। ৩ জন ইউরোপীয় সদস্য ভোটে যোগদান করিতে পারেন নাই।



বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন অভিমুখে লীগ সদস্যবৃন্দ ফটো—শ্রীতারক দাস

পাঞ্জাব বিভাগ—

২৩শে জুন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একযোগে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান গণপরিষদে যোগদান করিবেন না—পক্ষে ৯১ ও বিপক্ষে ৭৭ জন ভোট দেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের সদস্যগণ স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইয়া স্থির করেন যে পাঞ্জাব প্রদেশ দুই ভাগে ভাগ করা হইবে—ঐ প্রস্তাবের পক্ষে ৫০ ও বিপক্ষে ২২ জন ভোট দেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের সদস্যগণ পৃথক ভাবে মিলিত হইয়া পাঞ্জাব বিভাগের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন—পক্ষে ৬৯ জন ও বিপক্ষে ২৭ জন ভোট দেন। ২ জন ভারতীয় খৃষ্টান ও ১ জন এংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য লীগের পক্ষে ভোট দেন। ৮৮ জন মুসলমানের মধ্যে ৮০ জন লীগ দলভুক্ত—৮ জন ইউনিয়ন দলভুক্ত। হিন্দু, শিখ ও তপশীলী সদস্যদের সংখ্যা ছিল মোট ৭৭।

বিভাগের পদ্ধতি—

ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান—দুই ভাগে ভাগ করিবার জন্য দিল্লীতে বিভিন্ন কমিটী বসিয়াছে ও কাজ করিতেছে। সম্পত্তি বিভাগ কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে—(১) কোন্ অঞ্চল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্য্যন্ত কত টাকা পাইয়াছেন (২) দুইটি অঞ্চলের প্রত্যেকের অধিবাসীর সংখ্যা কত (৩) প্রত্যেক নূতন রাষ্ট্রের আয়তন (৪) প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারকে কত টাকা দেয় (৫) অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটির উন্নতির জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন? ভারত বিভাগের সঙ্গে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগ সমস্যাও রহিয়াছে।

বাঙ্গালা বিভাগ ও সীমা নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা বিভক্ত হওয়ায় উহার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য যে সরকারী কমিশন বসিবে তাহার সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গত ২৩শে জুন বাঙ্গালায় একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত কমিটীর সভাপতি ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমিটীর অন্যান্য সদস্য হইয়াছেন—ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মোদক,

অধ্যাপক ডক্টর এস-পি চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সংখ্যাবিজ্ঞান গবেষণাগারের শ্রীযুক্ত সমর রায়, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর চুনিলাল রায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় ও হরিচরণ ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গ দলের নেতা—

পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ দলের কংগ্রেস সদস্যগণ গত ২৩শে জুন কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে তাঁহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দুকে বাস করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দলের ডেপুটী নেতা, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু প্রধান হুইপ ও শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের নেতা—

গত ২২শে জুন রবিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস সদস্যগণ কলিকাতা কুমার সিং হলে এক সভায় সমবেত হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাদের দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৭ জন সভায় উপস্থিত ছিলেন।



পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ সদস্যদের সহিত আচার্য কৃপালনী ও শ্রীযুক্তা সুচেতা ফটো—শ্রীতারক দাস

দৈনিক বসুমতীর মামলা—

গত ১০ই জানুয়ারী এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দৈনিক বসুমতী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৩ হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে দৈনিক বসুমতীর পক্ষ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করা হইলে বিচারপতিগণ বাজেয়াপ্তির আদেশ নাকচ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বাজেয়াপ্ত করা অর্থ ফেরত দিতে বলিয়াছেন ও বাদীকে মামলার খরচ দিবার আদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি বিশ্বাস, আক্রাম ও রুফের আদালতে বিচার হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গ ও গণ-পরিষদ—

গত ৫ই জুলাই পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নূতন পাকিস্থান গণ-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে—কংগ্রেস মনোনীত নিম্নলিখিত ১১জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ধীরেন্দ্র দত্ত, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন দত্ত, প্রেমহরি বর্ম্ম, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, শচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল, হরেন্দ্র শূর ও জ্ঞানেন্দ্র মজুমদার। লীগ কর্ত্তৃক মনোনীত ৫জন তপশীল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন—শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—বাকী ৪ জন—মন্ত্রী নগেন্দ্রনাথ রায়, হারাণচন্দ্র বর্ম্মণ, ডাঃ ভোলানাথ বিশ্বাস ও মন্ত্রী দ্বারিকনাথ বারোরী পরাজিত হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা—

পূর্ব্ববঙ্গবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতামত আহ্বান করিয়া নববঙ্গ সমিতির পক্ষ হইতে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

প্রস্তাবসমূহ কলিকাতা ১৩৯ বি রাসবিহারী এভেনিউতে অধ্যাপক পি-কে-গুহ বা ২৭ বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সফর—

পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের অবস্থা দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই উত্তর অঞ্চলের জেলা-সমুহে সফরে বাহির হইবেন--শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, সুরেশচন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রভাতচন্দ্র সেন, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমহরি বর্ম্মণ, ধনঞ্জয় রায়, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, সুরেশ দাশগুপ্ত, সতীন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্র দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর।



নূতন-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি—

ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা ও বরিশালের অধিবাসীরা গোপালগঞ্জ মহকুমাকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী সম্পর্কে বিবেচনার জন্য গোপালগঞ্জে যে সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া গত ৫ই জুলাই গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪টি এলাকা হইতে বহু লোক পূর্ব্বেই গোপালগঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাটেও ঐভাবে সম্মেলন বন্ধ করা হইয়াছে।



মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস

নিজাম সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ—

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া ৫ই জুলাই বেজওয়াদায় প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমান নাগরিকগণকে অস্ত্র সরবরাহের গুজব সম্বন্ধে এতদিন নিজাম গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছিল, এতদিনে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিজাম সেনাদলে দুই লক্ষ শুধু মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইতেছে।

পণ্ডিত নেহরুর দলের পদত্যাগ—

পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সম্পর্কিত নূতন বিল উত্থাপিত হওয়ায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সদলে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পর বড়লাট পাকীস্থান ও ভারতীয় রাষ্ট্র সভার জন্য দুইটি পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন

করিবেন ও ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সেই মন্ত্রিসভাগুলি বিভক্ত ভারতের দুইটি পৃথক দেশ শাসন করিবে।

হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন—

গত ১লা জুন বিকালে হুগলী জেলার সোনাটিকরী গ্রামে হুগলী জেলা ব্যবসায়ী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা লৌহ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। রঘুনাথ বাবু তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক লীগ মন্ত্রিত্ব প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ভারতের অখণ্ড একত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে—পণ্যের বাজারে নিজেদের স্বার্থ অব্যাহত করিতেছে। ব্যবসায়ীদিগকে ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির সাহায্যে লীগের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে হইবে।" ভবতোষবাবু উদ্বোধন বক্তৃতায় বলেন—"লীগ মন্ত্রিসভার নীতি ও পক্ষপাতিত্ব মূলক কুশাসনের ফলে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু থাকায় দেশে প্রচুর দ্রব্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও লোক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে অসমর্থ। এই অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য দেশের ব্যবসায়ীদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে।" বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র ব্যবসায়ীদিগকে এখন সংঘবদ্ধ হইয়া দুর্নীতি দমনে অগ্রসর হইতে হইবে। যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ের মধ্যে যে অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে দেশ ও জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।



বঙ্গ বিভাগের সমর্থক ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্যবৃন্দ ফটো—শ্রীতারক দাস



হাওড়া ষ্টেশনে 'সিলভার এ্যারো' প্রদর্শনী সভায় গভর্ণর বারোজ ফটো—শ্রীপান্না সেন

নেপালে শাসন সংস্কার—

নেপালের মহারাজা এত দিনে প্রজাদের দাবী মানিয়া

লইয়া শাসন সংস্কারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। গত ২২শে মে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে অবিলম্বে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন, বালক বালিকাদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবেন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠন করিবেন এবং যথাসময়ে সরকারী হিসাবপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করিতেছে, তখন কি আর তাঁহার পক্ষে বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

বৃটীশ সৈন্যগণ আকিয়াব, সাণ্ডাওয়ে ও কাউকপিউতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিতেছে। কৃষকগণ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়াছে। বিদ্রোহের ফলে ঐ অঞ্চলে এবার ধান বা অন্য কোন খাদ্য-শস্যের চাষ হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া এই অবস্থা থাকায় লোকজনের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

কলিকাতায় খাবারের দোকান বন্ধ—

কলিকাতায় আটা ও চিনি সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় সহরের খাবারের দোকানগুলিতে আটা ও চিনি সরবরাহ



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী সভায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার ফলে গত ১২ই এপ্রিল হইতে সকল খাবারের দোকান বন্ধ আছে। ইহাতে খাবারের দোকানের ৬ হাজার কর্ম্মচারী বেকার হইয়াছে। চায়ের দোকানেও চিনি দেওয়া হয় না—ফলে গুড় দিয়া চা প্রস্তুত হইতেছে। বিস্কুটের কারখানাগুলিও আটার অভাবে বন্ধ হইয়াছে। প্রায় ৪ মাস এই অবস্থা চলিতেছে। আরও কতদিন চলিবে কে জানে?

পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন কমিটী—

পশ্চিম বাঙ্গালার জন্য একটি পৃথক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গঠনের প্রস্তাব গত ৫ই জুলাই বর্দ্ধমান মেমারীতে বর্দ্ধমান বিভাগ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলনে গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের উপর প্রদত্ত হইয়াছে—শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সুধীর ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মৌলবী আবদুস সত্তার, অতুল্য ঘোষ, রজনী প্রামাণিক, সুশীল পালিত ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরাকানে বিদ্রোহ—

ব্রহ্মদেশের আরাকান বিভাগে কিছুদিন হইতে বৃটীশ-বিরোধী আন্দোলন চলিতেছে। বিদ্রোহীরা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া সকল কাজ চালাইতেছে।

ছোরাভর্ত্তি পার্শ্বেল—

২৪শে মে কুমিল্লা পোষ্টাফিসে ২৪ ডজন ছোরাভর্ত্তি ২টি পার্শ্বেল ধরা পড়িয়াছে। ছোরাগুলি ওয়াজিরাবাদ হইতে এক মুসলমানের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই এইরূপ ছোরাপূর্ণ পার্শ্বেল ধরা পড়িতেছে—অথচ যাহারা পার্শ্বেল পাঠাইতেছে, তাহাদের শাস্তি দানের কোন ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না।

আসাম গভর্ণরের নীতি—

আসামের নূতন গভর্ণর সার আকবর হায়দারী আসামের বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি ২৩শে মে তারিখে ধুবড়ীতে এক সভায় বলিয়াছেন—“মুসলেম লীগের পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার দ্বারা মীমাংসার ব্যবস্থা করাই একান্ত বাঞ্ছনীয় আসাম সরকারের অনুমতি ব্যতীত সরকারী ভূমিতে বহিরাগতদের ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারই থাকিতে পারে না।”

পরলোকে ভূপতিনাথ মিত্র—

২৪ পরগণা পাণিহাটীর ডাক্তার ভূপতিনাথ মিত্র গত ১৬ই এপ্রিল মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী, সমবায় ব্যাঙ্ক, ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতি সকল জাতি গঠন মূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সারা জীবন পরোপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।



ভূপতি মিত্র

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি ভাণ্ডার—

নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়া রবীন্দ্রনাথের কলিকাতাস্থ পৈতৃক বাসভবন ক্রয় করা হইয়াছে ও বিশ্বভারতীকে তাহার ঋণ শোধের জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ১ লক্ষ টাকা দিয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইবে—ঐ টাকার সুদে প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখককে ‘ঠাকুর সাহিত্য পুরস্কার’ প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবনে একটি ‘জাতীয় কলা শালা’ প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করা হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের চেষ্টায় এত শীঘ্র রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে এইরূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে সেজন্য তিনি দেশবাসী সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

হুগলী জেলা সম্মিলন—

গত ৩১শে মে শনিবার হুগলী জেলার সোনাটিকরী গ্রামে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের সভাপতিত্বে হুগলী জেলা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় বলেন—“লোক সংখ্যার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখ্যা লঘিষ্ঠতা বিচার করা চলে না। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উৎকর্ষের উপর উহা নির্ভর করে।” কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা সম্মিলনীর সহিত অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সভায় বহু খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা উপস্থিত ছিলেন।



বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর সদস্য
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

ট্রাম ধর্ম্মঘটের জের—

কলিকাতার ট্রামওয়ে কর্ম্মীরা ৮৬ দিন ধর্ম্মঘটের পর কাজে যোগদান করায় তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিচার ভার সরকারী ট্রাইবিউনালের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে কর্ম্মীদের নিম্নতন বেতন ৩০ টাকা স্থলে সাড়ে ৩৭ টাকা করা হইয়াছে। তাঁহারা বৎসরে এক মাসের বেতন বোনাস পাইবেন ও ধর্ম্মঘটে কাজ বন্ধের সময়ের জন্য দেড় মাসের বেতন পাইবেন। কেরাণীদেরও নিম্নতন বেতন

৭০ টাকা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা কেরাণীদের নিম্নতন বেতন ৬০ টাকা ঠিক করিয়াছিল—ট্রাইবিউনাল তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ট্রাম কর্ম্মীদের দাবী ছিল—নিম্নতন বেতন ৪০ টাকা, বৎসরে ৩ মাসের বেতন বোনাস ও ধর্ম্মঘট কালের পুরা বেতন।



বঙ্গবিভাগের সমর্থক মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্জী (মধ্যে)
ফটো—জে-কে-সান্যাল

ভাইস-চ্যান্সেলার সম্মানিত—

গত ৩১শে মে শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক' রূপ সম্মানসূচক পদ প্রদান করা হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ৩০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। দেশবাসী যোগ্য-পাত্রে সম্মান অর্পিত হইতে দেখিয়া অবশ্যই আনন্দিত হইবেন।

দরবার গোপালদাস—

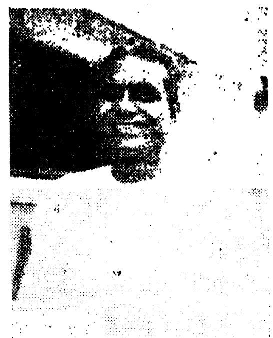
২৫ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করার জন্য গুজরাটের রাইসঙ্কন রাজ্যের স্বাধীন রাজা দরবার গোপালদাসকে গদীচ্যুত করা হইয়াছিল। গত ২৪শে মে তাঁহাকে ঐ গদী পুনরায় প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার গদীপ্রাপ্তি উৎসবে বোম্বায়ের প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ বহু কংগ্রেস-নেতা উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

রঙ্গপুর কুড়িগ্রামের উকীল ও খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ১৯শে মে ৭০ বৎসর বয়সে স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৩, ১৯২৯ ও ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর পদে কাজ করার সময় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষা—

ইউরোপের সকল দেশে ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত পি-এন-কৃপান ইউরোপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি সুইজারল্যাণ্ডে টেকনলজি শিক্ষার জন্য ৪০।৫০ জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, জেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সে তিনি ভারতীয় ছাত্র প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রগণের পক্ষে ঐ সকল দেশে যাইয়া কারিগরি বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।



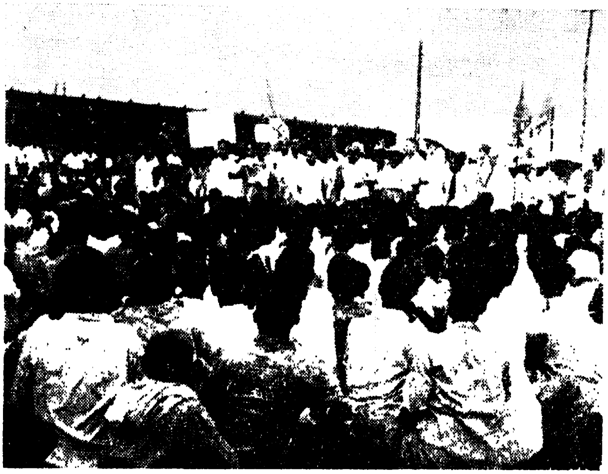
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আয়র্লণ্ডের লোক হিন্দু—

শ্রীযুত চমনলাল গত ১০ বৎসর ভারতের বাহিরে থাকিয়া বিদ্যা-চর্চ্চা করিতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আয়র্লণ্ডের লোকগণ হিন্দু—ভারতীয় পুরাণের সহিত আয়র্লণ্ডের পুরাতন কাহিনী সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। তিনি মেকসিকো ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের পর প্রকাশ করিয়াছেন—কলম্বাসের বহুপূর্ব্বে ভারতীয়গণ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুই শত রকমের উৎসব সম্পূর্ণ ভারতীয় ধরণের। তিনি ঐ অঞ্চলে বহু ভারতীয় চিত্র দেখিয়া আসিয়াছেন।

কবি প্যারিমোহন সেনগুপ্ত—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা কবি ও বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক প্যারিমোহন সেনগুপ্ত গত ২০শে মে কলিকাতা লালদিঘীর ধারে ট্রামে উঠিবার সময় সহসা সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া পথের উপর ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ২০ দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্ম তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাহার ২ পুত্র ও ৬ কন্যা বর্ত্তমান। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহু কবিতা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু সকলের পক্ষেই বেদনাদায়ক।



কাঁচড়াপাড়ার রেল কর্ম্মীদের এক সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের যান-বাহন সচিব ডাঃ জন মাথাই

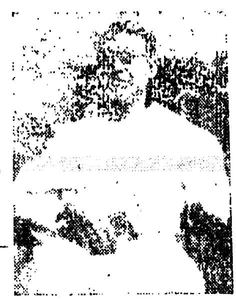


রাওয়ালপিণ্ডীর বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনে বড়লাট ও বড়লাটপত্নী

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট ঃ

ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা-দলের তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ড ৭ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জিতে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৩৯ রাণ তোলে। কে জি ভিলজোয়েণের ৯৩, বি মিচেলের ৮০ (রাণ আউট), এবং ডি ডায়ারের ৬২ রাণ উল্লেখযোগ্য। এডরিচ ৩৫.১ ওভার বলে ৯টা মেডেন নিয়ে এবং ৯৫ রাণ দিয়ে দলের মধ্যে সব থেকে বেশী ৪টা উইকেট পান।

ইংলণ্ড দল প্রথম ইনিংসে ৪৭৮ রাণ করে। এডরিচ ১৯১ রাণ এবং ডি কম্পটন ১১৫ রাণ করেন। টাকেট ৫০ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ১৪৮ রাণ দিয়ে ৪টা উইকেট পান। প্লিমসোল পান ১২৮ রাণে ৩টে।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৭ রাণ উঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৫ রাণ করলেন ডি নোর্স। এ-ছাড়া এ মেলভিলের ৫৯ রাণ উল্লেখযোগ্য। এবারও এডরিচের বোলিং মারাত্মক হ'ল। ২২.৪ ওভার বলে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৭৭ রাণ দিয়ে তিনি এবারও ৪টা উইকেট পেলেন। রাইট পেলেন ৩২ রাণে ৩টে।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তিন উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে ৭ উইকেটে বিজয়ী হয়।

ইংলণ্ডের এ জয়লাভের ব্যক্তিগত সম্মান এবং কৃতিত্ব এডরিচের। তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিষয়েই অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করেন।

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট খেলার পূর্ব্বাপর ফলাফল—১৮৮৮-১৯৪৫

প্রথম খেলার তারিখ		ইংলণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট
দক্ষিণ আফ্রিকায়	১৮৮৮-৯	২০	১১	১২	৪৩
ইংলণ্ডে	১৯০৭	৯	১	১১	২১
মোট		২৯	১২	২৩	৬৪

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—ডার্বানে ৬৫৪ (৫ উই, ১৯৩৯); দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ—৫৩০; ডার্বানে ১৯৩৯। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা কম রাণ—১৯০৭ সালে লিডসে ৭৬। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বাপেক্ষা কমরাণ—৩০; পোর্ট এলিজাবেথে, ১৮৯৬ সালে ও ৩০ রাণ বার্মিংহামে, ১৯২৪ সালে।

ফুটবল ঃ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ ক'লকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা এ বছর বন্ধ রাখা হয়েছে। পাওয়ার লীগের দু'টি বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান ১৭টা খেলায় ৩৩ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম স্থানে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। ১৬ টা খেলায় তাদের ৩১ পয়েণ্ট হয়েছে। মোহনবাগান বিপক্ষকে ৬৪টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টা গোল খেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ৩১টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো খেয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে বেনিয়াটোলা ১৫টা খেলায় ২৭ পয়েণ্ট ক'রে প্রথম আছে। দ্বিতীয়

স্থানে আছে সি এম সি—তারা ১৫টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট করেছে।

উত্তর ক'লকাতায় একটি ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা চলছে। দুটি ভাগে ভাগ ক'রে খেলা পরিচালনা করা হচ্ছে। 'এ' বিভাগে ৯টি দল এবং 'বি' বিভাগে ১০টি দল যোগদান করেছে। ক্যালকাটা ফুটবল লীগের কোন কোন খেলোয়াড়কে এইসব খেলায় যোগদান করতে দেখা গেছে।

অগ্রগামী ব্যায়ামাগার ঃ

মাত্র দু' বৎসর হ'ল বালীগঞ্জে "অগ্রগামী ব্যায়ামাগার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরই মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার তরুণ ও যুবকগণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান এক নূতন



অগ্রগামী ব্যায়ামাগারের সভ্যগণ

উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। রাসবিহারী এভিনিউস্থ ত্রিকোণ পার্কে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই সুবৃহৎ ব্যায়ামাগারটি অবস্থিত। ব্যায়ামাগারের সভ্যদের কেবলমাত্র শরীর গঠনের দিকেই নজর রাখা হয় না, আত্মরক্ষামূলক এবং কার্য্যকরী শিক্ষা—যথা, মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা-লাঠি-তরোয়াল, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শ্রীযুক্ত বলাই চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুক্ত রবীন সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃপেন গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীরগণ শিক্ষাদান করেন। গত "আগষ্ট দাঙ্গার" সময় এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্য্য দ্বারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যায়ামাগার-সম্পাদক শ্রীশ্যামল দত্ত ব্যায়ামাগারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শ্রেণীর আদর্শ ব্যায়ামাগার স্থাপনের জন্য আমরা তরুণ যুব সম্প্রদায়কে আহ্বান করছি।

পেশাদার টেনিস ঃ

পেশাদার টেনিস খেলার প্রবর্ত্তক হলেন মহিলাদের 'ওয়ার্ল্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ান' ফরাসী মহিলা Suzanne Lenglen। ১৯২৬ সালে সি সি পাইল কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি ৫০,০০০ ডলার পারিশ্রমিকের চুক্তিতে আমেরিকার এক ভ্রাম্যমাণ টেনিস খেলোয়াড়দলে যোগদান করেন। এই দলে অপর এক মহিলা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন, তাঁর নাম মিস মেরী কে ব্রাউন। এই ভ্রাম্যমাণ টেনিস দলে ঐ সময়ের খ্যাতনামা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ভিনসেন্ট রিচার্ডস, হাওয়ার্ড কিনসে, হার্ভে, স্নোডগ্রাস এবং পল ফিরেট যোগদান করেছিলেন। এই দলটি তিন মাস ধরে দেশের প্রধান প্রধান সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন ক'রে পেশাদার টেনিস খেলার প্রচার করেন।

১৯২৭ সালে আমেরিকায় রিচার্ডস এবং কিনসের নেতৃত্বে আমেরিকান পেশাদার লন টেনিস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বছর পুরুষদের একটি প্রতিযোগিতা হয়, রিচার্ড প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন।

এদিকে ইউরোপের টেনিস জগতে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে অনেক খেলোয়াড়ই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর সখের এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন Karel Kozeluh, তাঁর জুড়ী সে সময়ে কেউ ছিলেন না। এদিকে জার্মাণীর Ramon Najuch, ফ্রান্সের Albert Thomes ও Edward Burke এবং ইংলণ্ডের Major Rendell পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় জগতের তখন এক একটি ধুরন্ধর খেলোয়াড়। চেক্ খেলোয়াড় Kozeluh ১৯২৮ সালে আমেরিকার পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে রিচার্ডসের কাছে পরাজিত হন। রিচার্ডস আমেরিকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৯২৯ সালে রিচার্ডসকে পরাজিত করে Kozeluh পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

পেশাদার লন টেনিস জগতে ১৯৩১ সাল স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর দুর্দ্ধর্ষ টেনিস খেলোয়াড় উইলিয়াম টিলডেন এবং তাঁর ডবলসের সাথী ফ্রান্সিস টি হাণ্টার, আমেরিকার জে ইমেট পেরী, কালিফর্ণিয়ার রবার্ট সেলার পেশাদার শ্রেণীভুক্ত হলেন। টিলডেন তাঁর প্রথম পেশাদার খেলোয়াড় জীবনের শুভ উদ্বোধন করলেন ১৯৩১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে ১৪০০০ হাজার দর্শক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে। তাঁর প্রতিদ্বন্দী ছিলেন রিচার্ডস। ঐ বছরের এপ্রিল মাসে ইন-ডোর চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় টিলডেন সাতটি খেলায় রিচার্ডসের সম্মুখীন হ'ন এবং সাতটি খেলাতেই বিজয়ী হয়ে দেশব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন। পেশাদার টেনিস খেলায় বিপুল অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখালেন টিলডেন। নিউ ইয়র্কের উইলিয়াম ও' ব্রিয়েনের পরিচালনায় টিলডেন প্রতি বছর বড় বড় সহরে টেনিস খেলা দেখিয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতে লাগলেন। তাঁদের এই টেনিস খেলার আয় ১৯৩১ সালে ১৮২,০০০; ১৯৩২ সালে ৮৬,০০০; ১৯৩৩ সালে ৬২,০০০; ১৯৩৪ সালে ২৪৩,০০০ এবং ১৯৩৫ সালে ১৮৮,০০০ ডলার দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৪ সালে টিলডেন জুনিয়ার এইচ এলিসওয়ার্থ ভাইন্সের সঙ্গে টেনিস খেলেছিলেন। ১৯৩৬ সালে তাঁদের টেনিস দলে অনেক নামকরা পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করলেন। তাঁর দলের মিস জেনী সার্পকে খাওয়ার খরচা এবং ১৫০, মিসেস এথেল বার্কহার্ডটকের খাওয়া বাদ ৩০০, বার্কলে বেলকে ৫০০, ব্রুস বার্ণেসকে ২৫০ ডলার পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হ'ত।—ব্রিয়েন যাতায়াত এবং হোটেল খরচা নিজের পকেট থেকে দিতেন। টিলডেন এবং তাঁর মধ্যে লাভের ভাগ হ'ত আধা-আধি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর উপন্যাস অগ্নিযুগের কথা—১।০

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত "আমাদের খাদ্য"—৷৶০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "মহাসমরের বুকে"—৪৷০

এস্-ওয়াজেদ আলী প্রণীত "ইরাণ তুরাণের গল্প"—১৲

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত "ছড়া-ছড়ি"—১৵০

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "প্রেমরাগ"—৩৲

শ্রীদুলালচন্দ্র নস্কর প্রণীত সামাজিক নাটক "সর্ব্বহারার দাবী"—১৷০

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "অগ্নিসংস্কার প্রধূমিত বহ্নি"—৫৲

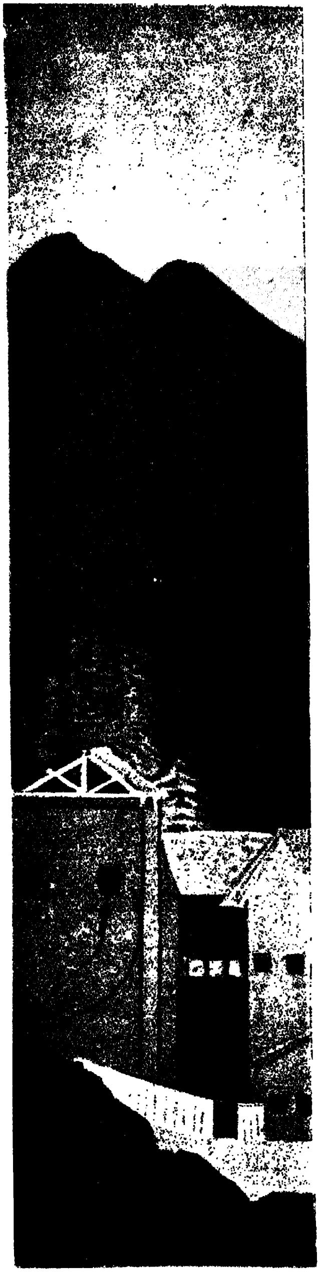
সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বন্দেমাতরম্"—৩৷০

শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন সম্পাদিত "ডেঙ্গার সিগন্যাল"—১৷০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "দীপ-শিখা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ধূসর পাহাড়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন ঘোষ



উৎকণ্ঠিতা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

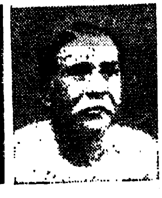




ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা



১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার

যে-দিনটির জন্য বাঁচিয়া থাকা সার্থক, সেই দিনটি আজ। বোমা-বর্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কণ্ট্রোল, মুসলমান গুপ্তঘাতকের ছুরি-ছোরা, পুলিসের গুলি, শাসনের ছদ্মবেশে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার তাণ্ডব-লীলা—সব কিছু উপেক্ষা করিয়া এই যে আজ বাঁচিয়া আছি, এই যে আজ এই দিনটি দেখিতে পাইলাম, তাহাতেই হইলাম ধন্য। ইহার পর মরণেও আর খেদ নাই।

আমাদের পূর্ববর্তিগণ—যাঁহারা আজ ইহজগতে নাই—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আমাদের স্বদেশের মণীষীগণ, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, আমাদের রবীন্দ্রনাথ—বারংবার আজ তাঁহাদের কথাই মনে পড়িতেছে। আমাদের স্বদেশের বীরগণ, যাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতা-অর্জনে কারাবরণ করিয়াছেন, মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—তাঁহাদের জন্য চক্ষু আজ অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতেছে। যাঁহাদের সকলের চিন্তার দ্বারা, প্রেরণার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা আজিকার এই দিনটি সম্ভব হইল, তাঁহারাই আজ নাই, তাঁহারাই এ দিনটি দেখিতে পাইলেন না! আমরা যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিলাম, তাঁহারাই আমাদের শিওরে আসিয়া জাগাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—আর ঘুমাইও না, জাগ্রত হও, উষার আর দেরি নাই। উষার আগমনে পূর্ব দিগন্ত রঙীণ হইয়া উঠিল—তাঁহাদের আসন আজ শূন্য। হায়, ইহার পরিবর্তে অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য আমরা যদি চলিয়া যাইতাম, তাঁহারা যদি আজ থাকিতেন! তাঁহাদের জন্য আজ সর্ব্বাগ্রে আমাদের অশ্রুর অর্ঘ্য নিবেদন করিতে হইবে।

মনের মধ্যে ভিড় করিয়া আসিতেছে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর, তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের আশা, তাঁহাদের স্বপ্ন।

"বল বল বল সবে
শত বেণু বীণা রবে
ভারত আবার জগৎ-সভার
শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

হে স্বপ্নদ্রষ্টা! হে সত্যবাদী! তোমার স্বপ্ন আজ সত্য হইতে চলিয়াছে, তুমি কোথায় রহিলে!

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্—

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু কাঁদিতেছে।" ওগো স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা গুরু, আজ আমরা সকলে কাঁদিতেছি তোমার জন্য।

"নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"
"Into that heaven of Freedom
My Father ! Let my country awake !"

হে মহাকবি, হে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, হে পথপ্রদর্শক! ভারতের সম্মুখে সেই স্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে খুলিতেছে, তোমার বীণা আজ নীরব কেন? কতবার কত বিপদ্-সঙ্কুল উপল-বন্ধুর পথে রজনীর অন্ধকারে তুমি পথ দেখাইয়াছ, আজ তোমার প্রজ্ঞার বর্তিকা নিভাইয়া দিয়া কোন্ অজ্ঞাত-লোকে সরিয়া রহিলে?

উপবাসে, অনশনে, কারাগারে বন্দিনী জননীর প্রতি উদ্যত দণ্ড আপনার ললাটের 'পরে বরিয়া লইলে, হে জন্মভূমির মুক্তি-সেনানীগণ—তোমরা, যাহারা তিলে তিলে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ, সেই তোমাদের—

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে!—

তোমরা, যাহারা আজ আমাদের এই মুক্তি-বাহিনীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে, মৃত্যু তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

শোক করিব না। তোমরা সবাই আছ, কেহ দূরে সরিয়া যাও নাই। তোমরা আমাদের মধ্যে আছ, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছ, আমাদের এই চিরায়ত জাতির মনোরাজ্যে অমর হইয়া থাকিবে।

এসো, আজ জননীকে আনিতে যাইবার আগে আমরা তাঁহাদের প্রণাম করিয়া যাই, যাঁহারা সবাই মায়ের মুক্তির অগ্রদূত, যাঁহারা আসিয়াছিলেন বিঘ্নসঙ্কুল শাণিত ক্ষুরধারার পথে, যাঁহারা বলিয়াছিলেন, "মা ভৈঃ! জননীর রথের ধ্বজা ঐ যে দিগন্তে দেখা যায়! মা আসিতেছেন।" নীরব নমস্কারে ধ্যান করি তাঁদের মূর্তি—

শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে—
সঙ্কট-আবর্ত মাঝে দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়ে ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।"

জননী আজ রাহুমুক্ত, কলঙ্ক-কালিমা-মুক্ত। শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর মেঘমুক্ত প্রভাতে মায়ের মুখ আজ স্নিগ্ধহাস্যে উদ্ভাসিত হইল। হে জননি, তোমায় বারংবার নমস্কার—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমল-দল-বিহারিণীং
বাণী বিদ্যা-দায়িনীং
নমামি ত্বাং।

এই প্রণাম তোমাকে যে জানাইতে পারিলাম, ইহাতে আমাদের জন্ম সার্থক হইল, আমরা পাপমুক্ত হইলাম। জননীর বন্ধনদশা ঘুচাইতে না পারিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ মাতৃ-নির্য্যাতন দমনে অক্ষমতা-জনিত গভীর পাপের পসরা মাথায় লইয়া পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের মধ্য দিয়া আজ এই একটি মুহূর্তে সর্বপাপ মুক্ত হইলেন।

জননি, তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ করো, আমরা যেন যোগ্য হই। জাতির মঙ্গলকে আপন মঙ্গল, জাতির সম্মানকে আপন সম্মান, জাতির দুঃখকে আপন দুঃখ বলিয়া জানিবার জ্ঞান আমাদের দাও। আমাদের অনুভবকে তীক্ষ্ণ করো, আমাদের মিলনকে অচ্ছেদ্য করো। জননী আমাদের শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধিতে সংযুক্ত রাখুন। আমরা যেন ভেদবুদ্ধিকে, আত্মম্ভরিতাকে, মূঢ়ত্বকে, বিগলিত শব অপেক্ষা ঘৃণ্যতর মনে করি। জননী, আমাদের শক্তি দাও, বীর্য্য দাও, তেজ দাও,

"ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর-খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।"

বহু আয়াসে আমরা যাহা অর্জন করিলাম, বহু আয়াসে আমরা তাহা রক্ষা করিব। জননি, তোমায় রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রাণের মায়া হরণ করিয়া লও।

তোমার এই দ্বিখণ্ডিত মূর্তি—আজ কিছুতেই যেন না ভুলি—কোন্ গভীর পাপের ফল। কিছুতেই যেন না ভুলি—বিচার-মূঢ় ঔদার্য ক্লৈব্যেরই আর একটি নাম—কিছুতেই যেন না ভুলি, ক্লৈব্য কখনোই ক্ষমার যোগ্য নয়। স্বাধীনতার ইতিবৃত্তের শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, আমাদের শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে, আমাদেরি বহু শ্রমে, বুকের রক্তে অর্জিত ফলে নির্লজ্জ ইতরতায় অংশগ্রহণ করিতে ছুটিয়া আসিয়াছে এবং আমাদেরি ধনে ধনী হইয়া আমাদিগকেই অপমানিত, নির্যাতিত করিয়াছে—বন্ধুবাক্য অবহেলা করিয়া আমরা সেই সম্প্রদায়কেই ভ্রাতৃনির্বিশেষে বুকের কাছে টানিতে চাহিয়াছি, ব্যাধি-দুষ্ট অঙ্গকে দারুণ মোহে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারি অনিবার্য্য ফলে আজ সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত, পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ

সুদূর-পরাহত হইয়া গেল। অগ্নির অক্ষরে এ কথা যেন আমাদের হৃদয়-পটে লেখা থাকে।

ধূর্ত্ততার দ্বারা যাহারা তপস্তার বিঘ্ন-দুরত্যয় পথ এড়াইয়া গিয়া আমাদেরি সাধনলব্ধ ফলের অংশভাগী হইয়া আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিল, তাহাদের খল খল অট্টহাস্যে আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইব না। তাহাদের কর্মফল তাহাদিগকে পাইতেই হইবে। চালাকির দ্বারা অর্জিত এই বিষয় ভোগ একদিন তাহাদের বিষবৎ মনে হইবে। ধূর্ত্ততার ফাঁস একদিন ধূর্ত্তেরি কণ্ঠরোধ করিবে।

বিগত দশবৎসরের কুশাসনের বিভীষিকা, বিশেষ করিয়া বিগত বারোটি মাসের কুখ্যাত মারণ-তন্ত্র,—মানব ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই—এ আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। পরমেশ্বর আমাদের চিনাইয়াছেন, প্রহারের দ্বারা চিনাইয়াছেন, চোখের জলে চিনাইয়াছেন, ছোরাচুরিতে, বন্দুকের গুলিতে দারুণ চেনা চিনাইয়া দিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়ের স্বরূপটি আমরা মর্মান্তিকভাবে চিনিয়া লইলাম, আর কোনোদিন ভুল করিব না।

ইহার পর মেকি ঔদার্য্য এবং ভ্রাতৃত্বের স্নেহোচ্ছ্বাস উভয় দিক হইতেই মূঢ়ত্ব, আর এ মূঢ়ত্ব কখনোই ক্ষমার যোগ্য নহে। স্থির জানি জাগ্রত জনমতের উদ্যতবজ্র এই মূঢ়ত্ব ভস্মসাৎ করিবে। স্থায়ের দণ্ড আজ জনরূপী নারায়ণ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তেজ আজ দুর্নিরীক্ষ, তাঁহার কণ্ঠস্বর গগনভেদী, তাঁহার এই অপূর্ব, অপরূপ মূর্তি আর কোনদিন দেখি নাই। কোনোদিন যে দেখিয়া যাইব, এ আশা করি নাই। কোন্ পুণ্যফলে আজ এই জনরূপী নারায়ণের সাক্ষাৎ পাইলাম, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলাম! তোমায় নমস্কার, হে জনরূপী নারায়ণ, হে জাগ্রত গণ-দেবতা, তোমায় নমস্কার, বরংবার নমস্কার

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্বঃ।
অনন্তবীর্য্যমিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

এসো আজ আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। কাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি? আজ আমাদের ঈশ্বর, আমাদের জননী, আমাদের জন্মভূমি, আমাদের আরাধ্য দেবতা, আমাদের ভাই বন্ধু,—আজ সবাই একাকার। আজ আমরা পথে পথে প্রণাম করিয়া যাই, মৃত্তিকাকণাকে প্রণাম করিয়া যাই, মৃত্তিকাকণাকে সগৌরবে মাথায় ধরি, এ আমাদের শৃঙ্খলমুক্তা জননীরই শ্রীচরণের ধূলি!

পূর্বগগনে মেঘ অপসারিত হইল, প্রাচ্য আজ নিদ্রাঘোর ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ আজ গ্লানিমুক্ত। তরুণ রবি আজ প্রথম-নয়ন-সম্পাতে চাহিয়া দেখিল, এমন ভারতবর্ষ সে বিগত শতাব্দী-দশকে দেখে নাই। হে সবিতৃদেব, হে অনির্বাণ অগ্নি, তোমায় প্রণাম করি। তুমি প্রসন্ন হও, বরদান করো। বরদান করো, যেন মধুমক্ষিকার মতো অতন্দ্রিত কর্মশীলতায়, ত্যাগে আমরা তিলে তিলে মধুসঞ্চয় করিয়া আমাদের জননীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারি। আর সেই মধু লুণ্ঠনপ্রয়াসে যদি কেহ আসে, আশীর্বাদ করো, মধুমক্ষিকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সুতীব্র হুলের দংশনে যেন সেই তস্করের দুরাশাকে চিরদিনের মতো জর্জরিত করিয়া ফিরাইয়া দিই।

বন্দে মাতরম্

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

খুড়ো-ভাইপোর কথা আরম্ভ হল।—"তাড়া রয়েছে, সবিস্তারে বলা চলবে না।" ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায়ছিলেন, কবে এলেন, সাহেবকে কেমন লাগছে?" উত্তরে বললেন—

"কলকাতা ছেড়ে—লক্ষ্মীছাড়ারা আর থাকে কোথায়! কবে যে এখানে এসেছি—তা কি মনে আছে? বোধ করি জোড়া শনিবার কেটেছে। তুমি এসেছ—আমার শ্রাদ্ধটা করে দাও, আমি আর এ প্রেতোণী করতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলে—সাহেব কেমন? এ প্রশ্ন করতে নেই, সাহেবদের মন্দ বলবে কে? তারা প্যাঁজের জাত, 'মজাতে' পারে ভালো। তবে এখন আমি চললুম।"

"কোথায়? সেইটাই তো আমার আসল জিজ্ঞাস্য।"

তাহলে আমাকে মহাভারত খুলতে হয়। সময় কই? জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের শিবিরে ঢুকে পড়েছি। কারণ আছে। আমার সাঁওতাল ছেলেটি যে সঙ্গে রয়েছে। তাকে তুমি দেখে থাকবে, মাছ না হলে তার যে একদিনও চলে না—

"পাণ্ডবেরা মাছ খেতো নাকি?"

"না—মাছের কেবল চোখ বিঁধতো? থাক্, তোমার

ইমারতও দেখে এসেছি। সেখানে আমাদের কুলুতো না। ঝঞ্ঝাট বাড়িও না, বেশ আছি।"

"আমার কথাও যে অনেক আছে।"

"তা থাকবে বইকি। বাঙালির তা ছাড়া আর কি থাকে। ওই ত আমাদের সম্পত্তি হে। সে হবে—আচ্ছা এখন—"

"একটা কথা বলে যান,—যুধিষ্ঠিরকে পেলেন কোথা?"

"সে এখন অনেক কথা—মহাভারতের খুদে-সংস্করণ নেই যে। যে দলে সে মিশেছে—সে তো আর ছোট জায়গা মাড়ায় না,—লাহা (Laha) কি মল্লিকদের বাড়ী বোধহয় ভজন গাইতে গিয়েছিল,—সাধু হয়েছে কিনা! ভজনখানেক লাঠি খেয়ে রাস্তায় পড়েছিল—প্রায় অজ্ঞান। তুলতে গিয়ে দেখি—পা ভেঙে দিয়েছে—দাঁড়াতে পারে না। নাড়াচাড়ায় একটু জ্ঞানের মত' হতেই বলে—দোহাই বাবু, আমি কিছু করিনি,—আমাকে পুলিশে দেবেন না। তারা উলটে আমার যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিয়েছে।"—

—"তখন বাদলকে ডেকে এনে, দুজনে ধরাধরি করে তাকে বাসায় নিয়ে যাই। হাতে কাজ ছিল না, দয়াময় জুটিয়ে দিলেন। তারপর—ডাক্তার আর সেবা। এগারো দিনে সে দাঁড়ালো। কথাবার্ত্তায় বুঝেছিলুম—লোকটা মন্দ নয়, কুসঙ্গে পড়ে কঠিন সাধন-ভজন নিয়ে আছে! এখন আর তার কিছু আটকায় না। সাধনোচিত ধামেই যাওয়া তার উচিত ছিল। কিশোরীর কাছে শুনলুম এখন এখানে সে মস্ত contractor, মাছের একচেটে কারবার। আকরগত পাপিষ্ট নয়। সুসঙ্গ পেলে এখনো বদলাতে পারে। যাক্, কোথায় আর যাবে, সেই সাধুর ডেরাতেই ঢুকে পড়েছি। বাদল—সেখানে রোজ সের দেড়েক মাছ মারছে। সে নড়বে না। তুমি কিছু মনে কোর' না। ইস্—তুমি করছো কি? সাহেবের মেজাজ এইবার বেগড়াবে, কি বিগড়ে থাকবে!"

বিনোদ চমকে গেলো,—"দিন, পায়ের ধুলো দিন। সন্ধ্যার পর দয়া করে আসবেন, আমি বড় বিপন্ন।"

"আবাগের বেটীকে স্মরণ করে যাও, কোন চিন্তা নেই। সন্ধ্যার পর দেখা হবে।"

খুড়ো চলে গেলেন।

* * *

"May I come in Sir—আসতে পারি?"

"Certainly,'am so very glad that you have come back—নিশ্চয়ই আসবে, আমি চায়ের order দিয়েছি।"

"ওসব আর শোনাবেন না"—বলতে বলতে বিনোদের গলা ভারি হয়ে এল, আর বলতে পারলে না।

সাহেব চঞ্চল ভাবে বললেন—"ওকি, কেন, কি হয়েছে —what is the matter, speak out doctor."

"এক বেগম নাকি সাক্ষ্য দেবেন—ও হার-ছড়াটি তাঁর—ইত্যাদি সে কথার পর আমার সর্ব্বনাশের আর বাকি কি থাকে—বিশেষ আমি যখন হার তৈরী করাবার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারব না!"

সাহেব একটু হেসে বললেন—"All rubbish, who says so?"

এসব বাজে কথা কে বলে? cheer up সে সব তো মিটে গেছে, তোমাকে সেই সুখবর দেবার জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করছিলুম। Don't worry doctor—বেগম সাহেব কোনো কথাই বলবেন না।"

চা এসে গেল। "চেয়ারে বোস তো। চা খেতে খেতে কথা কওয়া যাক্। ভাবনার আর কিছু নেই। অন্য কথা হোক্"—

শুনে ডাক্তার অবাক। কথা কইতে পারলেন না। শেষ বললেন—আপনাকে ও আপনার বিশ্বাসকে খোয়াবার চিন্তা সব চেয়ে অশান্তির কারণ হ'য়ে আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। লোকের বিশ্বাসই যদি গেল—তাহলে আর কি রইল আমার? এ ছাড়া আমার অন্য চিন্তা আর ছিল না Sir—জেলে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলুম—সেটাকে তত বড় করেও দেখিনি।"

সাহেব বললেন—"আমার গাফিলতিতেই এত কষ্ট পেয়েছ, নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলুম। তুমি দেখছি বড় sensitive আর nervous প্রকৃতি লোক।"

—আচ্ছা, ও কথা পরে হচ্ছে, এখন আগে তোমার খুড়োর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। চা খেতে খেতে চলুক। আমি যে কাজের জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজেছিলাম—উনিই সেই লোক"—

ডাক্তার বললেন—ওঁকে পাওয়াটাই আমাকে আশ্চর্য্য করেছে। ওঁর অপেক্ষা যে কাজের উপযুক্ত লোক আছেন কি না সন্দেহ। ওঁকে পাওয়া আর বোঝা কিন্তু কঠিন।—ধরা দেয় না। A true saint, সত্যকার সাধু। ওকে কথা শুনে বোঝা কিন্তু বড় কঠিন—আনন্দময় ও রহস্যপ্রিয়। অমন বিশ্বাসী ও নির্ভীক সত্য বক্তা বড় মিলবে না। লোক ঠিকই পেয়েছেন। না লোভ না চিন্তা। রহস্যের আচ্ছাদনে কথা কন্, সকলে বুঝতে পারে না। অনিষ্ট সেই লোক করে, সে স্বার্থ রাখে। উনি যদি কিছু করেন তো, উপকার আর সেবা। অর্থে ওঁকে বশে আনা সম্ভব নয়। কারো সদুদ্দেশ্য বুঝলে আপনিই সাহায্য করেন।

শুনে সাহেব হাসলেন, বললেন—"হয়েছে, আর বলতে হবে না। বুঝলুম উনি ব্যবহারিক জগতের লোক নন্,—সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ভাল লোক। কিন্তু অচল।"

"ঠিক তাই সার। আপনি এ সব কথা এনে আমাকে ম্যাডামের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোথায় কেমন আছেন, আগে বলুন।"

বলছি কিন্তু শুনে রাখো—বেগম সাক্ষী দেবেন না। তোমাদের চেয়ারম্যানও দু'দিন তাঁকে বোঝাতে এসেছিলেন, সুবিধে করতে না পেরে মামলা তুলে নিয়েছেন। কোর্ট থেকেই সব মিটে গিয়েছে।" কিন্তু…

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—"কিন্তুটা আমাকে বলতে দিলেই ভালো হয় sir—ওই একটা সামান্য হারের ছুতো নিয়ে আমাকে এত বড় বিপদে ফেলাটা কি আপনি সম্ভব বলে মনে করেন? আপনি আমাকে কি সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেই Jealousyতে কি এত বড় হাঙ্গামে কেউ যায়? আমি কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছি না Sir, কেবল মনে হ'চ্ছে এর পশ্চাতে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে বা আছে। আমি তা বুঝতে না পেরেই বড় অশান্তি ভোগ করছি। আপনি আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাও আমি দেখিনি।"

সাহেব শুনে ডাক্তারের মুখের পানে স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন। শেষ বললেন—কেবল হার চুরির অপবাদটায় তোমার কুলুচ্ছে না দেখছি। সেটা ছোট হ'ল কিসে? আর তাতেই যদি ও-পক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় তো তার বেশী ওরা আর কি চায়?

"তা জানলে আমার আর অশান্তি কিসের Sir!"

সাহেব তাঁর চেয়ার ছেড়ে ওঠে এসে ডাক্তারের পিঠ চাপড়ে হাসলেন।—"Bravo, এই জন্যেই তোমাকে খুঁজি। কাজ হয়ে গেলে এদেশে আর কেউ সে সম্বন্ধে ভাবে না। তোমাদের কিন্তু intelligent জাত বলে খ্যাতি শুনতে পাই। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমাদের দেশের নামকরা বড় সহরগুলির মত তোমাদের কলকাতাতেও বড় বড় গুণ্ডার দল আছে। তারা পারে না বা আবশ্যক হ'লে করে না এমন কাজ নেই। টাকা নিয়ে বড় লোকের দায় উদ্ধার বা মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধি করাও তাদের রোজগারের একটা পথ—"

বিনোদ—"কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি তো বড়লোক নই।"

"হ্যাঁ—প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল—কিন্তু পরে ভেতরের কথা সব জানতে পারলুম। আমাদের কাজ কতটা দায়িত্বপূর্ণ জানতো? তাই যেখানে থাকতে হবে সেখানকার নাড়িনক্ষত্রের সংবাদ নেবার ব্যবস্থাও সঙ্গে রাখতে হয়। সেই সূত্রে তোমার সম্বন্ধে সব খবর নেওয়া তেমন কঠিন হয়নি। কতদূর সত্যি জানি না কিন্তু এখানকার মিলের মালিকদের ধারণা তুমি তাঁদের কর্ম্মীদের বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছ, তোমারি সাহায্যে তারা দল বাঁধছে। এটি হ'লে তাঁদের স্বার্থে বড় রকমের আঘাত লাগবে। তাই কলকাতার একটি বড় দলের সাহায্যে তাঁরা তাদের বাধা অর্থাৎ তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চান। আরও জানা গেল যে তোমাদের চেয়ারম্যানও এঁদের সঙ্গে বিশেষ খাতির রাখেন, এক রকম হাতের লোকও বলা যায়—তাই তোমার বিরুদ্ধে কিছু করার তেমন কোনো অসুবিধে নেই।"

বিনোদ বললে—"কোনো অন্যায় কাজ জেনে-শুনে না করলেও এই রকম একটা আভাষ আমিও পেয়েছি Sir কিন্তু আমি ভাবছি, তাদের যখন খুন করাও আটকায় না তখন শক্তটা কি—আর এতদিন করেনিই বা কেন?"

সাহেব বললে—"এঁরা অন্য উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি হলে চট্ করে অতটা করতে চাননা। ওতে জানাজানি হবার সম্ভাবনা আছে কিনা! আর বললুম তো—তোমাদের

আপিসের মালিক হাতে থাকায়—সব দিক দিয়েই সুবিধে হয়ে গেছে।"

বিনোদ—"আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে, মাণিকের কেনো ভয় নেইতো ?"

"তা নেই, কিন্তু তোমাদের কারও এখানে থাকা আর উচিত বোধ হয় না। আর তুমি যে অদৃষ্টের কথা কইলে—হতে পারে তা ঠিক। কিন্তু যতক্ষণ সংসারে ও কাজে থাকা, ততক্ষণ সেটা অর্থহীন কথা। মানুষের সাধ্য-মত সাবধান হয়ে থাকতে চেষ্টা করাই উচিত। মানুষ বুদ্ধি পেয়েছে ব্যবহারের জন্য। রোগে লোক ডাক্তার খোঁজে কেন ? তোমার ও কথা সর্ব্বত্যাগীর জন্য।"

"আপনার কথাই ঠিক। মাণিকের কথাই ভাবছিলুম—হুঁস ছিল না—ক্ষমা করবেন। আর একটা কথাও আমাকে বিচলিত করে রেখেছে। ওই যুধিষ্ঠির লোকটাকে বুঝতে পারছি না। তার কাজ আর ব্যবহার দেখে তার সম্বন্ধে কিছু ঠিক করতে পারি না। দুয়ে মিল পাই না—। শুনেছি যে কারণেই হোক সে আমার প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা সম্মান রাখে। অতটা কেবল তার মাছের কারবারের সুবিধের জন্যে হতে পারে না—এই আমার ধারণা। তারপর হঠাৎ একদিন তারি মুখে তার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব কথা সে আমাকে স্বেচ্ছায় শোনায়—আমি বারবার নিষেধ করলেও থামে না, তা শুনে আমি শিউরে গেছি—ভয় পেয়েছি। তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না—মহা সন্দেহে পড়ে গেছি। সে সব তো আমাকে বলবার কথা নয়, আমাকে সে বলে কেন, উদ্দেশ্য কি ? তাই তার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি।"

সাহেব বললেন—"আমি ও লোকটিকে আমার দরকারের মতই জানি। সে ওই ভয়ঙ্কর দলের একজন বিশ্বাসী এজেন্ট। তোমার সম্বন্ধে ভীষণ একটা ভারপ্রাপ্ত লোক। এমনো তো হ'তে কারে যে এ দলে থেকেও লোকটি একটু অন্য ধাতের। তোমার সংস্পর্শে এসে এত বড় গর্হিত কাজটা করতে ইতস্তত: করছে—অথচ দলের নিয়মের বিরুদ্ধে সে কথা বলতেও পারছে না তাই সময় নিচ্ছে। পরে কি করবে জানি না, তাই তোমাদের এখান থেকে সত্বর সরানই আমার উদ্দেশ্য। আর যে কদিন এখানে থাকবে মিলের কারো সঙ্গে দেখা শোনা না করাই ভাল। যুধিষ্ঠির যে দলের এজেন্ট সে দলকে সবাই ভয় করে। মিলের দিকেই আর যেওনা।"

"আপনি যখন নিষেধ করছেন—আর যাব না।"

"আচ্ছা আজ তবে ওঠা যাক্। Good night doctor."

একটা ভাঙ্গা দাঁত

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

গেল ছমাস ধরে আমার একটা পাশের দাঁত নড়ছিল, আজ সেটা পড়ে গেল। এর আগে আমার আর কোন দাঁত পড়েনি, এইটিই প্রথম, তাই মন কেমন করছে। ছত্রিশ্ বছরের সঙ্গীটিকে আজ আমি হারালুম !

কচি বয়সের দাঁতগুলি একটার পর একটা প্রকাশিত হয়ে স্বজন-সমাজে কি পরিমাণ কৌতূহল ও আনন্দের হিল্লোল তুলেছিল, তার কথা আমার পরিষ্কার ভাবে মনে নেই, অবশ্য মনে রাখবার মত বয়সও সেটা নয়, তবে একথাটা মনে আছে যে কচি দাঁতগুলি একটির পর একটি অন্তর্হিত হবার সময় কিন্তু আমায় যথেষ্ট লজ্জা ও দুশ্চিন্তার হাতে ফেলে গেছে। পরিপাটী ভাবে সজ্জিত দন্তরাজির মধ্যে থেকে সামনের একটা যখন পড়ে গেল, তখন লজ্জায় যেন কথা বলতে পারি না, ফাঁকাটা যেন করে তার সুপস্থিতি ঘোষণা করে আমায় মুস্কিলে ফেলেছে। যেন সুন্দর একটা হারমানিয়ামের মাঝখানের একটা রীড ভেঙ্গে গিয়ে তার সুরের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিয়েছে, সঙ্গীতের আসরে আর সেটা উপস্থিত করা যায় না। ফোকলা হয়ে সকলকে হাসির খোরাক জুগিয়ে আমার প্রাণান্ত ! তা ছাড়া আবার মহা দুশ্চিন্তা, ফাঁকা জায়গাটিতে আবার নব দন্ত দেখা দেবে কিনা। সখাদের পরামর্শ মত সেই ছোট সাদা ফুলের কুঁড়ির মত দাঁতটিকে একটি ইঁদুরের গর্ত্তে দিয়ে তাকে তার একটি দাঁত আমাকে দিতে অনুরোধ জানিয়েছি।

ক্রমশ: কচি দাঁতগুলি একটির পর একটি অন্তর্হিত হয়েছে, এবং তাদের স্থলে উদ্গত হয়েছে একটির পর একটি করে দৃঢ় শক্ত দাঁত, যাদের দুটি পঙক্তি আজ আমার এই ছত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত অটুটভাবে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে—সেনাপতির সঙ্গে সেনাবাহিনীর মত।

দাঁতের যত্ন অবশ্য আমি বরাবরই নিয়েছি, যদিও আমার দাঁত সম্পূর্ণ

রোগমুক্ত নয়। বাল্যকালের সামান্য অবহেলায় একবার দাঁত খারাপ হলে তাকে সম্পূর্ণভাবে সারান যথেষ্ট শক্ত, এ কথা বেশী বয়সে জেনে অনুতপ্ত হয়েছি। হয়তো সেইজন্যে আমার মাত্র এই ছত্রিশ বছর বয়সে দাঁতটা পড়ে গেল, নাহলে কে বলতে পারে, ছয়ট্টি পর্যন্ত সেটি আমার মুখ গহ্বরকে উজ্জ্বল, উচ্চারণকে সুস্পষ্ট, হাসিকে বেগবান, তথা পরিপাকশক্তিকে প্রখর করতে পারত।

এমন সুন্দর ও এত প্রয়োজনীয় যে দাঁত, তার সম্বন্ধে আমরা যে যথেষ্ট অনুরাগ দেখাই না, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বেশী বয়স পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং শক্ত দন্তপঙক্তি মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধন করছে, এ সব দেশেই অসুলভ। যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদের এত ব্যাকুলতা, তাদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুকে বাদ দিয়ে অপর কোনটির চেয়ে দাঁতের স্থান নীচে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রামের মত দাঁত যে মর্য্যাদা পায়নি, তার কারণ বোধ হয় ইন্দ্রিয়রা শরীরের অংশ হিসেবে জন্মলাভ করে এবং প্রচণ্ড আঘাত বা কঠিন কোন অসুখের হাতে না পড়লে শরীরের সঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, সে পঞ্চাশ বৎসরেই হোক, বা নব্বই বৎসরেই হোক ; কিন্তু দাঁতের উৎপত্তি হয় জন্মলাভের পাঁচ ছমাস পরে এবং স্থিতিকালও সুদীর্ঘ নয়, প্রৌঢ়ত্ব আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটির পর একটি সরতে থাকে, বার্দ্ধক্যে একেবারে মুখবিবর শূন্য করে দিয়ে চলে যায়।

চলে যায় বলেই কি তাকে যথেষ্ট অনুরাগ দেখান হবে না, যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হবে না ? দাঁত— সে কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কারুর চেয়ে মুখমণ্ডলের কম শোভা বৃদ্ধি করে, না কারুর চেয়ে কম প্রয়োজনীয় ?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিষয়ে সার্থকতা বা অসার্থকতা প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্রিয়দলের দশন-সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ চক্ষুর কথাই ধরা যাক। যে কোন সুন্দর দৃশ্য নয়নসমক্ষে উপস্থিত হলে সহাস্য-আনন দন্তরাজিকে প্রকাশিত করে প্রশংসা জানায়। যখন মৃদু আলোকিত নির্জন কক্ষে প্রণয়িনী ধীরপদে অপরের শ্রবণ এড়িয়ে দয়িতের পাশে এসে দাঁড়ায়, সে তনুমন চকিতকর দর্শনের পুলক দশনশ্রেণীকেই প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রথম ; মুখে ভাষা না থাকলেও যায় আসে না, কারণ দর্শন ও দশন একসঙ্গে মিলে অনুচ্চারিত কাব্য সৃষ্টি করে। আবার যখন বেদনাকর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হবার উপক্রম হয়, তখন দাঁতে দাঁতে চেপে কষ্ট সহ্য করতে হয় ; অবমাননাকর ব্যাপার দেখে যখন রাগে শরীর জ্বলতে থাকে, তখন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ধৈর্য্য রক্ষা করতে হয়, এবং সময় সময় জিভ কামড়ে ধরে প্রত্যুত্তরে কটুভাষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

শ্রবণেরও নয়নের মত একই অবস্থা, ছায়ানুসারী লক্ষণ ভাইটির মত দশনকে সকল সময়েই চাই। আনন্দধ্বনি এসে কানে স্পর্শ করা মাত্র শরীরের অন্য কোন অংশের আগে দন্তদাম বিকশিত হয়ে স্বাগত জানাবে। আবার দাঁতের কোন অসুস্থতায় শ্রবণ যে কতটা আর্তবোধ করে, তা তো সর্বজনগোচর ব্যাপার।

জিহ্বার তো দন্তদামের জন্যে ব্যাকুলতার সীমা নেই, সে ব্যাকুলতার তুলনা দিতে গেলে একমাত্র মায়ের পুত্রদের প্রতি স্নেহের কথা বলতে হয়। এত বড় নিবিড় আত্মীয়তা বড় একটা দেখা যায় না। নিয়ত পাশে থেকেও স্বস্তি নেই, কারণে অকারণে দাঁতগুলির বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে দেখছে, ঠিক আছে কিনা, সামান্য একটু ব্যথা হলে কি অস্থিরতা ! আবার দাঁত যখন কাজ করে, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করে, তখনও খাদ্যগুলোকে বিভিন্ন দাঁতের কাছে কর্তন চর্বণের জন্যে এগিয়ে দিয়ে কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে কি চঞ্চলতা ! শিশুরা যেমন ভুল করে মাতৃস্তন কামড়ে দিলে মা কিছু মনে করেন না, তেমনি দন্তদাম অন্যমনস্কতায় জিহ্বাকে কামড়ে দিলেও জিহ্বা কিছু মনে করে না, পূর্বের মত সস্নেহে তার কাজ করে যেতে থাকে, শব্দজগতের প্রায় সব কিছুই তো দাঁতের ও জিহ্বার যুক্ত অধিকারে। বাক্যের সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্যে দাঁতের যে কি প্রয়োজন, তা বলার দরকার হয় না। যে চিত্তমোহন ধ্বনিউচ্ছল হাসি শোনবার জন্যে মন এত চঞ্চল হয়, তার এক প্রধান উৎস তো সুন্দর দন্তপঙক্তি। তাই বেশী বয়সে যখন মুখবিবর খালি করে দিয়ে দাঁতগুলি চলে যায়, তখন মুখমণ্ডলের হয় এক মস্ত বড় দৈন্য এবং জিহ্বার ক্ষতিটা হয় সবচেয়ে মর্মান্তিক। পরমাত্মীয়বিয়োগবিধুর জিহ্বা তখন মুখাভ্যন্তরে মাথা কুটে মরতে থাকে, তার উচ্চারিত কথাগুলি তখন হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত ; যার কথা শোনবার জন্যে সহস্র লোক ব্যগ্র হয়েছে একদিন, আজ তার কাছে একটি লোকও আসে না।

নাসিকা ও ত্বকের ব্যাপারও প্রায় একই রকম। আনন্দে ও নিরানন্দে, অধিকাংশ সময়েই দাঁতের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এমন যে দাঁত, তা একটির পর একটি স্খলিত হয়ে পড়ে কপোলদ্বয়কে করবে কুঞ্চিত, অধর ও ওষ্ঠকে করবে লোল, এ কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। কৃত্রিম দন্ত পরে বা গোঁফদাড়ি রেখে তো সে অভাবটা দূর করা যায় না, হয় তো কিছুটা ঢাকা যায়, তাছাড়া কৃত্রিম দন্তটা অনেকটা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার মত, কিছুতেই ভাল করে খাপ খায় না। যতই যত্ন নিয়ে রাখা যাক না কেন, ঐকান্তিকতা পাওয়া যায় না।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী আজকাল না থাকলেও সুমুখীদের মানরক্ষার জন্যে এক আধটা পান মাঝে মাঝে খেতে হয়। তাতে অধর, ওষ্ঠ এবং তার সঙ্গে দন্তদামকে রঞ্জিত করে নিজেদের কতটা ভাল দেখায় বলা শক্ত ; তবে শ্রীমতীদের, যাঁদের দাঁতগুলি ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র—তাঁদের মাঝে মাঝে পান খেলে মন্দ দেখায় না কিন্তু, দন্তরুচিকৌমুদী তখন জবাকুসুমসঙ্কাশ হয়ে মনকে রাঙিয়ে তোলে।

তবে তার অত্যধিকটা ভাল নয়, তাম্বুলবিলাস মাত্রাতিরিক্তে দাঁড়ালে দাঁতগুলির যে রূপ দাঁড়ায়, তা দেখে কারুরই উৎসাহ বোধ হয় না, তা

সে দন্তদাম শ্রীমতীর কমল মুখমণ্ডলেই বিরাজ করুক, বা শ্রীমানের মুখমণ্ডলেই অবস্থান করুক।

যে যৌবন নিয়ে এত কাব্য, এত শিল্প, এত আর্ট, তার তো এক প্রধান পরিচয়ই হল সুন্দর সুদৃঢ় দাঁত। দাঁত পড়তে সুরু করলেই এই জন্তে মানুষ ভয় পায়, তার কাছে বার্ধক্য আসছে, মুখে মুখে আলাপন, চুম্বন, আদর—সমস্তকে বিপর্য্যস্ত করে দেবে দন্তহীনতা, ভাবলে ভয় আসবার কথা বইকি।

তাইতো, হোক একটা পাশের দাঁত, তাহলেও এত অসময়ে পড়ে গেল! মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কবিরা দেখছি, দাঁতকে শুধু শুধু মুক্তার পাঁতি বলেননি।

স্ত্রী-সঙ্কট

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশী এম-এ

বিবাহের সাত আট দিন পরে কথা হইতেছে।

সুব্রত কি একটা কাজে শোবার ঘরে ঢুকিয়াছিল। নববধূ গীতা খাটের ওপর বসিয়া একখানা বাংলা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতেছিল, সুব্রত আসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—শোন—

সুব্রত মুখে একটু মিষ্টি হাসি টানিয়া বলিল, কি বলছো?

—মনে কিছু করবে না ত?

—না না মনে করবার কি আছে? বলোই না—

গীতা খাটের উপর পুনরায় বসিয়া বলিল, তুমি গোঁফ রাখো কেন বলো ত?

এ প্রশ্নের জন্য সুব্রত মোটেই প্রস্তুত ছিল না—কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল।

গীতার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, তোমাকে গোঁফ মোটেই মানায় না। গোল মুখে clean shaveই ভাল।

সুব্রত অনেকটা সামলাইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করিয়াছে সে। এ সব প্রশ্ন উঠিবারই কথা—বিব্রত হইবার কি আছে? তবু একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, এমনি—গোঁফ ওঠা অবধি রেখেই চলেছি—বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তার পর হাসিয়া বলিল, কেন? সকলে ত ভালোই বলে। গোল মুখে সরু গোঁফের রেখা মন্দ কি!

গীতা এবার গম্ভীর হইল, কিন্তু দমিল না। সকলকে নিয়ে ত আর সংসার করবে না? আমার যা ভাল লাগে তাই করা উচিত—তবে আর ভালোবাসা কি? গোঁফওয়ালা পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

সুব্রতের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। স্নান করিয়া সদ্য-ভিজা চুলে গীতাকে চমৎকার মানাইয়াছে। কমলালেবু রংএর সাড়ী, তার উপর ফর্সা মুখে কুমকুমের টিপ। একটা মিষ্টি গন্ধ ঘরটাকে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সে কাছে সরিয়া আসিয়া গীতার একখানা হাত টানিয়া লইল।

রাগ করলে গীতা? তোমার সামান্য ভালোবাসা পেলেও যে আমি ধন্য হব। গোঁফের কথা কি বলছো? আমাকে তৈরী করবার সম্পূর্ণ ভার ত তোমার।

গীতার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখা দিল।

—তবে আজ বিকেল থেকেই—

—বেশ—তথাস্তু। হাতখানা জোরে নাড়িয়া সুব্রত হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। বন্ধুরা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিয়া আছে।

বিকেল বেলা সত্যই সে গোঁফ কামাইয়া ফেলিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া ভালো লাগিল না। কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাইতেছে। এতদিনের একটা সংস্কার—মনটাও খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে গীতার হাসিভরা মুখ কল্পনা করিয়া সমস্ত দ্বিধা দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিল। দুই একদিন পরেই ঠিক হইয়া যাইবে। প্রথম প্রথম একটু অদ্ভুত লাগিবে বৈ কি! ঘর হইতে বাহির হইতেই বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা। তিনিও তাহার খোঁজে এই দিকে আসিতেছিলেন। নরেশবাবু রাশভারী প্রকৃতির লোক। বেশী কথাবার্ত্তা বলেন না।

—এই যে! তোমার খোঁজেই এলাম। তুমি এম-এ পাশ করেছো। সুবিমল কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করেছে—এই নাও। সেকেণ্ড ক্লাশ পেয়েছ।

সুব্রত টেলিগ্রামটা লইয়া বাবাকে প্রণাম করিল। মুখ তুলিতেই নরেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

এ কি? মুখখানাকে বাঁদরের মত করে ফেলেছ দেখছি। পুরুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না কি? না, মডার্ণ ফ্যাশন?

সুব্রত লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কি একটা বলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। মুখ হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পরামর্শ আছে। বলিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

এম-এ পাশের সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইল। এই উপলক্ষে বাড়ীতে বন্ধুদের একটি ভোজের ব্যবস্থাও হইল। সুব্রতের গোঁফ কামানোর আলোচনা প্রধান বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। অনেকে বলিল, রীতিমত স্ত্রৈণ। এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

সুব্রত সমস্ত বিদ্রূপ হাসিমুখেই গ্রহণ করিল, বরং স্ত্রৈণ কথাটাতে একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। এই ত ভালোবাসা। সে জগৎকে দেখাইবে ভালোবাসার স্বরূপ কি? সম্রাট সাজাহানকে পরাজিত করিবে সে।

রাত্রে গীতাকে সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের কথা শুনাইয়া গর্ব্বভরে বলিল—যে যাই বলুক—আমি কাউকে কেয়ার করি না। তুমি, আমি ব্যস! তারপর একটু থামিয়া বলিল, সকলের ঈর্ষা হয়, বুঝলে গীতা? তোমাকে যে এতটা ভালোবাসি তা যেন ওদের সহ্য হয় না। আমি একশোবার স্ত্রৈণ—কার কি?

গীতা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিল, স্ত্রৈণ পুরুষকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে।

আরও কয়েকদিন পরে। সুব্রত কোথায় বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল—গীতা ঘরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, ক'দিন থেকে একটা কথা বলবো ভাবছি—

সুব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

তুমি 'আণ্ডারওয়ার' ব্যবহার কর না কেন বল ত?

সুব্রতের চোখের সামনে নরেশবাবুর গুরুগম্ভীর মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। তবু একটা জবাব দিতে হইবে। বিদুষী পত্নীকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। বলিল, অভ্যেস নেই কোনদিন। আর তা ছাড়া বাবা এ সব বিশেষ পছন্দ করেন না। বাধ্য হইয়া এবার পিতার উল্লেখ করিতে হইল—কেন না 'আণ্ডার-ওয়ার' গোঁফ নয়, ইহা বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। এই সব বাবুয়ানী নরেশবাবুর দু' চক্ষের বিষ।

গীতা শ্লেষের সহিত বলিল, অত পিতৃভক্ত হলে পাড়াগেঁয়ে ভূতকে বিয়ে করা উচিত ছিল তোমার। ভদ্রসমাজে মিশতে হলে তাদের আদব-কায়দা শেখা উচিত। আজকাল ধোপারাও আণ্ডার-ওয়ার পরে—

সুব্রতের নিকট যুক্তিগুলো অসঙ্গত মনে হইল না। সত্যই ত! তার বাবার অত্যন্ত অন্যায়। বিংশ শতাব্দীতে বাস করিয়া এই সব শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গেলে চলিবে কেন? গীতাকে বলিল, বাবা যা ইচ্ছে বলুক। আমি শীগগীরই আণ্ডার-ওয়ার করাচ্ছি।

সুব্রতর একমাত্র ভরসাস্থল মা। মাকে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল।

—আজকাল সব ছেলেই পরে মা। এটা দোষের কিছুই নয়।

মা বলিলেন, বুঝি তো সব—কিন্তু ওঁর কাছে ত যুক্তি খাটবে না। জানিস ত সবই। পরে পুত্রের বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, কথাটা পেড়ে দেখবো।

বিকালবেলা সুযোগমত তিনি স্বামীর নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন।

শুনিয়া নরেশবাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন।

—তখনই বলেছিলুম, এ বিয়ের ফল ভাল হবে না। বিয়ের পর থেকে এই সব সুরু হয়েছে। ওকে তুমি শিক্ষিতা মেয়ে বল? যতো সব—

সুনীতি দেবী কহিলেন, অযথা বৌমার দোষ দিচ্ছ কেন? আজকালকার ছেলে সবাইকে ওই সব পরতে দেখেছে। বন্ধুরা হয়ত এই নিয়ে ঠাট্টা করে থাকবে।

নরেশবাবুর মতের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। ইচ্ছে হয়, নিজে রোজগার করে ও-সব ফ্যাশন করুক।

ইহার উপর কথা চলে না। সুনীতি দেবী আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কথাটা গীতার কানে গেল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! স্বামী বেকার এ দুঃখ রাখিবার তার স্থান কোথায়? লজ্জায় অভিমানে তার চোখ দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। সুব্রতকে ডাকিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সুরে কহিল, পুরুষ মানুষ বলে আর পরিচয় দিও না। এত বড় ছেলে—এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই। এ সব লোককে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। স্বামী না ছাই……

কথাগুলি সুব্রতের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। প্রত্যুত্তরে সে একটি কথাও বলিল না।

ইন্দ্রাণী রায় গীতার সহপাঠিনী—কলিকাতায় এক সঙ্গে আই-এ পড়িত। গীতার অন্তরঙ্গ বান্ধবী সে। অনেকদিন তার খবর পায় নাই। বিবাহের সময় সেই শেষ দেখা হইয়াছিল। হঠাৎ সেদিন ইন্দ্রাণীর একখানা চিঠি পাইয়া সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ইন্দ্রাণী লিখিয়াছে—

গীতা! কলকাতার গণ্ডগোলের জন্য আমরা কিছুদিন হ'ল সকলে কাশীতে এসেছি। এখন এখানেই থাকা হবে। এসে অবধি নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সময় করে তোর খোঁজ করে উঠতে পারিনি, কিছু মনে করিস না। একটা মজা হয়েছে। আমি প্রাইভেটে বি-এ দেবো ঠিক করেছি। একজন প্রাইভেট টিউটরের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কালকে সুব্রতবাবু 'ইণ্টারভিউতে' এসে হাজির! দু'জনেই অবাক। তিনি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করছিলেন, তাঁর সেই অবস্থা ভাই খুবই উপভোগ্য। যা হোক অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। সন্ধ্যার পর একটু করে তিনি পড়াবেন। অনেক ভাগ্যে জোটে ভাই—তুই যেন হিংসে করিস না।

ইন্দ্রাণী।

চিঠিখানা পড়িয়া গীতার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সুব্রত এ কথা তাহার নিকট সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছে। টিউশনি অনেকেই করে ইহাতে লজ্জার কি আছে? বিশেষ তাহারই অন্তরঙ্গ বন্ধুর খবরটা তাহাকে দিতে সুব্রতর এত সঙ্কোচ কিসের? পরশুদিন সুব্রত দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল—রাত্রে 'ক্ষিদে নেই' বলিয়া খায় নাই। অথচ পরশু দিনই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে সে দেখা করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ওখান হইতেই আহার সমাধা করিয়া আসিয়াছে। সুব্রতের এতখানি সাহস দেখিয়া গীতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার বোঝাপড়া সে করিবে। সুব্রত যে তাহার উপর টেক্কা দিবে ইহা তাহার অসহ্য মনে হইল। সে চায় তাহার স্বামী তাহারই একান্ত অনুগত থাকিবে। শিক্ষিতা মেয়ে সে—নিজের স্বামীকে করায়ত্ত করিতে পারিবে না?

রাত্রে সুব্রতকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, বাবার কথায় রোজগারের দিকে মন দেওয়া হয়েছে দেখছি, ভাল! এ কথা আমাকে বল্লে কি খেয়ে ফেলতাম?

সুব্রত চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে বুঝিল ধরা পড়িয়াছে, আর গোপন করিয়া লাভ নাই। সহজভাবে কহিল, বলবার মত বিশেষ কিছুই নয়, তাই বলিনি।

তারপর একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।—রোজগার যে বাবার জন্য করছি না, এটা বোধ হয় সকলের জানা আছে।

গীতা ঝাঁঝের সহিত বলিল, আমার বন্ধুর কথা গোপন করাকে আমি দোষাবহই মনে করি। অন্য কোথাও হলে—বয়ে গেছে আমার জিজ্ঞেস করতে—

সুব্রত বলিল, অপরাধ স্বীকার করছি। ঘুম পেয়েছে, বিরক্ত না করলেই সুখী হব।

এতখানি তাচ্ছিল্য? গীতা জ্বলিয়া উঠিল।

ওঃ—আমি কথা বল্লেই আজকাল বিরক্ত লাগে। তা ত লাগবেই—সুব্রত মুচকি হাসিয়া নিঃশব্দে কথাগুলি হজম করিল। তার এই নীরব উপেক্ষা গীতাকে অধিকতর দহন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া সে বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িল। স্বামীর সান্নিধ্যে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল।

সুব্রতর তখন মৃদু নাসিকা গর্জ্জন শোনা যাইতেছে।

পরদিন সুব্রত রীতিমত গম্ভীর হইয়া উঠিল। গীতাও সুব্রতকে এড়াইয়া চলিল। সমস্তদিন স্বামী স্ত্রীতে একটিও কথা হইল না। বিকালে মায়ের অনুরোধে গীতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—রাত্রে সুব্রত ভাত খাইবে না পরোটা

খাইবে। উত্তরে সুব্রত বলিয়াছিল রাত্রে খাইবে না, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণের কথায় গীতার নীরব থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। শ্লেষের সহিত বলিয়া উঠিল, ইন্দ্রাণীর বাড়ীতে বুঝি? সে কথা বল্লেই হয়, অত ঢং কেন?

সুব্রত বলিল, অত খোঁজের ত দরকার কারু দেখিনে—রাত্রে খাব না—ব্যস।

গীতা বলিল, দেখো—অত অহঙ্কার থাকলে হয়। একবার যখন কথা আরম্ভ হইয়াছে তখন আর নীরবতা চলে না। গীতা অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, কালকে 'আণ্ডার-ওয়ার' কেনা হয়েছে দেখছি। এক কৌটা "কিউটিক্যুরাও" এসেছে। আজকাল সাজ-সজ্জার দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়েছে দেখা যাচ্ছে।

সুব্রত উত্তরে কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর উপেক্ষায় অজ্ঞাতে গীতার চোখে জল দেখা দিল। সুব্রতকে করায়ত্ত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প কোথায় অন্তর্হিত হইল—সে নিজেই টের পাইল না।

কয়েকদিন এইরূপ মনকষাকষি চলিল। হঠাৎ সেদিন গীতা সুব্রতকে ধরিয়া বসিল—আজ পড়াইতে যাইবার সময় সে তাহার সঙ্গে যাইবে। অনেকদিন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয় নাই, বন্ধুর জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ইত্যাদি। সুব্রত প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল—না না তুমি যাবে কেন? ওঁকেই একদিন নিয়ে আসবো। তা ছাড়া ওঁরা একদিনও এলেন না, তুমি গেলে বাবা হয়ত মনে কিছু করবেন। গীতা কোনও ওজর আপত্তি শুনিল না। সে আজ যাইবেই। অগত্যা সুব্রতকে রাজী হইতে হইল।

ইন্দ্রাণী গীতাকে দেখিয়া খুব খুশী হইল। সুব্রতের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল, আজকে আমার ছুটি—বুঝলেন তো? অনেকদিন পর বন্ধুকে পেয়েছি সহজে ছাড়বো না।

সুব্রতও প্রত্যুত্তরে হাসিয়া বলিল, বেশতো! যতক্ষণ ইচ্ছে বন্ধুকে আটকে রাখুন। আমি তবে একটু ঘুরে আসি।

বাঃ—বেশ লোক তো আপনি। চা না খেয়েই যাবেন? আমি আজ নিজে হাতে 'আলুর খাসিয়া কাবাব' করেছি। বাইরের ঘরে একটু বসুন, এক্ষুণি নিয়ে আসছি—বলিয়া দেহের লীলায়িত ভঙ্গী তুলিয়া ইন্দ্রাণী গীতার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে প্রস্থান করিল।

সুব্রত গিয়া বৈঠকখানায় বসিল। কিছুক্ষণ পরে গীতা ও ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিল। ইন্দ্রাণীর হাতে খাবারের থালা ও পিছনে চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। চা' ও জলযোগের পর্ব্ব একঘণ্টা ধরিয়া চলিল। ইন্দ্রাণী যেন চোখে মুখে কথা কয়। গীতা লক্ষ্য করিল, ইন্দ্রাণী পূর্ব্বাপেক্ষা প্রগলভা হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করিল, বেশীর ভাগই সুব্রতর কথা। সে কি কি খাইতে ভালোবাসে—ইংরাজীতে তার কি অসাধারণ জ্ঞান, রাত্রে প্রায়ই ইন্দ্রাণী তাকে খাওয়াইয়া ছাড়ে। যেদিন পড়িতে ভাল না লাগে দু'জনে গঙ্গার ঘাটে বেড়াইতে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার মাঝখানে সুব্রত প্রায়ই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল। ইহাও গীতার লক্ষ্য এড়াইল না।

ইন্দ্রাণীর বাড়ী হইতে গীতা যেন নতুন মানুষ হইয়া ফিরিল। সে রাত্রে হাসি-খুশীতে সে অত্যধিক উচ্ছল হইয়া উঠিল। সুব্রতের তাহা খারাপ লাগে নাই—তবু যেন কিছুটা বাড়াবাড়ি মনে হইল।

ইহার পর হইতে গীতার আকস্মিক পরিবর্ত্তন সুব্রতকে রীতিমত অবাক করিয়া তুলিল। নরেশবাবুর মতামত, আচার ব্যবহার পূর্ব্বে গীতা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। আজকাল তাঁহার প্রশংসা গীতার মুখে লাগিয়াই আছে। শিক্ষিতা মেয়ের পটের বিবি সাজিয়া নভেল পড়াকে নরেশবাবু আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। গীতা সাবান পাউডারের ব্যবহার কমাইয়া দিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্বশুরের সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। নরেশবাবু মনে মনে খুশী হইয়া উঠিলেন। এতদিনে বৌমার সুবুদ্ধি হইয়াছে তাহা হইলে। তিনি যা ভাবিয়াছিলেন তা নয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিপদে পড়িল সুব্রত।

গীতা আজকাল তারই সাজ-সজ্জার দিকে অত্যধিক কটাক্ষ করে। দেশের যা অবস্থা—লোকে খেতে না পেয়ে মারা যাচ্ছে, তুমি কোন আক্কেলে পাউডার স্নো মাখো বলো ত?

কথাগুলি অযৌক্তিক নয়, আর গীতা যেরূপ জোরের

সঙ্গে বলিত তা উড়াইয়া দেওয়াও চলে না। সুব্রত বাধ্য হইয়া পাউডার ছাড়িয়া দিল। কিছুদিন হইল সে সেলুনে চুল কাটা আরম্ভ করিয়াছিল। গীতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—যেখানে দু' আনায় ভদ্রতা রক্ষা চলে, সেখানে অনর্থক ছয় আনা খরচ করে দেশের তুমি কি উপকারটা করছো? এই ছ'আনা আজকাল এক একটা ফ্যামিলির বাজার খরচ জানো?

সুব্রত লজ্জায় সে মাসে নাপিত ডাকিয়া চুল কাটিল।

কলিকাতা হইতে কি একটা কর্ম্ম উপলক্ষে সুব্রতের এক বন্ধু আসিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে দু'দিন থাকিবে। ছেলেটির নাম কনক—কংগ্রেসের সভ্য। দু' তিনবার জেল খাটিয়াছে। গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা—চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, সর্ব্বদা খদ্দর পরিধান করে। ছেলেটির কোনরূপ বিলাসিতা নাই। তার সরলতায় নরেশবাবু খুব খুশী হইলেন। সুব্রতর সামনে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই সব ছেলেই ত দেশের রত্ন। নিজের দেশকে যারা ভালোবাসে, বিলাসিতাকে যারা পাপ বলে গ্রহণ করে—তারাই ত ভবিষ্যত জাতি গঠনের অগ্রদূত। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক!

কনক হেঁট হইয়া নরেশবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল।

সুব্রত সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। একটা কাজের ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইয়া বাঁচিল।

রাত্রে গীতাও কনকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। তোমার বন্ধুটি চমৎকার! খদ্দরের ড্রেসেও কি সুন্দর মানিয়েছে—না? এ রকম simple ছেলে আমার বেশ লাগে।

সুব্রত সংক্ষেপে বলিল, হুঁ।

গীতা বলিল, 'আণ্ডার-ওয়ার' পরলে যেন ডেঁপো ডেঁপো লাগে। ও সব বিলেতী ঢং আমাদের দেশে মোটেই মানায় না—না?

সুব্রত পুনরায় কহিল—হুঁ।

গীতা উৎসাহভরে বলিয়া চলিল, তা ছাড়া দেশের যা অবস্থা—ওটাও ত বাজে খরচ। ওই পয়সায় অনেক ফ্যামিলির—

কিছুদিন হইতে গীতার অত্যধিক দেশপ্রীতিতে সুব্রতের মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর আজ বন্ধুর সামনে পিতৃদেবের দেশানুরাগ তাহাকে বেশ উত্তপ্ত করিয়া দিয়াছে। অসহিষ্ণু হইয়া সে বলিয়া উঠিল, বেশ! আণ্ডার-ওয়ার পরা কাল থেকেই ছেড়ে দেবো। কিন্তু গোঁফ আর আমি রাখবো না। তাতে বোধ হয় কোন ফ্যামিলির ক্ষতি হবে না।

অন্ধকারে গীতার চোখে মুখে চাপা হাসি খেলিয়া গেল।

অস্পৃশ্যতা নাই

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

পূর্ব্বে কাহারও পয়সা হইলে সে হয় কৃপণ হইত, নয় ধর্ম্মার্থে বা প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিধ ক্রিয়া কর্ম্ম করিত। কৃপণ নিজেকে এবং পরিজনবর্গকে এত কষ্ট দেয় যে তাহাকে কেহ ঈর্ষা করে না করুণা ও ঘৃণা করে। সেকেলে বড়লোকেরা দোল দুর্গোৎসব, বিবিধ ব্রত, পুষ্করিণী খনন, প্রভৃতি করিয়া লোকের নানা উপকার সাধন করিত। বর্ত্তমানে তাহাদের বিলাসেই সকল টাকা ব্যয় হয় সাধারণের হিতের জন্য খরচ করিবার টাকা কোথায়? আরও বেশী পয়সা থাকিলে সমুদ্র তটে, পাহাড়ে বা সাঁওতাল পরগণায় বাটীর প্রয়োজন। মোটরকার রেডিও গ্রামোফোন ইত্যাদির প্রয়োজন। বর্ত্তমানে টিউবওয়েল—নলকূপ প্রভৃতি হওয়ায় লোকে নিজের জলের জন্য পুষ্করিণী কাটে না, যাহাতে আরও পাঁচ জনের উপকার হইত। টিনের ঘর হওয়ায় বার্ষিক তৃণগৃহ নির্ম্মাণকারীদিগের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। ফলত বিবিধ ইংরাজি বিলাস দেশে আসায় ভদ্রলোকেরা পূর্ব্বে ইতর লোকদিগের স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে উপকার করিত তাহা বন্ধ হইয়াছে। মানুষের সহিত মানুষের পূর্ব্বে যে সকল মানবীয় সংস্পর্শ ঘটিত তাহা বন্ধ হইয়াছে।

এই মানবীয় সম্পর্ক কেমন করিয়া দাঙ্গার সময় লোকের রক্ষাবিধান করে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যালকাটা কেমিক্যালের বীরেন মৈত্রের বালিগঞ্জের বাটীর একতলামাত্র সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দাঙ্গার সময় তাহারা সেখানে সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। দোতালার অসমাপ্ত অংশের একটি ঘরে জন ১৫ মুসলমান রাজমিস্ত্রী বাস করিয়া বাটীর কাজ করিতেছিল। দাঙ্গার দিন হিন্দুরা ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করে। বীরেনবাবু তাহাদের কাতর ক্রন্দনে করুণার্দ্র হইয়া অনেক কষ্টে আক্রমণকারীগণকে প্রথমে ফিরাইয়া দেন। পরে যখন দেখিলেন তাহাদিগকে আর রাখা নিরাপদ নয়, তখন তিনি সন্ধ্যার পর সুযোগ পাইয়া কারখানার লরী আনাইয়া লোকগুলিকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া

দেন। দ্বিতীয় গল্পটি আমার শোনা মাত্র। পার্ক ষ্ট্রীটের অনেক বাটী লুণ্ঠিত হইলেও এক বাঙ্গালী হিন্দু ডাক্তারের বাটী লুণ্ঠিত হয় নাই। ডাক্তারটি লোকের উপকারী ছিলেন বলিয়া সেখানকার মুসলমানরাই তাঁহার বাটী রক্ষার ব্যবস্থা করে। এইরূপে হিন্দু মুসলমানকে রক্ষা করিয়াছে এবং মুসলমান হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বে আমি হিন্দু-সমাজে যে সকল অনাচার অবস্থিতির কথা বলিয়াছি, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন আমি সমাজে সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী। সমাজে যে সকল দোষ ঢুকিয়াছে তদ্বিষয়ে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। গল্পের খরগোস ঝোপের মধ্যে মুখটি মাত্র লুকাইয়া শরীর ঢাকিয়াছি ভাবিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এই দুর্দ্দিনে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দুই মহাপ্রভু পূর্ব্বে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের এক্ষণে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে।

দুই মহাপ্রভু :—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু। কয়েক মাস হইল শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ মহাশয়—যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের সুলেখক, ভাগবতের শ্রদ্ধাবান পাঠক এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত—যখন আমার নিকট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিপক্ষে দশ কথা বলিলেন, তখন সত্যই আমি বিব্রত হইয়াছিলাম, এবং কিছুকাল ধরিয়া আমার সংশয় চলিতেছিল। দাঙ্গার পর আমার সংশয় চলিয়া গিয়াছে এবং নিত্যানন্দের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ভিক্ষার জন্য যে সকল বৈষ্ণব গান করিয়া বেড়ায়, তারা প্রথমে চৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তি ও ভালবাসার প্রধানকেন্দ্র নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। নিত্যানন্দ বড় দয়াল, কাঙ্গালের—পতিতের বন্ধু—এই তাহাদের গানের প্রধান ধুয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু হিন্দুদিগের সংকটকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সংকটেও আমাদের তাঁহারই নির্দ্দিষ্টমার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। চৈতন্য মহাপ্রভু যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু তাহার প্রয়োগ দেখাইয়া ছিলেন। তিনি পতিত, তৎকালীন অস্পৃশ্য জাতিসমূহের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন—হিন্দু রাখিয়াছিলেন। রাঢ় দেশেই নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার প্রধানত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে এ জন্য হিন্দুর মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ তত বেশী হয় নাই। পতিত জাতির প্রতি নিত্যানন্দ কত সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাহা বৈষ্ণব কবির এই দুই ছত্র কবিতা হইতে বুঝা যায়।

"কি কব নিত্যানন্দের জাতের পরিপাটি।
উদ্ধরণ দত্ত সোনার বেনে তার ডেলে দেয় কাটি॥"

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস বলেন :—

কারুণ্যে ভক্তি দাতৃত্বে চৈতন্যগুণ বর্ণনে।
অমায়া কথনে নাস্তি নিত্যানন্দ সম প্রভুঃ॥

চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—।

"মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥" (চৈতন্য ভাগবত)

এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ কিরূপ বর্ত্তমান কালোপযোগী তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়টি কথা লিখিব।

(১) কলিযুগে হরিনামই (ভগবানের নাম) শ্রেষ্ঠ সাধন।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(২) ভক্তিমান চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ :—
"শুচি সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নিদগ্ধ দুর্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকেঽপি বুধৈ শ্লাঘ্যোন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥"

(৩) "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

আমার কথা শেষ হইলে পণ্ডিত যদুনাথও স্বীকার করিলেন বর্ত্তমানকালে প্রকৃতই অস্পৃশ্যতা নাই। নীচ জাতিদিগকে পূর্ণভাবে জলাচরণীয় করা উচিত। কথা প্রসঙ্গে আরও বাহির হইল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু—প্রথম জীবনে পৈতা ফেলিয়া ব্রাহ্ম হইয়া অব্রাহ্মণোচিত আচার অবলম্বন করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি তপঃসিদ্ধ হইয়া মহাগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। অনেক উচ্চ-বর্ণের লোক তাহার মন্ত্রশিষ্য। তাহার শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের উচ্চবর্ণের শিষ্য বহু। তাহার নমশূদ্র শিষ্য অনেক আছে। ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শিষ্য সন্তোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাহারও উচ্চ নীচ (নমশূদ্রও তাহার মধ্যে) বহু শিষ্য হইয়াছে। নীচ জাতীয় এইসকল শিষ্যগণও উচ্চজাতীয়দিগের মত গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা ব্যবহৃত হন।

তারাকিশোর চৌধুরী মহোদয় প্রথম বয়সে ব্রাহ্ম হইয়া পৈতা ফেলিয়া দিয়া নিজ পিতা কর্ত্তৃক পতিত বিবেচনায় তাঁহার ত্যাজ্যপুত্র হইয়াছিলেন। ইনিও পরে কাঠিয়া বাবার শিষ্য হইয়া তপঃসিদ্ধ হন। পরে সন্তদাস বাবাজী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য।

পরমহংসদেবেরও জন্মাদি উৎসব উপলক্ষে আহারাদির সময় কোনও-রূপ জাতি বিচার করা হয় না।

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বেও শ্রীপাট বাগনাপাড়ায় বৈষ্ণব উৎসব উপলক্ষে দেখিয়াছি অন্নকুট ব্যাপারে কোনওরূপ জাতিভেদ মানা হইত না। অবশ্য খুব নিষ্ঠাবান লোক কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিতেন না।

আমাদিগকে মহাপ্রভুর পদাঙ্ক ধরিয়া সকল জাতিকেই হরিনাম (ভগবানের নাম) দিতে হইবে এবং নাম যাহারা গ্রহণ করে তাহারাই পবিত্র ভাবিতে হইবে। নতুবা নাম অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে।

অসংলগ্ন

শ্রীদীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(এক)

চৈত্রের দুপুর। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, টু শব্দটী পর্য্যন্ত নেই। আমার নিরালা পর্ণকুটীরে আমি নিঃসঙ্গ একা। বসে বসে শুধু ভাবছি আর লিখছি—লিখছি আর ভাবছি। হঠাৎ খুট্ করে শব্দ হ'ল। চেয়ে দেখি দ্বারপ্রান্তে একজন অপরিচিতা তরুণী। বয়স আঠার উনিশ হবে। সদ্যস্নাতা, এলায়িত কেশ, মুখমণ্ডলে প্রসাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পরণে একখানা নীল রংয়ের শাড়ী। রক্তিম অধরে মৃদু মৃদু হাসি। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে চঞ্চলতার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দেখলে কোন কাব্যের নায়িকা বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় চেয়ে আছি তার মুখের পানে—সেও চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব, নির্ব্বাক। সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি যখন—দেখি সম্মতির অপেক্ষা না করে সে আমার শত ছিন্ন নোংরা বিছানার একাংশ অধিকার করে বসে আছে। আমি একেবারে অবাক্ বনে গেছি। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময়—

—মাফ্ করবেন, আপনার সম্মতি না নিয়েই অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি।—হেসে উঠলো সে।

—এতে মাফ্ চাইবার কি আছে বলুন? সরকারী বড়কর্তার খাসকামরা যখন এটা নয়—নিছক সহায়সম্বলহীন দরিদ্রের পর্ণকুটীর—তখন সেখানে প্রসিকিউসনের প্রশ্ন নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

—ভরসা তো ওইখানে। আবার সে হেসে উঠলো।

—তা যাক্ সে সব কথা। দয়া করে আপনার পরিচয়টা—

—জানবেন বৈকি, নিশ্চয়ই জানবেন। তবে আগে আপনার তরফ থেকে কিছু—

—জানতে চান বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।

—বলুন কি জানতে চান আপনি?

—সারাদিন বসে বসে কি লেখেন আপনি বলতে পারেন?

—আপনি কি করে জানলেন, আমি দিনরাত বসে বসে শুধু লিখি।

—জানি বৈকি। নিশ্চয়ই জানি। রোজ দেখি সারাদিন বসে বসে কি লেখেন, আর মাঝে মাঝে চিন্তামগ্ন হয়ে ভাবেন। আপনি কি সাহিত্যিক?

—না, মোটেই আমি সাহিত্যিক নই।

—তবে?

—তবে তেমন কিছু নয়। ওটা আমার একটা বাতিক।

—বলেন কি! সারাদিন ধরে লেখা আপনার বাতিক!

—আশ্চর্য্য হচ্ছেন নাকি?

—হচ্ছি, ভীষণ রকমের আশ্চর্য্য হচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। তারপর খানিকটা আনমনাভাবেই বলে—একটা কথা কি জানেন?

—বলুন।

—আপনাকে দেখে ঠিক আমার একযুগ আগেকার সেই সব স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে। উঃ, এখন সে সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়। সহসা বলতে বলতে সে থেমে যায়। মুহূর্ত্তে তার মুখখানি বেদনায় ম্লান, অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে। কণ্ঠস্বরও তেমনি তার হতাশাব্যঞ্জক। কোন আঘাত বোধ করি সে পেয়েছে। কেমন যেন শরম ও শঙ্কায় তার চোখের আনত দৃষ্টি নুয়ে পড়ে মাটীতে। মনে হয় সে যেন তার কোন মহাসত্যকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর আমিই যেন তার সে ইপ্সিত লক্ষ্য বস্তু। আমার মনেও তখন সংশয়, বিস্ময় সব একে একে জমা হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমি।······কিন্তু থাক্ সে সব।

(দুই)

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। ছোট বলতে মানে আমার ষোল সতের বছর বয়সের কথা বলছি। পান্না, বেণু, সুমিত্রা—এরা সবাই তখন আমার মনের মাঝে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রার কথাই বলি আগে—শোন তোমরা। ভীষণ একরোখা মেয়ে অর্থাৎ তেজস্বিনী যাকে বলে। ওঃ! সেবার আমাকে পুলিশের হাত থেকে জবর বাঁচা

বাঁচিয়েছিল, নইলে—বুঝতেই পারছ ? ১৯৩০ সালের কথা বলছি। স্বদেশী ডাকাতি আর সায়েব মারার হিড়িকে দেশ তোলপাড়। ছেলেরা সব জীবন পণ করে লেগেছে দেশ উদ্ধারের কাজে। ভারতবর্ষ থেকে যেমন করেই হোক্ ইংরেজ শক্তিকে নির্ম্মূল করতে হবে। সে কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা। শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক ভাঙ্গা পণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সেই কৃচ্ছ সাধনা ধ্যান-মৌন গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের মত যেমন স্থির অটল, তেমনি গুরু গম্ভীর। আর কি! আমিও ভীড়ে গেছি ঐ দলে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন জীবনদা! পাণ্ডা কথাটাকে তোমরা তাচ্ছিল্যের সাথে হেসেই উড়িয়ে দিও না যেন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে নায়ক। যেমন রাজপুত্রের মত দেখতে,শক্তিও তেমনি অসাধারণ। সাহসের কথা আর বলতে হবে না।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। দলের নির্ম্মল এসে খবর দিল—নীলগঞ্জের পুলিশ সুপারকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে আজকের এই সুবর্ণ সুযোগ আদৌ হাতছাড়া করা উচিত নয়। শিকারী যেমন শিকার দেখলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, জীবনদাও তেমনি সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে বল্লেন—'ইয়েস্—তাই হবে। শঙ্কর, বি রেডী ফর লাইফ এণ্ড ডেথ্। প্রবোধকে তারা যে পথে পাঠিয়েছে আমরাও আজ তাকে সেই পথে পাঠাব।'

প্রবোধ ছিল দলের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী—জীবনদা'র প্রিয় শিষ্য। ভীষণ অনুগত ছিল। অমন তাজাসোনার মত ছেলেটাকে ঐ ডেভিলটাই তো সেবার হলদী-বাড়ীর ডাকাতি কেসে গুলি করেছিল। ওঃ, সে কি বীভৎস দৃশ্য। গুলিটা প্রবোধের বুকে লেগেছিল কিনা। অনর্গল রক্ত ঝরছিল ক্ষত স্থান দিয়ে। একেবারে তাজা রক্ত। জীবনদা ওকে তাঁর বলিষ্ঠ দু বাহুর ওপর নিয়ে ছুটে চলেছেন। অন্ধকার রাত্রি। আকাশে কালো মেঘ—গুরু গুরু ডাকছে—আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গ্রামের পথ। উঁচু নীচু ঢিপি জঙ্গল আর কাঁটার বন। বুঝতেই পারছো ব্যাপারখানা কি। জীবনদা প্রাণপণে ছুটেছেন ওকে নিয়ে। অকস্মাৎ দিঘল গাঁয়ের নদীর বাঁকের কাছে এসে জীবনদার চলা থেমে গেল। চিরজীবনের মত সে ঘুমিয়ে পড়েছে জীবনদার কোলে। শ্রাবণের ধারা সুরু হয়েছে তখন জীবনদার দু চোখ বয়ে। তবে সে ঠাণ্ডা নয়—স্নেহমিশ্রিত তপ্ত অশ্রু। আমরা জীবনদার কাছে শুনেছি, প্রবোধের যাত্রাপথের শেষ কথা কয়টী নাকি ছিল—'জীবনদা, চল্লুম। আবার ফিরে এসে আমাদের কাজের শেষ দেখতে পাব তো? হ্যাঁ, আর একটী কথা। মাকে কিন্তু এসব কথ্খোন জানিয়ো না। আঘাত সইতে পারবেন না তিনি। সারাটা জীবন ধরে শুধু তাঁকে কষ্টই দিয়ে গেলাম জীবনদা। আমারি কথা জিজ্ঞেস করলে বলো—প্রবোধ ভালই আছে। শীগ্গীরই ফিরে আসবে।'

আসবে বৈ কি! আসবে। প্রবোধ আসবে। পান্না, বেণু, সুমিত্রা, নির্ম্মল—এরা সবাই একদিন আসবে। হঠাৎ বাতায়ন পথে ভেসে এলো—'আসবে বৈ কি। তারা সবাই আসবে। কিন্তু যে পথে তারা একদিন এসেছিল সে পথে নয়—নূতন পথে।'

ধ্যানমগ্ন ছিলুম এতক্ষণ। চেয়ে দেখি সমস্ত প্রকৃতিটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু নিশীথের মুক্ত আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বল জ্বল করছে, আর দূরে—বহু দূরে 'চোখ গেল' পাখীর করুণ বিলাপ ধ্বনি।

(তিন)

১৯৩৮ সাল। কর্ম্মীরা সব জেল থেকে বেরিয়েছে, নতুন চিন্তা ধারা নিয়ে। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো তারা অগণিত কৃষক মজুরের মাঝখানে। আমিও মিশে গেছি তাদের মাঝখানটায়। এবার আমাদের কাজের সুরু। গ্রামে ফিরেছি। সভা হবে—কৃষক সভা। হাজার হাজার কৃষক দূর দুরান্তের গ্রাম থেকে আসছে দল বেঁধে আমার বক্তৃতা শুনতে। হাতে তাদের সর্ব্বহারার লাল পতাকা। বজ্রকণ্ঠে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে—'দুনিয়ার কৃষক মজদুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক' 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। সভা আরম্ভ হ'ল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি—'কৃষক ভাই সব! কেন আজ তোমাদের এই অসহায় অবস্থা। খেতে পাচ্ছ না, পরতে পাচ্ছ না, মরতে বসেছ। চালে খড় নেই —গোয়ালে গরু নেই—গোলায় ধান নেই। হাল লাঙ্গলে সব মরচে ধরে গেছে। স্ত্রীপুত্রের ইজ্জৎ ঢাকবার মত এক ফালি কাপড় জুটছে না তোমাদের। কি ভয়াবহ অবস্থা!

রোজ সন্ধ্যে লাগতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে—তবুও এক ফোঁটা ওষুধ পাও না। রোগে ভুগে আজ তোমরা জীর্ণ শীর্ণ অস্থিকঙ্কালসার। ছেলেমেয়েরা চোখের ওপর মরে যাচ্ছে বিনা ওষুধে। অথচ কোন প্রতীকার নেই। জমিদার মহাজনের মোটা নজরানা থেকে সুরু করে তাদের মেয়ের বিয়ের টাকা, ধূর্ত্ত আমলা গোমস্তাদের হরেক রকমের পালপার্ব্বণী যোগাড় করতে আজ বাংলার কৃষক সর্ব্বস্বান্ত। এ ছাড়া পর্ব্বতপ্রমাণ জমির খাজনা তো আছেই। ভেবে দেখতো কি সাংঘাতিক কথা। তোমাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করে যারা বড় হয়েছে তারা কেউ রাজা, কেউ জমিদার, কেউ বা মহাজন! রক্ত দিয়ে গড়া তোমাদেরই অর্থে আজ তারা বড়লোক—ধনী। দুনিয়ার সকল সুখ সুবিধার আজ তারাই একমাত্র মালিক। আর তোমরা? তোমরা তাদের দাসানুদাস—গোলাম। তোমাদের আর মানুষ হ'বার যো নেই। আর কতকাল তোমরা এই নির্ম্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করবে? ভাই সব! মিছিল করে বেরিয়ে এসো আজ তোমরা। সমস্ত অন্তর দিয়ে ব্যক্ত কর তোমাদের পুঞ্জীভূত প্রাণের গোপন বেদনা। আজ ভাষায় প্রকাশ কর তোমাদের প্রাণের দাবী। মুক্ত কণ্ঠে বল—'আমরা মানুষ। মানুষের মত বাঁচতে চাই।'

দিগন্তে আওয়াজ উঠলো: 'দুনিয়ার সর্ব্বহারা কৃষক মজুর এক হও' 'ইংরেজরাজ ধ্বংস হোক'। হঠাৎ সমস্ত শরীরটা আমার রোমাঞ্চ দিয়ে উঠলো তীব্র উত্তেজনায়। থর থর করে আমি তখন কাঁপছি। একেবারে বেহুস্।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে।

(চার)

পান্না বেণু সুমিত্রা জীবনদা প্রবোধ নির্ম্মল। সোনারপুর গ্রাম। মুখুজ্জেদের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘর। নিশীথ রাত্রে লিচুতলা পেরিয়ে গোপনে খিড়কি দরজায় চুপি চুপি ডাক—'সুমি—সুমি'। বাপের সাথে পান্নার ঝগড়া—বিয়ে কোরবো না বলে। বেচারী বরের বাপের বিফল মনোরথে চলে যাওয়া। বেণুর মাতৃ-বিয়োগ—একে একে সব মনে পড়ছে। কোথায় গেল সে সব দিন। দেখা হলে চিনতে পারবে কি তারা? তন্ময় হয়ে ভাবছি কেবল। হঠাৎ আওয়াজ এলো কানে: শঙ্কর—শঙ্কর আছ নাকি! এ কি! কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। বাইরে এলাম।

—আরে নির্ম্মল যে! তুই কোত্থেকে?

—আবার কোত্থেকে—একেবারে সরকারী খাসমহল থেকে—বলে নির্ম্মল হাসতে হাসতে।

—আয়, আয়, ঘরে আয়, কতকাল পরে দেখা। কত কথা যে জমা হয়ে আছে রে ভাই। ফোয়ারার মত ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

নির্ম্মল বলে—খুব ডুব মেরেছিলে যা হোক। খুঁজেই পাওয়া যায় না।

—তা কি করে খোঁজ পেলে আমার?

—সে অনেক কথা।

—তারপর জীবনদা আজকাল কোথায়?

—কেন তিনি তো রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। চিঠি পেয়েছি ক'দিন আগে। কেমন যেন আল্‌গা ভাবে নির্ম্মল কথাটা বলে।

আবার সেই অপরিচিতা মেয়েটী এসে উপস্থিত।—'চিনতে পার শঙ্করদা?' মুখ টিপে হাসতে থাকে মেয়েটী। অবাক হয়ে আমি বলি—'না।'

নির্ম্মল হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—'চিনলে না ওকে? ও যে সুমিত্রা—আমাদের সুমি।' বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শঙ্কর চেয়ে থাকে সুমিত্রার পানে। তারপর বলে—'সুমিত্রা! আমাদের সুমি!' বিস্ময় উল্লাসে জ্বলতে থাকে শঙ্করের চোখ দুটী। বিশ্বাস হচ্ছে না এমনি যেন তার ভাব।

—'হ্যাঁ গো শঙ্করদা! এখনও চিনতে পারলে না বুঝি? সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। তবে সাহস করে কিছু বলি নি।'—জিজ্ঞেস করে দেখ নির্ম্মলদাকে।

অমনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শঙ্কর নির্ম্মলের পানে তাকায়। নির্ম্মল হাসতে হাসতে বলে—প্রথমে সুমির কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিল না। ও নাছোড়বান্দা। বলে, শঙ্করদা ছাড়া আর কেউ নয়। অবশেষে আমি বল্‌লাম—চলো তা হলে দেখেই আসা যাক্। তারপর দেখতেই তো পেলে ভাই নাটকীয় ব্যাপার।

শঙ্কর তখন দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে—সত্যি ভগবান বোধ করি আমাদের নাটকীয় উপাদানে গড়েছিলেন। নইলে এমনি ভাবে আমাদের দেখা হবে—স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি।'

—আমিও কোনদিন ভাবিনি শঙ্করদা! তুমি এই নিভৃত পল্লীতে আত্মগোপন করে আছ। ঘটনাচক্রে আমাকে আসতে হবে কাকাবাবুর বাড়ীতে। নির্ম্মলদা এসে জুটবে এখানে। আবার আমাদের হারানো দিনের বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র নূতন করে যোজনা হবে—সুদূর বাংলার এই নির্জ্জন পল্লীতে।......

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসে। তবুও চলতে থাকে ওদের কথাবার্ত্তা অবিশ্রান্ত গতিতে। যেন কত শতাব্দী ধরে মানুষের অব্যক্ত বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা এক এক করে জমা হয়েছিল ওদের মনে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত কথার বাণে আজ তা প্রকাশ পাচ্ছে। সুমিত্রা বলে চলে—আর কতকাল এই অত্যাচার নির্য্যাতন চলতে থাকবে। কবে এ কালরাত্রির শেষ হবে শঙ্করদা। আবার কবে আমরা নূতন প্রভাতের মুখ দেখতে পাব। যেদিন মানুষে মানুষে হানাহানি, স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঝগড়া, বিসম্বাদ, রক্তাক্ত ধরিত্রীর পঙ্কিলতা পাপ—এ সব কিছুই থাকবে না। সব ধুয়ে মুছে যাবে। বলতে বলতে সুমিত্রার চোখে জল আসে।

—সেদিনের আর দেরী নেই বোন্। কালরাত্রি শেষ হয়ে এলো। ঐ নূতন প্রভাতের সামনে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর বেশী দূর নয়। ভয় পাস নে যেন বোন রক্তাক্ত পথ দেখে।......এগিয়ে চল্।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ (১)

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ নেতা উ-আউঙ্গসানের নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হয়। ফ্যাসীবিরোধী গণ-স্বাধীনতালীগের সভাপতি ও ব্রহ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস চেয়ারম্যান উ-আউঙ্গসান ও তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর সকল সদস্য গত ১৯শে জুলাই অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। এই বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে এশিয়ার প্রতিটী দেশ শোকে মুহ্যমান। দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীর সন্তানের অকাল মৃত্যুতে ভারতবাসী তার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে সহানুভূতি জানাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাধীনতালীগের সহসভাপতি থাকিন নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। আশা করি তিনি তাঁর প্রিয় নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রহ্মকে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতার স্বপ্ন-মাখা চোখ তুলে চায় মহাকাশের পানে। দিকে দিকে উঠে জয়গান। মহাকালের রথ তাদের জয়যাত্রার সহায়ক। বিশ্বের রাজনীতির সভামঞ্চে ইউরোপ চারিশত বৎসর প্রাধান্য বিস্তার করে ভেবেছে এ আসনে তাদেরই শাশ্বত অধিকার। এশিয়ার নব জাগরণে তাদের এ ভুল ভাঙছে। তবুও চেষ্টা করছে তারা নানা ভাবে এই প্রাধান্য বজায় রাখতে। কিন্তু হার মানতেই হবে তাদের, বিদায় নিতে হবে তাদের এশিয়া থেকে। এখনও ক্ষীয়মান শক্তি নিয়ে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদের সাম্রাজ্য বজায় রাখবার উদ্যমের অন্ত নেই। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ, ইন্দোচীনে ফরাসী এবং ভারত ও ব্রহ্ম দেশে ইংরাজ কোটী কোটী লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। গণদেবতার রুদ্ররোষ যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন এক লহমায় তাদের এই খেলা ধ্বংস হবে।

বহু দরকষাকষি ও কূটনৈতিক ধাপ্পাবাজীর পর বৃটেন ভারতকে ডোমিনিয়ান শাসন মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুর্ব্বলতা সৃষ্টির প্রয়াসে ক্ষান্ত হয় নি। খণ্ডিত ভারতের একাংশে (পাকিস্থান) ঘাঁটী নির্ম্মাণের ভরসা ইংরাজ এখনও রাখে। এই ভেদনীতিই ইংরাজের চরম অস্ত্র। তবে ভারতের দিগন্ত রেখায় যে বিরাট সম্ভাবনার দ্যুতি আত্মপ্রকাশ করছে তার বিপুলছটায় একদিন সমস্ত অস্ত্রই ব্যর্থ হবে। ভারত আবার বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে।

ভারতের মত ব্রহ্ম দেশেও বৃটেন ডোমিনিয়ান শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ব্রহ্মের গণপরিষদ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম দেশের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ হলেই তার স্বাধীনতা ঘোষণার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীন ব্রহ্ম বৃটীশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার কিংবা বৃটেনের সঙ্গে সকল সম্পর্কচ্ছেদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ব্রহ্মের স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাসমরের রণ বাদ্যের

অন্তরালে। ১৯৪৪-৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ব্রহ্ম দেশের ভিতর দিয়ে ভারত সীমান্তে এসে ভারতকে উদ্ধারের জন্য অভিযান চালাচ্ছিলেন সেই সময়েই আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠে ব্রহ্মের জনগণের স্বাধীনতা লীগ। ষাট বৎসরের পরাধীনতার যবনিকা ভেদ করে এই সময় তাদের চক্ষে স্বাধীনতার আলো উদ্ভাসিত হয়, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ তারা পায়। স্বল্পকালস্থায়ী স্বাধীনতা তাদের মধ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প এনে দেয় বিদেশী শাসক বিতাড়নের কাজে। জাপানীরা ব্রহ্ম দখল করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বর্ম্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলে, আধুনিক রণ বিদ্যায় শিক্ষিত করে। জাপানীরা ভেবেছিল যে বর্ম্মীরা ইংরাজ তাড়ালেও তাদের তাড়াবে না। কিন্তু স্বাধীনতার মুখ যারা দেখেছে তাদের কাছে সব বিদেশী শাসকই সমান—ইংরাজও তাদের কাছে যে বস্তু, জাপানীও তাই। বর্ম্মীরা তাই স্বাধীনতার সঙ্কল্প নিয়ে দলে দলে যোগ দিলে ফ্যাসী-বিরোধী গণ-স্বাধীনতা-লীগে। এক তরুণ এই দলের নেতা। তিনি হলেন জেনারল আউঙ্গ সান। বাল্যকাল থেকেই আউঙ্গ সানের হৃদয়ে দেশ প্রেমের বহ্নি জ্বলে উঠে। রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়ই তিনি ব্রহ্মের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যুব আন্দোলনের প্রতিনিধি রূপে ১৯৪০ সালে তিনি রামগড় কংগ্রেসে যোগদান করেন। জাপানীদের ব্রহ্ম দখলের পূর্ব্বেই ১৯৪১ সালে এই বিপ্লবী নেতা যান টোকিওতে। সেখানে সমর বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি অল্পকালের মধ্যেই মেজর জেনারেল পদ-লাভ করেন।

জাপান থেকে ফিরে এসে আউঙ্গ সান দেখলেন জাপানীরা ইংরেজ তাড়িয়ে ব্রহ্ম অধিকার করে বসে আছে। জাপানীরা 'এসিয়া এসিয়াবাসীদের জন্য' শ্লোগান তুলে বর্ম্মীদের সহায়তায় ডাঃ বা-মকে প্রধান মন্ত্রী করে এক মন্ত্রিসভা গঠন করে বর্ম্মা শাসন করতে লেগেছে। আউঙ্গ-সান এই মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে জাপানীরা ব্রহ্ম দেশকে স্বাধীনতা দেবে। কিন্তু শীঘ্রই তার ভুল ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন যে ইংরেজ ও জাপানীতে প্রভেদ নেই। তখন তিনি গোপনে গোপনে স্বেচ্ছা-বাহিনী গঠন করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালাতে লাগলেন। বর্ম্মার গ্রামাঞ্চলে জাপ সৈন্যেরা কোথাও কোন প্রকার অত্যাচার করলে এই স্বেচ্ছাবাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে তার প্রতিশোধ নিতে লাগল। ক্রমে এই স্বেচ্ছা-বাহিনী জাপসেনাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠল। এই থেকেই বর্ম্মার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল ফ্যাসী-বিরোধী জনগণের স্বাধীনতা-লীগ গড়ে ওঠে।

ব্রহ্মের জনগণ তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। তারা আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ সংহত শক্তির বিকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তাই তারা ধীরে ধীরে আউঙ্গ সানের স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হ'ল। যুবার দলের সাথে সাথে প্রবীণের দলও এই তরুণ নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলে। আউঙ্গ-সান তখন মাত্র ত্রিংশবর্ষীয় যুবা। এই তরুণ নেতা কি করে যে ব্রহ্মের জনসাধারণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। অমলিন দেশপ্রেমই তাঁকে এই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। বাল্যকালেই আউঙ্গ সান ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের মহান নেতাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জওহরলালের আত্মত্যাগ ও আদর্শকে তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সাধনায় যে তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েছেন সমগ্র দেশের চিত্ত জয়ই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেখতে দেখতে স্বাধীনতা লীগ ব্রহ্মে বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টগণও এই দলে যোগদান করে এর শক্তিবৃদ্ধি করেন।

এদিকে ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জাপানীদের কাছ থেকে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে। ইংরাজ আবার তার শাসন কায়েমের চেষ্টায় ব্রতী হয়। অল্পকালের মধ্যেই তারা টের পায় যে ১৯৪৫ সালের ব্রহ্মের রূপ ১৯৪২ সালের থেকে অনেকখানি বদলে গেছে। এই তিন বৎসর কাল ধরে ব্রহ্মকে আধুনিক যুদ্ধের সকল প্রকার ধ্বংসকর অস্ত্রের ক্ষত-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করতে হয়েছে। ইংরেজ তাড়াবার জন্য প্রথমে জাপানীরা দেশের যথেচ্ছ ক্ষতি সাধন করেছে। আবার জাপানী তাড়াবার জন্য ইংরেজও ততোধিক ক্ষতি সাধন করেছে। দুই পররাজ্যলোভী শক্তির নির্ম্মম দাপটে নিরীহ দেশের এই ভাবেই সর্ব্বনাশ হয়। জাপ ও বৃটীশ অভিযানের ফলে ব্রহ্মের বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত জনগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। বনজ, খনিজ প্রভৃতি পণ্য ও কৃষিজাত সম্পদ হারা হয়ে অন্নপূর্ণা ব্রহ্মকে হা-অন্ন হা-অন্ন করতে হয়েছে।

এম্নি দুর্দ্দিনে ব্রহ্ম পুনরধিকার করে ইংরাজ ১৯৪৫ সালে ব্রহ্মের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিণতি বর্ণনায় যে হোয়াইট পেপার প্রকাশ করলেন ব্রহ্মবাসী তাতে আলোর তুলনায় আঁধারই দেখলে বেশী। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সেদিন একথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমরাগ্নি তাঁদের শোষণ বৃত্তির দাহিকা শক্তিকে ধ্বংস করেছে। তাই ব্রহ্মে বৃটীশ শোষণ অব্যাহত রাখবার চেষ্টায় হোয়াইট পেপারে ব্রহ্মের সামাজিক বিশৃঙ্খলা বিনাশ ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি জানান হল না।

ব্রহ্মে এই সময় স্বাধীনতা লীগ ছাড়া আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে মায়োচিত, দোবামা ও মহাবামা দলের নাম উল্লেখযোগ্য। মায়োচিত পার্টি গড়ে উঠে ব্রহ্মের প্রবীণ নেতা উ-স'র নেতৃত্বে, দোবামা (অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশ ব্রহ্মবাসীদের) পার্টি থাকিন-বা-সীনের নেতৃত্বে এবং মহাবামা (অর্থাৎ বৃহত্তর ব্রহ্ম) ডাঃ বা-ম'র নেতৃত্বে। এই সকল দল থাকলেও স্বাধীনতা লীগ যে ভাবে দেশের জনগণের উপর প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় এর কোনটাই তার কাছ দিয়েও যেতে পারে না। ভারতের সমগ্র দেশের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক যেমন কংগ্রেস, ব্রহ্মের স্বাধীনতা লীগও তদ্রূপ।

জাপ আক্রমণকালে পলাতক গভর্ণর স্যর রেজিন্যাল্ড ডর্ম্যান স্মিথ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বিঘোষিত হোয়াইট-পেপারের শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তিনি তার শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করলেন কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল বৃটীশ খেতাবধারী নেতা ও মায়োচিত পার্টির কয়েকজন দলত্যাগী নেতাকে নিয়ে। বর্ম্মীরা এই অপদার্থ গভর্ণরটিকে সুনজরে দেখতে পারে নি। আর তিনি যে ভাবে শাসন পরিষদ গঠন করলেন তাতে তারা মোটেই তুষ্ট হ'তে পারে নি। তারা দেশব্যাপী আন্দোলন সুরু ক'রে দিলে। জাপানীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল। অস্ত্রের সাহায্যে সমগ্র দেশে তারা অরাজকতার সৃষ্টি করলে। আউঙ্গ সান সুযোগ বুঝে কর্ম্মক্ষেত্রে নামলেন। দিকে দিকে অরাজকতা ও ধর্ম্মঘট ব্রহ্মের শাসন ব্যবস্থাকে অচল করে দিলে। ডর্ম্যান সাহেব তার সাম্রাজ্যবাদী প্রাচীন দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে অরাজকতা দমনে প্রবৃত্ত হলেন। বৎসরাধিক কালের চেষ্টাতেও তিনি কোন সুরাহা করতে পারলেন না। জনগণের সহযোগিতায় বঞ্চিত হয়ে ডর্ম্যান সাহেব শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন।

বৃটেনে শ্রমিক সরকার ব্রহ্মের এই অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। তাঁরা বুঝলেন যে স্বাধীনতা লীগের সহায়তা ব্যতীত ব্রহ্মে এখন আর শাসন কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তখন তাঁরা স্বাধীনতা লীগ ও লীগের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সানের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। স্যর রেজিন্যাল্ডকে ইংলণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে স্যর হিউবার্ট র‍্যান্সকে গভর্ণর করে পাঠালেন। তিনি এসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে শাসন পরিষদ ঢেলে সাজলেন। জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সম-সাময়িক। ব্রহ্মের শাসন কার্য্যে এই সরকারের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল। স্বাধীনতা লীগ কিন্তু তাতে তৃপ্ত হতে পারলেন না। পূর্ণ স্বাধীনতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে তারা ঘোষণা করলেন এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে হোয়াইট-পেপার প্রত্যাহারের জন্য তারা এক চরমপত্র দিলেন।

এই দাওয়াইতে বেশ চমৎকার কাজ হল। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে ব্রহ্ম দেশের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হল। বর্ম্মীরা ইচ্ছা করলে বৃটীশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকতে পারে অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে। ব্রহ্মবাসীরা তাদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার কাজ সম্পন্ন করলেই তাদের নিকট পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই ঘোষণায় ব্রহ্মবাসীরা আনন্দিত হল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে ব্রহ্ম প্রতিনিধিদল লণ্ডনে গিয়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চালালেন। এর ফলে এটলী-আউঙ্গ সান চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এতে ঠিক হল যে ব্রহ্মেও ভারতবর্ষের মত গণপরিষদ গঠিত হবে। এই গণপরিষদ স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার শাসন কাজ চালাবেন। এই সরকার ডোমিনিয়ন সরকারের মর্য্যাদা পাবে। দোবামা ও মায়োচিত পার্টির নেতৃদ্বয় থাকিন-বা-সীন ও উ-স আলোচনাকালে প্রতিকূল মনোভাব না দেখালেও শেষ মুহূর্ত্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরে অস্বীকৃত হলেন। তা সত্বেও এটলী-আউঙ্গসান চুক্তিই কার্য্যকরী করা হল।

ভারতের ন্যায় এখানেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভেদনীতির আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। আউঙ্গ-সান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করবার পর বর্ম্মী কম্যুনিষ্ট দল স্বাধীনতা লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধিতা করতে থাকে। মায়োচিত ও দোবামা পার্টিও স্বাধীনতা লীগের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। পরাধীন দেশে তল্পী বাহকের অভাব হয় না। এই সকল দল ছাড়াও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের পার্ব্বত্য জাতিগুলি সম্পর্কে মাইনরিটি সংরক্ষণের ধুয়া তুললেন।

বৃটীশ জাতির একটা মস্ত গুণ যে অতি সহজ সমস্যাকেও তাঁরা অতীব জটিল করে তুলতে পারেন। বর্ম্মাতেও তারা জাতীয়তার সহজ রাস্তা ছেড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্রহ্মেও ভারতের মত নানা জাতির বাস। ভারতবর্ষ যেমন জাতি হিসাবে হিন্দুদেরই দেশ, ব্রহ্মদেশও তেমনি বর্ম্মীদের। তবে ভারতের নানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মত সান, কাচিন, চিন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগুলি এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সর্ব্বোপরি ভারতের মুসলমানদের মত ব্রহ্মে রয়েছে কারেন জাতি। ভারতের মুস্লিম লীগের মতই কারেন সম্প্রদায় বৃটীশ অনুগ্রহ-পুষ্ট। তাই ব্রহ্মের আইন সভায় সংখ্যানুপাতে কারেনরা মাত্র বার জন প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী হলেও গণপরিষদে তাদের দেওয়া হয়েছে ২৪টি আসন। সান সর্দ্দার ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি গুলির জন্য ৪৫টি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ব্রহ্মে বৃটীশের ভেদনীতি ততটা সফল হয় নি। দেখা গেছে যে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিগণও জেনারেল আউঙ্গ সানেরই সমর্থক। সীমান্তের অধিবাসিগণও স্বাধীন ব্রহ্মের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়।

ব্রহ্মের বড় সৌভাগ্য এই যে সেখানে পাকিস্থান সৃষ্টিকারী, বৃটীশের পদলেহনকারী প্রতিক্রিয়াশীল জিন্না নাই, হায়দরাবাদের মত প্রভুত্বপ্রয়াসী রাজন্য নাই। ব্রহ্মের জনসাধারণের পক্ষে তাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা অর্জ্জনও তাই অনায়াসলব্ধ হবে বলেই মনে হয়। গণপরিষদের নির্ব্বাচনকালেও জনগণের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। পরিষদের ২১০টি সাধারণ আসনের মধ্যে স্বাধীনতা লীগের প্রার্থিগণ দুইশতটি দখল করেছেন।

গত ১০ই জুন নব-নির্ব্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন বসে। ব্রহ্মের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৬ই জুন স্বাধীনতা লীগের সভাপতি এবং ব্রহ্মের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভাইস-চেয়ারম্যান উ আউঙ্গসান ব্রহ্মে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ব্রহ্মকে ব্রহ্মদেশীয় যুক্তরাষ্ট্র নামে অভিহিত

করা হয়। ব্রহ্ম গণপরিষদের এই অধিবেশন ১০ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মের স্বাধীনতা ঘোষণার দৃঢ় ইচ্ছা জ্ঞাপন করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেই ব্রহ্মবাসীদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রকটিত হয়েছে।

সমগ্র ব্রহ্ম আজ স্বাধীনতা লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। চক্ষে তাদের স্বাধীন ব্রহ্মের স্বপ্ন, বক্ষে তাদের অসীম সাহস, মনে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প। তাদের এই সঙ্কল্পের সমক্ষে বৃটেনকে নতি স্বীকার করতেই হবে। আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্মে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিল কমন্স সভায় গৃহীত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ব্রহ্মবাসিগণ আজ স্বাধীনতার দ্বারে সমাগত। ভারতের প্রতিবেশী এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতার নবজন্ম সার্থক হোক প্রত্যেক ভারতবাসীই তা কামনা করে।

বিশুদা

শ্রীশান্তশীল দাশ

রবিবারের বিকেল।

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলেছি রাস্তা দিয়ে। রাত পোয়ালেই আবার সুরু হবে সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রা; তাই ছুটীর দিনের শেষ সময়টা কিছু উপভোগ করে নিচ্ছি। পকেটে পয়সার অভাব, তা' না হলে আরও ভাল ক'রে উপভোগ করা যেত এই রবিবারের বিকেলটা—সিনেমা কী থিয়েটার দেখে। কিন্তু তা' যখন সম্ভব নয়, তখন বিনা পয়সায় বেড়িয়ে বেড়ান ছাড়া গতি কী?

চলেছি রাস্তার দু'পাশের দোকানের সারি দেখ্‌তে দেখ্‌তে। কত বিচিত্র জিনিষে ভরা এই সব দোকানগুলো, আর তা'তে ভিড় করে রয়েছে কত রকমের মানুষ। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের ভাবভংগী। তাদের পানে তাকালে বোঝা যায় না কে কোন শ্রেণীর মানুষ।

হঠাৎ কে যেন নাম ধরে ডেকে উঠ্‌লো: অনু!

পিছনে তাকিয়ে একবার ভাল ক'রে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলুম। কই, কাউকে তো নজরে পড়লো না। বোধ হয় ভুল শুনেছি। এমন সময় কেই-ই বা ডাকবে। আবার চল্‌তে সুরু করলুম সেই বিচিত্র জনতার মধ্য দিয়ে।

কানে আবার ডাক এল। এবার একটু জোরে: অনু, এদিকে। শব্দ অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি একটা ছোট পুরাণ বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে বিশুদা'। হাতে একখানা বই নিয়ে পড়ছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলুম দোকানের কাছে। বিশুদা'র পাশে গিয়ে জিগ্যেস করলুম: বিশুদা' কবে ফিরলেন?

বিশুদা' খুব মনোযোগ দিয়ে বইখানার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে বল্‌লেন: দাঁড়া, সব বলছি, আর একটু বাকী আছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম তিন চার মিনিট। বিশুদা' তাঁর পড়া শেষ করে বইখানা দোকানদারকে ফেরৎ দিয়ে বল্‌লেন: চ, বেড়াতে বেড়াতে সব বলছি।

বাইরে এসে আমরা 'চল্‌তে সুরু করলুম। বিশুদা' বল্‌লেন: বইখানা বেশ ভাল বই রে, হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, তাই পড়ে ফেললুম। তারপর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন: আর কেনবার মত পয়সাই বা কোথায় যে কিনে পড়বো! এই রকম করেই···কী বলিস্? পড়াতো হ'লো।

জানতুম এ রোগ বিশুদা'র অনেক দিনের। এরকম করে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত বই যে বিশুদা' শেষ করেছেন তা' হয়তো গুণে শেষ করা যায় না। তাই সেকথা চাপা দিয়ে বললুম: তাতো হ'লো, কিন্তু আপনি ছাড়া পেলেন কবে? বাড়ীর সব খবর কী?

দাঁড়া, সব আস্তে আস্তে বলছি। অত ব্যস্ত কেন? তারপর দু'চার পা এগিয়ে গিয়ে—বল্‌লেন: পকেটে পয়সা আছে? চীনেবাদাম কেন্‌, বেশ খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আমার পকেট তো গড়ের মাঠ। বিশুদা' হাসতে লাগলেন।

ফুটপাথের পাশে এক চীনেবাদাম'ওলার কাছ থেকে চার পয়সার বাদাম কিন্‌লুম। বিশুদা'র হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বল্‌লুম: চলুন, এক জায়গায় বসা যাক্; বসে বসে বেশ গল্প শোনা যাবে।

না, না, চল্‌তে চল্‌তেই বেশ হবে'খন। কিন্তু বাদাম

যে সব আমায় দিলি। হাত পাত, দু'জনেই খেতে খেতে গল্প করা যাবে। বিশুদা' আমার হাতে কতকগুলো বাদাম ঢেলে দিতে দিতে বললেন : ছাড়া তো পেলুম, কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ে গেছি রে।

কী মুস্কিল? আমি একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিগ্যেস করলুম।

মুস্কিল আবার কী? পয়সার অভাব। জোগাড় করা যায় কী করে বল্‌তো? বিশুদা' একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন। রাজ-অতিথি হয়ে ছিলুম ভালো। বিশুদা' আবার আরম্ভ করলেন। ভাবনা চিন্তে বিশেষ ছিল না। কিন্তু এখন তো আর তা চলবে না! ছেলে, মেয়ে, বউ; এদের সব খাবার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আর নিজেও দুটো খেতে হবে।

এখন করছেন কী? আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলুম।

করবো আর কী; সবে তো ছাড়া পেয়েছি এই সাত দিন। তা যাই হোক, গাঁয়ের লোক একটু ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাই এর মধ্যেই দুটো টুইশানি পেয়ে গেছি। গোটা পঞ্চাশ টাকার মত পাওয়া যাবে। কিন্তু এই দুর্দিনে এই কটা টাকায় কীই-বা হবে? বিশুদা'র কণ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো করুণ সুর।

একটু আশ্বাস দিয়ে বললুম : এই তো সবে বেরিয়েছেন; একটু চেষ্টা করলে একটা না একটা কিছু পেয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

যাকগে, যা হোক একটা হয়ে যাবে; ভাবলে কী আর অভাব মিট্‌বে? কী বলিস? বিশুদা'র কণ্ঠে আবার স্বাভাবিক স্বর ফিরে এলো। বিশুদা' বাদাম চিবুতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে আমরা পাশাপাশি চল্‌তে লাগলুম। বিশুদা' আবার সুরু করলেন : কী বরাত করেই এসেছিল ছেলেমেয়েগুলো। আমার কাছে এসে না পেলে একদিন ভাল করে খেতে, না পেলে একটু ভাল পরতে।

কথার মোড় ঘুরাবার জন্যে বললুম : বিশুদা' আপনার ছেলের বয়েস কত হ'ল? ছেলেই তো আপনার বড়, না?

না, মেয়েই এখন বড়। অবশ্য ছেলেটা বেঁচে থাকলে সেই-ই বড় হ'ত। তা', তার বয়স প্রায় চোদ্দ পনের বছর হত বৈ কী? বিশুদা'র কণ্ঠস্বরে বেশ একটু বিষাদের আভাস ফুটে উঠ্‌লো।

মেয়ের নাম আপনার দুর্গা, না? কতদিন আগে তাকে দেখেছিলুম। সেটা এখন কত বড় হ'ল বিশুদা'? আবার জিগ্যাসা করলুম।

তা' এই বার পেরিয়ে তেরয় পড়েছে। শুধু রূপে নয়, মেয়ে আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী। বিশুদার স্বরে স্নেহ উপচে উঠ্‌লো। এর মধ্যেই ঘর সংসারের কত কাজ শিখে ফেলেছে। আমার স্ত্রীর মাঝে অসুখ করেছিল। শুনলুম, মা আমার একাই রুগীর সেবা থেকে সুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম করেছিল।

মেয়েকে লেখা পড়া শেখালেন না কেন?

পয়সার অভাবে আর স্কুলে দিতে পারলুম কই? তার পর একটু থেমে বিশুদা বললেন : তা, তার মার কাছ থেকে যা শিখেছে, স্কুলে দিলে তার বেশী কিছু শিখ্‌তো বলে তো আমার মনে হয় না। বাংলা তো বেশ ভালই জানে। সংস্কৃতও কিছু কিছু শিখেছে। আমি আর তাকে কাছে পেলুম ক'দিন। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তো কাটলো রাজ-অতিথি হ'য়ে। বিশুদা হাসলেন।

মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো? তার কী ব্যবস্থা করছেন? এখন থেকেই তো চেষ্টা চরিত্তির করতে হবে।

অত্যন্ত নিশ্চিন্ত সুরে বিশুদা উত্তর দিলেন : সে ভাবনা ভাবি না। ছেলে আমার ঠিক হ'য়ে আছে?

কী রকম? একটু উৎসুক হ'য়ে জিগ্যেস করলুম।

পাড়ায় একটা ছেলে আছে, এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। পাশ করে যাবে। বেশ ছেলে, মা বাপ কেউ নেই। পিসীর কাছে মানুষ হয়েছে। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়; তা হোক, ছেলেটি কিন্তু সত্যিই ভালো। এই পর্যন্ত বলে বিশুদা একটু থামলেন। দু' চারটে বাদাম ভেঙে মুখে দিয়ে আবার সুরু করলেন : জানিস্ অন্তু, ছেলেটিকে আমার ভারি ভালো লাগে। এই বয়সেই পরের দুঃখু-কষ্ট বুঝতে শিখেছে। যখন যে অবস্থায় তার কাছে যাও, সে না বলবে না। অবশ্য অর্থ সাহায্য করার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু এ ছাড়া নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও অপরের উপকার করবে। এটা কী মানুষের কম গুণ মনে করিস? আর এমন আশ্চর্য যে

এ সম্বন্ধে সে একটুও সচেতন নয়। পরের উপকার করছে বলে যে সে উপকার করে, তা নয়; না ক'রে সে থাকতে পারে না বলেই যেন সে ক'রে। কার বাড়ীতে রোগীর সেবা করার লোকের অভাব, কার বাড়ীতে মড়া-ফেলার লোক জুটছে না, এ সব কাজে সে যেন পা বাড়িয়েই আছে।

কিন্তু তার হাতে মেয়ে দেবেন, আর্থিক অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখবেন না, যখন জানছেন অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, একটু দ্বিধার সংগে বল্লুম।

জানিই তো তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু ওই একটা দোষ ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই, আমি বেশ জোর করে বলতে পারি। একটু জোরের সংগেই বিশুদা বললেন। তারপর একটু থেমে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন: কিন্তু অভাব তো মানুষের সংসারে নতুন নয়, অনু। এই আমার কাছেই বা মেয়ে কী সুখে আছে। কোনদিন খেতে পায়, কোনদিন পায় না, এ তো তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

সেই জন্যেই তো আপনার উচিত মেয়েকে এমন ঘরে দেওয়া, যেখানে খাওয়া পরার অভাব হবে না।

মানুষের খাওয়া-পরাটাই বড় কথা হ'ল। বিশুদা একটু উত্তেজিত হয়েই বল্লেন: তুইও এমন মুখ্যুর মত কথা বল্লি অনু। শুধু এই একটা দোষের জন্যে আমি এমন ছেলে হাতছাড়া করবো?

অবাক হ'য়ে বিশুদা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। যে অভাবের জন্য কিছুক্ষণ আগেও বিশুদা'র মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখেছিলুম, সেই অভাবকেই বিশুদা' এমন তাচ্ছিল্য করে উঠ্‌লেন। আশ্চর্য! জেনে শুনে মেয়েকে অভাবগ্রস্ত ছেলের হাতে তুলে দিতে একটুও দুঃখ বোধ করে না। সত্যিকারের মনুষ্যত্বের কাছে এরা সব কিছু বলি দিতে পারে। অথচ বিশুদা'র সংস্পর্শে যেই এসেছে, সেই জানে কী অপরিসীম স্নেহই না লুকিয়ে আছে ওর অন্তরে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিশুদা' আমাকে বোঝাবার সুরে বল্লেন: তুই একবার ভেবে দেখ অনু, যে মানুষ নিজের সুখ দুঃখকে অগ্রাহ্য করে অপরের মংগল করতে ছোটে সে কী সাধারণ মানুষ; এমন ছেলের হাতে-পড়া যে-কোন মেয়েরই ভাগ্যের কথা। তুই যাই বলিস্ অনু, এ ছেলে আমি হাতছাড়া করবো না।

মনে মনে বুঝলুম, এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা উচিত হবে না। বিরুদ্ধে বললে বিশুদা'র আদর্শে আঘাত লাগবে, আর পক্ষে বললে বিশুদা উৎসাহিত হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকতে সুরু করবেন। তাই এ প্রসংগ চাপা দিয়ে বল্লুম: আচ্ছা বিশুদা', আপনার সেই আগেকার কাগজের অফিসের চাকরীটা চেষ্টা করে দেখুন না?

বিশুদা' সচকিত হ'য়ে বলে উঠলেন: ভাল কথা মনে করে দিয়েছিস্ অনু, আজ সেই উদ্দেশ্যেই সহরে এসেছি। দেখ্‌তো তোর ঘড়িটায় কটা বাজলো? সাতটার সময় দেখা করার কথা আছে।

পকেট থেকে ঘড়িটা বার্ করে বল্লুম: এখনো ঢের সময় আছে; এই সবে সাড়ে ছটা।

তবে আমি চললুম। বিশুদা' তাঁর গন্তব্যপথের দিকে চল্‌তে সুরু করলেন।

আমিও বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম।

মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

মধ্য ভারতের গ্রামাঞ্চলে অজস্র লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে। এই লোক-গীতিগুলি বংশ-পরম্পরা গায়কদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই লোক-সঙ্গীতগুলি ভারতবর্ষের বৃহত্তর লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনাক্ষেত্রে অপরিসীম মূল্যবান। ভারতবর্ষের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোচনা ক্ষেত্রেও এই লোক-গীতিগুলির একটা বিশিষ্ট মূল্যবান স্থান রহিয়াছে। এখানে উদ্ধৃত লোক-সঙ্গীতগুলি জব্বলপুর বিভাগের গ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

দেবদেবী বিষয়ক সঙ্গীত—

শিব, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর কথা বাংলার লোক-সঙ্গীতের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। তদনুরূপ মধ্যভারতের লোক-সঙ্গীতে গণপতি, চণ্ডী, শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। পল্লী-গায়কেরা গণপতি, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীবিষয়ক সঙ্গীতগুলি সাধারণতঃ 'ভজন' সুরে গাহিয়া থাকে। এখানে এই ধরণের তিনটী লোক-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:—

(১) গণপতি

শ্রীগণেশ গিরজা সুবল মঙ্গল কে দাতার।
জো কারজ হম করত হৈ তুম্হারে আধার॥
অশুভ হরণ মঙ্গল করণ শ্রীগণেশজী ভগবান।
কবিতা কছু করণ চাহুঁ পরবহু অনুচর জান॥
নিজ ভরীস কছু নহীঁ নিজ করকে বিশ্বাস।
সরণ পড়ে প্রভু আপকে লাজ তুম্হারে হাম॥
জ্ঞান ধ্যান বল বুদ্ধি নহিঁ ন ধন ন দান উদার।
মো পাতক কী অপরাধ কো তুম্হি করো নিস্তার॥

(২) চণ্ডী

জগদম্বা অতি সুকুমার চণ্ড আউর মুণ্ড ঘাতনী।
ফাগ তুম্হারী কহোঁ গড় পার্ব্বতী কী বাসনী॥
রহী মাত প্রসন্ন চণ্ডী মহারাণী।
করতী সদা সহায় মোহি আপনা জন জানী॥
মুরখ মতী হৃদয় কে দেব হিয়দে মে জ্ঞান।
মন সে জো গাইব তুম্হে পাবৈ সভা মে মান॥
পাবৈ সভা মে মান হার কভু ন মানে।
গাবৈ আউর বজাবৈ সদা তেরী গুণ গাবৈ॥

(৩) শঙ্কর-পার্ব্বতী

সাজে সব সিঙ্গার জহাঁ শঙ্কর জী বিরাজে।
সমাজ দেবতা বসী বহাঁ ইন্দ্রাদিক রাজে॥
মাথে পে চন্দ্রমা মহেশ জী বসে কৈলাশ।
আসন মারে ধ্যান লগাবে দেবতা করতে জহাঁ বাস॥
নন্দী পে অসবার সদা শিব ভোলা স্বামী।
গোরা করে সিঙ্গার জহাঁ কৈলাশী বাসী॥
গণেশ গোদী লয়ে পার্ব্বতী ভোলা সাথ।
গঙ্গা সঙ্গ জটো ভরী ধন্য ধন্য শম্ভুনাথ॥
ইন্দ্রমুনি সুর দেবতা ভজন করে দিন রাত।
করে তপসিয়া তপেশ্বরী ধন্য ধন্য গোরা মাত॥
উমা পার্ব্বতী সাথ জটো মে গঙ্গা রমতী।
ধন্য ধন্য ভোলানাথ সদা শিব স্বামী হে ভজতী॥
তিন লোক দাতা হ্যায় শঙ্কর ঔগড়দানী।
সৃষ্টি পালন হার হো শম্ভুজী অবনাশী॥
বিষ্ণু লগাতে ধ্যান ব্রহ্মা শিব ভজতে হরীহর।
উমা পার্ব্বতী সাথ নাথ ভোলা উনকে হ্যায় বর॥
বরদান দেতে ভক্ত কী শঙ্কর ভোলা জহান।
শরণ শঙ্করজী বহেঁ আপ দেব বরদান॥
দয়া বন্দ ভোলা হরী-সদাশঙ্কর তিরপুরারী।
হিতকারী রহে মহেশ দাস কী করো রথবারী॥

গুরুবাদী সঙ্গীত—

বাংলার বাউল, সাঁই গানের মত লোক-সঙ্গীত মধ্য ভারতেও প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর লোক-গীতি এ দেশে 'গুরুমহিমা' গীত নামে সুপরিচিত। সাধু, সন্ত শ্রেণীর গায়কেরা এই গানগুলির ভিতর দিয়া গুরুর গুণ ও শক্তির কথা জনসাধারণ্যে প্রচার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গুরুবাদী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত হইল :—

পাইলে নাম গুরু কী গা লৈবী ফির করিয়ে দুজো কাম।

করিয়ে দুজো কাম গুরু মুক্তি কা দাতা।
কানন শব্দ শুনায় লগাবৈ হরি সে নাতা॥
ধ্রুব কী শব্দ শুনায় কে দিয়ো ভক্ত ভরপুর।
উত্তর দিশা সো অচল পদ হৈ তারা মজবুর॥
তারা মজবুর গুরু কী সেবা করিয়ে।
পাপ হোত সব ছার চরণ কমল নর জগ হিয়ে॥
মন এঁসা মল হরণ কর জগ ন লেখ কোঁ আর।
জীব চরাচর সম দিখৈ ফির হোয় মৃত্যু কী হান॥
হোয় মৃত্যু কী হান গুরু কোনোঁ রঘু রাই।
শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গুরু সে শিক্ষা পাই॥
মাতু পিতা গুরু সে করকে নিজ বিশ্বাস।
যে জিন পর কৃপা করেঁ সো পুজত মন কী আশ॥
পুজত মন কী আশ কভী নিন্দা মত করিয়ে।
তনক নে করো গিলান খ্যাল নারদ চিত্ত ধরিয়ে॥
নারদ জী নে ভী করী গুরু সঁকা মন মায়।
চৌরাশী ভোগন পরো ফির গুরুনে করো সহায়॥
গুরুনে করো সহায় সদা গুরু রহে দয়ালা।
হরে মদন তন পীর জগৎ সে পন্থ নিরালা॥

ঝুলন সঙ্গীত—

মধ্যভারত অঞ্চলে ঝুলন পরব সুবিখ্যাত। ঝুলনের সময়ে এ দেশের নরনারীরা 'ঝুলা'য় আনন্দ উপভোগ করে। ঝুলায় ঝুলনের সময়ে পুরুষ ও মেয়েরা গান গাহিয়া থাকে। এই ঝুলন সঙ্গীতগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক। ঝুলন সঙ্গীতগুলি হর্ষোৎফুল্ল। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঝুলন সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ভাই ঝুলন কুঞ্জন শ্যামরী হোমা বরসানে সে চলীঁ রাধিকা।
অজব কিয়ে শৃঙ্গার সাথ সুন্দর সখিয়া।
কালিন্দী তট পহুঁচ নায়ক মোহন করত জুহার
কহে মাধুরী বতিয়া।
ঝাঝ মৃদঙ্গ বজত ঢোল ঢপ তবল সতার
কান ফুকহি বসিয়া॥
কৃষ্ণ শ্যামরী সাথ রাধিকা ঝুলন করত বিহার বহিয়া।
রেশম তরক সী ঝুলা কদম কী ছহিয়া
ঝুলত মোহন বসিয়া॥

বিবাহের সময়ে মেয়েরা সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। বিবাহের গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই রামসীতা অথবা শঙ্কর পার্ব্বতীর বিবাহ প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। দোল উৎসবে 'ফাগ' গানে পল্লীকুটীরগুলি মুখরিত হইয়া উঠে রাম নবমী ও দশেরা উৎসব উপলক্ষে রামায়ণ সঙ্গীত কুটীরে কুটীরে গীত হয়। বাংলার ভাটিয়ালী ও সারি গানের অনুরূপ লোক-সঙ্গীত মধ্যভারতে প্রচলিত আছে কিনা বহু অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই।

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭)*

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা বিলের আলোচনা কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের চিন্তার আজই অবসান! ইহার পরে পার্লিয়ামেণ্টে ভারত-কথার আলোচনা আর হইবে না। ১৯০ বছরের 'কুটুম্বিতা' আজ শেষ। (আমি 'কুটুম্বিতা' শব্দটি ইচ্ছা করিয়াই প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু কেন করিলাম, সে কৈফিয়ৎ দিব না।) ১৫ই আগষ্ট ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করিবে। ১৬ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ১৬ই আগষ্ট তারিখটি ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ও কলিকাতাবাসীর মনে দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; তাই ১৬ই না ভাবিয়া ১৫ই আগষ্ট চিন্তা করাই ভাল। ১৬ই আগষ্ট মুস্লিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্বুরু হইয়াছিল। সেদিনের সেই বীভৎসতা ভারতবর্ষের ইতিহাস মসীমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। অনাগত ও অনন্ত ভবিষ্যকালে নাদির, তৈমুর ও চেঙ্গিস্‌খানের ভয়াবহ স্মৃতি ১৬ই আগষ্টের তুলনায় নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ যুদ্ধে হয় জয়, না-হয় পরাজয়, অথবা সন্ধি হইয়া থাকে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয় হইয়াছে—ভারতবর্ষের মাঝখানে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা; পরাজয়—বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব বিভাগে। ভারতের স্বাধীনতার পথ বিঘ্নাস্তৃত করিবার পক্ষে যত্ন, অধ্যবসায়, নরনারী হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড—যোড়শোপচারের ক্রটী হয় নাই; তথাপি ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। সার্থক সাধনা গান্ধীজীর! স্বাধীন ভারতের চিত্র তিনিই আঁকিয়াছিলেন; প্রতিমা তাঁহারই স্বহস্তনির্ম্মিত; আবার, প্রাণপ্রতিষ্ঠা তিনিই করিলেন। (ধ্যানের মূর্ত্তি প্রাণবন্ত হইলে কাহার না আনন্দ হয়? ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মপ্রদাতা ভারতের মুনি ঋষিগণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে ও রসাতলে আনন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইত। অপ্সর অপ্সরাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর নয়নে আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি কই; ভাষায় আনন্দোচ্ছ্বাস কই? প্রাণময়ী প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান পূজারী নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিতেছেন কেন?)

(কেন প্রশ্ন নিরর্থক, উত্তর আরও অনাবশ্যক।) ইংরাজ বণিক যেদিন ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন ভারতের যে দশা, যে অবস্থা ছিল, একশত নব্বই বৎসর পরে বৃটিশ যেদিন ভারত ত্যাগ করিতেছে, সেইদিন সেই অবস্থা, সেই দশার ভিতরেই নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। ১৭৫৭ ও ১৯৪৭-এ কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য! ভারতবর্ষ যেদিন পরাধীনতা বরণ করিয়াছিল সেদিনের সেই শতধা বিভক্ত ভারতে—আর আজিকার বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতে পার্থক্য যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, আমাদের চর্ম্মচক্ষুতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা দেখি সেদিনও ছিল অরাজকতার আরণ্য-আইনে মনুষ্যজীবন বিপর্য্যস্ত, দুর্ভিক্ষের হাহাকার, মৃত্যুর মহামহোৎসব! আজও মানুষের জীবন প্রতি পদক্ষেপে পর্য্যুদস্ত, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনারই শোভাযাত্রা, দুর্ভিক্ষে মৃত্যু, দাঙ্গায় মৃত্যু, গৃহযুদ্ধে মৃত্যু, অপমৃত্যুর মহাসমারোহ। ভক্ত তুলসীদাস লিখিয়াছিলেন, মানুষ জন্মের দিনে কাঁদে, মরণের কালে মানুষ হাসে। আমি দেখিতেছি, স্বাধীনতার জন্মকালেও মানুষ কাঁদিতেছে, স্বাধীনতা যেদিন মরিয়াছিল, সেদিনও মানুষের চোখের জলই সম্বল হইয়াছিল।

স্বাধীনতার পুনর্জন্মের হরষিত, সুরভিত ও আলোকিত প্রভাতটির কল্পনাই কল্পে কল্পে শতাব্দীতে শতাব্দীতে যুগে যুগে মানুষ ধ্যান করিয়াছে। এই শুভ দিনটির সাধনায় কত ত্যাগ স্বীকার, কত দুঃখবরণ ও সর্ব্বস্ব সমর্পণ! হাসি মুখে জীবন উৎসর্গ! সাধকের সাধনায় সে কি মহিমময় চিত্র উদ্ঘাটিত হইত! লেখকের রচনায় আনন্দ মঠ উদ্ভাসিত হইয়াছিল! কবির কাব্যে "কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর" এই আশ্বাসই দিত! চন্দ্রে কলঙ্ক বিন্দু আছে, থাক্; জোছনা সম্ভোগে কোনই বিঘ্ন নাই! হায়, ভারতের স্বাধীনতার কলঙ্কবিন্দু সম্পর্কে যদি ঐ কথা বলিতে পারিতাম। ভারত ভাগ্য বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যে ঋষির কর্ম্মে কুইট্ ইণ্ডিয়া বজ্র নাদ করিয়াছিল, সেই চিরমধুর, চিরভাস্বর, চির স্থির কর্ম্মই আজ ম্লান ও মলিন। আলোকের প্লাবনে মেঘের অভিযান। জ্যোতিরুৎসবে নির্ব্বাপিত দীপমালা।

তবু বলিব, "আমরা ঘুচাব তোমার কলিমা"; তবু বলিব, "মানুষ আমরা নহি ত মেষ"। ভাঙ্গা ঘর নূতন করিয়া গড়িব; ভাঙ্গা প্রাণ জোড়া দিব। স্বাধীনতার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে।

"কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তা'র বাঁধন কেন।
ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন"

পাষাণ ধ্বসিয়াছে, বাঁধন খসিয়াছে। আজ

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।"

আজ, মা কি ছিলেন, সে দুর্ভাবনা ভাবিয়া লাভ নাই; মা কি হইয়াছেন,

* ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭, বাং ২৯এ শ্রাবণ ১৩৫৪, শুক্রবার, ২৭ রমজান; চতুর্দ্দশী। পূর্ব্বদিনের রাশি ও নক্ষত্রের তারা শুদ্ধ। জন্মে বিপ্রবর্ণ মৃতে দোষো নাস্তি।

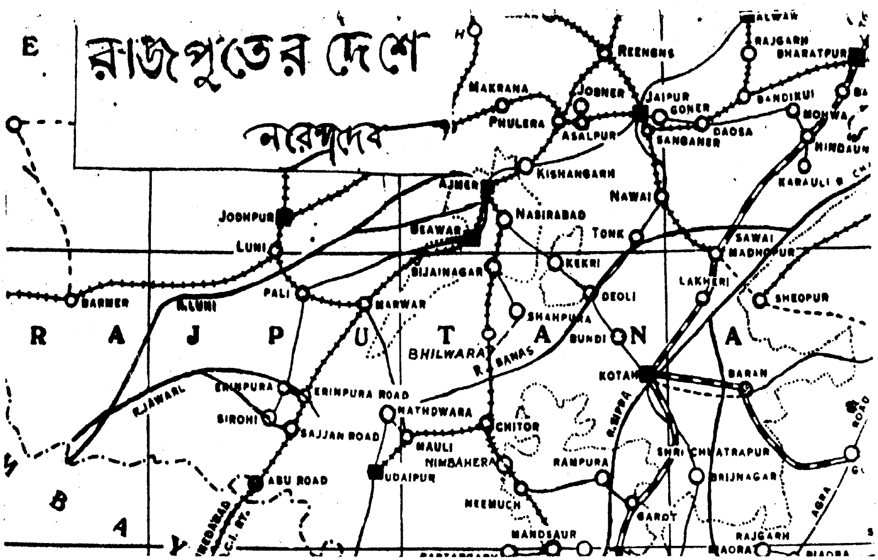
আজ সে কথাও অবান্তর ; মা কি হইবেন, আজিকার সেই কথা। শুধু আজ নয়, কেবল কাল নয়, অনাগত বহুকাল পর্য্যন্ত, সেই কথা, মা কি হইবেন ! আমরা সর্ব্বরত্নালঙ্কারপরিশোভিতা বালার্ক-বর্ণাভা ঐশ্বর্য্যশালিনী ভুবন-মনোমোহিনী জননীর কথা অনেক শুনিয়াছি। আবার অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী লীগতাড়িতা হৃতসর্ব্বস্বা কঙ্কালমালিনী জননীকেও চাক্ষুষ করিয়াছি। দশ বৎসর —দশ বৎসর ত নয়, দশ যুগ, শ্মশানবঙ্গে শ্মশানবিহারিণী মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া নিরাশ হইয়াছি, কাঁদিয়া ধরিত্রী ভাসাইয়াছি। তাহাতে আর সাধ নাই। আমরা আজ সেই মা'কে দেখিতে চাই, সেই মা'র আরাধনা করিতে চাই, সেই মা'কে হৃদি সিংহাসনে ধ্যান-মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত করিতে চাই—যে মা দশভূজে দশপ্রহরণ ধারণ করেন, যে মা শত্রুবিমর্দ্দিনী, যে মা বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, যে মা বীরেন্দ্রজননী। আজ সেই মা'র সাধনা করিব—যে মা বাহুতে বল, অন্তরে সাহস, বক্ষে বরাভয় মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আজ সেই মা'র পূজা করিব—যে মা কণ্ঠে ভাষা, নয়নে দিব্য দীপ্তি, হস্তে শিল্পলহরীস্বরূপিণী ! বৎসরে কি কালের মাপ হয় ? দিন গণিয়া কি দুঃখের পরিমাপ করা যায় ? লীগের দুঃশাসনে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রলুপ্তি ঘটিয়াছিল ; লীগের কুচক্রান্তে শ্বেতবসনা সরোজবাসিনী বীণাপাণির 'শ্রী' অপহৃতা হইয়াছিল। বাঙ্গালী আজ আবার প্রাণ ভরিয়া মন খুলিয়া বন্দেমাতরম্ গাহিবে ; আজ তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী দেবীর শ্বেতপদ্মটিকে লক্ষ্মীশ্রীতে সুশোভিত করিবে। মহাভারতের দুঃশাসন ভীষণ ছিল জানি ; ভীমসেন তাহার বক্ষঃরক্ত পান করিয়া পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়াছিল, তাহাও জানি ; বাঙ্গালী আজ লীগ দুঃশাসন কবলমুক্ত হইয়া পরিত্রাণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি। কিন্তু আজিকার সমস্যা যে কত দুরূহ, পথ যে কি দুরারোহ, তাহা ভাবিতেও যে স্তব্ধ হইতে হয়। আজ বৃটিশের নিন্দাবাদের অবসর নাই ; আজ আর মুস্লিম লীগের অপযশ করিবারও সময় নাই ; গভর্ণমেণ্টের পানে করুণ কাতর নয়নে চাহিয়া কালযাপন করাও চলিবে না। কে গভর্ণমেণ্ট ? স্বাধীন রাষ্ট্রে গভর্ণমেণ্ট একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী ও বিভিন্ন জাতি নহে ; স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক গভর্ণমেণ্ট। [গালি দিব কাহাকে ? শূন্যে নিষ্ঠিবন নিক্ষিপ্ত হইলে আত্মকলঙ্কই সার হইবে।]

দুইশত বর্ষের ব্যবধান যে, তাই ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। নইলে এই বঙ্গদেশ কি আমাদেরই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না ? এই বাঙ্গলা দেশেই না প্রতাপ-আদিত্য হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন ? "নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়" সে এই আমাদের বাঙ্গলাতেই নহে কি ? নরাধম মীর্জ্জাফর খাল কাটিয়া ক্লাইভকে না আনিলে সিরাজ কি আমাদের স্বাধীনবঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিপতি ছিলেন না ? গণেশ, সীতারাম, চাঁদ, কেদার কি বাঙ্গালীই ছিলেন না ? পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানী কি এই স্বাধীন বঙ্গ রাষ্ট্রেরই অধিশ্বরী ছিলেন না ? স্বাধীন বঙ্গরাষ্ট্রের ইতিহাসও কোন দুর্ভিক্ষের কালিমায় কলঙ্কিত হইতে দেখি না ! মন্বন্তর, মড়ক, মহামারী ত একখানি পৃষ্ঠাও কলুষিত করে নাই ! অন্নের জন্য হাহাকার, বস্ত্রের জন্য আত্মহত্যার ইতিবৃত্ত, কই, শত্রুতেও লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই ! পরন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস উল্লাসের ইতিহাস, উৎসবের রামায়ণ, পালপার্ব্বণের মহাভারত, প্রাচুর্য্যের বেদ ও পুরাণ। কোথায়, কোন্ সুদূরে ছিল সেই রাক্ষসাধিপতি দশানন লঙ্কেশ্বর রাবণের রাজ্য, আর কোন্ সুদূর অযোধ্যা হইতে দশরথতনয় রামচন্দ্র সেই লঙ্কায় গিয়া অকালবোধন করিল। কে সে সংবাদ রাখিয়াছিল ? আমার এই বঙ্গদেশ। অকাল বোধনকে ফলে ফুলে আলোকে উল্লাসে কে মূর্ত্ত করিয়াছিল ? আমার এই বাঙ্গালী জাতি। এই হিংসাবিধ্বস্ত, পরচীকির্ষু ভূখণ্ডে প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল কে ? আমার বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্য। ভক্তের ভক্তির আবাহনে ভগবান তাঁহার বৃন্দাবন পরিহরি ভক্তকে 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্' বলিতেও পারেন, এ পরিকল্পনা কাহার ? আমার বাঙ্গালী কবি জয়দেব ঠাকুরের। অপিচ স্বাধীনতার সাধনায় ভারতবাসীকে বীজমন্ত্র দিল কে ? [দিল, বল বাঙ্গালী লক্ষ কোটী কণ্ঠে বল,] আনন্দমঠ স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রদ্রষ্টা বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র। ভাই বাঙ্গালি, যে যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার দিনে একবার তিনশত কোটী কণ্ঠে বল, বন্দে মাতরম্।

(আজ বঙ্গরাষ্ট্র গড়িতে হইবে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী নির্ম্মাতা ময় দানব কি বাঙ্গলায় নাই ? সে বিশাল অট্টালিকা, সুরম্য হর্ম্ম্য কে গড়িবে ? আজ আর প্রদেশ শাসন নহে, যে ফাইলে ডিগ্রী ডিসমিস্ করিতেই যাদু ঘোষের রথ হড় হড় গড় গড় শব্দে চলিতে থাকিবে। আজ আইন পরিষদের আতপতাপশৈত্যনিবারিত সুখাসনে বসিয়া বক্তৃতার মেঘ গর্জ্জনেই শাসন যন্ত্র তৈলসিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সাজ এই থাকিবে, এই ঠাট, এই আলবাট পোষাক বজায় থাকিবে, অথচ দেশ হইতে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ঘুচিয়া যাইবে—এ দুরাশা যদি কাহারও মনে বাসা বাঁধিয়া থাকে তবে যত শীঘ্র সে বাবুই বাসা স্থানচ্যুত হয় ততই মঙ্গল। সাধারণ মানুষ আইন জানে না, কানুন বুঝে না, কনষ্টিটিউশনের ধার ধারে না ; স্বাধীনতা বলিতে সে জানে অভাব বিমোচন ; স্বাধীনতা বলিতে সে বুঝে, প্রচুর খাদ্য, পর্য্যাপ্ত বস্ত্র ; কনষ্টিটিউশন বুঝাইতে গেলে সে বলিবে, নীরোগ দেহ, শান্তশীতল দেহ। রামরাজ্য কি—তাহার সঠিকরূপ তাহার ধারণার অতীত হইলেও এইটুকু তাহার অজানা নাই যে রামরাজ্যে মানুষ উপবাস করে না, কাপড়ের জন্য কন্‌ট্রোলের দোকানকে তারকনাথের মন্দিরবোধে হত্যা দিতে হয় না, রামরাজ্যে চিকিৎসার অভাবে মানুষ কীট পতঙ্গবৎ যমালয়ে শোভা-যাত্রা করে না, অর্থের অভাবে আজন্ম-আমরণ অশিক্ষার আজ সংস্কারের অন্ধকূপে বাস করে না। রাম রাজ্যে বর্ব্বর বালী, সুগ্রীবও রাজা রামের বন্ধুত্বের গৌরব করে ; গুহক রাজরাজ্যেশ্বরের বক্ষালিঙ্গনে বদ্ধ হয় ; রাজা জটায়ুর চরণ বন্দনা করেন। এই মনোরম চিত্রখানি জনগণের সরল প্রাণের কোমল মৃত্তিকায় আঁকা আছে ! দুঃখে, দুর্দ্দিনে, দুর্দ্দশায়, দুর্য্যোগে নিমীলিত নেত্রে বহু দিন ধরিয়া এই ছবিখানিকে তাহারা মনোফুল-বিল্বদলে পূজার্চ্চনা করিয়াছে, আজ অর্জ্জিত স্বাধীনতার মহেন্দ্রক্ষণে অন্তঃস্থল হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না ?')

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্র দেব



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু, বিধাতা পুরুষ অন্তরালে হাসছিলেন। সিরোহী মোটর ষ্টেশনের অফিস গৃহে বড় বড় তালা ঝুলছে! সব বন্ধ। ষ্টেশন অন্ধকার।

বুঝলুম—লাষ্ট ট্রিপ অচলগড় থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে। আজকের মতো এঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবাই এতক্ষণ যে যার বাসায় পৌঁছে বিশ্রাম করছে।



ধ্বংসস্তূপের মধ্যে

দেবী আর কোনও বাক্যব্যয় না ক'রে নবনীতার হাত ধ'রে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

সভয়ে প্রশ্ন করলুম—তুমিও হাঁটবে নাকি?

গম্ভীর ভাবে বললেন—যেমন তোমার সুব্যবস্থা!

মাথা চুলকে বললুম—কিন্তু…

বাধা দিয়ে তিনি একটু উচ্চস্বরেই বললেন—কিন্তু, আর কি ক যেতে পারে বলো? অনির্দ্দিষ্ট গাড়ীর আশায় এখানে তো আর সারারাত অপেক্ষা করা যেতে পারেনা!

গুপ্ত সাহেবের মা বললেন—হ্যাঁ বাবা, বৌমা ঠিকই বলছেন। চলো হেঁটেই যাই—

আশ্চর্য্য হ'য়ে বললুম—সেকি! আপনি বুড়োমানুষ—এতটা পথ—

বৃদ্ধা সহাস্যমুখে বললে—এক সময়ে একটানা বিশ মাইল পথ হেঁটে গেছি, একটুও ক্লান্তিবোধ করিনি। আজ বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দু'চার মাইল এখনও চলে যেতে পারি।

নবনীতা মহাউৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললে—আমিও পারি। 'দৌ-দৌ'য়ের সঙ্গে আমি পাল্লা দিয়ে হাঁটবো।

শ্রীমান আমাদের হন্টনে অপরাজেয় একথা জানি। চেষ্টা করলে আমিও যে মাইল দেড়েক যেতে পারবনা এমন নয়। কিন্তু, ভাবনা আমার শ্রীমতীর জন্যে। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে বেরিয়ে পদব্রজে ত্রিকোণ

পার্ক পর্য্যন্ত গিয়েই যিনি বলেন—রিক্সা ডাকো, আমি আর হাঁটতে পারছিনি, পা ব্যথা করছে। তাঁর পক্ষে…

কিন্তু, দেবী ততক্ষণ অনেকটা পথ এগিয়েছেন দেখলুম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সকলকে নিয়ে আমি তাঁর অনুগমন করলুম।

গোধূলির সোনার আলো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্য্যের আভা নিষ্প্রভ হ'য়ে এলেও তখনও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। পার্ব্বত্য পথটি প্রদোষ আলোকে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য সেই প্রাক্-সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে একটা রহস্যময় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

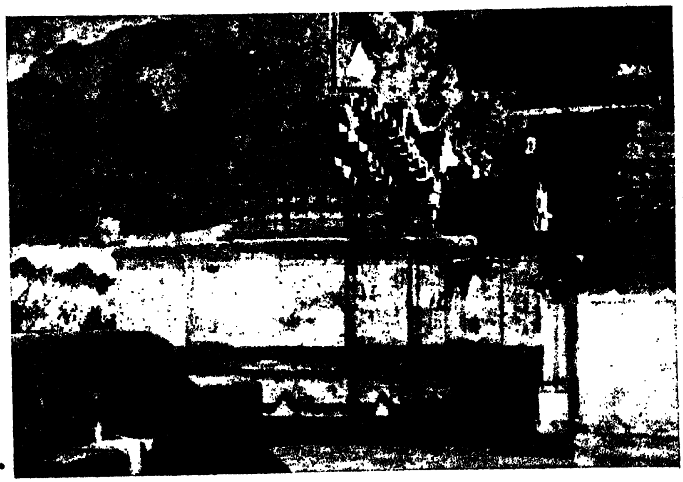
নিস্তব্ধ নির্জ্জন পথে নিঃশব্দে চলেছি আমরা ক'জনে। এত ভাল লাগছিল সেই বিদায়ী দিবার মধুর আবেষ্টনে আসন্ন সায়াহ্নের ক্রম-বিকাশ।

প্রায় অর্দ্ধেকটা পথ চলে এসেছি যখন আমরা, দেখি পিছন থেকে হর্ণ দিতে দিতে একখানি খালি মোটর আসছে। পাশ কাটিয়ে পথের একধারে দাঁড়ালুম। মোটর-খানি আমাদের সামনে দিয়ে গেল। একেবারে খালি গাড়ী। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। প্রাইভেট মোটর। ট্যাক্সী নয়। তবু বিপন্নের মতো হাত তুলে চিৎকার ক'রে থামাতে বললুম।

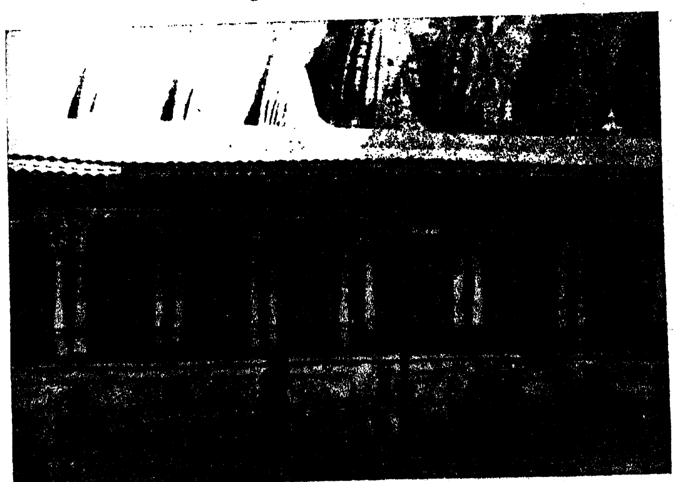
থামলো গাড়ী। ড্রাইভারকে আমাদের 'ষ্ট্র্যাণ্ডেড্' অবস্থা বুঝিয়ে বলে আবু মোটর সার্ভিস ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্ত সানুনয় আবেদন জানালুম এবং পাছে সে, 'নেহি হুজুর! মাফ্ কি জিয়ে। ইয়েত' হাম নেহি সেঁকেঙ্গে' ইত্যাদি কিছু বলে বসে, তাই সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে মোটা কিছু বখশিস্ কবুলালুম।

'আইয়ে জনাব!' ড্রাইভার নেমে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালো।…চলিয়ে হুজুর!

নসীরামের প্রস্তাবনা সঙ্গীতখানি মনে পড়ে গেল—"রূপেয়া—রূপেয়া! লুকিয়ে রেখেছো কোথায় পা!"



অচলেশ্বর মন্দির



অচল গিরিশৃঙ্গের জৈনমন্দির

* * * *

আবু মোটর সার্ভিসের অফিসে পৌঁছেই একেবারে মারমুখো হ'য়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলুম। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই, ম্যানেজার

উঠে এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানালেন "আমার পাঁচজন ড্রাইভারই হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে শয্যা নিয়েছে। আপনাদের জন্ত আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। কোথাও একটা 'ঠিকে' ড্রাইভারও খুঁজে পাইনি যে গাড়ী পাঠাই। শেষে বহুকষ্টে একজন বন্ধুর প্রাইভেট গাড়ী যোগাড় ক'রে আপনাদের পাঠিয়েছি। তাই এত দেরী হয়ে গেছে! কিছু মনে করবেন না!"

ম্যালেরিয়া! এই স্বাস্থ্যকর মাউণ্ট আবুর এমন চমৎকার পরিবেশের মধ্যে? একেবারে পাঁচ পাঁচটা ড্রাইভার একসঙ্গে একই সময়ে আক্রান্ত! কথাটা চট করে বিশ্বাস ক'রতে পারলুম না! এতটা মিথ্যে খুব বড় এক খামচা নুনের সঙ্গেও গেলা চলে না



মন্দির-পার্শ্বে

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠলুম! শেষটা কি ম্যালেরিয়া নিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা করলুম—এখানেও ম্যালেরিয়া আছে নাকি? আপনি বলেন কি? ম্যালেরিয়াত' আমাদের বাংলা দেশেরই একচেটে!

পণ্ডিতজী একটু ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন—আগে ছিলনা। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বড্ড হ'চ্ছে। তবে শহরে নয়। দেহাতে। আপনাদের কোনও ভয় নেই। ড্রাইভাররা সবাই শহরের বাইরে থাকে কিনা—স্নান করে লেকের এই স্রোতহীন রুদ্ধ পচা জলে, মশারি খাটিয়ে শোয়না—

আর কথা না বাড়িয়ে উপরে চলে গেলুম। বলে এলুম—কাল আমরা 'অচলগড়' দেখতে যাবো। সিরোহী মোটর সার্ভিসের সঙ্গে গাড়ীর ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনি শুধু ওদের অফিসে আমাদের পৌঁছে দেওয়া ও নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। আমরা ৬টে নাগাদ বেরুবো। এঁদেরই পাঠানো গাড়ীর ড্রাইভারকে মোটা টাকা বখ্‌শিস্ দেওয়ার বোকামীটা তখন অনুতাপ হয়ে বুকে বিঁধছিল!

পণ্ডিতজী তৎক্ষণাৎ সব ব্যবস্থা করে রাখবেন বললেন। আমরা সকলে 'এ্যান্টিম্যালয়েড ট্যাবলেট' খেয়ে নিলুম! কি জানি বাবা! ম্যালেরিয়াকে বিশ্বাস নেই! যদি একবার ধ'রে তাহ'লে সহজে ছাড়বে না!

পণ্ডিতজী কথা রেখেছিলেন। পরের দিন ঠিক ৬টের সময় গাড়ী এসে হাজির। গুপ্ত সাহেবের ছুটি ফুরিয়ে ছিল। তিনি সকালেই সপরিবারে মাউণ্ট আবু থেকে নেমে গেছেন। যাবার সময় আমাদের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেছিলেন। 'অচলগড়' যাওয়া হ'লনা বলে মিসেস্ গুপ্ত খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম—আপনারাত' খুব কাছেই আছেন। পরবর্তী যে কোন একটা ছুটীতে আহ্‌মেদাবাদ থেকে এসে দেখে যাবেন।

শ্রীমতী গুপ্ত হেসে বললেন—তা'ত যাবই। কিন্তু, এমন সঙ্গীতো আর ভাগ্যে জুটবে না!

সিরোহী মোটর সার্ভিস ষ্টেশনে যথাসময়ে পৌঁছে শোনা গেল তাঁদের 'কার'খানি হঠাৎ বিগড়েছে। ঐ একখানি মাত্র গাড়ীই তাঁদের সম্বল। তবে দু'খানি বাস আছে বটে। আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাঁরা একখানি বাসের ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাশ সীটগুলি সব আমাদের জন্য রিজার্ভ করে দিতে পারেন। ভাড়া মোটর গাড়ীর চেয়ে কম লাগবে—দশ টাকার পরিবর্তে সাত টাকায় হবে।

'অচলগড়' দেখতে এসে ফিরে যাবো—মোটরকার পাওয়া গেল না বলে—সে পাত্র আমি নই। সকলকে নিয়ে বাসেই রওনা হওয়া গেল। বললুম, কলকাতায় অধিকাংশ সময়ই তো আমরা বাসে ট্রামেই যাতায়াত করি, সুতরাং এখানেই বা বাসে যেতে আপত্তি কি?

সিরোহী রাজ্যের অযত্ন রক্ষিত, আঁকা-বাঁকা উঁচু নীচু, ধুলা, বালি ভরা অনেকখানি নোংরা পথ অতিক্রম ক'রে আমরা ইতিহাস বিশ্রুত, রাজপুত বীরত্বগাথায় গৌরবান্বিত, সিরোহীর অমর কীর্তি অচলগড়ে গিয়ে পৌঁছলুম। নবনীতা আবৃত্তি করতে সুরু করে দিলে—

"বাদশা ধরি সুরতানেরে বসায়ে নিল নিজ পাশ
কহিলা, বীর ভারত মাঝে কি দেশ 'পড়ে তব আশ?
কহিল রাজা—অচলগড় দেশের সেরা জগত পর,
সভার মাঝে পরস্পর নীরবে উঠে পরিহাস,
বাদশা কহে অচল হ'য়ে অচলগড়ে কর বাস।"

সিরোহীপতি সুলতানের এই অচলগড় দুর্গ মাউণ্ট আবুর মোটর ষ্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে। এখানে এখনও এমন সব অতি প্রাচীন-

কালের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন চোখে পড়ে যা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতার পরিচয় বহন করছে।

অচলগড় দুর্গ আজ প্রায় ধরাশায়ী। সিরোহীপতিরাও কেউ সেখানে অচল হয়ে বসে নেই। ইতিহাস বলে—কোনও এক প্রামারা রাজপুত নৃপতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অচলেশ্বর মহাদেবের ভক্ত সেবক। একদা যে দুর্গ ছিল তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি ও বীর্য্যবলের বজ্রপীঠ, সেই অচলগড় আজ জীর্ণ ও ভগ্ন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবের দেউল অচলেশ্বর শিবমন্দির এখনও তার অস্তিত্ব অক্ষত রেখেছে। শিবলিঙ্গের পাশে শিবশক্তি "মীরা"দেবীর একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দির সম্মুখে একটি ধাতু নির্ম্মিত প্রকাণ্ড বৃষ মহেশ বাহনের স্মৃতির সঙ্গে অহমেদপুর সুলতান মহম্মদ বেগরার নিষ্ঠুর আক্রমণের চিহ্নও বহন করছে। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলতান মহম্মদ বেগরা আহ্‌মেদাবাদের অধীশ্বর ছিলেন। অচলগড়ের হিন্দু নৃপতিদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকতো। একবার নাকি এই দুর্দ্দান্ত যোদ্ধা মহম্মদ বেগ্‌রা অচলগড় আক্রমণ করে তদানীন্তন হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তারপর রাজপ্রাসাদ দুর্গ ও নগর লুণ্ঠন করে বহু ঐশ্বর্য্যনিয়ে আহ্‌মেদাবাদ ফেরবার মুখে এই মন্দির তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি হিন্দু মন্দিরের ধনসম্পদের কথা জানতেন। মন্দির লুঠ করে শেষ এই বৃষটিকে তিনি আক্রমণ করেন। তিনি ভেবেছিলেন এর পেটের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে, কিন্তু ঠিক এই সময় হর-কোপানলে (!) লক্ষ লক্ষ ভীমরুলের আক্রমণে অস্থির হয়ে সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী ফেলে রেখে তাঁকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে হয়েছিল!

অচলেশ্বর শিবের সম্বন্ধে এখানে এক পৌরাণিক কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে, এক সময় দ্বারকাধিপতি বলরাম কোনও উদ্ধত রাজপুতের অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে হলাকর্ষণে অর্ব্বুদ পর্ব্বতকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলছিলেন! বিপন্ন রাজপুত ভক্ত ভীত হ'য়ে ইষ্টদেব অচলেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াতে মহাদেব বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দির থেকে তাঁর বাম পদ প্রসারিত করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা অর্ব্বুদ পর্ব্বত চেপে ধরেছিলেন। অচলেশ্বর শিবমন্দিরে এখনও মহাদেবের সেই পদাঙ্গুষ্ঠের চিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে। বহু ভক্ত দূর দূরান্তর থেকে দেবাদিদেব মহাদেবের এই পদচিহ্ন দেখতে আসে। ওঁরা বলেন—এই পদাঙ্গুলী পাহাড়ের বুকে এমন সজোরে চেপে বসেছিল যে সেখানে পৃথিবীর তলদেশ, অর্থাৎ একেবারে পাতাল পর্য্যন্ত একটি গভীর গর্ত্ত হয়ে গেছে। এই প্রবাদ সত্য কিনা পরীক্ষা করবার জন্য পরবর্ত্তীকালে ধারাবর্ষ নামে এক রাজা নাকি ক্রমাগত ছ'মাস ধরে দিবারাত্র অবিশ্রাম এর মধ্যে জলঢালার ব্যবস্থা করেও এ গহ্বরটি পূর্ণ করতে পারেন নি!

অচলেশ্বর শিবমন্দিরের নাটমণ্ডপ ও গর্ভ দেউলের মধ্যস্থলে একটি বিশাল তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে প্রতি বৎসর মন্দিরের বার্ষিক উৎসবের সময় এখানে একটি স্বর্ণের তুলাদণ্ড ঝোলানো হ'ত এবং সিরোহীপতিরা সেই তুলাদণ্ডে ওজন হ'তেন—অপরদিকের পাল্লায় স্বর্ণ রৌপ্য মণিরত্ন অলঙ্কার আভরণ বসনভূষণ ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি রেখে। তারপর উৎসব শেষে সেগুলি বিলিয়ে দেওয়া হ'ত রাজ্যের দীন দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত প্রজাদের মধ্যে।



অচলগড় দুর্গে

মন্দির প্রাঙ্গণের চারপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট দেউল আছে। তার মধ্যে পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ইত্যাদি নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অচলেশ্বর শিবমন্দির অচলগড়ে অচল হয়ে আছে, কিন্তু অচলগড় ভেঙে পড়েছে। সেই ধ্বংস স্তূপের উপর কিছুদিন আগে মালব প্রদেশের মাণ্ডু নগরবাসী দুই ধনকুবের শ্রেষ্ঠী একটি সুন্দর জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছেন। এই জৈন মন্দিরটি দিলবারার মতো কারুকার্য্যখচিত না হ'লেও, দেখবার মত বস্তু। অচলগড়ে রাণাকুম্ভ ও তাঁর পুত্র উদয়সিংহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে পাহাড়ের বুকে শাঁওন-ভাদুয়ান (শ্রাবণ-ভাদ্র) নামে যুগ্ম জলাশয় আছে। শুনলুম এর জল নাকি

কখনো কমে না ! যতই তোলো তবু পূর্ণ থাকে। জৈন মন্দিরটি তীর্থঙ্কর আদিনাথজীর। দ্বিতল মন্দির। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চার কোণে চারটি তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে ! এ ছাড়া আরও ১৪টি মূর্ত্তি আছে দেখলুম। গাইড বললে—এগুলি সব সোনার তৈরী, ওজন প্রায় দেড় হাজার মণ ! কিন্তু, যা চক্ চক্ করে তাই সোনা নয়। পরে জেনেছি এগুলি পঞ্চ ধাতুর তৈরী। এখানে আরও একটি জৈনমন্দির আছে। সেটি এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

অচলগড়ের অচলশীর্ষে একটি 'ঋষি গুহা' আছে। শোনা গেল সেখানে একজন বাঙালী সাধু বাস করেন। একবার গিয়ে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে 'ঋষি গুহা' পাহাড়ের এত উঁচু এক চুড়োর উপর যে সেখানে গিয়ে ওঠা এ বয়সে একেবারে অসম্ভব !

আবু পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া গুরুশিখরের উপর একটি শিবের মন্দির আছে। আমার মনে হল নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি প্রমথ জাতীয় শিবানুচর ভিন্ন অন্য কারুর পক্ষে সেখানে ইচ্ছামত যাতায়াত কর বোধ করি সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার !

শোনা গেল, প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ের শোভা নিরীক্ষণের জন্য এখানেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-লাভাতুর কোনো কোনো দুঃসাহসিক প্রেমিকেরা প্রায়ই আসেন। তাঁদের রাত্রিবাসের সুবিধার জন্য নিকটস্থ পার্ব্বত্য গ্রাম 'উরিয়া'রে একটি সরকারী ডাকবাঙলা আছে। এখানে এসে যারা একবার উদয়াচলের পূর্ব্ব দিগন্তে উষার সেই অপরূপ আবির্ভাব দেখে যান তাঁরা নাকি জীবনে আর সে অপূর্ব্ব দৃশ্য কখনো ভুলতে পারেন না !

বিগত যৌবনের বিলুপ্ত সামর্থ্য স্মরণ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমরা অচলেশ্বর শিবালয় থেকে বেরিয়ে এলুম। কেবলই মনে হ'তে লাগলো—হায়, বছর পঁয়ত্রিশ আগেও যদি এখানে আসতে পারতুম ! সেদিন পঁচিশ বৎসরের সেই দুর্দ্ধর্ষ যুবক নিশ্চয়ই সূর্য্যোদয় না দেখে ফিরতো না ! মেবারাধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা কুম্ভ যিনি চিতোর গড়ে তাঁর বিখ্যাত "বিজয় স্তম্ভ" নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, সিরোহী পতির এই অচলগড় তিনি আক্রমণ ক'রে অধিকার করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল পাই ১৪৩৩ খৃঃ অব্দ থেকে ১৪৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। টড সাহেব তাঁর রাজস্থানে বলেছেন রাণাকুম্ভ যখন অচলগড় জয় করেন তখনই এর প্রায় ভগ্নদশা। তিনি এই দুর্গের শোভা ও সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হন যে বহু অর্থব্যয়ে অচলগড়ের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন বা পুনর্নির্ম্মাণ করেন তিনি।

রাণাকুম্ভের নির্ম্মিত ধনাগার, শস্যভাণ্ডার, অস্ত্রাগার প্রভৃতিও আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র ! অক্ষমগুলের যে রাণীর জন্য তিনি এখানে সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন আজ তা শুধু ভগ্ন প্রস্তর স্তূপ। অচলগড়ের কোনও দিক দিয়ে শত্রু আক্রমণ করতে আসছে কিনা লক্ষ্য রাখবার জন্য তিনি অচলগড়ে বিশেষ করে একটি উচ্চ প্রহরীমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। সেটি এখনও সম্পূর্ণ ভূতলশায়ী হয়নি। রাণাকুম্ভের নাম উৎকীর্ণ করা আছে এই শিলামঞ্চের গায়ে। রাণীর মহলের দু-একখানি ঘর এবং উপরে উঠবার সিঁড়িটি এখনও অক্ষত আছে। আমরা এর সর্বোচ্চ ধাপের উপর দাঁড়িয়ে একখানি ছবি তুলিয়েছি। অচলগড়ের ভিত্তিমূলে পর্ব্বতগর্ভে একটি দ্বিতল গুহা আছে। গাইড বললে,



মন্দাকিনী তীরে পাষাণ মহিষত্রয় ও আমরা

পুণ্যশ্লোক মহারাজা হরিশ্চন্দ্র এখানে বাস করতেন !...তখন মন এমনই ভারাক্রান্ত যে এই আশ্চর্য্য কথার প্রতিবাদও মুখ দিয়ে বেরুল না !

অচলগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সজল চক্ষে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নিকটেই একটি চতুর্দ্দিক পাথরের সিঁড়ি দিয়ে বাঁধানো প্রকাণ্ড সরোবর চখে পড়ল। জলশুকিয়ে অর্দ্ধেকের অধিক তলা বেরিয়ে পড়েছে। অর্দ্ধেকটায় এখনও একটু জল আছে। কাদাগোলা নোংরা সে জল। চারপাশের বাঁধানো পাথরের সিঁড়ির একদিক একেবারে ভেঙে ধ্বসে পড়েছে। আর একদিকও প্রায় যায় যায় অবস্থা ! যেটুকু আছে তা থেকে বোঝা যায় একসময় এ কি মনোহর সরোবর ছিল। চারপাশের উঁচু পাথরের পাড়ে আগাগোড়া কারুকার্য্য করা লতাপাতা উৎকীর্ণ রয়েছে। 'গাইড' বললে এ সরোবরের নাম—'মন্দাকিনী'

কুণ্ড! বুঝলুম্ আজ এ স্বর্গের মন্দাকিনীকে ব্যঙ্গ করলেও, এর অতীত গৌরবের যুগে এ ছিল একদা সার্থকনাম্নী সরসী। এর জল সেদিন ভাগীরথীর ন্যায় পুণ্যোদক বলেই গণ্য হত। এই মন্দাকিনী তীরের একদিকে পাশাপাশি তিনটি প্রমাণ আকারের পাথরে গড়া মহিষ রয়েছে। মহিষ ত্রয়ের পশ্চাতে ধনুঃশর হাতে প্রামারা রাজ আদিপালের



মন্দির দ্বার

একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সেটি এখন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। গাইডের মুখে গল্প শুনলুম তিনটি অপদেবতা বা দানব নিত্য রাত্রে সঙ্গোপনে মহিষের মূর্ত্তি ধারণ করে এসে এই সরোবরের সমস্ত জল শোষণ ক'রে সরোবরটিকে কর্দ্দমাক্ত করে রেখে যেত। নৃপতি আদিপাল ক্রুদ্ধ হয়ে একদা রাত্রে উঠে এসে একটি বাণেই একসঙ্গে সেই তিনটি মহিষরূপী দানবকে গেঁথে ফেলে বধ করেছিলেন।

আমাদের গাইডটি একটি রাজপুত তরুণী। জাতে গোয়ালিনী। দেখতে সুন্দরী, কথাগুলিও ভারী মিষ্টি! তাকে এত ভাললেগেছিল যে আমরা তার একটি ছবি তুলে নিয়েছি! অচলগড়ের গাইডরা সবাই মেয়ে। তাব'লে এটাকে যেন মণিপুরী রাজকন্যার রাজ্য মনে



মন্দির সম্মুখের বৃষ

না-করেন কেউ। পুরুষ যথেষ্ট আছে। কিন্তু পথপ্রদর্শকের সহজ কাজ করে তারা নিজেদের পৌরুষকে অসম্মান করে না।

ইতিহাস বলে অচলগড় দুর্গ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রামার-রাজ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। আমরা আজ কিঞ্চিদধিক একহাজার বছর পরে গিয়ে দেখলুম শুধু তার ভগ্ন জীর্ণ চূর্ণ ও বিধ্বস্ত কঙ্কাল।

(ক্রমশঃ)

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

মৌন মুখর অন্তরেতে
　　কল্পলোকের ক্ষণিকা
ছড়িয়ে দিল চপল হাতে
　　দীপ্ত আলোর কণিকা।

স্বরগের প্রেম মাটির বুকেতে
　　নামে নিরালায় চুপে
আকাশেরে তার প্রণাম জানায়
　　কর্ম আরতি ধূপে।

ঝিলেপিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু ভোনাকে এড়াবার ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন তাকে এড়ানো গেল না।

গোষ্ঠাষ্টমী তিথি। এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম গোচারণে গিয়েছিলেন, তাই একে উপলক্ষ করে ইস্কুলের হেড্ মাষ্টারেরা গোচারণ বন্ধ করে দিলেন। একটার সময় ঢন্ ঢন্ করে ছুটির ঘণ্টা বাজতেই ছেলের দল হৈ হৈ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যমনস্কভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে রঞ্জু, কোত্থেকে ভোনা এসে পাকড়াও করলে।

—কি রে, খুব মাতব্বর হয়ে গেছিস যে। আজকাল তো তোকে দেখতেই পাওয়া যায় না।

—ছাড়ো, বাড়ি যাব।

—বাড়ি যাবি! ওঃ—একেবারে গুড্ বয়—বাড়ি গিয়ে দুধ-ভাত খাবে। নেঃ—অত ভালো ছেলে হতে হবে না। চল, মেলায় চল।

—মেলায়?

—হ্যাঁ—গোষ্ঠের মেলায়। অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি রে? আমরা সবাই যাচ্ছি, চল।

রঞ্জু বিব্রত হয়ে বললে, তা হলে বাড়ি থেকে মা-কে বলে আসি।

—কথা শোনো—এর জন্যে আবার মা-কে বলতে হবে। রাখ, রাখ—অত ভালো ছেলে না হলেও চলবে। চল, দল বেঁধে যাচ্ছি, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

গোষ্ঠের মেলা! রঞ্জু মনটা প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। গোষ্ঠের মেলার নাম শুনেছে সে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছে মস্ত বড় মেলা। নাগরদোলা আসে, টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ আসে, নানা রঙের খেলনা আসে, আর আসে বড় বড় আড়াইসেরী কদমা। গত বছর মেলা-ফিরতি মানুষ দেখেছে রঞ্জু, মনে হয়েছে মস্ত বড় একটা উৎসবের আনন্দ থেকে ফাঁকি পড়ল সে—বাদ পড়ে গেল।

—খুব দেরী করবি না তো?

—না, না, তুই চল্ না। ভয় নেই, হারিয়ে যাবি না। আঁচল-চাপা ছেলেকে আবার মার কোলে ঠিক ফিরিয়ে এনে দেব—দেখে নিস।

কথাটা বলে গালের পাশ দিয়ে জিভ বার করে ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে অবজ্ঞার হাসি হাসলে ভোনা।

খাঁদু বাঁকা মন্তব্য করলে, কেন ওকে টানাটানি করছিস? বাড়িতে ওর দুধ-ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আর একজন বললে, আমাদের সঙ্গে গেলে বাড়িতে ও পিট্টি খাবে।

হঠাৎ পৌরুষে ঘা লেগে গেল রঞ্জুর: বেশ তো, চল্ না। আমি কি কাউকে ভয় করি না কি? কণ্ঠস্বরটা এতক্ষণে বেশ তেজোদৃপ্ত শোনালো তার।

খুশি হয়ে ভোনা তার পিঠ চাপড়ে দিলে: সাবাস, এই তো চাই। এখন থেকেই মরদের মতো হয়ে উঠতে হবে—বুঝলি? অত তুতুপুতু করলে কি চলে?

পরমোৎসাহে পায়ের" তালি মারা চটি জোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভোনা চলতে সুরু করে দিলে। চলার তালে তালে হাতীর পায়ের মতো শব্দ উঠতে লাগল। তারপর বিকট ভঙ্গিতে যাত্রার দলের জুড়িদের মতো কানে হাত দিয়ে তারস্বরে থিয়েটারের গান ধরলে একটা:

"কালো পাখাটা মোরে
কেন করে এত জ্বালা—আ—তন—"

ট্রী-প্যারেরির মতো সেইটেই মার্চিং সং। নেতাকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করে ছেলের দলও অগ্রসর হল।

গোষ্ঠের মেলা ঠিক শহরের মাঝখানে বসে না। বসে শহর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে—সাহানগর বলে একটা গ্রামে। ইস্কুলের ওপারে রেলের লাইন, সেই রেলের লাইন পেরুলে মাঠ সুরু। ধান হয় না, পোড়ো পতিত জমি। মাঠ ছাড়িয়ে একটা মজা নদী, তার পাশে

ভাগাড়—শকুন, গিন্নী শকুন, আর টেলিগ্রামের তারে তারে শঙ্খচিল। তারপরে বড় রাস্তা, বাগান, পুরোনো আমলে সাহেবদের ভাঙা-চুরো একটা জংলা কবরখানা। বেশির ভাগ কবরের জীর্ণ দশা, মার্বেল ফলকের ওপরে লেখাগুলো কালো আর ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। শুধু শ্লেট পাথরের গায়ে একটা আরকলিপি জ্বল জ্বল করছে: 'পিটার হপ্‌কিন্স—জন্মিলা ১৮৩২ সনে, লাভ করিলা যীশুর শান্তিময় ক্রোড় ১১ই মার্চ ১৮৮৫ সনে'। সেই সঙ্গে একটুকরা কবিতার লাইন: "পিতার অপার প্রেম সকল সংসারে।"

এই কবরখানার ওপারেই সাহানগর গ্রাম। আর এখানে এসে পৌঁছুতেই যেন বহুদূরে সমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া গেল—মেলার কলরোল। অতীত মৃত্যুর শুদ্ধ বিষণ্ণ রূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রঞ্জুর মনটা যখন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তখন দূর থেকে ওই মেলার কলধ্বনি যেন হঠাৎ তাকে খুশি করে তুলল।

সারাটা পথ অজস্র বখামি করতে করতে এসেছে ভোনা। নানা সুরে নানা রকম গান গেয়েছে, মুখভঙ্গি করেছে, আগে আগে যে সমস্ত লোক মেলায় চলেছিল তাদের ভেংচিয়েছে এবং পা থেকে চটি জোড়াকে সব সময়ে দশ হাত করে এগিয়ে রেখেছে। একবার তার এক পাটি আর একজনের গায়ে লেগেছিল, সে ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেই ভোনা দলবল নিয়ে একেবারে তেড়ে গেল। লোকটা বিড় বিড় করে বললে, অসভ্য বানরের দল।

ভোনা জবাব দিলে, তাই তো তোমায় ডাকি দাদা হনুমান!

সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য ছেলেরা সুর ধরলে, দাদা হনুমান ওগো, দাদা হনুমান!

নিজের সম্মান রাখবার জন্যে লোকটা আর বাক্যব্যয় করলে না। বেগে পা চালিয়ে দিলে। পেছন থেকে খাঁদু ডাক দিয়ে বললে, রাগ করে চললে দাদা, নিতান্তই চললে? তা হলে বাড়ি গিয়ে চারটি বেশি করে ভাত খেয়ো—কেমন?

রঞ্জুর এতক্ষণে অনুতাপ হচ্ছিল। ভারী বিশ্রী লাগছে, অত্যন্ত আত্মগ্লানি বোধ হচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় এদের সঙ্গে এমনভাবে বেরিয়ে পড়ে মস্ত বড় ভুল করেছে সে। ওদিকে খাঁদু আবার একটা বিড়ি ধরিয়েছে, পরমানন্দে মুখটাকে বিকৃত করে ধোঁয়া ছাড়ছে। রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। যদি চেনা জানা কেউ দেখতে পায়, যদি বাড়ি গিয়ে বলে দেয়—তাহলে, তাহলে তার পরের অবস্থাটা কল্পনাও করা চলে না।

অন্যান্য পথচারীরা বাঁকা দৃষ্টিতে বারে বারে এদের দিকে তাকাচ্ছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই দলটির ওপরে কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়। একজন তো পরিষ্কার বললে, এই বয়েসেই বিড়ি সিগারেট ধরেছে, কী চমৎকার ছেলে তৈরী হচ্ছে সব!

ঝড়াং করে হাবুল জবাব দিলে, খাই তো খাই, কারু বাপের পয়সায় খাই?

সঙ্গে সঙ্গে ভোনা সুর করে 'অঙ্গদের রায়বার' বলতে সুরু করলে: "মোর বাপ কি তোর বাপকে বেঁধেছিল ল্যাজে?"

খাঁদু আরো একটু রদান দিলে: "এতগুলি রাবণ মধ্যে কোন্‌টি তোমার পিতা?"

যে মন্তব্য করেছিল সে চুপ হয়ে গেল।

সমস্ত পথটা যেন যমযন্ত্রণার মতো মনে হচ্ছিল রঞ্জুর। এক একবার ভাবছিল ফিরে চলে যায়, কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। এরই মধ্যে খাঁদু আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, এই, বিড়ি খাবি?

—না।

—না না। কেউ টের পাবে না।

—না ভাই।

—ও:—একেবারে ভালো ছেলে!

ভোনা ইংরেজি করে ছড়া কাটলে:

Jim is a good dog
Every day he catches a frog—

ছেলের দল হো হো করে হেসে উঠল।

কিন্তু কবরখানা ছাড়াতেই যখন মেলার কোলাহলটা কানে গেল তখন রঞ্জু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। সমুদ্রের ডাক—অজানা, অপরিচয়ের দূর সমুদ্র। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই সেখানে। সেখানে নাগরদোলা ঘুরছে, সেখানে টিনের বাক্সে বায়োস্কোপ, সেখানে চারপেয়ে মানুষ আর ছ'পেয়ে গোরু, সেখানে রঙীণ বেলুন আর আড়াই সেরী কদমা। এতটা পথ ভাঙা এতক্ষণে সার্থক হয়েছে।

দলটা মেলায় এসে ঢুকল। সত্যিই মস্ত বড় মেলা। নতুন একটা শহর দেখেছে রঞ্জু—দেখেছে অনেক মানুষ। কিন্তু একসঙ্গে এত মানুষকে সে আর কোনোদিন দেখেনি। অবাক হয়ে রইল রঞ্জু।

ভোনা হ্যাঁচকা টান দিলে একটা। বললে, অমন বাঙালের মতো হাঁ করে আছিস কী? চলে আয়। মেলায় কেনাকাটা করতে হবে না?

—কেনাকাটা! কিন্তু বাড়ি থেকে তো পয়সা আনিনি।

—দুর গাধা!—ভোনা জিভ্ বের করে চোখ উল্টে ভঙ্গি করলে একটা: মেলায় জিনিস কিনতে এলে আবার পয়সা লাগে নাকি?

—পয়সা লাগে না?—এ একটা নতুন খবর শোনা গেল। রঞ্জু আশ্চর্য হয়ে বললে, পয়সা লাগে না? তা হলে বিনি-পয়সায় দেয় নাকি?

—হুঁ:—বিনি-পয়সায় দেবে? তোর শ্বশুর কিনা সব। ভোনা এবার সত্যি সত্যি ভেংচে দিলে।

—তা হলে কিনবি কী করে?

—হাতের জোরে।

—হাতের জোরে? সে আবার কী?

—আঃ—এই বাঙালকে নিয়ে তো ভারী জ্বালাতনে পড়লাম। চলে আয় না, দেখতেই পাবি সব—ভোনা রঞ্জুকে টেনে নিয়ে চলল।

বেশি দূর যেতে হল না—সামনেই একটা বড় মণিহারী দোকান। তালা চাবি, ছুরি কাঁচি থেকে সুরু করে সাবান তেল, স্প্রিংয়ের মোটর, চুলের রেশমি ফিতে, জাপানী পুতুল—সব কিছুর বিপুল সমারোহ। দোকানে ভয়ঙ্কর ভিড়। দু তিনজন লোক একসঙ্গে জোগান দিয়ে উঠতে পারছে না।

ভোনা বললে, চল, এখানেই দেখা যাক।

দোকানের সামনে ভোনা বসল তার দলবল নিয়ে। এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আর দর জিজ্ঞাসা করে।

—এই সাবানটা কত?

—তিন আনা।

—ছয় পয়সায় হবে না?

—না।

—ওই রেলগাড়ির দাম কত?

—বারো আনা।

—ছ আনায় দেবেন?

—না।

—সাড়ে ছ' আনা?

—কেন অকারণে বকাচ্ছ খোকা? নিতে হয় নাও, নইলে চলে যাও।

—খালি খালি খদ্দেরকে অপমান করলেন মশাই? চাই না আপনার দোকানে কিনতে। চল্ খাঁদু—একটা বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে ভোনা উঠে দাঁড়ালো।

দোকানদার বললে, যত সব বখাটে ছোকরা!

ভোনা শাসিয়ে উঠল: শাট্ আপ্! আপনি আমাদের গার্জেন নন।

দোকানদার বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পর পর পাঁচ সাতখানা দোকান। একটা জিনিসও কিনল না ভোনা, খালি দরাদরি করলে, দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করলে। রঞ্জুর একেবারেই ভালো লাগছিল না; লজ্জায় অপমানে তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। এরা সবাই তো তাকে ওদের মতোই বখাটে ভাবছে! তবু দলের সঙ্গে ঘুরছিল যন্ত্রের মতো। আর ভাবছিল বাড়ি গিয়ে মা-র কাছে কী কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়?

খানিক পরে ভোনাও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে উঠল। বললে, আর নয় খাঁদু, কী বলিস?

খাঁদু বললে, হ্যাঁ—মন্দ হয়নি।

মেলার ভিড়টা ছাড়িয়ে দলটা এবারে চলে এল একেবারে গো-হাটার কাছে। এখানে লোক পাতলা, কয়েকটা ছোট ছোট চালীর নীচে জনকয়েক লোক গোরু নিয়ে দরাদরি করছে। দাঁত পরীক্ষা করছে, শিং দেখছে; ল্যাজ তুলে তুলে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করছে। গোবর আর ধুলোর একটা মিশ্রিত গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

এইখানে একটা বড় বট গাছের ছায়ার নীচে ওরা এসে বসল। ভোনা বললে, নে এবার, বার কর সব।

সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ওদের পকেট থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, সাবান, স্নো, চুলের ফিতে, এমন কি একরাশ খেলনা পর্যন্ত। সব একসঙ্গে জড়ো করা হল। রঞ্জু নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না—যেন স্বপ্ন দেখছে সে।

চোখ টিপে জিভ বের করে হাসল ভোনা।

—কেমন পরিষ্কার হাতের কাজ দেখলি তো? কোনো ব্যাটা টের পায়নি।

রঞ্জুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল, গায়ের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। গলা থেকে অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরুল: তোমরা চুরি করেছ?

—আঃ গাধা, অমন করে চেঁচাস না। এ চুরি নয়, এর নাম হাতসাফাই। তুই একটা হাঁদা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়েছিলি বটে, কিন্তু তোরও ভাগ আছে। নে খাঁদু, হিসেব কর—

রঞ্জুর এবারে বাকশক্তি পর্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। ক্রমাগত মনে হচ্ছে যেন প্রাণপণ বলে কে তার জিভটাকে টেনে ধরছে গলার ভেতর, একটা অপরিসীম ভয়ে চারদিকের পৃথিবীটা তার কাছে বারে বারে একটা ঝাপ্‌সা কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

—পাঁচ—

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জু। ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছে না। পা কাঁপছে তার, বুকের ভেতরে হাতুড়ি পড়বার মতো একটা অবিচ্ছিন্ন আর অস্বস্তিকর অনুভূতি। তীব্র তৃষ্ণায় তালুর শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, ঢোঁক গিলতে গেলেও যেন গলার ভেতরে খচ খচ করে কাঁটার মতো বিঁধছে।

জামার পকেটে খস খস করছে একখানা সাবান আর একটা স্থতোর গুটি। আজকের লুটের মাল, ভোনা ঠকায়নি, ভাগ দিয়েছে। পথে আসতে আসতে যতবার একটা চৌকীদার আর পাহারাওলার মুখ চোখে পড়েছে তার ততবার চমকে চমকে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। চুরির অংশ নিয়েছে সে—সে চোর। আর সেই অপরাধের স্বাক্ষর আঁকা রয়েছে তার মুখে, জল জল করছে, ঝক মক করছে। যে দেখবে সেই মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে—সে চোর।

বাতাসে ছুটো চুল মুখে এসে উড়ে পড়তেই অকারণে শিউরে উঠল রঞ্জু। মনে পড়ল একবার একটা অদ্ভুত আর বিশ্রী পোকা দেখেছিল সে। পোকাটা বারান্দার ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যাচ্ছিল, আর চলার সঙ্গে সঙ্গে এঁকে যাচ্ছিল আলোর একটা নীলাভ উজ্জ্বল রেখা। মনে হল তার কপালের ওপরে ওই রকম একটা কুৎসিৎ পোকা যেন নড়ে বেড়াচ্ছে, আর ক্লেদাক্ত উজ্জ্বল হরফে সেখানে লেখা হয়ে যাচ্ছে: চোর—চোর—

পকেট থেকে সাবান আর গুলি স্থতোর গুটিটা সে বের করে আনল, তারপর সোজা ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাশের অন্ধকার বাগানটার ভেতরে। এইবারে সে নিশ্চিন্ত—এইবারে মনের ওপর থেকে ভারটা নেমে গেছে তার। শুধু চুরি করে আজ সাবানটার একটা উগ্র মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ ধরে জেগে রইল তার ছুটি আঙুলে, জুড়ে রইল তার জামার পকেটটাকে।

জীবনের অনেক মিষ্টি গন্ধের পেছনেই ওই চুরি আর অপরাধের ইতিহাস—এ অভিজ্ঞতার সময় তখনো তার আসেনি।

খাতার পাতায় হিসেবটা আবার গোলমাল হয়ে যায়। ছিঁড়ে যাচ্ছে ধারাবাহিকতা—পেছনের কালো পর্দার ওপরে ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডের মতো এলোমেলো ছবি ফুটে উঠছে। কত চেনা পথ, কত ঘর-বাড়ি, কত আশ্চর্য ঘটনা, আজকে নিশ্চিহ্নভাবে ভুলে গেছে রঞ্জু, কেউ মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়ে না। কিন্তু কবে—কোন ছেলেবেলার নীল রঙের একটা ছোট পাখি এসে রঞ্জুর জানালার ওপরে বসেছিল; ছোট ঘাড়টি বাড়িয়ে কৌতূহলভরা উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল এক মুহূর্ত, তারপর লাল ঠোঁট ছুটো একটু ফাঁক করে একটা ছোট্ট মিষ্টি ডাক দিয়ে আবার উড়ে চলে গিয়েছিল—পরিষ্কার মনে আছে সেটা। পাখিটার স্বচ্ছন্দ বসবার ভঙ্গি, তার সবুজ চোখে ছুষ্টুমি-ভরা জিজ্ঞাসা—এ ভোলবার নয়, কোনোদিন ভুলবে না রঞ্জু।

গোষ্ঠের মেলা থেকে ফেরবার কতদিন পরে? তিন মাস? ছু মাস? ছু সপ্তাহ? আরো কি ঘটেছিল এই সময়ের মধ্যে? এই চুরির প্রতিক্রিয়া কতদিন মনটাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল? হিসেব মেলে না। সমস্ত

হিসেব তলিয়ে যায় বজ্রের মতো আকাশ-ফাটানো একটা উন্মত্ত গর্জনে।

—"বন্দে মাতরম্—"

—"মহাত্মা গান্ধী কী জয়—"

উনিশ শো তিরিশ সাল।

উত্তরাপথের গিরি দুর্গ আর দক্ষিণের নীল সমুদ্র উন্মথিত করে উচ্চারিত হল সংকল্প বাক্য :

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট করিব, আত্মঘাতী মাদক দ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরী করিব—"

মহাত্মা গান্ধী। দিকে দিকে রুদ্র ধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। ভারতবর্ষের মূর্তিমান প্রাণপুরুষ যাত্রা করলেন ডাণ্ডী সত্যাগ্রহের অগ্রচর হয়ে। আর-উইনের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্ত কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন : "মেরা এক কদম্‌সে সারে হিন্দোস্তান উথাল্ পাথাল্ হো জায়গা—"

নিরুত্তাপ প্রশান্ত কণ্ঠ—স্পর্ধা নেই, অহমিকা নেই। কিন্তু ওই একটি কথাই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পাঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল্-পাথাল্ হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সে কি ভোলবার দিন। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ করে দাও ল্যাঙ্কাসায়ার আর ম্যাঞ্চেষ্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও সৌখান বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানের লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর করে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয়-উষ্ণীষ পরে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠো।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিলিতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। রঞ্জু একদিন বাবাকে দেখেছিল এমনি করে কাপড় পোড়াতে, কিন্তু সেদিন যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাকে একটা পরম সত্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড়ো করে তাতে আগুন ধরানো হয়েছে, তার ধোঁয়াতে এক মাইল দূরে থেকেও কাশতে কাশতে দম আটকে আসছে লোকের। দেশি বিলিতী মদের বোতল চুরমার হয়ে রাস্তায় গড়াচ্ছে।

কী আশ্চর্য দিন—কী অপূর্ব সেদিনকার উন্মাদনা।

আর একটা তিরিশ সালের কথা মনে আছে রঞ্জুর। তেরশো তিরিশ সাল। ফেঁপে উঠেছিল আত্রাই—ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাঠ-ঘাট, গ্রাম-গ্রামান্তর। আজ উনিশ শো তিরিশ সালে আর এক বন্যা দেখল রঞ্জু। প্রকৃতির কূল ভাঙা বান নয়—বাঁধভাঙা জীবন-বন্যা। সে বন্যা উত্তর বঙ্গকে ভাসিয়েছিল, এ ভাসিয়ে দিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে। মাঠ-ঘাট গ্রাম-গ্রামান্ত—কোনো কিছু বাকী রইল না।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না। এখন ঊর্ধ্ব গগনে মাদল বেজেছে, নিচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণ দলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে "ঝাণ্ডা ঊঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল করে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন্ নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল : জুতি-মার্কা হ্যায়, খাও গে? একখানা বিলিতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবী চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল, নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। স্টেশনের সামান্য কুলি পর্যন্ত শাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণাবোধ করলে, বললে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি, রঞ্জুও পারল না। বেশ পরিষ্কার মনে আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই

বাঁধা নিয়মে ভাত খেয়ে রওনা হয়েছিল ইস্কুলের দিকে। কিন্তু খানিকদূর এগোতেই বাধা পড়ে গেল। দলবল নিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালো ভোনা।

হ্যাঁ—সেই ভোনা। সেই মার্বেল আর বাঘবন্দী চ্যাম্পিয়ান, হাত সাফাইয়ে বিশারদ, সুশ্রী কদর্য আলোচনায় মুখ খোলা সেই ভোনা। আজ সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তার। মাথায় খদ্দরের টুপি, বুকে ব্যাজ, হাতে পতাকা। শুধু ভোনা নয়, কালী, খাঁদু, পূর্ণ—সবাই।

—কোথায় যাচ্ছিস রঞ্জু?

—ইস্কুলে।

ভোনার দলের প্রত্যেকটি ছেলের মুখে ফুটে উঠল ঘৃণা আর অনুকম্পার রেখা।

—শেম্! শেম্!

—ধিক্।

—লজ্জা হয় না?

নেতার মতো উদাত্ত উদার ভঙ্গিতে ভোনা তুলে ধরল পতাকাটা: এখনো ইংরেজির মোহ? এখনো গোলামখানায় ঢুকতে চাস? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

লজ্জায়, অপরাধ বোধে সংকুচিত হয়ে উঠল রঞ্জু: কী করব তবে?

—আমাদের সঙ্গে চলে আয়।

—কোথায় যেতে হবে?

—ইস্কুলে পিকেটিং করতে।

ওরা রঞ্জুকে ডাকলে বটে কিন্তু রঞ্জুর জন্যে আর অপেক্ষা করলে না। মুহূর্তে ড্রিলের ভঙ্গিতে ভোনা অ্যাবাউট টার্ণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে দলের আর সবাই বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরে গেল। বেশ জোরে জোরে বার কয়েক পা ঠুকে ভোনা গান ধরলে:

"মোরে সোনেকি হিন্দুস্তান,
তু হামারা দিল্‌কা রোশ্‌না
তু হামারা জান—"

তার পরেই গানের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওরা। উৎসাহে, উল্লাসে ওদের চোখ মুখ ঝলমল করছে, একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, একটা কঠিন সংকল্পের নির্ভুল ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে ওদের সর্বদেহে। উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেসনের কুলি আর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় থেকে সুরু করে ভোনা, পূর্ণ, কালী, খাঁদু পর্যন্ত, কিছু আর অবশিষ্ট নেই—কেউ বাদ নেই আর। বন্দেমাতরমের বীজমন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমা বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পারো, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে?

রঞ্জু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ি ঘর—কোনো কিছুর আজ যেন আলাদা কোনো রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোনো রকমের। আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে—ধরেছে একটিমাত্র রঙ—ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ করে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ অনুঝঙ্কৃত হচ্ছে: বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

স্মৃতির মধ্যে চমক দিয়ে উঠল একটি নাম: অবিনাশ বাবু! আজ এতদিন পরে রঞ্জু চিনতে পারল যেন অবিনাশ বাবুকে, যেন এতদিন পরে তার কাছে এই অবারিত রৌদ্র ধারার মতো প্রত্যক্ষ আর দীপ্তোজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর প্রত্যেকটি কথা। একটা আকস্মিক আত্ম-চৈতন্যের বিস্ময়ে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত শির শির করে উঠল রঞ্জুর:

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এদেশ তোদের নয়—"

এই তো স্বদেশ—এতদিন পরে এই তো স্বদেশ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই যমুনা, এই গঙ্গানদীর ওপার আজ থেকে আমাদেরই তো অধিকার, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে তাদের বুকের ওপর দিয়ে জাহাজ আর বইবে না। আমরা জেগেছি, আমরা জাগব। আজ এই মুহূর্তটির জন্যে বেঁচে থাকা উচিত ছিল অবিনাশবাবুর, আজ এই মুহূর্তে তাঁর দেখে যাওয়া উচিত ছিল তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

রঞ্জু দু'হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিলে একবার—যেন তার ঘুম ভেঙেছে। তারপর নিজের ভেতরে কিছু একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে নিয়ে জোর পায়ে ইস্কুলের দিকে এগিয়ে গেল সে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার ভূমি-ব্যবস্থা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও পরবর্ত্তী অবস্থা

বহু অনিশ্চয়তার পর জমিদাররা ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কতকটা সুস্থির হইয়া বুঝিতে পারিলেন, যে পরিমাণ রাজস্ব অর্থাৎ বাৎসরিক ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা ইংরাজের হিসাবেও প্রজার নিকট যত টাকা আদায় হওয়া সম্ভব, তাহার এগারো ভাগের দশ ভাগ। তাঁহারা ইংরাজের ন্যায় জবরদস্তি করিয়া টাকা আদায় করিতে পারেন না, অধিকংশ প্রজার নিকট থাজনা বৃদ্ধি করিতে পারেন না, অথচ যথাকালে রাজস্ব দিতে না পারিলে সূর্য্যাস্ত আইনে তাঁহাদের জমিদারী "লাটে উঠিয়া" থাকে, অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইয়া যায়। এই দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া বহু জমিদারী হস্তান্তর হইতে থাকে। কোনও কোনও জমিদার দেয় রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছেন এবং থাজনা বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বহুবিধ উপঢৌকন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানিয়া লইবার পর অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর সাধারণ জমিদারদিগের দুঃসময় গিয়াছে এবং বহু নূতন জমিদার জলবুদ্বুদের মত উঠিয়া অল্পকালের মধ্যে জনসমুদ্রে মিশিয়াছেন। যদি হিসাব লওয়া যায় দেখা যাইবে, মাত্র কয়েকটী জমিদার বংশপরম্পরায় ইংরাজের নিকট ইজারা লওয়া জমিদারী ভোগ করিতেছেন এবং পুরাতন স্থলে অজ্ঞাতকুলশীল বহু নবীন জমিদার আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভূমি স্বত্বে জমিদার ও প্রজা

ইংরাজ যখন বাদশাহ বা নবাব সরকার হইতে জমিদারী বা দেওয়ানী গ্রহণ করে তখন প্রজার থাজনা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি পায় নাই। আদায়ী থাজনার কতকাংশ নিজেরা রাখিয়া বাকীটা নবাব সরকারে জমা দিবার ব্যবস্থা হয়। ইংরাজের সমসাময়িক অপর জমিদারদিগেরও সহিত অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে যে সকল জমি ঠিকা বিলি হইত অথবা জঙ্গল প্রভৃতি কাটিয়া চাষের উপযোগী করা যাইত, অথবা নূতন জরিপে জমির পরিমাণ বেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত, সেই সকল ক্ষেত্রে জমির থাজনা বৃদ্ধি করিয়া, ইংরাজই হউক অথবা অপর জমিদারই হউক, নিজেদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও প্রজা ও চাষের লোকের অভাব, দেশের মধ্যে নানা অশান্তি, যে সকল উপায়ে অতিরিক্ত থাজনা বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহার কোনটাই প্রয়োগ করার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। অবস্থা কতকটা শান্ত হইলে জমিদাররা নিজেদের আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জমিদারীতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

যখন সতর্ক জমিদাররা প্রজার ন্যায্য বা অন্যায্য দাবীতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন, তখন প্রজারা অলস থাকেন নাই। বিশেষতঃ বহু প্রজা নিজ চেষ্টায় আর্থিক উন্নতি করিয়া নিজেরাই প্রচুর জমির মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট জমিদারদিগের অত্যাচার ও দাবীর ফাঁক সবই জানা ছিল। সুতরাং প্রজার শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে এবং প্রজা ক্রমে ক্রমে কেবল যে জমিতে অধিকতর স্বত্ববান হইতে থাকেন তাহা নহে, জমিদারের পক্ষে থাজনা ছাড়া যে সকল দাবী থাকিত, তাহাও ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসে। ১৮৮৫ সালের ভূমি রাজস্ব আইন এ বিষয়ে একরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। তাহার পরও যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রজার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রজা সন্তুষ্টমনে কৃষিকার্য্য করিয়া কতক পরিমাণে জমির উন্নতিসাধনে যত্নবান হইয়াছেন।

অবনতির পথে

জমিদার ও প্রজার মধ্যে এই সময় একটা বিরুদ্ধভাব উপস্থিত হইয়াছিল। জমিদারদিগকে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান দেখিয়া ইংরাজ তখন প্রজাকে জমিদারের বিপক্ষে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকে। জমিদারগণও নিজেদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য আইন প্রভৃতির সাহায্যে জমি খাস করিতে বা প্রজা বদল করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু রাজশক্তি ক্রমশঃ প্রজার পক্ষে সাহায্য করায়, উপঢৌকন অথবা "আবওয়াব" প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া মকররি মৌরসী অথবা স্থিতিবান প্রজাস্বত্ব প্রভৃতি বিক্রয় করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া প্রজা দ্রুত জমি হস্তান্তর করিতে থাকে। জমিদারের থাজনা বাকী, সাংসারিক দায় প্রভৃতি মিটাইতে জমি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিক্রীত হইয়া বহু মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করিতে থাকে। তাহা ছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে জমির বণ্টন চলিতে থাকে। এই অবস্থায় আসিয়া বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য ভূমি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয় এবং সেই সমস্যা এখন এত গুরুতর হইয়াছে যে নূতন পথ আবিষ্কার করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর কৃষি তথা অন্ন সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।

জমির বিভাগ

বাঙ্গালার জমির আয়তন ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ একর বা ৭২,৩৮১ বর্গমাইল তন্মধ্যে ২ কোটী ৮৯ লক্ষ একরে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। ১,০২,০০০ জমিদারী রাজস্ব দিয়া থাকে, আর ৫১ হাজার জমিদারী নিষ্কর। ইহাদের অধীনে ২৭ লক্ষ জমা বা প্রজা বিলি আছে। জমিতে সাক্ষাৎ স্বত্ববান রায়তের সংখ্যা ১ কোটী ৭২ লক্ষ এবং তাহাদের প্রজা ৪৮ লক্ষ। রায়তের নিজস্ব জমায় ২ কোটী ৮০ লক্ষ একর এবং তাহাদের কোর্ফা প্রজার অধীনে ৩১ লক্ষ একর জমি আছে।

ভূম্যধিকারী ও তৎস্থানীয় বড় জমার অধিকারীর অধীনে ১ কোটী ৫২ লক্ষ একর জমি আছে।

জমির অত্যধিক ভাগ হইয়া যাওয়ায় প্রতি রায়তের গড়ে ১'৯ একর এবং তৎঅধীনস্থ প্রজার অধীনে গড়ে '৬৪ একর করিয়া জমি ভাগে পড়িয়াছে। এত অজস্র টুকরা হইয়া যাওয়ায় মোট জমি ৪ কোটী ৬৩ লক্ষ একরের মধ্যে ৩ কোটী ১১ লক্ষ একর রায়তের হাতে আছে অর্থাৎ বর্ত্তমানে রায়তরাই শতকরা ৬৭ ভাগ জমির অধিকারী; বাকী ৩৩ ভাগ জমি জমিদার ও বড় ভূম্যধিকারীর হাতে রহিয়াছে।

কুফল

জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় চাষ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। অথচ জমিতে প্রজার ও জমিদারের ব্যক্তিগত যে স্বত্ব জন্মিয়াছে, তাহাতে কাহাকেও উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া সাধারণ বাঙ্গালীর জমি ছাড়াও শিল্প হইতে যে আয় ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় জমির উপস্বত্ব হইতে অনেকেরই সংসার খরচের কতকাংশ সঙ্কুলান হইয়া থাকে। এক সীমানার অন্তর্গত বড় জমি বেশী পরিমাণ পাইবার সম্ভাবনা কম। যাঁহারা ধনী জমিদার, যোতদার বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের গড়ে কাহারও ১৫'২ একরের অধিক জমি নাই। ইহার মধ্যে কতটা খাস ও কতটা প্রজাবিলি তাহা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। যাঁহারা হাজার হাজার বিঘার মালিক বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদেরও খাসে হয়ত খুব বেশী জমি নাই। যদিই বা কাহারও থাকে, তাহা নানাস্থানে ছড়াইয়া টুকরা টুকরা হইয়া আছে।

জমির প্রকৃত মালিক

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার কালে মহা বিতণ্ডা উঠিয়াছিল, জমির মালিক কে? নবাব বাদশাহ বা তৎস্থলাভিষিক্ত ইংরাজ—না, জমিদার? তখন স্থির হয়, রাজা রাজস্ব দাবী করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত জমির মালিক, জমিদার। সেই হইতে জমিদার এক হিসাবে মহা মাননীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন; অবশ্য ইহা মুসলমানদিগের আমল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদার নির্দ্দিষ্ট খাজনায় জমি দখল করিয়া আছেন, প্রজার খাজনা অনেক ক্ষেত্রে নবাবী আমল হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহার উপর প্রজা নানারূপ স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া প্রকৃতপক্ষে জমির মালিক হইয়া আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে বাঙ্গালার ৭২,৩৮১ বর্গমাইল জমির মধ্যে ৬১,৪৬০ বর্গ মাইল অর্থাৎ শতকরা ৮৪'৯ ভাগ পড়ে। ইহার বাহিরে যে জমি পড়ে তাহা খাস মহল ও ঠিকা জমা অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা আছে। খাস মহলে মোট জমির ৭'৯ ও অস্থায়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত শতকরা ৭'২ ভাগ জমি পড়ে। সুতরাং জমির উন্নতি করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে যে জমি পড়ে, তাহারও উন্নতি প্রয়োজন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ

বাঙ্গালার জমির উন্নতির কথা বলিলেই জমিদারী কাড়িয়া লওয়া, চিরস্থায়ী প্রথার উচ্ছেদের কথা আপনি আসিয়া পড়ে। এ বিষয়ে কয়েকটা অসুবিধা আছে, সেদিক সংক্ষেপে আলোচনা করা অবান্তর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালার কর্ষণযোগ্য জমির অধিকাংশই রায়তের অধীনে; তন্মধ্যে প্রায় সবই চাষী প্রজা। তাহার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এমন কি নবাবী আমল হইতে বহু যোতজমার খাজনা হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হইলেই এই সকল প্রজার নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লওয়া খুব সহজ হইবে না এবং খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে না। তাহা ছাড়া জমি কাড়িয়া লইলেই বা কি হইবে? চাষী প্রজাকে জমি না দিলে এত চাষ করিবার ব্যবস্থা নাই; উপরন্তু প্রজার স্বত্ব কাড়িয়া লওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। মোট কথা, একবার গভর্ণমেণ্ট সমস্ত জমির মালিক না হইলে, খাজনা বৃদ্ধি করায় ঘোরতর আপত্তি ও আইনঘটিত নানা অসুবিধা উপস্থিত হইতে পারে।

জমিদারের স্বত্ব কাড়িয়া লইলেও প্রকৃতপক্ষে খুব বেশী জমি পাওয়া যাইবে না। যিনি ভূম্যধিকারী তিনি জীবন ধারণের জন্য জমি ন্যায্য মূল্যে রাখিতে চাহিলে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বেদখল করা ন্যায়ানুমোদিত নয়। যদি কেবল জমিদারী স্বত্ব লইলে সারা বাঙ্গালার প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেও এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হইতে পারিত।

তাহার পর মধ্যস্বত্বভোগীর কথা। গভর্ণমেণ্ট ও কৃষক-প্রজার মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগী জন্মিয়াছে। তাহাদের উচ্ছেদ করিলে প্রজার নিকট যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং তাহাদের উচ্ছেদ করার পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু দেশের মধ্যে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে যে পরিকল্পনা আলোচনা করা যাইতেছে, তাহাতে এই সকল লোকের সহিত বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই। এক সময় ইঁহারা ন্যায্য মূল্যে উপরিতন মালিকের নিকট স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন; পরে নানাপ্রকার দায়ে পড়িয়া সামান্য স্বার্থ রাখিয়া হস্তান্তরিত করিয়াছেন। যে খাজনা হাতে রাখিয়া ইহারা স্বত্ব হস্তান্তর করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকজনের হয়ত সংসার প্রতিপালন করা চলে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা হইতে সংসার খরচের কতকাংশ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। জমির উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাজের চক্ষে ইঁহাদের স্থান অতি নীচে। কিন্তু কাহারও স্বার্থহানি করিতে হইলে, কাহারও জীবনযাত্রার পন্থা রোধ করিতে হইলে, তাহাকে অন্য পথ দেখাইয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্টের কাজ; বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট যখন কাহারও সম্পত্তি দখল করিবার চেষ্টা করে। কোনও প্রকার ক্ষতিপূরণ না করিয়া সম্পত্তি দখল করিবার জন্য সমাজে চোর ডাকাত পরস্বাপহারীর অন্ত নাই। কোনও সুপরিকল্পিত কার্য্যসূচী স্থির না করিয়া এত বিরাট পরিবর্ত্তনের জন্য অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত কিনা বুঝিয়া দেখা দরকার। এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীদের

পোষ্যসংখ্যা ধরিলে প্রায় এক কোটীর নিকট দাঁড়ায়। সুতরাং তাঁহাদের উপজীবিকার কোনও কথা চিন্তা না করিয়া স্বত্ব দখল করিতে গেলে ঘোরতর আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলেও বলিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে এই মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা হ্রাস করিতেই হইবে। কিন্তু কি ভাবে তাহা করা যায়, তাহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

পথের সন্ধান

সমস্ত জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব লোপ করিতে গেলে—যদি গভর্ণমেণ্ট বিনা খেসারতে সমস্ত সম্পত্তি দখল না করে—গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বহু টাকা ঋণ করিতে হইবে। যদি ঋণ করিয়া বাঙ্গালার মঙ্গল হয়, তাহাও করা দরকার। কিন্তু তাহাতে বহু সময় লাগিবে, বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে এবং এই অনিশ্চিত পরীক্ষাকালে কৃষির গুরুতর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যদি পরীক্ষাই প্রয়োজন হয়, কোনও একটী জেলা বা জেলার অংশ লইয়া পরীক্ষা করিয়া অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বসিয়া কাল হরণের সময় নাই। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়ায়, বড় করিয়া চাষ করা চলে না। জমির উন্নতি করিতে, সার দিতে, উন্নত প্রণালীর চাষে বহু ব্যয় পড়িয়া যায়, সুতরাং সাধারণ প্রজার পক্ষে তাহাতে অসুবিধা হয়। এরূপ অবস্থায় অন্ততঃ এক হাজার বিঘা জমির মালিকদের স্বত্বের অংশ মানিয়া লইয়া সংহত ভাবে চাষ করিবার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। কত জমি চাষ করিতে কত ব্যয় পড়ে, তাহার ধারণা সকলেরই আছে। যাহার জমির যত অংশ, তাহার নিকট সেই ব্যয় লইয়া, ট্রাক্টর প্রভৃতির সাহায্যে চাষ করিলে, মোট ব্যয় খুব কম পড়িবে, অথচ চাষের ফলন বেশী হইবে। যে সকল প্রজা রায়ত চাষ করেন, তাহাদের মজুরির হার অনুসারে, তাহারা ফসল বা নগদ মজুরি দাবী করিবে। সমস্ত ফসলের বণ্টন জমির অংশে মালিকের স্বত্বের অনুপাতে হইবে। প্রথমে অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য পাকা দলিল করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। দ্বন্দ্ব কলহ হইলে, মালিককে তাঁহার অংশের জমির জন্য স্থানীয় খাজনার হার অনুযায়ী নগদ টাকা দেওয়া হইবে, কিন্তু জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। এই জমির মালিকদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যস্বত্ব ভোগী নিম্ন হইতে ক্রমে উপর দিকে ধীরে ধীরে তাহাদের স্বত্ব বিশ বা পঁচিশগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া লইলে, কাহারও পক্ষে বিশেষ ভার বলিয়া মনে হইবে না। ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই দেখা যাইবে, গভর্ণমেণ্ট যে মালিকদের খেসারত দিয়া সরাইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাই ত্রাসে অপসৃত হইয়াছেন।

জমি ও ফলন সম্বন্ধে পরিকল্পনা যাহাই চলিতে থাকুক, বাঙ্গালার এই প্রচণ্ড রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সময় জমিদারী উচ্ছেদ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান প্রভৃতি কাজে লাগাইতে বহু সময় যাইবে। কিন্তু বাঙ্গালাকে বাঁচাইতে হইলে একলপ্তে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কৃষি না করিলে বাঙ্গালার পক্ষে অন্নের জন্য পরনির্ভরতা বাড়িয়াই যাইবে। সে অবস্থা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বিদ্রোহী বঙ্কিম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তখনও আঁধার ছিল ; অরণ্যে বিপদাপন্ন পথ
পথের সর্পিল গতি, ক্রূর ফণা সর্প ভয়ঙ্কর
সঙ্কীর্ণ গহ্বর হ'তে অতর্কিত-হীন দংশনের
অপেক্ষায় রহিয়াছে বিষদন্তে প্রচ্ছন্ন প্রদাহ।
তখনও আঁধার ছিল—শ্মশানের ধুমায়িত রেখা
নির্মেঘ আকাশ তলে রেখে গেছে কলঙ্কের ছায়া।
জাতির কলঙ্ক নহে, শাসনের অপকীর্ত্তি গাথা
কঙ্কালে কঙ্কালে গাঁথা, নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পরিহাস—
পরিহাস বাঙালীর, পরিহাস আত্মবিস্মৃতের।
তখনও আঁধার ছিল, মনে মনে অন্তরে বাহিরে
আঁধারে নিশ্চিহ্ন পথ সে পথের দিশারী কে হবে ?

সে আঁধার বিদারিয়া প্রসারিত দিব্যদৃষ্টি তলে
ঋষি বঙ্কিমের ধ্যানে জাগিয়া উঠিল সত্য পথ,
মায়ের মন্দির চূড়া উদ্ভাসিত বালার্ক কিরণে
দেখা দিল সেই দিন, জাতির সে পরম প্রভাতে
উষার মঙ্গল শঙ্খে সে আঁধার মিলাইল দূরে
আনন্দ মঠের সৃষ্টি সেই দিন নিরানন্দ দেশে।
শত সন্তানের কণ্ঠে মাতৃ-মন্ত্র জাগিল সেদিন,
স্বর্গাদপি-গরীয়সী জন্মভূমি—দেবী আসনে
মূর্ত্ত হয়ে দেখা দিল, বঙ্কিমের তুলির লিখনে
বিচিত্র স্বপ্নের আশা, ধ্যানের সকল বাণী তাঁর
পঁচিহ্ন প্রাণ হ'তে প্রাণান্তরে প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ ;

দীর্ঘ দিন গত তবু—বিদ্রোহের সে মহতী বাণী,
বাঙালীর মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনি তোলে আবেগে গম্ভীর ;
সে বিদ্রোহ সন্তানের, মঠ রক্ষী বৈষ্ণবী সেনার
সে নিষ্ঠা—জাগ্রত মনে সঞ্চারিত ভবনে ভবনে।

অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন দাস জীবনের
গ্লানি ও বিক্ষোভে ভরা ক্ষুধার্ত্ত সে আত্মার বিদ্রোহ—
বঙ্কিমের মাতৃ পূজা ; 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র তার ;
সে মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্র—দীক্ষা দিতে সমগ্র জাতিরে
এক সূত্রে গাঁথিবারে ছিন্ন ভিন্ন বাঙালী সন্তানে
আনিলেন নব যুগ,—সে যুগের প্রদীপ্ত আলোকে
আমরা চিনেছি পথ, বুঝিয়াছি সঙ্কল্প তাঁহার ;
নিষ্ফল হয়নি তাঁর মাতৃপূজা, মন্ত্র আহুতির,
গৃহে গৃহে জ্বলিতেছে আহিতাগ্নিসম বহ্নিমান।

সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ—দেশ ধর্ম্ম—মুক্তির সাধনা,
মৃত্তিকার লোভে নহে, দেশেরে দেবতা জ্ঞান করি
আনন্দ মঠের সেনা মুক্তিজ্ঞানী সন্তানের দল
নিষ্কাম স্বদেশ প্রেমে জাগাইল প্রথম বিদ্রোহ !
—সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের,—
অন্ধকার মোচনের তরে নব প্রভাতের উদ্বোধন ;
সে বিদ্রোহ বঙ্কিমের, বন্ধন-মুক্তির মন্ত্র গুরু,
তাঁহারি উদ্দেশে কবি যুগে যুগে জানাবে প্রণতি।

বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

জাতির বিচারকর্ত্তা ইতিহাস এবং জাতীয় ইতিহাসের বিচার হয় মহাকালের প্রচ্ছদপটে। তবু আমরা যদি বর্ত্তমানেই ইতিহাস বিচার করিতে চাই তাহা হইলে প্রদীপের তলদেশ হইতে কিছু দূরে সরিয়া আসিতে হইবে।

বাঙ্গলা মাতার ক্রোড়ে জন্ম ও প্রথম শিক্ষা লাভ করিলেও আমি শেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছি শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতবর্ষেরও বাহিরে। তাহার পর কর্ম্মব্যপদেশে আমি চিরপ্রবাসী, প্রদীপের তলদেশের কিছু দূরে—যদিও সে দূরত্ব দেশকে দুর্ব্বোধ্য বা দুজ্ঞের্য় করিয়া তুলিবার মত বিষম নহে। অনতিদূর হইতে দেখা যদি ভুল হয় তাহা ব্যতিক্রম হইবে, নিয়ম নহে।

আর প্রবাসীর প্রেমবিচ্ছেদ ব্যথারসে সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া স্বদেশকে আরো ভাল আরো ঠিক করিয়া বুঝিবার অবকাশ দেয়। বাল্য ও কৈশোরের সে বাংলা দেশকে কখনো এত সুন্দর অথচ অসহায়, মধুর অথচ মরণোন্মুখ, সম্ভাবনাময় অথচ সশঙ্কিত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। মৃত্তিকার সে অনাদৃতা অথচ মহীয়সী মাতার আহ্বান প্রতিটী প্রবাসী বৎসরের ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছেদকে অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। সে জন্যই কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর পরাজয় বা পশ্চাদপসরণ সহ্য হয় না। আজ একটী বিষয়ে বাঙ্গালীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ দুয়েরই প্রতি বাঙ্গালী সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ইহার মধ্যে যদি নিজেদের দোষদর্শন বা সমালোচনা থাকে তাহা প্রেম-প্রসূত, অতএব আপনাদের মার্জ্জনীয়।

প্রধানত বাঙ্গালী চাকুরীজীবী। একদা রাজশক্তির প্রসার ও প্রচার কার্য্যে সেই বিদ্যা তাহাকে দূর প্রদেশে ও দেশান্তরে লইয়া গিয়াছে। রাজকর্ম্মের বিরাট্ মহীরুহের ছায়াতলে বহু বাঙ্গালী সুশীতল ও বংশ-পরম্পরা ক্রমিক নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই আশ্রয়স্থল বাঙ্গালীর পক্ষে বহুক্ষেত্রে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের উষা বাঙ্গালী চাকুরীজীবীর জীবিকার্জ্জনের সন্ধ্যা ঘনাইয়া তুলিয়াছে। অন্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলাম,—বাংলা দেশের মধ্যেই বাঙ্গালী চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশ পথেই পরীক্ষায় বিফল হইয়া হটিয়া আসিতেছে। সওদাগরী অফিসে মাদ্রাজী পাইলে কেহ বাঙ্গালী চায় না, সরকারী অফিসে জাতিবর্ণ বিশেষে যে স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্র অবশিষ্ট আছে তাহাতেও বাঙ্গালী পরীক্ষায় পরাজিত। সরকারী বহু চাকুরীর প্রবেশ পথে পরীক্ষা আছে; সেখানে বাঙ্গালী ছাত্র সুবিধা করিতে পারে না কেন? উদাহরণ স্বরূপ দেখুন আই-পি পরীক্ষা। ইহা নামে নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা হইলেও কার্য্যত পরীক্ষাটীর বেলায় প্রাদেশিক ভাগে বিভক্ত, যদিও সেক্রেটারী অব ষ্টেট চাকুরীর মালিক। বাংলাদেশের সিভিল লিষ্ট খুজিলে দেখিতে পাইবেন বহু অবাঙ্গালী বাংলাদেশে "ডমিসাইলড" হিসাবে পরীক্ষা দিয়া বাঙ্গালী ছাত্রকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে বাংলাদেশের পুলিশ কর্ম্মক্ষেত্রে রাজত্ব করিতেছেন।

কেহ বলিতে পারে, ভালই হইয়াছে। আমরা চাকুরীজীবী হওয়ার কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া অর্থকর ক্ষেত্রে, শিল্পে বাণিজ্যে ও উৎপাদিকা-শক্তিবিশিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। চাকুরীর চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হই নাই, সে চেষ্টায় পরাজিত হইতেছি। পরাজিতের সংখ্যা বহু, চাকুরীর বাহিরের ক্ষেত্রে সচেষ্ট বাঙ্গালীর সংখ্যা কম; সফলের সংখ্যা আরও কম। ছয় কোটী লোকের দেশে অন্যান্য ক্ষেত্রে চেষ্টা করিতেছেন এমন লোক বাদ দিয়াও পরীক্ষা-ক্ষেত্রে সফল কয়েকশত ছাত্র প্রতি বৎসর দেখাইতে পারা আমাদের পক্ষে উচিত ছিল। আমরা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া যেন আত্মপ্রবঞ্চনা না করি। এইরূপ আত্মপ্রসাদ আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে।

অন্যপক্ষে আমরা চাকুরীজীবী বলিয়া এবং চাকুরীক্ষেত্রে অন্যপ্রদেশের লোকদিকের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছি বলিয়া ঈর্ষা এবং অপবাদ অর্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালী বিদ্বেষের মূলে বহুলত: এই কারণ; অথচ ইহা আমাদিগকে আর অন্নবস্ত্রের সংস্থান দিতেছে না। এ বৃক্ষে পুষ্প শুকাইয়া যাইতেছে; কিন্তু কণ্টকভাগী হইয়া রহিয়াছি আমরা এখনো।

শ্রীযুক্ত ভারত সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা আয়ুষ্মতী আই-সি-এস চাকুরী দেবীর কথা ধরা যাক্। তাহার পাণিপ্রার্থী বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রতি বৎসর কম হইত না এবং তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণ প্রায় সকলেই থাকিতেন। কিন্তু সফল যাহারা হইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা অতি কম। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম পঞ্চাশজনের নাম প্রতি বৎসর পরীক্ষার পর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ১৯৩০ হইতে ১৯৪২ এই তের বৎসরে মোট ৩৬ জন বাঙ্গালী—হিন্দু মুসলমান প্রবাসী ও বাঙ্গালাদেশের অধিবাসী মিলিয়া—এই তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি বৎসরে প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা তিনজনেরও কম। এই তের বৎসরে মাত্র ছয়জন বাঙ্গালী আই-সি-এস পরীক্ষায় ভারতবর্ষ হইতে সফল হইয়াছেন। তাহারও অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিনজন প্রবাসী বাঙ্গালী। বিলাতের আই-সি-এস পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের দুরবস্থা সামান্য একটু কম, তাহার প্রধান কারণ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা উন্নততর হওয়ায় বাঙ্গালী ছাত্রের শিক্ষার দোষগুলি খানিকটা শুধরাইয়া যায়; দ্বিতীয়ত সেখানে পরীক্ষায় প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাহাতে বাঙ্গালী অন্য প্রদেশীয়ের সঙ্গে সমান শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

গত ১৯৩০ সন হইতে এই পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে শুধু যে আমরা জীবিকা অর্জ্জনের একটী বৃহৎ ক্ষেত্র হারাইয়াছি তাহা নহে; বাংলাদেশের জেলায় জেলায় বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রধান শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা থাকিলেন অবাঙ্গালী, আমাদের অক্ষমতা ও অগৌরবের সাক্ষ্য বহন করিয়া।

কেন্দ্রীয় সরকারের কেরাণী চাকুরীও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা দিয়া পাইতে হয় এবং ইহাতেও চাকুরী-সর্ব্বস্ব বলিয়া অপখ্যাত আমাদের ব্যর্থতা আই-সি-এস অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। পাঁচ বৎসরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরীক্ষার ফল হিসাব করিয়া দেখা গেল যে গড়পড়তা প্রতি বৎসরে মাত্র তিনজন করিয়া বাঙ্গালী প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

ফিনান্স, মিলিটারী একাউন্টস, রেলওয়ে, কাষ্টমস ও পোষ্ট্যাল বিভাগের যে কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষা একসঙ্গে হয় তাহাতে চার বৎসরের ফল হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বৎসরে গড়পড়তা মাত্র ছয় জন করিয়া বাঙ্গালী—প্রবাসী বাঙ্গালী ও ইহার মধ্যে আছে—প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই ছয়জনের মধ্যেও অনেকে চাকুরী প্রাপ্তিতে সফল হইবার মত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

এই যদি আমাদের অবস্থা তাহা হইলে আমাদিগকে সত্বর প্রতীকার করিতে হইবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় প্রথম যৌবন; সে সময়ে এতগুলি বাঙ্গালী যদি বৎসর বৎসর পরাজয়ের লজ্জা গ্লানি ও বিষময় ব্যর্থতা ভোগ করে, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি ও কোথায়? আমাদের আশাস্থলদিগকে নৈরাশ্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য আমাদেরই।

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতাগুলিতে বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হিসাবে অনেকে মৌখিক পরীক্ষার অজুহাত দেখান। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষই মৌখিক পরীক্ষায় বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে কম নম্বর দেয়। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য ত নহেই, বরং এই অভিযোগের দোহাই দিয়া আমাদের গুরুতর একটী ত্রুটী ঢাকিয়া যাইতেছি। মৌখিক পরীক্ষায় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক প্রসার, চরিত্রের বিকাশ প্রভৃতি গুণাবলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরীক্ষা করা হয়। বাঙ্গালী ছাত্র বহুক্ষেত্রেই জীবনে এই সম্ভবত প্রথম সাহেবী পোষাক পরিয়া পরীক্ষকদের সামনে আসে। তাঁহাদের নাম, মর্য্যাদা ও বাঙ্গালী-কর্ণে-অনভ্যস্ত ইংরেজী ভাষণ মাথা ঘুরাইয়া দেয়। তাহার উপর অনভ্যাসের কোঁটা সুট টাই কলার মোজা সর্ব্বাঙ্গে চড় চড় করিতে থাকে। আত্মপ্রত্যয় প্রতিটী প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। ফেডারাল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব্ব একজন সদস্য গল্প বলিয়াছিলেন যে আই-সি-এস পরীক্ষায় একটী বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীকে টাই বিভ্রাটে বিপন্ন দেখিয়া তাহাকে আগে সে সমস্যা সমাধান করিয়া পরে প্রশ্নোত্তর দিতে সময় দিয়াছিলেন। অন্য পরীক্ষকদিগের এই মন্দ সাহেব যশঃপ্রার্থীর সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল এবং ইহারই বা মানসিক দুরবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মোট কথা আমাদিগকে চৌকস হইতে হইবে। সুট যখন পরিতে হইবে অথবা যখন যে পোষাকে রণক্ষেত্রে যাইতে হইবে তাহাতে কোনও খুঁত থাকিবে না; ইংরেজী যখন বলিতে যাইবে তখন স্বদেশী বেংলিশ (Benglish) না বলিয়া শুদ্ধ ইংরেজী সাবলীল ভাবে শুদ্ধ উচ্চারণে ও শুদ্ধ ছন্দে ও স্বরে বলিব। যে পরীক্ষায় যাহা চায় তাহার জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইব এবং অন্যান্য বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় কলিকাতাতেও নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় পরীক্ষার্থী তৈয়ারী করার জন্য রীতিমত কার্য্যকর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অর্ব্বাচীন বাঙ্গালী কিশোর যদি পরশুরাম—ভণিত নিখুঁত আদর্শ তরুণীর সন্ধান করে যে হইবে বল্লরী বাড়ুয্যের মত রূপসী, মিসেস্ চৌবের মত সাহসী, জিগীষা দেবীর মত লেখিকা, লোটী রায়ের মত গাইয়ে ···ইত্যাদি তবে জীবনসংগ্রামে রত বাঙ্গালী যুবকই বা কেন নিখুঁত ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করিবে না—যাহাতে স্বয়ংবর সভায় সে দেখাইতে পারে যে পোষাকে সে নিউইয়র্কের নাগরিক, বুদ্ধিতে এথেন্স ম্যানিন, মনঃসমীক্ষায় পেলম্যান, আধুনিক জগতের জ্ঞানে এনসাই-ক্লোপিডিয়া?

আমাদের বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে "বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে। একটী বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত পুঁথিগত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরী করিয়াও বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীগণ প্রশ্নটী ভিন্ন ভাবে দেওয়া থাকিলেই হয় তাহা লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্ব্ব প্রস্তুত ছাঁচে ঢালিয়া দিয়া আসে, না হয় রূপান্তরের নিষ্ফল চেষ্টায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়। খুব সহজ একটী প্রশ্ন করুন "তোমার বয়স কত" উত্তর আসিবে "আমি ১৯২৫ সনের শেষ ভাগে জন্মিয়াছি।" Direct অর্থাৎ সোজাসুজি দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাবে আমরা বিদ্যার সারাংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি না, অর্জ্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাইতে পারি না, কোথায় যে তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও বুঝিয়া উঠি না। শুধু ভাসা ভাসা উচ্ছ্বাস, শুধু অবান্তর প্রকাশ, শুধু সময় চলিয়া গেলে হা হুতাশ ইহাই হয় পরিণতি। জীবনের বালুবেলায় "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর।" ছাত্রাবস্থায় ·মধ্যভাগে ভলান্টিয়ার বা সভাশোভন শ্রোতা, শেষভাগে চাকুরী পরীক্ষার্থী, পরে আইনছাত্র এবং শেষে বেকার আইনজীবী বা ক্রমাগত দরখাস্ত লেখক—এই অনিবার্য্য ধিক্কারজনক ভাগ্য হইতে বাঙ্গালী ছাত্রকে বাঁচাইতে হইবে। সে আমাদের নিকট অনেক কিছু দাবী ও আশা করিতে পারে; আপনাদিগকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে শুধু তাহাদিগের নহে, সমগ্র জাতির কথা ভাবিয়া।

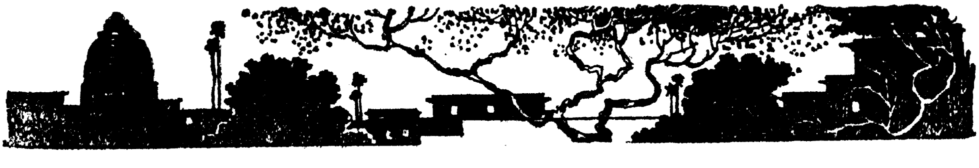
বর্ত্তমানে চারিদিকে "প্ল্যানিং" এর যুগ চলিতেছে। আপনাদিগকে ও প্রথমে নকসা করিয়া লইতে হইবে—কোন্ ছাত্র কোন্ পথের উপযোগী, কোন বিদ্যার অধিকারী। শ্রেণীবিভাগ করিয়া ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ও যোগ্য

পথের জন্য। অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষায় নম্বর উঠে বলিয়াই যে অঙ্কে প্রীতি ও আস্থাহীনকে অঙ্ক লইতে হইবে তাহা ঠিক নয়। যাহার দৃষ্টি শ্রমশিল্পের দিকে তাহাকে সাধারণ পথে এম, এ বা অনার্স পড়াইয়া শুধু সময়, অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট। যে চাকুরীজীবী হইবে তাহার দৃষ্টি থাকুক শিকারী ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার চাকুরী পরীক্ষার অতীত প্রশ্নগুলি ও বর্ত্তমান পাঠ্যের উপর। উপনিষদ্ বলেন আত্মানং বিদ্ধি; আপনারাও ছাত্রগণকে সময় থাকিতেই সে মন্ত্রে দীক্ষা দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পরিচিত পৃথিবী হইতে অজ্ঞাত অকরুণ নিখিলভারত প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে প্রস্তুত না করিয়াই আমাদিগের ছাত্রগণকে পাঠান বা যাইতে দেওয়ার ফলে সকলের প্রতিই ঘোর অবিচার হয়। যাহার ভবিষ্যৎ ইহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যে আত্মীয় স্বজন ইহার জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া অর্থব্যয় করিতেছেন এবং যে শিক্ষায়তনের ছাপ লইয়া ছাত্রগণ যাইতেছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিই অবিচার হইতেছে। বাংলা গল্প উপন্যাসে সর্ব্বদাই দেখি বাঙ্গালী কন্যার পিতা কন্যাকে আই-সি-এসের বধূ হইবার জন্য শিক্ষা বাল্যকাল হইতে দিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী অভিভাবক ও বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় পুত্রকে আই-সি-এস অথবা অন্যান্য জীবিকার্জ্জনের জন্য বাল্যকাল হইতে প্রস্তুত করিবেন না কেন?

চালাকী করিয়া কোন কঠিন কার্য্যে সফল হওয়া যায় না। একথা আমাদিগকে মানিতেই হইবে যে আমরা সম্প্রতি লঘুচিত্ত হইয়া পড়িতেছি, ভাবিতেছি যে উপর চালাকী করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর দিয়া শরের সহায়তা না লইয়া ধারেই কাজ সারিয়া লইব। কিন্তু এ ভাবে কখনও কেহ সফল হইতে পারে না। প্রতিভার মূলে প্রধানত পরিশ্রম, কেবল প্রেরণা নহে। পৃথিবীতে বিশেষজ্ঞের যুগ চলিতেছে; ভাসা ভাসা প্রয়াসের উপর নির্ভর করিয়া আমরা লক্ষ্যস্থল তীর হইতে দূরেই ভাসিয়া যাইতেছি, যেখানে ভাগ্যের পবন টানিয়া লইয়া যায়; দাঁড়ের উপর জোর দিয়া তরী তীরের অভীষ্ট স্থানে ভিড়াইতে পারিতেছি না। এই দোষ বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ছাত্রাবস্থা হইতেই ইহাকে আমূল উৎপাটন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিলে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে সাফল্যের আশা নাই। যোগ্যতমেরই বাঁচিবার অধিকার। বরমাল্য বায়ুপথে উড়িয়া আসিবে না; তাহা বীর্য্যশুল্কে অর্জ্জন করিতে হয়।

অধুনা—বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে সৈন্যদলে পদস্থ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের জন্য একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাতে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা, ব্যক্তিত্ব ও মানসিক বিকাশের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়। আপনারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বিবরণীতে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে এদেশেও কোন কোন সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের জন্য সেই পন্থারই অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রের বর্ত্তমানে এমন কোন সম্বল নাই যাহাতে এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। চাণক্য-কথিত পুস্তকস্থাপিতা বিদ্যা পুস্তকেই রহিয়া যায় বর্ত্তমানে, কিন্তু বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, কর্ম্মতৎপরতা ও বিভিন্ন দিকে মানসিক বিকাশ ও আমাদের ছাত্রদের হয় না।

আমি কিন্তু আশাহীন নহি। বিগত মহাযুদ্ধের সংঘাতে তরুণ বাঙ্গালী বহির্জ্জগতের সঙ্গে মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার তাসের কেল্লা, অলস স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নানা কার্য্যকরী অর্থকরী পথে সে উৎসাহ দেখাইয়াছে, যোগ্যতা ও জয়লাভ করিয়াছে। নবজীবনের আহ্বান তাহাকে আকাশযুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পুরোভাগে আনিয়া দিয়াছে। সামরিক চিকিৎসা বিভাগে, স্থলসেনার ও নৌসেনার উচ্চ কর্ম্মচারী বিভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালী কুঞ্জকুটীর ও কাব্যলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতকে জানিতে, অনাস্বাদিতকে আস্বাদ করিতে, মৃত্যু ও জীবনের সহিত বীরের মত পরিচয় করিতে চাহিয়াছে। এই সাহস ও উৎসাহ, এই প্রেরণা ও প্রাণ প্রাচুর্য্যকে যদি আমরা উপযুক্ত ভাবে বিকাশ ও বিস্তারের শিক্ষা ও সুযোগ না দিই তাহা হইলে আমরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইব ও মাতৃভূমির ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। কাজেই এই আমাদের শুভক্ষণ, এই সুবর্ণ সুযোগ, যে সময় তরুণ বাংলাকে যথা যোগ্য পথে নিয়োজিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। আমাদের পিছনে পড়িয়া আছে বহু বিস্তীর্ণ ব্যর্থতার ইতিহাস, কিন্তু সম্মুখে থাকুক বহুমুখী সাফল্যের সম্ভাবনা; সে সম্ভাবনাকে দিকে দিকে সত্যে—জাগ্রত সংশয়হীন সত্যে—পরিণত করিবার প্রশস্ত সময় এই। আজ নবোদ্বুদ্ধ যে চেতনা মহাসমরের পটভূমিকায় রূপ নিয়াছে বাংলা দেশের বহু অতীত কাহিনীর ন্যায় ইহাও যেন উৎসাহ ও পথ প্রদর্শনের অভাবে অকালে লুপ্ত না হইয়া যায়। সে জন্যই আমাদের শিক্ষা রীতি ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে—যাহাতে শুধু চাকুরীর নহে, মহা জীবনের পরীক্ষায়ও আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থলদের আসন বহু উচ্চে ও সম্মানজনক স্থান লাভ করে। তবেই সার্থক হইবে বাঙ্গালীর শিক্ষা ও পরীক্ষাসমরে যোগদান।



গ্রামের লোকজন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গ্রামে দরিদ্র ও অলস লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু অভাব তাহাদিগকে নিরানন্দ করিতে পারিত না—কেহ নিতান্ত অবেলায় বহু কষ্টে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত রাঁধিতেছে কিন্তু গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছে—

"গাছতলাতে রেঁধে খাবি
শাক চচ্চড়ি ওল ভাতে।"

অধিকাংশের প্রার্থনা ছিল—

"চাইনে কো মা রাজা হতে
দুবেলা যেন পাই আঁচাতে।"

দাবা পাশার ছক সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিত, তাস খেলা গান বাজনা লাগিয়াই আছে—দুঃখ তাহাদের একান্ত গা-সহা ছিল, মোটেই কাতর করিতে পারিত না।

অনেকে নিষ্কর্ম্মা ছিল, কিন্তু গ্রামের তাহারাই প্রকৃত কর্ম্মী। সকলের কাজ তাহারাই করিত। মেলা, অষ্টপ্রহর প্রভৃতি উৎসবে তাহারাই অগ্রণী।

বরযাত্রী যায় তারাই আগে, বরযাত্রীরে ঠকায় তারা,
নষ্টচন্দ্রে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় রাত্রি সারা।
রাত দুকুরে ডাক্‌লে পরে লম্ফ দিয়ে তারাই আসে,
সম্পদেতে সুখের সুখী, মুক্ত প্রাণে তারাই হাসে।
গ্রামবাসীদের বিপদ হলে তারাই আগে কোমর বাঁধে,
গ্রামের মৃত গঙ্গা লভে চড়ে কেবল তাদের কাঁধে।
গ্রামে গ্রামে হে ভগবান অকেজো দল এমনি দিয়ো,
তারাই গ্রামের গৌরব যে—আমার পরম বন্দনীয়।

নোটন ঘোষ ছিল এ দলের কর্ত্তা, তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

নাহি কাজ তার নাহি অবসর বাড়ী বাড়ী ফেরে ঘুরি,
সারা গ্রামখান্ খুঁজে দেখ আর মিলিবে না তার জুড়ি।
কোথায় ছেলেরা করিতেছে খেলা—করিছে চড়ুই ভাতি,
প্রভাত হইতে নোটন সেথানে হয়েছে তাদের সাথী।
গ্রামের ভিতর যাত্রা আসিলে যাবে না ফিরিয়া কভু,
ঘরে নাই ভাত, বাড়ী বাড়ী চাঁদা, নোটন তুলিবে তবু।
নূতন কেহই আসিলে এ গ্রামে চাকর চাহি নে তার,
সব কাজ তার নোটন করিবে কাছে রবে অনিবার।
সে তোমার চির বাধ্য চাকর, করে না কিছুরি আশা,
বকো না হাজার কিছুতেই তার কমিবে না ভালবাসা।
ভায়েরা এখন চিনেছে তাহাকে দেয় না পয়সা হাতে,
লক্ষীছাড়ার কোনো খেদ নাই কোনো দুখ নাই তাতে।
নাহিক অভাব তেমনি স্বভাব না থাকুক কড়ি কাছে,
গিয়াছে কামনা—হৃদয় কমল তেমনি ফুটিয়া আছে।

নোটন সমস্ত জীবন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিজয়া দশমীর দিন মারা যায়—যে চিরজীবন আনন্দ দিয়াছে তাহাকে আনন্দময়ী সঙ্গেই যেন লইয়া গেলেন।

শ্রীমান ঘোষাল ছিলেন খুব আমুদে লোক—

প্রতি মাঠে প্রতি ঘাটে গ্রামের প্রতি গাছে,
আজও বুঝি তাহার পায়ের ধূলার চিনে আছে।
দেখা দিত পাঠশালে সে কচিৎ কভু আসি,
সোহাগের পানকৌড়ি যেন উঠ্‌তো হঠাৎ ভাসি।
গাইত যখন হাত তুলে সে সংকীর্ত্তনের দলে,
গান শুনে তার গ্রামের বুড়া ভাস্‌তো আঁখিজলে।
ভবন ভরা পোষ্য এখন সেই তো তাদের আশা,
পাপিয়া কি গাইতে পারে রচ্‌তে হলে বাসা?
সারা দিবস খেটে খুঁটে সন্ধ্যাবেলা হায়,
এখনো যে খিন্নপদে লোচন পাটে যায়।
ক্ষণেক তরে হাসে নাচে তেমনি গাহে গান,
নিশার হিমে জাগে যেন মানস কুসুম ম্লান।
'নীলকণ্ঠের' যাত্রা যদি দুক্রোশ দূরে হয়,
সবার অগ্রে তাহার সেথা না গেলেই তো নয়।

তাঁহার আমোদ অফুরন্ত ছিল। পৌষল্লা প্রভৃতিতে তিনিই রাঁধিতেন। মতিরায় ও নীলকণ্ঠের নূতন গান তিনিই আমদানী করিতেন—নূতন নূতন সুর আয়ত্ত করিতেন। "এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চমাঝে" অহিভূষণের এই গানটি প্রথমে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। বাউল ও 'খেপার' গান কত জানিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার বাড়ীতেই সর্ব্বদাই ঢোল তব্‌লা খোল বাজিত। হাসিতে ও হাসাইতেই তিনি যেন জন্মিয়াছিলেন। দারিদ্র্য তাঁহার নিকট আসিয়া অপ্রতিভ হইত। এই শ্রেণীর সদানন্দ লোককে দেখিলে সত্যই মনে হয়—

"কে দিল মানবরূপ 'উত্রী' প্রপাত কে?"

হংস খেয়ারী—গ্রামের উত্তর প্রান্তে তাহার বাড়ী ছিল। সে কুনুর নদীতে খেয়া দিত। একটী পা খোঁড়া ছিল কিন্তু নৌকায় খেয়া দিতে উঠিলেই পা ঠিক হইয়া যাইত। সাঁতার সে খুব ভাল দিতে পারিত। আমি ছাত্রাবস্থায় কাটোয়া "প্রসূনে"র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় "হংস খেয়ারী"র নামে একটী কবিতা লিখি—অনেকের উহা ভাল লাগে এবং হংস খেয়ারী শুনিয়া খুব খুশী হয়।

তরুলতার রাঙা ফুলে চালটী আছে ঢেকে,
বাতাস আসে শিউলি ফুলের বাসটী গায়ে মেখে,
নদীর কাল জল,
করলে টলমল,
হাঁসগুলি তার হেলে দুলে ডাঙায় আসে বেঁকে।

২

দুপাট ডোঙায় সারা দিবস যাত্রী করে পার
আটটী জনের বেশী সে যে নেয় না কভু ভার,
ঝিঙ্গে কচু পুঁই
ভাবে কোথা থুই,
হাটের লোকে আঁজুল আঁজুল দেয় যে পুরস্কার।

৩

মামলা মোকর্দ্দমা এবং ধরার কোলাহল,
চায়না সে যে শুনতে—বিনা নদীর কলকল।
শুধু গঙ্গাস্নানে
যায় কাটোয়া পানে,
আদালতের নামে তাহার চরণ টলমল।

একবার তাহাকে জমিদার সাক্ষী মানিয়াছিলেন কিন্তু আদালতে ঢুকিতে সে এত কাঁপিতে লাগিল যে, তাহাকে আর সাক্ষী দিতে হইল না—হংস সে কথা স্মরণ করিলেই গঙ্গা মায়িকে উদ্দেশে প্রণাম করিত।

শ্রীশচন্দ্র বকসী—তাহাকে লোকে ছিরু বলিয়া ডাকিত, বড়ই আদুরে ও আমুদে ছিল। শ্রীমানের সহপাঠী। দুই বৎসর 'কটকে' আত্মীয়ের কাছে পড়িতে গিয়া উপেক্ষা ও অনাদরে তাহার মন খারাপ হয়—মন আর সরিল না।

বড় ডাং পিটা ছেলে
সদাই বেড়াত খেলে,
চাহিত না কিছু অজয়ের বুকে
সাঁতারিতে শুধু পেলে।
গাছে খেলি লুকোচুরি,
মাঠেতে উড়াত ঘুড়ি,
নাচিতে গাহিতে দেশেতে তাহার
জুড়ি আর নাহি মেলে।

তারপর সে কটক হইতে যখন ফিরিল, মুখে হাসি নাই—সর্ব্বদা আনমনা হইয়া বসিয়া থাকিত, সময় সময় অসংলগ্ন কথা বলিত—

বনের পাপিয়াটীরে
এমন করিল কে রে?
ভুলাইয়া গান ভাঙি পাখা দুটী
বনে দিয়ে গেল ফিরে?
ঝরে পড়ে গেছে তার সাথীদল
সেই শুধু হেথা রয়েছে কেবল,
শেষ হেমন্ত শেফালি গুচ্ছে
মলিন কুসুম খানি।

শেষ বয়সে তিনি কৈশোরের আনন্দের দিনের কথা বলিতেন—বটগাছে দোল খাইবার স্থানটী দেখাইতেন—

ফুলে ভরা চারু ময়ূরপঙ্খী
বুকে লয়ে দীপ রাশি,
মাতায়ে দুকুল দীপালীর রাতে
সে যে গিয়াছিল ভাসি।
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার,
আছে শুধু ধুম পোড়া সলিতার,
আঁধার তরণী লেগেছে আজিকে
আঁধার ঘাটেতে আসি।

ব্রজ তাঁতি—সে জাতিতে বাগ্দী ছিল, কিন্তু বস্ত্র বোনাই তার ব্যবসা—এক সময়ে তাহার কাপড়ের খুব খ্যাতি ছিল—হাট হইতে তাহার কাপড় ফিরিত না—উচ্চ মূল্যে বিকাইত—বিলাতী বস্ত্র আসিয়া তাহার ব্যবসা নষ্ট করিয়া দিল—

ভেঙ্গে গেছে পাঁচখানা তাঁত, সাধের মাকুশালা,
এক পাশেতে পড়ে আছে নিজের হাতের থালা।
বুনতে হয় যে কাপড় তাকে বর্ষে দু চার জোড়া,
পরে শুধু প্রণয়ী তার গ্রামের দুজন বুড়া।

রসিক বাগ্দী—সে বড় সাহসী ও বিশ্বাসী ছিল, সর্ব্বদা 'সাধু' ভাষায় কথা বলিত। মাছ ধরাই তাহার পেশা। অত্যন্ত অলস বলিয়া মজুর খাটিত না, কিন্তু সব কাজ ভালই জানিত। মাছ ধরা সম্বন্ধে তাহার অগাধ জ্ঞান। সত্য মিথ্যা কত তথ্যই জানিত। মাছের নূতন নূতন টোপের আবিষ্কার করিত। ছেলেদিকে মাছধরা শিখাইত, তাহাদের ছিপ্, বড়শী সংগ্রহ করিয়া দিত। সমস্ত রাত্রি মাছ ধরিত এবং ভূত পেত্নীর অসংখ্য গল্প বলিত।

দীর্ঘ তাহার সবল শরীর, আয়ত বক্ষ তার,
দেখিলেই ঠিক মনে হ'ত যেন ডাকাতের সর্দ্দার।
বাহু দুটী তার কত দিনে রেতে পর উপকার তরে,
ঠেলেছে হেলায় বন্যার বারি ভীষণ তুফানে ঝড়ে।
হরি আছে সেই চালাইবে দিন বলিত যখন দুখে
কি মহিমাময় দৃঢ়তার জ্যোতি জাগিত তাহার মুখে।
কত দিন হল গিয়াছে রসিক তবু কুয়ুরের তীরে
এখনো তোমরা দেখিতে পাইবে ভাঙা তার আড়াটিরে।
ভাসানের জল এখনো তেমনি আসে সে আড়ার কাছে,
দেখে শুধু সেথা নাহি একজন আর সবই পড়ে আছে।

অখিল মাঝি—অজয়ে 'থানা ঘাটে' সে খেয়া দিত। দুখানা বড় নৌকা তাহার ছিল। তাহার পিতা 'হরে মাঝি' বিখ্যাত নৌদস্যু ছিল। অখিল সরলপ্রাণ ধার্ম্মিক শান্ত-শিষ্ট লোক ছিল।

চাঁদ দেখে তারে প্রথমে
সম্ভাষে আগে রবি,
সবাকার আগে জাগে সে
প্রগাঢ় শান্তি লভি।
ধরে পাড়ি আর গাহে গান
হরি কারও ধার ধারি নে
কাহারো মন্দে থাকি নে ক আমি
কাহারো হিংসা করি নে।

তার বাড়ী 'নয়নতারা' ফুলে সুসজ্জিত থাকিত। গ্রামের গৌরব যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কাজ সে কখনো করিত না এবং কেহ করিলে বড় কষ্ট পাইত। উজানি মেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং বড় দলের যাত্রা না হইলে সে ম্রিয়মাণ হইত।

গোলাম মেটে—বড় শান্তিপ্রিয় লোক ছিল—ভাল বারুই ছিল সে। তাহার একমাত্র কন্যা ও জামাতা লইয়া আনন্দে থাকিত—সংসারে তার আর কেহ ছিল না।

আশার রেখা জাগলো বুড়ার বুকে
বেলা শেষের রৌদ্রটুকুর মত।

সংসারে আবার মন দিল, কিন্তু মেয়েটী মারা যাওয়ায় সে বড় কাতর হইল।

তুল্‌তে নারে আর সে কোদাল খানি
থাকে বুড়া মুখটী করে ভার,
উঠ্‌লো না আর রইলো তেম্‌নি পড়ে
আধেক গড়া গোহালখানি তার।

রাধানাথ ঘোষাল—আমি তাঁর বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি অত্যন্ত হাস্যরসিক লোক ছিলেন—সর্ব্বদা দাবা ও পাশা খেলায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বহু সঙ্গী ও শিষ্য ছিল।

নারাণ বায়েন—তাহাকে আমি থুরথুরে বুড়া দেখিয়াছিলাম। উচ্চদরের বাজকর ছিল—বিবাহে ও সব উৎসবেই তাহার বাজ আগে যাইত এবং দেশজোড়া সুখ্যাতি লাভ করিত। পাখোয়াজী বলিয়াও তাহার নাম ছিল। তাহার পুত্র ও নাতিরা সে সবের কোন মর্য্যাদাই বুঝিত না—পাখোয়াজের খোলে তামাক রাখিত—বাঁশী লইয়া নাতিরা খেলা করিত। নারাণের হতভম্ব ভাব তার গুণজ্ঞ গ্রামবাসীকে কাতর করিত। সে মধ্যে মধ্যে তাহার বালিশে আপন মনে বাদ্যযন্ত্রের তান দিত, বোধ হয় আনন্দ ও জয় গৌরবের দিন মনে পড়িত।

অশ্বিনী—যৌবনেই মারা যায়, একখানি ঘর প্রস্তুত করিতেছিল—উহার অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অশ্বিনী মারা যায়—যখনি ঐ ঘর দেখিতাম আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত—

কাঁদে ও দেয়াল ভাঙ্গা, ভাঙ্গা তার বাটিকা,
ও যেন আধেক লিখা বিষাদের নাটিকা।
এক মেটে প্রতিমা ও রেখে গেছে পূজারী,
হৃদয়ের সব সাধ দিয়ে গেছে উজারি।
যত কথা যত ব্যথা যায় নি সে বলিয়া,
ও দেয়াল বলে যেন পাটে পাটে গলিয়া।
যত আশা ভালবাসা রেখে গেল বাসাতে
আজি তাহা ফুটে বন মর্ম্মর ভাষাতে।

মানদা—তার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

মোর জননীর সঙ্গিনী ছিলে
ছিলে যেন পিসী মাসী,
তুমি আমাদের 'ধাত্রীপান্না'
আমাদের 'শ্যামা' দাসী।
আপন ভাবিতে আমাদের ঘর,
গৃহ কাজে রত নাহি অবসর,
সুদীর্ঘ তব জীবন গোঁঙালে
আমাদিকে ভালবাসি।

২

তোমার যত্ন, তব শুশ্রূষা
আজ বুকে করে ভিড়,
জননীর পরিচারিকা যে তুমি
অর্দ্ধ শতাব্দীর।
যাতে হাত দিতে তাই পরিপাটী,
তক্‌তকে সব—ঝরঝরে বাটী,
সবই নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কান্তি
মোদের গৃহশ্রীর।

৩

তোমার চিতায় গড়িতাম মঠ
থাকিলে প্রচুর ধন,
দাসীর শ্রাদ্ধে 'দান সাগরের'
করিতাম আয়োজন।
তোমার স্নেহের হ'ত প্রতিদান
যোগ্য তোমার দেওয়া হ'ত মান,
কৃতজ্ঞতায় শুধু করি আজ
শ্রদ্ধাই নিবেদন।

মানদা অত্যন্ত সাহসী স্ত্রীলোক ছিল—তাহার মা সড়কী করিয়া বনশূকর মারিয়াছিল, দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল।

আমি গ্রামের যাঁহারা কর্ত্তা, যাঁহারা গৌরবের—তাঁহাদের কথা লিখি নাই। আমার এ রেখাচিত্র তাঁহাদিগকে সম্যক মর্য্যাদা দিতে পারিবে না।

মৃত-জীবন

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

রেল ষ্টেশনের কাছেই গাঁয়ের ছোট ডাকঘর। বিকেলবেলা অনাদি সেখানেই গিয়েছিল। কলকাতা থেকে কতকগুলো দরকারী কাগজপত্র আসবার কথা। তারই খোঁজে কদিন ধরে সে একবার করে এখানটা ঘুরে যায়। ফেরার পথে সরকারী দিঘীটার ধারে প্রকাণ্ড জাম গাছটার ছায়ায় বসা একদল লোককে সে অন্যমনস্কভাবে প্রায় অতিক্রম করেই আসছিল। হঠাৎ একটা বিকৃতকণ্ঠ পেছন থেকে আহ্বান করলে—বাবু!

ফিরে তাকাতেই একটা জীবন্ত কঙ্কালের সাথে মুখোমুখি হয়ে গেল। অনাদির সামনে হাতটা মেলে ধরে সে একটা পত্রহীন শুকনো গাছের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোটরাগত দুটো চোখের দৃষ্টি কিছুটা লুব্ধ—কিছুটা বা ভিক্ষার মিনতিতে করুণ। অনাদি এবারে গাছের ছায়ায় জমায়েৎ ছোট দলটীর দিকে তাকাল। মেয়ে, পুরুষ, শিশু—সকলেরই এই অবস্থা। সবাই অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে তার পানে। দৃষ্টিতে তাদের কিছুটা যেন আশা, কিন্তু ভরসা বিশেষ কিছু নেই।

অনাদি প্রশ্ন করলে—কোত্থেকে এসেছ তোমরা সব?

যেন কথাবলার শক্তি নেই, ইচ্ছেও নেই তেমন—এমনি সুরে লোকটা বললে—কত জায়গায় ঘুরলাম বাবু পোড়া পেটের জন্যে—কিছু মেলে না।···বিকৃতভাবে দাঁতগুলো একবার সে বের করলে। হাসবার, না কাঁদবার ভঙ্গি সেটা বোঝা গেল না। বললে—তারপর এইখেনে এসুম।··· হাতটা সে সর্ব্বক্ষণ তেমনিই প্রসারিত করে রইল—যেন এই তার স্বাভাবিক অবস্থা।

অনাদি বললে—তা এখেনেই বা কী সুবিধে হবে বলো! এ গাঁয়ে কে তোমাদের খেতে দেবে? কেউ না হয় দু' একটা পয়সা ফেলে দিয়ে গেল, কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না।

ততক্ষণে দলের ভেতর থেকে আর একটা লোক উঠে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সে স্পষ্টই কান্নার সুরে বললে—কা করি বাবু? কোথা যাই?

অনাদি বললে—আমাকে কী করতে বলো?

কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললে—বন্দুক নেই আপনার কাছে—পিস্তল? মেরে ফেলতে পারেন না আমাদিকে?

অনাদি বললে—এ গাঁয়ে একমাত্র অতুল চক্রবর্ত্তী তোমাদের উপায় করতে পারে। তাঁর কাছে টাকা আছে—বন্দুকও আছে।

—আমরা তো তাঁর বাড়ী চিনি নে।

—চেনো না তো আমি কী করব?—ভ্রূ দুটাকে ঈষৎ কুঞ্চিত করে অনাদি বিরক্তি প্রকাশ করলে। অবশেষে বললে—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে, বাড়ী দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেখানে গিয়ে যেন আবার আমার নাম কোরো না বাপু!

দূর থেকে অনাদি অতুল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীটা দেখিয়ে দিলে। তারা সেদিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে ডাক দিয়ে অনাদি বললে—খুব তো এগিয়ে চললে। কিন্তু দরোয়ান কি তোমাদের ঢুকতে দেবে ভেবেছ? গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করবে।

—তাহ'লে!—লোকগুলো হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আমি তার কী করতে পারি?—অনাদির ভ্রূ দুটী আবার একটু কুঞ্চিত হল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ নীরবতার পর বলিল—আচ্ছা, তোমরা দাঁড়াও এখানে। আমিই যাচ্ছি।

কলকাতায় অতুলবাবুর মস্ত মদের ব্যবসা। ছেলেরাই সব দেখাশোনা করছে। অতুলবাবু শেষ বয়সে দেশের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। দীর্ঘ-জীবনে সুখ-সুবিধা সব কিছুই পেয়েছেন তিনি। ইদানীং চিন্তা ভাবনা তার ইহজীবন অতিক্রম করে পরজীবনের পানে ধাওয়া করেছে। বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারটায় জাঁকিয়ে বসে তিনি বিকেল-বেলার চা পান করছিলেন, এমনি সময় অনাদি গিয়ে প্রবেশ করল। অতুলবাবু গোঁফজোড়ার ফাঁকে অল্প একটুখানি হেসে বললেন—অনাদির খবর কী? শুনলুম খুব নাকি সভা-সমিতি করছ। তোমাদের বয়সে অমন পাগলামি আমরাও করেছি হে।

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অনাদি বললে—আসবার বেলা দেখলুম আপনার বাগানের দক্ষিণদিকে একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ওখানে কী হবে?

দামী শালটাকে কোলের ওপর আর একটু টেনে নিয়ে অতুলবাবু বললেন—আমার সমাধি মন্দির তৈরী হচ্ছে ওখানে। মরে গেলে ছেলেরা কী করবে কী জানি! তাই নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি!

আশ্চর্য্য হয়ে অনাদি বললে—মস্ত জায়গা নিয়ে ভিৎ গাঁথা হয়েছে দেখলুম। প্রকাণ্ড বাড়ী হবে তাহ'লে। আমি তো ভেবেছিলাম ধর্ম্মশালা-টালা কিছু তৈরী করছেন দুঃখাদের জন্যে।

—ধর্ম্মশালা না হলেও ধর্ম্মস্থান হবে বৈ কী! রাধাগোবিন্দের প্রতিষ্ঠা করে যাবো ওখানে। তা খরচা তোমার গিয়ে অনেকটাই পড়বে, বুঝলে অনাদি।

—কিন্তু একটা সমাধি মন্দিরের জন্যে অতখানি জায়গা—

—কেন নয় শুনি। বেঁচে থেকে এত জায়গার অধিকারী, আর মরার পর অতটুকু জায়গা অধিকার করতে পারবো না? মৃত্যুর পর সবাই যে আমায় অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দেবে সে আমি হতে দেবো না। আমার একটা প্রতিকৃতি তৈরী করবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি। কিন্তু একটা বড় সমস্যায় পড়ে গেছি হে।

—অগুন্তি টাকা আছে, তার আবার সমস্যা কিসের? অনাদি কথাটা বলে অতুলবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

অতুলবাবু খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জবাব করলেন—সমস্যা আর কিছুই নয়, ভাবছি যে কোনো একজন নামজাদা শিল্পীকে দিয়ে আমার একটা অয়েলপেন্‌টিং (oilpainting) করিয়ে নেবো—না, কোনো বিখ্যাত ভাস্করকে ফরমাস দেবো আমার পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করতে।

অনাদি কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। জীবিত থেকে ইনি বহু মানুষের জীর্ণ বুকের ওপর অত্যাচারের যে সিংহাসন স্থাপনা করেছেন মৃত্যুর পরও তা থেকে অবতরণ করতে চাইছেন না কিছুতেই। মরে গিয়েও বেঁচে থাকবার স্বপ্ন দেখছেন ইনি; তাই যারা বেঁচে থেকেও মরে আছে তাদের কথা এঁকে শোনানো নিষ্ফল। উঠে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আমি চলি, শিল্পী আর ভাস্কর কাউকেই বাদ দিয়ে কাজ নেই।—বলেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে এলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অপেক্ষমান বুভুক্ষুদের চেহারা প্রেতমূর্ত্তির মত বীভৎস দেখাচ্ছিল। অনাদি এসে কাছে দাঁড়াতে বললে—কিছু হল না।

একটী নারী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল। কোনো একটী শিশু কাঁদতে লাগল ক্ষীণস্বরে।

—কী হবে তবে বাবু? কী করব আমরা?

—একটা কাজ করতে পারবে?—অনাদি ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল তার চোখের তারাদুটো।—আজ রাতে দল বেঁধে চড়াও হতে পারবে অতুল চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে? ডাকাতি করতে পারবে? আমি তোমাদের লাঠি দেবো—অস্ত্র দেবো—পথ বলে দেবো।

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনাদির দিকে—টু-শব্দটী করলে না।

—কেমন পারবে?

—না বাবু না; আমরা গরীব কিষাণ, চোর ডাকাত নই।

অনাদির চোখের আগুন এক মুহূর্ত্তে নিভে গেল। নিস্তেজকণ্ঠে সে বললে—তা হলে আমি আর কী করতে পারি!

—আপনি দয়া করে আর একবার যান। ওকে বুঝিয়ে বলুন।

মুহূর্ত্তকাল নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি, তারপর সহসা অদ্ভুতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের অতুলবাবুর বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুচোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল।

অনাদিকে ফিরে আসতে দেখে অতুলবাবু একটু বিস্মিত হলেন, বললেন—ব্যাপার কী? আবার কী মনে করে?

সোজাভাবে দাঁড়িয়ে অনাদি বললে—আপনার কাছে কিছু চাইতে এসেছি।

—কী? সমিতির চাঁদা? আমি তো তোমায় অনেকবার নিষেধ করে দিয়েছি। ও-সব ছেলেমানুষির মধ্যে আমায় পাবে না।

—আমি চাঁদা চাইতে আসি নি।

—তবে? কী চাইতে এসেছো তবে?

অতুলবাবুর দিকে আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনাদি পরিষ্কার কণ্ঠে বললে—আপনার বন্দুকটা।

স্বরাজ ও সংগঠন

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ

আজ ভারতের স্বরাজের আশা জাগিয়াছে। কিন্তু আলো ও আঁধারের খেলার মত এ আশার সঙ্গে আশঙ্কার যোগও কম নহে। আলো-আঁধারের সম্মিলন প্রভাতে ও প্রদোষে প্রায় সমভাবেই ঘটিয়া থাকে, এক সূচনা করে আলোকময় দিনের, অন্যটি অন্ধকারময় রজনীকে ঘনাইয়া আনে। আজ আশা ও আশঙ্কার দ্বন্দ্বে আমরা কোন্ দশায় উপনীত হইব জানি না, সন্দেহের দোলায় কত দিন দোল খাইব, তাহাও বলিতে পারি না। যদি আশা ফলবতী হয়, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনা যদি সিদ্ধি মণ্ডিত হয়, তাহা হইলেও বলিব—ইংরাজের দয়াদত্ত স্বরাজ যে মূর্ত্তিতে আজ ভারতে দেখা দিবে, তাহা প্রকৃত স্বরাজ নহে, অতঃপর প্রকৃত স্বরাজ অর্জ্জন করিতে হইবে। স্বরাজ দানলভ্য সামগ্রী নহে, অধিকার করিবার বস্তু।

১৯০৫ সাল হইতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনুগামী জনসঙ্ঘ মাতৃভূমির পরাধীনতা-নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অহিংসার আশ্রয়ে কারাবরণ করিয়াছেন ও সর্ব্বস্ব বলি দিয়াছেন। অনেকে মনে করেন—এই আত্মত্যাগ-তপস্যা বিশেষ ; তপস্যার ফলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হৃদয়ে এমন কোন প্রেরণা দিন বা তাঁহারই সর্ব্বশক্তিময়ী ইচ্ছায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে এমন ঘোরাল করিয়া তুলুন, যাহাতে স্বরাজ-ফলটি আমাদের করতলগত হয় ; অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এরূপ চিন্তা যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হইতেছে, তাঁহারা মুখে না বলিলেও অন্তরে বুঝিতেছেন যে,—অহিংস সাধনা স্বরাজ-অর্জ্জনের পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। এই জন্যই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের গাত্রে ঘর্ম্মোদ্রেক হইতেছে না। একমাত্র নেতাজী ইহা উপলব্ধি করিয়া যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের প্রভুদিগের একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন নেতাজীর অমর-কীর্ত্তি। হিন্দু মুসলমানের মিলনভূমি এই বাহিনীতে উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘনীয় কি হইতে পারে? সে সংগ্রামে সফলতা লাভ হয় নাই সত্য, কিন্তু ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় ত' আজকার কথা নহে। আট শত বৎসর ব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ—জয় পরাজয় ও পরস্পরের প্রতি বৈরিতা হইতে যে বিদ্বেষ-হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল—তাহা আজাদী হিন্দ্ ফৌজের অমৃতময় সংগঠনে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ভাবী সাফল্যের সোপান প্রস্তুত হইতেছিল। আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের মুসলমান সেনাপতির যেদিন দণ্ডাদেশ হয়, তৎপরবর্ত্তী দুইটি দিনে হিন্দু-মুসলিম মিলিত ধর্ম্মঘটের প্রভাবে শ্বেতাঙ্গ-নর-নারীদের হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। একদিন দুইদিনের মিলনেই কলিকাতা ও সহরতলীতে যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতেই বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, হিন্দু মুসলমান মিলন ভারতের শুভদিন সূচনা করিলেও ব্রিটিশ শাসনের কালরাত্রি ডাকিয়া আনিবে। এ মিলন কি ব্রিটিশ সহ্য করিতে পারে? তাই পক্বমস্তিষ্ক চার্চ্চিল সাহেব প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ লীগ নেতার সহিত ষড়যন্ত্র রচনা করিতেছিলেন বহুদিন হইতে। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৯৩৪ সালে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন-বিধান রচনা করা হয়, তাহাতেই এই চক্রান্তের বীজ উপ্ত ছিল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব স্পষ্ট করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।* যতদিন না স্বরাজের টোপ ফেলা হইয়াছিল, ততদিন মুসলিম-লীগের গাত্র উত্তপ্ত হয় নাই। কূটনীতির বড়িশায় স্বরাজ-টোপ এমন ভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইল, যাহাতে লীগভুক্ত মুসলিমগণ উত্তেজিত এবং কংগ্রেসকে প্রলুব্ধ করা হইল। উভয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে স্বরাজ-টোপ এখনও ঝুলিতেছে—কিন্তু এই টোপ গিলিবার পূর্ব্বেই এক সম্প্রদায় অপরের মাংসশোণিত ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল—এখন স্বরাজ—"ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ" বহু ব্যবধানে পড়িল! আজ মুসলিম-লীগ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের হাতে ক্রীড়া পুত্তলী শুধু নহে—তাঁহাদের জয়পতাকা বহনের স্তম্ভ স্বরূপ।

শাশ্বত বিশ্ব ধর্ম্মের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি—কুসংস্কার হিন্দুকে দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছে। আজ মনে হয়—লীগপন্থী মুসলমানগণ ত' ঐ সকল কুসংস্কারের ধার ধারেন না, অথচ ব্রিটিশ গোলামীর উপর এত অনুরক্ত কেন? শুধু ব্রিটিশের পদতলে পড়িয়া থাকা নহে, তাহাদের ইঙ্গিতে মুক্তিকামী প্রতিবেশী-দিগকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিতেও অনুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, নারীধর্ষণ, শিশু হত্যা, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিপ্রদান—তদুপরি বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরীকরণ—ইহা যে কোন্ ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করে—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম! ইহার বাহিরে 'অধর্ম্ম' নামক কোন বস্তু আছে কি? বিশ্ব ধর্ম্মের শাশ্বতরূপ যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা

---

* In November 1934, General Sir Henry Page-Croft said: If the white paper goes through, our rule ceases. And India will pass permanently under the control of Hindus dominated by Brahmanism. Inevitably the precepts of Christianity will have to make way for Hindu ascendancy.

হয়,—লীগপন্থীদের ধর্ম্মের মর্ম্মস্থান কোন্‌টি? 'মমাজ' মাত্র করিলে বা ভগবানের নামে মাটীতে মাথা ঠেকাইলেই যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ শাসনে মমাজকারী চোর ডাকাতের শাস্তি প্রদান হইত কেন?

বাঙ্গলার বুকের' উপর যে বীভৎস তাণ্ডব চলিয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম হইবে ইহাই যে,—হয় প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী মুসলমানগণ লীগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেন, না হয়, সমগ্র মুসলিম সমাজ অধঃপাতের নিম্নস্তরে ডুবিয়া যাইবে।

সেকালের রাজগণ রাজ্য লুণ্ঠন করিতেন শুনা যায় বটে, কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অত্যাচারের কাহিনী অতি বিরল। শিবাজী মহারাজের সম্মুখে এক সময়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে এক সুন্দরী রমণী উপস্থিতা হইয়াছিলেন, শিবাজী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া সম্মানিত ও যথাস্থানে প্রেরিত করিয়াছিলেন।

আজ ব্রিটিশের কূটনীতিতে ভুলিয়া মুসলমানগণ হিন্দু ধ্বংস করিতে যতই উদ্যোগী হউন না কেন,—একটা জাতিকে নিঃশেষ করা সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ মুসলমানগণ নিজ রাজত্বকালেও যে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই—আজ পরকীয় বুদ্ধি পরিচালিত পরাধীন মুসলিম সেই জাতিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবে,—ইহা স্বপ্নমাত্র!

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার জ্যোতিঃ যাহাদের উপাস্য—'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'—ইহা যাহাদের নিত্য পাঠ্য—তাহাদের সাময়িক অবসাদ আসিলেও ধ্বংস হইতে পারে না। আচার নিয়ম-নিষ্ঠা কুসংস্কার নহে, আত্মলাভের উপায় মাত্র, এই বোধ বিরহিত হইতেই হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের স্বরাজ—'স্বেন রাজতে'—আত্ম বোধকে কেন্দ্র করিয়া পুনরভ্যুত্থান। আমাদের সংগঠন—আত্মানুভূতির মধুরতা সর্ব্বত্র সঞ্চারণ। কাপুরুষতা, ভীরুতা, অবসাদ বিদূরিত করিয়া তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও উৎসাহের উৎস বিকাশ করিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্ম কখনও কাপুরুষতার প্রশ্রয় দেয় নাই। এই ধর্ম্মের সেবা করিয়াই প্রতাপ, শিবাজী, রণজিৎ, বাজীরাও প্রভৃতি বীরবৃন্দ পরাধীনতার যুগেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের ক্রোড়ে লালিত হইয়াই নেতাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন—

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।

স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি॥ অষ্টম অঃ।৩৪৬

যে রাজা দস্যুতা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যকারী ব্যক্তিকে বা সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করে সে সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং প্রজাদিগের বিদ্বেষের পাত্র হয়। রাজা নিজের মিত্রত্ব লাভের জন্য বা বিপুল ধনাগমের আশায় সমস্ত জনগণের ভয়াবহ সাহসিক (Criminals) দিগকে কখনই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবে না। ৩৪৭

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে

দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥

আত্মনশ্চ পরিত্রাণে * * * *

স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণঘ্নন্ ন দুষ্যতি॥ মনু, ৮ম অঃ ৩৪৮।৩৪৯

যেখানে ধর্ম্মের উপর আঘাত আসে—সেখানে দ্বিজাতিগণও শস্ত্র ধারণ করিবে। দ্বিজাতি এবং সমস্ত বর্ণের উপর কালকৃত বিপ্লব (ব্যাপক অত্যাচার) ঘটিলে—রাজা না থাকিলে বা রাজা নিজ কর্ত্তব্য না করিলে ব্রাহ্মণও আত্মত্রাণার্থ, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণ্য রক্ষার্থ (আততায়ীকে) হিংসা করিলে দোষভাগী হইবে না। এই স্থানে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—"রাজার ব্যতিক্রম ঘটিলে এবং যুদ্ধ আরব্ধ হইলে ব্রাহ্মণের পক্ষেও শস্ত্র গ্রহণীয়। সেইরাজ্যে রাজাই রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রতি ব্যক্তিকে আটকাইতে পারেন না, এমন কতকগুলি দুরাত্মা থাকিতে পারে, যাহারা বলবান্ রাজপুরুষকেও পীড়া দেয়, কিন্তু শস্ত্রধারিদের ভয় করে, এ জন্য সর্ব্বকালের জন্যই শস্ত্র ধারণ করা উচিত। (সার্ব্বকালিকং শস্ত্রধারণং যুক্তম্।) শুধু গ্রহণ নহে, শুধু ভয় দেখাইবার জন্য নহে, হিংসা পর্য্যন্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পরের আক্রমণের জন্য এ বিধান নহে—কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য।

সমস্ত হিন্দুর মধ্যে আজ হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা বুঝাইয়া দিতে হইবে। আততায়ী ব্যক্তিকে বধ করিলেও অহিংসাধর্ম্মের হানি হয় না। 'নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন। প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি।' ঐ ঐ ৩৫১।

আততায়ীকে বধ করিলে বধকর্ত্তার কোনও দোষ হয় না। প্রকাশ্য ভাবেই হউক বা অপ্রকাশ্যভাবে হউক,—সেস্থলে ক্রোধের অধিদেবতা ক্রোধকেই প্রাপ্ত হন। এজন্য বধকারীর দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত বা অধর্ম্ম কিছুই হয় না। হিন্দু কখনও অপরকে আক্রমণ করিতে দেশান্তরে যায় নাই, নিজ ধর্ম্মের বোঝা জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপায় নাই, এবং আজও সে তাহা করে না বলিয়া সেই সুযোগ অপর সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ হিন্দুকে জগতে দেখাইতে হইবে—পরকে আক্রমণ না করিলেও পরের আক্রমণকে সে ব্যর্থ করিতে পারে, ইহাই সংগঠনের প্রয়োজন।

এই সংগঠনকে অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর প্রধানভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দু সমাজ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের চির-উপাসক। এই ধর্ম্মের প্রাণ হইল—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং দেহ হইল অর্থনীতি। অধ্যাত্ম-বাদ ও অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়াই আজও হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এক একটি হিন্দু সংহতি (communism)কে জাগাইয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের সমাজের সমস্ত অবয়বগুলি আজ উপেক্ষিত হইয়াছে; সমাজের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিত যাহারা, তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কুম্ভকার মাটীর পাত্র যোগাইত—সেখানে আসিয়াছে বৈদেশিক এলুমিনিয়ামের পাত্র; গোপ ঘৃত দুগ্ধ সরবরাহ করিত—তাহার স্থানে আসিয়াছে বনস্পতি ঘৃত ও বহুবিধ মল্‌টেড মিল্ক; আমাদের বস্ত্রশিল্প তন্তুবায় সংহতির হস্তে ছিল, আজ বৈদেশিক যন্ত্র-পঙ্ক মধ্যে সে শিল্প নিমগ্ন হইতে বসিয়াছে। তৈলকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার,—

বেণুজীবী এ সকলকেই আহার দিতে হইবে। এই আহার দিবার সুসমঞ্জস বিধানই আমাদের হিন্দুদিগের সামাজিক সংগঠন। যদিও আজ চতুর্দ্দিকে দেবমন্দির খুলিবার ও পরস্পর পানভোজনাদির প্রবর্ত্তন হিন্দু-সংগঠনের উপায় বলিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু ইহাও পাশ্চাত্য জাতির নিকট হইতে দেড়শত বৎসরের শিক্ষাগ্রহণের ফল। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন,—

In my opinion, the idea that interdining or intermarryiny is necessary for national growth, is a superstition borrowed from the west. Eating is a process just as vital as the other sanitary necessities of life. (young India "Caste-system") আমার মতে—সহভোজন ও সহবিবাহ দ্বারা জাতীয়তা বৃদ্ধি পায়, ইহা পাশ্চাত্য দেশের ধার-করা ভ্রান্তধারণা। ভোজন—স্নান শৌচাদির মতই জীবনধারণের অতি-প্রয়োজনীয় (ব্যক্তিগত) ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ ছোট-বড় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে এবং সে মর্য্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈতৃক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুলভতম তাহা পালনেই তাহার গৌরব, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা। এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।

*　*　*　*　*

ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রাখা হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে। বড়দের অনাত্মীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে,—সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পর আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়ীতে শ্যামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থির নিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগলামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত এবং সেই বৃথা চেষ্টায় সে বারবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। ('মর্য্যাদা')

বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়, এইজন্য য়ুরোপে পলিটিক্‌স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজ বহির্ভুক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি, কোনো আপত্তি করি নাই। (স্বদেশী সমাজ)

প্রকৃতপক্ষে—আমাদের সামাজিক সংগঠন ছিল বিশ্বের আদর্শ। আজ চাষীর চাষ নাই, কৈবর্ত্তের হাতে নৌ-বিদ্যা নাই, বাগ্‌দি নমঃশূদ্রাদির হাতে লাঠি সড়্‌কী নাই, চর্ম্মের কাজে চর্ম্মকারের শিক্ষা নাই, সকলকেই আমরা 'বাবু' করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। দেশের জমি পরহস্তগত, শস্য ফল-ফুল পরকীয় হস্তে তুলিয়া দিয়াছি—নৌকার মাঝি ও সারেঙ্গের কাজ অধিকাংশই আমাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিজেদের চিরন্তন মর্য্যাদার অমর্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি। এক্ষণে প্রয়োজন—পুনঃ সংগঠন। ভারতের প্রত্যেক হিন্দু তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় বাবদে হিসাব করিয়া দেখিতে চেষ্টা করুন,—ভারতের অর্থ—হিন্দুর অর্থ—আমাদের নিজজনের হাতে অধিক পরিমাণে যায় কিনা।

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ। (মনু ১০ম অঃ)

সমর্থ ব্যক্তি পরজনকে দান করিতেছেন, অথচ স্বজন দুঃখে প্রাণধারণ করিতেছে, সে দান আপাতমধুর: পরিণামবিষময় ধর্ম্মাভাসমাত্র, ধর্ম্ম নহে।

দেশের কোটি কোটি টাকা আজ বিদেশে যাইতেছে—তাহার আকর্ষণও স্বজনগণের মধ্যে সঞ্চারণ করাই হইল এখন সংগঠনের প্রধান উপায়।



পণ্ডীচেরী আশ্রম

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

আশ্রম বলতেই সাধারণত লোক মনে করে ইহ-বিমুখ, কর্ম্মবিহীন ধ্যান, মৌনী, বৈরাগী এবং সন্ন্যাসীর আস্তানা। শতকরা নিরানব্বই জনের এ ধারণার মাঝে আমার চিন্তাধারাও ছিল লুকিয়ে। কিন্তু পণ্ডিচেরীর পথে যেদিন চর্ম্মচক্ষু নিয়ে এসে দাঁড়ালাম, সেদিন আমার সমস্ত কল্পনা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে ফিরলো বাস্তব সত্যের দৃঢ় প্রকাশে। আশ্রমের প্রচলিত সংজ্ঞা আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। দেখলাম এ আশ্রমের বৃহত্তর ও পৃথক সংজ্ঞা। বিভিন্নমুখী বিপুল কর্ম-প্রবাহের যে স্রোত এখানে প্রবহমান, তারই সীমান্তে দাঁড়িয়ে তারই প্রাণস্পন্দন অনুভব করা কর্ম্মকল্পনা নয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "মহামানবের সাগর তীর" যেন সার্থকরূপী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ আশ্রমের প্রতিকক্ষে।

রকমারী জাতের সমাবেশে পণ্ডিচেরীর আশ্রম আজ পৃথিবীর তীর্থে পরিণত হয়েছে। এ উন্মুক্ত সাগর সঙ্গমে ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানা-বর্ণের মানব-নদী এসে মিলিত হয়েছে কোন্ এক মহাসাধনার মহাক্ষণকে স্মরণীয় করবে বলে কে জানে।

এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র কর্ম কোলাহল নেই। মনে হয়, বিশ্বপ্রকৃতির যে নীরব নিপুণ ছন্দে ভোরের কুসুম ফোটে, পূর্ব্বাকাশে সূর্য ওঠে, নদী বয়ে চলে—এখানকার সকল কাজও যেন সে উদার অনন্ত নিবিড় ছন্দে বাঁধা। সংসারে অবশ্য কর্ম ও কর্মময় প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। কিন্তু এ আশ্রমের যথেষ্ট বৈশিষ্ট রয়েছে বলেই এ সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উর্দ্ধে। এখানকার কর্মানুষ্ঠান অন্যান্য কর্ম প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বত্র সাধক সাধিকারা বিভিন্ন বিভাগে নীরবে আপন আপন কাজ স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন করে চলেছে। এখানে কেবল কাজের জন্য কাজ, কেউ আকাঙ্ক্ষা করে না; সকলেই এখানে কাজ করে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের উপায় হিসাবে। তারা কর্মকে গ্রহণ করছে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও পূর্ণযোগের এক বিশিষ্ট অঙ্গ কর্মযোগ হিসাবে। কুরুক্ষেত্র সমরক্ষেত্রে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ ধনুর্দ্ধর পার্থকে উপলক্ষ করে যে যোগের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আজও অবহেলিত অথচ যার সাধনা ও সিদ্ধি ভিন্ন মানবজাতির ও মানবজীবনের মূল সমস্যা সমাধানের অন্য পথ নেই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি—আশ্রম বলতে লোকে যা ভাবে, কর্ম-বিমুখ, মানবসমাজত্যাগী, সাধু সন্ন্যাসীর আখড়া—এ তা মোটেই নয়। কর্মপ্রবণ বাস্তব পৃথিবীরই মতো এখানে রয়েছে আশ্রমের তাঁতশালা, কামারশালা, রুটির কারখানা, গোশালা, ছাপাখানা, বই বাঁধানোর কারখানা, ছেলেমেয়েদের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক রুচিসঙ্গত বিদ্যালয়, আর আশ্রমের বিরাট সুন্দর পাঠাগার। এখানে রয়েছে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার—বিখ্যাত, স্বনামখ্যাত, অখ্যাত, এমনি কতো প্রতিভা। এ যেন একটা স্বতন্ত্র আত্মনির্ভরশীল রাজ্য। মানুষের একমাত্র পরিচয় এখানে মানুষ। রিয়ালিটি বা বাস্তববাদের এত সম্পূর্ণ চেহারা আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না। আশ্রমবাসীদের মর্যাদা ডিগ্রীর তৌল বা পরিমাণে নয়—আপন সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশে। তাই জ্ঞানের সীমা কোথাও এর দিগন্ত এঁকে দেয়নি। পণ্ডিচেরী আশ্রমে জাতি, ধর্ম্ম, দেশবিদেশের সংস্কারজনিত কোন ভেদের প্রাচীর নেই,—ধনী দরিদ্র একই পথে মানুষের অধিকারে উন্নতমস্তকে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে,—পৃথিবীতে এ উদাহরণ অসাধারণ।

আরো উল্লেখযোগ্য—এখানকার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও জীবন জগদাতীত ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি নয়;, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির ভেতর দিয়ে পরম সত্যাসুন্দরকে—কল্যাণময় ভগবানকে—সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠা করাই এখানকার উদ্দেশ্য। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"Life is the altar, works our offering, the transcendental will is the Deity" এই কারণেই দেখি এখানে প্রত্যেকটী কাজের প্রতি, জীবনে প্রতিটি ঘটনার প্রতি কি জলন্ত জাগ্রত দৃষ্টি; তাতে জীবনের এবং কাজের কোথাও কোন খুঁত, কিছুমাত্র অপূর্ণতা না থাকে। তাঁরা কাজকে মনে করে জীবনের প্রকাশ, তাই কাজের পরিপূর্ণতার জন্য তাদের এত যত্ন।

পণ্ডিচেরী আশ্রমে নারীজীবনের যে স্বচ্ছন্দ মুক্তির জোয়ার, সারা ভারতবর্ষের কোথাও সে পবিত্র সহজ জীবন যাপনের স্রোতস্বতী নেই, একথা প্রত্যেক দর্শনকামী মানুষই এখানে এসে স্বীকার করে থাকে। মেয়েদের অন্তর জীবন ও বহির্জীবন বিকাশের এমন সর্বাঙ্গীণ সুযোগ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। পৃথিবীর অপরাপর দেশে নারীর স্বাধীকার ও স্বাধীনতার যে সব বিবরণ শোনা যায় কোথাও তা নির্মল নয়; সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। এখানে বাইরের কোন আইন-কানুন, বিধিবিধান বা উপদেশদান নেই। কিন্তু তবুও অন্যখানে হাজারো উপদেশ বিধি বিধান ও বক্তৃতায় যা সম্ভব হয়নি, আপন অন্তর তপস্যায় এখানে তা সার্থক হয়েছে নির্বিরোধে। প্রশ্ন জাগে—"কি করে এ সম্ভব হ'ল এখানে।" মনের মধ্যেই উত্তর পাই—"তারা যে মানব জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শকে আপনার

করে নিয়েছে।" এই আদর্শই পরোক্ষে, প্রত্যক্ষে সহজ স্বাভাবিকভাবে এসব সম্ভব করে তোলে। সর্বোপরি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মাতৃশক্তি ও গুরুশক্তি রয়েছে এখানকার সহায়।

আশ্রমে চেয়ে অস্তির উপর জোর অধিক। তাঁরা বরণীয়কে বরণ করে চলেছেন বর্জনীয়কে দুই পায়ে মাড়িয়ে। অবরেণ্য জীর্ণ পত্রের মত ঝরে পড়ছে, নূতন গুণ সামর্থ্য ও ভাবরাজী এসে সত্ত্বাকে ও স্বভাবকে অধিকার করছে।

সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন সৌরজগৎ, তেমনি আশ্রম অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমায়ের স্নেহাঞ্চল ছায়ায় এই আশ্রম। রহস্যভরা বিশ্ব দেখে যেমন বিশ্বজননীকে স্মরণে জাগে, সেরূপ আশ্রমের প্রতি গৃহ, ফলফুল ভরা প্রতিটি বাগান, প্রতি বস্তু ও প্রত্যেকটি মানুষকে দেখে আশ্রম জননী শ্রীমাকে মনে জাগে। অপরূপ লাবণ্য ও কল্যাণময়ী নারী সহস্র জীবনের পরতে পরতে মাতৃস্নেহ স্পর্শের যে কণিকা বিলিয়ে জগন্মাতার মতো প্রকাশিত হয়েছেন,—সে মাতৃত্ব অপার্থিব বলেই ঝরণাধারার মতো বেগবতী। এই এক মাতৃশক্তিকে কেন্দ্র করে, মায়ের অভয় বাণীর অন্তরালে এক একটা স্ফুলিঙ্গের মতো পণ্ডিচেরীর গোপন কক্ষে যে নতুন মানবযাত্রীদলের প্রস্তুতি চলেছে, অনন্তকালের ইতিহাসে এরাই হয়তো স্মরণে থাকবে জ্যোতিষ্কের মতো। পৃথিবীর কাছে তারাই দিয়ে যাবে ভারতবর্ষের একক অনুভূত সত্যের মর্মবাণী। তাই আশ্রমের প্রত্যেক নরনারী এক মাতৃবাণীকে ধ্রুব করে এগিয়ে চলেছে। শ্রীমা বলেছেন "হে আমার পুত্রগণ, তোমরা মাতার সন্তান হও।" মাতার পুত্র হবার অদম্য সাধনাই যেন চলছে এ নির্জন সমুদ্র তীরে—বিশ্বজগতের অনন্ত কোলাহলের আতিশয্যকে পশ্চাতে ও একান্তে রেখে। কোলাহলের আড়ালেই এরা কর্মী হয়ে উঠেছে। এই স্বপ্নময়ী মায়ের সার্থক স্বপ্নের জয় হবেই, প্রতিষ্ঠা এর হবেই, তবেই পৃথিবীতে সম্ভব হবে শাশ্বত শান্তি, সত্যকার মঙ্গল।

ভগবান শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের অপেক্ষমান একটি মুহূর্ত অনুপম। উপনিষদের এ আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে দেখে মনে হোল তাঁরই তপঃস্পৃষ্ট আশ্রমের বিপুল গতিপ্রবাহ তাঁরই প্রগাঢ় প্রশান্তিতে বিধৃত। জয় হবেই, এ মহান পুরুষের জয় হবে তাঁরই কল্পিত ভারতবর্ষে। ভারতের অশ্রুমূর্তি এ তপস্যার আগুনে আহুতি স্নানে সার্থক হ'য়ে উঠবেই। পৃথিবী মাঙ্গলিক রচনার ভার নেবে ভারত মাতার সে বিজয় গৌরব উৎসবের। কবি প্রাণের সে সফল বাণীতেই জগত আত্মা জেগে উঠবে। বলবে,—"অরবিন্দ, জগতের লহ নমস্কার!"

নীলাচলে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শুনি ও কান্না কার?
বেদনা মাথান কাঁদনে কাঁপিছে নিশীথ অন্ধকার;
আকাশের চোখে বাষ্প ঘনায়ে আসে;
তারকা-নয়ন আবরিয়া তার কাহার দুঃখ ভাসে?
একাকী গোপনে গম্ভীরা-মাঝে কোন্ বিরহিণী নারী
দূরতর তার দয়িতের লাগি ফেলেছে নয়ন-বারি?
ভুবন বিথারী মর্মবিদারী ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
পৃথিবী-পবন মন্থর তার লভিয়া ক্লান্তাভাস!
হৃদয় মথিয়া উঠিতেছে গুরু ব্যথাভরা হাহাকার।
শুনি ও কান্না কার?
দয়িতের লাগি ব্যথা,
গত জীবনের শত দিবসের পুঞ্জিত কত কথা,
আকুতিতে ভরা মিথ্যা আশায় পথপানে চেয়ে থাকা,
দীর্ঘশ্বসিত হসিত-প্রিয়ের স্মৃতি সুরভিতে মাথা,
কাঁদনের মাঝে মুরতি ধরিয়া এসেছে সকলে তারা;
দেখিতে যে পাই এরি কান্নায় বিরহ আত্মহারা!
স্বর্ণ-তনুর আড়ালে লুকান কারে যেন দেখা যায়,
ধূলিধূসরিতা ব্যাকুলা রাধিকা কাঁদে পথ-ধূলিকায়!
পাগলের মত মন্দির-পথে কে ওই ছুটিয়া যায়?
কনকাঙ্গের দ্যুতিতে রাতের তিমির টুটিয়া যায়!
দেউল-তোরণ-তলে
লুটাইছে কার উন্নত তনু সিক্ত চোখের জলে?
পাতালে বহ্নি প্রবাহ যেমন ধরণী ছিন্ন করি
বাহিরিতে চায় অগ্নি-গিরির উন্মাদ-রূপ ধরি,
তেমনি কি ওর অন্তর-মাঝে প্রেমের অগ্নি জ্বলে,
বাহিরেতে চায় দেহ বিদরিয়া আপন পূর্ণ বলে?
যমুনা বলিয়া নীল-জলনিধি কে করে আলিঙ্গন?
চটকের পানে ছুটিয়া চলে কে ভাবিয়া গোবর্ধন?
তমালে জড়ায়ে নিজ বাহু লতিকায়
কৃষ্ণ বলিয়া কে কাঁদিছে ওই গিরি-বন-বীথিকায়?
তরু মর্মরে কে ওই শিহরে চকিত নয়নে চায়,
প্রিয়-পদ-ধ্বনি মনে মনে গণি সেদিকে সহসা ধায়?
সিন্ধুর কূলে আকাশের কোলে হেরিয়া পূর্ণ শশী
চির-বাঞ্ছিত-মিলন-অধীর কে উঠিছে উচ্ছ্বসি'?
মন্থিত কার তন্দ্রা-বিহীন হৃদয়ের পারাবার?
শুনি ও কান্না কার?

কলিকাতার আশেপাশে বাসগৃহ সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে বিভক্ত হওয়ায় উভয় অংশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে তীব্র ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই আতঙ্কজনিত দুর্ভাবনায় পূর্ব্ববাঙ্গালার সহস্র সহস্র হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এইভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাসস্থান পরিত্যাগ করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইবে বলিয়াই মনে হয়, কারণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কতকগুলি লোক এইভাবে পলাইয়া আসিবার সুযোগ পাইলেও বহু হিন্দুকে পূর্ব্ববঙ্গে বাধ্য হইয়া থাকিয়া যাইতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে লোক কমিয়া যাওয়ার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে নিঃসন্দেহে অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া ভীড় বাড়ান সমর্থন করা যায় না। তবে নীতির দিক দিয়া এই অসমর্থনের কথা তুলিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেদের এত অসহায় ও বিপন্ন বোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের পলায়নপর মনোবৃত্তিকে নিন্দা করার অর্থ তাঁহাদের একান্ত ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ণ করিয়া তোলা। এইরূপ যাঁহারা এখন পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জন্য না হইলেও অনেকের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে জায়গা খুঁজিয়া দিতে হইবে। যাঁহারা প্রকৃত অবস্থাপন্ন, টাকার জোরে তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই ; কিন্তু এই ধরণের জনকতক বড়লোককে বাদ দিলে আর যাঁহারা আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই অল্পসল্প পুঁজি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থানের ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্ন অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে হইতেই পশ্চিম বাঙ্গলায় বাসগৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। জমি ও বাড়ীর দর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি এই সঙ্কটজনক অবস্থার প্রধান কারণ। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পর গত ৮ বৎসরে দেশে যথেষ্ট লোক বাড়িয়াছে, অথচ নূতন বাড়ী ঘর বলিতে গেলে মোটেই তৈয়ারী হয় নাই। যুদ্ধকালীন অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নূতন এক বিত্তশালী শ্রেণীরও উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ নানাকারণে জমি ও বাড়ীর চাহিদা সম্প্রতি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে এবং তদনুপাতে মূল্যও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। ইহার উপর বাঙ্গলা ভাগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইতেছেন। ইহাদের অবস্থা করুণ, নিরুপায় হইয়া ইঁহারা সর্ব্বস্ব বিনিময়েও মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহে উৎসুক হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের সহর ও বাসযোগ্য গ্রামগুলিতে জমি বা বাড়ীর মূল্য গত এক মাসের মধ্যেই অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি চাহিদার চাপে সম্ভব হইলেও জমি বা বাড়ীর মালিকদের চোরাবাজারী মুনাফাবৃত্তিও নিঃসন্দেহে ইহার জন্য দায়ী। মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া জমি বা বাড়ীওয়ালাদের অনেকে ভাড়া, সেলামী অথবা জমির বিক্রয় মূল্য হিসাবে বেশ দু পয়সা কামাইয়া লইতেছেন। ভাড়ার জন্য কলিকাতা সহরে তবু 'রেণ্ট কণ্ট্রোলার' আছে, কিন্তু বিক্রয় মূল্য নিয়ন্ত্রণে কোন আইনগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় অবস্থা সর্ব্বত্রই ক্রমে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব্ববঙ্গীয় অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরা তো আয়ত্তাতীত মূল্যের জন্য আশ্রয়স্থল সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া মনোক্ষুণ্ণ হইতেছেনই, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের জমি বা বাড়ীর একান্ত প্রয়োজন, তাঁহাদেরও অসুবিধার সীমা থাকিতেছে না। আজকাল বাড়ী তৈয়ারীর জিনিষপত্রের অভাব এবং অগ্নিমূল্য সর্ব্বজনবিদিত, ইহার উপর জমির ব্যাপারে মুনাফাবৃত্তি এবং চোরাকারবার পুরোদমে চলিতেছে বলিয়া পশ্চিম বাঙ্গলায় (বিশেষ করিয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতার আশে পাশে ২০।২৫ মাইলের মধ্যে) বাসগৃহ সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

এই সাংঘাতিক অবস্থা যে চলিতে দেওয়া যায় না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ জটিল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণও কিন্তু অত্যন্ত কঠিন কাজ। শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার নয়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থবান ব্যক্তিগণ বা ব্যবসাদারেরা সমবেতভাবে এ ব্যাপারে অগ্রসর না হইলে ইহার সমাধান সত্যই আশা করা যায় না।

পশ্চিম বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে জমি বিক্রয় সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্ত্তন করিয়া স্থির করিয়া দেওয়া যে পশ্চিম বাঙ্গালায় অতঃপর যে জমি হস্তান্তরিত হইবে তাহার মূল্য যুদ্ধের আগের হিসাবে কোন ক্ষেত্রেই তিন গুণের বেশী হইতে পারিবে না (মোটামুটি খাদ্য-মূল্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া এই ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে)। এ ছাড়া সরকারের এমন এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টায় কলিকাতাদি সহরের সহরতলী অঞ্চলে বড় বড় জমির দখল লইয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতে পারে। এই ভাবে জমি দখলের জন্য প্রচলিত ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসন এ্যাক্টের বা জমি দখলের আইনের সুবিধা গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। এক সঙ্গে কাজ হইবে বলিয়া এই সব বাড়ী তৈয়ারীর খরচ অনেক কম পড়িবে এবং বিক্রয় করা হউক বা ভাড়া দেওয়া হউক, যাঁহারা বাড়ী দখল করিবেন তাঁহারা লাভবান হইবেনই। এইরূপ ব্যবস্থা যে

লাভজনক তাহা ইতিপূর্ব্বেই এদেশের একাধিক 'বিল্ডিং সোসাইটি' বা 'ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোম্পানী'র সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গলার সরকার যদি এইরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করেন তাহাতে তাঁহাদের আর্থিক লাভ হইবার নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা আছে। অবশ্য এজন্য অনেকগুলি টাকা এখনই বাহির করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গলার সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ বলিয়া মূলধনের সংস্থান অবশ্যই বড় কথা; তবে এইরূপ লাভজনক কারবারের দায়িত্ব যদি সরকার গ্রহণ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে চার পাঁচ কোটি টাকার ঋণপত্র বাজারে ছাড়েন, এখনকার ফাঁপাই টাকার বাজারে টাকা সংগ্রহে তাঁহাদের বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই কারবারে লাভের হার বেশী, ঋণপত্রের জন্য সাধারণতঃ তাহারা যে সুদের হার স্থির করেন, এক্ষেত্রে সে তুলনায় সুদ অনায়াসেই একটু বেশী করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে অর্থবান দেশবাসী এই বিশেষ ঋণপত্রে টাকা লগ্নী করিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনা ইতিহাসে নূতন ব্যাপার নয়। বাঙ্গলা সরকারই ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাকে পূর্ব্বাঞ্চলে বাড়াইবার জন্য অনুরূপ একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ কর্পোরেশন মারফৎ মাদ্রাজ সরকারের এই ধরণের একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হল্যাণ্ডে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ—এই ১৪ বৎসরের মধ্যে যত বাড়ীঘর তৈয়ারী হইয়াছে তাহার শতকরা ৪৮ ভাগ হইয়াছে সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় ও সাহায্যে।

সরকারী প্রচেষ্টার মূল্য ও গুরুত্ব অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের বাসগৃহ সমস্যার সমাধানে অর্থবান দেশবাসীর চেষ্টাও নানাভাবে ফলপ্রদ হইতে পারে। যুদ্ধের আগে জমি বা বাড়ীর বাজার দর যখন অত্যন্ত নীচে ছিল, তখনও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানকে জমির ব্যবসা করিয়া বা একত্রে কতকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিবার পর খুচরা হিসাবে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট মুনাফাভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এখন লোকের হাতে কিছু টাকা হইয়াছে, বাজার এখনও খুবই চড়া, এসময় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বড় বড় জমি সংগ্রহ করিয়া জমির উন্নতিসাধনের পর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বা শুধু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বেচিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন। অবশ্য এইভাবে লাভবান হওয়ার অর্থ চোরাকারবারের মুনাফা-বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া নয়। এভাবে জমি বা বাড়ীর মুনাফাখোরী ব্যবসা যে ইতিমধ্যেই পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক আকারে সুরু হইয়াছে, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। আমরা যে ব্যবসার কথা বলিতেছি তাহাতে ব্যবসাদারদের বা অর্থবান ব্যক্তিদের আশ্রয়হীন দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক বা সরকারী ঋণপত্রে টাকা খাটাইলে তাঁহারা যে হারে সুদ পাইয়া থাকেন, এই ব্যবসায় তদপেক্ষা কিছুটা বেশী মুনাফা ভোগ করিয়াই তাঁহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। টাকা মার খাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অবশ্য সুদের উচ্চ হারের প্রশ্ন উঠে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবসাটি এতই নিরাপদ যে ইহাতে লোকসান হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। দুচারজন বিত্তশালী ও হৃদয়বান ব্যক্তি উৎসাহ করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করিলেই এইরূপ জমি বা বাড়ী কেনা-বেচার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। আজকাল লোকে নিরুপায় হইয়া ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ফেলিয়া রাখে এবং তজ্জন্য সুদ যা পায় তাহা একান্ত নগণ্য। ভাল ব্যাঙ্ক ছাড়া দেশের যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খল অর্থ-নৈতিক অবস্থায় সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখাও এখন এমন কিছু নিরাপদ নয়।

প্রকৃতপক্ষে এখনও কলিকাতার কাছাকাছি পল্লী অঞ্চলে বহু বড় বড় জমি পড়িয়া আছে। এই সব জমির কতকাংশ উন্নত এবং সেগুলির দামও এখন চাহিদার চাপে কিছুটা বাড়িয়াছে, তবে অনুন্নত জমির পরিমাণই বেশী। বেশী টাকা লইয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ অনুন্নত জমির উন্নতিসাধন করা সম্ভব। এই ধরণের জমির ক্রয়-মূল্য নিশ্চয়ই কম এবং বিত্তশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে জমির উন্নতি করিয়া লইলেও কিছু লাভ রাখিয়া এখনও তাঁহারা সস্তাদরেই এই জমি বিক্রয় করিতে পারেন। এই সব জমির মধ্যে খুব বড় জমি থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে জমি ভরাট করা বা জমির উন্নতি করা, ড্রেন রাস্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, এমন কি জলের কল ও বিজলী বাতির ব্যবস্থা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। বি-এণ্ড-এ রেলপথের মেন লাইন ও খুলনা লাইনের মধ্যে, ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজ লাইনের মধ্যে, ই আই আর ও বি এন আর লাইনে কলিকাতার কাছাকাছি ২০।২৫ মাইলের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য বড় জমি পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ই আই আর কর্ড লাইনে ডানকুনির জলার এবং খুলনা লাইনে হাবড়ার মাঠের কথা উল্লেখ করা যায়। এই জমিগুলি উন্নত হইলে এবং এখানে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে সেই সব বাড়ীর বাসিন্দারা অক্লেশেই দৈনিক কলিকাতায় আসিয়া চাকুরী পর্য্যন্ত করিতে পারেন। কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে ১০।১৫ মাইলের মধ্যে (রেলষ্টেশনের একটু কাছে বা বাসপথের উপর হইলে) জমির দাম অন্ততঃ পক্ষে ২৫০ টাকা কাঠা, উপরোক্তভাবে জমি তৈয়ারী করিয়া লইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লগ্নী টাকার উপর শতকরা ১২ টাকা হিসাবে মুনাফা ধরিয়াও ১০০ টাকার মধ্যে (রেলপথ হইতে একটু ভিতরে হইলে আরও সস্তায়) সমদূরত্বের প্রতি কাঠা জমি বিক্রীত হইতে পারে। এই সব জমির স্বাস্থ্য বা সুবিধা পল্লী অঞ্চলে যে সব জমি বর্ত্তমানে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, তাহাদের তুলনায় অবশ্যই বেশী হইবে। এখন বাড়ী তৈয়ারী এক প্রচণ্ড সমস্যা, অতি কষ্টে জমি জুটাইলেও মালপত্রের অভাবে বাড়ী তৈয়ারী করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিত্তশালী কোন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী করিলে এবাজারে খরচ অনেক কম পড়িবে এবং কিছুটা মুনাফা রাখিয়া সেই সব বাড়ী নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের কিস্তিবন্দী হারে বিক্রয় করিলে দেশের একটি স্থায়ী কল্যাণ হইবে। আইনের বাঁধন থাকিবে বলিয়া এইরূপ কারবারে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইবার কোনরূপ আশঙ্কা নাই। নূতন নগর বা পল্লী গঠনের সময় স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য রক্ষার যে স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব, পুরাতন গ্রাম

বা সহরে সেই সম্ভাবনা নাই বলিলে চলে। এদিক হইতেও বড় বড় জমিতে যে বাড়ীগুলি বা রাস্তাঘাট তৈয়ারী হইবে সেগুলি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর কোন পরিকল্পনা অনুসারে অনায়াসেই হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে ইউরোপের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলিতে এই নগর পরিকল্পনা বা টাউন প্ল্যানিংয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। অবশ্য এখন ক্রমেই পশ্চিম বঙ্গে বাসগৃহ সমস্যা এত জটিল ও ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে যে, যে সব প্রতিষ্ঠান সত্যকার সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া (অর্থাৎ নিজেদের পকেট ভর্ত্তিই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না, দুর্গত দেশবাসীর মুখের পানে চাহিয়াই যাহারা লাভের হিসাব কষিবেন) এইরূপ জমি বা বাড়ীর কারবার সুরু করিবেন, তাঁহাদের প্রচুর টাকা লইয়া নামিতে হইবে। এখনকার অবস্থায় অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা না লইয়া এইরূপ কাজ আরম্ভ করা চলে না। তবে আশার কথা এই যে মুদ্রা সম্প্রসারণের যুগ শেষ হইয়া আসিলেও ফাঁপাই টাকার যুগ এখনও চলিতেছে এবং লোকের হাতে এখনও বাড়তি টাকা আছে বলিয়া উপযুক্ত ও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা এইরূপ বড় প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্যোগী হইলে এখন কিছুদিন অন্ততঃ মূলধনের অভাব হইবে না। পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই লোকায়ত্ত সরকারের উচিত নিজ চেষ্টায় বর্ত্তমান বাসগৃহ সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের ব্যবস্থা করা। এই কর্ত্তব্যপালনে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহের অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। জমি ও বাড়ী কেনাবেচার ব্যাপারে অবাঞ্ছিত মুনাফাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্ত্তন করা তাঁহাদের জনসাধারণের সেবা করিবার আগ্রহের অন্যতম পরিচয় হইবে সন্দেহ নাই। এছাড়া উপরিউক্ত নীতিতে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি জমি ও বাড়ী কেনাবেচার কোন বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, পশ্চিম বঙ্গীয় মন্ত্রী-সভা সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে সব দিক হইতে সাহায্য না করিয়া পারেন না। এজন্য গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী দুষ্প্রাপ্য মালপত্র ন্যায্য দামে সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া 'ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসান এ্যাক্ট' অনুসারে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বড় বড় পতিত বা অনুন্নত জমি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সকল প্রকার সাহায্যই আশা করা যায়।

নারী-ধর্ম

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল বাচস্পতি এম-এ, পিএচ্-ডি

বনবাসকালে রাম চিত্রকূটে বাস করিয়া নানাপ্রকার কর্ম দ্বারা এমন চরিত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন যাহা অনুপম।

কিন্তু পরে বুঝিলেন—এখানে আমি আছি সকলে জানিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগমের সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া সেখানকার মুনিদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত দুই ভাই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে অত্রিমুনির আশ্রমে পৌছিলেন। তাঁহার আসার কথা শুনিয়া মুনি বড় আনন্দিত হইলেন। প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য তিনি পুলকিত শরীরে রামের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া রামও ত্বরান্বিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে দণ্ডবৎ করিলেন। মুনি রামকে বুকে লইলেন, এবং দুই ভাইকে প্রেমাশ্রু দ্বারা স্নান করাইয়া দিলেন। রামের শরীরের অপূর্ব শোভা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুটী জুড়াইয়া গেল। তিনি সীতাসহ রাম লক্ষ্মণকে সাদরে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে বসাইয়া পরম জ্ঞানী মুনিশ্রেষ্ঠ রামকে ঈশ্বর বোধে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল শ্যামসুন্দর। তুমি শংকরবন্দিত, ব্রহ্মাদি দেব দ্বারা পূজিত। তুমি ইচ্ছা-রহিত ত্রিগুণাতীত। তোমার চরণকমলে ভক্তি দাও। আমার বুদ্ধি যেন তোমার চরণ কখনো ত্যাগ না করে।

সুশীলা বিনয়ী সীতা অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রণাম করিলেন। সীতাকে পাইয়া অনসূয়া দেবীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। তিনি সীতাকে নিকটে বসাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনসূয়া সীতাকে এমন সুন্দর বসনভূষণ পরাইলেন যাহা নিত্য নূতন ও অমল থাকে। তিনি সীতাকে নারী ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

হে রাজকুমারী, শোনো। বাপ, মা, ভাই, হিতকারীরা যাহা দিতে পারে, তাহার সীমা আছে, কিন্তু হে বৈদেহী, স্বামী অমিত দাতা, তাঁহার দানের সীমা নাই। যে সেই স্বামীর সেবা না করে, সে অধম। ধৈর্য, ধর্ম, মিত্র ও স্ত্রী এই চারিটীর পরীক্ষা হয় আপদকালেই। বৃদ্ধ, রুগ্ন, মূর্খ, ধনহীন, অন্ধ, বধির, ক্রোধী, অতি দরিদ্র, এই প্রকার স্বামীর অপমান করিলে নারী যমালয়ে অশেষ কষ্ট পায়। স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম ও একমাত্র ব্রত কায়মনোবাক্যে পতির চরণে ভক্তি রাখা। জগতে চারি প্রকার পতিব্রতা স্ত্রী আছে—উত্তম, মধ্যম, নিকৃষ্ট ও অধম। ইহাদের কথা বুঝাইয়া বলিতেছি, মন দিয়া শোনো।

উত্তম পতিব্রতা স্ত্রীর মনে স্বপ্নেও এই ভাব থাকে যে, জগতে আর অন্য পুরুষ নাই। মধ্যম পতিব্রতা পরের স্বামীকে নিজ ভাই বা পুত্রের মত দেখে। ধর্ম বিচার করিয়া ও বুঝিয়া যে কুলে থাকে সে নিকৃষ্ট। আর কেহ বা সুযোগ না পাইয়া বা ভয়ে কুলে থাকিয়া যায়। তাহাকে জগতে অধম নারী বলিয়া জানিও। যে স্ত্রী স্বামীর সহিত ছলনা করে ও পরের স্বামীর সহিত প্রেম করে, সে শতকল্প রৌরব নরকে বাস করে। ক্ষণিকের সুখের জন্য যে শতকোটী জন্মের দুঃখ বুঝিতে পারে না, তাহার সমান মন্দ আর কে আছে? যে স্ত্রী পতিব্রতা ধর্ম অকপটে পালন করে, সে বিনাশ্রমে মোক্ষ পায়। যে স্বামী-বিমুখ, সে পর-জন্মে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, সেখানে যৌবনেই বিধবা হয়।

শোনো, সীতা! তোমার নাম স্মরণ করিয়া নারীরা পতিব্রতা ধর্ম পালন করিবে। তুমি রামের প্রাণপ্রিয়া। সংসারের হিতের জন্য আমি এই কথা বলিলাম।

অনসূয়ার উপদেশ শুনিয়া সীতা অতিশয় প্রীতি পাইলেন, এবং সাদরে তাহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

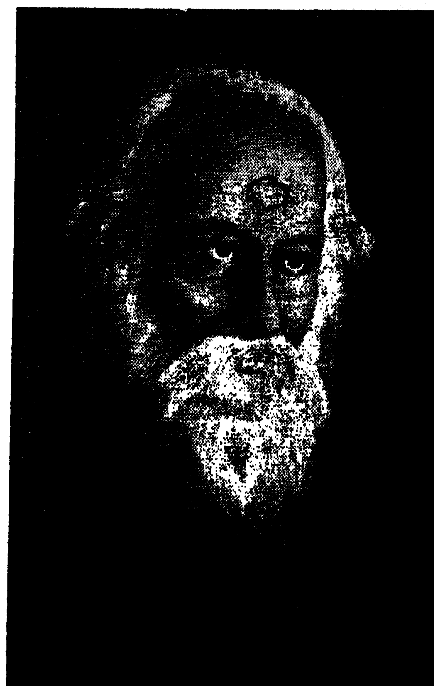
চিত্রশিল্পে মহিলার সাধনা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় চতুঃষষ্টি কলা (বিদ্যা)র মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম। ঋষি বাৎসায়ন ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে মহিলারা অনেকে সঙ্গীতকলার ন্যায় চিত্রকলারও বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে, সখী বিশাখা শ্রীরাধাকে শ্যামের মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইতেছেন। এমনও আছে যে শ্রীমতী নিজেও শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের পট আঁকিয়া উষাকে দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। গুহায় এবং বৌদ্ধমন্দিরে অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র এখনো বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে যুগে মহিলারা নিজেদের গৃহপ্রাচীরে নানা চিত্র অঙ্কন দ্বারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, ঘটের উপরেও নানাপ্রকারের চিত্র অঙ্কন করিতেন। মোগলযুগে হারেমের মহিলাদের মধ্যেও চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। সম্রাট দুহিতা জেব-উন্নিসা সুকণ্ঠী এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী উভয়রূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চিত্রকুশলতার বিষয় জগদ্বিখ্যাত।



তুষার-শিখর



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরাজের আগমনের সময়ে এদেশে আল্‌পনা, মৃৎপাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য প্রভৃতিতে বঙ্গ মহিলাদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যাইত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটিতে থাকায় পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। চারুকলা অনাদৃত হইতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পুনরায় পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই সম্পর্কে সুনয়নী দেবী, সুখলতা রাও, অমৃত গারগিল এবং লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি।

বর্ত্তমানে শিল্পবিদ্যালয়সমূহে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানের গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে এবং শান্তি নিকেতনের কলাভবনে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যে

আগ্রহ দেখা যাইতেছে। শিক্ষালয়ের বাহিরেও পুরনারীরা কেহ কেহ চিত্রকলার অনুশীলনে রত রহিয়াছেন।

আজকাল নানাস্থানে যে সকল শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহিলা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রাবলী ক্রমশঃই চিত্ররসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এবার কলিকাতায় 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্' অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে



শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায়চৌধুরাণী

বিশ জনেরও অধিক মহিলা-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের প্রদর্শিত চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০ হইবে। মহিলা শিল্পীরা ছয়টি পারিতোষিকেরও অধিকারিণী হইয়াছেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মহিলা অঙ্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্ত এবৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র—"বুদ্ধের গৃহত্যাগ"। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই জলরঙা চিত্রখানি অনবদ্য হইয়াছে। এই মহিলাশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছাত্রী। অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে অপূর্ব্ব বর্ণ-সমাবেশ করিতে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর মত সুদক্ষ শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি অনুগামীদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আর কেহ গুরুর শিক্ষায় এরূপ ভাবে বর্ণ সুষমাকে যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বিশিষ্ট শিল্পীরা সকলেই চিত্র খানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বুদ্ধের মুখে বিষাদ ও সঙ্কল্পের ভাব উভয়ই একসঙ্গে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা গোপা দেবীর মুখ সুষমামণ্ডিত। তিনি শিশুপুত্র সহ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরম বিপদক্ষণ যে সমাগত সে বিষয়ে তাঁহার কোনই ধারণা নাই। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রখানি শিল্পীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রদর্শনীতে এই মহিলাশিল্পীর অঙ্কিত আরও পাঁচখানি চিত্র—"গাঁয়ের বৈঠক", "অভিসারিকা", "কর্ণবধ", "রবীন্দ্রনাথ" এবং "শিল্পীর পুত্র" স্থান পাইয়াছিল। সেগুলিও চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী মৈমনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্ত জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তদীয় একমাত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী। এই অভিজাত পরিবারের শিক্ষা ও সঙ্গীতানুরাগ ভারত-বিখ্যাত। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি বিরল। বীরেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গুণী পরিবারের মধ্যে যে একজন সুদক্ষ মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহা অতি আনন্দেরই বিষয় বলিতে হইবে। আশা করা যায়, ইঁহার আদর্শে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ঘটিবে।

অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলায় প্রতি ইন্দিরা দেবীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপীয় মহিলার নিকট ইনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ একাগ্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে,

উপযুক্ত শিক্ষাগুরুদের সযত্ন শিক্ষায় ইনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করেন। খ্যাতনামা প্রতিকৃতি-চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু ইঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। জলরঙ্ ও তৈলরঙ্ উভয় প্রকারের চিত্র অঙ্কনেই এই মহিলা-শিল্পী সমান অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংখ্যা শতাধিক হইবে। শিল্পীর ভবনকে একটি স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জের ভবনে যাইয়া এই মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে শিল্পী স্বীয় পুত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া তিনি "শ্রীঅরবিন্দ" চিত্রখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।



রাসলীলা

মাতৃস্নেহধারায় স্নাত স্বীয় পুত্রের চিত্রখানিও অনবদ্য হইয়াছে। স্বীয় কন্যা ও 'একটি মহিলা' চিত্র দুইখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহু চিত্রই নয়নানন্দকর। "পাহাড়ী ঝরণা" চিত্রখানি অতি মনোরম। স্থান নির্ব্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। জলের ধার ও চারিদিকের বর্ণসুষমা অতি সুন্দর। "তুষার শিখর" চিত্রে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভ রশ্মি সমগ্র দৃশ্যকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রখানিতে শিল্পীর সাধনা সার্থক হইয়াছে। "পাগলা ঝোরা" চিত্রের বর্ণসমাবেশ অতি সুন্দর এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক।

"নিভৃত পল্লী" এবং "বৃদ্ধা লামা" চিত্র দুইখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। পল্লীর শান্ত সমাহিত ভাব দর্শককে মুগ্ধ করে। জপযন্ত্র হস্তে বৃদ্ধা লামা ভগবান তথাগতের নাম জপ করিতেছেন। মুখের ভাবে অন্তরের ভক্তি সুপরিস্ফুট। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পৌরাণিক চিত্রসমূহের মধ্যে "রাসলীলা", "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ", "কৈলাসে হরপার্ব্বতী", "মন্থরা কৈকেয়ী", "শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা", "মানভঞ্জন" প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইখানির মত এত বড় আকারের জলরঙা চিত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। শিল্পীর সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। "রাস-লীলা"র আকার ৫´×৩´ ফুট হইবে। অপরটিও প্রায় অনুরূপ আকারের। "রাস-লীলা" চিত্রে দ্বাদশটি মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মুখে স্বর্গীয় সুষমা। গোপীদের ভাবে ও ভঙ্গীতে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। কদম্ব বৃক্ষসহ সমগ্র চিত্রখানি অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত। "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ" চিত্রখানি দর্শকের অন্তরে করুণ ভাবের উদ্রেক করে। পুত্রের বিদায়-ব্যথা মহারাজ দশরথের আননে অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।



শিল্পীর পুত্র

সকরুণ অটল শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভাব যথাযথ হইয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণ করুণ বদনে দণ্ডায়মান। চিত্রখানির সম্মুখে দর্শকদের কিছুক্ষণ না থামিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শিল্পীর শ্রম সার্থক হইয়াছে। অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে ও বর্ণসুষমায় সুন্দর।

মহিলা শিল্পীর চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকখানির স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে তাঁহার একাগ্র শিল্প-সাধনার গৌরব অতি সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে কিনা জানি না। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি একজন বঙ্গমহিলারও চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে [illegible]।

মধ্য-প্রাচ্যের রাজনীতি—(ইরাক)

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

আমরা অবশ্য পাকীস্থানী রাজনীতিতে মজিয়া যাইতে বসিয়াছি। ভারতবর্ষে ইস্‌লামীয় রাজনীতি যে ভাবেই হউক দানা বাঁধিতেছে, কিন্তু খাঁটি ইসলামের দেশে কি হইতেছে ? সম্ভবত ইরাকবাসীরা ঐস্‌লামিক রাজনীতিতে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাই তাহাদের রাজনীতিকে আজ নূতন করিয়া ঢালাই করিতেছে। বেচারী অটোমান সাম্রাজের কবল মুক্ত হইয়াও নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিলনা। অটোমান সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল ; সেই ভাঙ্গা টুক্‌রা লইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্য-প্রাচ্যের ইমারৎ গড়িয়া উঠিল। অর্থাৎ কড়ার কইমাছ যেন ছিট্‌কাইয়া একেবারে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়িল। ইহার পরের অবস্থা ইরাকে কি হইল তাহা সম্পূর্ণ এখানে বলিবার অবকাশ না থাকিলেও কিছুটা আভাষ রাখিয়া যাওয়া ভাল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি ইরাক্‌কে একেবারে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। ইরাক প্রকৃতির নিকট হইতে তেলের তহবিলদারী পাইয়া অবধি বিপদে পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নব্যবিজ্ঞান ও সাম্রাজ্যবাদের নয়া কূটনীতি ইরাকের সমাজ-জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক জীবনে এমন দেখা যায় যে লোকে তেল দিয়া সন্তুষ্টি আদায় করে, কিন্তু রাষ্ট্রিক জীবনে ইহার ঠিক উল্টো—তেল দিয়া লাভ নাই বরং অ-লাভ, বাণিজ্য কলহ সার হইয়' ওঠে। ইরাকের তাহাই হইল। সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তেল যোগাইয়াও সাম্রাজ্যবাদীর মনের নাগাল পায় নাই। মসুল, কিরকুক ও খানাকিন এই তিনটি স্থান জুড়িয়া ইরাকের তৈল সম্পদ রহিয়াছে। থাকিলে কি হইবে তাহা ইরাকের ভোগে লাগিবার নহে। তাহা ভোগ করিতেছে Iraq Petroleum Company.

এইবার আমরা কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া একেবারে সাপের গর্ত্তে হাত দিয়াছি। Iraq Petroleum Companyর নিজের রসে এতটা উদর-স্ফীতি হয় নাই। ইরাকের তেল শোষণ করিতে আসিয়া অন্যকেও তাহার অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বছরের জন্য Iraq Petroleum Company ইরাকের তৈল উত্তোলন, নিষ্কাশন ও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা পায়। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ অংশ যাহা 'Transferred Territories' নামে পরিচিত তাহাই শুধু Iraq Petroleum Compauyর তৈল চুক্তি সর্ত্তের বাহিরে রহিল।

Iraq Petroleum Company অনেকটা নৈবেদ্যের কলার মত সবার ওপরে স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। চারটি গ্রুপ এই কোম্পানির স্তম্ভস্বরূপ। এর দুটি স্তম্ভ (গ্রুপ) খুব জোরালো অর্থাৎ ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থ। আর দুটি স্তম্ভ (গ্রুপ) অ-ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থ। ব্রিটিশ স্থিত স্বার্থের অংশ হইল (১) The Anglo-Iran Oil Company (২) The Royal Dutch Shell আর অপর যাহারা তাহারা হইল—'সাতটি আমেরিকান ও সাতষট্টিটি ফরাসী কোম্পানি। এর মধ্যে প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ ব্রিটিশের হাতে, পঁচিশ ভাগ আমেরিকা ও ফরাসীর হাতে—ইহার অর্থ এই যে কোম্পানির হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা ব্রিটিশই রহিয়া গেল। ইহার সঙ্গে যোগ হইল—অনেকটা মণিকাঞ্চন সংযোগের মত—সাম্রাজ্যরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। এই সব মিলিয়া ব্রিটিশের মধ্যপ্রাচ্য কূটনীতি ও রাজনীতি এক বিশেষ কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং তাহা বহুল পরিমাণে ইরাকের রাজনৈতিক জীবন-যাত্রাকে রাহুগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান ইরাকের রাজনীতি এই রাহুস্পর্শদোষ এড়াইবারই প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এড়ানো কি এতই সহজ ? সহজ নয় বলিয়াই ইরাকে আজ বিভিন্ন শক্তির খেলা চলিতেছে। নুরীসৈয়দ ও সালেজাব্বর যে রাজনৈতিক ব্লক গঠন করিয়াছেন তাহাই প্রতিপক্ষেরা কহিতেছে যে, ব্রিটিশের তাঁবেদার, ব্রিটিশ স্বার্থের রাজনৈতিক রূপ। পক্ষান্তরে এই ব্লকবিরোধী দল আখ্যা পাইতেছেন কম্যুনিষ্ট বলিয়া—অর্থাৎ ইহার পিছনে রুশ শক্তির প্রভাব রহিয়াছে। ইহারা সাধারণত National Liberation Party বলিয়া পরিচিত। আর একটি দল রহিয়াছে তাহারা নিজেদের Liberal বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহার নেতৃত্ব করিতেছেন তফিক্ সুয়েদি।

এই Liberal দলের আসল সমর্থক হইল ব্যবসাদারগোষ্ঠী। ইরাকের খেজুর ও বার্লির ব্যবসার উপর কোন একটি ব্রিটিশ বণিক প্রতিষ্ঠানের এক-চেটিয়া অধিকার পাইবার পর হইতে ইহাদের টনক নড়িয়াছে। এই দল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এবং তা শুধু নয়, মার্কিণদের সঙ্গে ব্যবসায় করিবার জন্য ইহারা উৎসুক। ব্যবসা করিতে গিয়া শুধু মাত্র একটি খরিদ্দার থাকিবে ও শুধু মাত্র একজনার নিকট হইতে সব কলকব্জা কিনিতে হইবে—এমন দস্তখত ইহারা দিতে রাজী নহেন। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে মার্কিণদেরও শুভাগমন তথায় ঘটিয়াছে। বিশ্ব বাণিজ্যের কারবারী ব্রিটিশ ও মার্কিণ তথায় জুটিয়াছে ও বিশ্ব রাজনীতির কারবারী ব্রিটিশ, মার্কিণ ও রাশিয়া তথায় দলগত প্রভুত্ব ছড়াইবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। এই রাজনীতির ঘোলায় পড়িয়া বেচারী ইরাক ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িতেছে।

গত নভেম্বর মাসে যে মন্ত্রীসভা নুরীসৈয়দ গঠন করেন তাতে Liberal এবং National Democratic Party যোগদান করে। তবে এই যোগদান-কার্য্যটি একেবারেই সর্ত্তাধীন। কেননা ইতিপূর্ব্বে উমারী মন্ত্রিসভা কোন রাজনৈতিক দল—যাহারা মন্ত্রিসভার বিরোধী—তাহাদের কোন স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দেয় নাই। তার ফলে রাজনৈতিক বিক্ষোভ বিভিন্ন দলের মধ্যে চরমে ওঠে। নুরী মন্ত্রিসভা এই জাতীয় নীতির পরিপোষক নয় বলিয়াই Liberal দল ও National Democratic দল ইহার সহযোগিতা করে। National

Democratic Partyর বর্ত্তমান নেতৃত্ব কামিল চাদারজি ও মহম্মদ হাদিদ-এর হাতে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দলের প্রচার-কার্য্য হইতে মনে হইতেছে যে ইরাক জাতির রাজনীতির ধর্ম্ম কি তাহার সন্ধান এই দলটি পাইয়াছে। ইরাকের পুর্ণ স্বাধীনতা, সবার সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন বৈদেশিক নীতি, আরব সংহতি : জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার : শিল্প প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের অধিকার : ভুমিহীন চাষীদের মধ্যে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জমি বিতরণ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। এই সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তবে National Democratic দলকে নুরী ও সালে জাব্বর পরিচালিত ব্লকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জেহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিতেছে; যে সকল প্রগতিশীল দল আজ ইরাকের কাজ করিতেছে তাহারা সবাই একযোগে কহিতেছে যে, ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির নিপাত হউক। কেননা এই চুক্তির ধারা অনুসারে যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বর্ণনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ব্রিটিশরা ভোগ করিতেছে তাহা আজ ইরাকী জনসাধারণের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে। এই দুঃখ নিবারণকল্পে কোন আন্দোলন চালাইবার পক্ষে নুরী-জাব্বর পরিচালিত রাজনৈতিক ব্লকই বড় বাধা। তাহারা ব্রিটিশ স্বিতস্বার্থের পাহারাদার এবং এদের প্রভাব ইরাকের সত্তরটি জিলার শতকরা আশী ভাগ সামন্ত নেতার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রগতিশীল দলগুলি বাগদাদ, মজুল, কিরকুক ও বসরা-র নাগরিক অধিবাসীদের উপর তাহাদের প্রভাববিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু আসল চাবিকাঠি এখনও সামন্ত নেতা শেখদের হাতে। ইরাকের সমাজ-জীবনের যে আলোড়ন তাহা মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে-ই শুরু হইয়াছে। এই সামন্ত শেখেরা আজও নুরী-জব্বর পরিচালিত রাজনৈতিক ব্লকের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। এই ব্লকের মূলনীতি রুশ ভীতির উপর-ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। এবং এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা অনেকখানি ইন্ধন জোগাইতেছে। কেহ কেহ এইরূপ মত পোষণ করেন যে National Democratic, National Union, ও People's Party এদের কেউই সত্যিকারের প্রগতিশীল দল নয়, এরা সবাই সংস্কারপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামী মাত্র। কোন নব্য সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী ইহারা করেন না। অথচ একই আদর্শের ওপর ভিত্তি করিয়া যে তিনটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ হইল নেতৃত্বের লড়াই; তবে একথা সত্য যে নুরী-জব্বর পরিচালিত ব্লক হইতে ইহারা অনেকখানি বামপন্থী বা Liberal দল হইতেও ইহারা বামপন্থী; কিন্তু ব্রিটিশ প্রভাব আজ নুরী-জব্বর পরিচালিত ব্লকের মারফৎ এমনভাবে ইরাকের সমাজের ওপর চাপিয়া বসিয়াছে যে তাহাকে সরাইতে গেলে সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। বস্তুত ইরাকে আজ তাহাই ঘটিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু আজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাটাইতেছে।

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অবসান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতে ১৯০ বৎসরব্যাপী বৃটিশ শাসনের অবসান হইল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি ইংরাজ বণিকদল বাণিজ্য ব্যাপদেশে আসিয়া ভারতের সহিত সর্বপ্রথম যোগ স্থাপন করে। এই সময়ে ভারতের ধনরত্ন ও শিল্পসম্ভারের সন্ধান পাইয়া ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহারা স্থানে স্থানে কুঠী নির্মাণ করিয়া ব্যবসা করিতে থাকে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিলে, কূটনীতিতে চতুর ইংরাজই সকলের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে।

ইংরাজ কুঠী নির্মাণ হইতে সম্পত্তি ক্রয় এবং সম্পত্তি ক্রয় করিতে করিতে দেশজয়ও সুরু করিয়া দেয়। পরে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত করিয়া শাসন-ক্ষমতা লাভ করে। তারপর ইংরাজ খণ্ড বিখণ্ড রাজ্যগুলি জয় করিতে করিতে প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয় এবং শাসনের নামে শোষণ করিতে করিতে ভারতকে যেমন একদিকে দারিদ্র্যের শেষ পর্য্যায়ে নামাইল, অপর দিকে ঠিক তেমনি নিজের দেশ ইংলণ্ডকে উন্নতির উচ্চতম শিখরে তুলিয়া দিল।

ইংরাজের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়। তখন হইতে বহুদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ ছিল, আবেদন নিবেদনের দ্বারা বৃটিশের নিকট হইতে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ করা। পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র কেশরী তিলক তাঁহার "কেশরী" পত্রিকায় নির্ভীকভাবে স্বাদেশিকতা প্রচারের ফলে এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগের কারণে দেশে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ তথা প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। কিন্তু এই সময় হইতে কংগ্রেসে "গরম" ও "নরম" দল হিসাবে দুইটি দল হইল এবং অনেক দিন পর্যন্ত দল দুইটি পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ অর্থ ও লোকবল দিয়া বৃটিশকে সাহায্য করে, কিন্তু যুদ্ধান্তে ইহার পরিবর্তে কোনও সুবিধা না পাইয়া ভারতের

ভাগ্যে যখন রাউলাট আইন আসিল, তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী আসিয়া দেখা দিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা বহিয়া গেল। তখন হইতে মহাত্মা গান্ধী বারে বারে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশকে এমন একস্থানে আগাইয়া আনিলেন যাহার ফলে বৃটিশ ভেদনীতির কারণে নিজেদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট মুসলিমলীগরূপ প্রতিক্রিয়াশীল দল থাকা সত্ত্বেও ভারতে সাম্রাজ্য রক্ষায় সন্দিহান হইয়া পড়িল। বৃটিশ জেল, ফাঁসি ও গুলির ব্যবস্থা করিয়াও ভারতের মুক্তিপাগল অহিংস সত্যাগ্রহীদের দমন করিতে পারিল না। ইঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া শাসক ও শোষক বৃটিশের নিকটে কেবলই স্বাধীনতার দাবী জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস চরমপত্র হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে "ভারত ছাড়" দাবী জানাইল। কঠোর ও নির্মম হস্তে বৃটিশ ভারতবাসীকে এবারেও দমন করিতে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে তাহাকে ভারত ছাড়িতেই হইবে।

এই সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ভারতের বাহিরে একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি শক্তিশালী সেনাদল গঠন করিয়া ভারতের মুক্তির জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া বৃটিশ সেনাবাহিনীর উপরে আঘাত হানিলেন।

বৃটিশের তখন উভয় সঙ্কট অবস্থা। একদিকে সে বিশ্বযুদ্ধের সহিত জড়িত, অপর দিকে ভারতের ভিতরে বাহিরে ভারতীয়দের সহিত তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইল। যাহা হউক ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিলে রাশিয়া ও আমেরিকার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও যুদ্ধে জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশের হাতে বন্দী হইল। কিন্তু এই বন্দী আজাদ হিন্দ্ সেনাদের মুক্তি দাবী করিয়া সমগ্র ভারতে আবার এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। এই সময়ে বোম্বাইএ ভারতীয় নৌ-সেনারাও বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাসে এত বড় নাবিক-বিদ্রোহ ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। ভারতের জাতীয় নেতারাও তখন কারান্তরাল হইতে জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র দেশে একটা তুমুল আলোড়ন। রণক্লান্ত ও ক্ষীয়মান বৃটিশ ইহা দেখিয়া যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। অবশেষে নিজেই ভারতের সহিত একটা আপোষ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল।

এই সময়ে গ্রেট বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হওয়ায় মন্ত্রীসভায় চার্চিলপন্থী রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে এবং শ্রমিকদল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই শ্রমিক মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিলাতে প্রথম ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার জন্য বৃটিশ মন্ত্রীসভা শীঘ্রই ভারতে এক মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করিবেন। ভারতকে দ্রুত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করাই হইবে তাঁহাদের কাজ।

বৃটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আসিবার কয়েকদিন পূর্বে ১৫ই মার্চ তারিখে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী পুনরায় জানাইলেন—ভারতবর্ষকে শীঘ্রই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সাহায্য করিবার জন্যই আমার সহকর্মীগণ ভারতে যাইতেছেন। বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরণের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে ভারতীয়গণই তাহা স্থির করিবেন। ভারতবাসী সত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। ইহাও আমরা মনে করি যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিবার অধিকার রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব সত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

ইহার পর ২৩শে মার্চ মন্ত্রীমিশন আসিলেন, কংগ্রেস, লীগ ও মিশনের মধ্যে আলোচনা বৈঠক বসিল। কিন্তু লীগের পাকিস্থানী জিদ্ লইয়া শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে ১৬ই মে মন্ত্রীমিশন লীগের সার্বভৌম পাকিস্থান অস্বীকার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের একটি নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন।

কংগ্রেস অনেক বিবেচনার পর মিশন পরিকল্পনার গণ-পরিষদ ও অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন উভয় প্রস্তাবই মানিয়া লয়। কিন্তু লীগ প্রথমে উল্লাসের সহিত মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াও শেষে উহা বর্জন করে এবং ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লইয়া সমস্ত ভারত ব্যাপিয়াই লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমানও শিখ জনসাধারণ অকারণে প্রাণ দিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও কিছু ফল হইল না দেখিয়া লীগ কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া বড়লাটের অনুমতিতে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিল, কিন্তু গণ-পরিষদে যোগদান করিল না। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিল লীগকে গণ-পরিষদেও যোগদান করিতে হইবে নতুবা তাহাকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতেই হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের দাবীতে লীগ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে নিয়োগ করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিবেই। ভারতের নেতৃবর্গ বৃটিশের ভারত ত্যাগের একটা নির্দিষ্ট সময় জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিলেন।

বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া ৩রা জুন তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ঘোষণা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুনের স্থলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ত্যাগের কথা বলিলেও বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবসহ ভারত-বিভাগের প্রস্তাব করিলেন। বৃটিশ ভারতত্যাগকালে ভারতশাসনে তাহাদের ভেদনীতির সহায়ক মুসলিম লীগকে তাহাদের দাবী হইতে বঞ্চিত করিল না। লীগের পাকিস্থান বা ভারত বিভাগের অসঙ্গত দাবীকেও শেষ পর্যন্ত তাহারা মানিয়া লইল। বড়লাট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেণ্টের বহু সদস্য পর্যন্ত

খণ্ডিত ভারতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেও অখণ্ড-ভারতের জন্য তেমন সাহসের সহিত কাজ করিতে পারিলেন না। লীগ বিনা যুদ্ধে, বিনা প্রাণবিনিময়ে কংগ্রেসের লব্ধ স্বাধীনতা হইতে পাকিস্থানী জিদ ধরিয়া "ক্ষুদ্র ও বিকলাঙ্গ" হইলেও পাকিস্থান আদায় করিয়া লইল। অবশ্য কংগ্রেস তাহার ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গৃহীত প্রস্তাব—দেশের অনিচ্ছুক অংশকে জোর করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে না রাখার সিদ্ধান্ত, অনুযায়ীই শেষ পর্যন্ত বিভক্ত ভারতেই সম্মত হয়।

দেশের কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আজ বিশেষ দুঃখের কারণ থাকিলেও, ইংরাজ যে ভারত ত্যাগ করিল এইটাই বড় কথা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভাগে সমগ্র ভারতের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভূখণ্ড পড়িয়াছে। এই ভূখণ্ড পৃথিবীর বহুশক্তিশালী দেশের আয়তনের তুলনায় অনেক বৃহৎ। এই অংশের কৃষি, শিল্প এবং খনিজ সম্পদও কোন স্বাধীন দেশের তুলনায় মোটেই নগণ্য নহে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার কৃষি ও শিল্পপ্রসারের সকল রকম সম্ভাবনাই রহিয়াছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারত, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য বলিয়া গণ্য হইল। এই ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মর্যাদা সম্পর্কে ১৪ই জুলাই তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লী বলেন—"ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ষ্ট্যাটুটে (১৯৩১) ডোমিনিয়ন শব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝায় বলিয়া বলা হইয়াছে।" অতএব বৃটিশ কমনওয়েলথের শুধু সদস্য পদের মোহ ত্যাগ করিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী দেরী হইবে না বলিয়া মনে হয়।

ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল শহীদ বৃটিশের শত অত্যাচার ও শাস্তিকে হাসিমুখে বরণ করিয়া জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, যে সকল নেতা বৃটিশের হাতে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন এবং সর্বোপরি আমাদের যে মহান্ নেতা মহাত্মা-গান্ধী, যাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাঁহারা চিরনমস্য; বর্তমান ও ভাবীযুগের দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

শিখ রমণী—সদাকৌর

শ্রীমতী অমিয়া বসু এম-এ, বি-টি

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে নারীজাগরণের তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। নারী পুরুষের সঙ্গে সম অধিকার দাবী করে। সমাজে গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই আন্দোলনের ফলে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাষ্ট্রে, পৌরকার্য্যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কি সমরাঙ্গনে ভারতীয় নারী তাহার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। ভারতীয় নারী আজ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধি, দৌত্য কার্য্যেও নারীর আসন উচ্চ।

ভারতের অতীত কাহিনীতে নারীর উচ্চ স্থান, বীরত্ব, বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। রাজপুত বীরাঙ্গনাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, দেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য আত্ম-বলিদান আজও আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। রাণী দুর্গাবতী, চন্দ্রাবতী, যোধবাঈ প্রভৃতির নাম চিরস্মরণীয়। মারাঠা জাতির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর জীবন গঠনের প্রধান উপাদান ছিল তাঁহার পুণ্যবতী মাতা জিজাবাঈর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রচর্চ্চা। মারাঠা ইতিহাসের অহল্যাবাঈ, তারাবাঈ এবং সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা ঝাঁন্সির রাণীর স্মৃতি ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। শুধু রাজপুত ও মারাঠা জাতির ইতিহাসে ভারতীয় নারীর কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নহে, শিখ জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে অনেক বিদুষী ও মহীয়সী নারীর পরিচয় পাইয়া থাকি। তন্মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহের শশ্রূমাতা সদাকৌরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুরু নানক ছিলেন শিখ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল—"গুরুই ঈশ্বর, ঈশ্বরই গুরু।" তাঁহার তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে শিখ সম্প্রদায় এই মূলমন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে লাগিল। দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দসিংহ শিখ-জাতিকে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করিলেন। কিন্তু শিখদের রাজ-নৈতিক ঐক্য ছিল না। বান্দার মৃত্যুর পর এমন কেহ শক্তিশালী ছিল না যে—সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। শিখজাতি বারটী মিসল্ বা দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের নায়ক একটী রাজত্ব শাসন করিতেন। মিসল্‌দের মধ্যে ভাঙ্গি মিস্‌ল, কানিহা মিস্‌ল, রামঘরিয়া মিস্‌ল, সুকারচকিয়া মিস্‌ল উল্লেখযোগ্য। এই মিসল-গুলির ভিতর পরস্পরে আত্মকলহ চলিতেছিল। অবশেষে সুকারচকিয়া মিস্‌লের নায়ক মহাসিংহের পুত্র রণজিৎসিংহ আপনার শক্তি বলে অন্যান্য মিস্‌লের অধীন রাজ্যখণ্ডগুলি অধিকার করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার অসামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভাবলে একটী বিশাল স্বাধীন শিখরাজ্য স্থাপন করেন।

রণজিৎসিংহের মাতা ছিলেন ঝিন্দরাজা গজপৎ সিংহের কন্যা। কানিহা মিস্‌লের অধিপতি জয়সিংহের পুত্র গুরুবক্সসিংহের স্ত্রী ছিলেন সদাকৌর। এই সময় সুকারচকিয়া ও কানিহা মিসলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। বাতালার যুদ্ধে গুরুবক্সসিংহ নিহত হন। এই বাতালার যুদ্ধ হইতেই কানিহা মিস্‌লের পতন আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কানিহা মিস্‌লের অধিপতি জয়সিংহ তাঁহার দুই পুত্র তারাসিংহ



ভীমপলশ্রী

বনফুল

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে আবার। তারপর হেসে বললে—"তখন আর এখনে কিন্তু তফাত আছে অনেক। এখন আমি তুমি এবং ব্রজেশ্বরবাবু ছাড়া এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কারও অধিকার নেই"

"কেন অনীতার ?"

"হ্যাঁ অনীতারও অবশ্য আছে"

"দেখুন যুক্তি দিয়ে এসব ব্যাপারের মামাংসা হয় না। আপনি যুক্তির অবতারণা করে' স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন আমি যদি শুধু সেমিজ পরে হ্যারিসন রোড দিয়ে হেঁটে যাই কার কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের মুখ বন্ধ হবে না তাতে"

"সত্যি যদি সাহস করে যাও, আমার মনে হয় না এ নিয়ে খুব একটা আন্দোলন করবে লোকে—"

সান্ত্বনা মুচকি হেসে বললে—"আপনার শোবার কষ্ট হল তার জন্যে খুবই দুঃখিত আমি। আর ওই মেজেতে শুলেই কি আরাম পাবেন আপনি ? ওর চেয়ে গোয়াল ঘরে শোয়া ঢের ভাল।"

সুশোভন ঘরের চার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"আমার বিশ্বাস এখানে শুলে একটু ঘুম হত। একটা 'রাগ' আর একটা বালিশ পেলে বেশ একঘুম দিয়ে নিতে পারতাম ওই কোনের দিকটায়"

"'রাগ' আর বালিশ দিচ্ছি আপনাকে। ওগুলো নিয়ে আপনি গোয়ালেই যান, সেখানেও বেশ ঘুমুতে পারবেন"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু শব্দটব্দ শুনে গোঁসাইজি যদি উঠে আসেন, তাহলে বালিশ-বগলে আমাকে ঝুমুর কাছে দেখে ভাববেন কি"

"কি আবার ভাববেন"

"একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন যে গোঁসাইজির চক্ষে আমরা স্বামী-স্ত্রী। যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে আমরা তাঁর সঙ্গে চাতুরী খেলছি তাহলে দুজনকেই এই রাত্রে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কিছু শুনবে না লোকটা। অ্যাডমিশন রেজিষ্টারে আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে' নাম সই করেছি। আর সেই ভদ্রলোক—গুম্ফ গোবিন্দ না কি যেন—"

"সদারঙ্গ বিহারীলাল ?"

"হ্যাঁ, তিনি আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে' জেনে গেছেন। জানাজানি হয়ে গেলে তোমার স্বামীর কাছে যে এর কি জবাবদিহি করব জানি না"

"সে আমি করব। আপনাকে করতে হবে অনীতা দেবীর কাছে"

সুশোভনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

"ব্রজেশ্বরবাবু আর অনীতা এ দুজনের সম্বন্ধে যদি আমাদের চিন্তা না থাকে তাহলে আর কে কি মনে করবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর এতক্ষণ আমরা যা করেছি তাতে ওরা যদি কিছু মনে না করে তাহলে আমার মেজেতে শোয়াটাও ওরা আশা করি অনুমোদন করবে। ওরা অমানুষ নয় তো। নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে একাজ করেছি তা বোঝবার মতো সহৃদয়তা ওদের নেই ? ওই ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গুঁজে আর ছাপ্‌পর খাটের তলায় পা চালিয়ে শোয়াটা যে আরামের নয় তা কি ওরা বুঝবে না ? নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুতে হচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরে জখমও হয়ে পড়তে পারি; হাসছ কি, খুবই সম্ভব সেটা।"

সান্ত্বনা মুচকি মুচকি হাসছিল।

"উনি অবশ্য কিছু মনে করবেন না।"

"বাস তাহলে তো হয়েই গেল। আমার স্ত্রীর ঝক্কি আমি সামলাব।"

"উনিও মোটেই কানপাতলা লোক নন। তাছাড়া আমার যাতে কষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজ মরে গেলেও করবেন না উনি। আড়ালেও আমার সম্বন্ধে কখনও কোন কটু মন্তব্য করেন না।"

"আমিও করি না। অনীতাকে আমি যত ভালবাসি এত বোধহয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বাসে না। সত্যি বলছি বড্ড ভালবাসি। যাক বালিশ আর 'রাগ' দাও, তাহলে চেষ্টা করে দেখি ঘুম হয় কি না—"

"কপাটে খিল দিন"

খিল দিতে গিয়ে সুশোভন আবিষ্কার করলে যে খিলটি ভাঙা।

"ভালই হয়েছে এক হিসেবে"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা পাশ ফিরে শুল।

"সুশোভনবাবু"

"অ্যাঁ—কি"

"ঘুমুচ্ছেন ?"

"কেন"

ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে সন্দিগ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল সুশোভন।

"কিছু মনে করবেন না, জানালাটা যদি খুলে দেন দয়া করে'। আমি শোবার সময় খুলতে ভুলে গেছি"

"জানলা খুলে কি হবে! হু হু করে' হিম ঢুকবে যে ঘরে। আমাকে মেরে ফেলতে চাও না কি"

"সব জানালা বন্ধ। বাইরের হাওয়া একটু ঢোকা দরকার"

"ঘরে যা হাওয়া আছে তাই তো যথেষ্ট মনে হচ্ছে আমার। আবার বাইরের হাওয়া কেন"

"জানালা খুলে না শুলে সকালে মাথা ধরে থাকে আমার। খুলে দিন লক্ষ্মীটি"

"ও। আচ্ছা দিচ্ছি তাহলে। দাঁড়াও উঠি আগে। রীতিমত কসরৎ করতে হবে। এই ড্রেসিং টেবিলের তলা থেকে মাথাটা বার করাই মুস্কিল, তারপর আলমারির তলা থেকে হাতটা—"

জানালা খুলে মিনিট দুই পরে সুশোভন আবার মেঝের উপর এসে বসল, অস্ফুটস্বরে গজগজ করতে করতে হাত থেকে ধূলা ঝাড়লে, তারপর নিজের ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের তলায় মাথা গলিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। মনে হল সান্ত্বনা নিদ্রাজড়িতকণ্ঠে 'ধন্যবাদ' না কি একটা বললে। তারপর নীরবতা ঘনিয়ে এল আবার, সান্ত্বনার মৃদু নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হঠাৎ নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করে ঝুনুর করুণ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ওই আবার! থামছে না—চলেইছে একটানা—।

"সুশোভনবাবু"

"কি"

"শুনতে পাচ্ছেন ? মরে যাই মাণিক আমার"

"আমাকে বলছ ?"

"ঝুনুর ডাক শুনতে পাচ্ছেন না ? আহা বেচারী"

"কই না"

"পাচ্ছেন না ? ওই যে"

"ও প্যাঁচা ডাকছে"

"কি যে বলেন। ঝুনু কাঁদছে। আহা, কি যে করি"

"জানলাটা বন্ধ করে' দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে"

"না, না। বেচারী সমস্ত রাত ওই রকম করে কাঁদবে, আর আমরা চুপচাপ শুয়ে থাকব এখানে—"

সুশোভন উঠে বসল।

"ওর কান্না বন্ধ করবে কি করে বল। ও চেঁচাবেই। কুকুরের স্বভাবই ওই"

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললে—লক্ষ্মীছাড়া কুকুর।

"উনি হলে ঠিক উঠে গিয়ে নিয়ে আসতেন"

"আমি 'উনি' হলে এই ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে আমার শিরদাঁড়া এমন জখম হত না"

"সুশোভনবাবু, উঠুন, যান লক্ষ্মীটি"

"যেতাম। কিন্তু যাবার উপায় নেই"

"কেন, এই একটু আগেই তো আপনি ওখানে শুতে যেতে চাইছিলেন"

"চাইছিলাম কিন্তু পারতাম না। আমি হলপ করে বলতে পারি এখন ওই খিড়কি দুয়ার পেরিয়ে গোয়ালঘরে যাওয়া যাদুকর পি, সি, সরকারের পক্ষেও অসম্ভব"

"কেন বড়জোর খিল দেওয়া আছে—"

"দেখ যে লোক বৈঠকখানায় ডবল তালা লাগাতে পারে সে নিশ্চয় খিড়কিতে এলার্ম লাগিয়েছে"

"শুনুন, আহা কি কান্নাটাই কাঁদছে বেচারী। ছি, ছি, এত নিষ্ঠুর আপনি। বোবা জানোয়ারের প্রতি দয়া হচ্ছে না একটু—"

"ওর নাম বোবা জানোয়ার!"

"আপনি যদি না যান আমাকে উঠতে হবে। ওর কান্না শুনে স্থির থাকতে পারব না"

সুশোভনকে উঠতে হল। জুতো পরে জামা গায়ে দিয়ে বারান্দা থেকে কমানো লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে নেবে গেল সে। নাবতে নাবতে তার মনে হল—অনাত্মার কুকুরের সখ নেই, আর যাই থাক! উঃ—! (ক্রমশঃ)

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার পুনর্বসতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মহাত্মা গান্ধী বিহারের উন্নয়ন-সচিব ডাঃ মামুদের আমন্ত্রণে সেখানকার মুসলমানদের সেবার জন্য ২রা মার্চ তারিখে পূর্ব-বাঙ্গলায় তাঁহার ঐতিহাসিক পল্লী-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ গ্রাম হাইমচর ত্যাগ করিয়া বিহার চলিয়া যান। তাঁহার পূর্ববঙ্গ ত্যাগের সংবাদে বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের অভয় দিয়া তিনি পূর্বদিন প্রার্থনা সভায় বলিয়াছিলেন—আগামীকাল আমি বিহার যাইতেছি, কিন্তু অল্প কিছুদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করিয়া আবার এখানে ফিরিয়া আসিব। এখন যে সকল উপদ্রুত গ্রামগুলিতে যাইতে পারিলাম না, ফিরিয়া আসিয়া সেই সকল গ্রামে যাইবার চেষ্টা করিব। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আমি নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ত্যাগ করিব না। আমার অসমাপ্ত কার্য আমার সঙ্গীদের উপর দিয়াই আমি বিহার যাইতেছি।

মহাত্মা গান্ধী বিহারে গেলেন, কিন্তু সেখান হইতে আবার তাঁহার ডাক পড়িল নয়াদিল্লীতে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুপরিবর্তনের কারণে তিনি সেখানে বহুদিন আটকাইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সময়ে উপদ্রুত নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার আরব্ধ ও অসমাপ্ত কার্যকে কি ভাবে যোগ্যতার সহিত চালাইয়া যান এই প্রবন্ধে মূলত তাহারই কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের জন্য শান্তির বাণী লইয়া তাঁহার দোভাষী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ও সর্টহাণ্ড লেখক পরশুরামকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সমস্ত দলবল ছাড়িয়া কাজিরখিল হইতে শ্রীরামপুর অভিমুখে রওনা হন এবং ঐ দিন তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহার দলের অন্যান্য সকলেও এক এক জন করিয়া এক একটি উপদ্রুত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার গ্রামগুলিতে রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তেরা তখন চারিদিকে অবাধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের আস্ফালন ও শাসানী মোটে কমে নাই। গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাম গন্ধ নাই। যাহারা কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহারা আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে। উপদ্রুত গ্রামসমূহের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীরা প্রকৃত অহিংস বীরের ন্যায় এক একজন করিয়া ঐ সকল গ্রামে গিয়া ক্যাম্প স্থাপন করিলেন অর্থাৎ কোনও একটি পোড়ো বাড়ীতে গিয়া একা একা বাস করিতে লাগিলেন। কর্মীদের মধ্যে মহিলারা পর্যন্ত রহিলেন। কর্মীদের এই সৎসাহস দেখিয়া এবং মহাত্মা গান্ধীর অভয় প্রচার ও গ্রাম পর্যটনের ফলে উপদ্রুত গ্রামবাসীরা আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ক্রমে ক্রমে গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন হইতে কর্মীরা ঠিক একভাবেই সেবা ও পুনর্বসতির কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহারা বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক ও কর্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকিলেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় গান্ধী-ক্যাম্পের ২৩টি কেন্দ্রে প্রায় ৫০ জন কর্মী কাজ করিতেছেন। নিম্নে গান্ধী ক্যাম্প ও কেন্দ্রসমূহ এবং ঐ সকলের পরিচালকদের নাম দেওয়া হইল:—

কাজিরখিল ক্যাম্প (ইহা গান্ধী ক্যাম্পের হেড কোয়ার্টার)—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ভোলানাথ সরকার (দিনলিপি সম্পাদন ও মুদ্রণ) চারু চৌধুরী, অরুণাংশু দে, রবীন্দ্রশংকর ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভৌমিক (পরিচালনা ও অফিস) রঞ্জনকুমার দত্ত (হিসাব)

জগদীশচন্দ্র সুর (ক্যাশ) যতীন্দ্র দে (গুদাম) মণী চক্রবর্তী, আভা গান্ধী (চরখা-নির্মাণশালা ও বিদ্যালয়) বিজয় দাশগুপ্ত, আপ্পারাও (যন্ত্রশালা) অমলেশ চৌধুরী (বনিয়াদি বিদ্যালয়) যোগেন্দ্রনাথ দাস (চিকিৎসা) প্রিয়নাথ মজুমদার (পাকশালা) বিধুভূষণ দাশগুপ্ত (অনুসন্ধান)

কেন্দ্র সমূহ—চণ্ডীপুর—সৌরীন্দ্র বসু ; চাঙ্গীর গাঁও—বিশ্বেশ্বর দাস ; কেরোআ—ভূপালচন্দ্র কর্মকার, দালাল বাজার—কর্ণেল জীবন সিং, ও হরিপদ মালাকার, বামনী—জীবনকৃষ্ণ সাহা, চররোহিতা—অন্নদাচরণ কুণ্ডু (মুটু) সীরন্দী—আমতুস সালাম, সুষমা পাল ; চাঁদপুর—অজিত সিংহ, কেথুরী—রেড্ডীপল্লী সত্যনারায়ণম্ ; পানিয়ালা—অমৃতলাল চ্যাটার্জি, মুরাইম—জ্ঞানেন্দ্র মাল, মহম্মদপুর—বীরেন্দ্রনাথ গুহ, পাল্লা—যতীশ চক্রবর্তী, পাঁচগাঁও—অজিতকুমার দে, জগৎপুর—দেবেন্দ্র সরকার, ভাটিয়ালপুর—প্যারেলালজী, চন্দ্রশেখর ভৌমিক, গোপাইরবাগ—বিশ্বরঞ্জন সেন ও নারায়ণকেশব বৈদ্য, রামদেবপুর—কানু গান্ধী ; পারকোট—সাধনেন্দ্র মিত্র ও প্রভুদাস প্যাটেল, আতাকোরা—মুরলীধর জানা, কমলা রায়, নন্দনপুর—খগেন্দ্রনাথ জানা, হাইমচর—মদন চট্টোপাধ্যায় ও বনমালী ঘোষ। *

এক একটি কেন্দ্র পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রামকে লইয়া কাজ করিতেছে। অতএব কম করিয়াও প্রায় দুইশত গ্রামে কর্মীরা সেবা ও পুনর্বসতির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সতীশবাবু কর্মীদের জন্য "শান্তি মিশন দিনলিপি"তে সকল কর্মীদের কাজ ও কর্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্মকেন্দ্রগুলির মধ্যে একটা নিবিড় যোগ রাখিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ৪ মাসকাল নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থান করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য মানবতার আবেদন লইয়া যে সকল বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কর্মীরা তাহাই কার্যকর করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি আনয়ন এবং সংখ্যালঘু হিন্দুদিগকে সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষা করার দায়িত্ব বুঝান, ভয়ভীতদের ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় না করিতে বলা এবং প্রকৃত নির্ভীক করিয়া তোলা, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা দূর করা, গ্রাম পরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা দূরীকরণ ও দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন—এই সকলই ছিল নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর কার্যসূচী। কর্মীরা মহাত্মাজীর এই সকল দুরূহ কাজগুলিকে সফল করিবারই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দুমুসলমান পুনর্মিলনের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে পথ অবলম্বন করেন কর্মীরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহারা বন্ধুর ভাব লইয়া সকল মুসলমানের সহিতই মেলামেশা করিতেছেন। সতীশবাবু দিন-লিপিতে এ সম্পর্কে বরাবরই কর্মীদের উপদেশ দিয়া আসিতেছেন—সাধারণতঃ সকল মুসলমানই ভাল এই বোধ ও বিশ্বাস লইয়া উহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। অবসর সময়ে তাহাদের সহিত মিশিবে এবং কথাবার্তার মধ্য দিয়া আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবে। হিতকাজের দ্বারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। মুসলমানদেরও নানা দুঃখ, শোক ও তাপ আছে; সহানুভূতির মনোভাব লইয়া মিশিলে মিলনের দরজা খুলিবেই। অহিংসার পরাজয় নাই, বিশ্বাস করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া সতীশবাবু কর্মীদের আরও বলেন—গ্রামের যুবক ও বালকদের লইয়া গ্রামের কাজে ও খেলাধুলায় তাহাদের সহিত মিশিবে। কারণ যুবক ও শিশুদের মন অনেকটা সরল এবং তাহারাও সাধারণত মিশুক।

কর্মীরা এইভাবেই কাজ করিতেছেন, ফলে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে যে অমিলের ব্যবধান বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির ভয়ভীতদের নির্ভীক করিবার জন্য এই কথাই শুধু বলেন, ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিবেন না। আপনারা ভয় ত্যাগ করুন, তাহা হইলেই আমাকে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করা হইবে।

গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরাও নোয়াখালি ও ত্রিপুরার ভয়পীড়িতদের মধ্যে এই কথাটাই প্রচার করিতেছেন। সতীশবাবু দিনের পর দিন দিনলিপিতেও ইহাই বলিতেছেন। এইরূপ প্রচারের ফলে ভয়ভীতদের মধ্যে অনেকেই নির্ভয় হইতেছেন এবং সৎসাহস ফিরিয়া পাইতেছেন। নিম্নে এরূপ সৎসাহসের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

আশ্রয়প্রার্থী শিবির হইতে ফিরিয়া গ্রামবাসীরা সমবায় প্রথায় কাজ করিতেছে। মেয়েরাও তাই। একদিন সকালে মেয়েরা রামধুন গাহিয়া কাজে যাইতেছে, এমন সময়ে পথের ধারে দাঁড়াইয়া কয়েকজন মুসলমান মেয়ে তাহাদের বলিল—তোদের ধিক্, তোরা এই সেদিন না কল্‌মা পড়ে মুসলমান হলি, আজ আবার রামনাম কর্‌ছিস্।

উত্তরে তাহারা নির্ভীকভাবে বলিল—হ্যাঁ রামনামই আমরা করব। তখন ভয়ে মুসলমান হয়েছিলুম। কিন্তু আর ভয় নেই, ভয় আর করবও না। এখন আর একবার মুসলমান করতে আসিস্। আমরা অহিংস থেকে মরব, কিন্তু তবুও আর ঐ রকম নতি স্বীকার করব না।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া মুসলমান মেয়েরা হতবাক্ হইয়া গেল এবং চুপে চুপে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে জাতিভেদপ্রথার কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার উপস্থিতির সময়েই নোয়াখালিতে অনেকগুলি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সহ-ভোজনের অনুষ্ঠানও হইয়াছিল। সতীশবাবু ও গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মীরা হিন্দুধর্মের এই পুরাতন ব্যাধি লোপ করিয়া বর্ণ, অবর্ণ তুলিয়া একটিমাত্র হিন্দুধর্মের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে সহ-ভোজ চলিতে লাগিল। কিন্তু কর্মীরা দেখিলেন—গলিত ব্যাধির

* সম্প্রতি ভাটপাড়া, রায়পুর ও দশঘরিয়ায় ৩টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং দু' একটি কেন্দ্রে পরিচালকরাও বদলী হইয়াছেন।

মত এই জাতিভেদ কতকগুলি লোককে ভীষণভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। হাঙ্গামায় যাহারা একদিন হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তাহারা হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের পূর্বের জাতি খুঁজিয়া বাহির করিতেছে এবং হিন্দুর অপরাপর জাতির সহিত একত্র ভোজনে নারাজ হইতেছে। এই কারণে সতীশবাবু কর্মীদের নির্দেশ দিলেন—এই ব্যাধি লোপ করিবার জন্য গ্রামে প্রত্যহ অন্ততঃ একটি করিয়া সহভোজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ী হইতে চাল ডাল প্রভৃতি আনিবে, তাহা হইলে কাহার পক্ষে ইহা ব্যয়সাপেক্ষ হইবে না।

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি ভ্রমণের সময়ে সেখানকার পুকুরের জল দূষিত দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন—জল এত দূষিত যে ইহাতে হাত দিতেও ঘৃণা বোধ হয়। লোকে যে পুকুরের জল খায়, সেই জলেই অন্যান্য সকল প্রকার কাজও করে, ফলে জল দূষিত হয়।

সতীশবাবু নোয়াখালিতে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য টিউব-ওয়েল বসান ও পুকুরের মধ্যে ফিলটার কূপের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পুকুরের মধ্যে ফিলটার কূপের ব্যবস্থাটি সস্তা এবং এইটাই তিনি গ্রামে গ্রামে চালু করিলেন। এই কূপ সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপে পুকুরের মধ্যে বসান হয়ঃ—

৪খানা ১০ ফুটী করগেট পাশাপাশি জুড়িয়া, পরে উহাকে গোল করিয়া একটি ঢোলে পরিণত করা হয় এবং ভিতরে লোহার ফ্রেম দিলে উহা শক্ত হয়। এই ঢোল পুকুরের মধ্যে বসাইয়া প্রথমে জল শুষ্ক করিয়া পরে আবশ্যকমত মাটী খনন করা হয়। জলের নীচে এইরূপ মাটী খনন করাকে কেজুন বোরিং বলে (caisson boring)। তারপর বাঁশের ফ্রেমে দরমার দ্বারা তৈরী একটি ঢোল উহার ভিতর বসাইয়া টিনের ঢোলটিকে তুলিয়া লওয়া হয়। এই দরমার ঢোল দেওয়ার উদ্দেশ্য পাশের মাটি আসিয়া যাহাতে গর্তটি ভরাট হইয়া না যায়। ইহার পরে উহার মধ্যে ফিলটার কূপটি বসান হয়। ৩।৪ জন লোক একদিনে এইরূপ কূপ খনন করিয়া একটি ফিল্‌টার বসাইয়া দিতে পারে।

কর্মীরা গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রামবাসীদের লইয়া গ্রামের রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পুকুরের পানা ও বনজঙ্গল সাফ করিতেছেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা সহযোগিতা না করিলেও তাঁহারা গ্রাম পরিষ্কারের কাজ ছাড়িতেছেন না। তাঁহারা নিজেরাই সাধ্যমত খাটিয়া যাইতেছেন। একদিনের সংবাদে জানা যায়—শ্রীযুক্ত কানু গান্ধী তাঁহার কেন্দ্রে একটি গ্রামের রাস্তা নির্মাণের জন্য গ্রামবাসীদের শ্রমসাহায্য চাহিলেন, কিন্তু কেহই কাজে আসিল না। অবশেষে তিনি নিজেই মাটি কাটিয়া রাস্তাটি মেরামত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা একাই কাজ করিলেন। এমন সময়ে রাস্তার উপরে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত কানুগান্ধীকে ঐভাবে পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার কাজ ছাড়িলেন না। শেষ পর্যন্ত যাহারা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল তাহারাও কাজে যোগ দিল।

কর্মীরা যেখানে সহানুভূতি পাইতেছেন না সেখানে ঠিক এইভাবেই পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেরাই কাজ করিয়া যাইতেছেন।

গ্রাম পরিচ্ছন্নতার জন্য সতীশবাবু কিছুদিন হইতে স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদিগকে কনট্রোল দামে চাউল বা খয়রাতি বস্ত্র বিতরণ করা হইবে তাহাদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলে, প্রত্যেক বাড়ীর একজনকে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কি ১॥ ঘণ্টা করিয়া সুলভ মূল্যের প্রতিদান হিসাবে গ্রামের মঙ্গলের জন্য রাস্তা মেরামত, পানা তোলা, জঙ্গল সাফ প্রভৃতি যে কোনও একটি কাজ করিতে হইবে। এইভাবেও কিছু কিছু করিয়া গ্রাম পরিষ্কারের কাজ চলিতেছে।

কর্মীরা গ্রামবাসীদের নৈতিক উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা করিতেছেন। কোনও অসৎপন্থা অবলম্বন হইতে তাহাদিগকে বিরত করিতেছেন। এ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের লোভ ও ভীরুতার বিরুদ্ধে চণ্ডীপুরে শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র বসু একবার অনশন করেন। ইহাতে ফল ভালই দেখা দেয়।

অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য কোন কোন কেন্দ্রে বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কাজিরখিল ও আতাকোরায় দুইটি বনিয়াদি বিদ্যালয় চলিতেছে। শ্রীযুক্ত কানুগান্ধী তাঁহার কেন্দ্রে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একটি ব্রতচারী নৃত্যের দল গঠন করিয়াছেন। সর্দার জীবন সিং তাঁহার কর্মকেন্দ্র দালালবাজারে ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত খেলার ছলে তাহাদিগকে দিয়া সংকল্প গ্রহণের অনুষ্ঠান করান। বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জাতীয় পতাকা উড়াইয়া উহার চারিদিকে ছেলেমেয়েরা বসিয়া যায়। তারপর একসঙ্গে সকলে উচ্চারণ করে—"এই ভূমি আমার মাতৃভূমি। এই ভূমি আমি ছাড়িব না ও ধর্মপালন করিব। মৃত্যু আসিলে আজ এখন যেমন বসিয়াছি এমনি বসিয়া বসিয়া মৃত্যু লইব। ভয় ছাড়িব ও হাতিয়ার ধরিব না।"

সকল কেন্দ্রে হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে রোগীর সেবা চলিতেছে। কাজিরখিলে একটি সস্তা ঔষধালয়ও খোলা হইয়াছে। এখানে প্রতি-দিনই রোগীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই বেশী। সকলকেই আপন ভাবিয়া সেবা করা হইতেছে।

প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান ব্যতীত কর্মীরা মাঝে মাঝে সভা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছেন। সভায় পুনর্বসতি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা ও দিন-লিপি পাঠ করা হয়। কর্মীরা গ্রামবাসীদের বিভিন্ন কুটীর শিল্পের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়া দেন। প্রদর্শনীতে সূতা কাটাও দেখান হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবীর উদ্যোগে মাঝে মাঝে মেয়েদের লইয়াও সভার আয়োজন হইয়া থাকে। সভায় মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

নোয়াখালি জেলায় নারিকেল অজস্ররূপে ফলে। নোয়াখালিবাসীরা এই নারিকেল কেবল রপ্তানি করিয়াই কিছুমাত্র আয় করিয়া থাকে। সতীশবাবু দেখিলেন এই নারিকেল দ্বারাই নোয়াখালিকে সম্পদশালী করা যায়। তাই তিনি নারিকেলের তৈল, শাঁস, খোল ও ছোবড়া লইয়া নারিকেল শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য পথ দেখাইয়া দিলেন। ছোবড়া হইতে রশি, পাপোশ, জাজিম করা, নারিকেলের মালা হইতে পেয়ালা মায় হাতল, খুরা, বোতাম ও হুকার খোল প্রস্তুত হইতে

লাগিল। কাজিরখিল ক্যাম্পে এই সকলের প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী করিবার জন্য কর্মীরা গ্রামে গ্রামে চরকার প্রচলন করিয়াছেন এবং কেন্দ্র হইতে গ্রামবাসীদের সূতা-কাটা শিক্ষা দিতেছেন। কেন্দ্রগুলির চাহিদা মিটাইবার জন্য কাজিরখিলে চরকা ও উহার সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে নবাগত শিক্ষার্থীদিগকেও এখানে চরকা নির্মাণ ও সূতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কোন কোন কেন্দ্রে তুলার চাষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের চাষও চলিতেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে সতীশবাবু যে সকল সাম্প্রদায়িক অপরাধের গুরুত্ব রহিয়াছে, যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং যাহা তিনি প্রমাণ করাইতে পারিবেন, এইরূপ ঘটনা সকল পুলিশকে জানাইতে থাকেন এবং তাঁহার সম্পাদিত শান্তি-মিশন দিনলিপিতেও প্রকাশ করিতে থাকেন। জুলাই মাসের অর্দ্ধেক সময় পর্যন্ত তিনি হত্যা, লুণ্ঠন, চুরী, গৃহদাহ, স্ত্রীলোকের শ্লীলতানাশ ও শ্লীলতানাশের চেষ্টা, ধমকানী ও শাসানী, বয়কট, জোরপূর্বক জমির ধান কাটিয়া লওয়া প্রভৃতি প্রায় সাড়ে চারিশত অপরাধমূলক ঘটনার কথা পুলিশকে জানান। পুলিশ বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কচিৎ দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিকারের জন্য আগাইয়া আসেন নাই। সতীশবাবু জুলাইএর শেষ দিক হইতে দিনলিপিতে এই অপরাধমূলক ঘটনা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন, তবে কর্তৃপক্ষকে ইহা পূর্বের ন্যায়ই জানান হইতেছে। কর্তৃপক্ষ ইহাতে কিছু না করিলেও কর্মীরা তাঁহাদের কর্তব্য হিসাবেই এই সকল অপরাধের কথা পুলিশকে জানাইয়া আসিতেছেন।

কর্মীরা এইভাবে সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। মাঝে এপ্রিল মাসে অত্যাচারীদের অত্যাচারের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়া যায়। সতীশবাবু এই সব ঘটনা মহাত্মা গান্ধীকে জানাইলে তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার উত্তরে জানান—যাহা দেখিতেছি তাহাতে হয় নোয়াখালির হিন্দুদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা মুসলমানদের ধর্মান্ধতার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করা উচিত তাহা স্থির করিবেন।

কর্মীরা স্থির করিলেন, পলায়ন অথবা মৃত্যু এই দুইটির মধ্যে আমরা মৃত্যুকেই বরণ করিতে প্রস্তুত। নোয়াখালির মাটি ছাড়িব না। মরিতে হয় এইখানেই মরিব, তবুও নিজেদের কর্তব্য ত্যাগ করিব না।

মানুষ আপন কর্তব্যে স্থির থাকিয়া কতখানি নির্ভীক হইলে তবে এমন কথা বলিতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন। কর্মীদের এই যে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা ও কর্তব্যে নিষ্ঠা ইহা সত্যই অপূর্ব ও বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

এই সকল কর্মী তাঁহাদের সকল কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আজ ১০ মাসকাল ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সেবা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত নির্বিশেষে সকলের নিকটেই বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুমুসলমান যদি মহাত্মা গান্ধী তথা কর্মীদের এই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন তবেই পূর্ববাঙ্গলার এই দুইটি জেলা তাহাদের কৃত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্খালন করিয়া আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং এখানকার হিন্দুমুসলমান মৈত্রী সংক্রামিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ছড়াইয়া পড়িবে, ফলে পূর্ববাঙ্গলায় পাকিস্থান আগমনে সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায় আজ যে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও একটা সমাধা হইবে।

শহীদ ক্ষুদিরাম

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

কে বাজাল ওই প্রলয় বিষাণ জীবনের জয়গান—
প্রাণের যজ্ঞে প্রথম আহুতি—বিপ্লব অভিযান!
পরাধীনতার কঠিন পীড়নে কাঁদে অন্তর যার—
সেই ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াল নির্ব্বিকার!
বিদ্রোহী প্রাণে জ্বলিয়া উঠিল রক্ত-বহ্নি-শিখা
আপন রক্তে আঁকিল ললাটে দীপ্ত বিজয়-টীকা—
"স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা, স্বাধীন স্বপ্ন যার—
আমার দেশেতে বাঁচিবার আছে আমাদেরই অধিকার!"
দিকে দিকে তারি লেলিহান শিখা জ্বলিছে বজ্রানল—
কত প্রাণ দিল বলিদান শুধু ভাঙিবারে শৃঙ্খল!
কত বীর মাতা আশীষ দিয়াছে কাহিনী রচিয়া যার—
তারই স্মৃতি আজো জাতির জীবনে আরতির সম্ভার!
তুমি নাই আজ, চ'লে গেছ দূর মরণ-সিন্ধু পার—
তবুও গরজে মাভৈঃ মন্ত্রে জীবনের ঝঙ্কার!
সাগ্নিক, তব নেভেনি' আগুন—দৃপ্ত শিখাটি তার—
মরণ-বিজয়ী বিপ্লবী বীর—লহ গো নমস্কার।



ক্ষুদিরাম চিত্র—লক্ষ্মী দাস

সাময়িকী

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭—

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিল। ঐ দিন বহু বৎসর পরে ভারত আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। গত ৬০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস যে সংগ্রাম করিয়াছে, আজ তাহা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে—এ জন্য যাঁহারা সংগ্রামে যোগদান করিয়া নানা-প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন ও জীবনাহুতি দিয়াছেন, আজ স্বাধীনতা লাভের শুভক্ষণে আমরা তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করি। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও আমরা নিরানন্দ—কারণ জাতীয়তা-বিরোধী ভারতীয় মুসলেম লীগের আন্দোলনের ফলে আজ ভারত হিন্দু ও মুসলমান প্রধান দুইটি স্বতন্ত্র দেশে বিভক্ত হইয়াছে। হয় ত এই বিভাগ স্থায়ী হইবে না, কিন্তু তথাপি আজ যে সকল হিন্দুকে মুসলমান প্রধান অঞ্চল অর্থাৎ পাকিস্থানে থাকিতে হইল—তাঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা জানাই যেন আমরা আমাদের বিজয়োৎসবের মধ্যে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া না যাই। ভগবান না করুন, যদি তাঁহারা নির্য্যাতিত হন, আমরা যেন তাঁহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হই। নচেৎ আমাদের এই স্বাধীনতা লাভ অসার ও নিরর্থক হইবে।

পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু—

বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুর মনোভাব কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমাদের জনৈক কথা-সাহিত্যিক বন্ধু কুমিল্লা হইতে এক পত্রে জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"১৫ই আগষ্ট আগাইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তির দিন আসন্ন। সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ভারতবর্ষ উন্মুখ, চঞ্চল। আনন্দোৎসবের আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু আজ অজানা আশঙ্কায় দিন গণিতেছে। আজ তাহার জন্য সৃষ্টি হইবে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার নূতন শৃঙ্খল। আজ সে স্বাধীন ভারতের কেহ নয়, ভারতের গৌরবের স্মৃতি-বিজড়িত জাতীয়-পতাকা তাহার কাছে বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতীক মাত্র। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার তাহার নাই। চন্দ্রতারকা-লাঞ্ছিত লীগ পতাকাকে রাষ্ট্রপতাকার সম্মান দিতে হইবে—তাহাকে করিতে হইবে অকুণ্ঠচিত্তে অভিবাদন—জয়ধ্বনি করিতে হইবে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। যে পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু ভারতের স্বাধীনতার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আজ ভারতের স্বাধীনতার দিনে তাহার কপালেই বিধাতা আঁকিয়া দিলেন সকলের চেয়ে বেশী দুঃখ—পরাজয়ের ও নিরাশার অপরিসীম গ্লানি। আপনাদের ঈর্ষা করি—ভারতের স্বাধীনতার আপনারা অংশভাগী। আপনাদের আনন্দ ও গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাউক, এই প্রার্থনা করি। তবুও এই অনুরোধ জানাই, আপনাদের আনন্দোৎসবের মধ্যে স্মরণ করিবেন, এই দুর্ভাগা পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দুদের—যাহাদের দুঃখ ও ত্যাগের মূল্যে ভারতের স্বাধীনতা ক্রীত হইয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী—

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম সদস্য চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী নূতন পশ্চিম



চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী

বঙ্গের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি সালেম জেলার সদরে উকীল ছিলেন—গত ২৭ বৎসর কাল তিনি একান্ত-ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস, ঐকান্তিকতা, নির্ভীকতা ও নিষ্ঠা আজ তাঁহাকে এই উচ্চ সম্মান দান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালা যেন তাঁহার নেতৃত্বে নূতন জীবন লাভ করিতে পারে, ইহাই আজ আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার কৃতী সন্তান, স্বনামধন্য নেতা ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস দলভুক্ত না হইলেও কংগ্রেস যে আজ তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তির সমাদর করিয়াছে, তাহা শুধু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে নহে, বাঙ্গালার পক্ষেও সম্মানের এবং গৌরবের বিষয়। হিন্দু মহাসভা দেশের বহু জাতীয় ভাবাপন্ন নেতাকে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে—আজ কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদকে গ্রহণ করায় কংগ্রেসেরও উদারতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আশা করি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই উচ্চপদে আসীন থাকিয়া সমগ্র ভারতের ও বিশেষ করিয়া বাঙ্গালার সেবা করিয়া ধন্য হইবেন।

সংস্কৃত শিক্ষা ও নূতন শিক্ষামন্ত্রী—

নিখিলবঙ্গ পণ্ডিত সমাজ হইতে গত ২৩শে জুলাই বাঙ্গালার নূতন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতিকে কলিকাতা আর্য্যসমাজ হলে এক সভায় সম্বর্দ্ধনা করা হইলে শিক্ষামন্ত্রী বলিয়াছেন—সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য করা সম্ভব না হইলেও সংস্কৃত পঠন, পাঠন, গবেষণা ও আলোচনার ব্যাপক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। বিচারপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।



ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বক্তৃতা

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা নেতা ও দেশসেবক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৫ই আগষ্ট হইতে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এখন দেশের কল্যাণের জন্ত



ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে আছেন ; তাঁহাকে বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রি-সভারও অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এখনও ফিরিতে না পারায় সে পদে কাজ করিতে পারেন



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

নাই। তাঁহার হয়ত ফিরিতে বিলম্ব হইবে, সেজন্ত তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর হইয়া কাজ করিবেন। বাঙ্গালী বিধানচন্দ্রের এই অসামান্ত সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে চিকিৎসার ক্ষেত্র হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার কথাই এই সুদিনে বার বার মনে পড়িতেছে। বিধানচন্দ্র যুক্তপ্রদেশে বাস করিলে বাঙ্গালী একজন সুচিকিৎসক হারাইবে বটে, কিন্তু বিধানচন্দ্রের এই গৌরবে গৌরবান্বিতও হইবে। বিধানচন্দ্রের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও কর্ম্মশক্তি অবশ্যই তাঁহাকে তাঁহার নূতন কাজে সাফল্য লাভে সমর্থ করিবে।



দমদম বিমান ঘাটীতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ফটো—ডি-রতন

দেবনারায়ণ সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা ৩১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটস্থ কিশোর আলেখ্য সম্মেলনের উদ্যোগে গত ১৭ই শ্রাবণ রবিবার সন্ধ্যায় শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুলের অমৃতলাল হলে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। কবি শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়া দেবনারায়ণের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় কলিকাতার বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন—

গত ২০শে ও ২১শে আষাঢ় সিথি বৈষ্ণব সম্মিলনার উদ্যোগে কলিকাতা, দমদম—২০নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে

বয়েজ ওন হোমের বিরাট হলঘরে নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর বক্তৃতার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মঙ্গলাচরণ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু উদ্বোধন করেন ও মূল সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। দ্বিতীয় দিনে সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন; দর্শন শাখায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন ও নবদ্বীপ নিবাস পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ সভাপতিত্ব করেন, কাব্য শাখায় কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক উদ্বোধন করেন ও ব্যারিষ্টার কবি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন ও শেষে কীর্ত্তন শাখায় শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। যাঁহাদের চেষ্টায় এই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই, বিশেষ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও বৈষ্ণবের কৃতজ্ঞতার পাত্র।



বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সমাগত সুধীবৃন্দ   ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী



বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ (১ম দিবস)   ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

রামচন্দ্রপুরে নূতন প্রতিষ্ঠান—

মানভূম জেলার যোরাদী ডাকঘরের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামে 'মহাত্মা নিবারণচন্দ্র আদর্শ বিদ্যালয়' ও 'স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ বিদ্যার্থী ভবন' নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয়টিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করার সকল ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থী ভবন গৃহ প্রস্তুত

হইতেছে, গৃহ সম্পূর্ণ হইলে বহু ছাত্র তথায় থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। স্বামী অসীমানন্দ (পূর্ব্বনাম অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ এবং প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। গ্রামে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশী ; তাহা ছাড়া যে দুই মহাপুরুষের নামে প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের নামকরণ করা হইয়াছে, তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কাজেই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সকল প্রকারে পূর্ণাঙ্গ হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হয়, সে বিষয়ে সকলের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

করেন। সম্মেলনে স্থানীয় বহু কবি ও সাহিত্যিকের লেখা পঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার অভিভাষণে নাটোর মহকুমার গৌরবময় ইতিহাস ও স্থানীয় সাহিত্যিকদিগের কথা বিবৃত করিয়াছিলেন।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা—

ক্যান্সার রোগ সহজে আরাম হয় না এবং তাহার চিকিৎসাও ব্যয়-বহুল। ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এ দেশে দিন দিন বাড়িতেছে। সে জন্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে উহার চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। তথায় পর্য্যাপ্ত স্থান নাই বলিয়া



ভাঙ্গী কলোনীতে মহাত্মাজীর দর্শন আশায় লেডী মাউণ্টব্যাটন

নাটোর লিজার ক্লাব—

গত ১১ই জুন রাজসাহী জেলার নাটোর সহরে স্থানীয় লিজার ক্লাবের বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী পুষ্পময়ী বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য

সম্প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি স্বতন্ত্র ক্যান্সার (কর্কট রোগ) চিকিৎসা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। এ বিষয়ে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করা হইয়াছে। আশা করি, অর্থাভাবে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে বিলম্ব ঘটিবে না।

খাজা নাজিমুদ্দীন নেতা নির্ব্বাচিত—

গত ৫ই আগষ্ট পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের লীগ দলের

পরিষদ-সদস্যদের এক সভায় বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীকে ৭৫—৩৯ ভোটে পরাজিত করিয়া খাজা নাজিমুদ্দীন দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ আই-আই-চুন্দ্রীগড় সভাপতিত্ব করেন। এখন খাজা সাহেবই পূর্ব্ববঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ৫ই আগষ্টের সাধারণ সভায় কলিকাতার হেয়ার ষ্ট্রীট হইতে হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত পথটির (উহা এখন ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট, চার্ণক প্লেস ও ক্লাইভ ষ্ট্রীট নামে পরিচিত) নেতাজী সুভাষ রোড নামকরণ করা হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ ও মুসলেম লীগ দলও প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছেন।



প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল সম্পর্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর ভাষণ ফটো—ডি-রতন

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের দায়িত্ব—

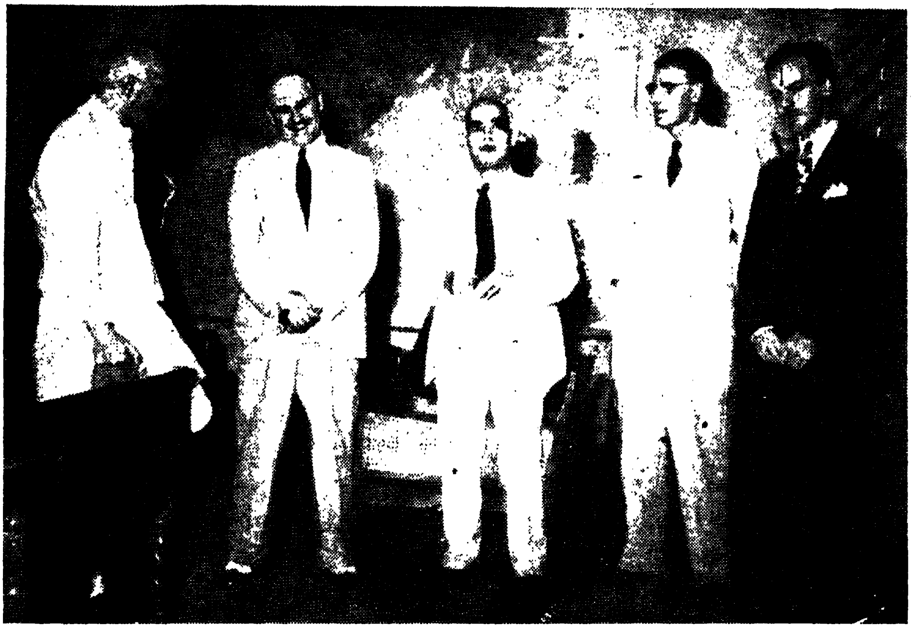
স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের কি দায়িত্ব থাকিবে সে বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও গত ২রা আগষ্ট নয়া-দিল্লীতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতই পৃথিবীর জাতি সংঙ্ঘে আপনার যোগ্য আসন লাভ করিতে পারে ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। এই গুরুতর কর্মভার গ্রহণের যোগ্যতা দেশে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানের নাই। এই জন্যই কংগ্রেসের দায়িত্ব আজ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক। জনসাধারণের সমর্থনে গঠিত রাজনৈতিক দল না থাকিলে স্থায়ী শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট হইতে পারে না। এজন্যও আজ কংগ্রেসের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ

গত ৩রা আগষ্ট করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছেন—ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ-ভাবে চেষ্টা করিয়া যাইবে। ভারতের দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। উভয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকিতে ও সম্মানজনকভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে। তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে দেশান্তর গমন করিতে হইবে। অন্য কারণে দেশান্তর

গমন উচিত হইবে না। যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান না করিবে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিবে। পাকিস্তানেও কংগ্রেস পূর্ব্বের মতই কাজ করিয়া যাইবে।

গভর্ণরের কাজ করিবেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে—গভর্ণর জেনারেল—মিঃ এম-এ-জিন্না। পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্ণর—সার ফ্রান্সিস মুডি। সিন্ধুর গভর্ণর—মিঃ গোলাম হোসেন হিদায়েতুল্লা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর—স্যার



ক্যানেডার উচ্চপদস্থ বিভাগীয় কর্মীগণ ও পণ্ডিত জহরলাল

নূতন গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণর—

১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতের দুইটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরের কাজ করিবেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—গভর্ণর জেনারেল—লর্ড মাউণ্টবেটেন। মাদ্রাজের গভর্ণর—সার আর্চিবল্ড নাই। বোম্বায়ের গভর্ণর—সার ডেভিড কলভিনি। আসামের গভর্ণর—সার আকবর হায়দারি। পশ্চিম বঙ্গ—শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারি। পূর্ব্ব পাঞ্জাব—সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা। বিহার—শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম। উড়িষ্যা—ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু। যুক্তপ্রদেশ—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ডাক্তার রায় এখন আমেরিকায় আছেন—তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশে জর্জ্জ কানিংহাম। পূর্ব্ব বঙ্গের গভর্ণর স্যার ফেডারিক বুর্ণ। শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকোয়াসা বর্ত্তমানে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি, ডাক্তার কৈলাসনাথ কাটজু—যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সচিব। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম সিন্ধুর খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা।

পাকিস্তান গণপরিষদে শ্রীহট্ট সদস্য—

গত ২রা আগষ্ট শ্রীহট্ট হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীহট্টবাসীরা অধিক ভোটের দ্বারা উক্ত জেলাকে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—মিঃ আবদুল হামিদ, আবদুল মতিন চৌধুরী ও অক্ষয়কুমার দাস। ১১ জন কংগ্রেস সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন—

অক্ষয়কুমার দাস, রমেশচন্দ্র দাস ও যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, ভোটে যোগদান করেন। ৭ জন সদস্য কলিকাতায় ছিলেন, যথা সময়ে শিলঙ্-এ যাইতে পারেন নাই।

সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন—

সিন্ধু দেশের মুসলেম লীগ মিঃ এম-এ-খুরোকে দলের নেতা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। কাজেই তিনি সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী হইবেন। খুরোর জীবন-কাহিনী অসাধারণ।



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও ফিল্ড মার্শাল ভাইকাউণ্ট মণ্টগোমারী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—

এই সংখ্যায় অন্যত্র 'শহীদ ক্ষুদিরাম' শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রচনা ও তাহাতে সুর যোজনা করিবার সময় রচয়িতা—লালগোলার রাজা, আমাদের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে শয্যাশায়ী। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া পুনরায় দেশের ও সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হউন।

ছাড়পত্র ও মুদ্রা সমস্যা—

দিল্লীতে স্থির হইয়াছে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান যে কোন দেশ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত এক দেশ হইতে অন্য দেশে প্রবেশের জন্য কোন পাসপোর্ট বা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে ১৯৪৮ সালের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একই মুদ্রা চালু থাকিবে। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর নাগাদ পাকিস্থানে স্বতন্ত্র কারেন্সি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুইটি দেশের মধ্যে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য চলিবে। একচেটিয়া অধিকার বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ থাকিবে। এই সকল প্রস্তাবে উভয় রাষ্ট্রই সম্মত হইয়াছেন।



আমেরিকার রাষ্ট্রদূত মিঃ হেনরী গ্রেডী ও পণ্ডিত নেহরু

পশ্চিম বঙ্গে নুতন নিয়োগ—

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা নিম্নলিখিত ভাবে কর্মী নিয়োগ করিয়াছেন-(১) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ এস-সেন আই-সি-এস (২) রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য—মিঃ এস-ব্যানার্জ্জি আই-সি-এস (৩) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ এস-এন-রায় আই-সি-এস (৪) স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ আর-গুপ্ত আই-সি-এস (৫) অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস-কে-মুখার্জ্জি আই-সি-এস (৬) বিচার ও আইন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ বি-কে-গুহ আই-সি-এস (৭) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সেক্রেটারী—মিঃ এস-কে-গুপ্ত আই-সি-এস (৮) কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম-কে-কৃপালনা আই-সি-এস (৯) শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে-সি-বসাক আই-সি-এস (১০) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস-কে-চ্যাটার্জ্জি আই-সি-এস (১১) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিঃ এ-ডি-খান আই-সি-এস (১২) গভর্ণরের সেক্রেটারী মিঃ বি-এন-চক্রবর্ত্তী আই-সি-এস (১৩) কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার—মিঃ এস-কে-দে আই-সি-এস (১৪) প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ কে-কে-হাজরা আই-সি-এস (১৫) গঠনতন্ত্র, নির্ব্বাচন ও মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী মিঃ এস-বি-বাপাত আই-সি-এস (১৬) বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার

মিঃ বি-বি-সরকার আই-সি-এস (১৭) অন্যান্য জেলার কমিশনার মিঃ জে-এন-তালুকদার আই-সি-এস (বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহ ছাড়া জলপাইগুড়ি অন্যান্য সকল জেলার বিভাগীয় সদর বলিয়া গণ্য হইবে।) (১৮) সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ বি-কে-আচার্য্য আই-সি-এস (১৯) কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ এন-কে-রায়চৌধুরী আই-সি-এস (২০) কলিকাতার এডিসনাল চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি-পি-আই-বৈদ্যনাথম্ আই-সি-এস (২১) কলিকাতার স্পেশাল ল্যাণ্ড একুইজিসন কলেক্টার মিঃ বি-এন-মিত্র আই-সি-এস (২২) শ্রমিক ক্ষতি পূরণ ও কৃষি আয়কর ট্রাইবিউনালের সভাপতি মিঃ এস-কে-সেন আই-সি-এস (২৩) ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর-কে-মিত্র আই-সি-এস (২৪) হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ আর-এ-এস-ষ্ট্র্যাসি আই-সি-এস (২৫) হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি-এ-বোরোনহা বি-সি-এস (২৬) বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস-এন-মিত্র আই-সি-এস (২৭) বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার অধিক্রম মজুমদার বি-সি-এস (২৮) বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন জি-রায় বি-সি-এস (২৯) খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট—মিঃ ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-সি-এস (৩০) মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ-কে-ঘোষ আই-সি-এস (৩১) জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ আর-কে-রায় আই-সি-এস (৩২) দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী কমিশনার মিঃ বি-জি-ক্রীক আই-সি-এস (৩৩) ২৪ পরগণার জেলা জজ মিঃ এস-এন-গুহ-রায় আই-সি-এস (৩৪) হাওড়ার জেলা জজ মিঃ এ-এস-রায় আই-সি-এস (৩৫) হুগলীর জেলা জজ মিঃ এস-কে-হালদার আই-সি-এস।

উভয় বাঙ্গলায় রাষ্ট্রভাষা বাঙ্গলা—

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির উদ্যোগে ৭ই জুলাই ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক চাপে আজ সোনার বাঙ্গালা বিভক্ত। বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব বিপন্ন। বঙ্গভাষার গতি ব্যাহত হইবার আশঙ্কায় বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি সমগ্র বাঙ্গালা ভাষাভাষী নরনারীকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও স্ফুরণ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ ও যত্নবান হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। এই সমিতি আশা করেন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার বাহনে তাঁহাদের শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন এবং দুইটি প্রদেশের যাবতীয় রাষ্ট্র কার্য্যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইবার দাবী করিবেন। এই ভাষার বন্ধনের দ্বারাই সাত কোটি বাঙ্গালী জাতির মধ্যে অখণ্ডতা ও সৌহার্দ্দ্য রক্ষিত হইবে। এই সমিতি বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকগণকে ও কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরূপ জনমত সৃষ্টির জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে।

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী



৺গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৪শে এপ্রিল ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা

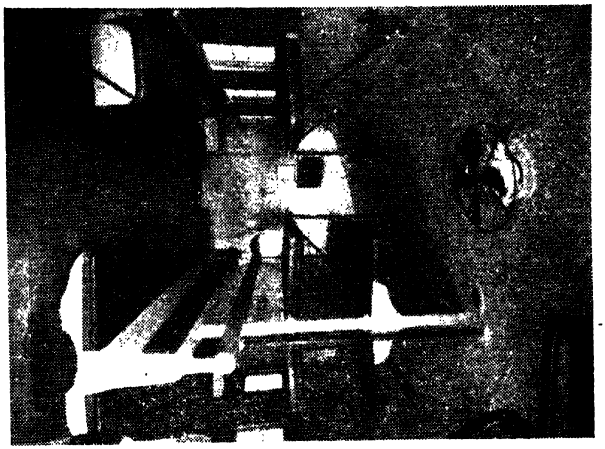
লাভ করিয়া অনাড়ম্বর শান্ত ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করিতেন ও শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোন্নগর পাঠচক্র ও অন্যান্য সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল।

কাশীধামে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবাসস্থান—

১৫১৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য মহাপ্রভু কাশীধামে দুই মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রশেখরের ভিটায় অবস্থান করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভোজন করিতেন এবং সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে বসিয়া সনাতন গোস্বামীকে বৃন্দাবন প্রকটের পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। কাশীর সেই বটবৃক্ষতল বর্ত্তমানে কাল ভৈরবের মন্দিরের সন্নিকটে যতন বড় (চৈতন্য বট) মহল্ল নামে পরিচিত। এই স্থানটি বেনারস মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের দখলে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ও বেনারসের গোপালদাস আগরওলা বাবাজীর চেষ্টায় সে স্থানে একটি চাঁদনী নির্ম্মিত হইয়াছে ও রাস্তার নাম "চৈতন্য রোড" হইয়াছে। সম্প্রতি রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, জ্যোতিষবাবু ও চকদিঘির শ্রীলীলামোহন সিংহের সহিত কাশীধামে গমন করিয়া বেনারস মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নিকট হইতে স্থানটি "স্থান উদ্ধার সমিতিকে" দিবার ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। তাঁহারা ২রা আগষ্ট কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্কুলে চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর জগন্নাথপ্রসাদ মেটার সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা করিয়া কাশীবাসীদের চিত্ত গৌরাঙ্গ-স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপ্রকাশ মহাশয় স্থানীয় কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব চৈতন্যদেবের কাশীপ্রবাস স্থান প্রকট করিবার জন্য অর্থাদি সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোডে সম্পাদকের নিকট যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা—

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া নূতন স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রধান মন্ত্রী—পররাষ্ট্র বিভাগ (২) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল—দেশীয় রাজ্য, স্বরাষ্ট্র, সংবাদ ও বেতার বিভাগ (৩) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—খাদ্য ও কৃষি (৪) সর্দ্দার বলদেব সিং—দেশরক্ষা (৫) আর-কে-সন্মুখম্ চেট্টি—অর্থ (৬) ডক্টর বি-আর-আম্বেদকর—আইন (৭) ডক্টর জন মাথাই—রেল (৮) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—শিল্প ও সরবরাহ (৯) মিঃ সি-এচ-ভাবা—বাণিজ্য (১০) মিঃ এন-ডি-গ্যাডগিল—পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ (১১) রফি আমেদ কিদোয়াই—চলাচল (১২) রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য (১৩) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা (১৪) মিঃ জগজীবন রাম—শ্রম।



সিলভার এ্যারো—নূতন পরিকল্পনায় যুদ্ধপরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ট্রেণ

চট্টগ্রামে ভীষণ বন্যা—

চট্টগ্রাম বিভাগে ভীষণ বন্যার ফলে সমগ্র বিভাগের তিন পঞ্চমাংশ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা, পটিয়া, বোয়ালখালি, সাতকানিয়া, কাঞ্চনা, ধেমসা ও আলোস্থিয়ার ক্ষতি সাংঘাতিক। কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ৫ সহস্র গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই। শুধু পটিয়ার বাজারে ৩ হাজার লোক আশ্রয় লইয়া আছে। চক্রশালা গ্রামে দেড় হাজার আশ্রয়প্রার্থী সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংক্রামক পীড়া

দেখা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও অধিক হইবে।

কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা নিখিল বঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ গত ২০শে আষাঢ় সন্ধ্যায় সম্মিলন স্থানে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক সভায় বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি



কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন মল্লিককে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমুদরঞ্জন আত্মভোলা মানুষ, স্তুতি-নিন্দার তিনি বাহিরে। তিনি মনের আনন্দে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। সর্ব্বোপরি তিনি পল্লীবাসী। কাজেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরাই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরা এই উপলক্ষে কবির সুদীর্ঘ কর্ম্মময় ও শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি।

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা—

পাকিস্থান গণপরিষদে নিম্নলিখিতরূপ জাতীয় পতাকা স্থির হইয়াছে—পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হইবে—৩ ও ২। দণ্ডের সন্নিহিত অংশে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে বিস্তৃত শ্বেতাংশ থাকিবে ও উহা সমগ্র পতাকার এক চতুর্থাংশ হইবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ গাঢ় সবুজ বর্ণের হইবে ও সবুজের মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র ও একটি পঞ্চমুখীতারকা থাকিবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

১৩ই আগষ্ট মস্কোতে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সোভিয়েট রুশিয়ায় প্রথম স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের দূতের কাজ লইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শদাতা মন্ত্রী মিঃ এ-ভি-পাই, সেক্রেটারী মিঃ প্রেমকৃষ্ণ, সাংস্কৃতিক অফিসার ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষাল, প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি-এন কৌল ও পাবলিক রিলেসন্স অফিসার কুমারী চন্দ্রলেখা পণ্ডিতও তথায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।



বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মিলনের দর্শন শাখার সভাপতি
পণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি—

১১ই আগষ্ট করাচীতে পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মিঃ এম-এ-জিন্না গণপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পরিষদে অস্থায়ী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি হইয়া মিঃ জিন্না ঘোষণা করেন যে, গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও যে কোন প্রকারেই হউক জনসাধারণের ধন-সম্পত্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসকে নিরাপদ রাখা। আজ যে ব্যাপক উৎকোচ ও দুর্নীতি চলিতেছে উহা দমন করা হইবে। চোরা-কারবার ও আত্মীয়পোষণ বন্ধ হইবে। দরিদ্র জনসমাজের কল্যাণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। যিনি যে কোন

ধর্ম্মেই বিশ্বাসী হন না কেন বা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হন না কেন, তাহার সহিত রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

উপলক্ষে প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।



তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভার বিগত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অধিবেশন কালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেজর জেনারেল এ-সি-চ্যাটার্য্যি ও শ্রীযুক্ত এন সি চাটার্য্যি

ফটো—তারক দাস



উত্তর কলিকাতার নববর্ষ উৎসবের সভায় বক্তৃতারত সভাপতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

ফটো—জে-কে-সান্যাল

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর সম্বর্দ্ধনা—

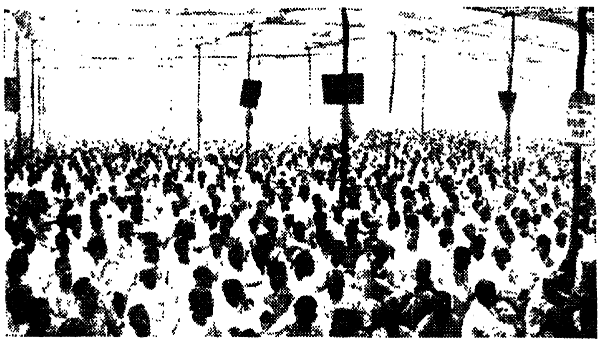
গত ৩রা শ্রাবণ খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স ৫০ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। সেই দিন তাহার প্রীতিকামী বন্ধুগণ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এই

নেতাজী সুভাষ রোড—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৩ই আগষ্টের সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে হ্যারিসন রোড হইতে হেয়ার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত (ক্লাইব ষ্ট্রীট, চার্চকপ্রেস ও ডালহৌসী স্কোয়ার ওয়েষ্ট) রাস্তার নাম 'নেতাজী সুভাষ রোড' করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিল্লী যাওয়ায় তাঁহার স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু ঐ বিভাগের প্রথমারম্ভ হইতে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, দিল্লী, নাগপুর, লাহোর, আগ্রা, বোম্বাই, পাটনা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন।



তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে বিপুল জনতার একাংশ
ফটো—তারক দাস

নিখিল ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে ৪ দিন নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যে যে নূতন নূতন সৃষ্টি ও ভাবধারার প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার সহিত সর্ব্ব প্রদেশের সাহিত্যিকদের সম্যক পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। আমরাও এরূপ একটি সম্মেলনের প্রয়োজন স্বীকার করি।

সম্মেলন বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। ইহার কার্য্যকরী সমিতিতে বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি আছেন দিল্লী প্রবাসী শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ মহাশয়। তিনি আমাদিগকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে বহু সাহিত্যিকের ঠিকানা না জানা থাকায় সম্মেলন তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে পারেন নাই। সম্মেলনে যোগদান করিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহারা যদি ১নং ওল্ড মিল রোড, নিউ দিল্লী এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত দাশের সহিত পত্রালাপ করেন তাহা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালী সাহিত্যের জন্য যে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা যেন বাঙ্গালী পায়, সে বিষয়ে সাহিত্যিকগণকে অবহিত হইতে শ্রীযুক্ত দাশ অনুরোধ করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী ৯ই আগষ্ট শনিবার সকালে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছিলেন। ২ দিন বিশ্রামের পর তাঁহার নোয়াখালি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধির ফলে তিনি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী পরিদর্শন করেন ও স্থির করেন যে তিনি কয়েক দিন কলিকাতার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এক পল্লীতে বাস করিবেন। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী গান্ধীজির সহিত একই গৃহে বাস করিয়া গান্ধীজির এই কার্য্যে সাহায্য করিতে সম্মত হন। তাঁহারা বেলিয়াঘাটায় নবাব আবদুল গণির পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেছেন।

সীমা কমিশনের রায়—

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব রাত্রি হইতে কলিকাতায় হিন্দুমুসলমানের মিলিত শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। মুসলমানগণ দলে দলে পথে বাহির হইয়া হিন্দুদের সহিত স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে ও নিজেরাও উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছে। বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ, হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ, মহাত্মা গান্ধীর জয়, আল্লা হো আকবর প্রভৃতি রবে বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে কলিকাতা সহর মুখরিত হয়। শুক্র, শনি ও রবি তিনদিন ধরিয়া অবিরাম সে উৎসব চলে। সোমবার মুসলমানপর্ব্ব ঈদ উপলক্ষে হিন্দুরাও মুসলমানদের উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ করিয়াছে। সেই আনন্দের মধ্যে ১৮ই জুন সকালে সীমা কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়। ভাগাভাগির সময় কোন বিচারকই উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।

কাজেই হয় ত কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই। তথাপি বলিতে হয়, সীমা কমিশনের সভাপতি সার সিরিল রাডক্লিফ যে রায় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচায়ক। তিনি বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—বাঙ্গালা—পূর্ব্ববঙ্গ পাইয়াছে—পুরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহি বিভাগের রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহি ও পাবনা জেলা সম্পূর্ণভাবে ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের সম্পূর্ণ খুলনা জেলা। পশ্চিম বঙ্গ পাইয়াছে—পুরা বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের পুরা জেলা—কলিকাতা,২৪পরগণা ও মুর্শিদাবাদ এবং রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা। তাহার পর নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি ৫টি জেলা ভাগ করিয়া উভয় দেশকে কিছু অংশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে—খোকসা, কুমারখালি, কুষ্ঠিয়া, মীরপুর, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাংনা, দামুর হুদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর ও মেহেরপুর থানা এবং দৌলতপুর থানার মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্বাংশ। যশোহর জেলার মধ্যে মাত্র বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা দুইটি পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে ও বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে—রায়গঞ্জ, ইতাহার, বংশীহরি, কোষমাণ্ডি, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ থানা এবং বালুরঘাট থানায় উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রেল লাইনের পশ্চিমের অংশ। দিনাজপুরের বাকী অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার মাত্র তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ ও পাটগ্রাম থানা ও কুচবিহার রাজ্যের দক্ষিণের কিছু অংশ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছে—বাকী সমগ্র জেলা পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও ভুলাঘাট থানা পূর্ব্ববঙ্গে ও বাকী অংশ পশ্চিম বঙ্গে গিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার ৪টি থানা—পাথরকান্দী, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ ও বদরপুর—আসাম প্রদেশের মধ্যে আছে—জেলার বাকী সকল অংশ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আসাম প্রদেশের আর কোন অংশ পূর্ব্ববঙ্গে আসে নাই।

সীমা কমিশনের নির্দ্দেশমত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে গিয়াছে—পুরা মুলতান ও রাওলপিণ্ডি বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের গুজরানওয়ালা, শেখুপুরা ও শিয়ালকোট জেলা। পূর্ব্ব পাঞ্জাব পাইয়াছে—পুরা জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ এবং লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা। লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা উভয় দেশের মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

বেদনা বিহ্বল কাঁপে বেণুবন দূর,
কাঁদে দুখে ভাগীরথী সকরুণ সুর।
যৌবনপীড়িতা কাঁদে আঁখি তারা ম্লান,
এলোমেলো সব যেন ছন্দহারা গান।
নির্ম্মম নিষাদ ক্ষিপ্ত বিচ্ছেদের বান
প্রতিপলে হৃদয়েরে করে শতখান।
রক্তাক্ত পরাণ পাখী আর্ত্তনাদ করে,
অলক্ষ্যে শোণিত বিন্দু নিঃশেষিয়া ঝরে।
সার্থকতা নাহি নামে ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া,—
স্বামী পরিত্যক্তা নারী, অদৃষ্টের ক্রিয়া!

হতাশার অশ্রুভারে লবণ জলধি,
গোপনে গরজে বক্ষে ক্ষোভে নিরবধি।
আস্বাদিত জীবনের সুধা স্মৃতি ভার,
রচিয়াছে তার লাগি ক্রুর কারাগার।
আশার পুরবী মৌন পথহারা সুর,
প্রিয়ের সন্ধানে লাগি গেছে চলি দূর।
দৈন্যের অভাব তিক্ত প্রচুরের মাঝে,
অন্তরে দংশন করে নিত্য প্রতি কাজে!
বিচ্যুতা লতিকা দুঃখে লোটে ধরাতল'—
ব্যর্থকাম পূজারিণী আঁখি ছল ছল।

খেলা ধুলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আমেরিকান ও বৃটিশ টেনিস খেলা ঃ

আমেরিকান ন্যাশনাল লন টেনিস টুর্ণামেন্টের আউট-ডোর প্রতিযোগিতা ১৮৮১ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। আর ডি সিয়ার্স ১৮৮১-১৮৮৭ সাল পর্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে সাত বছর সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে রেকর্ড করেন। এর পর উইলিয়াম টি টিলডেন ১৯২০-২৫ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ছ'বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ পান। এবং তাছাড়া ১৯২৯ সালেও তিনি চ্যাম্পিয়ান হ'ন। মেয়েদের সিঙ্গলস টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ১৮৮৭ সাল থেকে। পুরুষদের ডবলসের খেলা ১৮৮১ সালে এবং মেয়েদের ১৮৯০ সালে প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পুরুষদের ইন-ডোর ডবলস ও সিঙ্গলসের খেলা ১৯০০ সালে এবং মেয়েদের সিঙ্গলস ১৯০৭ সাল এবং ডবসের খেলা ১৯০৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। আমেরিকান টেনিস 'Rankings' এ পুরুষদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন আর ডি সিয়ার্স ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত। এর পর উইলিয়ম টি টিলডেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯২০-২৯সাল পর্য্যন্ত পুরুষদের সিঙ্গলস 'Rankings' তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

মেয়েদের 'Rankings' তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। ঐ বছর মেরী কে ব্রাউনী শীর্ষস্থান লাভ করেন। 'আমেরিকান লন টেনিস এসোঃ চ্যাম্পিয়ানস' প্রতিযোগিতায় মহিলা এবং পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। 'ইলিংস মেন'স সিঙ্গলস ও ডবলস চ্যাম্পিয়ানস' খেলার সূচনা হয়েছে যথাক্রমে ১৮৭৭ এবং ১৮৭৯ সাল থেকে। প্রথম কয়েক বছর ইংরেজ টেনিস খেলোয়াড়দেরই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল কিন্তু পরে পৃথিবীর সকল দেশের টেনিস খেলোয়াড়দের জন্য এই প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত হয়। মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডবলসের খেলা যথাক্রমে ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালে প্রথম আরম্ভ হয়।

ডেভিস কাপ ঃ

লন টেনিস জগতে 'ডেভিস্ কাপ'এর নাম সারা পৃথিবীব্যাপী। পৃথিবীর খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় Hon. Dwight Filley Davis তাঁর নামে এই 'ডেভিস কাপ' দান করেন। ইউ এস সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতি-যোগিতায় ডেভিস দু'বার রাণার্স আপ্ হয়েছিলেন এবং এইচ ওয়ার্ডের জুটিতে তিনবার ডবলস বিজয়ী হন। ১৯২০ সালে তিনি ইউ এস ক্যাবিনেটে যুদ্ধের সেক্রেটারী হন। ১৯২৯ সালে ফিলিপাইনের গভর্ণরের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে ৪৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান। প্রথম কয়েক বছর ইংলণ্ড এবং আমেরিকা, মাত্র এই দুটি দেশের খেলোয়াড়রা 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। ক্রমশঃ যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২৮ সালে ৩৪টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। গড়পড়তায় প্রতি বারে ২৫টি দেশ আন্তর্জাতিক 'ডেভিস কাপ' প্রতিযোগিতায় যোগদান করে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ১৯১৫-১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা বন্ধ ছিল। আমেরিকা ১৯০৪, ১৯১২ এবং ১৯১৯ সালে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম বছর, ১৯০০ সালে আমেরিকা ৫-০ গেমে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে

পরাজিত করে। এ পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে আমেরিকা ১৩ বার, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৫ বার, গ্রেট বৃটেন—৪ বার, অষ্ট্রেলিয়া—৭ বার, ফ্রান্স—৬বার। পর্য্যায়ক্রমে ডেভিস কাপ পেয়েছে সব থেকে বেশী আমেরিকা ৭ (১৯২০—১৯২৬), তারপর ফ্রান্স—৬ (১৯২৭—১৯৩২), অষ্ট্রেলিয়া—৫ (১৯০৭—১৯১১), গ্রেট বৃটেন—৪ (১৯৩৩—১৯৩৬), বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ—৪ (১৯০৩—১৯০৬)।

হুইটম্যান কাপ ঃ

পুরুষদের আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতা বলতে যেমন 'ডেভিস কাপ' তেমনি মেয়েদের 'হুইটম্যান কাপ'। আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব ন্যাশনাল সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান মিসেস লাজেস চেটচিক্‌স হুইটম্যান এই মনোরম কাপটি আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের বাৎসরিক টেনিস প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দান করেন।

শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় ঃ

মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে মিসেস হেলেন উইলস মুডী পৃথিবীর টেনিস মহলে সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে শীর্ষ স্থান অধিকার করে থাকবেন। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন টেনিস খেলায় যোগদান করে তিনি যে রেকর্ড করে গেছেন তা অতিক্রম করা খুব সহজ নয়।

পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকারী ডোনাল্ড বাজের নাম টেনিস জগত থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। বাজ টেনিস খেলায় যে সব রেকর্ড ক'রে গেছেন তা ভাঙ্গতে অনেক দিন লাগবে। তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে ভাইন্সের সঙ্গে খেলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ডোনাল্ড বাজ, ফ্রেড পেরী, ভাইন্স অষ্টিন, কোসে, ব্রমউইচ, পুনসেক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১৭৫ ও ১৮৪

ইংলণ্ড ঃ ৩১৭ (৭ উইঃ ডিক্লে) ও ৪৭ (কোন উইকেট না হারিয়ে)

ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করেছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি ড্র যায় এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাদলকে যথাক্রমে ১০ উইকেট এবং ৭ উইকেটে পরাজিত করে।

২৬শে জুলাই লিডসে ২০,০০০ হাজার দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা টসে জয়লাভ ক'রে খেলা আরম্ভ করে। খেলার সূচনা শুভ হ'ল না, দলের মাত্র এক রানে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম উইকেট পড়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের মোট ১৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। দলের উল্লেখযোগ্য রান করলেন বি মিচেল ৫৩ এবং ডি নোর্স ৫১। ইংলণ্ডের বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখালেন বাটলার ও এডরিচ। বাটলার ২৮ ওভার বল ক'রে ১৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৩৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেলেন। এডরিচ পেলেন ৩টে উইকেট ১৭ ওভার বল করে ৪টা মেডেন নিয়ে এবং ৪৬ রান দিয়ে। কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড প্রথম দিনের খেলার শেষে প্রথম ইনিংসে ৫৩ রান ক'রে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড সারা দিনব্যাপী ব্যাট ক'রে ঐ দিনের খেলার শেষে ৭ উইকেটে ৩১৭ রান তুলে। এল হ্যাটন ১০০, সি ওয়াসব্রুক ৭৫ এবং ডবলউ এডরিচ ৪৩ রান ক'রে আউট হ'ন।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংলণ্ড আর ব্যাট না ক'রে প্রথম ইনিংসের উইকেটে ৩১৭ রানের উপরে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের থেকে ১৪২ রান পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। এবারও খেলার সূচনা ভাল হ'ল না। দলের ৬ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ল। দ্বিতীয় উইকেট পড়ল ১৬ রানে। এর পর দক্ষিণ আফ্রিকা খেলা অনেকখানি আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় স্কোর বোর্ডে দেখা যায় ৩ উইকেটে তাদের ১০৩ রান উঠেছে। ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটন মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরের বল এক হাত দিয়ে চমৎকার লুফে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক এ মেলভীলীকে আউট করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৪ রানে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ করলেন ডি নোর্স ৫৭। ১৪০ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী ক'রে তিনি মোট রান তুলেন।

[দ]ক্ষিণ আফ্রিকাকে দ্বিতায় ইনিংসে এই শোচনীয় অবস্থার [স]ম্মুখীন হতে হয়েছিল ইংলণ্ডের বোলার বাটলার এবং [ক্র]্যানষ্টোনের বোলিং সাফল্যের জন্য।

ক্র্যানষ্টোন দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ চারটে উইকেট [পে]য়েছিলেন ৬টা বল ক'রে কোন রান না দিয়ে। তিনি [স]র্ব্বসমেত ৭ ওভার বল ক'রে ৩টে মেডেন পান এবং [বি]পক্ষকে মাত্র ১২টা রান করতে দেন। বাটলার ২৪ ওভার বল ক'রে মেডেন পান ৯টা আর ৩২ রান দিয়ে উইকেট পান ৩টে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৩টে উইকেট [পে]য়েছিলেন ২৬টা বল ক'রে মাত্র ১২ রান দিয়ে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৩ রান তোলার জন্য ইংলণ্ড [দ্বি]তায় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ৪০ মিনিট খেলার [প]র কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড ৪৭ রান তুলে [চ]তুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ১০ উইকেট জিতে যায়।

পৃথিবীর ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

১৯০৬ সালে ইংলণ্ড এবং সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayward) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৬১ ইনিংসে ৩,৫১৮ রানের পৃথিবীব্যাপী রেকর্ড দীর্ঘ ৪১ বৎসর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল আজ ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় বিল এডরিচ তা অতিক্রম ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছেন বলে [স]কলেই আশা করছেন। এ বছরের ক্রিকেট মরসুমে এডরিচ ২৬ ইনিংসের খেলায় ইতিমধ্যে ২,৩১৫ রান তুলে [ফে]লেছেন। বাকি ১,২০৪ রান তুলে নতুন রেকর্ড করতে তাঁর হাতে এখনও প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ রয়েছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহল উদগ্রীব হয়ে তাঁর খেলার দিকে চেয়ে আছে।

জো লুই ঃ

পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টি [যো]দ্ধা জো লুইকে হারিয়ে কেউ আর পৃথিবীর হেভিওয়েট [চ্য]াম্পিয়ানসীপের সম্মান তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারছেন না। নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে জো লুইকে বহু মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত অপরাজিত হয়ে আছেন। নিজ সম্মান রক্ষার জন্য তিনি আর কতদিন এই ভাবে লড়াই করবেন তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে গলফ ক্রীড়ারত জো লুই খুব তাড়াতাড়িই উত্তর দেন 'Just three more fights and then I quit in 1948 if I am still undefeated.

পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ঃ

মস্কো রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, রাশিয়ার 'Strong man' Grigori Novak পৃথিবীর ভারোত্তলন ইতিহাসে আর একটি রেকর্ড স্থাপন করেছেন। এই পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি দীর্ঘাকৃতি ভারোত্তলন বীর ৩০৬ পাউণ্ড ১০ আউন্স দু'হাতে মিলিটারী প্রেসে উত্তোলন ক'রে পৃথিবীর পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

* * * *

জামায়িকার Cynthia Thompson জর্জ্জটাউনে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জ্জাতিক খেলাধুলায় মহিলাদের ১০০ গজ দৌড় ১০·৮ মিনিটে শেষ করে ১৯৪৪ সালে হলাণ্ডের F. C. Blankers koen কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ডের সঙ্গে সমান ক'রেছেন।

বৃটিশ রেকর্ড ঃ

গ্লাসগো রেঞ্জার্স বার্ষিক স্পোর্টসে এ্যালেন প্যাটরসন (বৃটেন) এবং ভিসি (আমেরিকা) উভয়েই ৬ ফিট ৭½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম ক'রে আধ ইঞ্চির ব্যবধানে পূর্ব্বের 'বৃটিশ হাইজাম্প' রেকর্ড ভেঙ্গেছেন।

* * * *

উইমেনস এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় মিস এম লুকাস ১১৯ ফিট ৯ ইঞ্চি দূরত্বে 'ডিসকাস থ্রো' ক'রে গত বৎসরে প্রতিষ্ঠিত নিজের ১১৭ ফিট ৫ ইঞ্চির বৃটিশ মহিলা রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

* * * *

হার্ডল রেসে ২০ মিটার দূরত্ব মিস এস গার্ডনার ১১৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "টক্‌টিকি ও চড়াই"—২৲
শ্রীঅশোককুমার মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সবই যখন অন্ধকার"—১৲
শ্রীরাজমোহন নাথ-সম্পাদিত "সোণাধনের গীত"—৸৹
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা অনুদিত "গীতা-বোধ"—১৲
শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীশ্রীশনি-পূজা ও কথা"—৵১৹
অনিলচন্দ্র রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অনুপমাদি"—১৷৹
বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রণীত "বৃটীশ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিল কেন?"—৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



শিল্পী—শ্রীযুক্ত ফণি গুপ্ত | বরণডালা | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্





ভারতবর্ষ



আশ্বিন—১৩৫৪

প্রথম খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও মহাত্মাজী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(১)

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। মুসলমান দেশ শাসন করিতেছিল। সেদিন তাহারা তৃতীয় পক্ষের প্রশ্রয়-প্ররোচিত, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত, পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সঙ্ঘবদ্ধ ভীষণতম অত্যাচারে দেশে নোয়াখালির সৃষ্টি করিত না বটে, কিন্তু অত্যাচার ছিল। দেশে তৃতীয় পক্ষ বলিতে কেহ ছিল না। তথাপি দেশ যেন একটা অনবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই পথ চলিতেছিল। বাঙ্গালার লোভনীয় সম্পদ দেশ বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই রাজপদও নিরাপদ ছিল না। এমন কি গৌড়ের স্বর্ণ-সিংহাসনের মাণিক্যদ্যুতি, রাজভৃত্য—পুর-রক্ষক হাবসিগণকেও উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। রাজাবরোধের শুদ্ধান্তঃকক্ষে রাজমুণ্ড লইয়া তাহারা যেন গেণ্ডুয়া খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিল। ইহার বিষাক্ত প্রভাব রাজধানী হইতে দূরে বহু পল্লীর দুর্ব্বল দেহেও এক সংক্রামক বিসর্পের সৃষ্টি করিয়াছিল। উচ্চ হইতে নীচ পর্য্যন্ত রাজবল্লভগণ অধিকাংশই ছিল—কুশাসক, নিষ্ঠুর শোষক, দুর্নীতিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, অলস, বিলাসী, ব্যভিচারী। ইহারা বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সদাচার পালনে, চিরাচরিত ধর্ম্মাচরণেও ইহারা বাধা দিত। মন্দির লুণ্ঠন করিত, দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিত, লোচনলোভন ভাস্কর্য্যমণ্ডিত দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই উপকরণে মসজিদ নির্ম্মাণ করিত। সুন্দরী যুবতী হিন্দু নারী শান্তিতে সংসার করিতে পারিত না। দেশের সর্ব্বত্রই একটা আতঙ্ক, একটা অনিশ্চয়তা, একটা জাড্যজড়িত বিমূঢ় ভাব। বিধর্ম্মী—প্রায় বহুলাংশে বর্ব্বর কুশাসকের দুঃশাসনশাসিত সে কালের বাঙ্গালার এক দিকের ইহাই সংক্ষিপ্ত চিত্র।

অন্যদিকে সমাজ দেহও সুস্থ ছিল না। সমাজের

শীর্ষস্থানীয়গণের মধ্যে এক পক্ষ,—পদস্থ রাজকর্ম্মচারী-গণের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও ঘৃণ্য বিলাস্ ব্যসনে জীবন যাপনই মাত্র কাম্য বলিয়া মনে করিত। অপর পক্ষ অপ-প্রয়োজিত অসহযোগের কূর্ম্মাবরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গ লুক্কায়িত রাখিয়া এক দুর্গন্ধ পঙ্কিল বদ্ধজলায় জাতির শেষ-শয্যা রচনা করিতেছিল। অর্থহীন আচারের কঙ্কালালিঙ্গনে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, নাস্তিক্য-বুদ্ধি প্রণোদিত নীরস বিদ্যাচর্চ্চার মিথ্যা দম্ভে মস্তিষ্ক বায়ুগ্রস্ত, অথচ অসহনীয় ঔদ্ধত্যের অন্ত নাই। কূর্ম্মের পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইলেও, তাহার নিম্নাবরণ যেমন অরক্ষিত, কোমল ও অনায়াসছেদ্য, সমাজের নিম্নস্তরের অবস্থা ঠিক তদনুরূপ ছিল। সমাজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে—পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ধমনী ছিল না। সমগ্র দেহে শোণিত সঞ্চালনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বিশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গ দিন দিন শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল। শাসক ও সমাজ এই দুই দিকের নিপীড়নে এবং রাজজাতিত্ব লাভের তুচ্ছ প্রলোভনে সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী হয় নির্ব্বংশ হইতেছিল, অথবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছিল। এমনই দিনেই শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রেম-বিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

বিটপচ্যুত পুষ্পরাশি কোন অভ্যস্ত হস্তের সুনিপুণ গ্রন্থনে যেমন মনোহর মাল্যদামে রূপান্তরিত হয়, তেমনই বাহিরের দুর্দ্দান্ত সংঘাতে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, সমাজ বন্ধনহীন, পথহারা, লক্ষভ্রষ্ট বাঙ্গালী, মহাপ্রভুর প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইয়া একটা জাতিরূপে বিকাশলাভ করিল। সেন রাজত্ব অবসানের পর হইতে তিন শত বৎসরের পরাধীনতার প্লাবনে বাঙ্গালী জাতি হারাইয়াছিল। জাতির মোহ ছিল, কিন্তু জাতিত্বও ছিল না, জাতীয়তাও ছিল না। মহাপ্রভুর কণ্ঠোদ্গীত মানবতার উদাত্ত আহ্বান বাঙ্গালায় নবযুগ আনিয়া দিল। তাঁহার মানব দুঃখে বিগলিত অশ্রু ধারায় শতাব্দী সঞ্চিত জঞ্জালস্তূপ কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার প্রেম মন্ত্রে উজ্জীবিত জাতির জড়িমা কলুষ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার করুণা-রসায়ন বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্বের সাধনায় অনুপ্রাণিত করিল। মহাপ্রভুর পদরেণুপবিত্র বাঙ্গালার শ্যামসমতলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। বাঙ্গালী বিস্ময়-নির্নিমেষে চাহিয়া দেখিল—অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপ্রাকৃত প্রেম, অপার্থিব করুণা, অলৌকিক রূপ এক অপরূপ লাবণ্য-বল্লরীর লীলায়িত বন্ধনে বন্দী হইয়া বাঙ্গালায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সঙ্গে তাঁহার অভিন্ন হৃদয় সুযোগ্য সহযোগী অক্রোধ-পরমানন্দ প্রেমোদ্দাম শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। কাতারে কাতারে নরনারী আসিয়া তাহাদের ঘেরিয়া দাঁড়াইল, রাজপুত্র ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করিল, পণ্ডিতের বিদ্যাভিমান গেল, ক্ষমতাশালী রাজবল্লভ পথের ভিখারী হইল। অধম-পতিত-দুর্গত, চরিত্র-মহাত্ম্যে সর্ব্বজন-বন্দনীয় হইয়া উঠিল। ব্যক্তির সে কি আত্মোন্নতি, জাতির সে কি অভ্যুদয়। বিধর্ম্মী প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমাজের সে কি প্রভাব। শৈব শাক্ত সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম সংস্কারে অবহিত হইলেন। গ্রামে গ্রামে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বিষ্ণু মন্দির, শিব মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠাদি ইষ্টাপূর্ত্তের অনুষ্ঠানে, সমাজের আনুগত্য স্বীকার ও জাতির সেবায় পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের অনুগতগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চরিত্রে ও সদাচারে নরনারীকে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। মনুষ্যত্ব সমাদৃত হইল, সজ্জন মাত্রেই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূজা পাইতে লাগিল। সম্প্রদায়ে বৈদ্য প্রাধান্য থাকায় এবং কুল-ধর্ম্মানুসারে জীবিকার্জ্জনে গৌরববোধ জাগ্রত হওয়ায় বৈদ্যগণ ভবরোগের সঙ্গে দেহরোগ নিবারণেও মনোনিবেশ করিলেন। এক কথায় দেহে ও মনে বাঙ্গালী নূতনরূপে গড়িয়া উঠিল। অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় ভোগ ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত হওয়ায় ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ অন্তর্হিত হইল। বাঙ্গালা নিষ্কলুষ অন্তরে যুক্তকরে তাঁহার অন্তর দেবতার উদ্দেশে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে বন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিল—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালার জন্মগত। স্মরণাতীত কাল হইতে স্বাধীনতার সাধনায় বাঙ্গালী দুশ্চর তপস্যা করিয়া আসিতেছে। যাহারা বলে, সপ্তদশ তুরস্ক অশ্বারোহী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, তাহারা মিথ্যা কথা বলে। বাঙ্গালা জয় করিতে তুর্কীদের বহুদিন লাগিয়াছিল। সেন

রাজবংশধরগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বহুদিন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বাদশ ভৌমিকের সুতীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা সর্ব্বজনবিদিত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে চণ্ডীচরণপরায়ণ দনুজমর্দ্দনদেব—রাজা গণেশের গৌড় সিংহাসনে পদার্পণ, বাঙ্গালীর সাধের স্বপ্নকে সফল করিয়াছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন অনতিকালেই ভাঙ্গিয়া গেল। বাঙ্গালার আশা আকাঙ্ক্ষা আবার অন্য পথে আত্মপ্রকাশ করিল। সেই প্রকাশ স্বয়ং মহাপ্রভু।

মহাপ্রভু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে না গিয়া রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে সমাজ সেবায়, জাতিগঠনে মনোনিবেশ করিলেন। ইহার জন্য মানবের যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল, তাঁহার আচরণ ও প্রচারণে তাহা বহুলাংশে সুসিদ্ধ হইল। বাঙ্গালা ধীরে ধীরে একটা জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন মুখ্যত মহাপ্রভু যে রাধাঋণ পরিশোধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বিশ্বের সর্ব্বমানবের প্রতিনিধিরূপে সেই ঋণভার মাথা পাতিয়া লইয়া তিনি অঋণী হইবার উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব মানবের দ্বারে দ্বারে গিয়া চির-অনপিত প্রেম বিতরণ পূর্ব্বক তিনি সেই প্রেম পরিশোধের পথ দেখাইলেন। কেমন করিয়া আপনি আনন্দে বিভোর হইয়া অপরকে আনন্দ দান করিতে হয়, বোধ হয় মহাপ্রভুই তাহার পথ প্রদর্শক। লোকে এতদিন মাত্র ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণের কথাই জানিত, তাহারই কথা চিন্তা করিত। কিন্তু এই রাধাঋণ, আনন্দেরঋণ পরিশোধের কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। অথচ ইহারই জন্য তাহার যুগ হইতে যুগান্তরের পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা, ইহারই জন্য তাহার গ্রীষ্মে বর্ষায় বসন্তে শরতে সুকঠোর তপস্যা! এই আনন্দামৃতই তাহার চরমতম ও পরমতম কাম্য। ইহারই ক্ষুধায়, ইহারই পিপাসায় সুদুর্গম মরু-গিরি লঙ্ঘনেও মানুষ পশ্চাদপদ হয় নাই, ভয়াল অরণ্য সে হেলায় পার হইয়াছে। অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিবার প্রাণপণ প্রয়াস করিয়াছে। পথে কত যাত্রী প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি যাত্রার শেষ নাই। মানব চলিয়াছে, আজিও চলিতেছে।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে। এ সাধনা বীর্য্যবানের সাধনা। পতিত মানবকে আহ্বান করিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন—আইস, আমায় স্পর্শ কর, আমিও কৃতার্থ হই, তুমিও কৃতার্থ হও। ক্লেদ ক্লিন্ন কর্দ্দমাক্ত মানবকে বক্ষে টানিয়া তিনি যেমন বলিয়াছিলেন আইস, আমার, অশ্রুধারায় স্নান কর, তোমার সর্ব্ব মালিন্য অপগত হউক, তোমার সর্ব্ব গ্লানি বিধৌত হউক। তেমনই তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তৃণের ন্যায় সুনীচ হও, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হও, অমানীকে মান দাও এবং শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ কর। তৃণের ন্যায় সুনীচ হওয়ার অর্থ ইহা নহে যে, তুমি অকারণে অন্যের পদদলিত হইবে। তৃণাদপি সুনীচের অর্থ—তোমার সদা সুষ্ঠু আচরণের কোমল তৃণাস্তরণ যেন সংসার যাত্রাপথে অন্যের যাতায়াত স্বচ্ছন্দ করিয়া দেয়। তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবে, অর্থাৎ কুঠারাঘাত সহিয়াও তরু যেমন ছায়া ও ফলদানে কার্পণ্য করে না, তেমনই তুমিও সর্ব্বাবস্থায় আঘাতকারীকেও দয়া বিতরণ করিবে। তুমি নিজে বৃথা আত্মাভিমান—অর্থাৎ বিদ্যা, ধন, জাতি কুলাদি সর্ব্বপ্রকারের অভিমানশূন্য হইলেই তোমার নিকট অমানী বলিয়া কেহ থাকিবে না। আজিকার দিনে এই সমস্ত কথা অনেকেরই বিরক্তি উৎপাদন করিবে। কিন্তু ইহাই মানবধর্ম্ম, অন্ততঃপক্ষে ইহাই সর্ব্বমানবের ধর্ম্ম হওয়া উচিৎ। এই ধর্ম্মের গতি অতি গহন। কোথায় কোন্ আচরণের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, কোথায় অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার উচিত নহে, কেমন অবস্থায় আততায়ীকে আঘাত না করিলে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া অসম্ভব। যে সমস্ত বীর সাধক এই ধর্ম্মের সাধন করিবেন, সাধনার অগ্রগতির সঙ্গে সুনির্ম্মল বিবেকই তখন তাহাদের পথ নির্দ্দেশ করিবে। যাহা সত্য, যাহা মানবধর্ম্ম, মূলতঃ তাহা এক হইলেও, শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হইলেও, দেশ কাল পাত্রভেদে তাহার প্রকাশ ও বিকাশের ভঙ্গি পৃথক। সুতরাং সত্যের আচরণেও পার্থক্য থাকিবে।

মহাপ্রভু আপনার ভক্তগণের মধ্যে এক একজনের আচরণের দ্বারা এক একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ব্রহ্ম হরিদাসের চরিত্রে যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের যে সাধনার কথা বর্ণিত আছে, শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এবং

ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে তাহারই কিয়দংশ সুবিকশিত হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছে, গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূপাতিত করিয়াছে, তথাপি প্রহ্লাদ কৃষ্ণনাম পরিত্যাগ করে নাই। শত প্রলোভনে—এমন কি মৃত্যুভয়েও তাঁহার বিবেক বিচলিত হয় নাই। ইহা কবি-কল্পিত কাহিনী মাত্র নহে, জগতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ইহা সত্য। যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, হৃদয়ে ভগবানের অপ্রমেয় প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই আচরণ যে স্বতঃসিদ্ধ, ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে সেদিন আর একবার এই সত্য প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। পশুর অপেক্ষাও হিংস্র, ধর্ম্মান্ধ পিশাচের প্রচণ্ড প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতকল্প অবস্থাতেও তাঁহার অমৃতময়ী নিষ্ঠা জীবন্ত ও জ্বলন্ত ছিল।

(২)

মহাপ্রভু তিরোহিত হইলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণও একে একে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। সে ত্যাগ, সে তপস্যা, সে নিষ্ঠা, সে প্রেম আধারের অভাবে ধীরে ধীরে বিলীন হইতে লাগিল। সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিল। আবার সেই সিংহাসন-লাভের ষড়যন্ত্র, ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ, বিলাস লালসা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, জাতির জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। বাঙ্গালীর স্মৃতিভ্রংশ হইল। আকাশ জুড়িয়া দুর্য্যোগের ঘনঘটা, গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকার বাঙ্গালাকে আবৃত করিয়া ফেলিল। যে রণদুর্ম্মদ জাতির অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয় বৈজয়ন্তী বাঙ্গালার সান্ধ্যগগনে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, নিশি দ্বিপ্রহরে তাহা অস্তাচলমূলে ঢলিয়া পড়িল। এক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন বণিকজাতি রজনীর অন্ধকারে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গালার রাজদণ্ড অপহরণ করিল। কয়েকজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, বিদেশী বিশ্বাসঘাতকের সহায় হইল। একদিন তুর্কী প্রথমে দিল্লী জয় করিয়া বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল, আজ বিদেশী, বিশ্বাসঘাতক বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীও জয় করিয়া লইল। বাঙ্গালা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বণিকের দল সারা ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াফেলিল।

এ জাতির আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাদের উন্নততর সাহিত্য ছিল, দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল। সুশিক্ষিত সুনিয়ন্ত্রিত যোদ্ধৃদল এবং সুপ্রখর মারণাস্ত্র ছিল। আর সেই সঙ্গে তথাকথিত সুসভ্য পরিচ্ছদে ইহাদের বহিরাবরণ যেমন ছিল সুপরিচ্ছন্ন, অন্তরে ছিল তেমনই সাধারণের দুরধিগম্য অপরিসীম ধূর্ত্ততা। সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের চেষ্টায় মুসলমান যাহা করিতে পারে নাই, মাত্র শতাব্দীর শাসনেই ইহারা তাহাতে সফলকাম হইল। ইহারা বাঙ্গালার তথা ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে প্রায় অনায়াসেই জীর্ণ করিয়া তুলিল। কেমন করিয়া জানি না, আমাদের মনে ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, উহারা সর্ব্বপ্রকারেই উচ্চ এবং আমরা উহাদের তুলনায় সর্ব্ব বিষয়েই হীন। আমরা আহারে বিহারে, পোষাকে আসাকে, চলনে বলনে সর্ব্বরকমে তাহাদের অনুকরণ করিতে লাগিলাম। এদিকে বণিকের কৌশলপূর্ণ শোষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাঙ্গালা অধিকার করিল। অজ্ঞ জনসাধারণ ইহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়তি মনে করিয়া অকালে যমভবনে যাত্রা সুরু করিয়া দিল। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

তাহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল, সেকথা আজ সর্ব্বজনবিদিত। লর্ড কর্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ, বাঙ্গালার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বাঙ্গালীর আন্দোলনে সারা ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ, সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য, অরবিন্দ, বৃটিশের অমানুষিক নির্য্যাতনে পরাধীনতার দাবদাহে, হৃদয়ের অসহনায় জ্বালায় ভারতের পথপ্রদর্শক বাঙ্গালীর গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ, ফাঁসি, নির্ব্বাসন, কারাবরণ, সুসভ্য বৃটিশের স্বরূপ প্রকাশ, বীভৎস নিপীড়ন যেন চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অকস্মাৎ ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন গান্ধীজী।

কবে গান্ধীর মন্ত্রপ্রাপ্তি, কে তাঁহার দীক্ষাদাতা, কোথায় তাঁহার সাধনভূমি, সিদ্ধিক্ষেত্র, সে সমস্ত আলোচনা না করিয়াও একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে ভাবজগতে মহাত্মাজী শ্রীমন্ মহাপ্রভুরই মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীমহাপ্রভু যে ভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ, মহাত্মাজী সেই ভাব-প্রবাহেরই ধারক, বাহক ও প্রচারক। আধার ভারতীয় এবং আধেয়ও ভারতীয় না হইলে সমগ্র ভারত গান্ধীজীর ভাবে এমন করিয়া মাতিয়া উঠিত না। পৌরাণিক প্রহ্লাদের সাধনাই মহাত্মাজীর জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

যে সাধনা মহাপ্রভুর করুণায় ব্যক্তির জীবনে সার্থক হইয়াছিল, সত্যসন্ধ মহাত্মাজী তাহা জাতীয়-জীবনে—ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সাধনায় প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। মহাপ্রভুর সদল-সংকীর্ত্তনে নবদ্বীপের কাজি বিজয়ে যে ভাবের অঙ্কুরোদ্গম দেখিয়াছি, মহাত্মাজীর বহু আন্দোলনে—বিশেষ ডাণ্ডী অভিযানে তাহাকেই শতশাখ বনস্পতিরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। কৃশকায় কৃশানুকল্প মহামানব—ভারতের অর্দ্ধনগ্ন ফকির যষ্টিমাত্র সম্বল লইয়া লবণ সত্যাগ্রহের জন্য একাকী পথে বাহির হইয়াছেন। পশ্চাতে আতঙ্কিত আত্মীয়স্বজন, সঙ্গহারা অশ্রুআঁখি সবরমতীর অনুগতগণ, দক্ষিণে কৌতূহলী দর্শকের ছদ্মবেশে সিংহভাগ-গ্রহণের জন্য ওৎ পাতিয়া উপবিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ, বামে ভারতের ধীরবুদ্ধি নরমপন্থী হিতাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টাগণ, আর সম্মুখে পৃথিবীর অন্যতর গণনীয় শক্তি বৃটিশ, তাহার সর্ব্ববিধ মারণাস্ত্র ও কুটিল চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। গান্ধীজীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি পথে পদক্ষেপ করিলেন; অকস্মাৎ এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এই কৃশতনু কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসীর পদভরে আসমুদ্র ভারত উদ্বেলিত হইল। এক, দুই, তিন,—ঘরছাড়া পথিকের পদশব্দে ভারতের জনহীন পথ মুখর হইয়া উঠিল—শুধু কি একবার—গঙ্গাশ্লিষ্টসানু হিমাদ্রির উপত্যকা হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বার বার আমরা এই আলোড়ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

গান্ধীজী রাজনীতিকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই দেশে এইকালে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না। ভারতে যাঁহারাই রাজনীতি চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঋষিকল্প মনীষী। প্রাচীন ভারতে ঋষিরাই রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। অর্ব্বাচীনকালেও চাণক্য, হরিষেণ, গর্গদেব, ভবদেব ভট্ট, এমন কি হলায়ুধ পর্য্যন্ত সেই ধারাই প্রবহমান ছিল। মহাত্মাজীর বৈশিষ্ট্য রাজনীতিকে তিনি সত্য ও অহিংসার অভিনব শ্রীসৌন্দর্য্যেমণ্ডিত করিয়াছেন। সত্য ও অহিংসা—এক কথায় প্রেমই তাঁহার রাজনীতির প্রাণ। পশ্চিমের ক্ষাত্রবীর্য্যে প্রমত্ত পরস্বলোলুপ বণিকজাতি, নব নব আণবিক সংহারাস্ত্রের আবিষ্কারে যখন সমগ্র পৃথিবীকে ত্রস্ত ও চকিত করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের এই মহামানব—নবযুগপ্রবর্ত্তক এই ঋষি তখনো আপন ধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা প্রকাশপূর্ব্বক বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করিতেছেন।

হিংসার পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা—মুণ্ডের বদলে মুণ্ডের গ্রহণ যাহাদের মূলমন্ত্র, গান্ধীর মহিমা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কিন্তু তাহারা একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, পৃথিবী হইতে হিংসা পাপ দূরীভূত না হইলে মানবের কল্যাণ নাই এবং প্রতিহিংসা এই পাপ দূরীকরণের পন্থা নহে। কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে, কি ব্রহ্মদেশে মানুষ আজ পশুর স্তরে নামিয়া গিয়াছে, বুঝিবা পশুরও অধম হইয়াছে! এই পশুত্ব অপগত না হইলে মানবের শ্রেয় লাভের উপায় কি?

ভগবান আছেন এ কথা যেমন সত্য, তাঁহাকে না জানিলে মানবের মঙ্গল নাই, একথাও তেমনই সত্য। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—শ্রেয় লাভ করিতে হইলে শ্রীভগবানকে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। প্রভু, সখা, পুত্র, প্রাণপতি—অধিকার ও রুচি অনুসারে, ইহার যে কোন একটী ভাব গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হও, সিদ্ধি তোমার অবশ্যম্ভাবী। বিস্তীর্ণ মানব সমাজ এই ভাবের সাধনক্ষেত্র। মানুষকে যে সম্বন্ধের ডোরে, প্রীতির বাঁধনে বাঁধিতে পারিল না, সে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে কিরূপে? জীব ভগবানের নিত্যদাস এই জ্ঞানে তাহার সেবা করিতে হইবে। প্রেম ভিন্ন এই জ্ঞানের উদয় হয় না। যে প্রেমহীন—যাহার জীবে দয়া নাই, ভগবানের নামে রুচি নাই, বিষ্ণুর আপনার জন—বৈষ্ণব জ্ঞানে সর্ব্বমানবের সেবায় যাহার স্পৃহা নাই, তাহাকে তো মানব নামে অভিহিত করিতে পারি না। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন—মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই মন্ত্রই মহাত্মাজী নূতন করিয়া প্রচার করিতেছেন। মন্ত্রের যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গত ভগবানকে মাতৃভাবে উপাসনার ভারতীয় ধারার কথাও উল্লেখ করিতে পারি। অন্তরের যে নিষ্ঠা, যে পবিত্র মধুর দৃষ্টিভঙ্গী ও আকুল আবেগ লইয়া মানব ভগবানের উপাসনা করে, সেই নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও আবেগ যদি দেশের, জাতির, তথা মানবের উপাসনায় প্রযুক্ত হয়, ব্যক্তির সাধনা জাতির জীবনে সংক্রামিত হয়, তাহা হইলেই পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

যে শিক্ষায় ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির—ব্যক্তির সঙ্গে জাতির সমন্বয় ঘটে না, তাহা শিক্ষা নহে, অশিক্ষাও নহে, কুশিক্ষা। আবার যে শিক্ষায় ইউরোপের সর্ব্বনাশা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে, যে শিক্ষায় জাতি অথবা সম্প্রদায়কে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহাও বিষবৎ পরিহরণীয়। পরাধীনতার সদ্যশৃঙ্খলমুক্ত যে জাতিকে জীবন গঠনের জন্য বর্ণপরিচয় হইতে পাঠ সুরু করিতে হইবে, জাতীয়তাবাদ, অথবা মানবতাবাদ, কোন্ বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ আছে। কোন বিষয় লেখনীমুখে প্রকাশ করা সহজ, কিন্তু তাহা জীবনে আচরণে সমস্যা আছে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহীর করণীয়ের পার্থক্য আছে। এইরূপ অনেক কিছু আছে। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল ধর্ম্মেরই সাধন পদ্ধতি আছে, জীবনে তাহার আচরণ করিতে হয় এবং আচরণে সিদ্ধিলাভ না ঘটিলে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সঙ্কট সৃষ্টি করে। গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংসাও এইরূপ একটী ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সবলের ধর্ম্ম। যথোপযুক্ত মনোবল না থাকিলে এ ধর্ম্মের আচরণে বিপদ ঘটিতে পারে। আর ভগবদ্ বিশ্বাস না থাকিলে এ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভেরও কোনই আশা নাই। বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের দিনে এ ধর্ম্ম হয়তো মানুষের মনঃপূত হইবে না। মহাত্মাজীর তিরোধানের পর হয়তো এ ধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য অবনতও হইতে পারে, এমন কি বাহ্য দৃষ্টিতে হয়তো ইহার বিলুপ্তির আশঙ্কাও দেখা দিবে। তথাপি একথা ধ্রুব সত্য যে, ইহাই অমৃত, ইহার বিনাশ নাই। এই ধর্ম্মই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, বিশ্বমানবের চরম ও পরমতম ধর্ম্ম। পৃথিবীর অধিকাংশ মানবকে একদিন এই ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই ধর্ম্মকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন, জীবনে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই তিনি অন্তরের অন্তস্তলে নোয়াখালি পরিক্রমণের প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। নোয়াখালির ঘটনা যেমন ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব, মহাত্মাজীর নোয়াখালি পর্য্যটনও তেমনই ইতিহাসের অজ্ঞাত। ইহাপেক্ষা হিংস্র শ্বাপদ-সমাকুল ভয়াল অরণ্যে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ অতিশয় অনায়াসসাধ্য ছিল। নোয়াখালীর উৎপীড়িত আর্ত্তের ব্যথিত হাহাকার তাঁহাকে এতই বিচলিত করিয়াছিল, যিনি বর্ত্তমান ভারত-ইতিহাসের নিয়ামক, বুঝিবা তাঁহার বৈচিত্র্য-পূর্ণ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র রচনার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অজ্ঞাতসারেই নোয়াখালি আসিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় গান্ধীজীর জীবনেতিহাসে নোয়াখালিই শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়।

পরিপূর্ণ সত্যকে গ্রহণ করা সহজ কথা নহে। তাহার রূপও সর্ব্বত্র নয়নাভিরাম নহে। সত্য আবির্ভূত হইয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানব ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, আবার অনেকেই তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, তাহার প্রকাশে বাধা দিয়াছে, এ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি পুরাতন। মহাত্মাজী যে দিন প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন—প্রকাশ্য দিবালোকে বিঘ্নবহুল রাজপথে দাঁড়াইয়া এই কটিবাসপরিহিত কর্ম্মযোগী যে দিন সুস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি, সেদিন তাঁহাকে গ্রহণের অসংখ্য বাধার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাধা ছিল বৃটিশভীতি। তাঁহারই যাদুদণ্ড প্রভাবে সে ভীতি অতি দ্রুত অপসারিত হইতেছিল, আজ তিনিই তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছেন। আশা করি অপরাপর যত বাধা, অনতিবিলম্বে সেই সমস্তও নিশ্চিহ্ন হইবে এবং এইবার আমরা তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিব। গান্ধীজীর বাণী—ভারতেরই মর্ম্মবাণী। এই বাণী পৃথিবীর সর্ব্বমানবের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠুক, শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি পৃথিবী হইতে হিংসা বিদূরিত হউক। মহাত্মাজীর সাধের সাধনা সার্থকতা লাভ করুক।



শুধু কান্না

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠোঁটফোলানো ছোট্ট ছেলের গোঁঙানার মত সারা রাত ধরে অতন্দ্র আকাশের গুমরে গুমরে কান্না আর থামতে চায় না। এক ঘেয়ে একটানা টিপ্ টিপে বৃষ্টির সুর।

আধোজাগ্রত ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠে রাসমণি—অ্যাঁ, ঐ কাঁদচে না—ভয়ে আঁতকে সে ঠেলা দেয় তাড়ির তাড়ায় হতচেতন ভজহরিকে—তার সুপুষ্ট উচ্ছিষ্ট যৌবনের নবতম রসিক্ মালিক—তিন তরফা কন্ঠিবদলের জোরে হাতবদলী দখলি স্বত্ত। কে শোনে কার কথা।

চোখ রগড়ে উঠে বসল রাসমণি, তেলের কুপোটা জ্বাললে, তারপরে কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করলে—ছোট ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে কিনা—

আধা-বয়সী ভজহরির উঠন্ত ভুঁড়িটা নাকের ডাকের সঙ্গে তাল রেখে উঠছে আর নামছে, তার দিকে চেয়ে রাসমণি বিতৃষ্ণায় কঠিন হয়ে ওঠে, মনে একটা বিরাট্ অজগরের সর্পিল নিঃশ্বাস তাকে কুৎসিৎ লেহন করছে, আশ্চর্য্য হয়ে যায় রাতের পর রাত এদেরি হাত ধরে আবার ভাঙা ঘর মন জোড়া দিয়ে পাড়ি জমাতে চেয়েছিল সে। ঘন দুধ খাওয়ার পর পিটুলি গোলা জল গেলা আর কি, হাসিও পায়, কান্নাও আসে।

হঠাৎ রেগে সজোরে ভজহরিকে নাড়া দিয়ে বলে—এমন্ ঘুম-কাতুরে নেশাখোর লোক দেখিনি বাপু বাপের জন্মে।

অতিকষ্টে চোখ মেলে চায় ভজহরি, হাত ধরে টেনে বলে—কি হলো এতো রাত্তিরে, ঘ্যানর ঘ্যানর কেন?

আস্তে আস্তে রাসমণি জিজ্ঞেস করে—শুনতে পাচ্ছো? কী—খুলেই বল না।

কান্না—

চটে ওঠে ভজহরি—কান্না আবার কোথায়, ও কিছু নয়, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ—

না, না, রাত তিন পহরে পাগলামীর আর জায়গা পেলে না—ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে, শ্যামের বাঁশী বাজতে না বাজতেই, এখন আর ঢং পীরিতির সময় নেই, মিলের ম্যানেজার সাক্ষাৎ কিছু ভাই সম্বন্ধী নয়।

মৌজ করে পাশ ফিরে সে নাক্ ডাকাতে সুরু করলে।

তন্দ্রাহত রাসমণি চুপ করে বসে থাকে, তার মনের ভিতর কি রকম করছে—নিশ্চয় খোকা কাঁদচে।

অস্থির হয়ে উঠে পড়ে সে, দাঁড়িয়ে দরজা একটু খুলে নিরন্ধ্র ধারাকুল অন্ধকারের মাঝে দেখতে চেষ্টা করে, দূরে পার্কের পাশে তিনতলা বাড়ীর একটা বড় কামরা থেকে নালচে আলোর ক্ষীণ আবছা আভা আসছে কিনা। লাভের মধ্যে শুধু বড় বড় জলের ফোঁটা তীক্ষ্ণ তীরের মত বেঁধে তার ক্ষত বিক্ষত উন্মুক্ত দেহটাকে। ব্যাপারটা হচ্ছে বস্তীর ও ধারে বড় বাড়ীর সেজবাবুর মেজ ছেলের অসুখ—সে আজ পার্কে বেড়াতে গিয়ে শুনে এসেছে।

বিকেল বেলা ঠেলা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে, সে শুনতে পেয়েছিল বুড়ী বিমলি বলে চলেছে—বাঁচে কিনা সন্দেহ, সারাদিন কাঁদচে, বৌটারও কি নাকাল, অতি বড় শত্তুরেরও যেন ও রকম রোগ না হয়।

লক্ষ্মীঝি মেজ বৌরএর খাস ঝি, বেশ গোদিয়ানী চেহারা, বল্লে—অনেক কিছু ডাক্তার ওষুধ, মানত মাদুলী গিন্নীমা ত করলেন্, কপালে নেই, কাজের কিছু হলো না—

ঝাঁমিয়ে ওঠে বিমলি—রেখে দে তোর কপাল, কালে কালে কতই দেখলুম্, কচি খুকী নই, পাপ। পাপ—বড়লোক মনিব বাড়ীর নিন্দেয় লক্ষ্মী অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে পেছন ফিরে

শ্যামার দিকে চেয়ে বল্লে—গিন্নিমা কুষ্ঠী দেখিয়েছিলেন দুষ্ট শনির দৃষ্টি পড়েছে, আচায্যি ঠাকুর বল্লেন, ডাইনীতে চোখ দিয়েছে, তা না হলে আর অমন্ রাজপুত্তুরের মত ছেলে—

মুচকি হেসে বিমলি বলে—ডাইনীই বটে, তবে সেটা সেজবাবুর পেছনে, বামে যোগিনী, অমন্ রূপসী বিদুষী বউ, দুধে আলতা রং, দুর্গা পিতিমের মত চেহারা, তারও রং কালি করালি। প্রথমটিত ঐ রকমেই গেল—পেঁচোয় পেয়ে, ষাট্ ষাট্ বাছারে—এটাকেও বিষে শুষে খাচ্চে!

লক্ষ্মী চটে ওঠে—বড্ড নিন্দুক্ তুমি মাসী, বড়ঘরের মান ইজ্জত রেখে কথা বলতে পারো না—কাজ কি বাপু



এমন ঘুমকাতুরে নেশাখোর লোক দেখি নি বাপু বাপের জন্মে

কথায়। দেখেছিস্ ত শ্যামা, ছেলের ভাতের সময় সে কি ঘটা, সাত দিন ধরে খেয়ে পেটের ব্যথায় মরি।

তা আর দেখিনি দিদি, বড় বাড়ীর বড় কাণ্ড কি সুন্দর মানিয়েছিল হারটার। ছেলেটাকে দেখলে কিন্তু কান্না পায় দিদি, কি কষ্টটাই না পাচ্চে।

বিমলি ছাড়বার পাত্রী নয়, ফোড়ন দেয়—শাশুড়ী মাগীও তেমনি, সারাদিনই বউএর পেছনে খিটি খিটি, ছেলে যে বারমুখো তা আর নজরে পড়ে না, ভাবটা বউ কেন বাঁধতে পারে না ছেলেকে।

রাসমণি তার চার্জের ছেলেটিকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে এগিয়ে আসে, আঁচল খুলে একখিলি জরদা-দেওয়া পান দেয় বিমলিকে, জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ মাসী, কি হয়েছে গা সেজবাবুর ছেলের।

আর সবাই কলকাতার পোড় খাওয়া, চোখ্ টেপাটিপি করে। বিমলি মুখ ঘুরিয়ে বলে—থাম্ ছুঁড়ি, নিজের চরকায় তেল দে, কতদিন গাঁ ছেড়ে এসেছিস্, গলা টিপলে দুধ বেরোয়—

শ্যামা হেসে বলে—ভজহরি এখন বেশ সেরেছে—বেশ ভাল পান তো, গিন্নীর ডাবর থেকে সরিয়েছিস্ বুঝি—

হঠাৎ একটা তীব্র চীৎকারে সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে ওপরের দিকে তাকায়, ছোট্ট ছেলের সমস্ত শেষ শক্তি নিংড়ে নিয়ে গলা ফাটানো সে কী করুণ কান্না। তার সাথে কান্নাভেজা মিহি গলায়—মর, মর তুইও জুড়ো, আমিও জুড়োই। সঙ্গে সঙ্গে কাংস্যকণ্ঠী শাশুড়ীর ভারিক্কি ধমক্—রোগা ছেলের গায়ে হাত—এমন্ রাক্ষুসী মাকেও বলিহারি, কি অপয়া বউই নিয়ে এসেছিলাম সংসারে, জ্বালিয়ে খেলে, ঝাড়ু মারি নেকাপড়া শেখা মেয়েকে।

ঘাগী বিমলিও চুপ মেরে যায়, শুধু থেকে থেকে বলে—ষাট্ ষাট্ বাছারে।

চুপি চুপি শ্যামাকে বলে—বৌটাও ফুঁপিয়ে কাঁদচে না? শুনতে পাচ্চিস্? হে মা তারা, মেয়েজাতের কি পেহার!

হঠাৎ দামী মোটরের হর্ণে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। ট্যালবট্ হাঁকিয়ে সেজবাবু নৈশ অভিযানে বেরিয়ে গেলেন, গন্ধ ছড়িয়ে। শ্যামা বলে—সেজবাবুর মোটর, ঐ যে রোগা ছেলে কোলে সেজ বউও জানালার ধারে দাঁড়িয়েছে, সেজবাবুর বিকেলে বেরুনোর সময় মোটরের হর্ণ শুনলেই ওর বারন্দায় এসে দাঁড়ানো চাই।

রাসমণি হাঁ করে চেয়ে দেখে—দুটো কঠিন চকমকির যেন ঠোকাঠুকি, আর ছেলেটা—কি নলি নলি হাত পা, প্যাঁকাটির মত সরু, সাদা ফ্যাকাশে চেহারা, চোখের পাতায় পাতায় ঘা—ধুকঁছে।

পাঁচবাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী, ছেলেমেয়ে, বউ ঝির মুখরোচক্ খবর নেওয়া দেওয়ার আসর আর জমল না। না জমল গল্প ছোকরা চাকরগুলোর সঙ্গে, শুধু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী শ্যামা ও বাড়ীর খাস্ খানসামা রামুর সঙ্গে কি

যেন ইসারা করে বল্লে হেসে দুলে। রাসমণি 'থ' হয়ে বসে রইল, কিছুই যেন সে বুঝতে পারছে না।



রাসমণি 'থ' হ'য়ে বসে রইলো

শ্যামা ফিরে এসে ঠেলা দিয়ে বল্লে—এই রাসমণি। আবার কার ধ্যানে বসলি লো, মেঘ জমেছে আকাশে, সবাই চল্ল যে।

চমক্ ভেঙে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। একটা অজানা শিশুর একটানা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ আকাশে বাতাসে ভাসচে।

পোয়াটাক্ দূরেই তার মনিব বাড়ী গিয়েই ছেলেটাকে নামিয়ে সে গিন্নীমাকে বল্লে—বড্ড শরীরটা খারাপ লাগছে মা।

একটু সাবধানে থাকিস্ বাছা এ সময়ে, তা বাড়ী যাবি ত যা—সকালেই আসিস, কিন্তু শুয়ে থাকিসনি যেন। একটু আচার নিয়ে যাস্ বুঝলি? ভাল লাগবে মুখে। বলেই পাশের বড় ননদকে বল্লেন—শুনেছো ঠাকুরঝি, মিত্তিরদের বাড়ীর এ ছেলেটাও বুঝি বাঁচে না, ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। হরিনামের মালা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুরঝি চুপ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। রাসমণির বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগল—তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল বাসার দিকে। বাসায় গিয়ে নিজের দাওয়ায় বসে হাঁফাতে লাগল।

ভজহরি তখনও ফেরেনি। মনে মনে সে মানত করে—ভজহরি আর যেন না আসে। দূরে সদ্য-নিভে-আসা আলোর শেষ বেশ বড়বাড়ীর তিনতলার দেওয়ালে রক্ত রাঙা। অশরীরী কিছু যেন একটা ঘটছে সেখানে, বুঝতে পারছে না রাসমণি। নীল আলো জলে উঠল, চকচকে একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াল, হন্তদন্ত হয়ে বাড়ীর সরকার গোঁসাইজী নামলেন—হ্যাটকোটপরা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে। হাতে ওষুধে যন্ত্রে ভরা ব্যাগ। শুধু মিত্তির বাড়ী ছাড়া সবকটা বাড়ীতেই সাঁঝের শাঁখ বেজে উঠল। রাসমণি আকুল হয়ে মানত করে—গেরস্তর কল্যাণ হোক, ছেলেটিকে ভালো করে দাও ঠাকুর। চোখের সামনে ফুটে ওঠে একটা রুগ্ন শিশুর ব্যথাকাতর ডাগর চোখের অসহায় দৃষ্টি, পাশে সারা বিশ্বের অবিশ্বাস ও হতাশ নিয়ে তারি বয়সী অতি বড় রূপসী একটি শুকনো মায়ের মুখ, চোখে মুখে জলের রেখা।

এক বছর আগে বানের রাতের কথা রাসমণি কোন দিন ভুলতে পাবে না। সেদিন আকাশের কি ভেঙে পড়া কাতরতা! মত্ত সাগরের উন্মত্ত নর্ত্তনের মাঝে দুর্দ্দম দোলায় দুলতে দুলতে রুদ্ধ অভিশাপের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে এগিয়ে এসেছিলেন মরণের দেবতা—সে কী রূপ, ধবধবে, বিরাট—মাথাটা গুলিয়ে যায় যেন—ভাবতেই পারে না, সব কিছু খুইয়ে, সব কিছু হারিয়ে সে এখনও বেঁচে, আর তাও ওই হিংস্র নখর সহরে—উঃ, না ছেলেটা কাঁদচে না?

হারাণী সেদিন সত্যই রেগেছিল। মানুষটার কি আক্কেল, জোয়ান্ মরদ, জ্বরে ও আমাশয় ভুগে কঙ্কালসার, তিনদিন উপোষের পর না খাওয়া না দাওয়া ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে চল্লেন কিনা ভিনগায়ে কীর্ত্তনের আসরে। কীর্ত্তনের নামে লোকটা যেন পাগল হয়ে যেত। সত্যিই তার মত খোল-বাজিয়ে ও তল্লাটে আর কেউ ছিল না। খোল যখন বোল দিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, তখন মনে হোত দুহাত তুলে জয় গোবিন্দ বলে হেমকান্তি গৌরতনু নদের নিমাই নেমে এল।

বুকটা মুচড়ে উঠল রাসমণির—জাত বোষ্টমের মেয়ে সে—গৌরবিনোদ বাবাজীর আখড়ায় এক জমাটী কীর্ত্তনের

আসরেই তার প্রথম রসের কলি ফুটেছিল। তার বয়সই বা কতো, সবে সতেরো, ছিপছিপে তন্বী, গদাইএর বেটা ভীম তখন ভীমই ছিল বটে—সুন্দর সুঠাম চেহারা, ঢল ঢল স্বাস্থ্য ও যৌবন। বুড়ো বাবাজী দেখে শুনে বলেছিলেন—রাধারাণী কৃপা করলেন দেখছি, গৌর হে সবই তোমার কৃপা।

চুপ করে চেয়ে রইল সে বাইরের দিকে। কালো অন্ধকার—দেখা যায় না কিছু—ঐত কাঁদচে না। টস্ টস্ করে জল পড়ে চোখ বেয়ে তার।

কী দিনই গেছে, ভীমের দরাজবুক, জোয়ানদিন, সবল পেশী, মুখর ভালবাসা—আর আজ, ভজহরির মত মনে ও দেহে রুগ্ন ক্লেদাক্ত মানুষগুলো—গা যেন গুলিয়ে ওঠে তার! হঠাৎ আঁতকে ওঠে সে—বিমলির কথা মনে পড়ে—ওই রকম রুগ্ন ছেলে যদি তার কোলে এসে থাকে—না, না, কিছুতেই পারবে না সে।

মোটে ছবছর আগের কথা, বাড়বাড়ন্ত ঘর, ক্ষেত-খামার, জোৎজমি—গোয়ালভরা গাই বলদ—কোলভরা ছেলে—ছেলে! তার সারা দেহ থর থর করে কেঁপে ওঠে, শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশির করে ওঠে গা। তারপর অজন্মা, দেনা, রোগ, মহাজন, ডিক্রী, ক্রোক, যুদ্ধ, মন্বন্তর, বান—বান—ছেলে—সব ডুবে গেল। জিনিষ থেকে মানুষ অবধি, মনুষ্যত্ব থেকে সতীত্ব পর্য্যন্ত, ছেদ পড়লো প্রাণের ধারায়—সে বেঁচে থাকে আজো—আশ্চর্য্য!

সারাদিন পরে ঝড়বৃষ্টি মাথায় দুর্য্যোগঘন ভর রাতে যখন ভীম বাড়ী ফিরেছিল তখন রাত অনেকটা এগিয়েছিল। রেড়ির পিদিমটা গিছল নিভে—কোলের ছেলেটা মায়ের শুকনো বুকে দুধ না পেয়ে এলিয়ে পড়েছে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে। বাইরে আকাশে বাতাসে জলে সে কী মাতামাতি মিতালী! ভীমের ম্লান মুখের দিকে চেয়ে রাসমণির তপ্ত রাগটা গিছল জুড়িয়ে, মুখের 'রা' সে কাড়েনি! অমুখর মৌন অভিমানে শুয়ে পড়েছিল স্বামীর পাশে।

ভীম ভেবেছিল—নাঃ বড্ড রেগেছে আজ, রাগবারই কথা। শুধু তার গায়ে হাতটা রেখেছিল সে।

ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল রাসমণি।

শেষ রাতে সে কী জলের তোড়, বাইরে কি গোঁ গোঁ শব্দ; 'ওঠ ওঠ' ভীম বলে—বান নেমেছে।

চালের উপর উঠেছিল তারা পুঁটলিপাটলা নিয়ে, চারদিকে অথই জলের রাজত্ব।

চালটা ছিটকে চলল্ বানের স্রোতে, অন্ধকারে লাগল একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা। কোলের ছেলেটা জলে পড়ল টাল সামলাতে না পেরে।

'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি।



'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল রাসমণি

নাড়ী ছেঁড়া প্রথম সন্তান উঃ মাগো! শির শির করে ওঠে গা।

তাকে ধরতে গিয়ে ভীমও গেল তলিয়ে মহা-বরষার রাঙা জলে।

হায় ভগবান, সত্যই কি তুমি ছিলে, না আজও আছো।

একটা জোর কান্নার শব্দে বর্ত্তমানে ফিরে এলো রাসমণি—কাঁদচে, কে, কারা কেন কাঁদচে? এবারে আর ভুল নেই, ঠিক শুনেছে সে, আশ্চর্য্য ভেতর থেকে ভজহরির নাকের ডাকও বেশ শোনা যাচ্চে। মা, মাগো! অসহ্য—পেটের নাড়ীগুলোও বুঝি মোচড় দিচ্চে—বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্চে—এতদিনের সব কিছু অশুচি অজাত—

থাকতে পারলে না রাসমণি, বেরিয়ে পড়ল দৌড়ে বস্তি বেয়ে রাসবিহারী এ্যাভিনিউর দিকে। পার্কের পাশে

বড়বাড়ীর তিনতলার নীল আলোটা কিছু পরে নিভে গেছে, শুধু একটা গুমরে ওঠা চাপা কান্নার সুর—খোকা, খোকারে, মাণিক্ আমার।

রাসমণি এগিয়ে চলল—নিশিতে পাওয়া স্তিমিত। ঢং ঢং করে তিনটে বাজল—তীরবেগে একটা মোটর ছুটে গেল—নেশাজড়িত কণ্ঠে সেজবাবুর গলা—হটো হট্ যাও—।

রাসমণি কিন্তু আর ফিরল না।

সহজ শিক্ষা

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল

মানবসভ্যতার ইতিহাসে এখন বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সহিত আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেরও দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে রেডিও, এরোপ্লেন ও এ্যাটম বোমএর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান যুগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

অধুনা আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্ন পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সহজ ছন্দে চলিতে না পারিলে, গণতান্ত্রিক সমাজের জনসাধারণের নিকট আমাদের ইট, কাঠ, টেবিল, চেয়ার অধ্যুষিত এই বিরাট শিক্ষাসৌধ শুধু বিস্ময়ের নহে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। অগ্রগামী দেশের নেতারা তাঁহাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছেন।

সুখের বিষয় এই যে হিমগিরির তুষারশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমাদের গৃহেও আজ নূতন যুগের আহ্বান বাণী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা এখন এক যুগসন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছি। এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপার নহে। গতিশীল জগতে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নূতনকে বরণ করা চলিবে না। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন এখন আর কোনও বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির সহিত আপনা হইতেই সখ্যতাসূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের মায়ামন্ত্রে, আমাদের একান্ত অজ্ঞাতসারেই এই মিলন সম্ভবপর হইয়াছে। তাই জনসাধারণের মধ্যে সহজ উপায়ে শিক্ষার বিস্তার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কবির ভাষায় আমাদের শিক্ষার বাহন এতদিন চারি ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ীতে চড়িয়া প্রশস্ত রাজপথ কাঁপাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। গাড়ীর পিছনে উর্দ্দীপরা তকমাধারি সহিস্ ক্রমাগত হাঁকিয়াছে, হট্ যাও, হট্ যাও। ভীত, সন্ত্রস্ত, পথচারি মূঢ় বিস্ময়ে পথ ছাড়িয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিরাট শিক্ষা শকট গলি ঘুঁজির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার গৌরবেই জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কালবিলম্ব না করিয়া এই বিমূঢ় জনসাধারণের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ইহাদের শিক্ষার সহজ ও সুখবোধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শিক্ষাপদ্ধতি স্কুল, কলেজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পথে চলিবে না। ইহা জনসাধারণের স্বীয় আবেষ্টনের মধ্যে কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শুভ অবসর মুহূর্ত্তে আপন প্রাণধারায় সিক্ত হইয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তবে কি সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাদের সুমহান, কক্ষচ্যুত হইয়া বাজারের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে? আমরা বলিব, ক্ষতি কি? সক্রেটিস্ দর্শনশাস্ত্র স্বর্গ হইতে আহরণ করিয়া মানব সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। অ্যাডিসনের সাধনা দর্শন, বিজ্ঞানকে স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া বারোয়ারীর আটচালায়, ক্লাবে, পান্থশালায় ও রেস্তরাঁয় হাজির করিয়াছে।

পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিলে চলিবে না। স্কলার ও জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য এই যে জনসাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; পণ্ডিত বা স্কলার শতকরা ১০ জনও নহেন। স্কলার একটি বা দুইটি বিষয়ে জানিতে চাহেন অনেক, কিন্তু অনেক বিষয়ে বুঝিবেন কম। অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সচেতন জনসাধারণ সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের অল্প কিছু জানিতে চাহেন এবং বুঝিবার অনুভূতি শিক্ষিতের অপেক্ষা কম নহে। মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে এই সহজাত অনুভূতিকেই অন্যত্র "অশিক্ষিতপটুত্ব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই "পটুত্বের" সুযোগ লইয়া বয়স্ক জনসাধারণের **informal education**এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু একাদশ, চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিলেই গণ-শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হইল—একথা মনে করা ভুল। **'Education is a life long process'** গণ-তন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা জনসাধারণের সামাজিক জীবনযাত্রার সহিত একখাতে মিলিত করিতে হইবে। **"for the great majority learning is a social activity."** সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চাহে না ও এই শিক্ষার উপযুক্তও নহে। এই শিক্ষার অভাব প্রকৃত

অভাব নহে বলিয়া সমাজের নিকট ইহার জন্য কোনও কৈফিয়ৎ দিবারও প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য, সমাজতান্ত্রিক জনশিক্ষার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ। সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থক্যই এই প্রভেদের কারণ। কিন্তু ইহার মুলনীতি সর্ব্বত্র এক। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা সিলেবাস থাকিবে না। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যসূচক ভীতিপ্রদ নামের উল্লেখ থাকিবে না। যে কোনও সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ আলোচনা চলিতে পারে। মাতৃভাষাই এই আলাপের বাহন হইবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিয়া বলা চলে :—

সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সামান্য সেলাইএর বুননের সারির মধ্যে বীজগণিত ও অঙ্কশাস্ত্রের বহুতথ্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আজ কোনও বিজ্ঞানবিদ বা শিক্ষাবিদ পণ্ডিতের চোখে এই সেলাইএর সাইকোলজি, মেথড্ ও educational value ধরা পড়ে নাই। তাই যখন সেলাই নিপুণা কোনও শ্রীমতী অপরার স্কার্ফের প্যাটার্ণের সুখ্যাতি করেন, তখন দ্বিতীয়া প্রথমাকে মাত্র প্যাটার্ণটি বুনিবার কৌশল দেখাইয়া দেন। প্রথমার বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না; প্যাটার্ণটি তখনই তুলিয়া ফেলেন। কিন্তু এই সামান্য জিনিষের এডুকেসন্যাল ভ্যালু ধরা পড়িলে কি বিভীষিকার সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সেলাই তখন 'এডুকেশন্যাল নিটিং'এ পরিণত হইবে। দ্বিতীয়া তখন প্রথমাকে বলিবেন,—প্যাটার্ণটি ভাল ভাবে শিখিতে হইলে তোমাকে মিস্ কাঙ্গিলালের মডার্ণ ন্যাশন্যাল আর্ট একাডেমির ইভনিং ক্লাসে যোগদান করিতে হইবে। সেখানে পুরাপুরি বারটি লেক্‌চার শুনিতে হইবে: তিনটি লেকচার সেলাই শিল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস, তিনটি মনস্তত্ত্বের, চারিটি সেলাইএর বিভিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ, একটি অঙ্কন ও আর মাত্র একটি হাতে কলমে সেলাই। শেষেরটিতে ফেল করিলে কোনও অসুবিধা নাই—কেবল নম্বর যোগ হইবে না। প্রথমবার সমস্ত উৎসাহ, আগ্রহ উবিয়া যাইবে।

ধরুন, ক্লাবের রেডিওটি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। নিকটবর্ত্তী একজন মেকানিক আসিয়া যন্ত্রটি ঠিক করিয়া দিল। উপস্থিত সভ্যগণ স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রশ্ন সুরু করিলেন :—কি গোলযোগ হইয়াছিল? আপনি কি করিলেন স্যার? মেকানিকের উত্তর অতি সংক্ষেপ: সব কথা বুঝিতে গেলে প্রতি রবিবারে আমাদের ক্লাসে এ্যাটেণ্ড্ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্ত্তাদের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত কৌতূহল ফিউজ হইয়া যাইবে।

উৎসুক জনসাধারণ ক্লাসে যোগদান করিতে চাহেনা। তাহারা তৎক্ষণাৎ রেডিও সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহে। এই সুযোগে বলা চলিত—রেডিও-যাদুকর ডাঃ মিত্রকে একবার আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনুন না কেন? তিনি এ সম্বন্ধে খুব ভাল গল্প বলিতে পারেন। বলা বাহুল্য এই যাদুকর হইবেন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। বিশেষজ্ঞের মুখে বক্তব্য বিষয় গল্পে ও হাস্য কৌতুকের ভিতর দিয়া ক্লাবের আবহাওয়াকে মুখর করিয়া রাখিবে। কেননা, যিনি যে বিষয়টি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিয়াছেন তিনিই সেই বিষয়টি লইয়া হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারেন।

দরিদ্র পল্লীর—বিশেষতঃ শ্রমিক অঞ্চলের সাধারণ পবিত্র হোটেল, চায়ের দোকান ও অরোরা রেস্তোরাঁগুলির নোংরামি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। পৌরসভা ও কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি পরিহার করিয়া চলিবার নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু চায়ের দোকান ও হোটেলগুলির আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাই যে অপরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকাংশে দায়ী সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই। শতছিন্ন, মলিন অয়েলক্লথ আবৃত ভাঙ্গা টেবিলের উপর নোংরা পেয়ালায় চা পরিবেশন করিলে, পরিবেশক ও ভোক্তা উভয়েরই হাত হইতে দু এক ঝলক চা টেবিলের উপর ক্রমাগত পড়িতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার উপর চা-পানরত ভদ্রলোকদের কনুইএর গুঁতার আকস্মিকতাও আছে।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শাদা ধব্‌ধবে টেবলক্লথের উপর পরিষ্কার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিলে সকলেই পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। খোলা মেঝের উপর উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু মেঝের উপর কার্পেট বা অন্য কোনও আস্তরণ বিছান থাকিলে সকলেই সতর্ক হইবেন। এইরূপে জনসাধারণের informal শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল ফল হইবে।

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন দেখিতে ভালবাসি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানবের আদর্শবাদকে রূপ, রস ও গন্ধে প্রাণবন্ত করিয়া আসিয়াছে। ভাবী ভারতের জন-শিক্ষার স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে। অনেকে ইহা নিছক স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু স্বপ্নও সত্য হয়। বন্ধুবর শ্রীঅশোককুমার, শ্রীচারুলাল এবং সমপর্য্যায়ভুক্ত আরও কয়েকজন visionary একটি ক্লাব গড়িয়া তুলিয়াছেন। সেখানে চা পান ও জলযোগের ব্যবস্থাও আছে। কোনওরূপ colour (collar ?) bar নাই। উদ্যোক্তারা কেহ পরিচারক, কেহ waiter রূপে সকলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহকোণে রেডিও হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে। চাপানরত কোনও অতিথি হয়ত তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মনে হয় যেন সবই একরকম, কিন্তু ভাই, যাই বল, বেশ কসরৎ আছে—মন্দ লাগেনা।' এই শুভ মুহূর্ত্তটিতে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অশোককুমার নহে,—সঙ্গীতজ্ঞ অশোককুমার তাঁহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া যাইবে এবং দেখা যাইবে তিনি বলিতে সুরু করিয়াছেন যে ভূপালীর খেয়ালে পাঁচটি সুর লাগিয়াছে,—সাতটি লাগে নাই এবং এই সব কারণেই সাধারণে যাহাকে কসরৎ অর্থাৎ সাধনা বলে তাহার প্রয়োজন হয়। হয়ত আপনার আনন্দেই ও শ্রোতাদের আনন্দ দিবার জন্যই তিনি ভূপালীর আরোহণটিও গাহিয়া দেখাইবেন—সা রা গা পা ধা র্সা।

ওদিকে আর এক টেবিলে সাহিত্যিক চারুলাল তখন সিনেমায় অভিনীত চণ্ডীদাসের সমালোচনার তুমুল তর্ককোলাহলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন এক সময়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের উঁচু পর্দ্দায় সুর ধরিয়াছেন। মুগ্ধ শ্রোতারা শুনিতেছে— সবার উপর মানুষ সত্য,

তাহার উপরে নাই।

আধুনিক শিক্ষা ও বনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীউষাপতি ঘটক

জকাল ভারতের উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও তাহাদের অধীন স্কুল ও লেজে যে ধরণের কল্পনাপ্রধান (Subjective) শিক্ষাদান কার্য্য লিতেছে, তাহা ছাত্রগণের কল্পনা-শক্তি বিকাশে সাহায্য করে। সরকারী বেসরকারী কার্য্যালয়ে এবং কলকারখানায় ইহার খানিকটা কাজে সে। কিন্তু সমাজ-জীবনের বিভিন্ন-স্তরে—বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ঠিক সে ধরণের নয়। াধুনিক শিক্ষা মধ্য-বিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবকগণের নিকট ভার-স্বরূপ।

বস্তুতঃ, আধুনিক শিক্ষার শেষে ছাত্রের জীবনে আসে অবসাদ—খন "যেন তেন প্রকারেণ" জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে যাইয়া াক্ষিতগণ বিষম সঙ্কটে পড়ে। সামান্য কেরাণী হইয়া জীবন-যাপন করা শ্লাঘনীয় নয়; অথচ নানা কারণে এই সামান্য কেরাণীগিরিও অনেকের াগ্যে জুটে না। অথচ এইরূপ শিক্ষা অর্জ্জনের ঘটা দেখিলে বিস্মিত ইতে হয়।

এই শিক্ষার ফলে শিশুকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একটা কক্ষের ধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সে বিশুদ্ধ বায়ু, রৌদ্রতাপ ও আলোক ইতে বঞ্চিত হয়। এই শিক্ষা শিশুমনের সব বৃত্তিকে বিকশিত করিতে া পারিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিদ্যাপীঠের বরোধের মধ্যে থাকিয়া তাহার মানসিক স্ফূর্ত্তি নষ্ট হয়। নীরস াঠ্য-পুস্তকের হিজিবিজি অক্ষরগুলির দিকে তাকাইয়া তাহার মন কছুতেই সান্ত্বনা পায় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ে যে ব ছাত্র পাঠাভ্যাসে অবহেলা করে—আর শিক্ষকগণ যাহাদের পরিণাম ন্তা করিয়া শঙ্কিত হন, তাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ না করিয়াও জীবন-দ্ধে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করে।

আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রকার কল্পনাপ্রধান শিক্ষার ত্রুটি াক্ষ্য করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ও হাপুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়া তিনি বলিতেছেন,—"জ্ঞান দুই প্রকার;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ; কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না।"

আধুনিক শিক্ষায় মস্তিষ্কের কাজটাই হয় বেশী; কিন্তু শরীর ও মনের সমান বিকাশ না হইলে, শিক্ষার্থীর জীবন নানাভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে। সেই কারণেই বর্ত্তমান শিক্ষার সহিত জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী কোন শিল্প শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা ও সময়োপযোগী।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যন্ত্রশিল্পপ্রধান দেশগুলির শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, কলকারখানা ও বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে চাহিদার একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইয়া বালকের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করা হইত। এই সব দেশে নূতন নূতন শিক্ষানবিশদল শিল্পপ্রসারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিত। এইরূপে উল্লিখিত দেশসমূহ নানা দিকে সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ শিক্ষার পর ছাত্রগণকে কলকারখানায় পাঠানো হইত; সেখানে শিক্ষার্থিগণ কারখানা চালানো কাজের মোটামুটি একপ্রকার ধারণা করিয়া লইত—তাহা ছাড়া প্রাথমিক যন্ত্রপাতি (Elementary Tools) ব্যবহারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিত। কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইত ইহার ঠিক পরেই। রুশিয়ায় লেনিন-প্রবর্ত্তিত পলিটেকনিক শিক্ষা অনেকটা এই ধরণের।

কিন্তু রুশিয়ার ন্যায় সমাজতন্ত্র যতদিন না এদেশে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন এই প্রকার শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কলকারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যত বাড়িতে থাকিবে, ততই বেকার-সমস্যা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। আমাদের দেশে কলকারখানার প্রসার তেমন নাই,—শীঘ্রই যে নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহার ও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং ইউরোপের শিল্পশিক্ষা এখন আমাদের দেশের উপযোগী নহে। পরে ঐরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে।

এদিকে যুদ্ধশেষে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা প্রবল আকারে দেখা দিতেছে; যুদ্ধের সময় যেরূপ ধরণের কার্য্যপদ্ধতির প্রয়োজন ছিল, আজ আর তাহার তেমন চাহিদা নাই। রণক্লান্ত সৈন্যগণকে ও যুদ্ধকালীন কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে জীবিকা অর্জ্জনের নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। যুদ্ধোত্তর বেকারগণের মধ্যে যাহারা কোনপ্রকার শিল্পকার্য্যে দক্ষ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী অপর কোন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই, তাহারা যদি ধৈর্য্যধারণ করিয়া কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার ফলও নেহাত মন্দ হইবে না।

আমাদের মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধির আদর্শ অনুসরণে ওয়ার্দ্ধাতে যে বনিয়াদী শিক্ষা (Basic Education) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের শিল্পশিক্ষার অনেকখানি অভাব পূরণ করিতে পারে। এই শিক্ষা কুটিরশিল্পাশ্রয়ী; তবুও ইহা এমনভাবে পরিকল্পিত যাহাতে ইহা ভবিষ্যতে কোন কোন যন্ত্র-শিল্পেরও পরিপূরক (Supplement) হইয়া উঠিবে। ইহাতে শরীর ও মনের সমান বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে, শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষা (General Education) দিবার সঙ্গে সঙ্গে কোন শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী

করিয়া তোলা। ইহার অপর উদ্দেশ্য হইল,—শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষার্থীকে কতকটা স্বাবলম্বী হইতে সাহায্য করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়; কিন্তু এই শিক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশেষ কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। বনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রগণ শিক্ষাগ্রহণকালে যে সমস্ত শিল্পসামগ্রী উৎপন্ন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের লাভ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে। এইরূপ স্থলে শিক্ষকের দায়িত্ব বড় সামান্য নহে।

এই শিক্ষা সাত বৎসর বয়সে আরব্ধ হইয়া সাত বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। মাতৃভাষাই হইবে এই শিক্ষার বাহন। কোন বিশিষ্ট শিল্পকে আশ্রয় করিয়া এই শিক্ষা অগ্রসর হইবে; অর্থাৎ যে শিল্পকে মনোনয়ন করা হইবে, তাহাকে কেন্দ্রস্থ করিয়া অন্যান্য মানসিক শিক্ষাকে এই শিক্ষার অধীন করি[illegible]। নির্ব্বাচিত শিল্প-বিদ্যাটি (craft) নিয়ম অনুসারে শেখানো হইবে। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার বহন করিতে হইবে রাষ্ট্রকে; শিল্পদ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহারের দায়িত্ব এবং উহার উদ্বৃত্তাংশ বিশ্বের বাজারে বিক্রয়ের গুরুভার রাষ্ট্রকেই বহন করিতে হইবে। ইহাই হইল মোটামুটি পরিকল্পনা। সব পরিকল্পনাতেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে পারে। বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকেও অভ্রান্ত বলা যায় না; তবে কার্য্যক্ষেত্রে ইহার অনেক দোষ-ত্রুটি সংশোধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে—শিশুর আবেষ্টনীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অন্যান্য শিক্ষাকে এই প্রধান শিল্প শিক্ষার অধীন করা বাঞ্ছনীয়। ইহার অর্থ এই যে—যদি কেহ বস্ত্র-বয়ন-শিল্প শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গ্রহণ করে,—তাহা হইলে তাহাকে বয়নের উপাদান তুলা, তাহার আবিষ্কারের ইতিহাস, কৃষি-পদ্ধতি, বিস্তার ও পৃথিবীর যে সব কেন্দ্রে তুলা পাওয়া যায়, তাহা জানিতে হইবে। তুলার বীজের কথা জানিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য বীজের কথা জানিতে পারিবে। যে আবহাওয়ায় ও যে মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয় তাহার কথাও স্বাভাবিক ভাবে জানা যাইতে পারে। এই প্রকারে সে ভূগোল, ইতিহাস ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবে তাহার মূল্য অনেকখানি। এই শিক্ষায় বিষয়বস্তুর কোন অংশ কণ্ঠস্থ করিবার প্রয়োজন নাই।

তুলা পরিষ্কার করা শিক্ষাকালে মানব-ইতিহাসে এই জন্য যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও যে যে পদ্ধতি কার্য্যকরী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা জানাও অপরিহার্য্য। বস্ত্র বয়নকালে সে ওজন, মাপ ও সময়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এ পর্য্যন্ত বস্ত্র বয়নের জন্য যতপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যবহার-পদ্ধতিও তাহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। যে যন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করা হয়, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করাও স্বাভাবিক। এইভাবে প্রতি পদে পদে তাহার যেমন জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে, তেমনি অন্যান্য জ্ঞানের সহিত তাহার নবলব্ধ জ্ঞান সম্মিলিত হইতে থাকিবে। এইপ্রকারে তাহার ব্যক্তিত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা বর্দ্ধিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সমালোচনা

মহাত্মা গান্ধি-প্রবর্ত্তিত বনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী তাঁহার "Gandhiji's Latest fad" (Basic Education)—শীর্ষক পুস্তিকায় এই সমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত সমাজের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলে সমগ্র শিক্ষাটাই ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। রুশিয়ার পলিটেকনিক শিক্ষার ন্যায় ইহা সমাজদেহের অঙ্গীভূত। রাষ্ট্র বা সমাজের নির্লিপ্ততা এ শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিবে। আমরা একে একে সমস্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, দেখা যায় যে ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়; এই সময়ে শিশু বা বালক যাহা উৎপাদন করিবে তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু, ইহার ফলে কি শিশু শিশু-শ্রমিকে (Child Labour) পরিণত হইতেছে না? এখন সমাজতন্ত্রবাদিগণ এই ব্যবস্থা সমর্থন করিবে কি? কিন্তু, কার্ল মার্কস এই শিশু-শ্রমিক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—যে স্থলে বড় বড় কলকারখানার অস্তিত্ব রহিয়াছে,—সে ক্ষেত্রে শিশু-শ্রমিক নিষিদ্ধ করার মূলে নিছক সদিচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তন করাও যদি সম্ভবপর হয়—তাহাও সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যাইবে।*

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—শিশু বা বালক-বালিকার শিল্পকার্য্য হইতে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকের পারিশ্রমিক সংগৃহীত হইবে কি না। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গিয়াছে—একটী ছাত্র যদি প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করিয়া চরখায় সূতা কাটে, তাহা হইলে সে মাসে এক টাকা হইতে দেড় টাকা (যুদ্ধ-পূর্ব্ব হার) পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। একজন শিক্ষকের মাহিনা কমপক্ষে ২০৲ টাকা ধরিলে এই ব্যবস্থায় তিনি ২০।২৫ জন ছাত্র লইয়া ক্লাস চালাইয়া যাইতে পারেন।

শিক্ষকের মাহিনা ভারতে ১০।১১ টাকা ধরা হইয়াছিল। ইহাই ভারতে সাধারণ (Average) শিক্ষকের উপার্জ্জন মনে করিয়া, এই নূতন পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষকের মাহিনা উহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। একজনের জীবিকা হিসাবে এই পারিশ্রমিক যুদ্ধের পূর্ব্বে গৃহীত হইতে পারিত, কিন্তু সমগ্র দেশ যতক্ষণ না রুশিয়ার আদর্শে সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে ততদিন পর্য্যন্ত কোন

---

* "It is necessary to indicate the age below which children should not be permitted to labour, A general prohibition of child labour is inconsistent with the existence of large industry and therefore can be nothing more than a good intention. And even if the introduction of such a prohibition were possible it would be a reactionary measure."—Latest Fad p. 66.

শিক্ষকের পক্ষে এইপ্রকার সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকা অসম্ভব। অন্যথা, শিক্ষকগণকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া একদিক হইতে সমাজের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া থাকিতে হয়। ইহা ঠিক স্বাভাবিক জীবন নহে। তাহা ছাড়া ভারতে কোন যুগেই সন্ন্যাসজীবন কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। যে কেহ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনযাপনে অধিকারী ছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষকের পারিশ্রমিকের হার এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যাহা তাহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিবে।

অনেকে হয়তো বলিবেন যে, আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে, সামান্য আয়ে চলিয়া যায়। ২০৲ টাকা সেখানে সামান্য নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয় সর্ব্বত্র একরূপ অবস্থা নহে। তাহা ছাড়া যাঁহারা জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদের পারিশ্রমিক সামান্য হইলে উপযুক্ত শিক্ষক এস্থলে আকৃষ্ট হইবে না। যে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার চেষ্টাই হইতেছে—সে যুগে ভারতের শিক্ষকগণ কেন অত সামান্য মাহিনায় জাতিগঠন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা বুঝি না।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে—পাশ্চাত্য দেশগুলির ন্যায় এদেশে যদি ব্যাপকভাবে কলকারখানার প্রবর্ত্তন হয় তাহা হইলে কুটিরশিল্পাশ্রয়ী বনিয়াদী শিক্ষার আবশ্যকতা কি? তখন গ্রামে গ্রামে চরখায় সূতা কাটা, সূত্রধরের কাজ শেখা, বই-বাঁধানো, কাগজ-তৈয়ারী, কার্ডবোর্ড প্রস্তুত করা প্রভৃতি শিখিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? ইহার উত্তরে বলা হয় যে—রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় যে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে—তাহাও গ্রামস্থ ছোট ছোট শিল্প-বিদ্যালয়ে। তাহা ব্যতীত, ১৮ বৎসর বয়স না হইলে সে দেশে কোন শ্রমিককে কলকারখানার কাজে নিযুক্ত করা হয় না। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে,—যদি কোন বালক কলকারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া কোন শিল্পকার্য্য শিক্ষা করে, ভবিষ্যৎ জীবনে যে সে শিক্ষা কোন কাজে লাগিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। এদিকে যুদ্ধ শেষে আমাদের দেশে যখন কলকারখানার প্রসারে বিলম্ব আছে—তখন শিশুগণের পক্ষে কোন শিল্প শিক্ষা করা মন্দ কি? ভবিষ্যতে যদি এদেশে যন্ত্রশিল্প ব্যাপক-ভাবে প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলেও এই সব বনিয়াদী শিক্ষার অধীন বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন কমিবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে—বিদ্যালয়গুলি হইতে যে বিপুল শিল্প-সম্ভার উৎপন্ন হইবে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখনও প্রয়োজনমত শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ নয়; সুতরাং যদি কোন নূতন শিল্প-পরিকল্পনায় শিল্পোৎপাদনের নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাহা কি জাতি বা সমাজের দিক হইতে লাভজনক নহে? ইহার ফলে এদেশে বিদেশী কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যাইবে।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষা শিল্পজগতে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে পারে কি না। যন্ত্র-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা ত' আছেই; অধিকন্তু, ইহা কি কুটীরশিল্পীর (যাহারা বনিয়াদী শিক্ষা পাইবে না) উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে না? ইহার উত্তরে বলা যায়,—ভারতে শিল্প সামগ্রীর চাহিদা সামান্য নহে। ভারতকে যখন প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকার বিদেশের কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য আমদানী করিতে হয়, তখন যে কোন উপায়ে ভারতে শিল্প-সম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না; নূতন শিল্পপ্রচেষ্টা কোন বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবে না। প্রথম অবস্থায় শিল্প-শিক্ষার্থীদিগের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি এদেশের কুটীর-শিল্পজাত বা বিদেশের যন্ত্র-শিল্পজাত সামগ্রীসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবে না সত্য; কিন্তু, পরে যখন শিল্পসম্ভার বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে—তখনই সমস্যার গুরুত্ব সুস্পষ্ট হইতে পারে। এক্ষেত্রে বনিয়াদী শিক্ষাকে রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব থাকিবে সরকারের। সরকারকে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমাইয়া স্বদেশী দ্রব্যের জন্য স্বদেশে ও বিদেশে বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। শিল্পসম্ভার ক্রয়ের, বিক্রয়ের এবং ব্যবহারের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদি এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হয়—কিম্বা যদি আমদানী বা রপ্তানী শুল্ক কমিয়া যাইবার অজুহাতে এই ব্যবস্থা অচল বলিয়া বাতিল করিতে চাহেন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করা ছাড়া আর উপায় নাই। যেখানে মূল উদ্দেশ্য হইতেছে—জাতিকে অবৈতনিক শিক্ষাদান—সেখানে কোন সরকারই এই সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিরোধিতা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা জানি—ইতিমধ্যেই ভারতে অনেক প্রদেশে এই বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কংগ্রেস প্রভাবান্বিত প্রদেশগুলিতে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। আমরাও বনিয়াদীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার কামনা করি।

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

শতদলে ঘেরা কুসুমের মাটি
নীরবে বক্ষে বয়

সৌরভ তার চপল মলয়
অক্লেশে করে জয়।

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

১

অবিশ্রান্ত বর্ষণে আর জোলো-হাওয়ায় আকাশ বাতাস যেন ভারি হইয়া আছে। নদীর দুইকূল ভরিয়া গৈরিকজল উপছিয়া পড়িয়া পাক খাইয়া ফেনাইয়া ছুটিতেছে। অবিশ্রাম ধারাপাতের বিরাম নাই; বর্ষণধৌত বৃক্ষগুলির সতেজ সবুজপত্রে দিনশেষের ক্ষীণ রক্তিম যেন শেষ সঙ্গীতের করুণ সুরটির মত জড়াইয়া আছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের সকল দুয়ারগুলি বন্ধ হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইয়া হেড চাপরাশী রামরত্তিয়া দ্বারবানকে গেট্ বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়া এই মাত্র চলিয়া গেল।

হোষ্টেলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নবাগতা তরুণী শিক্ষয়িত্রীরা কি যে গল্প করিতেছে শোনা যায় না, তবে তাহাদের উচ্ছ্বসিত মিষ্টি হাসির আওয়াজ এখানেও ভাসিয়া আসিতেছে।

আপনার শ্রান্ত দেহখানি ইজি-চেয়ারে এলাইয়া দিয়া মিসেস সিং (স্কুলের লেডি প্রিন্সিপ্যাল) আপনার ড্রইংরুমে বসিয়া বাহিরে নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার শীর্ণমুখের রুক্ষতা কখন অপসারিত হইয়াছে কে জানে, সারামুখে একটি করুণ বিষাদের ম্লানিমা জড়াইয়া আছে। বেণীবদ্ধ রুক্ষ কেশের দুই একটি গুচ্ছ বাঁধনভ্রষ্ট হইয়া মুখে চোখে উড়িয়া পড়িতেছে। উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সুখলতা বসিয়াছিলেন। শূন্য নির্জ্জন গৃহ। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে তিনি একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। উপরে ষ্টাডিরুমে তাঁহার পালিতা কন্যা রেবা পড়িতেছে। স্কুলের সেকেণ্ড টীচার তাহাকে পড়াইতেছেন। দূরে আউট-হাউসে ও বাবুর্চিখানায় তাঁহার দাসী ভৃত্যগণ জটলা করিতেছে, তাহাদের কণ্ঠস্বর এখানে আসিয়া পৌছায় না। তাঁহার গৃহে সূচী পতনের শব্দটুকুও বুঝি শোনা যায়। যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এই ভয়ে তাঁহার গৃহে ও স্কুলে সবাই ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাঁহার ক্রোধের উন্মত্ততা যে ভয়ানক, তাহা সুখলতা নিজেও জানেন, যেন কাল বৈশাখীর ঝড়ের মত, উড়াইয়া ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া আপনার প্রান্তিভারে আপনি কখন স্তব্ধ হইয়া যান। কষ্টকর আত্মগ্লানি মনকে নিপীড়িত করে। কিন্তু কেন? নির্জ্জন বর্ষণাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া কর্ম্মহীন অবসরের এই ক্ষণটুকুকে সহসা সুখলতার মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। কেন? বর্ষার অবিচ্ছিন্ন ধারাপাতের করুণ রাগিণী তাঁহার সুপ্ত মনের চেতনায় অকস্মাৎ যেন রুক্ষ আবরণ খসিয়া পড়িয়া যায়। বর্ষার বারিপাতের এই উদাস বাউল রাগিণী ইহা বড়ই বিস্ময়কর। মানবের মনকে সুখের মুহূর্ত্তে উদ্বেল করিয়া তোলে, আবার দুঃখের ক্ষণে অভিভূত করিয়া দেয়। আপনার মনের অবস্থা বিশেষে হৃদয় যেন নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। স্মৃতি আসিয়া বর্ত্তমানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া গিয়াছে। চক্ষুর উপরে বাহুমূল আচ্ছাদন করিয়া সুখলতা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন। ধীরে ধীরে ছায়াচিত্রের ন্যায় তাঁহার অতীত জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। আজ হইতে কতবৎসর পূর্ব্বের সে জীবন? যখন তরুণী সুখলতা ফিজিক্স অনার্স লইয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে?

২

১৯১৯ সাল। মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়াছে। ভার্সাই সন্ধিপত্রে চুক্তি স্বাক্ষর হইয়া গিয়াছে। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত রাজ্যচ্যুত কাইজার হল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মরণাহত জার্ম্মানী পাশবদ্ধ অজগরের মত একধারে পড়িয়া আছে, তাহার ফুঁসিবার অনুমতিটুকু পর্য্যন্ত নাই। অসহায় জনগণ চাহিয়া আছে কালিমাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে।

বিজেতা ব্রিটিশের উল্লাসধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিতেছে। কি গৌরবপূর্ণ স্তুতি সে কি তাহার উল্লাস! অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত ভারত সে উল্লাসধ্বনিতে সুর মিলাইতেছে, কিন্তু ব্যর্থ আশাহত ক্ষীণ করুণ সেই সুর।

সেই তেমনি দিনে সুখলতা কলেজে পড়িত। অনাগত ভবিষ্যতের রঙীণ স্বপ্নে বিভোর তরুণী সুখলতা দেশ বা

কালের চিন্তা তখন করিত না—ভাবিত কেবল আপন ভবিষ্যত !

প্রফেসারগণের মন্তব্য কানে যাইত Her future is very bright. Highly intelligent girl—ইত্যাদি।

মুগ্ধ ভক্ত ছাত্র ও সহপাঠিগণের সরব ও নীরব স্তুতি। সহপাঠিগণের ঈর্ষা ও প্রশংসা তাহার দিবারাত্রকে যেন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গৃহস্থঘরের কন্যা সে। পিতা মার্চেন্ট অফিসে সামান্য চাকুরে। বড় ভাইটি আই-এ ফেল করিয়া একটি চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অপর ভাই ও বোনটি নিতান্ত ছোট, স্কুলে পড়িতেছে। তাহাদের মাঝে অসাধারণ হইয়া যেন সুখলতা আসিয়াছিল। যেমন তাহার রূপ, তেমনি তাহার বুদ্ধি। পিতামাতা বোধ করি সেইজন্য তাহাকে অধিক স্নেহ যত্ন করিতেন এবং হয়ত প্রশ্রয়ও দিতেন। ভ্রাতা ভগ্নীগণও তাহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। সুখলতা জীবনে কোনও দিন সেকেণ্ড হয় নাই। একে একে প্রতিক্লাশে অজস্র পারিতোষিক লাভ করিয়া ফার্ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ম্যাট্রিকে যখন সে stand করিয়া প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে স্থান পাইল তখন তাহার আশা, কল্পনা সীমা ছাড়াইয়া ছুটিয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের আশা ও আনন্দের সীমা নাই।

আই-এস্সিতে সুখলতা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ফিজিক্স অনার্স লইয়া বি-এস-সি পড়িতে সুরু করিল। সায়েন্স তাহার ভাল লাগে। তাই ম্যাট্রিকে অঙ্ক শাস্ত্রে উচ্চ নম্বর পাইয়া সে আই-এস সি পড়িতে মনস্থ করে। তখনকার দিনে সায়েন্সে মেয়ের সংখ্যা থাকিত নগণ্য। বিশেষ করিয়া সেইজন্য সুখলতা সায়ান্স লইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সৃষ্টির এক বিশাল রহস্য যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে। কত নূতন তথ্য ইহার অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এক একজন মণীষী তাঁহার আজীবনব্যাপী সাধন দ্বারা এক একটি রহস্যের দুয়ার খুলিয়াছেন। অনুমানকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আজীবনব্যাপী জ্ঞানপিপাসাকে কথঞ্চিত পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

সাধারণ মানব তাহার সুবিধা, তাহার শুভফল গ্রহণ করে, কিন্তু সুযোগদাতাগণকে দিনান্তে একবার স্মরণ করিতেও ভুলিয়া যায়। তা যাক্। সেই সাধকগণ নিন্দা সুখ্যাতিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। একের পর আর একজন আসিয়া আরব্ধ কর্ম্মকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক রহস্য, এই আলোকতত্ত্বের অপূর্ব্ব রহস্য লোক-চক্ষে আনিয়া ধরিয়াছেন। ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎজ, ব্র্যাঁলি, স্যার জগদীশ, অলিভার, লজ, সংখ্যাতীত নীরব সাধক মণীষীগণ। পড়িতে পড়িতে সুখলতার মনে হয় আমিও ওই রকম হইব। গবেষণা করিব, নূতন বৈদ্যুতিক শক্তির তথ্য আবিষ্কার করিব। হায় রে, আশা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ তরুণ জীবন। একাগ্রচিত্তে গভীর অভিনিবেশে সুখলতা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধির প্রতিভায় প্রফেসারগণও বিস্মিত হইলেন। সকল ছাত্র ছাত্রী অনুমান করিতে লাগিল যে এবারও প্রতি-যোগিতায় সুখলতা প্রথম হইবে। আঃ, সেই সকল দিনগুলি !

৩

সকলের আনন্দ অভিনন্দন কোলাহল উচ্ছাস প্রশমিত হইতে সেদিন বেশ একটু বিলম্ব হইয়াছিল। এম-এস সি ক্লাসের প্রথম দিন। সুখলতা আসিয়া যখন ট্রাম ধরিল তখনও তাহার মাথাটা যেন গরম হইয়া আছে। আনন্দে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ। অবশেষে প্রথম হইয়াছে ? তাহার ছাত্রাজীবনের সকল কামনা। সেইদিনই রজতের সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। সে সময়টা ট্রামে অত্যন্ত ভীড়। আনন্দ পরিপূর্ণ আপনচিন্তায় নিমগ্ন সুখলতা। অত লক্ষ্য না করিয়াই এই ট্রামে উঠিয়াছিল। কিন্তু উঠিয়া যখন দেখিল ভীড়—স্থান নাই, তখন ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াছে, নামিতে পারিল না। সুখলতা একপাশে দাঁড়াইল। একটু পরেই রজত তাহাকে ডাকিয়াছিল; কথাগুলো, যেন এখনও কানে আসিয়া বাজে, "আপনি যদি কষ্ট করে একটু এগিয়ে আসতে পারেন তবে এখানে একটু জায়গা হতে পারবে।" অপরিচিতের আহ্বানে বিরক্ত সুখলতা মুখ তুলিয়া আহ্বানকারীর পানে চাহিতেই তাহার মন যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সুবেশ সুদর্শন রজত হাসিভরা আগ্রহপূর্ণ আঁখি তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে।

সুখলতা ধন্যবাদ জানাইয়া কোনক্রমে অগ্রসর হইয়া গেল। বসিবার স্থান দিয়া রজত নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিল "Congratulations" বিজ্ঞান কলেজের দুর্লভছাত্রী আপনি। আপনাকে আনন্দ জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—ক্ষমা করবেন।

সুখলতার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোনও মতে কহিল "বহু ধন্যবাদ।"

রজত তাহার নিজের পরিচয় দিল তাহার নাম রজত রায়। সম্প্রতি সে বিজ্ঞান কলেজে electro magnetic theory'র পার্টটাইম লেকচারার।

এতক্ষণে সুখলতা সাগ্রহদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কহিল "আপনি? আপনি আমায় আনন্দ জানাচ্ছেন? আপনার মত এম-এসসির রেজাল্ট, ইউনিভার্সিটির কেরিয়ার। সে আমাদের মত যে কোনও ছাত্রছাত্রীর পক্ষে কামনার বস্তু।"

আপনি এখন বসু বিজ্ঞানমন্দিরে উদ্ভিদবিজ্ঞান রিসার্চ্চ করছেন শুনেছিলুম। আচ্ছা আপনি দুটো ডিফারেণ্ট সাবজেক্টে কি করে রেকর্ড রেখে ফাষ্ট হলেন?

সুখলতার উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে রজত হাসিল। মৃদু হাস্যধ্বনি এখনও যেন কর্ণে ধ্বনিত হয়। রজত উত্তরে বলিয়াছিল "তাহলে গুণগ্রাহী হিসাবে আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। হ্যাঁ উপস্থিত আমি রিসার্চ্চ বন্ধ করে কলেজে পার্ট-টাইম কাজ করছি এবং ফাইন্যান্স সার্ভিসের জন্য তৈরি হচ্ছি। কাজেই এখন ভাবি—যে বিদ্যাকে জীবনে সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারলুম না, তাতে ফাষ্ট সেকেণ্ড হওয়াটা অর্থহীন।"

সুখলতা বুঝিল তাহার প্রশংসা ইহার কোনও গোপন ব্যথায় ঘা দিয়াছে। অপ্রতিভ হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

রজত প্রসঙ্গটি সহজ করিয়া কহিল "জানেন? বাড়ীর লোকেরা যখন দেখলেন যে দুটো সাবজেক্টে প্রথম হলুম, তখন তাঁদের ইচ্ছা হল যে দেখা যাক ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে ছেলেটা ফার্ষ্ট হতে পারে কিনা। তাঁদের ইচ্ছাপূর্ণ করতে গিয়ে আমার ইচ্ছা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল। অর্থাৎ কিনা আদর্শপুত্র হতে চেষ্টা করলাম।" বলিয়া সে হাসিল। এবারকার হাসিতে আনন্দের উচ্ছলতা নাই, ব্যথিত হাসি। সুখলতা সহানুভূতির দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়াছিল।

তাহার পর কলেজে, ক্লাশে, করিডোরে, দৃষ্টি বিনিময়, হাসি, দুই চারিটি বাক্য বিনিময়। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হইতে লাগিল। সেই সব দিনগুলি? বাহিরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। মেঘভারে সমস্ত আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসিয়া নদীর এপার হইতে ওপার যেন অনাবৃত করিয়া দিতেছে। মিসেস সিং আপনার অজ্ঞাতসারেই চোখের উপর হাত ঢাকা দিলেন। সে সুখস্বপ্নে মনটা নিবিড়ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে তাহা যেন এমনি ভাঙ্গিয়া না যায়। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে, তাহার প্রবল শব্দে পৃথিবীর আর সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে বসিয়া পৃথিবীর একটি প্রাণী তাহার জীবনের বিষামৃত একাকী মোহভরে পান করিতেছে। আহা সেইসব আনন্দ পরিপূর্ণ দিনগুলি! কত আলাপে, কত আলোচনায়, কত অর্থ-হীন গুঞ্জনে, দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া চিন্তাহীন লঘু দিনগুলি যেন উড়িয়া গিয়াছে। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই কলিকাতা নগরী—আজো কি তাহা তেমনি আছে?

তাহারপর ধীরে ধীরে একদিন উভয়ের মনের গোপন কামনা প্রকাশ হইয়া গেল। অসহ্য আনন্দব্যাকুল সেই মুহূর্ত্ত। অত্যধিক সুখাবেগে বোধকরি নয়নের অশ্রু বাধা মানে না? তাই রজতের বলিষ্ঠবাহুর বন্ধনে উত্তপ্ত বক্ষের সান্নিধ্যে সুখলতা কাঁদিয়াছিল। সেই তৃষিত ওষ্ঠের গাঢ় উষ্ণ স্পর্শ আজো যে সুখলতা অসীম ঘৃণাভরেও ভুলিতে পারে না? তাহার সমস্ত দেহ মনে আজো যে সেই নিবিড় সোহাগ স্পর্শের স্মৃতি উদ্বেল করিয়া তোলে?

যেন রঙীণ স্বপ্নে সেই দিনগুলি কাটিয়াছে! ছুটির দিনে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন ঘুরিয়াছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখনীড়ের রচনার গল্পে সময় কাটিয়াছে। আবার কলেজ আওয়ারে সাধনার সহিত পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। পড়াতে রজতের কি আগ্রহ কি উৎসাহ। অথচ মনোনিবেশে সুখলতা পড়িতেছিল। ষ্টেট্ স্কলারশিপ সে লইবেই। কে জানে—তাহার জীবনেও মাদাম কুরী বা ইভান্স কুরীর ন্যায় সাফল্য আসিবে কিনা?

৪

রজত ইংল্যাণ্ড হইতে ফিরিয়াছে কয়মাস। আসিয়াই কলেজে অস্থায়ী কর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছিল। রজত ফেল

করিয়াছিল viva voceতে। অন্যান্য বিষয়ে উচ্চনম্বর পাইয়াও সে ব্যর্থ হইয়াছে। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। রজতের মনেও আঘাতটা একটু বেশীরকম বাজিয়া তাহাকে এই পরীক্ষায় সফল হইতে দৃঢ়কাম করিয়া তুলিল।

রজত কলেজের চাকুরী ছাড়িল। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী।

সুথলতা বলিয়াছিল "এক্সপেরিমেণ্টের সময় তোমার অভাবটা আমাকে বেশী লাগবে। তা হোক, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কর।"

রজত বলিয়াছিল "তোমায় ছেড়ে যেতে কষ্ট কি রকম হবে সেটা তুমি নিজেকে দিয়ে অনুভব করছ বোধহয়। তবু কর্ত্তব্য আগে। আমি না থাকলে তোমার এক্সপেরিমেণ্ট, একাগ্রতায় আরো ভাল হবে। আর তা ছাড়া সু, তোমাকে শীঘ্র কাছে পেতে হলে আমার তাড়াতাড়ি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও তো প্রয়োজন?"

সুথলতা ও রজতের পিতামাতার নিকট তাহাদের প্রণয়ের বার্ত্তা অবিদিত ছিল না। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে সুথলতা এম-এসসি পাশ করিলেই ইহাদের বিবাহ হইবে। ইহারাও সেকথা জানিত।

সুথলতা গভীর বিশ্বাসের সহিত ভাবিত, রজত তাহার স্বামী। তাহার কুমারী হৃদয়ের প্রথম প্রণয় একান্তভাবে রজতকে নির্ভর করিয়া বাড়িতেছিল। রজতের প্রতি চাহিলে তাহার হৃদয় গভীর আনন্দরসে সিক্ত হইয়া যাইত। তাহার হৃদয় যেন চিরন্তন রজতের মঙ্গল কামনা করিত। ইহা তাহার নারীত্বের স্ফুরণ। নারীর নারীত্ব, শুধু প্রেম, শুধু স্নেহ দিয়া পরিপূর্ণ। অন্ধ আবেগে ভরা।

প্রেমের পূজায় জ্ঞান বিদ্যা যুক্তি তর্ক অর্থহীন। সে পূজার নির্ম্মাল্য ভক্তি ও ভালবাসা। তরুণী সুথলতা তাহার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়খানি নিঃশেষে রজতকে সমর্পণ করিয়াছিল।

সুন্দরী সুথলতার স্তাবক ভক্ত মিলিয়াছিল প্রচুর। তাহার একনিষ্ঠ হৃদয় কাহারোও পানে চাহিয়া দেখে নাই।

ক্রমে বৎসর ঘুরিয়া গেল। সুথলতার একাগ্রচিত্তে অধ্যয়নের বিরাম নাই।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠায় দিন কাটিতে লাগিল। খবর বাহির হইলে জানা গেল। সুথলতা উচ্চ নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছে। কি সে আনন্দভরা দিন। আনন্দ অভিনন্দন আশীর্ব্বাদ প্রশংসার স্রোতের বিরাম ছিল না। তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আশা সফল হইয়াছে। সে স্কলারসিপ পাইবে। তাহার পর বিবাহ ও দুইজনে মিলিয়া বিলাত যাইবে। তাহাদের স্বপ্ন দিয়া রচিত ইংল্যাণ্ড।

রজত তখন দিল্লীতে। তাহাকে সব খবর দিয়া সুথলতা পত্র দিল।

উত্তরে উচ্ছসিত আনন্দ জানাইয়া প্রথমে টেলিগ্রাম ও পরে পত্র আসিল। বহু আনন্দ জানাইয়া আশীষ দিয়া যে পত্র আসিল তাহার শেষদিকে রজত লিখিয়াছিল। "সু, এবার তুমি ইংল্যাণ্ডে যাবে। যে মাটিতে তুমি আছ সেই মাটিতে আমিও রয়েছি। এ দূরত্ব বোধ হয় না, কেন না ট্রেণে চড়লেই তো তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছাবো। কিন্তু তুমি বহু দূরে যাবে মনে করলে মনটা অস্থির হয়। তা হক, আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ—তুমি তোমার শিক্ষা সমাপ্ত কর ও সুখী হও।"

মাতা একদিন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "জানিস সুথ্ তোর শাশুড়ীর আর তর সইছে না—সে আমাকেও যেমন তাড়া দিচ্ছে তেমনি নিজেও বরণডালা সাজাতে বসে গেছে।"

সুথলতা সলজ্জ হাস্যে কহিল "তোমারও তো তাতে কম উৎসাহ নেই মা?"

মা বলিলেন "তা সত্যি বলতে কি, আমার ইচ্ছেও কম নয়। মেয়ে বড় হলে কি কম চিন্তা? তবে তোমার মত মেয়ে ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ পাত্রপক্ষ বিয়ের জন্যে নিজে থেকে সাধছে।" মা গর্ব্বভরে হাসিলেন।

সুথলতা হাসিল, বলিল "কিন্তু ওঁরাও খুব ভাল মা, কেন না ওঁদের ছেলে তো মেয়ের চাইতে খাটো নয়।"

মা ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার রজতের মত পাত্র বহু ভাগ্যে বহু আরাধনায় মেলে। সে কথা একশো বার। না রে আমি ঠাট্টা করছিলুম। তবে রজতের বাপ মা বিয়ের জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন। এই কদিনে পাকাপাকি করে বোধ হয় অগ্রহায়ণে দিন ঠিক করবেন।"

সুথলতা নীরবে শুনিল। গভীর সুখাবেশে তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রজত? তাহার রজত

এইবার নিকটতম হইবে। তাহাদের হৃদয় বহুদিন এক হইয়াছে, এইবার সামাজিক বাঁধন তাহাকে দৃঢ় করিবে—স্থাপিত করিবে লোকচক্ষে। হেমন্তের এক কুহেলী আবৃত সন্ধ্যা অপেক্ষা করিয়া আছে তাহাদের জন্য। তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবে তাহা সার্থক হইবে। তাহার পর জায়া, জননী, গৃহিণী। কিন্তু? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—জননী হইবার পূর্ব্বে সে নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক হইবে। বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক। তাহার জীবনের চরম কামনা। মনের তৌলদণ্ডে ওজন করিলে একদিকে রজত, একদিকে বৈজ্ঞানিক হইবার আকাঙ্ক্ষা।

বিবাহের পর সে বিলাত যাইবে। রজতও গিয়াছিল। তাহার পর সসম্মানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ইউরোপ ভ্রমণ সারিয়া দেশে ফিরিবে। কি সে সুখের দিন! কি সে আনন্দময় জীবন!

প্রফেসারদের সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়া লইয়া এ্যাপ্লাই করিল। D. P. I. এর সহিত সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিল। হায় নিজের মৃত্যুশয্যা আপন হস্তে রচিত করিয়াছিল সেইদিন।

ইতিমধ্যে পরীক্ষা শেষে রজত দেশে ফিরিল। রজতের মাতা ভগ্নী তাহাদের বাটি আসিতে লাগিলেন। পিতায় পিতায় গোপনে পরামর্শ হইতে লাগিল। কথাবার্ত্তা অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

দুই বাটির মাতাদ্বয় কাপড় জামা গহনার অর্ডার লইয়া ব্যস্ত হইলেন।

আর রজত? হাসি খুশী কোলাহলের ফাঁকে তাহাকে নির্জ্জনে দেখিলেই মৃদু কণ্ঠে সুর করিয়া গাহিত "ওগো প্রিয়া, নিতি আসি তব দ্বারে"… …

আরক্ত হইয়া লজ্জিত কণ্ঠে সুখলতা বলিত, "আঃ কেউ শুনতে পাবে যে?"

"শুনতে পেলেই বা? তুমি কি আমার প্রিয়া নও?" রজতের মৃদু কণ্ঠে কৌতুক উচ্ছল হইয়া উঠিত।

"তাই বলে চেঁচিয়ে"……লজ্জায় সুখলতার বাক্য অর্দ্ধ পথে থামিয়া যাইত। বলিত "নাম করে ডাকতে পার না যেন?"

আবেগবিহ্বল অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে চাহিয়া রজত বলিত "নাম? ওই একটাই তো তোমার নাম? প্রিয়া, প্রিয়া, আমার চিরকালের অন্তহীন জীবনের একমাত্র প্রিয়া।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

'দেহ মনের' গঠন ও উৎকর্ষ সাধন

ডাঃ শ্রীদুর্গারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-বি

প্রসবকালে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সাধারণতঃ সে ক্রন্দন করে। এই প্রথায় সে প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। প্রথম শ্বাস গ্রহণ করিবার অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ ফুলটী (placenta) জঠর হইতে পৃথক হওয়ায় অম্লজান বাষ্পের অভাব হয়। দ্বিতীয়তঃ বহিস্থ শীতল বায়ু চর্ম্মে লাগিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রক্রিয়া করে।

জীবনের প্রারম্ভ মুহূর্ত্ত হইতেই এই দেহের অভাব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা আমরা উপলব্ধি করি, উহা আমাদিগের উপর সারাজীবনই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

এই শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের পর হইতেই দেহের কার্য্যের বিকাশ ক্রমস্তরে ঘটিয়া ক্রমে শিশুটী পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে দেহের মধ্যে ও বাহিরে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন, গঠন ও সংবর্দ্ধন ঘটে। অবশ্য প্রয়োজনীয় মনের গঠনও দেহের গঠনের ন্যায় ক্রমস্তরে গড়িয়া উঠে। জীবনের অন্ত হইলেই উহাকে মৃত্যু বলে। শ্বাসপ্রশ্বাস মৃতের থাকে না। মনের স্বত্বা আর জীবনের লক্ষণও অপসারিত হয়। শিশুকাল হইতে পূর্ণযৌবনাবস্থায় পৌঁছাইবার কাল অবধি দেহ ও মনের সংবর্দ্ধন হইতে থাকে। দেহের পরিবর্ত্তন অবশ্য সারাজীবনই চলিতে থাকে।

অতি শিশুকালে ক্ষুধা পাইলে শিশু ক্রন্দনরূপে ঐ বেদনা ব্যক্ত করে। ক্রমে ক্ষুধা ও মলমূত্রত্যাগ ও অস্বচ্ছন্দতা ইত্যাদির অনুভূতি হয়। ক্রন্দন ও তৎসহ হস্তপদাদি অঙ্গসঞ্চালনাদি ক্রমে পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে ক্ষুধার লিপ্সা, আনন্দে হাস্য দর্শনের অভিলাষ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যের পরিলক্ষণ পরিস্ফুটিত হয়। ক্রমে প্রয়োজন হেতু বাসনা, উহা হইতে অনুভূত সুখের লিপ্সা, বেদনায় বিরক্তি ও আপত্তি প্রকাশ করে।

বাসনা কল্পনায় পরিণত হয়। কল্পনাকে সফল করিতে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চিন্তা ও কার্য্য-কৌশল অবলম্বন করে। কাজেই দেখা যায়, শরীর ও মন স্তরে স্তরে উভয়েই উভয়কে উৎকর্ষের পথে টানিয়া লইয়া যায়।

যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব অবধি দেহ কেবল গঠন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে। মনটি চাঞ্চল্যপরিপূর্ণ থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে মনটি অধিক চঞ্চল হয়—তাহার কারণ দেহে নানাপ্রকার কার্য্য হইতে থাকে, উহা মনটিকে অজানা সুখের পথে পরিধাবিত করে। এই পরিধাবন অবশ্য স্বাভাবিক হইলেও, বিভিন্ন ব্যক্তির ও নরনারীর মধ্যে বহু পার্থক্যের লক্ষণ দেখা যায়। দেহের এতদ্‌অবস্থায় একমাত্র গঠনমূলক কার্য্য সর্ব্বক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হইলেও শিক্ষা সংযম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী গঠনমূলকের সাথে আবার ধ্বংসমূলক কার্য্যের সূচনা আরম্ভ হয়। দেহের গঠনমূলক কার্য্য পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থা অবধি সংসাধিত হওয়াই নীতি, এই অনুযায়ী ধ্বংসমূলক কার্য্য অপরিমিত হইলে দেহের পূর্ণ গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনটি যৌবনের প্রারম্ভ কাল হইতে সুখপ্রিয়, অভিলাষী ও অনুসন্ধিৎসুতার পরিচয় দেয়, উহাও প্রয়োজনের দায়ে। দেহের পূর্ণ গঠনের পরে মনের চাঞ্চল্য স্থিরীভূত হয়, তাই পূর্ণপ্রাপ্ত বয়স হইতে প্রৌঢ়কালের মধ্যেই স্থির চিন্তাশক্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রৌঢ়ত্ব হইতে বার্দ্ধক্য অবধি স্থির ধীর বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ হইলেও, দেহের কার্য্য যখন ক্রমে অধোমার্গে ধাবিত হয় তখন স্মৃতি ও চিন্তাশক্তি কমিতে থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে বার্দ্ধক্যকাল অবধি মানসিক শক্তির বিকাশ অধিকতর হয় বলিয়া যৌবনের প্রারম্ভজীবনের কার্য্যকরণ অবস্থার উপর ভবিষ্যত জীবনে মানসিক স্ফুরণ নির্ভর করে। প্রবৃত্তি মার্গের পরিবর্ত্তন ও দেহের বিকার এই জীবনের পিচ্ছিল সঙ্গম স্থলে অসংযত বা সংযত ভাবে চলার উপর নির্ভর করে।(১) প্রাকৃতিক, স্বভাবীয় প্রাণিকুলের কার্য্যাবলী সুবুদ্ধিমান মানব ঘৃণাসহকারে বর্জ্জন অভিলাষে জ্ঞানকল্পিত দেববাঞ্ছিত নিয়ম-কানুন পালনে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেন।(১) ধর্ম্মের সমর্থন অতি নিম্নতর প্রাণীদিগের মধ্যেও বিচার করিলে বর্ত্তমান দেখা যায়। মানব স্বভাবের নিয়ম রক্ষা করিতে যাইয়া পাশবিক যে হিংস্রভাবের উদয় হয়—উহাকে দমন করিবার জন্য ধর্ম্মনীতি গঠন করেন। ধর্ম্মনীতি, সমাজ ও শাসন নীতির ভিত্তিস্থাপন করে। সমাজ ও শাসননীতি গঠন করিবার উদ্দেশে পাপতত্ত্বের উদয় হয়। পাপতত্ত্ব, অবাঞ্ছনীয় পশুভাবের বিরোধ আনিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। পাপশূন্য হইতে হইলে সংযম শিক্ষা প্রয়োজন। মানব বিচার ও শিক্ষার দ্বারা পশুভাব ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কি একেবারে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য উপেক্ষা করিতে পারে? ইহাই সমাজ শিক্ষার সমস্যা। স্বভাবের স্ফুরণ বজায় রাখিয়া সংযম, মানব সমাজের ইহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন সমাজ তাহাদের শিক্ষা, ধর্ম্ম, দীক্ষা আবহমান কালের প্রচলন অনুযায়ী চলে ও ক্রমে চেষ্টা ও যত্ন অনুযায়ী ক্রমস্তরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়।

হিন্দু সমাজের, উচ্চ ধর্ম্ম ও সমাজনীতিগুলি জগৎ মধ্যে আদর্শ হইলেও উহাদের পূর্ণ বিকাশ কোনও জাতির মধ্যে এখন দেখা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় মনীষীগণের মধ্যে অনেকেই উহা সুপ্রথা বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও উহার নীতি এত কঠোর যে অপর কোন জাতি উহা গ্রহণ করিয়া পালন করিতে অক্ষম।(২) হিন্দুরাও এখন উহা পালন করিতে অক্ষম। কোনও ভাষা প্রচলন অভাবে লুপ্তপ্রায় হইলে যেমন উহার চর্চ্চায় সুফল ও সুযশ পাওয়া কঠিন হয় সেইরূপ আমাদিগেরও ধর্ম্ম আলোচনা সুফলপ্রদায়িনী বলিয়া এখন আর মনে হয় না।(৩)

হিন্দুদিগের ধর্ম্মসাধনপ্রণালী কেবল কুসংস্কারপূর্ণ কঠোর সমাজনীতি বা নিম্নস্তরের কুসংস্কারপূর্ণ পূজাপাঠ ভাবিলেই চলিবে না। ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর দ্বারা দেহ ও মনের গঠন হয়। উহা স্বভাবিক নিয়মের পন্থায়। সাধনে দেহের অপেক্ষা মনের শক্তি ও স্থির জ্ঞানের অধিক বিকাশ হয়।(৪) যৌন ব্যাধিই অধিকতর দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক। হিন্দুপদ্ধতি উহার প্রতিবন্ধক। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া স্নায়ুগুলিকে সচেতন করিয়া দেহের কার্য্য কমাইয়া ও বিশ্রাম দিয়া মনের একাগ্র চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়।(৫) ধর্ম্মপন্থার সাধন করিলে উহার চূড়ান্ত প্রত্যক্ষ পথই যোগসাধন মার্গ।(৬) যোগ সাধনায় দেহ ও মনের সম্বন্ধ বুঝা যায়।(৩) ইহাই দেহের নিরাময় শক্তি অর্জ্জন ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পন্থা। মনের স্থৈর্য্য ও শক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যোগসাধনই একমাত্র দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থা।(৬)

মানব জগতে বিজেতা হয়—মনের শক্তি প্রভাবে(২) শারীরিক বলে সর্ব্বদা আধুনিক যুগে উহা সম্ভব হয় না। আত্মসংযম না করিলে সমাজ ও শাসন বিশৃঙ্খল ব্যক্তিকে সমাজে বাস করিতে দিবে না(১)। মানব নিজ সংযম শক্তির প্রভাবে সমাজে স্বাধীনতা ও সম্মান বজায় রাখিয়া, নিজস্বাধীনতা ও সম্মান অর্জ্জন করেন। যিনি যত সংযত, শক্তিসম্পন্ন ও পরহিতৈষী, সভ্য সমাজ তাহার তত সমাদর করে। সভ্যতার চরম শীর্ষে কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগ—যাহার দ্বারা মানব পূর্ণত্ব লাভ করে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য বৈষয়িক জগৎ মানে না বলিয়া সভ্য হিন্দু জাতিও কি তাহাদের আদিম সভ্যতা ত্যাগ করিবে? অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে কি হিংসা নীতি টিকিবে।' হিন্দুর গম্ভীর মাঙ্গলিক নীতিমূলক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ধরিয়া—দেহমনের গঠন করিলে অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে নীতির প্রভাব প্রকাশ পাইবে(১)।

যোগ সাধনায় দেহের উপর মনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা জন্মে, ক্রমে—মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়—উহা হইতে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হেতু দেহ ও মন উভয়েই স্বীয় অধীনস্থ হয়। অধীনস্থ দেহ ও মন—সংযম সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারে। সংযমই মনের অলৌকিক শক্তির কারণ।(৪)

বাল্যকাল হইতে শারীরিক পরিশ্রম করিলে অবশ্যই দেহের গঠন নিরাময় হয় ও সুন্দকায় হওয়া যায়।(৩) শ্রমজীবীদিগের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।(৭) ছাত্রদিগের যৌবনের

প্রারম্ভকালে কঠোর ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রাপ্ত যৌবনে যদি সম্ভব হয় ক্রমন্তরে লঘু ব্যায়াম হিতকর এবং উহাতে বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরণে বাধা দেয় না। শিশুকাল হইতে কঠোর ব্যায়ামে বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণে বাধা পাইতে পারে। অধিক ও কঠোর ব্যায়াম, সারা জীবন একাধারে চালান সম্ভব নহে। মস্তিষ্কের চালনা করিয়া যাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের অবশ্যই মধ্য বয়সের পরে ব্যায়াম চর্চ্চা ছাড়িতে হয় ও ছাড়িলে যকৃৎ ও উদরের প্রক্রিয়া উত্তমভাবে না হওয়ায়—বাত, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়।(২) অধিক পরিশ্রম করিলে, তদনুরূপ পুষ্টিকর আহার ও বিশ্রাম না করিলে দেহের ক্ষয় ও মনের দৌর্ব্বল্য অবশ্যই আসে! কঠোর ব্যায়ামে পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। পরাধীনতার পেষণে মধ্যবিত্ত লোক আজ প্রায় নিরন্ন। পুষ্টিকর আহার ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক এতদুভয়ের অধিক পরিশ্রমই ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। অলস ব্যক্তির অধিক মানসিক পরিশ্রমে শরীর সুস্থ রাখা সম্ভবপর হয়। দ্রুত ভ্রমণাদি লঘু ব্যায়ামের প্রয়োজন। অধিক মানসিক চিন্তার পর মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। অধিক চিন্তায় চিত্তবিকারগ্রস্থ হয়, তাই উদ্বেগ, অনিদ্রাদি হইতে উদরের ও স্নায়বিক ব্যাধি কখনও কখনও হৃদযন্ত্র ও ধমনীগুলিতে বিকৃতি লক্ষণ ঘটিয়া অধিক রক্তের চাপজনিত ব্যাধি আদির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

যোগসাধন মার্গে কিন্তু দেহ ও মনের একাধারে উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই পন্থায় ইচ্ছা অনুযায়ী দেহ ও মনের কার্য্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত করা যায়, ও তদধিক বিশ্রাম উপভোগ করা যায়।

শিক্ষা পাইলে অনেকের পক্ষেই যোগসাধনা করা সম্ভব হয়। নিত্য অল্পক্ষণ সাধন করিলে শরীর ও মনের যথেষ্ট মঙ্গল হয়। বিষয়টি গোপনীয় রাখা যে ঠিক দোষণীয় তাহাও বলা চলে না। কারণ শিল্প পণ্য প্রস্তুত প্রণালী, ব্যবসার গূঢ়তত্ত্ব ইত্যাদি যদি গোপন রাখা ন্যায্য হয়, তবে এই তত্ত্বোৎকর্ষক পরাবিদ্যার গোপনতা দোষনীয়?

তবে বিদ্যাটি লুপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

References :

(1) The Journal of the Indian Medical Association, Calcutta Vol XIII no 3 Page 77. (Dec 1943)

(2) The Journal of Ayurveda, Cal Vol III Pages, 98, 306,375 ; Vol XV Page 46, 287 (1936-39)

(3) The chikitsa Jagat, Calcutta, Vol XV no 7 Page 147 (May 1944) Baisakh Bs 1351

(4) The Indian Medical Record, Calcutta, Vol LXIV no 4 Page 101 ; no 8, P 199 (1944)

(5) The Health, Madras, Vol XXI no 5 Page 98 (May 1943)

(6) The Bharatvarsha, Calcutta Vol XXXII no 1 Page 57 (Asarh Bs 1351)

(7) The Calcutta Municipal Gazette, Cal Vol XLI no 10. Page 298 ; (27th Jounary 1945)

পথ

"ভাস্কর"

১

এ স্থানটা এতদিন ছিল একটা শালবন।

কিছুদিন হইতে এ স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া বড় একটা রাস্তা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

বড় বড় গাছ কাটিয়া সরাইয়া ফেলা হইতেছে। উচু নীচু স্থানগুলিকে কাটিয়া ও মাটি ভরিয়া সমান করা হইতেছে। বহু দূর হইতে লরী বোঝাই ইট, খোয়া, পাথরকুচি আরও কত কি আসিতেছে। গোটা দুই প্রকাণ্ড রোলার এক স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। এক দল ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসীয়র ও অন্যান্য কর্মচারী সর্বদা ঘোরাফেরা করিতেছে।

যেখানে পথ ছিল না, সেখানে পথ হইতেছে। যেখানে কখনও কোন মানুষ যাতায়াত করে নাই, সেখানে বহু লোক যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। অজ্ঞাত স্থানটি সহসা অতিকায় হইয়া পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। নির্জন বনস্থল কলরবমুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এপাশে ওপাশে কয়েকটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বাস করেন কয়েকটি কর্মচারী, আর মজুত থাকে নানাপ্রকার কাগজপত্র আর যন্ত্রপাতি। কয়েকটি টিউব-ওয়েল বসান হইয়াছে প্রয়োজনীয় জলের জন্য।

প্রকৃত পরিশ্রমের কাজ যাহারা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহাদের মধ্যে আছে পুরুষ, আছে নারী, আছে বালকবালিকা। ইট বহা, মাটি কাটা, জল

তোলা, গাছ কাটা, রোলার টানা প্রভৃতি কত রকমের কত কাজ। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু পুরুষ ও বহু নারী মিলিয়া নিজেদের শরীরের সকল শক্তিটুকু ব্যয় করিয়া তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে এই পথ। এই পথে নরনারী গমন করিবে, বালক-বালিকা গমন করিবে, গরুর গাড়ী, রিক্শ, মোটর গাড়ী চলিবে। কত দ্রব্য দূর হইতে দূরান্তরে যাইবে এই পথের উপর দিয়া। কেহ যাইবে ধীরে, কেহ যাইবে দ্রুতগতিতে। কেহ যাইবে নিকটে, কেহ যাইবে দূরে। কত অপরিচিতের সঙ্গে কত অপরিচিতের সাক্ষাৎ হইবে ক্ষণেকের জন্য। এই পথ বাহিয়া কেহ যাইবে আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে, আবার কেহ যাইবে করুণ বিলাপ করিতে করিতে। এই পৃথিবীর, এই সমাজের কত সুখ, কত দুঃখ বহিয়া যাইবে, ভাসিয়া যাইবে এই পথের বুকের উপর দিয়া।

এই নূতন পথের কাজে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছে একটি ক্ষুদ্র পরিবার—রামু, রামুর মাতা, আর রামুর স্ত্রী শোভা। রামুর শরীরটা যেন মানুষের শরীর নয়, কাল পাথরের মূর্ত্তি যেন। নিকষ কাল পেশী-বহুল সুস্থ সবল যৌবনদীপ্ত দেহখানির দিকে যাহারই দৃষ্টি পড়ে সেই তাকাইয়া থাকে। কাজ করে অসুরের মত। তাহারই মত অন্য শ্রমিকরা যে কাজ করে একদিনে, রামু তাহা শেষ করে একবেলায়। বেশী কাজ করিতে পারে বলিয়া তাহার আয়ও বেশী। পুত্রের দিকে চাহিয়া মাতার বুক আনন্দে ভরিয়া ওঠে। স্বামীর দিকে চাহিয়া শোভার মন গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়। রামুর মনিবরা তাহাকে ভালবাসে, সহকর্মীরা শ্রদ্ধা করে, হয়তো মনে মনে একটু হিংসাও করে।

পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামুদের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে থাকে। দিনের পর দিন ক্রমশ যেমন প্রশস্ত পথটির স্বকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি রামুদের কুটীরখানিও ক্রমশ শ্রীসম্পন্ন হইতে থাকে। গৃহখানি বেশ ভাল করিয়া পুনর্নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ফুল গাছও রোপণ করা হইয়াছে। প্রকৃতির শোভা, কুটিরের শোভা একত্রিত হইয়া শোভার সংসারের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। নূতন পথ হইতে বেশী দূরে নয়। ছোট একটি পল্লী। প্রায় সকলেই এই পথে কোন না কোন কাজ করে। সকলেরই অবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু স্বচ্ছল হইয়াছে। তবু রামুই যেন এদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী।

শোভার কুটীরের শোভা বর্ধন করিতে নূতন অতিথির আগমন-সম্ভাবনা হইয়াছে। রামুর উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। শোভা কাজে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। রামুর মা আনন্দে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া পুত্রবধূর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। একটা আশা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ বাতাসে কুটীরখানির অন্তর ও বাহির ভরিয়া উঠিয়াছে।

২

সেদিন মাতা ও বধূ সারাদিন ধরিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়া নানাবিধ আহার্য প্রস্তুত করিয়াছে। স্থানীয় রীতি অনুসারে আজ তাহারা এবং তাহার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীরা একত্র বসিয়া প্রীতিভোজন করিবে, আর অনাগত মানুষটিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিবে।

রামু কর্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিল একটু যেন বিষণ্ণমুখে। সে নিজে যথাসাধ্য তাহার বিষণ্ণতা ও অবসাদ চাপিয়া রাখিল। শোভা বার বার জিজ্ঞাসা করিলেও সে জানাইল, ও কিছু না। এমনি।

ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র উৎসব শেষ হইয়াছে। রামুকে একান্তে পাইয়াই শোভা জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে তোমার?

বিশেষ কিছু না। শরীরটা তেমন ভাল নাই।

শোভা রামুর গায়ে হাত দিয়া দেখিল, আগুনের মত গরম। সে বলিল, একি গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে।

ইহার পরের সংবাদে নূতনত্ব কিছু নাই। কয়েক দিন খুব জ্বর হইল। ক্রমশ জ্বর কমিল, কিন্তু ছাড়িল না। জ্বর গায়ে লইয়াই কাজ করিতে গেল। শরীরের পেশীগুলি যতদিন সহ্য করিতে পারিল, ততদিন কোনমতে কাজ চলিতে লাগিল। যখন অসুখ আরো বাঁকিয়া বসিল, তখন একদিন একখানি ইটের লরীতে বসিয়া সুদূর সহর হইতে একশিশি ঔষধ লইয়া আসিল। কিছুদিন চিকিৎসার প্রহসন চলিল। রামুর মা নিকটস্থ মন্দিরের পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে একটি মাদুলী আনিয়া উহার

হাতে বাঁধিয়া দিল। নিয়তি হাসিতে লাগিলেন। পাথরে কোঁদা নিকষ কাল অসুরের মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে শীর্ণ হইতে লাগিল। বধূ উদ্বেগে আকুল হইয়া অসহায়ভাবে তথাকথিক করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাহাদের মিনতি জানাইল।

করুণাময় করুণা করিলেন না।

একদিন মাতা ও বধূর শত অনুনয় উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ রক্তবমি করিয়া পথের মাঝখানে একটি বালির ঝুড়ি সমেত পড়িয়া গেল রামু। আর উঠিল না।

মাতা আসিয়া উন্মাদিনীর মত পথের মাঝখানে "বাবা আমার" বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। কুটীরে ফিরিয়া দেখিল, পাড়ার কতকগুলি মেয়ে পুরুষ জড় হইয়াছে তাহাদের আঙিনায়—গৃহের মধ্যে শোনা যাইতেছে নবাগত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন। আর মাতা! তিনি একটু পরে কাঁদিলেও কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।

৩

ইহার পরে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যেমন করিয়া কাটিবার কথা, ঠিক তেমনি করিয়াই কাটিয়াছে। সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছে, শাশুড়ী ও পুত্রবধূ কোন মতে তাহা দিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়াছে, শিশুটিকে পালন করিয়াছে। রামুর মা পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই কেমন যেন হইয়া গিয়াছে। তাহার কথায় কাজে কেমন একটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়াছে। ক্রমশ লোকে তাহাকে 'পাগলী' আখ্যা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রামুর এক বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা সে শোভাকে বিবাহ করে। বহুদিন শোভা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু বন্ধু তথাপি বন্ধুত্ব অস্বীকার করে নাই। অভাবে অভিযোগে, অসুখে বিসুখে সর্ব্বদাই সে প্রকৃত বন্ধুর মতই ব্যবহার করিয়াছে। শাশুড়ীর বর্তমান অবস্থা, শিশুর ভবিষ্যৎ প্রভৃতি চিন্তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত শোভা বিবাহে মত দিয়াছে। সর্ত এই যে বন্ধুকে রামুর বাড়ীতে আসিয়াই বাস করিতে হইবে এবং রামুর মাকেও 'মা' মনে করিতে হইবে। বন্ধু একসঙ্গে মাতা, বধূ ও পুত্র লাভ করিতে সানন্দে স্বীকার করিয়াছে। বিবাহের দিনও শোভা রামুর জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছে, বন্ধু সান্ত্বনা দিয়াছে, রাগ করে নাই। কুলীর বন্ধু তো।

রামুর মার অবস্থা ক্রমশই যেন খারাপ হইতে লাগিল। এখন প্রায় কাজের বাহির হইয়া গিয়াছে। শোভা ও তাহার স্বামী অনেক কষ্টেই তাহাকে আগলাইয়া রাখে। সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্নানাহারের কথাও মনে থাকে না। মাঝে মাঝে নূতন রাস্তার মাঝখানে, ঠিক যেখানটায় রামু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানটায় বসিয়া পড়ে, "বাবা আমার" বলিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে। এই সময়ে পথে যে সব গাড়ী চলে কোনটি একটু থামিয়া যায়, কোনটি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, কোনটি হইতে কেহ হয়তো একটু 'আহা' বলিয়া সমবেদনা জানায়, কেহ বা দু একটা পয়সা ছুড়িয়া দিয়া যায়। যে সব গাড়ী সর্ব্বদা এই পথে যাতায়াত করে তাহারা এই পাগলীকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহার প্রাণের গভীরতম প্রদেশের যে ব্যথা তাহাকে আজ পাগল করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া ইহাদের মনেও উদার সহানুভূতি জাগে।

৪

সেদিন গাড়ীর খুব ভীড়। এই প্রকাণ্ড রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসংখ্য গাড়ী—মোটর গাড়ী, লরী মোটর বাস। সাইকেল, সাইকেল-রিকশ ও গরুর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ীরও অভাব নাই। নিকটেই কোথায় একটা মেলা বসিয়াছে। তাই এত যাত্রীসমাগম। বিবিধ পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া এবং বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ জনমণ্ডলী বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অগণিত যানবাহন।

পাগলী তাহার অভ্যাসমত রামুর শ্মশানতীর্থ সেই রাস্তার ঠিক সেইখানটায় আসিয়া আজও বসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে একা নয়। কোলে তাহার নাতি-রামুর পুত্র। কোন ফাঁকে শোভার অলক্ষিতে তাহার নয়নের মণিটি কোলে করিয়া পাগলী চলিয়া আসিয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। রাস্তায় প্রায় সব গাড়ীগুলি পাগলীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে।

একবার একখানি লরী একখানি রিকশাকে বাঁচাইতে গিয়া একেবারে আসিয়া পড়িল পাগলীর গায়ের উপর

যথাসাধ্য ব্রেক করিয়াও গাড়ীর গতি রোধ করা গেল না। প্রকাণ্ড চাকার তলায় পড়িয়া পাগলী ও তাহার নাতির দেহ নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল।

পুত্রকে বাড়ীতে না দেখিয়া শোভা ছুটিতে ছুটিতে রাস্তার পাশে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা বিহ্বল হইয়া গেল। প্রাণ দিয়া তাহার স্বামী যে পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই পথের যাত্রীর উল্লাস সমারোহে তাহার প্রিয়তম পুত্রের সমাধি রচিত হইল, এটা ভগবানের কোন্ জাতীয় পরিহাস, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে শোভা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শরৎচন্দ্রের ছোট গল্প

শ্রীকালিদাস রায়

অনুপমার প্রেম

যে সমাজে এগারো বারো বছরের মধ্যেই বালিকাদের বিবাহ হইয়া যাইত—সে সমাজের কথা লইয়া নরনারীর প্রেমের উপন্যাস লিখিতে হইলে সধবার কিংবা বিধবার অবৈধ প্রেমই দেখাইতে হইত। আর কুমারীর প্রেম দেখাইতে হইলে হৃদয়-বিনিময় দেখানোর সুবিধা হইত না—অনুপমার মত যুবক বিশেষের প্রতি একতরফা অনুরাগ দেখানো চলিত। শরৎচন্দ্র এইরূপ প্রেমের অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিয়া এগারো বছরের অনুপমাকে রাশি রাশি নভেল পড়াইয়াছেন এবং তাহাকে ধনীর আদুরী দুলালী করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—রাশি রাশি নভেল পড়িয়া এগারো বছরের অনুপমা কুড়ি বছরের মেয়ের মত পাকা হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেই নিজের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল। সমগ্র গল্পটি অনুপমার এই অপরাধের দণ্ড বিধান ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য শরৎচন্দ্রকে স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অনেক আয়োজনই করিতে হইয়াছে।

১। সুরেশের মত গুণবান ছেলে—যে বি-এ পরীক্ষায় (অবশ্য কোন বিষয়ের অনার্সে) প্রথম স্থান অধিকার করে, দেখাইতে হইয়াছে সেও মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া বিবাহের দিন সকলকে বিশেষতঃ একটি সরলা বালিকার অদৃষ্ট বিপন্ন করিয়া পলায়ন করিতেছে।

২। বর বিবাহের রাত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে অন্যের সহিত কন্যার সেই রাত্রেই বিবাহ দিতে হইবে নতুবা জাতিচ্যুতি হইবে—এইরূপ একটা কুসংস্কার সেকালে প্রচলিত ছিল। এই কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া অনেক গল্প কাহিনী সেকালে বিরচিত হইত। সুরেশের অভাবে পাত্রানুসন্ধান অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অনুপমার জন্য গ্রামে কিংবা নিকটস্থ গ্রামে একজন যে কোন বিবাহার্থী যুবক পাওয়া গেল না, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। অনুপমার পিতা সুরেশের পিতাকে ৫ হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেন—এজন্য তাঁহার দশ হাজার টাকা দিতেও আপত্তি হইত না। দশ হাজার টাকার লোভেও কোন যুবকের পিতা বিবাহ দিতে রাজী হ'ন নাই—ইহা অস্বাভাবিক মনে হইবে। তাহাতে অনুপমার অবিবেচনার দণ্ড হয় না। কাজেই একজন কালরোগ-গ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে অনুপমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে।

৩। অল্প বয়সে অনুপমার বৈধব্য ঘটানো হইয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার মাতা পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

৪। অনুপমার পিতার উইল গোপন করা হইয়াছে।

৫। অনুপমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে একটি পিশাচ করিয়া তোলা হইয়াছে। অনুপমা চন্দ্রনাথবাবুর একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী, সে বিধবা পুত্রহীনা, চন্দ্রনাথবাবুর বিষয় সম্পত্তিতে তাহার দাবি-দাওয়া নাই—সে পরিচারিকার মত পরিশ্রম করিয়া ভ্রাতৃ সংসারে একবেলা অন্নগ্রহণ করে, এইরূপ ক্ষেত্রে অনুপমার নির্য্যাতন হইবার কথা নয়। যে শরৎচন্দ্র রামের সুমতিতে নারায়ণীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তিনিই চন্দ্রনাথ-বাবুর স্ত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা অথবা অনুজার মত স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালিতা অনুপমাকে সে নারী নিজের সংসারে সহ্য করিতে পারিল না। এ সমস্ত অনুপমার দণ্ডবিধানের আয়োজন ছাড়া কিছুই নয়।

৬। অনুপমার পিতা যখন অনুপমার বিধবা বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন তখন অনুপমাকেই তাহার বিরোধিনী করা হইয়াছে—ইহা স্বাভাবিক হইলেও তাহার অধিকতর দণ্ডের সম্মুখীন করার জন্যই এ প্রস্তাবের প্রত্যাখানের অবতারণা করা হইয়াছে।

৭। যে ললিতকে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের যুবকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—যে ললিত মদ্যপায়ী, কুসঙ্গে আসক্ত, অমিতব্যয়ী, যে ললিতকে জেলে পাঠাইবার জন্য অনুপমাই সহায়তা করিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত তাহার হাতেই সমর্পণ করিয়া শরৎচন্দ্র অনুপমার চরম দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

অনুপমা যে ভুল করিয়াছিল—সে ভুলের দণ্ড আছে বটে, কিন্তু এত বেশী দণ্ডের ভার গল্পের আর্ট সহ্য করিতে পারে না। নভেলপড়া প্রেমোন্মাদিনী বালিকা অনুপমার চরিত্র বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একভাবে অপ্রকৃতিস্থ। বিবাহের পর হইতে আর একভাবে অপ্রকৃতিস্থ। তাহার

চরিত্রের প্রকৃতিস্থতা ক্ষণকালের জন্য আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে—যখন সে বলিয়াছে—"বাবা আমায় রক্ষা কর।"

কত কাতরোক্তি, কত ক্রন্দন, কিন্তু কোন কথাই খাটিল না। এই প্রকৃতিস্থ অবস্থার আবেদন পিতা শোনেন নাই বলিয়া সে বিধবা হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তাহার অন্তর্গূঢ় অভিমানকে প্রকাশ করিল। পিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন তখন অভিমানিনী অনুপমা ঘাড় নাড়িল। মনে মনে বলিল—তখন জাত গেল, আর এখন যাবে না! যখন চক্ষু কর্ণ বন্ধ ক'রে তোমরা আমাকে বলিদান দিলে, তখন এ কথা ভাবলে না কেন? আজ আমারো চোখ ফুটেছে—আমিও ভালোরূপ প্রতিশোধ নেব।

কিন্তু প্রতিশোধ কাহার উপর? আত্মনিগ্রহের দ্বারা নিজের দণ্ডই ঘনীভূত করা। অনুপমা নিজেকেই নিজে দণ্ডিত করিল সব চেয়ে বেশি।

শরৎচন্দ্র পরিহাস-রসিকতায় গল্পটির আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত গল্পটিকে ভাবগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার শেষ বক্তব্য দাঁড়াইয়াছে—যে ভালবাসে না, ভালবাসিতে জানে না—সে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া Gilchrist বৃত্তি পাইলেও তাহাকে হৃদয় দান করা চলে না, কিন্তু যে মূর্খ, অমিতব্যয়ী, জেল খাটে, মদ খায় সেও যদি ভালবাসে তবু তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করা চলে। নিজের চেয়ে এ জগতে যাহার বড় কিছু নাই সে ভালবাসার অযোগ্য—যে নিজেকে ভুলিতে পারে সে যত পাষণ্ডই হোক সে ভালবাসার যোগ্য। মরীচিকার পিছে ছুটিলে নিরপরাধা মৃগীরও কি সর্ব্বনাশ হয় না? সোনার হরিণের লোভে মহীয়সী সীতার দণ্ডের কি অবধি ছিল?

কাশীনাথ

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা, কাঁচা লেখা। কাশীনাথ অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রের লোক—এই অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র লইয়া তিনি গল্পটি আরম্ভ করিয়াছেন। যুবজনসুলভ Sex-appeal এই চরিত্র হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে। কাশীনাথ চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র উত্তরাধিকার (Heredity) ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের সহায়তা লইয়াছেন। সংস্কৃত শাস্ত্রপাঠ তাহার চরিত্রে একটা ঔদাস্য ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল—এই ঔদাস্য প্রেমের পরিপন্থী, শরৎচন্দ্র ইহাই দেখাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র যে যুগের কাহিনী রচনা করিয়াছেন—সে যুগে কৌলীন্যের প্রতাপ পুরাদমে বিদ্যমান। জমিদার তাহার একমাত্র কন্যাকেও অনাথ কুলীন যুবকের হাতে দান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। সংস্কৃত শিক্ষাই সে যুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধান শিক্ষা-রূপে গণ্য। অথচ এদিকে পল্লীগ্রামের ছোট জমিদারের কাছারির ম্যানেজার বি-এ পাশ-করা কোটপ্যাণ্ট-পরা যুবক। উনবিংশ শতাব্দীর ঠিক শেষ সময়ের চিত্র এইখানি তাহা ধরিবার উপায় নাই। যে সময়ের কথাই হউক—সে সময়ের আবেষ্টনী ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ঠাকুরমশাই ও জমিদার গৃহের আবেষ্টনীও এ চিত্রে ফুটে নাই। নায়িকা কমলাকেও শেষ পর্য্যন্ত অপ্রকৃতিস্থ চরিত্রে পরিণত করা হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সূত্রপাত কিন্তু কাশীনাথেই হইয়াছে। পুরুষ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য এবং নারীচরিত্রের সক্রিয়তা ও প্রাধান্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একটা বৈশিষ্ট্য। সে বৈশিষ্ট্য কাশীনাথেও আছে। পল্লীসমাজের রমার পূর্ব্বাভাষ কমলায় আছে। রমা ও কমলা একার্থক। পুরুষ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি শরৎচন্দ্রের রচনার একটা টেকনিকেরই অঙ্গ। ইহাতে তাহাও আছে। "অহেরিব গতি প্রেমঃ"—প্রেমের গতি ঋজুপথ ধরিয়া নয়, কুটিল পথ ধরিয়া। শরৎচন্দ্র তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসে ইহাই দেখাইয়াছেন। কাশীনাথেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তবে প্রেমপথের কৌটিল্য এতবেশি দূর চলিয়া গিয়াছে যে তাহাকে আবার সহজ ঋজু পথে ঘুরাইয়া আনিতে অনেক আয়োজন করিতে হইত, শরৎচন্দ্র তাহা করেন নাই। অবতরণের জন্য যতটা সময় লাগে, অধিরোহণের সময় তাহার চেয়ে ঢের বেশি লাগে, কলা বিজ্ঞানের এই সত্য শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছেন। গোরুর গাড়ী না হইলেও ঘোড়ার গাড়ীতে দূরে চলিয়া গিয়া যেন বিমান যোগে ফিরিয়া আসা।

কমলা বিষয় সম্পদ নিজের নামে লিখাইয়া লইয়াছিল—প্রেমের সম্পর্কে বৈচিত্র্য সম্পাদনের পক্ষে প্রেমের গতি কৌটিল্যের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্র এই ব্যাপারে একটু বেশী পরিমাণে Emphasis দিয়া ফেলিয়াছেন। একটা মকর্দ্দমার অবতারণা ও কাশীনাথের সাক্ষ্য দান পর্য্যন্ত যথাযথ গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাহার পর যাহা ঘটিল—তাহা শরৎচন্দ্রের স্বভাবসংযত লেখনীর পক্ষে স্বধর্ম্মচ্যুতি। শরৎচন্দ্রের সহৃদয়া প্রেমিকারা বুকে প্রেম পোষণ করিয়া মুখে কটু-ভাষিণী। এই কটু ভাষা আঘাত করিবার জন্য বটে, কিন্তু জীবনকে বিপন্ন করার জন্য নয়। কাশীনাথকে আহারে বসাইয়া যখন সে শ্বশুরের অন্ন গ্রাস মুখে তুলিতেছে তখন কমলার উক্তি—

যে চিরকাল পরের খেয়ে মানুষ—এখনও যাকে পরের না খেয়ে উপোস করতে হয়, তার সত্য কথা বল্‌বার সখই বা কেন, আর এত অহঙ্কারই বা কেন?...যে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত, তার তেজ শোভা পায় না। এই সকল কথা কাশীনাথের পক্ষে আত্মহত্যার প্রণোদক। তারপর কমলা কাশীনাথকে অত্যন্ত রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। কাশীনাথের বিদায়কালীন ক্ষমা, প্রেম ও সহিষ্ণুতার বাক্যগুলি তাহার চিত্তকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। ইহাতে প্রেমের শ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ইহার পর আর প্রেমের প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব নয়।

শরৎচন্দ্র ইহাতেই ক্ষান্ত হ'ন নাই। কোটপ্যাণ্ট-পরা বি-এ পাশ করা যুবক ম্যানেজারের সঙ্গে টুলো পণ্ডিতের জমিদারিণী পত্নী কমলার পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কথা হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে ভিতর হইতে কমলা বলিল—আপনি ভিতরে আসুন, অনেক কথা আছে। বিজয়বাবু—ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ মৃদু মৃদু কথা

হইল, তারপর বিজয়বাবু বাহিরে আসিলেন। তারপর আহারের সময় কমলার কটূ ভাষা। তারপর রাত্রে কাশীনাথের নিম খুন। সে সংবাদ শুনিয়া কমলা অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কি করিয়া এই অনর্থ ঘটিল এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়া কহিল—একেবারে খুন হয়ে গেছে? এইগুলি এক সঙ্গে করিলে বুঝা যায়, বিজয় ও কমলার মধ্যে পরামর্শ হইয়াছিল, কাশীনাথকে দৈহিক প্রহারের দ্বারা শাস্তি দিতে হইবে, যাহাতে বেশ দুই চারিদিন শয্যাগত থাকে। কিন্তু বিজয়ের আদেশেই হউক, আর গুণ্ডাদের সতর্কতার অভাবেই হউক—কাশীনাথকে এরূপ আঘাত করা হইয়াছে যাহাতে সে 'একেবারে খুন।'

ইহার ফলেই কমলার মূর্চ্ছা। কাশীনাথ লোক চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহারা শ্বশুর পরিবারেরই অনুজীবী বলিয়া নাম করে নাই এবং জ্বরের প্রকোপে কাশীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—'বল কমলা, একাজ তুমি করনি। আমি মরেও সুখ পাব না, কমলা, শুধু একবার বল, এমন কাজ তোমার দ্বারা হয়নি।"

কমলা যে প্রেমকে এতদূর অত্যাচারের ও অপমানের দ্বারা বিদায় দিল, দুই দিন অচেতন থাকিয়াই সে প্রেমকে সে একমুহূর্ত্তে ফিরিয়া পাইতে পারে না। যদি পায় কখনও তবে তাহা সুদীর্ঘকালের দারুণ তপস্যার দ্বারা। অক্ষমের ক্ষমা ও প্রেম এক জিনিস নয়। অপ্রকৃতিস্থ কাশীনাথ অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অপ্রকৃতিস্থতর—তাহার ক্ষমা লাভ করা কঠিন নয়—কিন্তু চির-উদাসীন কাশীনাথের প্রেম ফিরিয়া আসিতে পারে না। প্রেমের গতি অহির মত বটে, কিন্তু অহির দংশনে প্রেমের রক্ষা পাওয়া কঠিন।

কাশীনাথে শরৎচন্দ্র কথাশিল্পের যে মাত্রা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী উপন্যাসগুলিতে সে মাত্রার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুলেন নাই।

একই সুর

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

১

"আমায় বাধা দিস্ নে দ্বারী
  আমি সুবল সখা রে,
প্রাণের কানু কেমন আছে
  দেখ্‌ব চোখের দেখা রে।
মা যশোদার নয়নমণি,
  বৃন্দাবনের কানু সে,
কেমন করে সাজ্‌ল রাজা
  হৃদগগনের ভানু সে!
চোখের দেখা দেখ্‌ব শুধু
  দূর হ'তে একবার গো,
মুখের কথা কইব না রে
  খোল্ রে দ্বারী, দ্বার গো।"

২

দ্বার খুলে দে দ্বার খুলে দে—
  শোন্ রে দ্বারী শোন্,
স্বাধীনতার সনদ্ নিতে
  এলো এ কোন্ জন?
কতই রাজা রায় বাহাদুর
  আসেন নানা বেশে,
ধূলায় মলিন দেশের সেবক,
  এল দুয়ার দেশে।
সে এল রে নগ্নপায়ে—
  মোদের হৃদয় রাজা,
রাজপ্রাসাদে মন্ত্রীবেশে
  যাদবেন্দ্র পাঁজা!

বদ্‌লে গেছে দেশের হাওয়া
  বদ্‌লে গেছে কাল,
দেশের প্রতিনিধির গায়ে
  নাই রে দামী শাল।
রাঢ়ের রাঙা মাটীর ধূলায়
  ধূসর সকল দেহ,
এই যে মায়ের বুকের পাঁজর
  চিন্‌ল না হায় কেহ।
যেমন হাসে চাঁদ আকাশে
  নাই রে বসন ভূষা;
পূব আকাশে রঙ্ লাগে রে—
  যখন হাসে ঊষা।

৪

রাজার সভায় চিন্‌ল না তো
  সেই সেকালের দ্বারী,
লাটপ্রাসাদে চিন্‌ল রে
  কে এল কাণ্ডারী।
হাজার হাজার বছর পরে
  সেই সে কালের সুর,
আনন্দে বুক উথ্‌লে ওঠে,
  চিত্ত যে ভরপুর।
নবদ্বীপের আঙিনাতে
  বৃন্দাবনের বাঁশী,
স্মরণ করি খুসির দিনে
  ক্ষুদিরামের ফাঁসী।

আবিষ্কার

শ্রীসুবোধ বসু

বম্বে শহরের আপামর সাধারণ এক-জোট হইয়া আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ খবরটা আগে টের পাইলে বম্বের ত্রি-সীমানা মাড়াইতাম না। ভারতের এই 'প্রবেশদ্বার'টির পাছ-দুয়ার দিয়া অতি চুপেচুপেই ভিতরে ঢুকিয়াছিলাম, কিন্তু অতি শীঘ্রই টের পাওয়া গেল, খবরটা এখানকার কাহারও কাছে গোপন থাকে নাই। বিখ্যাত ব্যক্তি হইলে অনায়াসেই মনে করিতে পারিতাম, ইহা খবরের কাগজের কুকীর্ত্তি; আমার বম্বে আসার খবরটা পূর্ব্ব হইতেই প্রচার করিয়া আমার বিরুদ্ধে নিরীহ জনতাকে উস্কাইয়া দিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলি আমাকে স্বভাবতই উপেক্ষা করিয়াছে; কোনও সভা-সমিতিও সম্বর্দ্ধনা জানায় নাই। তবু বম্বের জনসাধারণ অনায়াসেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি সদ্য বম্বে আসিয়াছি। আমাকে নাকাল করিবার জন্য প্রত্যহই বিভিন্ন অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বম্বের বিভিন্ন দুর্গম স্থানের পথের নির্দ্দেশ আমার কাছ হইতেই জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথম ক'দিন ইহাতে সন্দেহ করি নাই। ভাবিয়াছি, আমার মতোই কোনো নবাগত হালে পাণি না পাইয়া তৃণ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। কিন্তু যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন লোক জগতের অপরাপর লোকদের উপেক্ষা করিয়া একমাত্র আমার কাছ হইতেই পথের হদিস্ জানিবার ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিল, তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ষড়যন্ত্র বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলাম।

আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গল আবিষ্কারে লিভিংষ্টোন যে দুর্জ্জয় সাহস ও অ্যাডভেঞ্চার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই সাহস এবং অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে আমি বম্বের 'গেট্ অব্ ইণ্ডিয়া', তাজমহল হোটেল, ইয়াট ক্লাব প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়াছি এবং মিউজিয়মের সম্মুখের ট্রাম-টার্মিনসে পৌঁছিয়া পরিচিত স্থানে প্রত্যাগত অভিযানকারীর গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এমন সময় একটা বদ্ লোক আমার সমস্ত তৃপ্তি ও গর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিল। আশেপাশে অপেক্ষমান যাত্রীর কোনই অভাব ছিল না, কিন্তু লোকটা তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিল না। জনতার মধ্য হইতে ঠিক আমাকেই বাছিয়া লইয়া ঘাড় শক্ত করিয়া আগাইয়া আসিল। অর্থাৎ, তোমাকে ছাড়া চলিবে না। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দিতে সে প্রশ্ন করিল, 'এই ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হয়ে যাবে?'



ট্রামটা কি মহম্মদ আলী রোড হ'য়ে যাবে?

একবার প্রশ্নটা শুনুন! বম্বের ট্রাম কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে যায়, কিছুই জানি না; এমন কি, ইহাদের কোনও নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান আছে কিনা, না মাঝপথে মত বদলাইয়া যে কোনও দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে এখনও নিঃসন্দেহ হই নাই। সেই আমার কাছে উপস্থিত

হইয়া মহম্মদ আলী রোডের ট্রামের খোঁজ না করিলেই কি চলিত না ?

আঙুল দিয়া লোকটাকে ট্রাম-কোম্পানার উর্দ্দি-পরা এক কর্ম্মচারিকে দেখাইয়া দিলাম। ভাবখানা এই যে, এত কাছে ট্রামের লোক দাঁড়াইয়া থাকা সত্বেও আমার মতো ভদ্রলোককে বিরক্ত করা কেন? আশঙ্কা হইতে লাগিল, লোকটা হয়তো এইবার বলিয়া বসিবে, 'এইটুকু বলে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যেত না।' কিন্তু দেখা গেল, মানুষটা অত খল নয়; আমাকে আর জব্দ করিবার চেষ্টা না করিয়া সে ট্রাম-কর্ম্মচারির কাছেই আগাইয়া গেল। বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করিলাম। গত ক'দিন ধরিয়া যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুধু গন্তব্যস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া রীতিমত জেরা করিয়া ছাড়িয়াছে, তাহাদের তুলনায় ইহাকে দেবতুল্য লোক মনে হইল। ভাবিলাম, মহম্মদ আলী রোড নামে বম্বে শহরে যে একটা রাস্তা আছে, এই অমূল্য সংবাদটি নোট বইয়ে টুকিয়া রাখি।

পাঁচ দিন বম্বেতে বাস করিবার পর একটি তথ্য খুব ভালো করিয়াই শিখিয়াছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ স্টেশনের সামনে গোলাকার পার্ক-ধরণের যে ভূখণ্ডটুকু আশে পাশে সকল নিম্নশ্রেণীর বেকার ও অলস জনতার বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'বোড়ি বন্দর'। এইটা কি করিয়া বন্দর হইল এবং কোন্ স্কেলের মাঝে ইহাকে বড়ো বলা চলে তাহা সমস্যার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এমন একটা সর্ব্বজনবিদিত 'ল্যাণ্ডমার্ক' পাইয়া আমার বড় সুবিধা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া অর্থাৎ ফিটন গাড়ির চালককে ভিক্টোরিয়া টার্মিনসে পৌছাইয়া দিতে বলিলে পথ ভুল করিয়া বসিতে পারে, কিন্তু 'বোড়ি বন্দর' বলিলে কখনও ভুল করিবে না। অতএব আমি এই বোড়ি বন্দরকে অনিত্য জগতে একমাত্র নিত্য বস্তু হিসাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। কিন্তু বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও মিউজিয়মের টার্মিনস্ হইতে বোড়ি বন্দরগামী ট্রাম আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। দেদার গাড়ি দাদার যাইতেছে, কলবাদেবী বা জৈবিতলাও, তারদেও বা গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক যাইতেছে, অথচ বোড়ি বন্দরের বোর্ড একটা ট্রামেও খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া আগাইয়া গিয়া ট্রামওয়ে কর্ম্মচারিকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

লোকটা একবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমার মুখের দিকে তাকাইল। ভাবখানা এই যে, এটা আবার কোথাকার আনাড়িরে! অতঃপর কড়ে আঙুলটিকে কষ্টের সঙ্গে সামান্য উঁচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া গাড়িগুলোর কোনও একটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

আর বাদানুবাদ অনর্থক বিবেচনা করিয়া আমি সামনে আগাইয়া গেলাম এবং সম্মুখের দোতলা ট্রামটিকে উপেক্ষা করিয়া পরের ছ্যাকড়া ট্রামগাড়িটাতে চাপিয়া বসিলাম। এইটাই ইঙ্গিতের লক্ষ্য মনে হইয়াছিল, এজন্যই দোতলাকে উপেক্ষা করিয়া একতালাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বম্বের ট্রাম টার্মিনস্ হইতে কখন ছাড়িবে বা মোটেই ছাড়িবে কিনা, কিছুই ঠিক নাই। অপরিচ্ছন্ন আসনগুলি মোটেই আরামপ্রদ নয়; ট্রামের যাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। বম্বের ভদ্রলোকেরা অধিকাংশই বাস্-এ চড়েন। বাস্-এর গতিবিধি আরও রহস্যজনক মনে হওয়ায় আমি কখনও বাস্-এ চড়িতে ভরসা পাই না। কিন্তু নিরুদ্যম ট্রামে অস্বস্তিতে সারা হইয়া স্থির করিলাম, আগামী কাল হইতেই বাস্ অভিযান শুরু করিব। এমন সময়, আমাকে নিরস্ত করিবার জন্যই যেন ঘটাং ঘটাং শব্দ করিয়া ট্রাম ছাড়িল। ল্যাণ্ডো-গাড়ির সহিসের মতো পোশাক-পরা ট্রাম-ড্রাইভার হইলে উল্টা প্যাচ মারিয়া গাড়ি ছাড়িল।

এইবার নূতন অস্বস্তিতে তটস্থ হইয়া উঠিলাম। যাইবে তো এইটা বোড়ি বন্দর! অথবা কলবাদেবী বা খেত্‌বিজ-লাওয়ের গোলক ধাঁধার মধ্যে টানিয়া লইয়া আমাকে নির্দ্দয়ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবে? সারা রাত ধরিয়া মাকড়সার জালে-পড়া মাছির মতো মুক্তি পাইবার জন্য হাত-পা ছুঁড়িয়া মরিব!

এই তো 'কালা ঘোড়া'! বম্বের পরিচিত 'ল্যাণ্ডমার্ক'-গুলির মধ্যে এই 'কালা ঘোড়া' অন্যতম। মহামহারথীরা স্বর্গীয় হইলে রাস্তার মোড় অথবা পার্কের মধ্যে স্তম্ভের উপর প্রস্তরীভূতরূপে দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা জানি। কিন্তু এইখানে' ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোড়াকে প্রাধান্য দেওয়ায় বম্বের 'কালা ঘোড়ার' প্রতি প্রথম হইতেই আমার সম্ভ্রম জাগ্রত হইয়াছিল। এমন মহাপুরুষ ঘোড়া দর্শনে

কে না অভিভূত হয়! এখন ইহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম; বুঝিলাম, ঠিক পথেই চলিয়াছি। দিক্‌চিহ্নহীন অর্ণবের মধ্যে আমার কাছে 'কালা ঘোড়া' ধ্রুবতারার মতো মনে হইতে লাগিল। নিশ্চিন্ত হইয়া উদ্বিগ্ন মাথাটাকে জানালার বাহির হইতে ভিতরে টানিয়া আনিলাম।

কয় মিনিট অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার মধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল! দেখিলাম, আমি হারাইয়া গিয়াছি! ট্রামগাড়ি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রবঞ্চনা করিয়াছে! কালা ঘোড়া দেখাইয়া আশ্বস্ত করিয়া এখন আমাকে সম্পূর্ণ অজানা রাজ্যে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

মিউজিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া টার্মিনস্ পর্য্যন্ত রাস্তাটা আমার মুখ-চেনা। কিন্তু কোথায় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজাবাই টাওয়ার, কোথায় মহাত্মা গান্ধী রোডের বড় বড় দোকান অফিস বাড়ি, কোথায় ফ্লোরা ফাউন্টেন? এ কোন্ দুর্গম-লোকে আসিয়া পড়িয়াছে? এই অপরিসর পথ দিয়া, রুদ্ধদ্বার অট্টালিকাশ্রেণীর গা-ঘেঁষিয়া ট্রাম-গাড়ি আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? চকিতে বুঝিতে পারিলাম, ভুল ট্রামে চড়িয়াছি; ট্রামের কর্ম্মচারি আমার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করিয়াছে! তবু নিঃসন্দেহ হইবার জন্য পাশের যাত্রীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাই হর্নবি রোড তো?' সে লোকটা দুই সেকেণ্ড আমার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'এটা মিণ্ট রোড।'

আর সন্দেহ রহিল না। আমাকে নাকাল করিবার ষড়যন্ত্র ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। হাঁক ডাক করিয়া তখনই ট্রাম থামাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্দ্দয় ট্রাম পরের ষ্টপের আগে থামিল না। আমি প্রথম সুযোগেই নামিয়া পড়িয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আরও গভীর এবং অপরিচিত অঞ্চলে গিয়া পড়িবার আগেই যে নামিয়া পড়িতে পারিয়াছি, সেইটাই বাঁচোয়া! এইবার উল্টো-মুখী ট্রামে চড়িয়া মিউজিয়মে ফিরিতে পারিব বলিয়া আশা করি—অবশ্য যদি ওদিকের ট্রামগাড়ি ইতিমধ্যেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া না থাকে।

বাঁ দিকে উঁচু রেলিং-ঘেরা একটা গোলাকার পার্ক। রাস্তার আলোতে ইহার সরকারী নামটা পড়িলাম—'এলফিনষ্টোন সার্কল্'। ইহার আশেপাশে মস্ত উঁচু উঁচু সব বাড়ি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু কোনও জানালাতেই আলোর আভাস নাই। যেন ইহারাও সব ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আছে। না হইলে এত বড় বড় বাড়িতে আলো জুটিবে না কেন? পরে অবশ্য জানিয়াছিলাম, এই-গুলি সবই অফিস বাড়ি; কিন্তু তখন তো ইহাও জানিয়াছি, মিণ্ট রোড ঘুরিয়াও ট্রাম বোড়ি বন্দর যায়।

যাহা হউক, বড় রাস্তার উপরে, এলফিনস্টোন্ সার্কেলের ঠিক উল্টা দিকে, প্রাসাদোপম একটা বিরাট দালান নজরে পড়িল। অন্ধকার রাতে জনবিরল রাস্তার উপর এই বাড়িটা প্রায় রূপকথার রাজার বাড়ির মতো স্তব্ধ ও রহস্যপূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বারবার তাকাইয়া এইটাকে কেবলই আমার ভূতুড়ে বাড়ি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ঐদিকেই আমার ট্রাম ষ্টপ্। রাস্তা পার হইয়া বাড়িটার সামনে গিয়াই দাঁড়াইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, সভ্য শহরের সঙ্গে দুর্গম অরণ্যের তফাৎ কোথায়। উভয় স্থানেই দেখিতেছি, বেমালুম পথ হারাইয়া বসা সম্ভব।

সহসা পার্থক্য-নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিল। চকিতে পাশ ফিরিয়া দেখিলাম, একটি ভারতীয় নাবিক একেবারে আমার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তবে কি সে আমার জলে-পড়া গোছের মুখের ভাব দেখিয়া উদ্ধার করিতে আসিয়াছে? কপালকুণ্ডলার মতো সমুদ্র-অঞ্চল-প্রত্যাগত আমাকে সে-ও কি প্রশ্ন করিবে, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' শীঘ্রই সে প্রশ্ন করিল, কিন্তু প্রশ্নটি অন্যরূপ। সে বলিল, 'টাউন হল্ কোন্‌টা, বলতে পারেন?'

আমি প্রায় হিংস্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলাম। আমার মনের যা অবস্থা তাহাতে নিজের নাম ভুলিবার উপক্রম হইয়াছে, অথচ এই লোকটা কিনা আমারই কাছে আসিয়া টাউন-হলের খোঁজ করিতেছে! বম্বেতে যে টাউন্-হল্ আছে, তাহা এই প্রথম শুনিলাম। কাজেই টাউন-হলটা বাইকুল্লা না মহালক্ষ্মীতে, মালাবার হিল-এ না প্যারেলে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুবিসর্গ ধারণাও নাই। কিন্তু রাগে গা জ্বলিয়া যাইতেছিল; সকলে এক-জোট হইয়া যদি আমাকে মিছিমিছি নাকাল করিবার

কাজে লিপ্ত হয়, তবে রাগ সংযত রাখিবার উপায় কি? আমিও প্রতিশোধ লইতে জানি।

বলিলাম, 'টাউন-হল? সে তো এখান থেকে বহু দূর। 'সি'-বাস্-এ করে যেতে হয়। ঐ তো একটা বাস্-স্টপ দেখা যাচ্ছে রাস্তার মোড়ে। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বাস্ পাওয়া যাবে।'



টাউন হ'ল? সে তো এখানি থেকে বহু দূর

'বলেন কি, তাই নাকি?' সে লোকটা বিস্মিত হইয়া বলিল। 'আমাকে বলে দিলে খুব কাছেই। চার্চগেট্ স্টেশন থেকে সোজা রাস্তায়ই তো হেঁটে আসছি...'

'কত বাজে লোকে কত কথা বলে', আমি সম্ভ্রান্তভাবে বলিলাম। 'কিন্তু আমার কাছে আর নয়। স্টপে গিয়ে দাঁড়াও। বম্বের বাস্ একটা ফস্‌কালে সারা রাত্তিরেও আর একটা পাবে না।...'

'আপনি ঠিক জানেন তো?'

'আলবৎ।' আমি জোর দিয়া বলিলাম।

আশা করি, আমার ট্রাম দু-চার মিনিটের মধ্যেই আসিয়া পড়িবে।

লোকটা চলিয়া গেল, হাঁক্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইবার বাছাধন টের পাও গিয়া। বম্বের রাস্তায় কেবল আমিই নাকাল হইব, ইহা একটা কথাই নয়।

কিন্তু ট্রামের কি হইল? অন্তত পনেরো মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, কোনও ট্রামের এদিকে আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমাকে জব্দ করিবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যাওয়া শুরু করে নাই তো? নিশ্চিন্ত হইবার জন্য অবশেষে রাস্তার মধ্যখানে আগাইয়া গিয়া সেখানে দুই জোড়া ট্রাম-লাইনই আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় একজোড়া বুটের শব্দে চমকিয়া উঠিয়া দেখি, আমার ক্ষণকাল পূর্ব্বের প্রশ্নকর্ত্তা রাস্তা পার হইয়া আবার এইদিকেই আসিতেছে।

আবার কি চায় এটা? জেরাটা বাকি রাখিয়া গিয়াছে মনে পড়ায় জেরা করিতে ফিরিয়া আসিতেছে না তো? সি-বাস্ উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম কোন্ দিকে, কোন্ রাস্তা দিয়া, কোথায় যায়, এইবার হয় তো সেই প্রশ্নই করিয়া বসিবে। এমন কি, বম্বের টাউন-হলের স্থাপত্যরীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই বা মারে কে?

আক্রমণাত্মক রণনীতিই আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী মনে করিয়া আমিও প্রস্তুত হইলাম।

'সে কি মশায়, আবার ফিরে আসচেন কেন?' আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম।



আপনার পিছনের দালানটাই টাউন হ'ল কি না—

সে বলিল, 'আপনার পেছনের দালানটাই টাউন-হল কিনা, তাই অগত্যা ফিরেই আসতে হলো। ওখানে নাবিকদের জন্য একটা ক্যান্টিন খোলা হয়েচে। সাহায্য করবার জন্য 'ধন্যবাদ! নমস্তে।' বলিয়া সেই দুষ্ট লোকটা মিটিমিটি হাসিয়া আমার পিছনের রাজপ্রাসাদ-মার্কা সেই বাড়িটার ফটকের দিকে আগাইয়া গেল।

পৃথিবীর বিখ্যাত অভিযানকারীরা আবিষ্কারের জন্য বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা ও হতাশা সহ্য করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার অর্দ্ধেকও অপমানিত হইয়াছেন তাঁহারা, এমন শুনি নাই। নিদারুণ ক্ষোভেপায়ের দিকে চাহিয়া বলিতে যাইতে-ছিলাম, ধরণী দ্বিধা হও, কিন্তু সমুখ দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতে দেখিয়া মত পরিবর্ত্তন করিয়া ডাকিলাম, 'ট্যাক্সি!'

গ্রামের জীবজন্তু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের গ্রামে অনেক ফুলগাছ ছিল এবং বনে বহু ফুল ফুটিত; সেই জন্য মৌমাছি ও প্রজাপতির ঝাঁক খুব বেশী দেখা যাইত। প্রতি বাড়ীতেই ২।৩ খানা মৌচাক থাকিত। আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই মৌমাছির গুঞ্জন শুনিতাম, বড় ভাল লাগিত তাই লিখিয়াছিলাম—

যখন যেখানে দেখি আমি মৌচাক,
হই আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক।
নরম সোনায় গঠিত কক্ষগুলি
দেখিয়া রাজার প্রাসাদ যাইবে ভুলি।
কবি ও শিল্পী মিলেছে ওখানে যেন
কোথা গুণীদের পরিমণ্ডল হেন?
রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর,
কর্ম্মের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
কোথায় এমন রসিক দঙ্গের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি-সম্রাট?

বিবিধ বিচিত্র রঙের প্রজাপতিগুলি উড়িয়া বেড়াইত—যেন এক একটী জীবন্ত ফুল, কতই বাহার। শুনিয়াছি ডিম পাড়িয়াই প্রজাপতি মারা যায়—একবার একটী করবী গাছের পাতায় দুইটী সুন্দর ডিম ও মৃত প্রজাপতি দেখিয়া লিখিয়াছিলাম—

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটী করবী প্রাতে—
মণিসন্নিভ দুইটী ডিম্ব রাখি
বারেক ফিরালো মৃত্যু-আঁধার আঁখি,
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনী মরি!
সুপ্ত মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি
নিঃশেষ করে দিয়ে গেল যেন হৃদি।

গ্রামের মাঠে অনেক খরগোস্ থাকিত, অজয়ের ভাঙন ও বন্যা শশক দলকে প্রায় অপসারিত করিয়াছে। শৈশবে নদীর ঘাটে যাইতে প্রায়ই দুইটী শশককে দেখিতাম—

"তৃণের মূলগুলি নীরবে খেত তুলি
বসিয়া তৃণ দল মাঝে।"

এক বৎসর প্রবল বন্যা আসিল—

প্রিয় বসতি ত্যজি শশক দুটী আজি,
ভয়ে সুদূরে গেল সরি।
শুকায়ে গেল বান, তবু সে নীড় খান
শূন্য রহিল যে পড়ি।
আসিতে যেতে আমি নিয়ত চেয়ে দেখি,
তা' দিকে দেখি নাক আর,
সাঁজেতে মাঠ একা পড়িয়া থাকে ফাঁকা
আঁধার ঘন চারি ধার।

অনেক দিন পর তাহাদিগকে সেই মাঠে মৃত অবস্থায় দেখিয়া,

নিকটে গিয়া ধীরে দিলাম গায়ে হাত
সাড়া শব্দ কিছু নাই,
শান্ত বনভূমে দোঁহার মুখ চুমে
দুজনে পড়ে আছে তাই।
তা'রা কি পারে নাই ভুলিতে প্রিয় ভূমি
তাদের প্রিয় তরুলতা?
মনে কি পড়েছিল সাঁজে শ্যামল মাঠ
সে সুখ দিবসের কথা?
সেথা কি ভেসেছিল ইহার ছায়া ছবি
চারিটী ছোট আঁখি কোণে?
এই যে শ্যামলতা মায়ার বাঁধন কি
বাঁধিয়া ছিল দুটী মনে?

কুমুর নদীর তীরে ঘন বন থাকায় নানা বন্য জন্তু আসিত। শৃগাল অসংখ্য ছিল, বড়ই উৎপাত করিত। কত হাঁস, ভেড়া, ছাগল তাহারা মারিত তার ইয়ত্তা নাই। তবে দু তিন বৎসর অন্তর এক একবার 'শিয়ালমারা' দল আসিয়া শিয়াল দল প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া যাইত। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পরও ৩।৪ দিন ভয়ে শিয়াল ডাকিত না। মনে একটা অভাব ও কষ্ট অনুভব করিতাম। বানরগণও খুব উপদ্রব করিত, ত্রেতাযুগ হইতে উহা চলিয়া আসিতেছে—কাজেই সহনীয় হইয়া গিয়াছে। 'বানরমারা'র দল গ্রামে ঢুকিতে পাইত না—আমাদের গ্রাম তীর্থস্থান, এখানে বানরবধ নিষিদ্ধ। যে হেতু শ্রীরামচন্দ্রকে সাগর বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই জন্য কাঠবিড়ালও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী। সাঁওতালেরা মারিতে এলে লোকে বাধা দিত।

গ্রামে মধ্যে মধ্যে বন্যবরাহ আসিত কিন্তু গ্রামবাসীর নিকট যে অভ্যর্থনা পাইত তাহাতে তিষ্ঠানো সম্ভব হইত না। শৈশবে শুনিতাম শীতকালে মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মাত্র এক রাত্রির জন্য ব্যাঘ্র অজয়ের তীরে আসে এবং প্রণাম করিয়াই চলিয়া যায়, গ্রামে ঢুকিবার অধিকার নাই। শীতের রাত্রে 'ফেউ' ডাকিলেই আমরা বুঝিতাম আজ বাঘ ওপার হইতে মাকে প্রণাম করিতেছে—আমরা উহার হিংসার বাহিরে।

আমাদের গ্রামে বহু গোয়ালার বাস ছিল তাহারা অনেক উৎকৃষ্ট গাভী রাখিত। ক্ষীর দধি ছানা মাখনের জন্য আমাদের গ্রামের নাম ডাক ছিল। এখানকার ক্ষীর ও ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারই গো-পালন করিত। এক সের খাঁটি দুগ্ধের মূল্য ছিল মাত্র এক আনা এবং ঘৃত টাকায় তিন পোয়া। চাষের জন্য মহিষও ব্যবহৃত হইত। মাত্র একঘর গোয়ালা দুগ্ধের জন্য গাই-মহিষ রাখিত। গো-মাতারা দেবতার সম্মান পাইতেন, প্রত্যেক দুগ্ধবতী গাভীকে 'কপিলা' ও 'সুরভি' মনে করিতাম। সবৎসা গাভী দেখা যাত্রায় শুভ-সূচক বলে, পল্লীপথের উহা একটী বৈশিষ্ট্য।

অনেক গৃহস্থই কুকুর পুষিতেন। কেহ কেহ সখ করিয়া গ্রে-হাউণ্ড, স্পেনিয়েল প্রভৃতি মূল্যবান কুকুর আনিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বেশীদিন টিকে নাই। গ্রামের কুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম—

ভল্লো, ভুলো, সুখদাস, টাইগার, জো,
কত নাম, কি তাদের আদর বোঝো।
কখনো চেপেছি পিঠে, করেছি ঘোড়া,
নেজে কারো ঝুমঝুমি বেঁধেছি মোরা,
গলে লয়ে বগলস্, সহিত ঘুঙ্গুর,
সোজাসুজি পার হ'ত ভরা এ 'কমুর'।

২

শিক্ষিত পরিবারে ছিল কত সখ,
মেরিছি—গড়িতে 'সেণ্ট বারনার্ড ডগ'।
লণ্ঠন মুখে দিয়া টেনেছি পথে,
শিক্ষা দেবই দেব যে কোনো মতে।
হেলা করে নিজেদের শিক্ষা ও পাঠ
তাদেরে শিখাতে সে কি চেষ্টা বিরাট!

৩

সার্কাসে কুকুরের খেলা দেখে রাম—
গ্রামের কুকুরগণে দিতনা বিরাম।
সব দিকে তাহাদের হিতপিয়াসী,
পিটায়েছি করিবারে নিরামিষাশী।
চোখে তাহাদের যাহা পেতাম আভাষ,
না শিখুক, ছিল বেশ শিখিবার আশ।

৪

সাথে লয়ে কুকুর, হাতে ধনু তীর,
শত্রু ছিলাম মোরা খেঁকশিয়ালীর।
ব্যসনে ও উৎসবে, চড়ুই ভাতে,
সাথী তারা দিবসেতে, প্রহরী রাতে।
গ্রামেতে ঢুকেছি কভু রাতি দুপহর,
দু মাইল হতে শোনা যেত চেনা স্বর।

৫

তাড়াইলে সরিত না—আহা যাহারা,
আজি তা'রা ডাকিলেও দেয় না সাড়া।
তাহাদের লাগি মন ব্যথা পায় মোর,
সঙ্গী যে ছিল দ্বারে রোদ পোহানর।
যুধিষ্ঠিরের মত ভাগ্য হলে,
সঙ্গে নিতাম সেই কুকুর দলে।

কুকুরের পরই বিড়াল—তাহারা দুধ, মাছ প্রভৃতি খাইয়া গৃহস্থের বহু অনিষ্টই করিত, তবু তাহারা গ্রামে অনেক ছিল। ষষ্ঠী দেবীর বাহন বলিয়া কেহ বিড়াল মারিত না। 'দধিমুখী' বিড়াল খুব আদর পাইত—গ্রাম্য ছড়ায় আছে—

তাল, তেঁতুল, বাবলা
কি করবে দধিমুখী একলা?

এই সঙ্গে সাপের নাম ও উল্লেখ যোগ্য। গৃহপালিত না হইলেও উহারা অনেকেই গোপনে গৃহেই বাস করে, এবং সময় সময় বৃহৎ অনিষ্টও ঘটায়। এ অঞ্চলে অন্যান্য পল্লীগ্রামের ন্যায় আমাদের গ্রামেও মা মনসার খুব সম্মান—বিশেষতঃ আমাদের গ্রাম যখন "বেহুলার" পিতৃভূমি তখন মনসার বিশিষ্ট দাবী আছে! বর্ষা কালে প্রত্যেক পঞ্চমী তিথিই ভক্তির সহিত পালিত হয়। 'পোখলা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রামে "ঝাঁকলাই" নামে এক প্রকার সর্প পূজিত ও রক্ষিত হয়, তাহারা থাকায় নাকি অন্য বিষধর সর্প আসিতে পায় না এবং ঐ সকল গ্রামে সর্পদংশনও হয় না! বহু গ্রামে সমারোহের সহিত 'মনসাপূজা' তখনও হইত এখনও হয়।

আমাদের গ্রামে গাঙ্গুলী বাড়ী কিন্তু মনসা পূজার দিন যে সব দ্রব্য খাওয়া নিষেধ তাহাই খাইবার ব্যবস্থা আছে। উক্ত বংশের প্রসিদ্ধ

মাণিক গাঙ্গুলী মহাশয় 'চাঁদ সদাগরে'র মত তেজস্বী শৈব ছিলেন—তিনিই বাধা নিষেধ উঠাইয়া ঐ প্রথা করিয়া গিয়াছেন ইহাই অনেকের ধারণা।

আমাদের বাড়ীতেও সাপ ধরাইতে বা মারিতে নাই; আমার মাতাঠাকুরাণী যখন বালিকা তখন তাঁহার কান্নায় মাতামহদেব একটী সাপ সাপুড়েদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া ফিরাইয়া আনেন। তাই লিখিয়াছিলাম—

বাস করি মোরা পল্লীগ্রামেতে সেটা অদ্ভুত ভূমি
অবাক হইবে তার কথা শুনে তুমি,
অজয়ের তীরে তাম্বু পাতিল একদল সাপুড়িয়া
শুধু বিষধর সাপ ধরে যায় নিয়া।
আমাদের গ্রামে একটী বাড়ীতে একদা তাহারা আসি
বাজাতে লাগিল তাহাদের ভেঁপুর্বাশী।
প্রাচীন ভগ্ন প্রাচীর ফাটালে কত দিন ধরে ছিল
রূপার মতন দেহলতা তার, ফণাটি চমৎকার
ভয়ের কোথাও চিহ্ন নাহিক তার।
সূর্য্য কিরণে সেই সে শুভ্র ভয়াল কান্ত রূপ,
দেখিয়া সকলে একেবারে হলো চুপ।
সুমুখে তাহার ঝাঁপি ধরে দিল, সর্প ঢুকিল তাতে…
সাপুড়িয়াগণ নিয়ে গেল ঝাঁপি মাথে।
বাড়ীর কন্যা দশ বছরের সোনার বরণ দেহ
কাঁদিতে লাগিল, ভুলাতে পারে না কেহ।
বাবাকে বলিল সাপ ফিরে আনো, সাপ ফিরে আনো তুমি
মা যে বলিলেন আজ 'নাগ-পঞ্চমী'
তিন পুরুষের ও সাপ মোদের বাস্তু আগুলি আছে।
সে কি দেওয়া যায় সাপুড়িয়াদের কাছে?
দেহেতে তাহার দিব্যজ্যোতি—চাহিল মায়ের পানে
রোষে নয় বাবা—নিদারুণ অভিমানে।
বলিল সে যেন 'ছেড়ে যাব আমি এই সব ফেলে পুলে
সাপুড়িয়া হাতে শেষে মোরে দিলি তুলে?
মা মোর কাঁদিছে, বোনেরা কাঁদিছে, কাঁদিছে বাড়ীর ঝি,
মা বলেন কেহ এ কাজ করে কি ছিঃ।
বুঝাতে পারে না পিতা যত বলে—বুঝেও বুঝে না হায়,
যুক্তি হারায় কন্যার কান্নায়।
নিরূপায় পিতা অবশেষে গিয়া বনে সাপুড়িয়া কাছে—
সাপটী তখনো ঝাঁপিতেই ভরা আছে।
"বাপু সাপুড়িয়া লও পাঁচ টাকা সাপ দিয়ে এসো ফিরে
বাড়ীতে সবাই ভাসিতেছে আঁখি নীরে।
গোটা পরিবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলায়ে ফেলেছে চোখ
সাপের জন্য দেখিনি এমন শোক।"
সাপুড়িয়া হাসি 'বলিল' বাবুজী সাপটী পুরানো বড়
মঙ্গলকারী—অরিষ্ট নাশে দড়।
ওঝারা সকলে বলে খুব দামী, ভারী উপকারী বিষ,
ফিরে দেব—দিস্ বিশ টাকা বখ্‌সিশ্।
দশ টাকা নিয়া সাপুড়িয়া আসি সাপ পুনঃ গেল দিয়ে
কোনো দেশে তুমি এমন শুনেছ কি হে?
উল্লসিত সে বাড়ীর সকলে, শান্ত হইল ভূমি—
সার্থক হ'ল আজ নাগ-পঞ্চমী।
ভাবি কি করিয়া সর্পযজ্ঞ করিল জন্মেজয়—
কন্যা তাহার ছিলনাকো নিশ্চয়?

এই সব জীব জন্তু লইয়া আমরা এক পরিবারে যেন বাস করিতাম—বিপদ-আপদ সহরের চেয়ে বেশী ছিল মনে হয় না।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি

(১)

এই বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের মূল সভাপতি পদে মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করায় আমার যে মনোভাব হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব-সংস্কৃতি-নির্দ্দিষ্ট বিনয়ের দ্বারাও ঠিক প্রকাশিতব্য নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরাট ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—সুতরাং এইরূপ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার মত যোগ্যতা আমার যে অতি সামান্য সে বিষয়ে আমি তীক্ষ্ণ ভাবে সচেতন। অথবা হয়ত এ ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি আমার নিজের গুণ নহে, আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদমিশ্র শুভেচ্ছা! যে মহাপ্রভুর অপার, অনমুমেয় করুণায় পাপীতাপী উদ্ধার লাভ করিয়াছে ও পঙ্গু গিরিলংঘনের দ্বারা অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাঁহার প্রসাদ-কণা আমার উপর বর্ষিত হইয়া আমাকে এই গুরুভার বহনে শক্তি দিক্ ইহাই আমার প্রার্থনা।

কালের দুরতিক্রম্য প্রভাবে প্রায় সমস্ত ধর্ম্মই কম-বেশী আদর্শগত বিশুদ্ধি হারাইয়াছে—উহাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক প্রেরণা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কতকগুলি বহিরঙ্গমূলক আচার—অনুষ্ঠান পালনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক যুগে কোন ধর্ম্মেরই পূর্ব্বের ন্যায় সার্ব্বভৌম প্রভাব—প্রতিপত্তি নাই। হিন্দুধর্ম্মে গীতা—উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, সর্ব্বভূতে সম-দর্শিতা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস সাধারণ

হিন্দুর অবচেতন মানসস্তরে শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যুদার ক্ষমা ও বিষয়-নিস্পৃহতার আদর্শ আজ আণবিক বোমার অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মের অধঃপতনের ইতিহাস নোয়াখালি ও পঞ্জাবের অমানুষিক বীভৎস অত্যাচারে অবিস্মরণীয়ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শক্তি-পূজা-সাধনা রামপ্রসাদ—রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া এখনও ইহার সজীবতার পরিচয় দিতেছে; কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও শত শত হিন্দু পরিবারে ইহা যে অধ্যাত্ম-জ্ঞান-শুদ্ধ কর্ম্ম-প্রেরণা যোগাইত, যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপূত ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন করিত, আজ তাহা বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য গ্লানিবহুল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের তুলনায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রশংসনীয় ব্যতিক্রমের পর্য্যায়ভুক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত ইহার অনুরাগীদের বাস্তব জীবনে অনেকটা সতেজভাবে ক্রিয়াশীল। ইহার গণতান্ত্রিক সাম্যবাদের আদর্শ ও সরল, প্রত্যক্ষ আবেদন জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। নাম-সংকীর্ত্তনের আকর্ষণ নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে অনুভূত—এখনও তাহাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা এই কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কোনও প্রাকৃতিক দৈবদুর্ব্বিপাক, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, শুভ কর্ম্মের সূচনা বা বৈরাগ্যমিশ্র ভক্তির প্রেরণা তাহাদিগকে সংকীর্ত্তনের আশ্রয়-গ্রহণে প্রণোদিত করে। এই সংকীর্ত্তনের মধ্যে পূজা-পার্ব্বণের পোষাকী দুষ্প্রাপ্যতা নাই; ইহা বিশেষ কোন তিথি, কোন সুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন বা উদ্যোগ-আয়োজনের নিখুঁত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। ইহার আয়োজন অতি সামান্য; ইহার বিধি অত্যন্ত সরল; ইহা অকৃত্রিম, স্বতস্ফূর্ত্ত ভক্তিরসের সহজ বিকাশ। ইহা জপ-ধ্যান-সাধনার কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রক্রিয়ার অপেক্ষা না করিয়া মানব-মনকে এক প্রত্যক্ষ উপায়ে অধ্যাত্মলোকে উন্নীত করে, ভগবদারাধনার এক অতি সহজ প্রণালী নির্দ্দেশ করে। সুরের মাধুর্য্যে, ভাবের উচ্ছ্বসিত আবেগে, বহু মনের একলক্ষ্যাভিমুখীনতায় ও পারস্পরিক প্রভাবে ইহা একটী নিবিড় ভাব-তন্ময়তার আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া এই পাপ-পঙ্কিল ধরাতলে এক স্বল্পকালস্থায়ী স্বর্গরাজ্যের বর্ণবিন্যাস করে।

*

(২)

বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠত্বের দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের লোকোত্তর চরিত্র-মহিমা; দ্বিতীয়তঃ অগণিত ভক্তের জীবনে ইহার আদর্শের আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল অনুসরণ। চৈতন্যদেব জগতের ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা-সংঘের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক—মাত্র চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তিরোভাব ঘটিয়াছে। যদিও ভক্তবৃন্দের উত্তেজিত কল্পনাবৃত্তির আতিশয্যের জন্য তাঁহার জীবনীতে নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তথাপি তাঁহার চরিত্রের নিছক মানবিক আকর্ষণ ইহার দ্বারা মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যাহারা তাঁহার অবতারত্বে আস্থাহীন, তাহারাও তাঁহার মহামানবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। শত শত ভক্তের লেখনীতে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, বহু প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে যাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের অনুপম মাধুর্য্য, অসীম করুণা, বাহ্যজ্ঞানহীন ভক্তি বিহ্বলতা ও দিব্যোন্মাদ এবং অধ্যাত্ম আদর্শের অননুকরণীয় শুচিতা আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠে। সুদূর অতীতকাল হইতে অতিসন্নিহিত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কাহারও জীবনী আমাদের নিকট এত সুপরিচিত, কাহারও ব্যক্তিত্ব এত সুস্পষ্ট নহে। চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, তাঁহার মানস অবস্থার প্রত্যেকটী স্তর, তাঁহার গৌরবর্ণ দেহে ভাব-কদম্বের প্রত্যেকটী রোমাঞ্চশিহরণ, তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেম ও করুণার প্রতি তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস, এমন কি তাঁহার কথোপকথন ও প্রকাশ-ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটী পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-চরিতকারদের দক্ষ অঙ্কনের সাহায্যে আমাদের মানস চক্ষুর নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বালক নিমাইএর শৈশব দুরন্তপনা হইতে তাঁহার যৌবনের পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রাভিমান, তার পর তাঁহার জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, তাঁহার সংসার-বন্ধনচ্ছেদের হৃদয়-গ্রাহী, করুণ কাহিনী, তাঁহার অপরূপ নৃত্যসুষমায় লীলায়িত কীর্ত্তনানন্দ, তাঁহার শেষ-জীবনের ধ্যান-তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও আনন্দ-বিভোর সংজ্ঞাহীনতা—যাহাদের চোখে দেখিয়াছি তাহাদের জীবনী অপেক্ষাও এই সমস্ত দৃশ্যগুলির সঙ্গে যেন আমাদের আরও গভীর, অন্তরঙ্গ পরিচয়। অনুপম "গৌরাঙ্গতনুলাবণী" লইয়া কত শত পদ রচিত হইয়াছে; কত অজস্র-ভক্তিবিগলিত অশ্রুধারা গৌরাঙ্গদেবের সাত্ত্বিক-ভাবোৎপন্ন স্বেদ-বিন্দু-মকরন্দের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের, স্নিগ্ধ, নিরভিমান আচরণের, আচণ্ডাল প্রেমবিতরণে অকৃপণ উদারতার উদ্দেশ্যে কত উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতির অর্ঘ্য নিবেদিত হইয়াছে! এ হেন মহাপুরুষ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা আমাদের অধ্যাত্মজীবনের একটী গভীরতম আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করিয়াছে, অন্তরের একটা চিরস্থায়ী প্রয়োজনের নিবৃত্তি ঘটাইয়াছে। কাজেই আধুনিক যুগেও ইহার প্রেরণা ও প্রভাব নিঃশেষিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের স্মৃতি আমাদের মনে যে পরিমাণে উজ্জ্বল থাকিবে, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মও ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের জীবনে কার্য্যকরী হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন বিষয়ে মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত ও পরিকরবৃন্দ যেরূপ প্রচার-নৈপুণ্য ও সংগঠন-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াবহ। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুদ্বয় বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রেম-ধর্ম্মের প্লাবন বহাইয়া দিলেন ও বিধিবদ্ধ সমাজ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মঠ—আখড়া গড়িয়া উঠিল, বৈষ্ণব ধর্ম্মের জপ-আরাধনা-পদ্ধতি সুনির্দ্দিষ্ট হইল, ত্যাগ, বিনয় ও বৈরাগ্যের আদর্শে গঠিত জীবনযাত্রা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ও সাম্প্রদায়িক সংঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা জীবনের নিয়ামক শক্তিরূপে অলংঘনীয় মর্য্যাদা লাভ

করিল। এই বিষয়ে বঙ্গদেশের ভক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী-গোষ্ঠীর সহযোগিতা মণি-কাঞ্চন-সংযোগের ন্যায় ফলপ্রসূ ও সুষমান্বিত হইয়া উঠিল। গোস্বামীগণ এই নব-ধর্ম্মের বেদ রচনা করিলেন, ইহার দার্শনিক ভিত্তি, ইহার স্মৃতির অনুশাসন, ইহার সাংস্কৃতিক গৌরব তাঁহাদের কর্ত্তৃক অদ্ভুত শিল্প-সুষমাবোধ ও নির্ম্মিতি-কৌশলের সহিত গঠিত হইল। কীর্ত্তনের ভাব-গদ্‌গদ ভক্তি-বিহ্বলতা ও পদাবলীর অনুপম কাব্যসৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া ইহার মাধুর্য্যরস জনসাধারণের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল। চৈতন্যোত্তর সমাজে বৈষ্ণব অধ্যাত্ম-মহিমায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল, ও ভক্তিশ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ পাত্র হিসাবে "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব" এই যুগ্ম শব্দের সমাবেশ-নৈকট্য ভাষার মধ্যে ইহাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার স্থায়ী নিদর্শন-স্বরূপ স্থান লাভ করিল। চৈতন্য-ভক্ত সাধুজনের দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত জীবনে ব্যাপক-ভাবে অনুশীলিত হইয়া সমাজে এক নূতন মহিমান্বিত আদর্শকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত নব-জাগরণের যুগ। মঙ্গল-কাব্যের গতানুগতিক ধারার অনুসরণে ক্লান্ত সাহিত্যসৃষ্টি অকস্মাৎ এক নূতন ও অফুরন্ত রস-উৎসের সন্ধান পাইয়া নবজীবনের পরিপূর্ণতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—নূতন সুরের মূর্চ্ছনায়, অভিনব ভাবোন্মেষের ঐশ্বর্য্যে, উপমার বিস্ময়কর প্রাচুর্য্যে হৃদয়ানুভূতির অকৃত্রিম গভীরতায়, সৌন্দর্য্যবোধের নব-নবায়মান অভিব্যক্তিতে সাহিত্যের অর্দ্ধমৃত শুষ্কতরু ফুলে-ফলে অঙ্কুরিত হইল। ভক্তির অনিবার্য্য প্রেরণা কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিল, হৃদয়ের আলোড়ন ছন্দোবৈচিত্র্যের নূপুরশিঞ্জিতে ধ্বনিরূপ লাভ করিল, নয়নের উদ্‌গত প্রেমাশ্রু সুরভিত কুসুম-স্তবকের ন্যায় কাব্যলক্ষ্মীর পুলকিত দেহে ফুটিয়া উঠিল। অন্তরের আবেগের যেটুকু কাব্যের রন্ধ্রপথে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই, সেই অতিরিক্ত অংশ কবিদের দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত ইতিহাস-বোধকে জাগাইয়া তুলিল ও বাস্তব-চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন-চরিত-রচনার সূত্রপাত করিল। সংস্কৃতে ও বাংলায় মহাপ্রভুর যে অসংখ্য জীবনী রচিত হইল, সেগুলিতে অলৌকিক ঐশী শক্তির স্তবস্তুতি দৃঢ়বদ্ধ তথ্য-সন্নিবেশের অর্ঘ্যাধারে নিবেদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুগ্ধ কল্পনাবিলাস ও সচেতন তথ্যানুরক্তির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জীবন-ঘটনার প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি, তাঁহার তীর্থ-পর্য্যটনের পুংখানুপুংখ বিবরণ, তাঁহার গতিপথের নিখুঁত মানচিত্র-অঙ্কনের-প্রয়াস, তাঁহার ভ্রমণ-সঙ্গীদের বিস্তৃত পরিচয়, তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপের দিনলিপি-রচনা—এই সমস্তই এক নব বাস্তব-বোধ ও দায়িত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ সূচনা করে। সনাতন অতিরঞ্জন-প্রবণতা ও অতিপ্রাকৃতে অক্ষুণ্ন বিশ্বাস এই বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় বহিয়া গিয়াছে ও পরস্পর নিরপেক্ষ এই দুই বিপরীত ধারার একত্রাবস্থিতি যে উদ্ভট অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছে; ভক্তিবিহ্বল লেখকদের সঙ্গতিবোধ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি অনুভব করে নাই।

(৩)

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম যে সামাজিক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফল আরও সুদূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক। তিনি বাঙ্গালীর মনে যে ভাবের প্লাবন বহাইয়া দিলেন তাহাতে সমাজের সনাতন শ্রেণীবিভাগ-গুলির সীমারেখা ধুইয়া মুছিয়া গেল। সকল দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যে অলৌকিক কিম্বদন্তী জড়িত থাকে, বাঙ্গালী ঐতি-হাসিক যুগে তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঐন্দ্রজালিক দ্রুততার সহিত অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন পরম্পরা ঘটিতে লাগিল। পাপী জগাই মাধাই চক্ষের নিমিষে শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হইল; জ্ঞানাভিমানী বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া শিশুর ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; নরপতি প্রতাপরুদ্র এই মহাসন্ন্যাসীর চরণতলে নিজ মুকুট লুটাইয়া তাঁহার প্রসাদ-কণিকা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন; রাজনীতি-চর্চ্চায় অভিজ্ঞ, ঘোরতর বিষয়ী রূপ-সনাতন লৌকিক মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠাকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় বিভোর হইলেন; রাজ-কুমার রঘুনাথ আধুনিক যুগের বুদ্ধের ন্যায় রাজৈশ্বর্য্য ও সংসারসুখ উপেক্ষা করিয়া শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। পৌরাণিক যুগের বিস্ময় আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনীত হইল; পৃথিবীর উপর স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা যায়

"এসেছে সে এক দিন
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।"

বুদ্ধদেবের তিরোধানের বহু শতাব্দী পরে বাঙ্গালী কি আকর্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ-বিহারের অধ্যক্ষত্বে অভিষিক্ত হইয়াছিল, অতীশ-দীপংকরকে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের জন্য হিমালয়ের অপর পারে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার উপলব্ধি আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অনুমানের কুহেলিকাচ্ছন্ন। কিন্তু চৈতন্যধর্ম্মের নিবিড় মোহ ও অপ্রতিরোধনীয় আবেদন আমরা এখনও হৃদয়ের নিগূঢ় তন্ত্রীতে, রক্তপ্রবাহের শিরা-উপশিরায় অনুভব করি।

অপেক্ষাকৃত নিম্ন লৌকিক স্তরেও পরিবর্ত্তনের কাহিনী কম বিস্ময়াবহ নহে। বৈষ্ণবের মঠ-আখড়ায় অধ্যাত্মসাধনার নূতন প্রণালী, শান্তিময়, বিষয়-নিঃস্পৃহ নূতন জীবনাদর্শ অনুশীলিত হইতে লাগিল—তাহার গ্রাম-প্রান্তস্থিত কুঞ্জবনে বৃন্দাবনের চিরতরুণ সরসতা ও মাধুর্য্য-রসাস্বাদের আংশিক প্রতিচ্ছায়া মায়া বিস্তার করিল; যমুনাতীরের স্মৃতিসুরভিত মলয়ানিল-স্পর্শ স্বপ্নাতুর কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিল। রাজনৈতিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার যুগগুলিতে অত্যাচারের খররৌদ্রতাপ বাঙ্গালীর চিত্তকে যে সম্পূর্ণ ঝলসাইয়া দিতে পারে নাই তাহার মূলে এই স্নিগ্ধ শান্তিনীড়-সমূহের প্রতিষেধক শক্তির কতখানি প্রভাব তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? তাহার মন এই রসনির্ঝরে অবিরত সিক্ত থাকিত বলিয়াই বোধ হয় বিপ্লব-

ঝটিকাতাড়িত মরু-বালুকার শুষ্কতা ইহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব-কবির প্রেরণায় রসার্দ্র চিত্তভূমিতেই ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের বীজ এত সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারিয়াছিল।

প্রাকৃত জনসাধারণের মনেও অজ্ঞাতসারে এই রসধারা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস কীর্ত্তনের রোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। উহার নিবিড় আনন্দে বাঙ্গালীর অন্তর কাণায় কাণায় পূর্ণ; মণ্ডলীনৃত্যের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাহু যেন তাহার অধ্যাত্ম অভীপ্সার পরিমাপ ও বহির্বিকাশ। নূতন নূতন মেলা ও মহোৎসবের প্রচলন বাঙ্গালীর সামাজিক হৃদ্যতা ও অতিথি-পরায়ণতাকে নূতন আত্মবিকাশের অবসর দিল, তাহার সমাজ চেতনাকে নূতন স্ফূর্ত্তির পথে অগ্রসর করিল। এই মেলা-মহোৎসব-গুলি তাহার পরাধীনতা-পিষ্ট, অভাবক্লিষ্ট জীবনের মরুভূমিতে সরসতার নির্ঝর বহাইয়া সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামশ্রীমণ্ডিত ভূমিখণ্ড রচনা করিল। বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণের যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সার্থকতা প্রতিপাদনে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবদান নিতান্ত সামান্য নহে। পৌরাণিক দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে বৈষ্ণবের রথ, স্নান, ঝুলন, রাস ও দোলযাত্রা মিলিত হইয়া বর্ষাবর্ত্তিত উৎসব-চক্রের সম্পূর্ণতা বিধান রহিল। মাতৃপূজার সম্ভ্রম-শুচিতার সহিত হোলির মত আতিশয্য সংযুক্ত হইয়া ভক্তি-প্রবৃত্তির সমস্ত স্তরের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। এই নবাগত ধর্ম্ম নিজ অন্তর্নিহিত শক্তির জন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসনের গণ্ডীভেদ করিয়া অবশ্য-পালনীয় বিধির মধ্যে নিজ স্থান করিয়া লইল। শ্রাদ্ধ-বাসরে কীর্ত্তন-গানের প্রচলন কখন আরম্ভ হইল জানি না। কিন্তু শ্রাদ্ধ বিধির মধ্যে ইহার অন্তর্ভুক্তি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে সনাতন শাস্ত্র এই আগন্তুক ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রভাবকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ধর্ম্মগুরুদের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ অল্পদিনের মধ্যেই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনায় বাঙ্গালার তীর্থ-গৌরব অনেকটা ক্ষীণ—বাঙ্গালার খুব কম তীর্থস্থানই গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরীর মত সর্ব্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিব ও শক্তিপূজার পীঠস্থানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল প্রাদেশিক ভক্তমণ্ডলীকেই আকর্ষণ করিত। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদে বাঙ্গালার তীর্থস্থানের এই আপেক্ষিক অগৌরব ও অপকর্ষ অনেকটা ক্ষালিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি ও কৈশোরলীলা-ক্ষেত্র নবদ্বীপের মাহাত্ম্য প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিয়াছে; আর বৃন্দাবন ও পুরীর আধুনিক প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে বাঙ্গালী বৈষ্ণবদেরই সৃষ্টি—উভয় তীর্থই চৈতন্য-দেবের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত হইয়া তাহাদের পৌরাণিক মহিমাকে নূতন করিয়া অনুভব করিয়াছে। তা ছাড়া, তীর্থের মাহাত্ম্য কেবল তাহার আকর্ষণের পরিধির উপরই নির্ভর করে না, করে ইহার অনাবিল ভক্তি উদ্দীপন করার শক্তির উপর। সেই হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম সমস্ত দেশে নানা ছোট ছোট পুণ্যভূমি সৃষ্টি করিয়া পল্লীবাসীর চিত্তকে ভক্তিরসে আর্দ্র রাখিয়াছে, ধর্ম্মসাধনার প্রতি উন্মুখ করিয়াছে ও গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম্য তীর্থ-গুলি ঠিক যেন আমাদের মাঠের ছোট ছোট জলাশয়গুলির মত—পুকুরগুলি যেমন অনাবৃষ্টির টানের মধ্যে শুষ্কপ্রায় শস্যগুচ্ছকে জিয়াইয়া রাখে, তেমনি এই সমস্ত অনাড়ম্বর পল্লী-তীর্থগুলি তাহাদের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সংসারতাপক্লিষ্ট মানবের ধর্ম্মবোধকে বিলুপ্তির গ্রাস হইতে রক্ষা করে। হয়ত কোন বৃহৎ চিত্ত-শুদ্ধি দিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই, ধর্ম্ম-সাধনার উন্নত স্তরে পৌঁছাইয়া দিবার মত সম্বল ইহাদের অনায়ত্ত; ইহারা কেবল দুর্ভিক্ষের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষার মত কোনরকমে প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিতে সহায়তা করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, জীবনে এইরূপ পরিচর্য্যার মূল্য বড় কম নহে। আমাদের প্রতিদিনের অন্নের মধ্যে অমৃতের কণিকাবিন্দু নিহিত আছে। শীর্ণ-প্রবাহিনী ঝরণার মধ্যে ভাগীরথীর বিপুল বিস্তার ও কলুষনাশিনী পাবনী শক্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার অন্ততঃ তৃষ্ণার অঞ্জলি পূর্ণ করিবার মত উপকরণ আছে।

(৪)

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের অবদান-প্রাচুর্য্যের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। বাঙ্গালার কাব্যে, দর্শনে, স্মৃতিব্যবস্থায়, লৌকিক আচার-ব্যবহারে ও ধর্ম্মসাধনায় ইহার প্রভাব গভীর ও অবিস্মরণীয়। কিন্তু অধুনা ইহার সে গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছে। আর বৈষ্ণবধর্ম্ম শক্তি-প্রাচুর্য্যের প্রেরণায় দিগ্বিজয়ে বাহির হয় না; নাস্তিক অবিশ্বাসীর চিত্তপরিবর্ত্তনের বা ভগবৎ-প্রেম-বিতরণের উপযোগী প্রাণসম্পদ ইহার নাই! ইহা এখন বহির্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত হইয়া নির্জ্জন গৃহকোণে অধ্যাত্ম সাধনায় রত। অনেকের ক্ষেত্রে বহিরঙ্গমূলক আড়ম্বর অন্তরের ধর্ম্ম-প্রেরণাকে অভিভূত করিয়াছে—আদর্শ আত্ম-প্রচারের নিকট মাথা হেঁট করিয়াছে। ইহাই সকল ধর্ম্মের শেষ পরিণতি—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অঙ্গার-নির্ব্বাপণ! যে কাঠে আগুন জ্বলে, যে প্রক্রিয়ায় ধর্ম্মবোধ উজ্জ্বল হয়, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার চিতাশয্যা রচনা করে—সূতিকাগারই নিয়তির অলংঘনীয় বিধানে সমাধিস্থলে পরিণত হয়। মহাকালের এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে অনুযোগ বা বিদ্রোহ বৃথা। বৈষ্ণবধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুদয়ের যুগেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিকূল সমালোচনা একেবারে স্তব্ধ হয় নাই। প্রেম-বিহ্বলতা ও বিষয়-বৈরাগ্যের আতিশয্য রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। উড়িষ্যার কোন কোন ঐতিহাসিক খেদ করেন যে গজপতি প্রতাপরুদ্রের আত্যন্তিক বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রীতি তাঁহাকে রাজকার্য্যে উদাসীন করিয়া উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-লোপের কারণ হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তির—"বৈষ্ণবধর্ম্মের সনাতন কুলে জন্ম বটে, কিন্তু ইহা বৌদ্ধধর্ম্মে জাত দিয়াছে"—পিছনে যে কিয়ৎ পরিমাণে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আজ বাঙ্গালীর যে অত্যন্ত কোমল, নমনীয় মনোবৃত্তি, ও মেরুদণ্ডহীনতা তাহার কর্ম্মশক্তি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাকে

মুহুর্মুহু শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহার অপরিমিত ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহার মূলে হয়ত কিছুটা চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রভাব থাকিতে পারে। অবিরত ভাবোচ্ছ্বাসসিক্ত জলাভূমিতে দৃঢ় পাদক্ষেপের অবসর থাকে না, রাজনৈতিক সৌধনির্ম্মাণোচিত দৃঢ় ভিত্তি মিলে না। আণবিক বোমা-বিধ্বস্ত জগতে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিক্ষুব্ধ বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আধুনিক যুগের উত্তরাধিকারী মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ-সংশয় স্বভাবতঃই জাগে। কিন্তু এই বাস্তব অনুপযোগিতাই নীতির উৎকর্ষ বিচারে একমাত্র মানদণ্ড নহে। ইহা খুবই সম্ভব যে অহিংসা বা প্রেমধর্ম্মকে কার্য্যকরী করিতে হইলে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে ও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ইহার অনুশীলন প্রয়োজন, তাহা আমাদের শক্তির অনায়ত্ত। আততায়ীর উদ্যত অস্ত্রের নিকট শুধু বিনা প্রতিরোধে নয়, ভীতিহীন ও বিদ্বেষহীন, প্রসন্ন চিত্তে আত্মসমর্পণ মানুষের বর্ত্তমান নৈতিক পরিণতির স্তরে অসাধ্য। মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ-স্পৃহা ও জিঘাংসা জাগ্রত হইলে দৈহিক নিশ্চেষ্টতার কোন নৈতিক মূল্য থাকে না। বিশেষতঃ এই অপ্রতিরোধের সঙ্গে কাপুরুষতার ভেদ-রেখা নির্দ্ধারণ করাও সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু যদি চৈতন্যদেবের ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ পূর্ণভাবে বাস্তব কার্য্যক্রমে প্রযুক্ত হইতে পারিত, তবে বোধ হয় পৃথিবীর রূপটাই বদলাইয়া যাইত। যখন আমরা মুখে কোন বৃহৎ আদর্শের দোহাই পাড়ি, তখন ভিতরে ভিতরে আমাদের সুবিধাবাদ, ভীরুতা, জয়-পরাজয়-সম্ভাবনার আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি নিম্নতর প্রবৃত্তিগুলি উহার তলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহাকে দুর্ব্বল ও অনির্ভরযোগ্য করিয়া তোলে। এই জন্য মহান্ আদর্শ বাস্তব জীবনের পরীক্ষায় লাঞ্ছিত হয়; বার বার অকৃতকার্য্যতার নজীরে ইহাকে বাস্তব কর্ম্ম-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করা হয়। ইহার জন্য অপরাধ কেবল আদর্শের অননুসরণীয়তার নহে, অপরাধ আমাদের আদর্শের অনুসরণে আন্তরিকতার অভাবেরও।

যাহা হউক বৈষ্ণবধর্ম্ম যে এখনও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সজীব ও সক্রিয় আছে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে ইহার চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন ও তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইহার আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। অঙ্গারস্তূপের মধ্যে এখনও অগ্নিশিখা সুপ্ত আছে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টার অনুকূল বায়ুপ্রবাহে এই নির্ব্বাপিত-প্রায় অগ্নিকে আবার প্রজ্বলিত করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় বৈষ্ণবতীর্থগুলি মুমূর্ষু অবস্থায় বিদ্যমান—মহাপুরুষের স্মৃতিজড়িত এই স্থানগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে, ইহাদের অতীত মহিমাকে পুনর্জীবিত করিতে হইবে। বক্তৃতা, প্রচারকার্য্য, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির দ্বারা এই সমস্ত মহাপুরুষের কীর্ত্তিকে আবার জনসাধারণের নিকট উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। রামকেলিতে রূপসনাতন, খেতুরীতে নরোত্তমদাস, ঝামটপুরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে অমৃতধারা তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন তাহার আস্বাদ আমাদের রসনাকে নূতন করিয়া উপভোগ করাইতে হইবে। সেই সমস্ত স্থানে মেলা-মহোৎসবের প্রবর্ত্তন দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা পরিবেশনের আয়োজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উপর ভারার্পণ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি, কাব্য ও দর্শনকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হইবে। এইরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার দ্বারা এই জড়বাদ ও পশুশক্তিবাদের যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নত আদর্শকে জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে অতীতের উত্তরাধিকারকে সে ঠিক জীয়াইয়া রাখিতে পারে না। সে যেমন তাহার হৃদয়াবেগের সঞ্চয়কে, তেমনি তাহার ঐতিহ্য সম্পদকেও জীবনের পথে পথে ধূলিকণার মত ছড়াইয়া দিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার নূতন আহরণের পথ বিস্মৃতির ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়া। নদীর স্রোত যেমন তটের এক দিক ভাঙ্গে—আর এক দিক গড়ে, মানবের মানস অগ্রগতিও তেমনি এক দিকে পুরাতনকে ভোলে ও অন্যদিকে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করে। আমরা পুরাণের যুগে গীতা-উপনিষদকে ভুলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভুলিয়াছি, রঘুনন্দনের অনুশাসনের প্রভাবে পূর্ব্বতন উদারতা ও সাম্যভাবকে বিসর্জ্জন দিয়াছি, জড়বাদ ও বিজ্ঞানের যুগে প্রাচীন অধ্যাত্মবোধের সারাংশ ফেলিয়া তাহার বাহ্য আবরণটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি। সেই জন্য আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে এক কালগত যোগ ছাড়া আর কোন অস্থিমজ্জাগত সংযোগ গড়িয়া উঠে নাই। এই সর্ব্বযুগ-প্রসারী, সর্ব্বসংস্কৃতিমিলনকারী সংশ্লেষণ-শক্তির (Synthesis) অভাবেই আমাদের জীবনে আসিয়াছে অগ্রগতির পরিবর্ত্তে চক্রাবর্ত্তন। তাই যে পশুযুগকে আমরা বহু পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, অতি আধুনিক সভ্যতার মধ্যেও তাহার প্রভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই। তাই উন্নতির ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বনের অভাবে আমরা পা পিছলাইয়া আবার ভূতলশায়ী হই। জানিনা মানুষ কোনদিন তাহার এই পশ্চাদপসরণপ্রবণতা জয় করিতে পারিবে কি না তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ সাধনা এই এক-লক্ষ্যাভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন যদি এই সাধনায় কোনদিন সিদ্ধিলাভ হয়, তবে সমস্ত অতীত যুগের প্রাণশক্তি আমাদের রক্ত-ধারায় প্রবাহিত হইবে, সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কৃতি আমাদের মানস ঐশ্বর্য্যও প্রসারে প্রতিফলিত হইবে ও আমরা আধুনিক যুগে বাস করিয়াও বেদ, উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধধর্ম্ম, পৌরাণিক ধর্ম্ম বৈষ্ণব ও তন্ত্রধর্ম্মের বিচিত্র প্রেরণা ও নিগূঢ় প্রভাব আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালীর মধ্যে রূপায়িত করিতে পারিব।

(নিখিল-বঙ্গ-বৈষ্ণব-সাহিত্য-সম্মেলনে মূল-সভাপতির অভিভাষণ)

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দূর থেকেই ঘন ঘন ধ্বনি উঠছে: বন্দেমাতরম, বন্দে-মাতরম্। বৈশাখী বিকেলে ঈশান কোণ থেকে যখন হু হু করে একটা উন্মাদ কালো ঝড় ছুটে আসে—বয়ে নিয়ে আসে দূরের গাছপালাগুলো থেকে একটা উতরোল আর্তনাদের শব্দ, ঠিক তেম্নি ভাবেই শোনা যাচ্ছে: বন্দেমাতরম্—বন্দে—

ইস্কুলের সামনে প্রায় দুশো আড়াইশো ছাত্র। চার-দিকের চারটে ফটক তারা আগলে রেখেছে, পাঁচ সাতজন করে শুয়ে আছে ফটকের সামনে। যারা ঢুকতে চাও, তাদের মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। দুটি চারটি ভালো নিরীহ ছেলে বিপন্নের মতো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে আছে একটা সুযোগ পেলেই সাঁ করে ভেতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু ওই সব গোবেচারী ভালো ছেলেদের ওপরে কড়া নজর আছে সকলের।

ওদের মধ্যে বদ্রী বলে একটা ছেলে কী করে ঢুকে পড়ল ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে। আর ঢোকবামাত্র আর কোনো কথা নেই, ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য না করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ইস্কুলেরদিকে। পেছন থেকে শতকণ্ঠে ধিক্কার উঠল: শেম্—শেম্—

কে একজন বলতে যাচ্ছিল, একবার বেরিয়ে আসুক না ওখান থেকে। চিরকাল তো আর ইস্কুলে বসে অ্যাল্‌জাব্রা কষতে পারবে না। একবারটি বেরিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে এক চাঁটিতে—

কিন্তু আক্রোশটা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবার আগেই আর একজন কেউ মুখে একটা থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। বললে, চুপ। আমরা সত্যাগ্রহী—কোনো রকম ভায়োলেন্সের কথা আমাদের মুখে কেন, মনেও আসতে পারবে না।

একটু দূরেই ইস্কুল কম্পাউণ্ডের ভেতরে কালো স্যুট্ পরে দাঁড়িয়ে আছেন হেড্ মাস্টার। তাঁর কালো মুখখানা আরো কালো হয়ে গেছে; চাপা আক্রোশে কোঁচকানো ভ্রূদুটো চোখের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে—হঠাৎ একটা জোরালো আলো চোখে পড়লে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, সেই রকম। সত্যিই তো, বড্ড বেশি জোরালো আলো পড়েছে। সদ্য রায়সাহেব হয়েছেন হেড্‌মাস্টার—এ আলো তাঁর সহ্য হচ্ছে না। নতুন যুগের নতুন সূর্য উঠেছে ছেলেদের রক্তের ভেতরে, হাজার হাজার চোখে সে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর সূর্যকিরণের চেয়ে অতসী কাচের প্রতিফলন যে অনেক বেশি দুঃসহ একথাই বা কে অস্বীকার করবে।

বদ্রীর এই আকস্মিক সাফল্যে হেড্‌মাস্টার যেন অনুপ্রেরণা পেলেন একটা। হিংস্রভাবে নাচের ঠোঁটটাকে বার কয়েক চিবিয়ে নিলেন তিনি, তারপর এগিয়ে এলেন ছেলেদের দিকে। আগুন-ঝরা গলার ডাক দিলেন: মৃগাঙ্ক।

ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট বয় মৃগাঙ্ক ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান ছেলে, আজ পর্যন্ত তার মুখের হাসির কেউ ব্যতিক্রম দেখেনি। মৃগাঙ্ক এক মুখ হাসি নিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে কি আপনি কিছু বলতে চান স্যার?

—বলতে চাই? হাঁ—বলতে চাই বই কি।—হতাশা-জর্জরিত রুদ্ধস্বরে হেড্‌মাস্টার বললেন, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

—অন্যায় তো কিছু করিনি স্যার।

—অন্যায় করোনি!—বিকৃত ভঙ্গিতে হেড্‌মাস্টার বললেন: পড়াশুনো বিসর্জন দিয়ে ভারত মাতাকে মুক্ত করা হচ্ছে! তা করো—আপত্তি নেই। নিজেরা গোল্লায় যাবে যাও, কিন্তু অন্য ছেলেদের মাথা খাচ্ছ কেন?

সত্যাগ্রহী মৃগাঙ্ক চটল না: আমরা তো আর কারুর মাথা খাইনি স্যার।

—খাওনি ?—হেড্‌মাস্টার বললেন, নিজেরা ইস্কুল বয়কট করেছ করো, কিন্তু যারা আসতে চাইছে তাদের বাধা দিচ্ছ কোন্ অধিকারে ?

মৃগাঙ্ক তেম্‌নি হাসতে লাগল : মনুষ্যত্বের অধিকারে। অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার, আপনাকেও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেটা সত্য, সেটা অন্যকে বোঝাতে সকলেরই অধিকার আছে স্যার।

—বটে !—হেড্‌মাস্টারের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল : খুব বড় বড় কথা শোনাচ্ছ যে! আচ্ছা বেশ, এ সম্পর্কে আমারও কতটা অধিকার আছে সেটা একবার জানানো দরকার।

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরলেন হেড্‌মাস্টার। উচ্চকণ্ঠে উঠতে লাগল : বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্—

মিথ্যেই শাসাননি রায়সাহেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এল পুলিশ ! লাঠিধারী ভোজ-পুরী আর সশস্ত্র গুর্খার দল। মস্তিষ্কহীন যান্ত্রিক মানুষ—চোখে মুখে ক্লান্ত গ্লানির অপচ্ছায়া।

তরোয়াল ঘুরিয়ে উইণ্ড্-মিলের সঙ্গে লড়াই করত কোন্ পাগলা লোকটা ? ডন্ কুইক্‌সোট্। গল্পের বইতে তার ছবি দেখেছিল রঞ্জু—এবার চোখের সামনে তাকে দেখতে পেলে।

বাঙালি ডি-এস্-পি—নামটা শুনেছিল, দিগম্বর সাহা। বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়াবার মতো অস্থিসার চেহারা। আলনায় ঝোলানো জামার মতো শরীরে ঢল ঢল করছে ইউনিফর্মটা। রোগা হাঁটু আর হাড়সর্বস্ব পায়ে জুতো মোজা যেমন বেখাপ্পা, তেমনি বেমানান দেখাচ্ছে—কেন যেন "পুস্ ইন্ বুট্‌স"-এর গল্প মনে পড়ে যায়। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলভার, গাঁট বের করা আঙুলে সেটাকে আগলে আছেন ডি-এস্-পি ; সন্দেহ হয় রিভলভার ছুঁড়বার আগেই আঙুলগুলো প্যাঁকাটির মতো মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে কিনা।

চেরা-গলায় ডি-এস্-পি হুঙ্কার ছাড়লেন। হার্মোনিয়ামের প্রথম আর শেষ রীড্ দুটো একসঙ্গে টিপলে যেমন একটা মিহি-মোটা বিচিত্র দ্বিস্বর বেরোয়, গলার আওয়াজটা শোনালো সেই রকম।

শাদা বাংলায় বললে পাছে ছেলেরা বুঝতে না পারে সেজন্যে দিগম্বর সাহা সাধু ভাষায় বললেন, বালকগণ, তোমরা বে-আইনি কাজ করিতেছ।

উত্তর এল : বন্দে মাতরম্—

—যদি ভালো চাও তো এখনি এখান হইতে প্রস্থান কর।

জবাব এল : মহাত্মা গান্ধী কী জয়—

—শেষবার বলিতেছি, না গেলে লাঠি চালাইবার হুকুম দান করিব। গুলিও চলিতে পারে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে ছেলেরা : ভারত মাতাকি জয়—

হার্মোনিয়ামের দুটো স্বর এবার চারটে হয়ে ঠিকরে বেরুল : লাঠি চার্জ।

লাঠি চলল। প্রথমে পড়ল মৃগাঙ্ক, তারপরে আরো, আরো, আরো অনেকে। দশজন পালালো, বিশজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রক্তের ছিটে বইল স্রোত হয়ে। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। লাঠি চালাতে পারো, গুলি ছুঁড়তে পারো, কিন্তু কণ্ঠরোধ করতে পারো না।

আহত ছেলেদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে ফেলা হল বাকী জনপঞ্চাশকে একটা মোটা কাছি দিয়ে কর্ডন করে নিয়ে যাওয়া হল কোতোয়ালী থানায়, সেখান থেকে জেলখানাতে। ধুলো আর রক্তের রাজটীকা পরে অকম্পিত পায়ে এগিয়ে চলল ছেলেরা।

রঞ্জু নির্বাক দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

উনিশ শো তিরিশ সালের ছবি। অজস্র, অসংখ্য।

চৌমাথার মোড়ে একটা বেঞ্চি টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন চারটি খদ্দরের টুপি পরা ছেলে। একজন বলতে সুরু করল : বন্ধুগণ, বিদেশী শাসনের নির্মম অত্যাচারে—

চারদিকের ভিড় সরে গেল। দারোগা ঢুকলেন বাহিনী নিয়ে।

দারোগা বললেন, বক্তৃতা বন্ধ করুন !

ছেলেটি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলে না। বলে চলল, নির্মম অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। আজ এই অত্যাচারের জবাব দিতে হলে—

দারোগা বললেন, নেমে আসুন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

এইবার উঠল দ্বিতীয়জন। দারোগা বললেন, আপ

নিষেধ করছি, আপনি এখানে কোনো কথা বলতে পারবেন না।

দ্বিতীয় বক্তা কথা বললে না, আবৃত্তি সুরু করলে :

"ওরে তুই ওঠ্ আজি,
আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি"

—নেমে আসুন—ইউ আর অ্যারেস্টেড্।

তৃতীয় জন বক্তৃতা করলে না, আবৃত্তিও না—সোজা গান ধরে দিলে :

"বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্—"

—আপনাকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি।

ছবির শেষ নেই। একটার পর আর একটা—অসংখ্য গণনাতীত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য—রঞ্জু এর ভেতরে যেন দর্শক ছাড়া আর কিছুই নয়। রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসহ্য উন্মাদনায় ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে মাথার শিরাপেশী-গুলো, তবু কোথায় যেন বাধা পড়েছে তার। এই উন্মত্ত জীবন-স্রোতে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারেনি। নিজের ভেতরে একটা বিচিত্র একাকিত্ব—বড়বাবুর ছেলের আশৈশব-লালিত স্বাতন্ত্র্য-বোধনা তাকে সরিয়ে রেখেছে। ভরা গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে দেখেছে বন্যাকে, তার ফেনিল ভয়ঙ্কর রূপকে, কিন্তু একটি মাত্র পা এগিয়ে গিয়ে সেই প্লাবনছন্দে মাতামাতি করতে পারেনি। খোলা জানলার মধ্য দিয়ে যেমন করে দেখেছিল তিরিশ সালের বন্যাকে—ঠিক সেই রকম। কেন? রঞ্জু ঠিক উত্তর দিতে পারে না। আজকের রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়তো বলতে পারত: মনের ভেতরে যত প্রচণ্ড হয়ে তার ঝড় জেগে ওঠে, বাইরের পৃথিবী তার কাছে তত ছোট হয়ে যায়। সমস্ত শিরাস্নায়ুগুলোকে উগ্র প্রখর করে দিয়ে, বিনিদ্র উত্তেজিত মস্তিষ্কে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্থিরভাবে পায়চারী করে সে নিজের ভেতরে আস্বাদন করতে ভালবাসে বিপ্লবের আবর্তকে; আর অদ্ভুত—বাইরে সে ভীরু, সে সংশয়ী। আত্মকেন্দ্রিক—ব্যক্তি আর অনুভূতি-সর্বস্ব। এখানেও হয়তো প্রশ্ন উঠবে—কেন? শুধু রঞ্জু নয়, রঞ্জুর মতো আরো অনেকের কাছেই হয়তো এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ থাক। সত্যিই—ছবির শেষ নেই।

একটা তোবড়ানো আল্‌কাত্‌রার দাগ চটে-যাওয়া বিবর্ণ ছোট সাইন বোর্ড চোখের সামনে ভেসে উঠছে এবারে। কাঁচা অসমান অক্ষরে লেখা রয়েছে: "লাইসেন্স-প্রাপ্ত দেশী মদের দোকান। ভেণ্ডার: হারানিধি পাল। সময় সকাল আটটা হইতে রাত্রি নয়টা।"

কিন্তু আটটা বাজবার আগেই ভিড় জমে গেছে সেখানে। পিকেটিং চলছে।

একজন বলছে, ভাই, দেশের বড় দুর্দিন। মদ খেয়ে দেশের আর সর্বনাশ কোরো না। তোমাদের পায়ে পড়ি, নেশা ছেড়ে দাও—

দশ বারোটি ক্রেতা জটলা করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। বেশির ভাগই নিম্নশ্রেণীর—ধাঙড়, মেথর জাতীয় লোক। নিম্নবিত্ত ভদ্রলোকও আছে দু একজন। ফিটফাট বাবুদের মদ কেনাটা এমনিতেই আড়ালে আবডালে চলে, সুতরাং আপাতত তারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই—রয়েছে নেপথ্যে।

কাউণ্টারে আসীন লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার হারানিধি পাল বসে আছে প্যাঁচার মতো মুখ করে। গোল গোল মস্ত চশমার আড়ালে চোখ দুটোতে যেন নরখাদকের দৃষ্টি। খালি গা, গলায় সোনার হারের সঙ্গে মস্ত বড় সোনার তাবিজ বুক আর পেটের মাঝামাঝি জায়গায় দোল খাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের বিপুল বপু জুড়ে নিবিড় রোমা-বলীর স্বচ্ছন্দ অভ্যুদয়, অনেকটা অনুসন্ধান করলে হয়তো চামড়ার সন্ধান মিলতে পারে। সবটা মিলিয়ে মনে হতে পারে, যেন শিকারের আশায় গেড়ে বসেছে একটা ভালুক।

কোমল স্বরে হারানিধি বললে, এ আপনাদের ভারী অন্যায় বাবুমশই। এমনভাবে যদি আপনারা গরীবের অন্ন মারেন—

পিকেটারেরা তার দিকে ফিরেও তাকালো না। তারা বলে যেতে লাগল: ভাই সব, কথা শোনো। বাড়ি ফিরে যাও—

ক্রেতাদের একজন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অভ্যস্ত নেশার সময়ে এরকম অবাঞ্ছিত বিঘ্ন ঘটাতে সে খুশি হতে পারেনি। বললে, হামাদের পয়সায় হাম্‌লোগ দারু পিব, তুম্‌হারা কেনো বাধা দিতে আসিয়েশে বাবু?

বাকী লোকগুলো বোধ হয় এই কথাটার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে কলরব উঠল; সরিয়ে যাও—হামরা দারু পিব—হামাদের খুশি।

পাথরের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালো পিকেটারেরা।

'—না, তোমরা মদ খেতে পাবে না।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিল বটে, কিন্তু পিকেটার-দের ঠেলে কেউ এগিয়ে যায়নি। কিন্তু রক্তে রক্তে অভ্যস্ত নেশার নিয়মিত দাবী। এগোতে পারছে না, পিছোনোও অসম্ভব। মদ ছাড়া ওদের চলবে না।

হারানিধি আবার কাতরকণ্ঠে বললে, যারা নিতে চাইছে, তাদের নিতেই দিন না। কেন খালি খালি আপনারা ঝামেলা বাড়াচ্ছেন বাবুমশই?

অবস্থাটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবেই হয়তো আরো খানিকক্ষণ চলত, কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি লোক ঘটনা স্থলে প্রবেশ করল। লম্বা খিট্‌খিটে চেহারার লোক, গায়ে বিলিতী আদ্দির ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী, কানে একটা সিগারেট। বড় বড় বাবরী চুল, সংপ্রতি অবিন্যস্ত ও বিশৃঙ্খল—পরিপূর্ণ লম্পটের চেহারা। লাল চোখ দুটো চরকির মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে তার—দুদিন ধরে নেশা করতে না পারায় আপাতত খুন চড়ে উঠেছে তার মাথায়।

দোকানের সামনে এসেই বাবরী চুল আদেশ করলে হটো—তফাৎ যাও—

পিকেটারদের ভেতরে যে উৎসাহী হয়ে সকলকে বোঝাচ্ছিল এতক্ষণ, সেই-ই জবাব দিলে। বললে, কালতো ফিরে গিয়েছিলে ভাই ব্রিজ্‌বিহারী, আজও ফিরে যাও।

—কেয়া? ব্রিজ্‌বিহারী কদর্য একটা মুখভঙ্গি করে গাল দিলে অশ্লীল ভাষায়। বললে, নেহি জায়গা, তুম্ ক্যা করোগে শালা?

অপমানে এক মুহূর্তের জন্যে ছেলেটির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সংযম চক্ষের পলকে আত্মস্থ করে দিলে তাকে।

—তোমাকে অনুরোধ করছি ভাই, ফিরে যাও।

—কেয়া লৌট্ যাউঙ্গা? কভি নেহি। হটো শালা লোগ্—দিল্লাগি সে কাম ন চলেগা।

—না। তোমাকে মদ কিনতে দেব না।

—হটো—ব্রিজবিহারীর চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—না।

—না?

নক্ষত্রবেগে মাটি থেকে একখানা থান ইট তুলে নিয়ে ব্রিজ্‌বিহারী—বসিয়ে দিলে সজোরে। আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটি। হাতের ফাঁক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল, তবু সেই অবস্থায় সে বলল, আমার কথা রাখো ভাই—মদ খেয়ো না।

তখন চারদিকে কলরব উঠেছে: খুন খুন। বিদ্যুৎ-বেগে অদৃশ্য হয়ে গেছে মদ্যপায়ীর দল, ঝনাৎ করে কাউণ্টারের জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে হারানিধি! সবাই পালিয়েছে, শুধু পালাতে পারে নি ব্রিজ্‌বিহারী নিজে। মাটির ভেতর থেকে একটা অলক্ষ্য শৃঙ্খল যেন তার পা দুটোকে আটকে ফেলেছে সেখানে।

রঞ্জু ভুলতে পারবে না ব্রিজবিহারীর সেই মুখ। আড়ষ্ট সংকুচিত হয়ে গেছে—বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে গেছে একটা বাসি মড়ার মতো। ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ ভেঙে পড়বার মতো নিজের অপরাধের আকস্মিক চৈতন্যনিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে ব্রিজ্‌বিহারী, ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রিজ্‌বিহারী থর থর করে কাঁপতে লাগল, তারপর আহত ছেলেটির মতোই দু হাতে নিজের মাথা মুখ ঢেকে বসে পড়ল ধুলোর ওপরে। যেন চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে তার।

মাতাল, লম্পট ব্রিজ্‌বিহারী নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। ব্রিজ্‌বিহারী আর কোনদিন মদ খাবে না। (ক্রমশঃ)



বঙ্গ-বিভাগ ও হিন্দুধর্ম্মসংস্কৃতি সংরক্ষণ

স্বামী বেদানন্দ

খণ্ডিত বাঙ্গলাকে প্রাণপণ সংগ্রামে অখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল যাহারা, সেই বাঙ্গালী হিন্দু পুনরায় অখণ্ড বাঙ্গলাকে তীব্র সঙ্কল্প ও প্রবল আগ্রহে খণ্ডিত করিয়া ফেলিল; কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দু কংগ্রেসী, হিন্দু মহাসভাইট্, সনাতনী—সকলেই অখণ্ড বঙ্গকে খণ্ডিত করিবার সংগ্রামে যোগ দিয়াছিল। কেন, কী উদ্দেশ্যে? বঙ্গদেশ যখন বিভক্ত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইল তখন বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে প্রশ্ন—বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, বিভাগ তো হইল; যে উদ্দেশ্যে বঙ্গ-বিভাগ চাহিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্যটী কি এবং তাহা সম্পাদন করিবার পথে করণীয় কি কি? 'ততঃ কিম্'?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা ও কর্ম্মীগণের মনে কি আছে—জানিনা। কিন্তু হিন্দু-জনতার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার মনোভাব লক্ষ্য করিতেছি। একদল ভাবিতেছেন—লীগ গভর্ণমেণ্টের দশ বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ত তাণ্ডবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; লীগ-রাহুমুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বঙ্গে নিশ্চিন্তে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা যাইবে। আর একদল ভাবিতেছেন—বাঙ্গালাদেশে লীগ গভর্ণমেণ্ট তো চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছিল; জাতীয়তবাদীগণের কোনো স্থান ছিল না, ভবিষ্যতেও স্থান পাইবার আশা ছিল না। বাঙ্গলায় যতটুকু বিভাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত জুড়িয়া নিতে পারিলাম, ততটুকুই লাভ; জাতীয়তাবাদের একটী ঘাঁটি বাঙ্গলাদেশে রহিল। পূর্ব্ব পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের মনে আশ্বাস—পাকিস্থানী শাসন অসহ্য হইয়া উঠিলে হিন্দুবঙ্গ বা জাতীয়তাবাদী বঙ্গে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিব। যাহারা আনুষ্ঠানিক হিন্দু-ধর্ম্ম ও সদাচার পালন করিয়া চলেন—অবশ্য তাহাদের সংখ্যা অল্প—তেমন হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি রক্ষার একটা স্থান বাঙ্গলাদেশে রহিল। এমনিতর নানা ভাব ও ধারণা হিন্দু জনগণের মধ্যে বর্ত্তমান। যখন বঙ্গ-বিভাগের জন্য বাঙ্গালী হিন্দুর কণ্ঠে সম্মিলিত দাবী উঠিয়াছিল, তখন কোন্ উদ্দেশ্যটী মূল এবং কোন্ গুলি গৌণ—ততদূর সকলে ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

সর্ব্বপ্রথম যখন কয়েকব্যক্তি বঙ্গ-বিভাগের যৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন; তৎপরে যখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন, তখন যেটাকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাই ছিল—বঙ্গ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্য; বিভিন্ন দলের হিন্দুগণ বিভিন্ন গৌণ উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে যোগদান করেন। বঙ্গ-বিভাগের বা বাঙ্গলায় স্বতন্ত্র হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের সেই মূল উদ্দেশ্যটী কি ছিল? সে হইতেছে—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ।

বঙ্গ-বিভাগ তো হইয়াছে; কিন্তু উহার মূল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি? দায়িত্ব কার? হিন্দুর ধার্ম্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং হিন্দুজননেতা ও কর্ম্মীগণের উপরই উপরোক্ত দায়িত্ব।

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝিব? লীগ গভর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক আঘাত আক্রমণাদির কবল হইতে হিন্দুর ধার্ম্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পদ অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতি নীতি, আচার প্রথা, স্বার্থ, অধিকার, সম্মান রক্ষাকেই পূর্ব্বে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি-সংরক্ষণের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করিত? পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানবাসী হিন্দুগণের সম্বন্ধে এখনো সেই তাৎপর্য্যই খাটে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের তথা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণের সম্বন্ধে তো সে কথা আর এখন প্রযোজ্য নয়। তবে কি হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতির সংরক্ষণ প্রচেষ্টার কোনো আবশ্যকতা নাই?

এই প্রশ্নের সমাধানের পূর্ব্বে আমরা বিচার করিব—হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি এবং তাহার রক্ষণ বলিতে আমরা কি বুঝি? হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আছে দুটী দিক—(১) আদর্শ ও সাধনার দিক; এটীকে তাত্ত্বিক দিক বলা চলে। (২) শিক্ষা-দীক্ষা, আচারপ্রথা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, মন্দির-বিগ্রহাদি এবং ধার্ম্মিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার প্রভৃতি;—এটীকে বাস্তব দিক বলা চলে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ বলিতে উক্ত দুই দিকেরই রক্ষা বুঝিতে হইবে।

উক্ত প্রত্যেক দিকটী রক্ষণের জন্য কয়েকটী করিয়া পন্থা অবলম্বনীয়। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ ও সাধনার দিক রক্ষা করিতে গেলে—(১) যেটুকু হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে, সেটুকু কু-সংস্কারমুক্ত করিয়া দিতে হইবে; (২) যেটুকু বিলুপ্ত হইয়াছে, সেটুকুর পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; (৩) হিন্দু সমাজের যে সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ কিছু নাই, তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি শিখাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বাস্তব দিকটীর রক্ষার জন্য কয়েকটী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে—(১) যেগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে; (২) যেগুলি বিলুপ্তির পথে সেগুলিকে বাঁচাইতে হইবে; (৩) যেগুলি আছে, সেগুলির উপর আঘাত আক্রমণ না আসে—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু হিন্দুজনতার জীবনের কোন্ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা কতটুকু দেখা যায়? বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে কয়জন দৈনন্দিন উপাসনা করে? কয়জনে পর্ব্বাহাদির অনুষ্ঠান পালন করে? কয়জনে মন্দিরে যায়? কয়জনে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করে? কয়জনে সদাচারানুষ্ঠান প্রথা পালন করে? কয়জনে হিন্দুয়ানী সম্মত আহার গ্রহণ ও পরিচ্ছদ

ব্যবহার করে? কয়জনে হিন্দু আদর্শে জীবনযাপন করে? কয়জনে হিন্দুত্বের প্রতি আস্থা ও গৌরব-গর্ব্ব পোষণ করে? এভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত যারা তাহাদের অধিকাংশই তো হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যারা ভাবেন যে তারা হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনা লইয়া চলিতেছেন, তাহাদেরও প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন কতকগুলি লোকাচারে ও দেশাচারে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুজনতার অবশিষ্টাংশের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কোনো আলোক অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই।

সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক :—(১) হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ আদর্শ ও সাধনার প্রচার ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠা। (২) হিন্দুত্বের আদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে শিক্ষা বিস্তার (৩) সমাজ-সংস্কার, (৪) সমাজ-সংগঠন, (৫) শুদ্ধি; (৬) নারীরক্ষা; (৭) মন্দির বিগ্রহ রক্ষা; (৮) আদিম ও পার্ব্বত্য জনতাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দান পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে গ্রহণ; (৯) হিন্দুজনতাকে মিলন, সখ্য, সহযোগিতার সূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করা; (১০) হিন্দুজনতার মধ্যে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও ক্ষাত্র-বীর্য্যের পুনরুদ্বোধন।

উপরোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য প্রথমেই চাই :—

(১) হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ও সাধনার ছাঁচে সুগঠিত এবং হিন্দু-সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিত, ত্যাগ-সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের ভাবে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র প্রচারক ও কর্ম্মী।

(২) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুজনতার সাপ্তাহিক ও পর্ব্বাহিক সম্মেলন-ব্যবস্থা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণের জন্য অভ্রান্ত নির্দ্দেশ বাণী এবং "হিন্দুমিলন মন্দির রক্ষীদল গঠন"—কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের বহুসংখ্যক প্রচারক ও কর্ম্মী দুই সহস্র "হিন্দুমিলন মন্দির"এর মধ্য দিয়া উপরোক্ত কার্য্য করিতেছেন।

সঙ্ঘের পরিকল্পনা

হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গ-বিভাগ। সুতরাং আজ উপরোক্ত কর্ম্মপদ্ধতিকে দ্রুত বহুব্যাপক রূপদানের সময় সমুপস্থিত। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ দক্ষিণ কলিকাতার সন্নিহিত পল্লীতে "কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দির" স্থাপনপূর্ব্বক এক বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রীয় হিন্দুমিলন মন্দিরে থাকিবে :

(১) সমাজ সেবা-ব্রতী প্রচারকগণকে হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারক শিক্ষায়তন।

(২) সহস্র সহস্র পল্লী রক্ষীদলগুলিকে ব্যায়াম চর্চ্চা ও বীরত্বমূলক অস্ত্রশস্ত্র ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক রক্ষীদল নায়ক গঠনের উদ্দেশ্যে রক্ষীদল শিক্ষায়।

(৩) হিন্দুত্বের আদর্শ ও সাধনার ভিত্তিতে বিদ্যার্থিদের জীবন ও চরিত্র গঠনের সুযোগদানের জন্য বিদ্যার্থি ভবন।

(৪) ব্যায়াম চর্চ্চা ও লাঠি, তরবারি, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষার জন্য ব্যায়ামাগার।

(৫) হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাদির রক্ষণ ও পঠন পাঠনের জন্য গ্রন্থাগার।

(৬) সমবেত উপাসনা, কীর্ত্তন, স্তবস্তুতি পাঠ, ভজন, পূজা-আরতি, জপধ্যানাদির জন্য উপাসনা মন্দির।

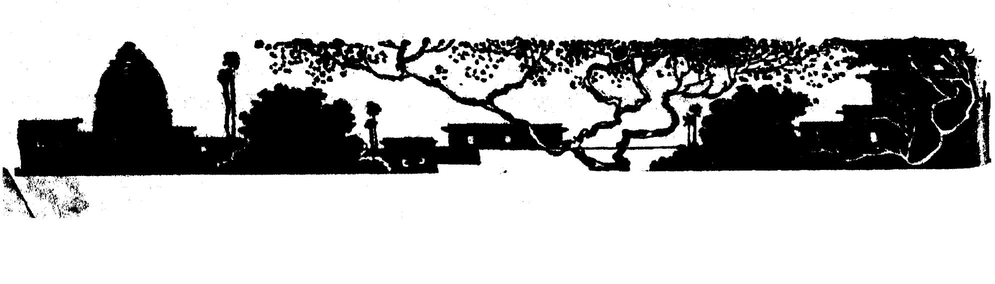
(৭) হিন্দুজাতীয়তা মন্দির—ইহাতে থাকিবে বৈদিক যুগ থেকে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তন, সমাজ-সংস্কারক, সাম্রাজ্য সংগঠন। ঋষি, অবতার, আচার্য্য, বীর, সম্রাটগণের প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়; শাস্ত্রাদি হইতে সমন্বয়-মূলক আদর্শ ও সাধনার তত্ত্ব প্রকাশক শ্লোক, উপদেশাবলী ও বাণী, হিন্দুর গৌরবময় ইতিহাসের ঘটনাবলীর চিত্র ও পরিচয় এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রেরণামূলক বাণী ও চিত্র।

এতদ্ভিন্ন চিকিৎসালয়, অতিথি নিবাস, সন্ন্যাসী নিবাস, যজ্ঞশালা প্রভৃতি থাকিবে। প্রতি বৎসর যাহাতে শত শত প্রচারক ও রক্ষীদল-নায়ক শিক্ষিত হইয়া সমগ্র দেশের পল্লীতে পল্লীতে প্রেরিত হইতে পারে—এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া সঙ্ঘ উপরোক্ত পরিকল্পনা করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে ৫০ লক্ষ টাকা আবশ্যক :—

প্রচারক শিক্ষায়তন—৫০ হাজার; রক্ষীদল শিক্ষালয়—৫০ হাজার; বিদ্যার্থিভবন—৫০ হাজার; চিকিৎসালয়—৫০ হাজার; অতিথি নিবাস—৫০ হাজার; ব্যায়ামাগার—৫০ হাজার; গ্রন্থাগার—৫০ হাজার; কর্ম্মীনিবাস—৫০ হাজার; হিন্দু জাতীয়তা মন্দির—১ লক্ষ; উপাসনা মন্দির ও নাটমন্দির—১ লক্ষ; অন্যান্য আবশ্যক গৃহাদি—এক লক্ষ। এতদ্ভিন্ন প্রচারক, বিদ্যার্থী, রক্ষী, শিক্ষক, রোগী, চিকিৎসক, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, অভ্যাগত, আশ্রয়প্রাপ্তগণের ভরণপোষণ ব্যয় মাসিক ২৫ হাজার টাকা।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই বিপুল অর্থের জন্য ধনী, দানশীল, সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।



কমলার কাহিনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে

কোন বড় জংসনে একখানা ট্রেন থেকে নেমে আর একখানা ট্রেণের জন্য যখন কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তখন আপার ক্লাশ ওয়েটিংরুমে ইজি চেয়ারে পা ছড়িয়ে শুয়ে হালকা সাহিত্য পড়ুন অথবা কলম নিয়ে ডাইরি লিখুন, এর চেয়ে আরামের জিনিষ ভ্রাম্যমান জীবনে আর আমি পাইনি। নতুন সহরে যেয়ে সব যায়গায় লণ্ডনের ডরচেষ্টারের মতো হোটেল মিলবে তেমন ভরসা কম। মিললেও সেখানে হয়তো নেহেরুর মতো কোন গণ্যমান্য অতিথির জন্য সারা বাড়ীটা সরগরম হয়ে আছে, নতুবা হাজার স্থানীয় দর্শনায় বস্তু টানবে আপনার মন, তিষ্টুতে দেবেনা ঘরে।

কিন্তু এই ওয়েটিংরুম, নিতান্তই প্রতীক্ষা করবার জন্য তৈরী। ছোট বেলায় ইস্কুলে পড়েছিলাম একটি ইংরাজি কাহিনীতে—কোন বৃদ্ধা মাতা সাগর কুলের ঘরে—মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখত, তার নাবিক পুত্র ফিরে আসবে, তারই প্রতীক্ষায়। এই ওয়েটিংরুমের বাতি জ্বলছেই, আপনার আমার সবার জন্য। লৌহবর্ত্মের উপর ঢেউ জাগিয়ে চলে যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার-মেল এক্সপ্রেস-লোকাল। কতজন নামছে, উঠছে। এলো গেল আপনার পাশে ভারত-ব্রহ্ম-চান হতে সুদূর ন্যুইয়র্কের পন্টিয়াক হোটেলের লেবেল লাগানো এটাচি-ওয়ালা স্যুটকেশ স্যুট-ধারী। আপনার খেয়াল রাখবার দরকার শুধু হাত ঘড়ির দিকে, আপনার ট্রেণের সময়টা আপনি জানেন।

অমরাবতী হতে ফিরে নাগপুর যাব। বাডনরা জংসনে এসে মেলের অপেক্ষা করছি। গাড়ী আসবে প্রত্যুষে। এখন সবে সন্ধ্যা।

কেরোসিনের আলো জ্বালা একখানা গোল টেবিলের উপর, দেওয়ালে একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে দার্জ্জিলিংএর ছবি, তলায় লেখা 'ভারতবর্ষ দেখুন'। আশে পাশের যাত্রীরা লিগ কংগ্রেস আর কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলি নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করছেন। আমার পকেটে তাকিয়ে দেখি, কলমটার ক্লিপে কেরোসিনের আলো চিক চিক করছে।

কলমেরও ভাষা আছে—আমরা সেটা ভেবে দেখিনি। ভেবে দেখুন আপনার কলমটি দিয়ে এযাবত কতকিছু লিখেছেন—প্রেমপত্র হতে সুরু করে 'ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট' পর্যন্ত। যারা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, তারা বলতে পারবেন, কত লক্ষ টাকার চেক সই করেছেন ওই কলমে। কিন্তু এমন কিছু কি করেন নি যাতে হৃদয় হাল্কা হয়ে গেছে, মনে হয়েছে আপনি যে কথা মুখে বলতে পারেন নি তাই লিখে রাখলেন। এমনও কি হয় না, যে কথা আপনার অবচেতন মনেই গুপ্ত ছিল, কলম জানত সেই কথা, আপনার অগোচর সে কথা সে বলে দিয়েছে। পরে আপনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন, মনে হয়েছে—যেন খানিকটা কর্তব্যপালন হ'ল, যেন ঋণশোধ হ'ল কিছুটা। কিন্তু সব ঋণ তো শুধবার নয়। বলি শুনুন একটা ছোট্ট ঘটনা।

আমি ঘুরছি অনেকদিন বাংলার বাইরে। আমার চেহারাটা কন্দর্প-কান্তি নয় বলেই জানি, পরন্তু ট্রেণে টহল করে বেড়ালে কন্দর্পেরও দর্প থাকত কিনা সন্দেহ। কোথায় স্নান, কোথায় আহার কিছুরই ঠিক নেই। নেহাৎ শরীরটার বয়স বেশী নয়, তাই সয়ে যাচ্ছে। তবে যেদিনের কথা বলছি সেদিন রীতিমত অবগাহন স্নান করেছি, পথে ঘাটে যা নিতান্তই অমিল বস্তু। ওথায় সমুদ্র পেয়ে ডুবিয়ে নিলাম এক চোট। পুরীর সমুদ্রের মতো অত বড়ো বড়ো ঢেউ নেই। জল দূরে গাঢ় নীল, তবে ওয়ালটেয়ার-বিশাখা পট্টমের সমুদ্রের মতো নয়। নিকটের জল নীলাভ।

তীরে বড় বড় দানার উজ্জ্বল বালি প্রচণ্ড রোদে চিক চিক করছে। অনেক দূরে নিয়ে বালুর চর। ছোট ছোট জাহাজ মেরামত করছে কাথিয়াবাড়ী মিস্ত্রী। স্নানের ঘাটে আলাপ হ'ল নাসিকের বালকিসন নামে একটি যুবকের সাথে। সে কলকাতা চেনে, গেছে ভারতের

ছোট বড়ো নানা সহরে আমারই মতো ভবঘুরের বেশে। ওর সাথে খাতির হয়ে গেল।

ফিরলাম একসাথে, এক ট্রেণে, ঠাসাঠাসি ভিড় তৃতীয় শ্রেণীর ছোট কামরায়।

ঝঞ্ঝাট বাধালো বালকিসন, কথা প্রসঙ্গে বলে ফেল্লে—আমি বাঙ্গালী। কিন্তু আমার চেহারা বা চাল-চলন যে বাঙ্গালীসুলভ নয় এটাই সন্দেহ করলেন একজন সিন্ধী ব্যবসায়ী। কলকাতার সুতাপটিতে তাদের 'চল্লিশ সাল কি'—কারবার আছে। 'বন্দিপাধ্যায়', 'মুকারজি' প্রভৃতি তার কত 'দোস্ত' আছে, 'জান পচান' আছে 'হরেক কিসিম' বাঙ্গালী বাবুর সাথে। কিন্তু 'দে-বাবু' 'কভি নেহি শুনা'।

সন্দিগ্ধ স্বরে তিনি হিন্দিতে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি বাঙ্গালী? 'সাচ' বলছেন?

কি উত্তর দিই? বল্লাম—বাংলা দেশে জন্মালে, মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন সবাই বাঙ্গালী হলে যদি বাঙ্গালী বলা হয় তবে আমি বাঙ্গালী।

আবার প্রশ্ন হ'ল—আপনি বাংলা বুলি জানেন?

না হেসে পারলাম না, বল্লাম, আমি বাংলা বল্লে কি আপনি বুঝতে পারবেন?

'জরুর।' তিনি বল্লেন—'হাম ভি বাংলা সামঝাতে পারি। আচ্ছা বলিয়ে জি জরু কৌন চিজ হ্যায়?

বল্লাম উত্তরটা।

আবার প্রশ্ন—'মাশায় কেমন আছে'—এর 'সামাল' কি?

হাসি চেপে জবাব দিলাম।

আবার প্রশ্ন—হামি ভালো আছে।

বললাম উত্তর।

প্রশ্নকর্তা বল্লেন—বাংলা আপনি থোড়া থোড়া সমঝেচেন। 'লেকিন' লেখা পড়া তো নেহি আয়ে গা।

বালকিসন এবং নিকটস্থ অনেকগুলি সহযাত্রী এতক্ষণ সাগ্রহে আমার অগ্নিপরীক্ষা লক্ষ্য করছিল। এবার বাল-কিসন রুখে উঠল—বল্লে, লেখা পড়া পারবেন না মানে? ইয়ারকি নাকি? কাগজ বের করুন, দেখাচ্ছেন লিখে।

মনে মনে কৌতুক অনুভব করলেও এভাবে নিজেকে বাঙ্গালী প্রমাণিত করবার অদম্য উৎসাহ আমার ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। জানিনা বালকিসনের মতো আমিও এবার তেড়ে উঠতাম কিনা। সকালে দ্বারকা হতে ট্রেণে চেপে ওখা গেছি, তিন মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেট দ্বীপে মন্দির দর্শন করেছি। এপারে এসে সমুদ্র-স্নানের পর সারা বন্দরে এক টুকরা পুরী কি ভাজি পাই নি, এক কাপ চিনিশূন্য চা খেয়েছিলাম, তদবধি পেটে কিছু পড়ে নি। মাথায় তেল নেই, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ে চোখে মুখে পড়ছে। পেটও চো চো করছে। বাইরে বাতাসে বালি উড়ে আসে, ট্রেণের ইঞ্জিন হতে ছাই ও কয়লার গুড়া উড়ে আসে, তাই চোখে গগলস আটা আছে। জামা কাপড় তীর্থকাকের উপযুক্ত অবিন্যস্ত এবং যথাসাধ্য ময়লা। এই বেশটাকে বাঙ্গালীর বলে প্রমাণিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ক্রমেই আমার শিথিল হয়ে আসছিল। কিন্তু এই সময় একটি অঘটন ঘটল।

আমার বেঞ্চের সুমুখের দুখানা বেঞ্চ পেরিয়ে তৃতীয় বেঞ্চে আমার দিকে মুখ করে বসে আছে একটি সুশ্রী যুবতী। তার গায়ের রংটা উজ্জ্বল গৌর, মুখাবয়ব অনেকটা আমার ছোট বোনের মতো, হাতে সরু চুড়ি, গলায় সূক্ষ্ম মফচেন, কানে মুক্তার দল বসানো কুণ্ডল। এলো খোঁপার উপর মাথায় সামান্য কাপড় দেওয়া। শাড়ী পরবার ধরণটা অবিকল বাঙ্গালীর মতো, এমনি কি গায়ের সামিজটাও। সহসা দেখলে তাকে বাঙ্গালী বলে ভুল করা কঠিন নয়, কিন্তু মুখাবয়বে অবাঙ্গালীত্বের বিশিষ্ট ছাপ অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ে।

পাশেই তার ছোট বোন, অত্যন্ত চঞ্চল। মুখখানা অবিকল বড় বোনের মতো। বাংলায় হলে এ বয়সে সে ফ্রকই পরত, কিন্তু তার মাথায় ওড়না, পরণে শাড়ী। ওদের সাথে আর কে আছে জানতে পারিনি।

কাব্য করবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা ছিল না সে কথা পূর্বেই বলেছি। বেলা পড়ে আসবার সাথে সাথে শরীর ক্লান্ত হয়ে আসছিল। লবণ সমুদ্রে স্নান করবার দরুণ চর্মে খড়ি উড়তে লাগল। কৌতুকজনক ব্যাপারে জড়িত হয়ে না পড়লে হয়ত আমি নিতান্ত বিব্রত বোধ করতাম।

অনেকক্ষণ বিমনা থাকবার পর এই সিন্ধী বণিকটির সাথে বাদানুবাদের সময় লক্ষ্য করলাম, তৃতীয় বেঞ্চে উপবিষ্ট ওই যুবতীটি অন্যমনস্কতার ভান করলেও অধিকাংশ সময়

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে বাইরে বহুযোজনব্যাপী বিস্তারিত মাঠে দৃষ্টি নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমি বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেই ওর দৃষ্টি ফিরে আসচে। এ ব্যাপারটী যে অনেকক্ষণ ধরে চলছিল সেটা আমি অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত বেশ তদুপরি গগলস আটা পাগল চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখবার কিছু আছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আমার ভুল ভাঙ্গল যখন আমার সুমুখের দ্বিতীয় বেঞ্চে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসা পাগড়ী মাথায় একজন বৃদ্ধ ঘুরে বসে সোজাসুজি আমার সাথে পরিষ্কার বাংলায় কথা বললেন। তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে বিলম্ব হল না, তিনিই এই কন্যাদ্বয়ের পিতা। জ্যেষ্ঠা কন্যার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিম্বা সিন্ধী বণিকের অনুচিত বাদানুবাদে বিরক্ত হয়ে আমার সাথে কথা বললেন—বোঝা গেল না।

আমাদের আলাপটা অল্পেই জমে গেল, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—আমি সত্যি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার বর্তমান খবর কি তাই শুনবার জন্যেই যে আমি ঠিক বাঙ্গালী কিনা তার পরখ হচ্ছিল সেটাও বুঝিয়ে বল্লেন। কলকাতার দাঙ্গার সংবাদ তখন সর্বত্র দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে—সেই সব কথাই তিনি বিস্তৃতভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পেরিয়ে গেল, আমাদের আলোচনা জাগতিক পরিস্থিতি হতে ক্রমে পারিবারিক আলোচনায় পর্যবসিত হয়ে গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সাথে আলাপ করতে লাগলেন। আমার ব্যক্তিগত খুঁটি নাটি খবর তিনি শুনতে চাইলেন, নিজের সম্যক পরিচয়ও জানালেন।

কলকাতায় কুড়ি বছর ধরে তিনি কয়লার কারবার করেছিলেন। যুদ্ধের গোলযোগে ওয়াগন অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়। সংসারে তিনি একা, পুত্র সন্তান নেই, ওই দুটিমাত্র কন্যা। তাই আর ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে জন্মস্থান রাজকোটে চলে এসেচেন। এখানেই পৈতৃক বাস, বসত বাটি আছে। তা ছাড়া যা দু চার পয়সা জমিয়েছিলেন তাতে রাজকোটে কয়েকখানি 'মকান' খরিদ করে তারই ভাড়ায় দিন গুজরান করছেন।

মুস্কিল হয়েছে বড়ো মেয়েটিকে নিয়ে। ওর নাম কমলা। দুই বোনেরই জন্ম কলকাতায়। কিন্তু ছোটটি খুব ছোট থাকতেই এ দেশে ফিরেচে বলে এ দেশি ভাব সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছে। পারে নি কমলা, পারে নি—কারণ সে চায় নি। এ নিয়ে মাতা কন্যার অহোরহো সংঘাত লেগে আছে। কলহে পিতা কোন পক্ষ নিয়ে থাকেন সেটা আভাসে বুঝলাম। বস্তুত কেবল কমলার নয়, তার পিতারও গভীর অনুরক্তি আছে বাংলার সংস্কৃতির উপর। বিশেষ করে ষোল সতের বছর ধরে মেয়েকে যে শিক্ষা ও আদর্শে মানুষ করেছেন সেটা পুরাপুরি বাঙ্গালীর আদর্শ। পরিষ্কার বলেই ফেললেন—কমলাকে কোন উপযুক্ত বাঙ্গালীর হাতে দিতে পারলেই তিনি খুসী হতেন, কমলাও সেটা নিশ্চয় পছন্দ করত। কিন্তু বাংলা হতে হাজার মাইল দূরে বসে এ স্বপ্ন তার নিরর্থক।

কমলা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনছিল আমাদের কথা-বার্তা। শেষের দিকে পারিবারিক আলোচনা সুরু হতেই সে অন্যমনস্কের ভান করে নিজেকে দূরে নিয়ে গেল। কিন্তু সে যে আদৌ অন্যমনস্ক নয় সেটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না।

আমি কাথিয়াবাড়ের গুণগান করলাম, বল্লাম—যে দেশে বাপুজীর জন্ম হয়েচে সে দেশের সংস্কৃতিও তো তুচ্ছ করবার নয়।

বৃদ্ধ বললেন—কি জানো বাবা, দোষটা আমার। এই যে পাগড়ি এটা আমি এদেশেই পরছি, বাংলায় আমি বাঙ্গালী হয়েই ছিলাম। আমার বন্ধুরা তোমার দেশের গণ্যমান্য লোক। আমি বাংলাকে অন্তরের সাথে শ্রদ্ধা করি।

কমলা আমার সেই বাংলার ঘরে জন্মেছিল, সেই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, আমি ওকে বাংলার আদর্শ হতে বিচ্যুত করতে চাইনি, আজও যে মনে প্রাণে চাই তেমন নয়। ওটা যে কি জিনিস, সেটা তো জোর করে বোঝাতে পারব না। তুমি বাঙ্গালী, বিদেশীর এই মনো-ভাব হয়তো তুমি বুঝবে না। তবু এটা সত্য। আমি জানতাম রবীন্দ্রনাথের বাংলা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা, স্যার রাজেন মুখার্জির বাংলা। সে বাংলাকে আমি আজীবন শ্রদ্ধা করব।

রাজকোট ষ্টেশন এলো। তারা সবাই নামলেন আমিও নেমে বৃদ্ধকে নমস্কার করলাম। তিনি প্রতি নমস্কা

করলেন। কমলাও পরিষ্কার কণ্ঠে 'নমস্কার' জানালো। কিন্তু তার মুখে কিছুক্ষণ আগে দেখা হাসির জ্যোতিটি খুঁজে পেলাম না।

রাজকোট ছাড়িয়ে ভিরমগাম, সেখানে হতে বোম্বাই, আমার ট্রেণ্‌ কোন বাধা মানে নি। কিন্তু আজ কতো দিন পরে বাডনরা জংসনের ওয়েটিং রুমের এই প্রায়ান্ধকারে আমার স্মৃতিকথা লিখতে বসে কমলার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেদিন রাজকোট ষ্টেশন হ'তে ট্রেণ ছাড়লে, মনে হয়েছিল কয়লার ব্যবসায়ীর ঘরেই ভগবান কি হীরক পাঠিয়েছেন? আজ মনে হচ্ছে, সেদিন তার নির্বাক প্রশংসমান দৃষ্টি দিয়ে আমার হতশ্রী চেহারাকে উপলক্ষ করে এক বিমুগ্ধা নারী বাংলাকে, বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের, বাংলার সংস্কৃতির আভিজাত্যকে যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, বোধ হয় এসিয়ায় সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ দিয়েও নোবেল কমিটি বাংলাকে সে সম্মান দিতে পারেনি। জানিনা কমলা কোথায়, বাংলার ঘরের বধূ হওয়ার আশা তার পূরণ হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে বৃহত্তর বঙ্গের প্রসার এতো চলবেই, বন্ধ হবে না।

ভারতে বৃটিশ শাসনের স্বরূপ

শ্রীত্রিবিক্রম পাঠক

প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ, বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষের আহ্বানে কত শত বৎসর ধরে কত মানব গোষ্ঠীর ধারা এসেছে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তারা আপনার করে নিয়েছে। ভারতের সভ্যতায় তাদের দান অনস্বীকার্য্য। দুস্তর মরুপর্ব্বত লঙ্ঘন করে এসেছে শক, হুণ, তুর্ক, মোগল, পাঠান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতি, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে ভারতীয় সমাজে তারা তাঁদের ঠাঁই করে নিয়েছে, কিন্তু যারা ভারতকে তাদের দেশ বলে মেনে নিতে পারে নি, যারা শুধু তাকে তাদের বাজার আর শোষণের লীলাভূমি মনে করেছে, প্রতিযোগিদের পরাস্তকারী কূটকৌশলী ইংরাজই তাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। আর এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণী জনকল্যাণের নামে স্বশ্রেণীর কল্যাণেই সর্ব্বদা আত্মনিয়োগ করেছে তাই নবযুগ স্রষ্টা ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত রামমোহন যেদিন মাত্র যুগোপযোগী শিক্ষার দাবী জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে ঐতিহাসিক চিঠি দিয়েছিলেন সে দিনও তাঁর দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে স্বশ্রেণীর প্রয়োজনে স্বল্প মাহিনার কেরাণী ও প্রভুভক্ত সেবকশ্রেণীর সৃষ্টি করা। এই আত্মগোপন করা ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনের সর্ব্বস্তরেই আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই নিবন্ধে আমরা তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

.ভারতের দিগন্তে আলেকজাণ্ডার, তৈমুর ও নাদিরশার লুণ্ঠন বিভীষিকা দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার স্বল্পকালস্থায়ী ধ্বংসলীলায় জনসাধারণের জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘাত প্রতিঘাত দেখা দেয়নি। গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার পাদপীঠ ভারতবর্ষ সেদিনও তার সুকুমারশিল্পে, তার কারুকার্য্যে ও তার জ্ঞানচর্চ্চায় আত্মসমাহিত ছিল। তার জীবন যাত্রায় বিপর্য্যয় ঘটাবার মত শক্তি দেখা দিয়েছে বহুকাল পরে ধনতন্ত্রবাদের পূর্ণ বিকশিত রূপ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের এই নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়েছে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনে। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জনসমষ্টিকে শিক্ষা, সভ্যতা, কৃষ্টি, আহার, বাসস্থান চিকিৎসা প্রভৃতি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলো থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রচিত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারত সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যিক শোষণের আলোচনা করতে গেলেই মনে পড়ে ভারতের বিগত দিনের সমৃদ্ধির কথা। রোমক সভ্যতা যেদিন দেদীপ্যমান হয়ে ইউরোপকে সুসভ্য করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করেও তাকে বিলাস-ব্যসন, কলা প্রভৃতির জন্যে নির্ভর করতে হত ভারতবর্ষের ওপর। কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলেছেন "সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল রোম দিল্লী থেকে আনা সোনা রূপার ব্রোকেডে সুসজ্জিত থাকত। সারা সভ্য জগতে ঢাকার মসলিনের খ্যাতি প্রচারিত ছিল। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, রত্নাদিখচিত বস্ত্র, সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য, ব্রোকেড, কার্পেট, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাইয়ের দ্রব্যাদি আসবাব পত্রাদি, চমৎকার ও অতি তীক্ষ্ণ বিভিন্ন আকারের তরবারি প্রভৃতি, .ভারতের কারুশিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছে। **M, Martin Indian Empire**এ লিখেছেন ঢাকার মসলিন, কাশ্মিরী শাল ও দিল্লীর সিল্কের ব্রোকেডই সিজারের দরবারের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করত। তখন বৃটেনের বর্ব্বর অধিবাসীরা রং মেখে সং সেজে থাকত। ধাতু দ্রব্যের কারুকার্য্যসমন্বিত দ্রব্যাদি, মণি-মুক্তা হীরা, ভেলভেট, কার্পেট, চমৎকার ইস্পাত, চীনা মাটির জিনিষপত্র, জাহাজের চমৎকার কাঠামো—ভারতের এই সব বিবিধ দ্রব্য সভ্য মানুষ বহুদিন ধরেই প্রশংসা করে আসছে এবং তাঁর কথায় **"Before London was known in history,**

India was the richest trading mart of the earth. কিন্তু ভারতের বাণিজ্যিক পরিচয়ই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। ধর্ম্ম, শিক্ষা, কলা, জ্ঞান বিজ্ঞানের অপরিমিত দান ভারতীয় উপনিবেশকারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে পূর্ব্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে। তার সাক্ষ্য আজও অমলিন হয়ে রয়েছে। মানব সভ্যতা সব সময়েই যে অগ্রগামী ইতিহাস তা' স্বীকার করে না। গ্রীক, এ্যাসিরিয়, ব্যাবিলনিয়, মিশরিয়, রোমক সব সভ্যতাই জরাগ্রস্ত হয়েছে, তাই বাইরের আঘাতে জীর্ণ সভ্যতা ধ্বংস পায় বা রূপান্তরিত হয়। ভারতের ইতিহাসেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। রূপকথার মত মনোরম কল্পনার মায়াজাল রচনাকারী ভারতের ঐশ্বর্য্যকাহিনী শুনে লুব্ধ বণিকের দল ভারতের সন্ধানে সপ্ত সমুদ্র তোলপাড় সুরু করে দিল মধ্যযুগে। প্রতিযোগী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো থেকে দলে দলে আবির্ভাব হলো বণিকগোষ্ঠীর। মুখে প্রভু যীশুর বাণী আর অন্তরে রয়েছে পরদেশ লুণ্ঠনের দুর্দ্দমনীয় লোভ।

কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ ও ভাগ্যের বহু প্রতিকূলতাকে জয় করে বণিক প্রতিনিধি ক্লাইভ যেদিন স্বদেশী দালালের মারফৎ বাঙ্গলায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন—সেদিন ভাবীকালের শোষণের স্বপ্নে তিনি পাগল হয়েছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন "কোম্পানী আজ যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেছেন তা' ফ্রান্স ও রাশিয়া বাদ দিলে ইউরোপের যে কোন রাজ্যের চেয়ে বড়। ৪০ লক্ষ ষ্টার্লিং খাজনা তাঁরা পাবেন আর পাবেন সমপর্য্যায়ভুক্ত বাণিজ্যিক লাভ।...... আপনারা বর্ত্তমানের চিন্তায় অধীর হবেন না, ভবিষ্যতের লাভের কথা ভুলবেন না......এখুনি লুট পাটের বখরার জন্যে অধীর হবেন না। (হাউস অব কমন্সে ৩০শে মার্চ্চ, ক্লাইভের বক্তৃতা) আপনারা ২৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাবেন। শীঘ্রই ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এখনই সামরিক ও অসামরিক কাজে ৬০ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় হবে না। (ক্লাইভের চিঠি, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৭৬৫)।

ক্র্যাফটন লিখেছেন যে, পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ থেকে ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং ইংল্যাণ্ডে লুণ্ঠতরাজ করে আনার ফলে কোম্পানী তিন বৎসর ধরে ব্যবসা চালিয়েছেন বিনা পুঁজিতে এবং তাহা বিদেশী কোম্পানীদের পাওনাও পরিশোধ করেছেন। ক্লাইভ সঙ্গে করে ২৫০০০০ পাউণ্ড এনেছিলেন ও ভারত থেকে তাঁর নিজস্ব জমিদারী বাবদ বাৎসরিক ২৭০০০ পাউণ্ড পাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাইভের উপরোক্ত চিঠি থেকে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বর্ণনা থেকে বাংলার জনসাধারণ যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হয়েছিল তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বর্ত্তমান যুগের মুদ্রার মূল্যে হিসেব করলে এই লুণ্ঠনের অঙ্ক ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে। মেকলে সাহেব ও ক্লাইভ, হেষ্টিংসের বাঙ্গালী অনুচরদেরই বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি মনে করে তাদের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছেন তার শতগুণ বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছে পররাষ্ট্রলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীদের চরিত্রে। ক্লাইভ, হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত চুরি বন্ধ করার চেষ্টা করা হলেও জাতিগতভাবে এই শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে রইল জনসাধারণের ওপর জগদ্দল পাথরের মত। ফলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে দিন বুভুক্ষু নর-নারীর শবের পূতি গন্ধে সারা দেশ ছেয়ে গেল সে দিনও এই লোভাতুরতার হাত থেকে দেশবাসী মুক্তি পায়নি। এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হল, আর এক তৃতীয়াংশ দেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য জঙ্গলে পরিণত হল। ১৭৭০ সাল থেকে যে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তার চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। হেষ্টিংস লিখেছেন যে এক তৃতীয়াংশ দেশের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলেও খাজনা আদায় ১৭৬৮ সালের চেয়ে ভালই হয়েছে "খাদ্য শস্যের গোলা, বাণিজ্যের ও শিল্পের প্রাচ্যের কেন্দ্র বাংলা ২০ বৎসরের মধ্যেই শ্মশানে পরিণত হয়েছে"—এ কথা লিখেছেন একজন ইংরাজ ১৭৮৭ সালে।

মণীষী বার্ক, হেষ্টিংসকে পার্লামেণ্টে বিচারকালে তাঁকে বিসূচিকা রোগের সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বৃটিশ শাসনের কুশাসনকে ব্যাঘ্রের হিংসাপরায়ণতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি অত্যুক্তি করেছিলেন বলে মনে হয় কি? ভারতে বৃটিশের এই ভয়াবহ দুঃশাসনের শোষণের প্রতিবাদ করার জন্যে বার্ক, ব্রাইট, মহামতি এ্যাণ্ড্রুজ ইংরেজ জাতের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছেন। একথা ভেবে আমরা কিছুটা সান্ত্বনা পাই। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনা যে, কোম্পানীর মারফতে ইংরেজ জাত যখন তার লুঠের অংশ দিয়ে স্বদেশের জনসাধারণকে শিল্প বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে তখন সে ভারতের শিল্পকে ধ্বংস করে সারা দেশের ধ্বংসে আত্মনিয়োগ করেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব্ব বিপ্লব দেখা দিল তা Brooks Adams-এর লেখা থেকে, Palme Dutt তাঁর India to-day-তে উদ্ধৃত করেছেন আধুনিক যুগের মাকু, বোনার কল, শক্তিচালিত তাঁত, বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি যুগান্তকারী যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল এই সময়ে। তিনি বলেছেন "Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder, because for nearly fifty years Great Britain stood without a Competitor." কিন্তু কোম্পানীর এই লুণ্ঠনে স্বদেশী প্রতিযোগীরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠল Adam smith তাই লিখলেন "Such exclusive Companies are nuisances in every respect, always more or less inconvenient to the Countries in which they are established & destructive to those which have the misfortune to fall under the Government."

ফক্স, বার্ক, শেরিডন সেদিন কোম্পানীর নিন্দাবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে দিয়ে বঞ্চিত স্বদেশবাসীদের মনের কথাও প্রকাশ পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে যে বন্দোবস্ত তাঁরা কায়েম করলেন, তাতে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থাই করা হল। শাসনের নামে শোষণের জয়রথ যেদিন ভারতের

ওপর দিয়ে চলেছিল ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা সব কিছুই সেদিন তার রথের চাকায় পিষ্ট হয়েছিল।

১৮৪০ সালের পার্লামেন্টারী এনকোয়ারি কমিটির বিবরণে প্রকাশ পেয়েছে যে বিলিতি পণ্যকে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সুতি বস্ত্রের ওপর শতকরা ১০৲, রেশমের ওপর শতকরা ২০৲ এবং পশমের বস্ত্রের ওপর শতকরা ৩০৲ টাকা কর ধার্য্য করে বিলাতি বস্ত্রব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষা করেছিল, আর Navigation Act মারফৎ ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা হয়েছিল, নিজেদের এক চেটিয়া অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

১৮১৩ সালের সাক্ষ্যে বলা হয়েছে যে, বৃটিশ বাজারে ভারতের তুলার ও পশমের বস্ত্র অনুরূপ বিলিতি বস্ত্রের চেয়ে শতকরা ৫০৲, ৬০৲ টাকা কম মূল্যে বিক্রী করেও ভারতের লাভ থাকত, তাই শতকরা ৮০৲ টাকা কর স্থাপন বা সরাসরি ভারতীয় বস্ত্র আমদানী নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে এর ওপর ভারত সরকারের চাপান করের বোঝাও ছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থে ভারতীয় তাঁতীদের উৎসাদনে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা করেছিলেন বহুনিন্দিত বিলিতি বস্ত্র বর্জ্জনের আন্দোলনে ভারতীয়েরা কি অনুরূপ ঈর্ষাপরায়ণতা দেখিয়েছে? নীল করের অত্যাচার, তাঁতীদের আঙুল কাটার গল্প আজও বাংলাদেশে শোনা যায়। মনে হয় যে সুসভ্য দেশের অসভ্য অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না।

১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকার মসলিন ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছিল। কাঁসা, পেতল, লোহা সব শিল্পেই শিল্পীদের অভাব দেখা দিয়েছে ১৯০৯ সালে। ভারতীয় শিল্পের ওপর এই সর্ব্বাত্মক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষকে শুধু মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা সম্মত ভাবে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হল।

শিল্প বিপ্লবের নবযুগের সঙ্গে তার পরিচয় ব্যাহত করার জন্যে পদে পদে সাম্রাজ্যবাদ যে বাধা রচনা করলে তা' আজও প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি স্তরে। ভারতীয় পরাধীনতার সমস্যা বুঝতে হলে এই দিকে দৃষ্টিপাত করার সবিশেষ প্রয়োজন আছে।

ক্রীতদাস ব্যবস্থা উঠে যাওয়াতে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে চা বাগান, রবার, কাফি প্রভৃতি ব্যবসায়ে পুজি নিয়োগ করে দাস ব্যবস্থা নতুন করে প্রবর্ত্তন করেছে। ফলে যারা বস্ত্র প্রস্তুত করে তাদের শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করত, তারা তুলা চালান দিয়ে জীবনধারণ সুরু করলে, শালকর পশম চালান দিয়ে আত্মরক্ষা করলে। তৈল বীজ, চামড়া খনিজসম্পদ বিবিধ কাঁচা মাল নামমাত্র মূল্যে চালান দিয়ে ভারতবাসী তার দুর্ভাগ্যের পেয়ালা পূর্ণ করেছে।

সিপাই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তা বোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। হৃতসর্ব্বস্ব ভারতীয় জনসাধারণের সমাজ ব্যবস্থায় যে ওলট পালট সুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সেই ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্যেই এই বিস্ফোরণ ঘটল। সাম্রাজ্যবাদ সেদিন তার বিপদের সঙ্কেত বুঝে নতুন রূপে নিজেকে সংগঠিত করে নিলে। কোম্পানীর হাত থেকে নিজেই শাসনভার বুঝে নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট একচেটিয়া ভারত শোষণ বন্ধ করে প্রতিযোগীদের মুখ বন্ধের ব্যবস্থা করলে, এবং এই শোষণ ব্যবস্থাকে বহু নামের নামাবলীতে ঢাকা হয়েছে। তুরস্কের সুলতান সপারিষদ ইংলণ্ড পরিদর্শন করতে এলে তার জন্যে যে নাচের পার্টি দেওয়া হয় এবং ভূমধ্যসাগরে সৈন্য রাখারও চীনের দূতাবাসের খরচা এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাবার ব্যয় প্রভৃতিও ভারতের কাছে আদায় করা হত। ইংলণ্ড ভারত থেকে Home Charge বলে একটা বিরাট অঙ্কের পাওনা আদায় করে। তাতে শুধু ১৯৩৩-৩৪ সালে যথাক্রমে ২৭০৫ লক্ষ ও ৬৯০৭ লক্ষ পাউণ্ড বলে হিসেব দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেনি, তাই যুদ্ধের সময় ১৬০০ কোটি টাকা দেনা বলে ভারতীয় জনসাধারণকে বঞ্চনা করে আদায় করা হয়েছে এবং তাও তামাদি করার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের কাছ থেকে লুণ্ঠন করা অর্থের অংশ ভারতে খাটিয়েছে। ভারতের শোষণ ব্যবস্থার এই দিকটা মিঃ ব্রেলস ফোর্ড তাঁর property or peace বইতে লিখেছেন যে ৭০০ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন ভারতে খাটছে। কয়লার খনিতে লগ্নী করা টাকা থেকে তারা শতকরা ১২০ টাকা লাভ পেয়েছে, কিন্তু শ্রমিকদের মাত্র তাদের ৮ পেন্স দিতে হয়েছে। ৫১টা চটকলের মধ্যে ৩২টাই ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ পর্য্যন্ত শতকরা ১০০ টাকা লাভ বণ্টন করেছে, বাকী গুলোর লভ্যাংশও বিস্ময়কর। এই চটকলগুলোর লাভ, শ্রমিকের মোট মজুরির ৮ গুণ বেশী হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের যখন তারা ৮ পাউণ্ড দিয়েছে তখনই তারা স্কটল্যাণ্ডে অংশীদারদের দিয়েছে ১০০ পাউণ্ড। এই শোষণের তুলনা আছে কি? তাই চা বাগানের অত্যাচারের কথা প্রকাশে ও ডিগবয়ের ধর্ম্মঘটের কথা শুনে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আধুনিককালের ক্লাইভেরা উন্মত্ত হয়ে ভারতবন্ধু ষ্টেটসম্যান মারফৎ কংগ্রেস গভর্ণমেন্টকে 'Criminal Govt' বলে গাত্রদাহ মিটিয়েছিল। এই সব ব্যবসায় নিযুক্ত শ্রমিকদের কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে তাদের কথা বলার লোভ সংবরণ করতে হল, কিন্তু যাঁরা এদের জীবনযাত্রার প্রহসন প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা জানেন যে কি দুর্গতির মধ্যেই তারা দিন কাটাচ্ছে। একদিকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের বিলাস বহুল জীবনযাত্রার মহা-সমারোহ, আর তার পেছনে রয়েছে আদিম যুগের অন্ন বস্ত্রহীন নরনারীর ভীড়। এ যেন প্রাসাদবাসীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য প্রাসাদের পাশে দরিদ্রকে কুটীর নির্ম্মাণে বাধ্য করে নির্লজ্জ ধনীর আত্মমহিমা প্রকাশের অশোভন আত্মম্ভরিতার উগ্র উন্মত্ততা।

ভারতের নামে প্রথম ১৮৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩ কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমশ তা বৃদ্ধি করে একটা বিরাট অঙ্কে পরিণত করা হয়। শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্র জারের আমলের ঋণ অস্বীকার করায় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টায় যারা তৎপর হয়ে উঠেছিল, তারা তাই ভবিষ্যতের ভয়ে ভারতের কাছ থেকে সব পাওনা আদায় করে নিয়েছে। খালি ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংএর বেলায় তারা ফিকির খুঁজছে। ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে কি বিরাট বঞ্চনা করেই

না এই টাকা আদায় করা হয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যারা মরেছে তাদের অস্থিও চালান দেওয়া হয়েছে। রক্ত-পিয়াসী সাম্রাজ্যবাদের নির্ম্মমতার তুলনা আছে কি? ভারতের রেলপথ বিস্তারের প্রসঙ্গে লর্ড ড্যালহৌসি খোলাখুলি ভাবে বলেছিলেন যে রেলপথ বসাবার উদ্দেশ্য এই যে, সহজেই ভারত থেকে কাঁচা মাল রেলপথ-যোগে ভারতের বন্দরগুলোয় নীত হবে ও বিভিন্ন বিলিতি মালে ভারত ছেয়ে যাবে; তা ছাড়া সামরিক কাজে এর প্রয়োজনও তাদের লক্ষ্য ছিল। ভারতে প্রস্তুত জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে তারও ধ্বংস সাধনের ইতিহাস আধুনিক লেখকরা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। ১৮৬৩ সালেও বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ বোম্বাই বন্দরে নির্ম্মিত হয়েছে; পরে স্যার রবার্ট পিলের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট রচিত হয় তাতে অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করে ভারতের জাহাজী কারবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়। জাহাজী কারবারে সিন্ধিয়া কোম্পানী যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তা আজ ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত নেই। দেশের অভ্যন্তরে আজও বিদেশী কোম্পানীর ষ্টীমার চলাচল করছে। ভারতের উপকূলে আজও স্বদেশী জাহাজী কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি তার কারণ বৃটিশ জাহাজী কারবারের প্রতিকূলতা। সারা পৃথিবীর জাহাজী কারবারে ভারত পেয়েছে মাত্র ·২৪ ভাগ, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের ভাগে রয়েছে ২৪ ভাগ। ভারতের শোষণ মুদ্রানীতি ও বাট্টানীতির মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ১৯২৬ সালে স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস টাকাকে ১ শিলিং ৬ পেন্স হারের নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে বলেছিলেন যে এই ব্যবস্থায় ভারতীয় উৎপাদনকারীরা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করবে। ৪/৫ অংশ অধিবাসীর পেশা কৃষি, আর তারাই এর কবলে পতিত হবে। তাই বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ভারত ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপের অনুকরণের কোন পথ না পেয়ে ২০৩০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা বৃটেনকে দিয়েছে। তারপরও ২৪১০ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সে আর শিল্প স্থাপনা করে বৃটেনের প্রতিযোগী হতে না পারে। এর সঙ্গে আমরা যদি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে ভারতের যুদ্ধ ব্যয় জুড়ে দিই, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে দেশবাসী বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে কেন? এই খাতে যে ব্যয় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিসেব আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি কমিটির হিসেবে ভারতীয় কৃষি ঋণ ১৯২৯ সালে ৯০০ কোটি টাকা ছিল। দশ বৎসর বাদে এই ঋণ ১৫০০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক রঙ্গ তাই মোরেটারিয়াম ঘোষণা করে তাদের রক্ষার জন্যে সবিশেষ আবেদন করেছিলেন। সে আবেদনে সাম্রাজ্যবাদের আমলারা কোন সাড়া দেয়নি। জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ এই কৃষককুলের জীবিকার্জ্জন আজও দুরূহ সমস্যা হয়ে রয়েছে। স্বদেশী বিদেশী পরভূকদের হাত থেকে এদের মুক্তিলাভ সম্ভবপর না হলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকবে না, এ কথা আজ সকলকেই বুঝতে হবে।

বিদেশী লেন-দেন, মুদ্রা বিনিময় এই সব কাজে আজও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পেছনে পড়ে আছে। অটোয়া চুক্তির দলিলের মত যে কোন দলিলে সই করিয়ে নেওয়ার দিন আজ শেষ হয়ে এসেছে, তা' প্রমাণিত হল সম্প্রতি প্রত্যাগত ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের বিবৃতিতে।

ভারতের খনিজ সম্পদের লুণ্ঠন বন্ধ না করতে পারলে আমাদের সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে এ কথা স্যার বিঠলভাই দামোদর থ্যাকার্সে বলেছেন বহুদিন পূর্ব্বে। এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একথা উল্লেখ করছি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণকে শোষণের উদ্দেশ্যে যে পথ বেছে নিয়েছে তা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুরু থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করে ভারতীয় সমস্যাকে বিকৃত করার চেষ্টায় কোন ক্রটিই করা হয়নি। পরলোকগত নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সরকার-পরিচালিত দাঙ্গা বলে অভিহিত করেছিলেন কর্ত্তৃপক্ষ এই অভিযোগের কোন উত্তরই দিতে পারেন নি।

পরিশেষে আমরা জানাচ্ছি যে ভারতের শোষণকে অল্পে প্রকাশের চেষ্টা সম্ভবপর নয়। এই শোষণ প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে। খাদ্য, বস্ত্র, সভ্যতা সকল বিষয়েই যে অভূতপূর্ব্ব দারিদ্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে তার মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যিক শোষণ। এই শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতাকে সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ দেবার গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীয়দের অন্যতম কর্ত্তব্য বলে পরিগণিত। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়পুষ্ট শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য লোপও এই সংগ্রামের অন্যতম কর্ম্মসূচি। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাঁর সভাপতিত্ব কালে সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী রূপ পেয়েছে সেই মুক্তি সংগ্রামব্রতী নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle-এ লিখেছেন পরিষ্কার ভাষায় "ভারতের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ভর করবে সেই দলের ওপর—যার মতবাদ, কর্ম্মসূচি ও কাজের পরিকল্পনায় কোনো গোঁজামিল থাকবে না—যে দল শুধু স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেই ক্ষান্ত হবে না, যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে কার্য্যকরী করে তুলবে।—যে দল ভারতের পরম অভিশাপ তার একাকীত্ব ঘুচিয়ে জাতি-সঙ্ঘের মধ্যে তাকে আনবে···যার গভীর বিশ্বাস থাকবে যে ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা রয়েছে বিশ্ব মানবের সঙ্গে।"

দিগম্বর

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

মানভূমের পার্বত্য অঞ্চল। মাটিহীন প্রস্তরময় ময়দান—শুষ্ক মাঠ আর নগ্ন পাহাড়—ছন্নছাড়া ভিখারীর মত এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটার গায়ে দু-চারটা পলাশ, আবার কোনোটা সম্পূর্ণ দিগম্বর। দূরে দূরে চারিপাশেই অবস্থিত শৈলশ্রেণী—সবুজ সীমারেখা দিগন্তে মিশে আছে। দেখলে মনে হয় এইটুকুই হয়ত জগৎ। এই পরিবেষ্টনের মধ্যেই আবার জেগে উঠেছে ঘন পলাশ জঙ্গল। এক সময় এখানে নাকি শালেরই বন ছিল, আজ সে শালের চিহ্নও আর দেখা যায় না। পলাশ—শুধু পলাশ। বসন্ত যখন ধরায় নামে—তখন আগুন লাগে পলাশ বনে। লালে লাল হ'য়ে উঠে বনভূমি। বিটপীর শীর্ষে শীর্ষে শাখায় শাখায় রক্তরাঙা তুলির স্পর্শ, সভা বসবার আগে বিছিয়ে দেওয়া লাল গালিচার মত। এই পলাশ জঙ্গলেরই সীমান্তে ছোট্ট জলস্রোত ব'য়ে চলেছে। এখানের মানুষ এটাকে বলে, "বীর কাড়া" (বনের ছোটনদী)। প্রবহমান জল কঠিন মাটির আবরণ উন্মোচন করে প্রকাশিত ক'রে দিয়েছে শিলাসন। দীর্ঘ পরিধি—বিশাল আয়তন! অপ্রশস্ত আঁকা-বাঁকা নদীটির অপর পার্শ্বে উচ্চ মালভূমি। এখানেও হয়ত এককালে শালবন ছিল। তারই কয়েকটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এখনো দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ নাকি—ঐ সব গাছে এখানের অধিবাসী যারা তাদের দেবতা থাকেন। লোকে বলে "বঙা-বঙির" (সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা দম্পতি) থান। বঙা-বঙির থানেরই সংলগ্ন ক্ষুদ্র পল্লী, নাম "লাফুড্ডি"। এদের পূর্বপুরুষ লাফু কোন এক অখ্যাত দিবসে এখানে এসে প্রথম বাসা বেঁধেছিল—তাই তার নামেই পল্লীটার নামকরণ করা হ'য়েছে। কে এই নামকরণ কল্লে, তার কোনো ইতিহাস নেই। ছোট ছোট মেটে চালাঘর; গোবর মাটির প্রলেপ দেওয়া চালাঘরের দেয়ালগুলো। শুধু তাই নয়—খড়পুড়িয়ে তার ছাই দেয়ালের গায়ে গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে আবার প্রলেপ দেওয়া হ'য়েছে, দেখলে মনে হয় সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো! চক্ চক্ করছে—চোখ জুড়িয়ে যায়। শান্ত সমাহিত পল্লীর আবহাওয়া—কোলাহল নেই, আধুনিক যান-বাহনের উৎপাত নেই। দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর লাফুড্ডির সাঁওতালদের জীবন। বনের কাঠ কেটে পাতা এনে "থালা" (দোনা) বানায়, লাঙলের ফলা দিয়ে কঠিন মাটির বুক চিরে অনুর্বর জমীকে উর্বর করে তুলে—চাষ করে, ফসল ফলায়। শ্রমের বিভাগ নেই কর্তব্যের বাঁধা-ধরা "রুটিন" নেই। ভোরে যখন ঘরের মুর্গিগুলো একস্বরে প্রভাতের সূচনা জানিয়ে দেয়, তখন এরা শয্যা ত্যাগ ক'রে যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ে।

সেদিনও হ'য়েছে ঠিক তাই। মোরগের প্রভাত-জ্ঞাপন শব্দে বিছানা ছেড়ে মংলী কাঁকে ঝুড়ি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বঙা-বঙির থানে প্রণাম করে এসে দাঁড়ালো "বীর কাড়া'র শিলাসনে। আকাশের গা লাল হ'য়ে উঠেছে তখন। বনানার অন্তস্থল হ'তে টিয়া ময়নার প্রভাতীসুরে বন্দনা গান ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে; আর তারই সাথে মধুর কোমল সুরে গাইতে গাইতে ছুটে চলেছে "বীর কাড়ার" জল স্রোত। ধীর শান্ত সে গতি! মংলী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো স্বচ্ছ জলস্রোতের পানে তাকিয়ে; তারপর গায়ে একটু উত্তাপ লাগতেই বন থেকে দাঁতন ভেঙে এসে বসলো শিলাসনের উপর প্রবহমান জল তরঙ্গের পাশে।

মংলী!

মংলী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো গারগু—তারই সমবয়সী গারগু। অনাবৃত কালো দেহ, চিকন কালো ঐ দিগম্বর পাহাড়টার মতো। বাহু আর বক্ষদেশের সুস্পষ্ট মাংসপেশীগুলো অচঞ্চল। সেই অনাবৃত দেহটার উপর পড়েছে সূর্যের প্রথম কিরণ! গারগুর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ (তীর ধনুক), আর হাতে কোদাল। সে জিগ্যেস কল্লো, বিদায়াম্ আ আব্ সায়াব কানায়া? (তোর কাঁধে কাঁড়-বাঁশ কেন)

গারগু এ প্রশ্নের আর কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো। মংলীর দাঁতন করা হ'য়ে গিয়েছিল, হাত মুখ বেশ ক'রে ধুয়ে উঠে দাঁড়ালো ঝুড়িটা নিয়ে।

—ঝুড়ি কেনে? গোবর কুড়াবি নাকি?

হুঁ মংলী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলো, হাঁ তাই করবে।

মাঠ থেকে ধান কাটা হ'য়ে গেলেই ক্ষেতের মাটিকে উর্বরা করবার জন্তই এরা পৌষ মাস থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে গোময় সংগ্রহ ক'রে ক্ষেতে জমা করে রাখে। এ গোময় এদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার। বেশী সার দিলে বেশী ধান হ'বে।

গারগু একেবারে মংলীর নিকটে এসে বল্লো, চ কেরে আমার সঙে ছুটি মাটি ফেলে দিবি? যাবি?

মংলী এক কথাতেই রাজী ল'য়ে গেলো।

তারা দু জনে এক সঙ্গে এসে উঠলো বনের মধ্যে। তখন বিহঙ্গমদের ঐক্যতানের বিরাম ঘটেছে, কিন্তু সুরটা তখনো মিলিয়ে যায়নি। এক একটা পাখী মনের আনন্দে বনের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে গিয়ে বসছে—যেখানে দু চারটা সমগোত্রীয় পাখী কলরব করছে, প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রতিবেশীর খবরাখবর নিতে যাওয়াও যেন তাদের কর্তব্য। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে স্থানটা আছে ভরে। অপূর্ব পরিবেশ! গারগু এক গুচ্ছ কুড়চি ফুল তুলে স্তবক ক'রে গুঁজে দিল মংলীর এলায়িত খোঁপায়। মংলী গারগুর দিকে তাকিয়ে এক টুকরো হাসলে। খুশির আতিশয্যে গারগু গেয়ে উঠলো :—

বীররে বাহাও কানা
চেঁড্যা রাএলা,
সাগরত্যা দাউতু বালা কানা
মংলী হন্ তুলুং দেলাম বেলা কানা।

বন ছাড়িয়ে তারা এসে দাঁড়ালো অনুর্বর কঠিন মাটির উপর, যেখানে বনের শ্যামলিমা হারিয়ে গেছে গৈরিক মাটির প্রভাবে। এই স্থানেরই খানিকটা অংশ কেটে গারগু ক্ষেত তৈরী করবে, খানিকটা মাটি কাটা আছে আরো "চুরা" (দশ ফুট্ স্কয়ার ও এক ফুট গভীর কাটা অংশ) পাঁচ মাটি কাটলেই সুন্দর ক্ষেত হ'বে।

গারগু কাঁধের কাঁড়-বাঁশ নামিয়ে রেখে মংলীকে বল্লো, ভঁাডা তোলমে চালা হোরত্ত মেৎ। (নে কোমর বাঁধ) মংলী ঝুড়িটা গারগুর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্লে, আগে তুই ঝুড়ি ভর।

গারগু শক্ত হাতে কোদাল চালাতে আরম্ভ করলে। ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি পরাজয় স্বীকার করলে গারগুর কাছে। আত্ম-সমর্পণ করলে সৃষ্টির আদিম মানবের বংশধরের বাহুবলের নিকট।

বেলা বেড়ে উঠেছে। প্রভাতের বালারুণ এখন পরিপূর্ণ যৌবনের সীমানায়। সূর্যতাপে পাথর-মাটি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আরো বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে পাহাড়ের নগ্ন দেহটা।

মংলী মাথা থেকে ঝুড়ি নামিয়ে বল্লে, উঃ বড় ধূপ!

—দেলা না নিউইস্তয়াদা, (চল জল খেয়ে আসি)

—দেলা। (চল্)

গারগুও মাটি কাটতে কাটতে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে। সারা গা ভিজে গেছে ঘামে। তারও জল পিপাসা পেয়েছে। তাই সম্মত হ'য়ে গেলো মংলীর প্রস্তাবে।

মাঠের কাজ শেষ করে যখন তারা ঘরে ফিরে এলো তখন সূর্য পাটে বসবার আয়োজন করছেন। গ্রামে ঢুকে দেখলে তাদের ভূস্বামীর গোমস্তা পাঁচকড়ি গ্রামের মাতব্বরদের জমা ক'রে কি সব বলছে। গারগু আর মংলী তাদেরই এক পাশে এসে দাঁড়ালে।

পাঁচকড়ি গারগুকে দেখে বল্লে, কিরে যাবি তুই?—কুথা? জিগ্যেস্ করলে গারগু।

পাঁচকড়ি আপনার পেট থাপড়ে বল্লে, উপোসে মরতে হবে না, আর অমন টেনাও পরতে হ'বে না। বল যাবি ত—টাকা পাবি মোটা, চাল পাবি, কি হ'বে মাঠে কোদাল চালালে? সারা বছর খেটে পাবি ত মোটে পলি কতক চাল, তাতে পেটও ভরে না। শুধু খাটাই সার হয়!

পাঁচকড়ির এক বর্ণ কথাও গারগু বুঝলে না। সে বল্লো, কুথা যাব ঠেকুর বল্।

—ঐ দিগম্বর পাহাড়ীটায় কাজ হ'বে—খাটবি ঐ খানে? হাজরি পাবি অনেক।

—কি কাজ?

—পাথর কাটা।

—কত দিবি?

—এক টাকা হাজরি—আর কামিনের দশ আনা।

—কাল আসবি, বলব।

—আচ্ছা তাই আসব। চলে গেলো পাঁচকড়ি।

অনাগত কালের অলীক সুখের ছবি তুলে ধরলে পাঁচকড়ি এদের সামনে। প্রলোভনের জাল ফেলে এদের সে ধরতে চেষ্টা করলে। সে জালে অবশ্য ধরাও পড়লো অনেকে—গারণ্ড, মংলী, শুকার বৌ, শুড়মা। তারা এলো মাঠ ছেড়ে পাহাড়ে। কোদাল ছেড়ে ধরলো গাঁইতি আর ঝড়া।

এত কাল তারা যুদ্ধ করে এসেছে বৈরাগী মাটির সঙ্গে। আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত ক'রে পরাজিত করেছে উপল-সর্বস্ব কঠিন ভূমিকে। তারা কোথাও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু ঠিকাদারের কাজে হাত দিয়ে তারা যেন প্রথম পরাজয় স্বীকার করে।

দিগম্বর পাহাড়টা তাদের জমীদারের। জমীদার পাহাড়টা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন ঠিকাদারকে। পাহাড়ের পাথর কেটে চালান হ'বে দূরে—যেখানে এরোড্রাম তৈরী হ'চ্ছে—মিলিটারী রোড্ তৈরী হচ্ছে।

সকাল হ'তে কাজ চলে। দ্বিপ্রহরে আধ ঘণ্টার জন্ত কুলি মজুরদের ছুটি মিলে খাবার। তারপর আবার কাজ চলে সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত। গারণ্ড শক্ত মুঠিতে গাঁইতি ধ'রে সজোরে পাথরের উপর বসিয়ে দেয়, গাইতির ফলা কখনো কখনো ছিটকে আসে। নির্জিব পাথরগুলো সজীব হ'য়ে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে—লোভী স্বার্থপর মানুষের বিরুদ্ধে। গারণ্ড বিদ্রোহী পাথরগুলোর কাছে পরাজিত হ'য়ে যায়। আঘাতের পর আঘাত ক'রেও একটা কণাও সে ছাড়াতে পারে না। মাথা থেকে ঘাম ঝরে—সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ঘন ঘন ভারি নিঃশ্বাস পড়ে, বুকের মাংসপেশীগুলো তারি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামা উঠা করে। ক্লান্ত গারণ্ড গাঁইতি রেখে বসে পড়ে। কিন্তু ঠিকাদার ঐ আধ ঘণ্টা ছুটি বাদে আর এক মুহূর্তও বিশ্রাম দিতে রাজী নয়, তাই ধমক দিয়ে বলে, এই বসলি কেন? এ কী আরাম করবার জায়গা? উঠ্ ধর গাইতি। নিরুপায়, আবার গাঁইতি ধরতে হয়—আবার পাথরের বুকে আছাড় মারতে হয়।

মংলার জন্ত তার ভাবনা হয় বেশী। তার কথাতেই মংলী এখানে এসেছে। তাকেও এমনি পরিশ্রম করতে হয়। সূর্যোদয় হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিশালকার পাথরগুলোকে হাতুড়ির ঘায়ে খণ্ড খণ্ড (রবল) করতে হয়; তারপর সেই বিখণ্ডিত উপল—জমা ক'রে সাজিয়ে রাখতে হয় ঠিকাদারের "হাটের" পাশে। খাটতে খাটতে সে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। মুখের সে সজীবতা আর নাই;—গলার হাড়গুলো পর্যন্ত উঁকি মারতে শুরু করেছে। কাজ নাকি মংলী বেশ ভাল করে—কাজে ফাঁকি দেয় না। ঠিকাদার তার উপর তাই বেশ সন্তুষ্ট। শুকার মা আর শুড়মাকে এ দুদিন কাজে লাগিয়ে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বুড়ো-বুড়ি, শক্ত কাজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দ্বারা হবে না।

মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা আসে। সারা আকাশের গায়ে আবীর ছড়িয়ে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে আত্মগোপন করেন। দূরে ঐ বনানীর পাতায় অস্তগামী রবির রংয়ের পরশ লাগে—বিহঙ্গের কণ্ঠে কণ্ঠে সান্ধ্য বন্দনা গান মুখর হ'য়ে উঠে। কুলি-মজুর-কামিনের দল এসে সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঠিকাদারের "হাটের" সামনে। এক এক করে নাম ডেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সত্যনারায়ণের প্রসাদ নেওয়ার মত সকলে হাত পেতে গ্রহণ করে দৈনিক মজুরী। তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যায় আপন আপন আস্তানার পানে।

সেদিনও কুলি-কামিন মজুরের দল সমবেত হ'য়েছে ঠিকাদারের কুটীরের দ্বারদেশে—দৈনিক মজুরী নেওয়ার জন্ত। প্রত্যহের মত সেদিনও ঠিকাদারের লোক এক এক করে নাম ডেকে যায়—বিন্নু বাগ্‌দী একটাকা, লোখু বাউরী আজকার একটাকা আর কালকার বাকী আট আনা, গদাই একটাকা, গারণ্ড এক টাকা, সীতা দশ আনা, মংলী আট আনা—নে নে ধর, হাত পাত। তাড়া দিয়ে উঠলো ঠিকাদারের মুহুরী।

মংলী মুখ গম্ভীর করে বল্লো, না আট আনা পুইসা কেনে লিব? সারা দিন খাটলুম।

—কি খেটেছিস? সারাদিনে তিরিশ ঝুড়িও পাথর বইতে পারিস নাই! ধর—

দুটো ছোট ছোট গোলাকার সিকি মুহুরি ছুঁড়ে দিলো মংলীর গায়ে।

মংলী সিকি দুটো কুড়িয়ে মুহুরীর সামনে "ফিকে" (ছুড়ে) দিয়ে বল্লে—মিছা কথা কেনে বুলছিস্?

সারাদিনে আড়াই কুড়ি ঝুড়ি বইয়াছি। না লিব নাই আট আনা।

টানা টানা আয়ত চোখ দুটো উঠলো জল জল করে তার। দুলে উঠল সর্বাঙ্গ। বাহুর উপর অসংযত বস্ত্র খসে পড়লো।

ঠিকাদার মুহুরীকে বল্লেন, ওকে একটা টাকাই দাও। মুহুরী একটা টাকার একটা নোট তার হাতে দিয়ে বল্লো—নে ধর!

ঠিকাদার বল্লেন, কি খুসি হ'য়েছিস্?

মংলীর মুখে দেখা দিলো হাসি। মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি চক্ চক্ করে উঠলো।

দেখতে দেখতে দিগম্বর পাহাড়ের অর্দ্ধেকটা অঙ্গ খসে পড়লো—উচ্চতা আর তার থাকল না। সমতল হ'য়ে গেলো প্রান্তরের সঙ্গে। লাকুড্ডির ঘর বাড়িগুলো —আর রেল ষ্টেশনের পাকা ইমারত পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পেলো। তাদের মধ্যিখানের প্রাচীর ধ্বসে পড়েছে! লাকুড্ডির সীমান্তে কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত চব্বিশ প্রহর দণ্ডায়মান থেকে যে বীর বহিঃশত্রুর হাত হ'তে রক্ষণ করে এসেছে লাকুড্ডির মানুষগুলোকে—সেই বীর আজ ধরাশায়ী, প্রতিপক্ষের বলে ক্ষত বিক্ষত তার অঙ্গ। শুধু তাই নয়, লুব্ধ শকুনি আজ তার অঙ্গের মাংস-পিণ্ড কুরে কুরে তার ধারাল দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে।

গারগু গাঁইতি রেখে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল কতকালের পাহাড় এটা, এর গায়ে কেউ কোনোদিন পদাঘাত করতে সাহস করেনি, কিন্তু আজ তা অস্ত্রাঘাতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে বসেছে। এর জন্যে তাদের অভিশাপ পেতে হ'বে। মনে পড়লো তার, তাদের মাতব্বর নিমাইএর কথাগুলো—ওরে উথেনে দেবতা থাকে, দেবতার গায়ে "গাঁং" (গাঁইতি) মারলে—লাকুড্ডির মানুষগলা সব মরে যাবেক। যাস্ না—উথেনে কাজ করতে যাস্ না! সেদিন গারগু এ কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু আজ আর না বিশ্বাস করে উপায় নেই। প্রথম হয়ত সে-ই মরবে। শুকার মা বুঝি পোরগু মরে গেছে —হয়ত এই পাপেই—

এই বসে বসে কি ভাবছিস্। উঠ্ মাটির তল থেকে সাদা সাদা পাথরগুলো বের করতে হবে। ওগুলো ভাল পাথর।

গারগু উঠলো।

—তোরা সব গাল-গল্প করবার জায়গা পেয়েছিস্ নাকি? আজ আর সব কামিনের পাথর ভেঙে কাজ নেই। মংলী ঐ-যে ছোট ছোট পাথরগুলো পড়ে আছে ওগুলো ঝুড়িতে কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখ পাথর গাদায়।

ঠিকাদারের কর্কশ কণ্ঠ আর শোনা গেল না। গারগু তাকিয়ে দেখলো ঠিকাদার চলে গেছে, আর মংলী গারগুর পায়ের নীচের পাথরগুলোকে কুড়িয়ে ঝুড়িতে ভরছে।

দাঁড়া আমি ভরে দিছি। গারগু বল্লো।

গারগু ঝুড়ি সাজিয়ে দিলো—মংলী দিয়ে এলো সেই ঝুড়ি ভর্তি পাথর গাদায় ফেলে। এক দুই তিন—চার—পাঁচ—দশ—পনেরো—। মধ্যাহ্ন ঘনিয়ে এলো, মধ্যাহ্নের পর বেলা শেষের করুণ রক্তিমা ফুটে উঠলো। কিন্তু কই মংলী সেই যে ঝুড়ি নিয়ে গেল আর ত ফিরল না। সে কপালের ঘাম মুছে কপালের উপর হাত রেখে তাকিয়ে দেখলো মংলী আসছে কি না—কিন্তু কই তার দেখা মিলল না। উচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আবার ভালো করে আসবার পথটা—উন্মুক্ত প্রান্তরটা দেখে নিলে সে, কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবে সে গেল কোথা? সে গাঁইতি ফেলে চল্লো পাথরের গাদার দিকে। কিছু দূর এগিয়ে এসে দেখলে ঠিকাদারের "হাটের" দরজার ফাঁকে কার শাড়ির প্রান্ত দেখা যাচ্ছে। ভালো করে পরীক্ষা করলো শাড়ীর পাড়টা—চেনা চেনা মনে হয় শাড়িটা! তবে কী—

ক্ষিপ্রপদে সে ছুটলো কুটীরের পানে।

—ছাড় ছাড় বলছি—হাত ছাড় বলছি!

থমকে দাঁড়ালো গারগু। মংলীর গলার সুর!

—তুই যা চাইবি তাই দিব। কাপড় টাকা আরো অনেক জিনিষ—

ঠিকাদারের কলুষিত দৃষ্টি, ঘৃণিত প্রলুব্ধ প্রস্তাব। গারগু আর স্থির থাকতে পারলে না। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। যা কল্পনা করেছিল

তাই দেখল সে। ফেলে আসা জীবনের স্তিমিতপ্রায় চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। বন্য পশুর সঙ্গে বুনো মানুষের দ্বৈরথ সমরলিপ্সা জেগে উঠলো! সজোরে সে আঘাত কল্লে ঠিকাদারের মুখে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ঠিকাদার—ব্যাধের হাতে হিংস্র জন্তুর পরাজয় যেমন ক'রে ঘটে! মুখ নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এত সব লক্ষ্য করবার মত সময় গারগুর ছিল না। সে মংলীর হাত ধরে সহজ সুরে বল্লে—ত্যালাং ইস্কুলু হুজুমে। (আয় আমরা যাই) গাইতিটা পড়ে থাকলো পাহাড়ের পাদদেশে—সেটার আর প্রয়োজন নেই। কোদালই তাদের ভালো। কিন্তু দিগম্বর পাহাড়—আজ আর নেই, এদের স্বাতন্ত্র্য কি রাখতে পারবে এরা?

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শাসনক্ষমতা লাভ করিবার পরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল ও শোষিত রাজ্যগুলির স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে জাতি-সঙ্ঘের কংগ্রেস-মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডল দুর্ব্বল পশ্চিম আফ্রিকার পক্ষাবলম্বন করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন ঐ রাজ্যটী কৌশলে কুক্ষীগত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানান। তাঁহাদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়; জাতি-সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত জানান যে, পশ্চিম আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অবশ্য, শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ হয় কি না—জাতি-সঙ্ঘ কোনও অবাধ্য সভ্যরাষ্ট্রকে সায়েস্তা করিতে পারেন কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিকামী প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজদের অন্যায় ও অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ভারতীয় প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ স্বস্তি পরিষদের সদস্য নহে বলিয়া অষ্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধি এই সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের আবেদন অনুসারে জাতি-সঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদ ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

গত বৎসর নভেম্বর মাসে ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া চেরিবন্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া—বিশেষতঃ বিশ্বের জনমত প্রতিকূল হইয়া ওঠায় ওলন্দাজ ধুরন্ধররা ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া কিছু সময় লইতে চাহিতেছিল। শক্তি সঞ্চয় করিবার পর কৌশলে, প্রয়োজন হইলে সামরিক বলপ্রয়োগ করিয়া নবীন ইন্দোনেশিয়ান্ রিপাবলিককে ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। নাৎসী আক্রমণে পঙ্গু হল্যাণ্ডের পক্ষে নিজ শক্তিতে ইন্দোনেশিয়ার জাগ্রত ৭ কোটী অধিবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করা সম্ভব নহে। ইন্দোনেশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজ কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বৃটেন্ ও আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার তৈল ব্যবসায়ে বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ; বৃটিশ সেল্ ও ওলন্দাজ সেল্ কোম্পানী একত্রে ইন্দোনেশিয়ার তৈল আহরণ করে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইন্দোনেশিয়ার প্রতি আমেরিকার লোভ প্রচুর।

ইন্দোনেশিয়ার ৩শত বৎসরের ওলন্দাজ শাসনের কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে এই কোম্পানীর ব্যবসা আরম্ভ হয়। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটির মত ওলন্দাজ কোম্পানীও ব্যবসায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। অতি সত্বর ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইন্দোনেশিয়া নামে পরিচিত দ্বীপপুঞ্জ অস্ত্রবলে জয় করে। দুই শত বৎসর কোম্পানীর রাজত্ব চলিবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। তদবধি ১৯৪২ সালে জাপানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ওলন্দাজরা পলায়ন করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইন্দোনেশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সিন্‌কোনা, গোলমরিচ, রবার, নারিকেল, পেট্রোল, চা, চিনি, কফি প্রভৃতি এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয় এবং বহু পরিমাণে বিদেশে চালানও যায়। এই সব কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের উৎপাদনে এবং ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব ওলন্দাজদের; দেশীয় জনসাধারণ কঠোর দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত। শতকরা ৯৯জন ইন্দোনেশিয়ের বাৎসরিক আয় ছিল ২ হাজার টাকা; গড়পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক আয় মাত্র ৫০ টাকা। পক্ষান্তরে শোষক ওলন্দাজদের মাথা পিছু গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ৫ হাজার টাকার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে নিষ্পিষ্ট ইন্দোনেশিয়দের পক্ষে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আশীর্ব্বাদস্বরূপ হয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে জাপানের তড়িৎগতি আক্রমণে ও দ্রুত সাফল্যে তাহারা উৎসাহিত হইয়া ওঠে। প্রতিবেশী জাপানকে তাহারা মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে দেরী হয় নাই। প্রতিবেশী পীত জাতিটি যে শ্বেতাঙ্গ শোষক অপেক্ষা কম নির্ম্মম ও কম স্বার্থপর নহে, তাহা বুঝিবামাত্র সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। প্রতিরোধকারীদের বিরামহীন তৎপরতার ফলে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানীরা কখনই ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তারপর ১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসে জাপানের পরাজয় ঘটিবামাত্র প্রতিরোধকারীরা ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্য নব-প্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশীয় রিপাবলিককে অভিনন্দন জানায়। ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্ট তখন ছিলেন নিরুপায়। নাৎসী আঘাতে পঙ্গু ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইন্দোনেশিয়াকে পুনরায় অস্ত্রবলে জয় করা আর সম্ভব ছিল না।

ঔপনেবিশিক রাজ্যের শোষণে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চিরদিন ঐক্যবদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বৃটিশের স্বার্থের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৃটেন্ এই সময় ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জাতীয় আন্দোলনের পুষ্টি, তাহাকে জাপানী চক্রান্ত আখ্যা দিয়া তাহার বিরুদ্ধে বৃটিশও জাতীয় সৈন্য লেলাইয়া দেয়। ইন্দোনেশীয়রা তখন স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে, অস্ত্রবলে তাহাদিগকে দমন করা সহজসাধ্য নহে। বৃটিশ সৈন্য নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ চালাইয়া নাৎসী প্রথায় নিরীহ গ্রামবাসীদিগকে পোড়াইয়া মারিয়া ইন্দোনেশিয়াকে পদানত করিতে পারে না। এদিকে বিশ্বের জনমত ক্রমেই প্রতিকূল হইয়া উঠিতে থাকে। ১৯৪৭ সালের প্রথমে সোভিয়েট রুশিয়া ও ইউক্রেন জাতি-সঙ্ঘে ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং অবিলম্বে তথা হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করে। জাতি-সঙ্ঘে এই দাবী গ্রাহ্য না হইলেও সংগ্রামরত ইন্দোনেশীয়দের অনুকূলে বিশ্বের জনমত তৈয়ারী হয়। অস্ত্রবলে ইন্দোনেশীয়দের দমন করা ক্রমেই অসাধ্য হইয়া উঠিতে থাকে। তখন এই দ্বীপপুঞ্জকে অবরোধ করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান সরীর ভারতবর্ষকে ৫লক্ষ টন্ চাউল দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বৃটিশ ও ওলন্দাজরা একযোগে এই চাউল ভারতে পৌছান বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

যাহা হউক, স্বাধীনতাকামী ইন্দোনেশীয়দিগকে দমন করা অসম্ভব বুঝিয়া ১৯৪৬ সালেরঅক্টোবর মাসে ওলন্দাজরা এক চুক্তি (চেরিবন্ চুক্তি) করিতে সম্মত হয়। এই চুক্তির খসড়া তৈয়ারী হইয়া যাইবার পর ৪ মাসের মধ্যে তাহারা উহাতে স্বাক্ষর করে না। এদিকে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত তাহারা ক্রমাগত লঙ্ঘন করিতে থাকে; অর্থনৈতিক অবরোধও কঠোরতর হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইন্দোনেশিয়ায় যত ওলন্দাজ সৈন্য থাকিবার কথা, তাহার সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পশ্চিম জাভার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ওলন্দাজ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অধিকার করিয়া বসে; অজুহাত, ঐ অঞ্চলের সন্ধানীরা ওলন্দাজদের কর্ত্তৃত্ব চায়।

এই সব বিরোধ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় জন্য ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক গত মে মাসে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ওলন্দাজদের পক্ষ হইতে ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক অন্তর্ব্বর্ত্তী ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ইন্দোনেশীয় রিপাবলিক এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য এই ফেডারেল গভর্ণমেণ্টে ওলন্দাজ প্রতিনিধি থাকিবার অসঙ্গত প্রস্তাবেও আপত্তি করে নাই। তবে, ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটি অপমানকর সর্ত্তে রিপাবলিকান্ কর্ত্তৃপক্ষ প্রবল আপত্তি তোলেন; আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ওলন্দাজ কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে তাঁহারা কিছুতেই রাজী হন নাই। চেরিবন্ চুক্তিতে (পরে লিগঅজ্জাতিতে অনুমোদিত) জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরায় রিপাবলিক্যান্ গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তি রিপাবলিক্যান্ গভর্ণমেণ্টের এই কর্ত্তৃত্বের অধিকার মানিয়াও লয়। তাই, ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আমীর সরিফুদ্দীন সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করিয়াছেন, "We therefore, ask the question why then should we accept the joint police force in our own territory ?"

ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবের মীমাংসায় যখন এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তখন হঠাৎ ওলন্দাজরা আদেশ দেয় যে, ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীকে তাহাদের অবস্থানক্ষেত্র হইতে ১০ কিলোমিটার সরাইয়া লইতে হইবে। এইভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ সামরিক প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া ওলন্দাজরা "মারমুখো" হইয়া ওঠে এবং ২১শে জুলাই ওলন্দাজ বিমান বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্থলবাহিনীও তৎপর হয়।

ওলন্দাজরা কেবল সময় লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে চেরিবন চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহা তাহাদের আচরণে সুস্পষ্ট। বৃটেন ইন্দোনেশিয়া হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে বাধ্য হইলেও ওলন্দাজদের সে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছে। ওলন্দাজ সামরিক বিভাগকে বৃটেন্ প্রচুর পরিমাণে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র প্রদান করিয়াছে। ওলন্দাজ সেনাবাহিনী শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ভার লইয়াছে বৃটেন। বৃটিশ বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই ডিভিসন সৈন্য তখন ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ করিতেছে। সম্প্রতি মিঃ বেভিন্ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ওলন্দাজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবার কাজ বন্ধ করিবেন না।

ইন্দোনেশিয়ায় দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইবার আর্থিক সঙ্গতি ওলন্দাজদের ছিল না। বৃটেন্ দরিদ্র, তাহার পক্ষে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নহে। তাই, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওলন্দাজ গভর্ণর জেনারেল দৌড়ান ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়। মার্কিণ ধনকুবেরেরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ সকলে ডলার খাটাইবার জন্য উদগ্রীব। ইন্দোনেশিয়ায়

ডলার খাটাইয়া লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজ খবর লইবার জন্য তাহারা বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়াছিল। খোঁজ খবর লওয়া শেষ হইয়াছে। এখন তথাকথিত মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে রণবিক্ষত ইউরোপীয় দেশগুলিকে সাহায্য দানের নাম করিয়া তাহাদিগকে ডলারের চাকায় বাঁধিবার যে চেষ্টা হইতেছে, সেই চেষ্টায় নেদারল্যাণ্ডের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা হইবে। আমেরিকা যে ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে কত বেশী আগ্রহী, তাহার বড় প্রমাণ পূর্ব্ববর্ণিত ওলন্দাজদের ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিককে মানাইয়া লইবার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট চাপ দিয়াছিলেন। তাহারা ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিককে জানাইয়াছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব না মানিলে তাহারা ইন্দোনেশিয়াকে কোনরূপ অর্থসাহায্য করিবে না।

ইন্দোনেশিয়ার প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইলে বৃটেন ও আমেরিকা সমগ্র ব্যাপারটা ভণ্ডুল করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বৃটেন অষ্ট্রেলিয়াকে এক চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিল যে, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়া পক্ষপাতমূলক আচরণ করিয়াছে, সে আমেরিকার পূর্ণ সম্মতিক্রমেই অষ্ট্রেলিয়াকে এই কথা জানাইতে বাধ্য হইল। তাহার পর, স্বস্তি পরিষদে বৃটেন্ ইন্দোনেশিয়ার অনুকূলে ভোট দেয় নাই। আমেরিকা তখন ব্যস্ত হইয়া ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ মীমাংসা করিতে আগাইয়া আসে। আমেরিকার আশঙ্কা—পাছে জাতি-সঙ্ঘ তাহার নিজস্ব প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাইয়া প্রকৃত ব্যাপারটা জানিয়া ফেলে এবং ইন্দোনেশিয়ার অনুকূলে রায় দেয়; তাই, সে নিজে এই ব্যাপারে মোড়লী করিতে চায়। শেষ পর্য্যন্ত রিপাবলিক্যান গভর্ণমেণ্টের আপত্তিতে আমেরিকার চাল ব্যর্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য—পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা যদি সচেষ্ট হইত, তাহা হইলে অনায়াসে এই ব্যাপারের সুমীমাংসা হইতে পারিত; জাতি-সঙ্ঘে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রয়োজনই ঘটিত না।

শিল্পী মুকুন্দ মজুমদার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে যাঁহারা ভারতীয় শিল্প-আদর্শে সহজ কথায় 'ওরিয়েণ্টেল আর্টের' সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিন্দা ও সমালোচনার গ্লানি অতি তীব্রভাবেই সহিতে হইয়াছিল। স্বয়ং



মুক্তবেণী

অবনীন্দ্রনাথ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যবৃন্দ অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে প্রভৃতি জন-সমাজের দিক হইতে এবং সমালোচকদিগের নিকট হইতে অবহেলা ও বাক্য জ্বালা সহিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ সেই দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে।



কলেজের মেয়ে

খন তাঁহারা শুধু বাঙ্গালা দেশ বা ারতবর্ষেই নন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও াহাদের প্রাপ্য হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ লিকাতা গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ বং সি, আই-ই উপাধি ভূষণে ভূষিত ইয়াছিলেন। আজ অবনীন্দ্রনাথ যশস্বী বং অতুল গৌরবের অধিকারী তিনি। াহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা চিত্রজগতে তুলনীয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া তাঁহারই ক্ষা ও আদর্শের গৌরবকে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আজ আমরা যে তরুণ শিল্পীর পরিচয় তেছি তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর র্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব রিয়েণ্টেল আর্টস' হইতে ১৯৪৪ সালে প্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শিল্পী মুকুন্দ াবস্থায়ই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ঙ্কিত বহু চিত্র সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার শিল্প তিভার পরিচয় দিতেছে।



ঘুমন্ত শিশু



শিল্পী—মুকুন্দ মজুমদার

আমরা এখানে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়াও সঙ্গত মনে রতেছি। মুকুন্দ স্বদেশহিতৈষী ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক তি অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পৌত্র। মুকুন্দ পারিবারিক কার আদর্শ গ্রহণ না করিয়া আপনার পথ আপনি বাছিয়া লইয়া— ই শিল্পীর জীবনকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

মুকুন্দ আপনাকে কোনদিন জনসমাজে প্রচারের জন্য উন্মুখ নয়, নীরবে আপন মনে শিল্প সাধনাই তাহার জীবনের ব্রত।

এখানে যে কয়টি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল, তাহার সব কয়টিই তাহার ব্রাসওয়ার্ক, এবং মডেল হইতে গৃহীত। খোকা ঘুমাইয়া আছে তাহার পাশে পড়িয়া আছে তাহার সাধের ঝুমঝুমিটি। ঘুমন্ত এই শিশুর মুখে যে স্বাভাবিক সারল্য এবং শান্ত মাধুর্য্যের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। আমাদের ভারতীয় চিত্রকরেরা বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মত তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রে শিশু ও বালক-বালিকার জীবনের সহজ সরল সচ্ছন্দ গতি ও সাবলীল অঙ্গভঙ্গী—হাসি, কান্না, আদর, খেলা ধুলার বৈচিত্র্য দেখা যায় না, কাজেই এই নিদ্রিত শিশুটির চিত্র দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

মুকুন্দের অঙ্কিত মুক্তবেণী ও কলেজের মেয়ে চিত্র দুইটি ব্রাশওয়ার্ক। বিনা ড্রইংএ শুধু ব্রাশের টানে দুইটি তরুণীর মুখাবয়ব বিচিত্র ও বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উভয় তরুণীর চক্ষুর দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটা চমৎকার নির্ভীক অথচ প্রসন্ন দিব্যশ্রী বিকশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার এই চিত্র তিনটির ভিতর দিয়া শিল্পীর চিত্র নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাই।

শিল্পী মুকুন্দ বহু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্কিত সেই সমুদয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী হইলে উহা চিত্রামোদীদের কাছে আদরণীয় হইবে বলিয়া মনে করি।

আশা করি একদিন এই তরুণ শিল্পী বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের ন্যায় জনসমাজে সমাদৃত হইবেন। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করি।



ভীমপলশ্রী

বনফুল

১০

খিড়কীর দরজার সামনে সুশোভন এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন তুলে দেখলে একটা নয় দুটো ছিটকিনি। উপরে একটা, নীচে একটা—লোহার ছিটকিনি। নীচেরটা হল-হলে গোছের, একটা আঙুল দিয়েই তোলা গেল। কিন্তু এত বেশী হল-হলে যে একটুতেই পড়ে যাচ্ছে, আর এমন একটা খড়খড় আওয়াজ করছে যে বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, আশঙ্কাজনকও। গোঁসাইজির ঘুম ভেঙে যেতে পারে। উপরের ছিটকিনিটি আবার ঠিক বিপরীত, এমন আঁট যে মনে হচ্ছে রিপিট করা আছে। সুশোভনের বাঁ হাতে লণ্ঠন ছিল, ডান হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে ছিটকিনিটিকে এক চুলও সরাতে পারলে না। তখন লণ্ঠনটা মাটিতে রেখে এক হাত দিয়ে কপাটটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত দিয়ে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান মারলে একটা। ক্যাঁ—চ করে' বিকট একটা আওয়াজ হল কিন্তু খুলল না। অর্দ্ধেকটা খুলে থেকে গেল। আলোটাও নিবে গেল দপদপ করে'। সুশোভন আলোটা তুলে নেড়ে দেখলে তেল নেই। তারপর উপরে তেতালার দিকে চেয়ে দেখলে কারও ঘুম ভেঙেছে কি না। না, ভাঙেনি। পকেটে দেশলাই ছিল তাই বার করে জ্বাললে। বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা নিয়ে আর একবার টান দিলে ছিটকিনিটাতে। নড়বার কোনও লক্ষণ নেই, মনে হল 'জ্যাম' হয়ে এঁটে বসেছে আরও। বাঁ হাতের আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ফেলে দিতে হল দেশলাই কাঠিটা। আঙুলে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগল কি করা যায়। কুকুরের একটা হিল্লে না করে' সান্ত্বনার কাছে ফেরা যাবে না। ছিটকিনি খুলতেই হবে যেমন করে' হোক। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে' রুমালটা ছিটকিনিতে বেঁধে ঝুলে পড়ল সেটা ধরে' সে। ক্যাঁ—চ খটাৎ—ভীষণ শব্দ করে' খুলে গেল। যাক। উপর দিকে আবার চেয়ে দেখলে। না' গোঁসাইজির নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। কপাটটা খুলে বেরিয়েই সুশোভনের পা পড়ল ন্যাতার মতো একটা জিনিসের উপর। দেশলাই জ্বেলে দেখলে জায়গাটা আঁস্তাকুড় গোছের। ভাঙা টিন, তরকারির খোসা, কাগজের টুকরো, গোবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। রান্নাঘরের জলও বোধহয় পড়ে এইখানে। স্যাঁত স্যাঁত করছে চতুর্দিক। আবার একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেটা তুলে ধরে' সুশোভন দেখলে—সর্ব্বনাশ, সামনে আর একটা দেওয়াল এবং তাতে আর একটা কপাট। মনে হল এইটেই বোধহয় আসল খিড়কি। এটা পার হতে পারলে তবে গোয়ালঘরে পৌঁছানো যাবে। ভাগ্যক্রমে এ কপাটের ছিটকিনি সহজে খোলা গেল। বিশেষ বেগ পেতে হল না। কপাট খুলে বেরিয়েই গোয়ালটা পেলে। ঝুমুর আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হল ঝির ঝির করে'। কনকনে হাওয়া তো ছিলই। রুমালটা মাথায় দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালতে জ্বালতে গোয়ালটার দিকে অগ্রসর হল সুশোভন। ছাপ্পর-খাট-শায়িতা কম্বলাবৃতা সান্ত্বনার ছবিটা অনিবার্য্যভাবে ফুটে উঠল মনের উপর। কি অদ্ভুত মেয়ে। একটু আগে তার শয্যাপ্রান্তে বসে তার ছিমছাম ঘরোয়া মূর্ত্তি দেখে একটু অভিভূত সে যে হয় নি তা নয়। বিলাসী, জেদি,

রেচে অনীতার সঙ্গে তুলনা করে' সান্ত্বনার সাদাসিধে ভাবটা ভালই লেগেছিল তার। কিন্তু সুশোভনের মনে পড়ল সান্ত্বনাও এককালে কম করে নি। সেই লেখন-ঘটিত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকেই ও বদলে গেছে এবং তারপর বোধহয় আবিষ্কার করেছে যে সাদাসিধে চাল চলনই ভাল। একটু আগে—সত্যি কথা বলতে কি—সান্ত্বনার ধীর স্থির শান্ত গার্হস্থ্য লক্ষ্মীস্ত্রী দেখে এবং অনীতার উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে তার তুলনা করে' সুশোভনের মনটা সান্ত্বনার দিকেই ঝুঁকে ছিল একটু। কিন্তু এখন সে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম করছিল এইসব লক্ষ্মী-স্ত্রী-মার্কা স্ত্রীদের স্বামী হওয়া কি সঙ্গীণ ব্যাপার। তাকে স্বেচ্ছায়, শুধু স্বেচ্ছায় নয় সানন্দে এই হাওয়ায় অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি মাথায় করে' লক্ষ্মীছাড়া একটা কুকুরের সন্ধানে বেরুতে হবে!. কি রকম দাম্পত্যজীবন এদের? ভদ্রহাসি-মাখানো শাস্ত্রীয় মাধুর্য্যের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কি! না, তার অনীতা ঢের ভাল এর চেয়ে। উদ্দাম জিদি 'আবদেরে বদরাগী কিন্তু প্রাণ আছে, বৈচিত্র্য আছে—আর এতটা অবুঝ স্বার্থপরও নয়। অনীতা কখনও তাকে এমনভাবে কুকুর আনতে পাঠাতো না। কখনও না।

কিন্তু সান্ত্বনার সঙ্গে—সেই সেকালের কমরেড সান্ত্বনার সঙ্গে—একরাত্রি কাটানোর অভিজ্ঞতা নিতান্ত মন্দও লাগছিল না সুশোভনের। বেচারী! কি বদনামটাই রটিয়েছিল সবাই ওর নামে। তারই চাপে বোধহয় গৃহলক্ষ্মীটি হয়ে গেছে একেবারে। এরকম আরও দেখেছে সে। বিয়ের আগে যে সব মেয়েরা খুব বেশী প্রগতিশীলা থাকে বিয়ের পর আর চেনা যায় না তাদের। একেবারে সটান তুলসীতলা আশ্রয় করে তারা। সান্ত্বনার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি হচ্ছিল তার।

এইবার ঝুনুর খোঁজ করা যাক।

ঝুনুর কান্না শোনা যাচ্ছিল, তার কারণ গোয়ালের কপাটটা খোলা ছিল। সুশোভন কপাটের কাছে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে একটু। কিছু দেখা গেল না। খড়ের খড় খড় শব্দ আর ঝুনুর আর্ত্তনাদ ছাড়া শোনাও গেল না কিছু। সুশোভন ভিতরে ঢুকে দেশলাই জ্বাললে। সুশোভনকে দেখে ঝুনু হাহাকারের সঙ্গে সম্বর্দ্ধনাসূচক একটা হর্ষোচ্ছ্বাস মিশিয়ে অদ্ভুত ধরণের শব্দ করতে করতে এগিয়ে এল। সুশোভন হাতটা বাড়িয়ে দিতে চাটলে দু' একবার ভয়ে ভয়ে। আহা, আপাদমস্তক থর থর করে' কাঁপছে। লোমগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। বেঁড়ে ল্যাজের কাছটায় খুব জোরে জোরে অদ্ভুত ধরণে নড়ছে। করুণ দৃষ্টি তুলে সুশোভনের দিকে একবার চেয়ে তারপর সভয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। চীৎকার বন্ধ করেছিল, কিন্তু তার বদলে এমন একটা আনুনাসিক কোঁতানি আরম্ভ করলে যা অতিশয় শ্রুতিকটু।

"চুপ কর"

"কুঁই কুঁই কুঁক কুঁক"

ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। সুশোভনকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ঠিক।

"চুপ কর"

সুশোভন ডান-হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার। কুকুর যে এ রকম ছিঁচকাঁদুনে হতে পারে তা সুশোভনের ধারণার অতীত ছিল। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল ঝুনু।

"চুপ কর বলছি, মারব না হলে—"

সুশোভন যে-ই একটু হাত তুলেছে ঝুনু "কেঁউ" করে' বেরিয়ে গেল একছুটে অন্ধকারের মধ্যে।

"আরে, এ কি হল"

কপাটের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সুশোভন।

"আঃ আঃ চু চু চু"

টুসকি দিতে লাগল। কোন ফল হল না। বেরুতে হ'ল গোয়াল থেকে। বৃষ্টিও নামল বেশ জোরে।

"আয় আয় ঝুনু—আঃ—আঃ—"

নাতি-উচ্চ-কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে অন্ধকারে এগুচ্ছিল হুড়মুড় করে' হোঁচট খেলে। একটা প্রকাণ্ড গামলা গোছের কি ছিল, গরুর জাবখাওয়াবার ডাবা বোধ হয়।

"ঝুনু ঝুনু, আয় বলছি। এস লক্ষ্মীটি। মারব না, কিচ্ছু বলব না, আঃ আঃ। আয় না—উঃ কি লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বাবা—ধরতে পারি যদি একবার। ঝুনু—ঝুনু"

দূরে বহুদূরে শর্ষে-ক্ষেতের ভিতর ছুটতে ছুটতে একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে 'কেঁউ' করে' উঠল

ঝুনু। সেইদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সুশোভন চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। আপাদমস্তক রি রি করে' উঠল রাগে। কিন্তু করবারই বা কি আছে! এগুতে হল। শব্দটা যে দিক থেকে এল সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল সে হন্ হন করে'। আবার হোঁচট খেয়ে পড়ল কিসের উপর একটা। তলপেটে গুঁতো লাগল। টিউব ওয়েলের পাম্প না কি এটা! আর একটু গিয়ে আবার হোঁচট —আর একটা পিপে। ঝন ঝন শব্দ করে' টিনও পড়ে গেল একটা। সমস্ত জায়গাটা জব জবে ভিজে পা বসে যাচ্ছে। সেখানটা অতিক্রম করতে গিয়ে আর একবার ঠোক্কর খেতে হল, সান-বাঁধানো জায়গা ছিল একটা সামনেই। বোধহয় স্নান করবার জায়গা। একটা ঝাঁটা পায়ে ঠেকল, লাথি মেরে সরিয়ে দিলে সেটাকে। তারপর সে দাঁড়াল একটু। এ কোথায় এসে পড়ল! আর তো কোন শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। একটা গাছের ডাল থেকে ফোঁটা কয়েক জল পড়ল টপ টপ করে' নাকের ডগায়। সরে' দাঁড়াতে হল।

"উঃ কি ফ্যাঁসাদে পড়লাম। এর পর যদি কুকুরটাকে ধরতেও পারি,-কি যে হবে তা দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। ওই ভিজে কুকুরকে সান্ত্বনা কিছুতেই বিছানায় উঠতে দেবে না, আমাকেই ওকে নিয়ে মেজেয় শুতে হবে, শুয়ে ঘুম পাড়াতে হবে। ধরতে পারলে হয়, জন্মের মতো ঘুম পাড়িয়ে দেব একেবারে। ঝুনু—আঃ—আঃ—ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু-ঝুনু—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই। আর একটু এগিয়ে সুশোভন দেখলে একটা বেড়া রয়েছে, তারের বেড়া। এর ওপারেই মাঠ। মাঠে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। বেড়াটায় ভর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই।

বেড়াটায় ঠেস দিয়ে সুশোভনের মনে হল আর পারছে না সে। সীমা অতিক্রম করেছে এবার। এর চেয়ে দুরবস্থা আর হতে পারে না, হওয়া সম্ভবই নয়। ওই গোয়ালে ঢুকেই শুয়ে পড়া যাক। থাকুক গোবরের গন্ধ, ওই খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কেটে যাবে কোনক্রমে। ভাবলে বটে কিন্তু যেতে পারলে না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে'। কোলকাতায় তার নিজের বিছানার কথা মনে পড়ল, ধপধপে সাদা চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেটের মশারিটি ফেলে অনাতা শুয়ে আছে। কল্পনা করেও যেন আরাম হল একটু। কিন্তু একটা কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম করে' একটু দমেও গেল সে। এ সমস্তর জন্যে সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। রাগ পড়ে' গেল। একটা শূন্য বিমর্ষভাব খাঁ খাঁ করতে লাগল সারা বুক জুড়ে। ঘুমও পাচ্ছিল খুব···। বেড়াটা পেরিয়ে খুঁজে দেখবে না কি আর একটু? কিন্তু আর পারছিল না সে। আর এতে লজ্জারই বা কি আছে। ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটা বললেই চুকে যাবে। ঘুম না হয় নাই হবে। ঘুম হবেই বা না কেন, নিশ্চয় হবে, সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে।

কিন্তু না, তার মনের অন্তরতম প্রদেশে আর একটা কি যেন খচখচ করছিল। কি সেটা? সে এমন কিছুই করে নি এখনও পর্য্যন্ত যা অন্যায়, যাতে অনাতার ন্যায়ত রাগ হতে পারে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে অনীতা বুঝবেই নিশ্চয় শেষ পর্য্যন্ত। কিছুই তো করে নি সে। কিন্তু তার মনের এই বিমর্ষভাবের সঙ্গে অনীতাই যে নিগূঢ়ভাবে জড়িত এ ধারণাটাও সে ত্যাগ করতে পারছিল না কিছুতে···।

"ঠিক"—হঠাৎ মনে হলে তার—"আসলে অনীতার জন্যে মন কেমন করছে।' মানে বিরহ"

হ্যাঁ, বিরহই। নিজের বান্ধবীদের কাছে যে অনীতার বুদ্ধি সম্বন্ধে নানা সমালোচনায় সে পঞ্চমুখ সেই অনীতাকে বিয়ের পর এক রাত্রিও ছেড়ে থাকে নি সে। নিজের বুদ্ধিতে চলতে গিয়ে তো এই হয়েছে—পরের স্ত্রীর কুকুরের পিছু পিছু ছুটে একটা হতভাগা হোটেলের পিছনে মাঠে দাঁড়িয়ে ভিজতে হচ্ছে রাত দুপুরে। অনাতার সম্বন্ধে সে আবার সমালোচনা করতে গেছে সান্ত্বনার কাছে!

অনীতার মেজাজটা অবশ্য একটু কড়া। কিন্তু ওই অনীতাকেই তো সে ভালবেসেছিল। ওই অম্লমধুর অনমনীয়াকেই তো সে জয় করেছিল একদিন। আহা, তার এই মুহূর্ত্তের বিগলিত মনোভাবের খবরটা যদি অনাতা পেত কোনক্রমে—একরাত্রি তাকে ছেড়ে কি

রকম মন কেমন করেছিল তার—তাহলে তার কড়া মেজাজ নরম হয়ে যেত ঠিক।

সান্ত্বনা বড্ড বেশী নরম—একটা কুকুরের জন্যেই কেঁদিয়ে মরছে। চুলোয় যাক্ তার কুকুর। হোটেলের দিকে ফিরল সে মরীয়া হয়ে। পত্নী-নিষ্ঠা, স্বামীর নিষ্কলুষ চরিত্র-মাধুর্য্য প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের ভাবে তার সমস্ত চিত্ত তখন পরিপূর্ণ। যথাসম্ভব কম শব্দ করে' দুটি দুয়ারের ছিটকিনি বন্ধ করলে, বলাবাহুল্য প্রথম দুয়ারের উপরের ছিটকিনিটি স্পর্শ পর্য্যন্ত করলে না। লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কাঠের সিঁড়ি—ক্যাঁচ কোঁচ একটু আধটু শব্দ নিবারণ করা গেল না কিছুতে। উপরে উঠে সিঁড়ির উপর বসে' ভিজে জুতো দুটো খুলে ফেললে সে সর্ব্বাগ্রে। ইস্, জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। জুতো খুলে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সে একটু। এইবারই তো—। উপরের ঘরে (মানে গোঁসাইজির ঘরে) খুটখাট শব্দ শোনা গেল দু' একবার। চকিতে উপরের দিকে একবার চেয়ে নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়ল সে ভিতরে। সান্ত্বনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দেশলাই জ্বাললে, তবু সান্ত্বনার কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা তাকের এককোণে মোমবাতি রয়েছে একটা। হেডমাষ্টারের সম্পত্তি, বোধহয় তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছেন ভদ্রলোক। চট্ করে' মোমবাতিটা তুলে জ্বেলে ফেললে সে।

বালিশে মাথাটি রেখে সান্ত্বনা ঘুমুচ্ছে—বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছে বলে' মনে হল—অধরে শান্ত প্রসন্ন হাসি। মাথাটা একদিকে সামান্য কাত হয়ে থাকাতে গণ্ডের ও গ্রীবার এমন একটা লোভনীয় ভাব প্রকাশ হয়েছে যা শুধু মনোহর বললেই সবটা বলা হয় না। সুশোভন হাত দিয়ে আলোটা আড়াল করে' ঝুঁকে দেখতে লাগল।

সামান্য একটু নড়ে চড়ে উঠল সান্ত্বনা, বাঁ হাতখানা বুকের উপর ছিল নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। অনামিকায় বিয়ের আংটিটা ছিল, আলো পড়াতে চকমক করে উঠল তার পাথরখানা। সুশোভন সোজা হয়ে দাঁড়াল, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে এল। অনীতার কথা মনে পড়ল তার। সে বেচারীও বোধহয় একা একা শুয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। কিম্বা সে হয় তো জেগে আছে, তারই কথা ভাবছে··· বিয়ের পর এই প্রথম বিচ্ছেদ···একটা অভূতপূর্ব্ব বেদনা আকুল করে' তুলেছে হয় তো। সুশোভনের শীত করছিল, জামাটা ভিজে সপসপ করছে। অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাল সে একবার। না, সে শোবে না এখানে। সান্ত্বনা, সান্ত্বনার স্বামী এবং সমস্ত শোনবার পর অনীতাও তার এখানে শোওয়ার সমর্থন করবে সে জানে, কিন্তু তবু তার মনে হল শোয়াটা উচিত নয়, সিঁড়িতে কিম্বা ওই গোয়াল ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। কেন উচিত তা বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না তার। ক্ষমতা হয় তো ছিল, উৎসাহ ছিল না। ঘুমে ক্লান্তিতে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছিল। তার কেমন যেন আবছাভাবে মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে শুলে অনীতার সঙ্গে আত্মিকযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে। ঘুমন্ত সান্ত্বনার দিকে আর একবার চেয়ে দেখলে সে। না, রূপসী বটে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তখনই মনে হল সেইজন্য আরও চলে যাওয়া উচিত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"উঃ কি সাংঘাতিক প্যাঁচেই যে পড়েছি। ভিজে জামা, ভিজে কাপড়, ঘুম পাচ্ছে, মন ছুঁকছুঁক করছে, বিবেক দংশন, রাম রাম! কি যে করি এখন ঘোড়ার ডিম"—স্বগতোক্তিটা জোরেই হয়ে গেল একটু।

"কে, ও আপনি, কি বলছেন"—জেগে উঠল সান্ত্বনা।

"বলছি, কি করি এখন"

"কি আবার করবেন, শুয়ে পড়ুন, ঝুনু কই"

"ঝুনু এল না। বাইরে খেলা করছে, কিছুতেই আসতে চাইছে না। থাক না বেশ আছে, বাইরে আরামে থাকবে"

"খেলা করছে! না, না, সুশোভনবাবু নিয়ে আসুন তাকে। ঠাণ্ডায় অসুখ করে' যাবে"

"কিছু হবে না। বেশ খেলা করছে। তাছাড়া বাইরে গিয়ে এখন ধরাই যাবে না তাকে"

"কেন"

"যা অন্ধকার। সূচীভেদ্য বললে কিছুই বলা হয়' না। আলকাতরার মতো বললে তবু খানিকটা—"

"ঝুনু কোথায়"

"শেষবার যে তার সাড়া পেয়েছি তার থেকে অনুমান করছি সর্ষে ক্ষেতে ঢুকেছে"

"সর্ষে ক্ষেতে, বলেন কি! ওমা, আপনি যে ভিজে গেছেন একেবারে দেখছি"

সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসল এবং তার সিক্ত কোটের দিকে শুভ্র বাহুটি প্রসারিত করে বলল—"ছি, ছি, আমার দশা কি হয়েছে আপনার"

"তাতে কি হয়েছে"—ঔদাসীন্যভরে সুশোভন জবাব দিলে—"বেশী ভেজেনি, সামান্য একটু"

"সামান্য একটু কি! ভিজে সপসপ করছেন, এর নাম সামান্য একটু? এত ভিজলেন কি করে? বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে না কি?"

"আজ্ঞে না। পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম"

"কাপড় জামা ছেড়ে ফেলুন এক্ষুণি। অসুখ করে' যাবে না হলে। কিন্তু ছাড়বেনই বা কি করে'—আপনার স্যুটকেশ তো আসে নি—সে তো অনীতার সঙ্গে চলে গেছে। মুশকিল হল দেখছি, কি করা যায়"

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় সীমানা-নির্ধারণ কমিশনের রায় কি অযৌক্তিক?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভারত বিভাগ সাব্যস্ত হওয়ায় পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশও বিভক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভোটদাতাদের নির্ধারণ অনুযায়ী শ্রীহট্ট জেলাকেও পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল, বড়লাট বাহাদুরের ৩০শে জুনের ঘোষণা অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের জন্য সীমানা কমিশন নিযুক্ত হয়। ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের ৩রা জুনের ঘোষণায় সীমানা কমিশনের বিচার্য্য বিষয় নিম্নলিখিত রূপ স্থির করা হইয়াছিল।

"সীমানা নির্ধারণ কমিশনকে মুসলমান ও অমুসলমান সংলগ্ন অঞ্চল নির্ণয় করিয়া বাংলার উভয় অংশের সীমানা নির্ধারণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণ করিতে গিয়া কমিশন অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করিবেন।" সীমানা কমিশনকে যথাসম্ভব ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অনুরোধ জানান হয়। বাংলাদেশে বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জ্জী, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি আবুসালে মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এম, এ, রহমানকে লইয়া কমিশন গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগের সমর্থন অনুযায়ী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিশনই শ্রীহট্ট জেলার সীমানা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। পাঞ্জাবপ্রদেশের জন্য বিভিন্ন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য স্যার সিরিল পাঞ্জাব কমিশনেরও সভাপতি ছিলেন।

প্রাথমিক কয়েকটী বৈঠকের পরে কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগের নিকট হইতে স্মারকলিপি আহ্বান করেন। বহু বিঘোষিত নানা দলের স্মারকলিপির মধ্যে জাতীয় মহাসভা, হিন্দু-মহাসভা ও মুসলিম লীগের স্মারকলিপিই উল্লেখযোগ্য ছিল। ১৬ই হইতে ২৪শে জুলাই কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। কমিশনের সভাপতি প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া কোনও পক্ষেরই যুক্তিতর্ক শোনেন নাই। কমিশনের নিকটে উত্থাপিত উপাদান এবং কৌন্সুলীদের যুক্তিতর্ক পাঠ করার পরে কমিশনের সভ্যদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যার জন্য কয়েকদিন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যগণ বহু আলোচনার পরও সর্ব্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন, এমন কি প্রধান প্রধান প্রশ্ন সম্পর্কেও দুই মত হওয়ায় সভাপতি স্বয়ং এক আপোষনামা দেন। সভাপতি স্যার সিরিল তাঁহার আপোষনামা দেওয়ার কৈফিয়ৎএ জানান যে কমিশনের দুইদল সভ্যই কোন স্থির সিদ্ধান্তে একমত হইতে না পারায় সভাপতির উপরে চূড়ান্ত মীমাংসার ভার ছাড়িয়া দেন। আপোষনামায় আলোচ্য প্রশ্নগুলি উল্লেখ করিবার সময় স্যার সিরিল জানান যে বাংলাদেশকে দুভাগ করিবার মতন সন্তোষজনক প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই বলিলেই হয়; মুসলমান ও অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় এমন কোন প্রাকৃতিক রেখা নাই। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরের দ্বারা সীমারেখা টানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন—কলিকাতা নগরী কোন ভাগে পড়িবে কিম্বা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায় কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কলিকাতা যদি সমগ্রভাবে একটী রাষ্ট্রের ভাগে পড়ে তবে কলিকাতা সহর ও বন্দর নির্ভর করে এমন কোনও অংশের সহিত ইহার সংযুক্তি অবশ্যম্ভাবী (নদীয়ার সমস্ত নদী ইহাদের অংশ অথবা কুলটীর নদীসমূহ)।

তৃতীয় প্রশ্ন—যশোহর ও নদীয়া জেলার মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দাবী অপেক্ষা গঙ্গা, পদ্মা ও মধুমতী নদী রেখার আকর্ষণ বেশী কিনা এবং তাহা দ্বারা কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লঙ্ঘন করা হয় কি না?

চতুর্থ প্রশ্ন—খুলনা এবং যশোহর জেলাকে পরস্পরের সহিত পৃথক করা যায় কি না?

পঞ্চম প্রশ্ন—মালদহ এবং দিনাজপুর জেলায় অমুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা উচিত কি না ?

ষষ্ঠ প্রশ্ন—দার্জ্জিলিং এবং জলপাইগুড়ী জেলা কোন ভাগে পড়া উচিত। প্রথমটীতে শতকরা ২·৪৩ জন এবং দ্বিতীয়টীতে শতকরা ২৩·০৮% জন মুসলমান বাস করে কিন্তু এই দুইটী জেলা কোনও অমুসলমান প্রধান অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত নহে।

সপ্তম প্রশ্ন—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চল কোন অঞ্চলে পড়া উচিত। এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র হইলেও ইহা চট্টগ্রাম জেলার অধিকারী ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত করা মুস্কিল।

গত ১৮ই আগষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঁটোয়ারা কমিশনের সিদ্ধান্ত সকলেই অবগত হইয়াছেন। ইহার পরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভা-সমিতিতে বাঁটোয়ারার বিপক্ষে উভয়পক্ষেরই বিরুদ্ধ আলোচনা ও বিক্ষোভের যে ঢেউ উঠে আজও তাহার সমাপ্তি হয় নাই। কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে উভয় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় আপোষনামাকে শান্তির সহিত গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। উক্ত আবেদনে তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে আপোষনামার ত্রুটীসমূহ সংশোধন করিতে হইলে বিতণ্ডা না করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় শান্তির সহিত মীমাংসা করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই আবেদনের সাথে সাথেই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুখপত্র 'আজাদ' পত্রিকায় রাডক্লিফ সিদ্ধান্তে হিন্দুসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে বলিয়া লিখিত হয়। উক্ত পত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব লিখিতেছেন, রিপোর্টখানি দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে হিন্দুদের মনস্তুষ্টির আগ্রহাতিশয্যবশতঃ বাঙ্গলার মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা করিয়া এইরূপ রায় দিয়াছেন। মৌলানা সাহেব স্বসমাজের মুছলমানদিগকে হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে তিক্ততা বাড়াইতে নিষেধ করিয়া সম্ভবতঃ মনের অগোচরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় অভ্যস্ত ইন্ধন জোগাইয়াছেন। এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক স্যার সিরিল রাডক্লিফ তাঁহার রিপোর্টে কোন সম্প্রদায়ের "কোলে ঝোল" টানিয়াছেন। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের ঐতিহাসিক আপোষনামা আমরা ভুলি নাই, ঐ আপোষনামায় সুদূর লভ্য হইল অখণ্ড ভারত খণ্ড বিখণ্ড। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন করার মূলে কোনও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারসাজী আছে কিনা বিচার্য্য।

ব্রিটীশ বাংলার পরিমাণ ফল ৭৭৪৪২ বর্গমাইল।

বাংলা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৫·৫ ভাগ অমুসলমান। অমুসলমানের বর্ত্তমান দখলীকৃত ভূভাগের পরিমাণ শতকরা ৭৭ভাগের বেশী, বাংলা দেশের মোট দেয় রাজস্বের ৮০ ভাগ দেয় অমুসলমান। কাজেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবার সময় ন্যায়সঙ্গতভাবে হিন্দুবঙ্গের ভূভাগ অন্ততঃপক্ষে লোকসংখ্যানুযায়ী ৪৬ ভাগ হওয়া উচিত ছিল। বড়লাট তাঁহার আনুমানিক বিভাগ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ৩১৯১৯ বর্গ মাইল জমি দিয়াছিলেন। রাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম বাংলায় ২৮২৪৯ বর্গমাইল জমি পড়িয়াছে, অথচ অমুসলমানদের সংখ্যা অনুপাতে জমির পরিমাণ ৩৫ হাজার বর্গমাইল হওয়া উচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়, পর্ব্বত, অনাবাদী ও অনুর্ব্বর জমির অংশ হিসাবে ধরিলে নীট আবাদী জমির পরিমাণ আরও বেশী দাঁড়ায়, অথচ বাংলার সমগ্র আয়তনের ৩৩·৭ ভাগ পড়িল পশ্চিমবঙ্গে, আর ৬৬·৩ ভাগ পড়িল পূর্ব্ববঙ্গে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে কুমিল্লা জেলায় ১ বিঘা জমির দামে বর্দ্ধমান বাঁকুড়ায় ১০ বিঘা জমি কিনিতে পাওয়া যায়। ধান্য উৎপাদিকা শক্তির উপরে এই মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। বাংলা দেশের লোকসংখ্যা ৬০৩০৬৫২৫জন, পশ্চিম ও পূর্ব্ববাংলায় লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২ কোটী ৭৫ লক্ষ ও ৩ কোটী ৩০ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে মাত্র ২ কোটী ১২ লক্ষ, ইহার মধ্যে ৫২ লক্ষ থাকিল মুসলমান। মুসলমানের এই সংখ্যা সমগ্র বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ১৬ ভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ২৫·০১ ভাগ মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গে অমুসলমান দেওয়া হইল এক কোটী তের লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র বাংলায় অমুসলমান জনসংখ্যার ৪২ ভাগ থাকিতেছে পূর্ব্ববঙ্গে এবং পূর্ব্ব বাংলার লোকসংখ্যার মধ্যে ২৯·১৭জন রহিল অমুসলমান। বাংলায় হিন্দু জনসাধারণ আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত অন্তর্ভুক্ত থাকিবার জন্য অখণ্ড বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করিতে রাজী হইয়াছিল, সেখানে এই বিপুল-সংখ্যক হিন্দুকে রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারচ্যুত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কুখ্যাত সরিয়তী সাম্যবাদী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে ঠেলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি ? প্রধান দুই জাতি একসঙ্গে এক রাষ্ট্রে থাকিতে অরাজী হওয়ায় দুই জাতির সংলগ্ন বেশী সংখ্যক লোকের পৃথক রাষ্ট্রভূমি রচনা করিবার জন্যই এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। সীমা নির্দ্ধারণের ফলে এক অংশে জনসংখ্যার ⅓ অংশ লোক ও ভূমি দেওয়া ব্রিটীশ সুবিচার, ন্যায় ও নীতির কি সঙ্গতিই না হইয়াছে ? সীমা নির্দ্ধারণকালে অন্যান্য বিষয়গুলিও চিন্তা করিয়া দেখিতে কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কমিশন এই মূলনীতিও কতটা মানিয়া চলিয়াছেন তাহাও দেখা যাউক।

রিপোর্ট দেখিয়া মনে হয় কমিশন "থানা"কে সীমানা নির্দ্ধারণের "ইউনিট" ধরিয়াছেন। বাংলা দেশে মোট ৬৪৭টী থানা। ইহার মধ্যে ২৯৩টী থানায় অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। মোট জনসংখ্যার ৪০ ভাগ এই ২৯৩ থানায় বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৩টী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ২৩৯টী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসিয়াছে। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গের (সিলেট ব্যতীত) ৩৭৫টী থানার মধ্যে ৫৪টী অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। * ইহার ভিতর ৪৫টী থানা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন।

রাডক্লিফ সাহেব যে কয়েকটী প্রধান প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করা হউক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় শতকরা ৭৭জন অমুসলমান বসতিপূর্ণ কলিকাতা নগরীকে পশ্চিমবঙ্গে না ফেলিয়া পারেন নাই। এই মহানগরীকে যে বিভক্ত করা অসম্ভব তাহাও তিনি

---

* ৩নং তপশীল দেখুন।

বুঝিতে পারিয়াছেন এবং কলিকাতা নগরীও বঙ্গের গৌড় কিম্বা অপরাপর পুরাতন নগরীর ন্যায় ধ্বংসস্তূপে যাহাতে পরিণত না হয় তজ্জন্য ভাগীরথী নদী এবং যে সকল নদ নদীর জলে ভাগীরথী পরিপুষ্ট থাকিতে পারে তাহাও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা নগরীর পয়ঃপ্রণালী উন্মুক্ত রাখিবার জন্য কুলটী নদীও যে একান্ত প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ভৈরব, জলঙ্গী ইত্যাদি নদনদী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া বহতা ছিল। বর্ত্তমানে এই সকল নদনদী মৃতপ্রায় এবং ইহাদের সংস্কার করিতে হইলে যে ভূখণ্ডের উপরে অধিকার থাকা প্রয়োজন তাহাও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভৈরব সংস্কার বিপুল অর্থসাধ্য বলিয়া পরবর্ত্তী মাথাভাঙ্গা নদী তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে কিন্তু পদ্মানদীর জলস্রোত যে স্বল্পপরিসর ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া মাথাভাঙ্গার মধ্যে প্রবহমানা—মাত্র সেইটুকু ভারত ইউনিয়নে রাখিয়া সম্পূর্ণ মাথাভাঙ্গা নদীকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া কি রকম ভৌগলিক-জ্ঞানসম্মত তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ নদীয়ার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ স্থান সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত স্থান। জঙ্গীপুর মহকুমা সংলগ্নতার জন্য প্রয়োজন এবং এই সামান্য প্রয়োজনের বালাইএর জন্য সম্পূর্ণ খুলনা জেলার দাবী খারিজ হইতে পারে না। ভৈরবের পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত স্বল্পায়তন ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদের মৃত ভূখণ্ড কোন কারণেই এবং কোন হিসাবেই খুলনার দাবী রদবদলে সমর্থ হয় না।

তাঁহার তৃতীয় প্রশ্নে গঙ্গা, পদ্মা ও মধুমতী পর্য্যন্ত ভূভাগকে একদিকে আনিলে সীমারেখা প্রাকৃতিক হইতে পারে কিন্তু এতদঞ্চলের অগণিত মুসলমান জনসংখ্যা তাঁহাকে বিব্রত ও বিরত করিয়াছে। মধুমতী নদীকে সীমারেখা ধরিলে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ মিলিয়া যে ভূখণ্ড হয় তাহার অমুসলমান সংখ্যা হয় শতকরা ৬৯ভাগ এবং মুসলমান হয় শতকরা ৩১জন। এই জনপদ ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক হিসাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ। তত্রাচ যশোহর ও খুলনার বিষয়ে কেবলমাত্র মুসলীম লীগের অখণ্ড মুসলীমবঙ্গের দাবী উপেক্ষিত হইলে বিচার্য্য বিষয় সংক্রান্ত মূলনীতি লঙ্ঘন করা হইবে বলিয়া স্যার রাড্‌ক্লিফ তাহা করিতে পারেন নাই। বড়লাটের ঘোষণা অনুযায়ী খুলনা জেলা, যে জেলা কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী, বরং বৃহৎ কলিকাতার খাদ্যদ্রব্যের গোলাবাড়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, বাখরগঞ্জের সংলগ্ন দুইটী থানা বাদ দিলে যে জেলা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুগরিষ্ঠ, সেই জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দিতে আইনজ্ঞ স্যার রাড্‌ক্লিফের বিচারে অন্যায় হয় নাই। খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন নড়াইল মহকুমার অধিকাংশ ভূভাগ, অভয়নগর থানা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা, রজৈর এবং কলকিনী থানাসমূহ, বাখরগঞ্জ জেলার ৫টী উল্লেখযোগ্য থানা এই মোট ভূভাগের আয়তন প্রায় ১৯১১ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ২২ লক্ষ, অমুসলমান সংখ্যা ১২ লক্ষের উপর (শতকরা ৫৭ ভাগ)। এই বিরাট ভূখণ্ড খুলনার সহিত আসিয়া যায় ইহা ঝুনো বৃটীশ ব্যুরোক্রাট স্যার রাড্‌ক্লিফের দৃষ্টিপথের অগোচরে থাকে নাই। সমৃদ্ধিপূর্ণ এই ভূখণ্ডের সুসংগঠিত ক্ষাত্রবীর্য্যপূর্ণ নমশূদ্র জাতি সম্ভবতঃ বিচারের সময় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়াছিল, খুলনা জেলার সহিত সংলগ্ন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ ও প্রবহমানা নদনদী, পশ্চিমবঙ্গের হস্তচ্যুত হওয়ায় কেবলমাত্র লোকসংখ্যায় এই নূতন প্রদেশ দুর্ব্বল হইল না, ভাবী জনসংখ্যার সম্ভাব্য আবাসভূমি, সুন্দরবন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম চাউলের কেন্দ্র হস্তচ্যুত হইয়া গেল। অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ বীর নমশূদ্র জাতিও দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

পঞ্চম প্রশ্নে মালদহ ও দিনাজপুর জেলার অমুসলমান অংশকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া যায় কিনা? প্রশ্নের এই ধারা ও ক্রমবিকাশ দেখিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে খুলনা ও যশোহর জেলাদ্বয়কে পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া সাব্যস্ত হইলে খুলনা যশোহরের কয়েকটী মুসলমানবহুল থানার বদলে হিন্দুবহুল দিনাজপুর ও মালদহের কয়েকটী থানা পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়া বিচারসঙ্গত হয় কিনা—কিন্তু খুলনা, যশোহর বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের ৩০টী হিন্দু প্রধান থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দেওয়ার পরেই উক্ত প্রশ্নের আদৌ সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্যে এখানেও এই অসঙ্গত বিচার করা হইয়াছে। মালদহ জেলা রাজসাহীর সংলগ্ন বলিয়া মালদহের ৪টী মুসলমান প্রধান থানার সহিত একটী হিন্দুপ্রধান থানা (নাচোল) রাজসাহী জেলায় জুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার সহিত সংলগ্ন পদ্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত হিন্দুপ্রধান রাজসাহী সহরও বোয়ালিয়া থানাকে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল না কেন তাহা দেবতারও অবোধ্য! রাজসাহী বরেন্দ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সহরসমেত চারিটী হিন্দুপ্রধান সংলগ্ন থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে দিয়া, হিন্দুপ্রধান দিনাজপুর জেলার পশ্চিম অংশকে কোণঠাসা করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্ব্ব সীমান্ত বিহার প্রদেশের সহিত ঠেলিয়া দেওয়ার সঙ্গত কারণ কি, আপোষনামায় তাহার উল্লেখ নাই। যশোহর ও খুলনার মুসলমান গরিষ্ঠতার বেদনার ন্যায় এখানে কোনও নৈতিক প্রশ্নই বিচারকের বিচারে উদয় হয় নাই। চিহ্নিত ১নং তপশীলে দেখা যাইবে যে এই অঞ্চলের সহিত জলপাইগুড়ির তলদেশ পর্য্যন্ত গড়হিসাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আছে। জলপাইগুড়ী মালদহ ও দিনাজপুর বিচ্ছিন্ন করিবার সময় নদনদীর গতিপথ, সাংস্কৃতিক কিম্বা সামাজিক, পারস্পরিক যোগাযোগও বিচার করা হয় নাই। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী মহানন্দা, করোতোয়া, ত্রিস্রোতা ও আত্রেয়ী। প্রায় সকল নদনদীই ত্রিস্রোতার জলে সুপুষ্ট ছিল। ত্রিস্রোতা বর্ত্তমানে পূর্ব্বগামিনী হওয়ায় উত্তরবঙ্গের সকল নদনদীই মৃতকল্প। ভবিষ্যতে ত্রিস্রোতা নদীর যদি কোন পরিকল্পনা করা হয় তবে এইভাবে উত্তরবঙ্গ ও তাহার নদনদীকে দুই ভাগে "ঠুঁটো জগন্নাথ" করা হইল কেন? ত্রিস্রোতার জল যেখানে শক্ত পার্ব্বত্য ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিতা সেই ভূভাগ রহিল ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে, নীচে যাহারা কল কুড়াইবে অর্থাৎ বন্যার জের সামলাইতে তাহারা রহিল পূর্ব্ব পাকিস্তানে। ভূভাগ বন্টনেও মজার গবেষণা করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ী জেলার বোদা, পাচগড়, দেবীগঞ্জ এবং তেতুলিয়া একসঙ্গে

বলা হয় বোদা পরগণা। এই অঞ্চলের মোট ১৯২১৯৩জন লোকের মধ্যে ৮৭৮৬০জন মুসলমান, মোটা কথায় ঐ পরগণা এখনও হিন্দুপ্রধান অঞ্চল, তত্রাচ এই অংশকে পাকিস্তানে দিয়া জলপাইগুড়ীর বাদবাকী বিপুল জনসংখ্যাকে ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করা হইল কেন? এই স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন উত্তরবঙ্গকে তথা বাংলা দেশকে কার্য্যতঃ তিন ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত রাজবংশীসমাজ তিনভাগে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর এই জাতির মৃত্যুবীজ বপন করা হইল কিনা ভবিষ্যৎ একমাত্র সত্যদ্রষ্টা, সবচেয়ে সেরা হইয়াছে ভাগ্যের খেলায় পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া, ঠিক যেন কোচবিহারের বুকে পিস্তল তাগ করিয়া আছে এই ক্ষুদ্র পাটগ্রাম। কোচবিহারের কোলে ছোট্ট এই হিন্দুপ্রধান থানা, তামাকের জন্য বিখ্যাত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ী জেলার সংলগ্ন রঙ্গপুর জেলার ডিমলা ও হাতিবাঁধা নামক হিন্দুপ্রধান থানা দুইটীকে জলপাইগুড়ীকে না দিয়া হিন্দুপ্রধান পাটগ্রাম থানাকে পাকিস্তানে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক। সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙ্গে গুর্খাদের আন্দোলন এবং জলপাইগুড়ীতে অসমিয়া স্বজাতির শুভেচ্ছামিশন প্রেরণ, ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন। "বঙ্গাল খেদা" আন্দোলনে ছায়া কি পূর্ব্বগামিনী? মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখে। এই অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের কিঞ্চিৎ বেশী। অধিকাংশ অধিবাসীই উপজাতি এবং শাসনবহির্ভূত অঞ্চল। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের ৯১ ও ৯২ ধারানুসারে শাসিত এই অঞ্চল ব্যবস্থাপরিষদে কোনও সদস্য প্রেরণ করিত না, উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, ত্রিপুরা ও মগদের সংখ্যা অত্যধিক। মোট আয়তন ৫০৭৭ বর্গমাইল। বড়লাট আনুমানিক অঞ্চল বর্ণনা করার সময় মুসলীমপ্রধান বঙ্গের তপশীল দেন, সেই তপশীলে এই জেলার কোনও উল্লেখ ছিল না; কিন্তু শাসন বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছিল কিনা তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; সীমানির্ধারণ কমিশন এই অঞ্চলের কোন প্রতিনিধি কিম্বা মন্তব্য গ্রহণ করে নাই। কোনও কারণেই এই অনাবৃত অঞ্চল মুসলীম বঙ্গে যাইতে পারে না, পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত না থাকায় শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এই অঞ্চল হয় আসাম প্রদেশে কিম্বা সংলগ্ন স্বাধীন ত্রিপুরার সহিত যুক্ত হইতে পারে। বিচারপতি রাডক্লিফ কোন আইনে বলিলেন যে চট্টগ্রামের মালিকই এতদঞ্চলের স্বাভাবিক অধিকারী, ধর্ম্ম কিম্বা নৃতত্ত্ব কোন কারণেই চট্টগ্রামের সহিত এই উপজাতিদের কোনও সম্পর্ক নাই। স্যার সিরিল রাডক্লিফএর বিচার দেখিয়া মনে হয় বিচারক সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই বাংলাদেশ ভাগ করিতে বসেন নাই। তাঁহার হিসাবে আছে একদিকে কলিকাতা নগরী ও অপরদিকে বাংলাদেশ; কাজেই মুসলিম বঙ্গ কিসে দাঁড়াইবে, আয়তনে, জনসংখ্যায় কিম্বা খাতুজ দ্রব্যে, কয়লার বদলে হাইড্রো-ইলেকট্রীক স্কীমের সুবিধা দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত ত্রিস্রোতার অববাহিকা ভূমি, নিদেন পক্ষে সুসঙ্গ দুর্গাপুর, চট্টগ্রামের (পার্ব্বত্য) কাঠ, সুন্দরবনের কাঠ ও মধু, দিনাজপুরের কাটারীভোগ চাউল, সেতাবগঞ্জের কিম্বা দর্শনার চিনি পাটগ্রাম ও তেঁতুলিয়ার উৎকৃষ্ট তামাক, কলিকাতা মহানগরীর বদলে না দিলে, নবজাত প্রদেশের চলে কি করিয়া! শরিয়ৎএর আদর্শে সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে এক কোটী বার লক্ষ হিন্দুর বলিদান, মোটেই অসঙ্গত নহে। স্পষ্টভাবে এই রকম না বলিলেও কতকটা যে এইরকম ভাব তাহা সুস্পষ্ট। কাজেই আগে হইতে আক্রাম খাঁ সাহেব যে দোহার টানিয়া চলিতেছেন, ইহা কি একেবারে না দেখিয়া অন্ধকারেই কোপ মারা। ম্যাকডোনাল্ডের স্বজাতি স্যার সিরিল রাডক্লিফ বিচারকের আসনে বসিয়া মূলনীতি, "দুই পক্ষের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি" ও ন্যায় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া দুরপনেয় অন্যায় করিয়াছেন। সীমানির্ধারণ কমিশনের সভাপতি হইয়া তিনি প্রকাশ্য বৈঠকে উপস্থিত হন নাই, যে অঞ্চল দিয়া সীমারেখা টানা হইয়াছে তাহাও তিনি নিজ চোখে দেখিবার সুযোগ বা প্রয়োজন বোধ করেন নাই, দুইপক্ষ সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি "কাঁচি" হস্তে বাংলার মানচিত্র সোজা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য দুইভাগ মন্তর দিয়া মানসিক সংযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন! কাজেই এই অনুমান কষ্টসাধ্য নহে যে, ইহা বিচার নহে, রাজনীতিজ্ঞের কৌশলমাত্র। ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের বাঁটোয়ারা অপেক্ষাও এই রায় আরও অসন্তোষজনক, স্বাধীনতার পূজারী বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও ক্লীব করা চাই, ইহাই বাঁটোয়ারার মৌন নির্দেশ।

তপশীল নং ১

দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী ও রংপুর জেলার সংলগ্ন ভূভাগ। অযৌক্তিকভাবে এই ভূভাগকে পাকিস্তানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিভাগ কি পশ্চিমবঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া গৃহবিবাদ স্থায়ী করিবার জন্য ?

থানার নাম	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন বর্গমাইল
তেঁতুলিয়া	১৩১৯০	১৭২৮২	১৫০
পাঁচগড়	১৫৮০৭	১৭৮০৭	
বোদা	৩৬৭৪২	৩৭৮৪৪	৩৫২
দেবীগঞ্জ	৪১৫৮৪	১৪৯২৭	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৫৬৮	১০০
সম্পূর্ণ ঠাকুরগাঁমহকুমা	২৯২১২৮	২৮৯১০৭	৫১৭৫
ধামাইর হাট *	৩২৪৪২	২২২৪১	১১৬
বিরল	৩৫৯৭০	৩১৬৪২	১৩৭
দিনাজপুর	৫০২২৬	৫১৬৯২	১৩ ৭
হাতিবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	১১১
ডিমলা	৫১১০৩	৪০৬৫৫	১২৭
	৬৩৩৫২৭	৫৮৩৯৪৮	২৪০৫

* বালুরঘাট থানার সংলগ্ন এই থানাকে পূর্ব্ববঙ্গে জুড়িয়া দেওয়ার কি কারণ হইতে পারে?

তপশীল নং ২

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমপ্রধান থানাগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা :—

থানা	অমুসলমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা	আয়তন
হরিহরপাড়া	১৬৩১৬	৩৮৭৬৩	৯৮
ডোমকল	১৫৪৯৩	৬১০১০	১১৭
নওদা	২৩১৫৬	৩৪২৯৪	৮৯
জলঙ্গী	১০৮৮৪	৪৫৩২৬	৭৭
বেলডাঙ্গা	৬৭৩৩৪	৭৭৩০০	১৪৩
সমশেরগঞ্জ	৩৯৭৮৭	৮০৯৩০	১০০
সুতী	৪০৭৬০	৫১৪১৪	১০২
রঘুনাথগঞ্জ	৫৫৫৭০	৭২৩১৭	১০২
লালগোলা	১৭৪৪৬	৫৩২১৭	৮৪
ভগবানগোলা	১৪৮৩২	৬৪৩২৭	১১৭
মুর্শিদাবাদ	১৯০০০	২৪২২৯	৬০
রাণীনগর	১৬০২৩	৭৫০৯৩	১২৩
বনগ্রাম	৪০৯৫৫	৫৩০৬১	২২৬
গৈঘাটা	১৫০৪৭	২৪০৪১	৯৪
করিমপুর	২১৪৪০	৭৯৮৩২	১৭২
তেহাট্টা	৩৯৯০২	৫২৬৩৭	১৭৫
নাকাশীপাড়া	৩২০৪১	৩৪৭৮৬	১৪০
চাপড়া	২০৩০০	৫০০২১	১৩১
হরিণঘাটা	১৯৯৫৩	১৪৫৪৫	৬৫
হাঁসখালি	৯৭১৫	২৭৮০৬	১০৩
হরিশ্চন্দ্রপুর	৪৩২৭৮	৫৬৬৯৬	১৫০
খরবা	৪১৯১৪	৬১১৪৮	১৪২
রতুয়া	৪৪৩৭৫	৫৮৬১০	১৫৪
কালিয়াচক	৭০২৯৮	১২৪০০৬	২০৭
মুরারাই	৪৬২৬৯	৫৫৭৫০	১৩৮
মাটীয়াবুরুজ	৪৬৭৩৮	৫৬১৩৪	৪
ভাঙ্গড়	৪৮২১১	৬৫৯৭২	১২৭
হাবড়া	২৯৩১৯	৪২৩৯৯	১০৯
দেগঙ্গা	১৯৫০৯	৪৫১৯৯	৭৮
বারাসত	৩৯৭৩৪	৫৯৩৩০	১০৪
আমডাঙ্গা	১৫৪৭৯	২০৭১৭	৫৪
স্বরূপনগর	২৬৩০৮	৩১২৩৪	৮১
বাদুড়িয়া	৩৩৮৫৪	৪৯৮৩০	৮১
	১,২৫৪,২২	১৭৪০৯৭৪	৩৭৩৭

তপশীল নং ৩

পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা

(এই হিসাবে অসংলগ্ন হিন্দুপ্রধান থানা কিম্বা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ধরা হয় নাই)

থানা	জন সংখ্যা অমুসলমান	জন সংখ্যা মুসলমান	আয়তন বর্গ মাইল
অভয়নগর	৩৯৭৪৩	৩০৫০৫	৯৫
শালিখা	২২৪২০	২০৮৯৩	৮৮
নড়াইল	৬২৫৯০	৪৮০৯৩	১৪৮
কালিয়া	৬১৬৩৪	৬১৫৩৫	১১৮
বাটিয়াঘাটা*	৩৯৬৬৮	১৭৬৫২	৯৭
দৌলতপুর*	৩১৯২৪	২৫০৮৮	৩৪
দাকোপ*	৫৩৬৪৩	১০৬৪৬	১১০
তারাখাদা*	৩৪৭২০	৩২০৭০	৮৩
খুলনা*	৪৪৯৬৫	২৫৮৫৩	৩৮
দামুরিয়া*	৫৮২৮০	৪৭৮৪০	১৭৪
পাইকগাছা*	৯১১৭৫	৭৯৬৫৯	২৪৭
কচুয়া*	৩৫০৩৩	৩১০৩০	৬৫
বাগেরহাট*	৬৫৩১৪	৫৫০১৪	১২৬
ফকিরহাট*	৩২৭৬১	২০৭০৩	৬১
মোল্লাহাট*	৫৩৬৩১	৫৭৮৪৭	১১৬
রামপাল*	৫৪৮৪৯	৫০০২৮	১৯৪
দেবহাট্টা*	২৬১০৬	১৯৩০৯	৬৮
আশাশুনি*	৬০৭৩৬	৫৬১২১	১৫৮
শ্যামনগর*	৬১৬৩৭	৫৩৯০৯	১৭৬
গোপালগঞ্জ মহকুমা	৩৪৮৭৭৯	২৬৮২৩৩	৬৭২
বালিয়াকান্দী	৪৮৬৬৩	৪৬০৯২	১২৫
রজৈর	৬০৪৫৯	৫৭৭৩৮	১০০
গৌড়নদী	১২৩৮৭৭	৯১৩৬৭	২০০
উজীরপুর	৫৮৭৫৬	৬৭৮৩০	
ঝালকাঠি	৭০৫৭৫	৬২৮৯০	৯০
স্বরূপকাঠি	৬০৮৮৫	৫৫৫১৩	১৫০
নাজিরপুর	৪২৯৬১	৩৫৫৪১	
বোয়ালিয়া	২৮৪২০	২০৩৬০	২৫০
গোদাগাড়ী	৩২৮৯৭	৩৪৩০৬	
নাচোল	২৩২১৫	৭১৫০	১১০
দিনাজপুর	৫০২২৬	৫১৬৯২	২৭৪
বিরল	৩৫৯৭০	৩১৬৪২	
হরিপুর	১৩৫২৫	১৪১৮৩	৩৮৮
পীরগঞ্জ	৩৭৪৩৭	৩৭৬০২	
বীরগঞ্জ	৪৪৭৪৩	২৩৩২৭	
ধামাইরহাট	৩২৪৪১	২৯২৪১	১১৬
হাতীবাঁধা	৩৩২৯৮	৩৩১৮৩	১১১
ডিমলা	৫১১০৩	৪০৬৫৫	১২৭
দেবীগঞ্জ	৪১৫৮৪	১৪৯২৭	৩৫২
পাচগড়	১৫৮০৭	১৭৮০৭	
বোদা	৩৭৮৪৪	৩৬৭৪২	
পাটগ্রাম	৩১০৩৭	২০৫৬৮	১০০
	২২৫৫৪২৭	১৮৪২৩৮৩	৫৩৬১

* খুলনা জেলার সংলগ্ন থানা সমূহ।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব



(স্টেট্ গেস্ট)

অচলগড় প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম মন্দাকিনী কুণ্ডের জীর্ণ ঘাটে। ঘড়ি খুলে দেখলুম পাঁচটা বাজতে দেরী আছে। আমাদের বাস্ ঠিক পাঁচটায় আসবার কথা। সিরোহী বাস সার্ভিস্ কোম্পানীর ম্যানেজার স্বয়ং আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন অচলগড়ে। কাজেই আমরা নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ৫টা থেকে ৬টায় এসে দাঁড়ালো, তবু বাসের দেখা নেই। অচল গিরিশৃঙ্গ হ'তে অস্তাচল বোধ করি বেশী দূর নয়, কারণ সূর্য্য বেলাবেলিই ডুবে গেলেন। ৬টার আগেই বাড়ী ফেরার কথা ছিল, কাজেই আমরা কেউ গরম কাপড় সঙ্গে আনিনি। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপটুকুও চলে গেল। পাহাড়ী শীতের নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনশ্রুত হলেও অননুভূত যে নয় এটা অতি দ্রুতই বোঝা যাচ্ছিল।

অচলগড়ের ধ্বংসস্তূপের উপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তিমিরাবরণ নেমে এল। মিলিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে আগাছায় ভরা চারপাশের জঙ্গল, কুশবন, নুড়িপাথর, মন্দির চূড়া, গিরিগুহা। ঠাণ্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম বাড়ী ফেরবার জন্য। সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার চারিদিক থেকে অধীর যাত্রীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এমন শুষ্ক করুণ মুখে নতশিরে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁকে কিছু বলতে মায়া হচ্ছিল। বেচারা বার বার জোড় হাত ক'রে সকলকে জানাচ্ছিল যে "আমিও তো



ট্রেণের কামরায় নবনীতা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি—কেন যে গাড়ী আসছে না—কেমন ক'রে বলবো? দু'টো ট্রিপ্ যাবার সময় উৎরে গেছে। দুখানা বাসের একখানারও দেখা নেই—আমি কিছু বুঝতে পারছিনি। কোনোও এ্যাকসিডেন্ট্ হয়েছে কি পথের মাঝে

দুখানা গাড়ীরই কল বিগড়ে ব্রেক্ ডাউন হয়েছে কিছুতো জানতে পারছিনি !"

শীত বাড়ছে। সন্ধ্যা গভীর হয়ে আসছে। আর বাইরে থাকা চলে না। নবনীতার মা চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেয়ের ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয়ে। তাঁর নিজের শরীরও একেবারেই ঠাণ্ডা-সহ নয়। জঙ্গলে মশার উপদ্রব শুরু হ'ল। অগত্যা আমরা সকলে মিলে নিকটস্থ একটি ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। অন্যান্য যাত্রীরা সবাই একটি বাঁধানো বটগাছের তলায় বসে জটলা করতে লাগলেন।

ভাগ্যে থার্ম্মোফ্লাস্কে ভরে কিছু চা ও টিফিন ক্যারিয়ারের মধ্যে সামান্য টিফিন আনা হয়েছিল, ক্ষুধার্ত্ত কন্যাসহ আমি ধাতস্থ হলেম। বাবাজী চায়ের ফ্লাস্কেই খুশি। একটি পাহাড়ী রাজপুত মেয়ের কাছে কিছু ছোলাভাজা কিনতে পাওয়া গেল। ছোলা ভাজা চিবুতে চিবুতে রাজপুতানীর সঙ্গে দেবী তাঁর বান্ধবী সহ গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটির স্বামী খুব জোয়ান ও পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। তার নিজেরও ঐ রোগ ধরেছে। কিন্তু এখানে কোনও ডাক্তার কবিরাজ নেই। ওষুধপত্র পাওয়া যায়না। 'বোখারে' ভুগে অনেক লোক মারা পড়েছে।

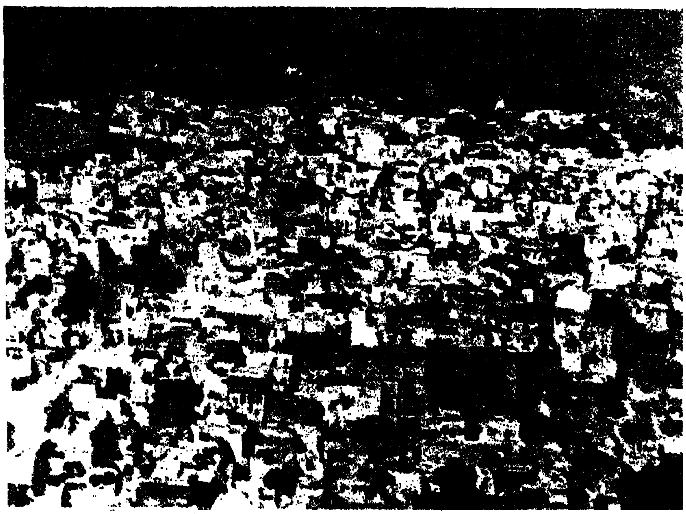
দেবী তাঁর 'হাতব্যাগ' খুলে কি একটা ওষুধ বার করে দিলেন তাকে। বলে দিলেন 'বোখার' ছাড়লেই মুখে ফেলে জল দিয়ে গিলে খাবে। মেয়েটি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'সেলাম করে চলে গেল। আমরা মনে করলুম নিশ্চয় 'কুইনিন সালফেটের' ৫ গ্রেণ বড়ি তিনি ওকে দিলেন, কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করে জানলুম 'কুইনিন' নয়, সেগুলি বায়োকেমিক্—'ফেরাম ফস' ট্যাব্লেট! বললুম—এ পাহাড়ী ম্যালেরিয়া সারানো 'বায়োকেমিকের' কাজ নয়।

শ্রীমতী বায়োকেমিকের পরম ভক্ত। কাজেই এই বেফাঁস মন্তব্য নিয়ে যখন তর্ক যুদ্ধ জমে উঠবার উপক্রম, 'ভোঁ ভোঁ' করে বাসের হর্ণ্ আর ঘর্ ঘর্ শব্দে ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। শ্যামের বাঁশী শুনে শ্রীরাধা বোধ করি যেমন ব্যাকুল হ'য়ে ঘর ছেড়ে যমুনাতীরে ছুটে যেতেন তেমনি করেই এঁরা বাসের হর্ণ্ শুনতে পেয়ে আলুথালু হয়ে ছুটলেন।

সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার আমাদের জানালেন যে, দুখানা বাসের ড্রাইভারই পর পর দু'টি ট্রিপ নিয়ে গিয়েই ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছে। এইজন্য বাস আসতে এত দেরী হ'ল।

আমি বললুম—কিন্তু আবু থেকে যে আমাদের মোটর সিরোহীতে আসবার কথা ছিল ঠিক ৬টায়। এখন ৭টা বেজে গেছে। সিরোহী পৌঁছতে আমাদের আরও বিশ মিনিট কি আধঘণ্টা লাগবে। আবুর মোটর যদি এতক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা না ক'রে চলে গিয়ে থাকে তাহ'লে আমাদের আবু ফেরবার উপায় কি হবে?

সিরোহী মোটর সার্ভিসের ম্যানেজার প্রতিশ্রুতি দিলেন আমাদের গাড়ী অপেক্ষা না ক'রে যদি চলে গিয়ে থাকে, তা'হলে এই বাসই আমাদের মাউণ্ট আবু পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।



যোধপুর—নূতন সহর ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঁচা গেল। একটা মস্ত দুর্ভাবনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলুম। গাড়ীতে উঠে আর কোনও কথা নয়—শুধু ঐ ম্যালেরিয়া! ঈস! এ কোথায় এসেছি? এবার থেকে যেখানে যেখানে যাবো আগে সেখানকার স্থানীয় স্বাস্থ্য-সংবাদ জেনে তবে যাবো।

অচলগড়ে ম্যালেরিয়া, সিরোহীতে ম্যালেরিয়া, মাউণ্ট্ আবুতেও ম্যালেরিয়া!! এ আবার এমন পাহাড়ীয়া ম্যালেরিয়া যে জ্বর হ'লেই বেহুঁস! বাপ্! পত্রপাঠ কাল পরশুর মধ্যেই আবু ছাড়তে হবে।

সিরোহীতে পৌঁছে দেখি ভগবানের দয়ায় ও পণ্ডিতজীর কৃপায় আমাদের আবুর গাড়ী তখনও অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার গাড়ীর মধ্যে মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। দেখে ভয় হ'ল—ম্যালেরিয়ায় 'বেহুঁস' নয়ত? ডাকাডাকি করতে ধড়্মড়িয়ে উঠলো। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম—তবিয়ৎ আচ্ছা তো? গাড়ী লে'যানে সেকেগা? বোখার নেই আয়া?

নেতিবাচক উত্তরে আশ্বস্ত হয়ে—গাড়ীতে উঠে বাড়ী ফিরলুম।

বাসায় পৌঁছেই একেবারে অর্ডেনান্স জারি করে দিলুম—গোটাও তোমাদের আস্তানা। বেঁধে ফেলো সব জিনিস পত্র। পরশু সকালেই রওনা দেবো—যোধপুর। অন্তু এখানে নয়। মাউন্ট আবুর সুখ-স্মৃতিটুকুই স্মরণে থাক, তাকে আর জ্বরের ধমকে বিকারের ঝোঁকে বিকৃত ক'রে কাজ নেই। "চলো মুশাফের্—বাঁধো গাঁঠ্রিয়া—"

পরদিন বেলা ১টায় আমরা আবু পাহাড় থেকে আবু রোড ষ্টেশনে নেমে এলুম। সেখান থেকে আহমেদাবাদ—দিল্লী মেলে রওনা হ'য়ে আবার 'মাড়ওয়াড়' ষ্টেশনে এসে নামলুম গাড়ী বদল করতে। বেলা ৫টা নাগাদ যোধপুর—বিকানীর ষ্টেট্ রেলওয়ের গাড়ী ধ'রে রাত্রি ৮॥টায় যোধপুর ষ্টেশনে পৌঁছলুম।

যোধপুরের ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আমাদের স্থপতিবন্ধু শ্রীমান ভূপতি চৌধুরী একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন। ভূপতির সহপাঠী ছিলেন তিনি। উভয়ের অবস্থানের মধ্যে আজ যথেষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব আজও নিকটতমই আছে। আমি মাউন্ট আবু থেকে তাঁকে আমাদের যোধপুরে পৌঁছবার সময়টা জানিয়েছিলুম এবং সেখানে তাঁর জানা কোনও একটি ভালো হোটেলে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে রাখতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেছিলুম।

গুপ্ত সাহেব দেখি স্বয়ং আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে নিজের মোটর সহ এসে হাজির হয়েছেন। বহুসমাদরে আমাদের গাড়ী থেকে তিনি নামিয়ে নিলেন। তারপর আর আমাদের কিছু করতে হল না। কুলির ব্যবস্থা করে আমাদের সঙ্গের ২২টি লগেজ নামিয়ে ফিটনে বোঝাই ক'রিয়ে দিয়ে ভোলানাথকে তার সঙ্গে দিয়ে আমাদের তিনি মহারাজার পাঠানো ল্যাণ্ডো জুড়িতে এবং নিজের মোটরে ভাগাভাগী-করে নিয়ে চললেন যোধপুর রাজ্যের নূতন রাজধানীতে।

ষ্টেশনে শুল্ক ও আবগারী বিভাগের রাজকর্ম্মচারীরা প্রত্যেক নবাগত যাত্রীরই মালপত্র আটক করছিলেন—নগরে নিষিদ্ধ দ্রব্য বা পণ্য কিছু শুল্ক ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য। আমাদের পাঁচটি মানুষের সঙ্গের ছোট বড় ২২টি লাগেজ অত্যন্ত সন্দেহজনক! কর্তব্য-পরায়ণ রাজকর্ম্মচারীরা ধরেছিলেনও ঠিক আমাদের মালপত্র পরীক্ষার জন্য। কিন্তু স্বয়ং ষ্টেট্ ইঞ্জিনীয়ার গুপ্ত সাহেব আমাদের জামীন দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্বে সমস্ত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুটি কথা শুধু তাঁর মুখে শুনলুম—এঁরা 'ষ্টেট্-গেষ্ট্'...exempted from inspection!

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তো বেশ বুদ্ধি করে আমাদের ষ্টেশন পার করে নিয়ে এলেন, কিন্তু ওরা যদি জানতে পারে যে আমরা হোটেলে উঠেছি, তখন হয়ত' আবার জ্বালাতন ক'রতে আসবে? গুপ্ত সাহেব হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন—ভয় নেই। আপনাদের শুভাগমন বার্তা যথাসময়ে মহামান্য মহারাজা বাহাদুরের কর্ণগোচর হয়েছিল। রাজ আদেশে আপনাদের ষ্টেট-গেষ্ট্ রূপে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা হাত জোড় করে বললুম—দোহাই মশাই! আমরা 'রাজ-অতিথি' হওয়ার চেয়ে কোনও হোটেলে সাধারণ পরিব্রাজকরূপে থাকতে পারলেই সুখী হবো। কারণ, রাজকীয় ব্যাপারে আমরা মোটেই অভ্যস্ত নই! গুপ্ত সাহেব বল্লেন—হোটেলে থাকলেও—আপনারা যোধপুর রাজের 'ষ্টেট-গেষ্ট্' হয়েই থাকবেন। কিন্তু মহারাজের 'গেষ্ট্-হাউস্' খালি থাকলে—রাজ-অতিথিদের ষ্টেট্হোটেলে উঠতে দেওয়া হয় না। গেষ্ট্-হাউসে স্থানাভাব ঘটলে তখন অতিরিক্ত অতিথিদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আপনাদের থাকার



রাজকীয় দপ্তরখানা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

জন্য মহারাজার 'গেষ্ট্-হাউসে' সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে রাখা হয়েছে। আপনাদের সেখানে কোনও অসুবিধা হবে না।

জিজ্ঞাসা করলুম—গেষ্ট্-হাউসে উপস্থিত আর কোন্ কোন্ অতিথিরা আছেন? গুপ্ত সাহেব বললেন—আপনারা সপরিবারে এসেছেন। যাঁরা ফ্যামিলি নিয়ে আসেন তাঁদের পৃথক বাড়ী দেওয়া হয়। আপনাদের জন্য গেষ্ট্-হাউসের দুটি পৃথক কোয়ার্টার যুক্ত অর্থাৎ একটি দো-মহলা বাড়ী সম্পূর্ণ রিজার্ভ রাখা হয়েছে। আপনারা সেখানে যে ভাবে খুশী থাকতে পারবেন। কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

য়ুরোপীয় বা ভারতীয় যে প্রথা পছন্দ করেন সেই রকম ব্যবস্থাই করা হবে।

যোধপুর শহরের রাজপথ দিয়ে রাজঅতিথিদের নিয়ে ষ্টেটের ন্যাশোজুড়ি পথ সচকিত করে চলেছে। পীচ ঢালা প্রশস্ত রাজপথ। দু'ধারে বড় বড় বাড়ী। কতক আধুনিক য়ুরোপীয় আদর্শে প্রস্তুত, কতক বা ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য্য গৌরব ঘোষণা করছে। পথের দু'পাশে গাছের সারি। সুদৃশ্য বিজলী বাতির পোষ্ট দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। টেলিগ্রাফ্ ও টেলিফোনের তার চলেছে সারি সারি লাইন হয়ে। একবারও মনে হচ্ছে না যে আমরা বাংলার রাজধানী থেকে বহুদূরে—ভারতের অপরপ্রান্তে—রাজপুতানার এক ঐতিহাসিক সামন্ত নৃপতির স্থাপিত নগরে এসে পড়েছি। আধুনিক জগতের অতি আধুনিক শহরের সমস্ত সুব্যবস্থাই চপে পড়ছিল। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

কাহারে হেরিছ ঘুমে নিশীথে,
কাহার পরশ তাপে তোমার শ্রীঅঙ্গ কাঁপে
আপনি চাহিছ নিজে স'পিতে ?
কাহার ধেয়ান ব্রত গহন হৃদয়ে রত
উদিল তোমার কাছে স্বপনে ?
কাহার পূজার ডালা মিলন অমৃত ঢালা
লভিলে জিনিয়া সুখে গোপনে ?

কে তোমা' চাহিয়াছিল দিবসে ?
কাহার হৃদয় মাঝে ভুবন মোহন সাজে
পশিয়া হরিলে মন বিবশে ?
কে তোমা দেখেনি চোখে, অরূপ অমৃত লোকে
ভরেছ কাহার আশা গীতিতে ?
তাহারে ভোলার পরে খেয়াল খেলার ঘরে
আবার ডেকেছ হেসে নিশীথে।

তুমি কি জান না সেও গোপনে
বাহিরে দুয়ার দিয়ে ভিতরে স্বপন নিয়ে
রচিছে তোমার ছবি আপনে ?
পুলকিত পৃথিবীর কেহ কোথা নহে স্থির
তুমি যে রভসে থাক নীরবে
অসহ উন্মাদ হিয়া পলেকের শান্তি নিয়া
মৌনেরে মুখর করে গরবে।

যাহারে দেওনি কিছু আলোকে
আঁধার সাগর পারে বেদনা কল্লোল ভারে
পীড়িয়া দিয়ো না আশা ভূলোকে।
ফুটালে না যেই রাগ তাহা অমনিই থাক্
জানায়ো না চেয়েছিলে দিতে
সহজে পেয়েছ যারে মনেই মুছিয়ো তারে
ভুলিয়ো হেরেছ তারে নিশীথে।

স্বাধীন ভারত*

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

স্বাধীন ভারতে স্বাধীন আমরা স্বাধীন পথের সাথী ;
গৌরবে আজি ফুটেছে প্রভাত কেটেছে তিমির রাতি !
দুশো বছরের ম্লান জীবনের হ'য়ে যাক্ অবসান—
মায়ের চরণে শৃঙ্খল ভার ভেঙ্গে পড়ে খান্ খান্ !

আপনার ঘরে পরবাসী হ'য়ে দেশের ভক্ত বীর—
দিয়ে গেল প্রাণ ফাঁসির মঞ্চে না ফেলি' অশ্রুনীর !
কত বীর-নারী বক্ষ পাতিয়া বিদেশী-শাসনে হায়,
দিয়াছে ঢালিয়া তপ্ত রুধির দেশ-জননীর পায়।
শিয়রে জাতির হানিল বজ্র নর-রূপী শয়তান—
রক্তধারায় হ'ল বলিদান লক্ষ বীরের প্রাণ !
ভুলে যাও আজ অতীতের ব্যথা—জীবনের অপমান—
মিলিত কণ্ঠে গাও-সবে আজ জীবনের জয়গান !

বাঙ্গালীর বীর ঘর ছেড়ে গেছে সুদূর সিন্ধুপার—
বলেছে "তোমারে দেব স্বাধীনতা, দিলেও শোণিত ধার"।
কোথায় নেতাজী, দাও দেখা দাও, নূতন উষার রথে—
অনুসারী জনে নিয়ে যাও তুমি জয় গৌরব পথে।

* কলিকাতার লেক-ময়দানে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাধীনতা উৎসবে এবং অন্যান্য বহু সভা সমিতিতে শ্রীমতী ছবিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত।

সাময়িকী

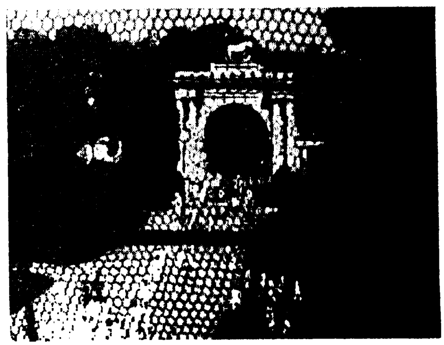
স্বাধীনতা-লাভ-উৎসব

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াও স্বাধীনতা লাভ করিল। ঐ উপলক্ষে সেদিন প্রত্যেক প্রদেশে এবং ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লী ও করাচীতে স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন গণপরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নিয়োগে ভারতের বড়লাট হইলেন। দিল্লীতে ১৪ই আগষ্ট মধ্য-রাত্রি হইতে ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে উৎসব ও বক্তৃতাদি চলিল—দিল্লীর লাল কেল্লায়—এতদিন যেখানে কংগ্রেস-সেবকগণকে আবদ্ধ রাখিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছে—তথায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িল। কিন্তু এ



স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির শোভাযাত্রা
ফটো—শ্রীসরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সকলের অপেক্ষা অনেকগুণ মূল্যবান এক ঘটনা কলিকাতা-বাসী সকলকে বিস্মিত করিয়া দিল। ১৫ইএর মাত্র ২দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতা সহরের বৎসরব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য বাঙ্গালার অনাচারী লীগ-মন্ত্রিসভার নেতা শ্রীযুক্ত এচ-এস-সুরাবর্দ্দীকে সঙ্গে লইয়া বেলিয়াঘাটার বিধ্বস্ত অঞ্চলে এক মুসলমানের গৃহে বাস আরম্ভ করিলেন। তাহার পূর্ব্বে পশ্চিম বাঙ্গালায় হিন্দু-মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছে—কাজেই গান্ধীজির কলিকাতা আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়দিন জনকতক হিন্দু নির্ভয়ে মুসলমান দমনে অগ্রসর হইয়াছিল। গান্ধীজি আসিয়া কি শান্তিবারি ছিটাইলেন তাহা জানি না—কিন্তু ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্ণ হইতে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব্ব মিলন আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ



১৫ই আগষ্ট লাটভবনের সম্মুখস্থ জনতা ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিন্দুদের স্বাধীনতা উৎসবে পূর্ণভাবে যোগদান করিল—হিন্দুপল্লীতে যাইয়া হিন্দুদের সহিত বন্ধুত্ব পুনপ্রতিষ্ঠা করিল ও হিন্দুদিগকে মুসলমান পল্লীতে পাইয়া সম্বর্দ্ধিত করিল। এইভাবে কলিকাতায় শান্তি আসিল—সাধারণ মানুষ বিস্মিত হইল—চমৎকৃত হইল—মুগ্ধ হইল। কলিকাতার খবর সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল—বাঙ্গালা দেশের সকলেই জানিল—কাজেই পাকিস্থান পাইয়াও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিল না, বরং কলিকাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলকে সাদর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। পাকিস্থানে—বাঙ্গালার হিন্দু-অধিবাসীদের মন হইতে আশঙ্কা চলিয়া গেল। ১৫ইএর আনন্দ উৎসব ১৬ই ও ১৭ই পর্য্যন্ত চলিল—তাহার পর

১৮ই আগষ্ট আসিল, মুসলমান পর্ব্ব ঈদ উৎসব। ঈদ উৎসবে হিন্দুরা যোগদান করিল—মুসলমানগণের জন্য মসজিদে মসজিদে খাদ্য পাঠাইয়া বন্ধুত্ব স্মরণীয় করিল। মহা-সমারোহে হিন্দু মুসলমান মিলিত হইয়া ঈদ উৎসব সম্পাদন করিল। কলিকাতায় ট্রামবাস সকল পথে চলিল—যে সকল পথে গত ১৯৪৬ সালের কুখ্যাত ১৬ই আগষ্টের পর হইতে হিন্দুরা যাইতে সাহস করে নাই, সে সকল পথে হিন্দু পূর্ব্বের মত অবাধে চলাফেরা করিতে লাগিল। পাছে দুষ্ট লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, সেজন্য কর্ম্মীর দল, ছাত্রের দল, নেতার দল কলিকাতার পথে পথে মিছিল করিয়া ঘুরিয়া মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ২৬শে আগষ্ট সারা কলিকাতাব্যাপী মিলন-মিছিলের প্রদর্শন



স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইল—সেদিনের দৃশ্যের কথা দর্শক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না।

গান্ধীজি কলিকাতায় থাকিয়া প্রতিদিন বিকালে এক এক পল্লীতে যাইয়া প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান দ্বারা মিলন ও পুনর্বসতি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। নূতন মন্ত্রীরা গান্ধীজির উপদেশ মত দ্রুত দাঙ্গা পীড়িতদিগকে সাহায্য করিতে ও গৃহহীনদিগকে নিজ নিজ গৃহে পুনস্থাপিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। সে কার্য্যও বেশ সাফল্য লাভ করিল।

কিন্তু আবার সহসা একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। ২রা সেপ্টেম্বর গান্ধীজির নোয়াখালী যাত্রার দিন স্থির হইয়াছিল। ৩১শে আগষ্ট রাত্রিতে একদল যুবক গান্ধীজির শিবিরে উপস্থিত হইয়া জানাইল—মুসলমানগণ সেদিন সন্ধ্যা হইতে পথে হিন্দুদের আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের সে সংবাদ তখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহারা গান্ধীজির গৃহ আক্রমণ করিল—জানালার কাচের সার্সি ভাঙ্গিয়া দিল, গান্ধীজির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করিল। ঐ ঘটনার পর হইতে সারা সহরে আবার দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়িল—হিন্দু পল্লীতে মুসলমান মরিল, মুসলমান পল্লীতে হিন্দু মরিল—উভয় সম্প্রদায়ের লোকের দোকান-লুণ্ঠিত হইল। কত ক্ষতি হইল, তাহা বলা কঠিন। ১লা সেপ্টেম্বর সারাদিন ঐভাবে চলিতে দেখিয়া মহাত্মাজী স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি রাত্রি সওয়া ৮টা হইতে আমরণ অনশন আরম্ভ করিলেন। তিনি জানাইলেন—



স্বাধীনতা উৎসবে রাজপথে ছাত্রীবাহিনী

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার আর কোন অস্ত্র নাই—আমি উপবাস করিব—যদি কলিকাতায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা বন্ধ না করে, তবে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করিব।

যেদিন ১৫ই আগষ্ট সারা ভারতবর্ষের লোক স্বাধীনতা উৎসব সম্পাদনে আত্মহারা হইয়াছিল, সেদিন ছিল, গান্ধীজির প্রিয়ভক্ত ও পুত্র-প্রতিম শিষ্য মহাদেব দেশাইএর মৃত্যুতিথি। স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজি উপবাস, চরকায় সুতা কাটা ও উপাসনায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যেদিন প্রথম গান্ধীজি কলিকাতা বেলিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করিতে যান, সেদিনও ঐ পল্লীর এক সম্প্রদায়ের লোক গান্ধীজির আগমন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল।

যাহা হউক, ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করিলেন—২রা সারাদিন অবিশ্রাম অতিবৃষ্টি চলিল। দেবতা বোধ হয় সুপ্রসন্ন হইলেন—কলিকাতার রাজপথে সোমবার যে রক্ত ছড়ান হইয়াছিল, মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে তাহা ধুইয়া গেল। বুধবার ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা আবার শান্তভাব ধারণ করিল। রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী গান্ধীজির অনশন সংবাদ পাইয়া বুধবারে কলিকাতা আসিলেন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী



লাটসাহেবের প্রাসাদ শিখরে স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

হইলেন। সহরের সকল নেতা—গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী, প্রধানমন্ত্রী ডক্টর ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মী-বৃন্দ—মুসলমান নেতৃবৃন্দ—সকল সম্প্রদায়ের নেতা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—কেহই বাদ গেলেন না—সকলে মিলিয়া কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা নিজেদের শরীর ও জীবন বিপন্ন করিয়া মঙ্গলবার অতি বৃষ্টির মধ্যেও পথে পথে ঘুরিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই দলে নেতৃত্ব করিতে যাইয়া খ্যাতনামা কর্ম্মী শচীন্দ্রনাথ মিত্র ও স্মৃতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাণ দিলেন—আরও অনেকে আহত হইলেন। কিন্তু প্রহার ও হত্যা সহ্য করিয়াও সকলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় একাগ্রতা দেখাইলেন। ফলে শান্তি আসিল। বুধবার ও বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণ কলিকাতা দেখিয়া ৭৩ ঘণ্টা অনশনের পর মহাত্মা গান্ধী বৃহস্পতিবার রাত্রি সওয়া ৯টার সময় অনশন ভঙ্গ করিলেন। তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ৭জন নেতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং গিল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ আর-কে-জৈড্‌কা গান্ধীজির নিকট নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি দান করিলেন—



রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ স্বাধীন ভারতের পতাকা

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

"আমরা গান্ধীজির নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে যখন কলিকাতায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে তখন আমরা সহরে আর কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করিতে দিব না এবং মৃত্যুপণ করিয়া উহার প্রতিরোধের চেষ্টা করিব।"

তাঁহার পূর্ব্বে আচার্য্য কৃপালনী প্রধান মন্ত্রীর গৃহে শতাধিক নেতার উপস্থিতিতে নিম্নলিখিত ৮জন নেতাকে লইয়া শান্তি কমিটী গঠন করেন—(১) মৌলানা আক্রাম খাঁ (২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (৩) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (৫) মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দি (৬) শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় (৭) শ্রীযুক্ত

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইস-চ্যান্সেলার) ও (৮) ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

গান্ধীর অনশনে সারা ভারতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বহু কর্ম্মী অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মীরা—যাহারা এতদিন তাহাদের লাঠিবাজির জন্য কুখ্যাত হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে উত্তর কলিকাতার প্রায় ৫শত পুলিশ বৃহস্পতিবার সারাদিন গান্ধীজির সহিত উপবাস করিয়া নিজ নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

১৪ই আগষ্টের শান্তিপ্রতিষ্ঠা যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, ৪ঠা সেপ্টেম্বরের শান্তিও তেমনই কি করিয়া সম্ভব হইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। গান্ধীজির ৭৩ ঘণ্টা



রেড ক্রস্ আফিসের সম্মুখে ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

অনশন—তাহার সঙ্গে শচীন্দ্র মৃতীশ প্রভৃতির জীবনদান—সত্যই কি আমাদের মনকে পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? এই কথাই আজ বার বার মনে পড়িতেছে।

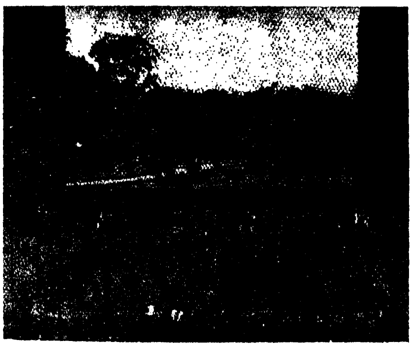
পাঞ্জাবে হাঙ্গামা—

সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের রায় প্রকাশের পর হইতে পাঞ্জাবের উভয় খণ্ডে—মুসলমানপ্রধান পশ্চিম-পাঞ্জাব ও হিন্দুপ্রধান পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছে তাহার বিবরণ দেওয়া যায় না। উভয় খণ্ডে কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাবের মুসলমানগণ যেমন তথায় শিখ ও হিন্দুদিগকে ধ্বংস করে, পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরাও সেইভাবেই মুসলমানদিগকে হত্যা করে। লর্ড মাউণ্টবেটেন, কায়েদে আজম জিন্না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান নেতারা কয়দিন ধরিয়া উভয় অংশে দল বাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ফল তেমন হয় নাই। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে প্রায় সকল হিন্দু ও শিখ পলাইয়া আসিয়াছে, কতক পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে স্থান পাইয়াছে—বাকী সব দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গালা এমন কি সুদূর মাদ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুসলমানগণও পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হইতে কতক পূর্ব্ব দিকে চলিয়া আসিয়াছে, কতক পশ্চিম দিকে গিয়াছে। ইহার ফলে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা পাঞ্জাব আজ শ্রীহীন, বিধ্বস্ত। পাঞ্জাব প্রদেশে সেচের ব্যবস্থার ফলে কৃষি যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, ভারতের কুত্রাপি আর সেরূপ হয় নাই। কিন্তু আজ পাঞ্জাবের অবস্থা ও সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের অবস্থা কল্পনা করিলেও হৃদয় আতঙ্কিত হয়। রেলপথগুলি নষ্ট করা হইয়াছে—মোটর যাতায়াতের পথ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাজেই পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টকে উড়োজাহাজে করিয়া অধিবাসীদের সরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। খাদ্যহীন ভারতে আজ আবার নূতন করিয়া কয়েক কোটি লোক খাদ্যহীন ও আশ্রয়হীন হইয়া পড়িল—কে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে কে জানে? শান্তিদূত মহাত্মা গান্ধী আজ অনশনজীর্ণ শরীর লইয়াই দিল্লী গমন করিয়াছেন। সারা ভারতের লোক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে, গান্ধীজির শান্তি প্রচেষ্টা সার্থক হউক, সাফল্যমণ্ডিত হউক।

পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন যে পশ্চিম বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই—তবে নভেম্বর মাসে নূতন ফসল না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্যবণ্টন সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করা যাইবে না। কিন্তু আমাদের ত অন্যরূপ অবস্থা ভোগ করিতে হইতেছে। রেশনের দোকানে চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাত খায়, আটা লইয়া তাহার ক্ষুধা মেটে না। কয়েক সপ্তাহ শুধু মোটা আতপ চাউল খাইতে হইয়াছে—ফলে সর্ব্বত্র উদরাময় ও আমাশয়ে লোক কষ্ট পাইতেছে। খাদ্যরূপে

গ্রহণের উপযুক্ত চাউল এখনও পাওয়া যায় না। বাজারে অন্যান্য সকল খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, ডাইল ও তরিতরকারী দুষ্প্রাপ্য—মাছ ত দুর্লভ বলিলেই হয়। ১ টাকা সের দরে ডাইল ও তিন টাকা সের দরে মাছ কিনিবার অবস্থা কয়জন বাঙ্গালীর আছে, প্রধানমন্ত্রীর তাহা অজ্ঞাত নহে। দুগ্ধ বা ঘৃতের কথা না বলাই ভাল। আলু, গুড় প্রভৃতি যাহাতে নূতন বৎসরে প্রচুর উৎপন্ন হয় ও বাজারে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, সেজন্য সরকারী চেষ্টা অবিলম্বে প্রয়োজন। সব্জী চাষেও দেশবাসীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।



লাট সাহেবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় নূতন শ্রমিক-নীতি—

২৬শে আগষ্ট কলিকাতায় এক সাংবাদিক সভায় পশ্চিম বাঙ্গালার শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন মন্ত্রিসভার শ্রমিক-নীতি প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শ্রমিকদিগকে লাভের অংশ প্রদান করার ব্যবস্থা হইবে। ধনী দ্বারা শ্রমিক-শোষণ বন্ধ করা হইবে। ফলে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে।

গভর্ণরদের বেতন—

২১শে আগষ্ট ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন—প্রত্যেক গভর্ণর সমান বেতন পাইবেন—তাঁহাদের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা। মাদ্রাজ ও বোম্বায়ের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণরদ্বয় পূর্ব্ব বেতন পাইবেন। গভর্ণরদের বেতন আয়কর মুক্ত নহে—ফলে তাঁহাদের মাসিক প্রকৃত বেতন হইবে তিন হাজার টাকা। পূর্ব্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণররা বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, পাঞ্জাব ও বিহারের গভর্ণর ১ লক্ষ টাকা, মধ্য প্রদেশের ৭২ হাজার টাকা ও উড়িষ্যার গভর্ণর ৬৬ হাজার টাকা বেতন পাইতেন।

পশ্চিম বাঙ্গালায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—

৩১শে আগষ্ট মধ্যরাত্রির পর হইতে বাঙ্গালা দেশের সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়া দিয়া ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের অনুরূপ করা হইবে। সকল সরকারী অফিস নূতন সময়ের ১০টা হইতে কাজ করিবে।



ডালহৌসী স্কোয়ারে নেতাজী তোরণ

ফটো—শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতায় ইলেকট্রিক ট্রেণ—

কলিকাতায় শীঘ্রই ইলেট্রিক ট্রেণ চলাচল করিবে। দমদম হইতে চিৎপুর, বাগবাজার, নিমতলা ঘাট ও হাওড়া পুল হইয়া পোর্ট কমিশনারের রেল যে পথে গিয়াছে সেই পথে ফেয়ারলী প্লেস পর্য্যন্ত রেল চলিবে। পরে দক্ষিণ দিকে বাড়াইয়া উহা মাঝেরহাট পর্য্যন্ত যাইবে। বেলগাছিয়া, চিৎপুর, কুমারটুলী ঘাট, নিমতলা ঘাট, হাওড়া পুল ও ফেয়ারলী প্লেসে প্রথমতঃ ষ্টেশন খোলা হইবে। পরে ক্রমশঃ (১) হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান—হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড ও হাওড়া-ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান উভয় পথে (২) শিয়ালদহ হইতে কাচড়াপাড়া হইয়া রাণাঘাট, দমদম হইতে বনগাঁ, শিয়ালদহ হইতে বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর ও ক্যানিং (৩)

হাওড়া হইতে খড়্গপুর ষ্টেশনের সকল পথেই ইলেকট্রিক ট্রেণ চলিবে।

মাদ্রাজে মাদক বর্জ্জন—

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে মাদক বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী অক্টোবর মাস হইতে মাদ্রাজের ২।৩ ভাগ মাদক বর্জ্জিত হইবে। ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, নীলগিরি, মাদুরা, মালাবার, নেলোর, গুণ্টুর ও দক্ষিণ কানারায় নূতন ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বে তেলেগু অঞ্চলের ৫টি ও তামিল অঞ্চলের ৩টি জেলায় মাদক বর্জ্জিত হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লী ও ভিজিয়ানাগ্রামের ২টি স্কুলে ১৫০ জন পুলিশ কনেষ্টবলকে মাদক বর্জ্জন কার্য্য শিক্ষা দান করা হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় নিয়োগ—

বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ কমিটীর নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইবার পর নিম্নলিখিত ৪টি জেলায় নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়োগ করা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে দেওয়া হইল—(১) পশ্চিম দিনাজপুর—মিঃ বি-কে আচার্য্য ও (শ্রীযুক্ত বিপুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না আসা পর্য্যন্ত, শ্রীপ্রফুল্ল দত্ত (২) নবদ্বীপ—শ্রীদেবব্রত মল্লিক ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (৩) মুর্শিদাবাদ—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীনীরোদচন্দ্র সেনগুপ্ত (৪) মালদহ—শ্রীরাধারমণ সিংহ ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে হাইকোর্ট—

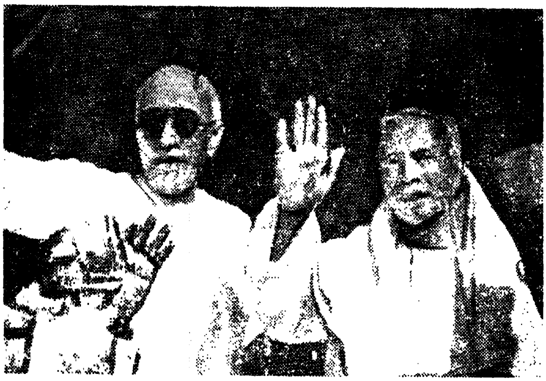
পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে নূতন হাইকোর্ট হইয়াছে, দেওয়ান রামলাল তাহার প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজন, সর্দ্দার বাহাদুর তেজ সিং, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্ত অছরুরাম ও শ্রীযুক্ত গোপালদাস খোসলা পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বিভাগ নির্ণয়—

পূর্ব্ববঙ্গে ২টি বিভাগ পুনর্গঠন করা হইয়াছে—চট্টগ্রাম বিভাগে থাকিবে—চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট। রাজসাহী বিভাগে থাকিবে—রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, খুলনা, যশোহর ও নদীয়া। কুষ্টিয়া মহকুমা ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমা লইয়া নূতন নদীয়া জেলা হইয়াছে—তাহার সদর হইয়াছে কুষ্টিয়া সহর।

গান্ধীজিকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা—

গত ২৪শে আগষ্ট রবিবার কলিকাতা ময়দানে অক্টারলোনা মনুমেণ্টের নিকট মাঠে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে পৌর-সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই তৃতীয়বার কর্পোরেশন হইতে গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা করা হইল। উত্তরে গান্ধীজি কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।



১৫ই আগষ্ট লাটভবনে পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী ও প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ফটো—শ্রীপান্না সেন

সীমান্তে নূতন মন্ত্রিসভা—

সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর পুরাতন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। খাঁ আবদুল কোয়াম খাঁ প্রধান মন্ত্রী ও খাঁ মহম্মদ আব্বাস খাঁ অন্য মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খান্না মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা টালীগঞ্জে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীকে বিহারে বাঙ্গালীদের অধিকার স্বীকৃত হইবে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে গান্ধীজি

লিয়াছেন—"ভারতের প্রত্যেক নাগরিক ভারতের প্রত্যেক অংশে সমান অধিকার পাইবেন। বিহারে বাঙ্গালীদের ও বেহারীদের সমান অধিকার থাকা উচিত; কিন্তু বাঙ্গালীগণকেও বিহারীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে হইবে। তাঁহারা বিহারীগণকেও শোষণ করিবেন না। তাঁহারা বিহারকে বিদেশ বলিয়া মনে করিবেন না বা বিহারে গিয়া বিদেশীর মত ব্যবহার করিবেন না।"

দেশোন্নতিকর ব্যবস্থা বাবদ—১ কোটি ৩৩ লক্ষ

পথ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ বাবদ—৩ কোটি।

চোরা বাজার বন্ধের আইন—

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট চোরা বাজার বন্ধের জন্য ২৯শে আগষ্ট নূতন জরুরী আইন ঘোষণা করিয়াছেন। বিচারে ৬ মাস হইতে ৭ বৎসর কারাদণ্ড ও 'যে কোন পরিমাণ' অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। আপাতত ৬ মাস এই আইন



বাংলার বয়েজ স্কাউট প্রতিনিধিদলের ফ্রান্স যাত্রা ফটো—শ্রীপান্না সেন

ভারতের নিকট বাঙ্গালার ঋণ—

বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি যখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যে বিভাগের কথা উঠে, তখন দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট মোট ৭ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়াছেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—

বেসামরিক রক্ষা বাবদ—১ কোটি ৭৭ লক্ষ।

দামোদর বাঁধ মেরামত বাবদ—৬৬ লক্ষ।

অধিক ফসল ফলাও বাবদ—২১ লক্ষ

কৃষকদিগকে যন্ত্র বিতরণ বাবদ—১০ লক্ষ

চলিবে। চোরা বাজার ধরিবার জন্য গুপ্তভাবে কয়েক হাজার লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সহরবাসী গোপনে খবর দিবার অধিকার পাইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের বস্ত্র সমস্যা—

৩১শে আগষ্ট কলিকাতায় সকল বণিকসমিতির এক সম্মিলিত সভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন। ঐ পরিকল্পনায় ভারতের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা আছে।

যাহাতে দেশে বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সে জন্য দেশের ধনী ও শ্রমিকদিগকে একযোগে কাজ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্ব্বাচন কেন্দ্র—

বাঙ্গালা বিভাগের ফলে পশ্চিম বঙ্গে নিম্নলিখিত কয়টি নূতন নির্ব্বাচন কেন্দ্র ঘোষণা করা হইয়াছে—(১) মুর্শিদাবাদ সাধারণ—২ জন (২) দিনাজপুর মালদহ সাধারণ—২ জন (৩) দিনাজপুর ও মালদহ তপশীলী—১ জন (৪) নবদ্বীপ সাধারণ—১ জন (৫) পশ্চিম দিনাজপুর গ্রাম্য সাধারণ—১ জন (৬) নবদ্বীপ পশ্চিম মুসলমান—১ জন (৭) বহরমপুর মুসলমান—১ জন (৮) মুর্শিদাবাদ মুসলমান—১ জন (৯) জঙ্গীপুর মুসলমান—১ জন (১০) দিনাজপুর মুসলমান—১ জন (১১) মালদহ মুসলমান—১ জন। কোন মুসলমান কেন্দ্রে বা মুর্শিদাবাদ সাধারণ কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে না—পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কাজ করিবেন। বাকি ৪টি কেন্দ্রে নির্ব্বাচন হইবে।



বেলিয়াঘাটা গান্ধী-আবাসের সম্মুখে গান্ধীজীর দর্শনার্থী জনতা

ফটো—শ্রীপান্না সেন

দামোদর পরিকল্পনা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ৩০শে আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতে কোন নূতন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম দামোদর পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। উহা সম্পূর্ণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে। বিহার ও বাঙ্গলা (পশ্চিম) গভর্ণমেণ্টকে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয় ভারত রাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা স্থির করিতেছেন।



একটি চার বৎসরের বালিকার গান্ধীজীর হস্তে হরিজন ফণ্ডে অর্থদান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

কলিকাতায় বস্তির উন্নতি—

গত ২৯শে আগষ্ট কলিকাতা মহম্মদ আলি পার্কে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার বস্তীগুলির অধিবাসীরা যাহাতে আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাইয়া সুখে বাস করিতে পারে, সে জন্য বস্তীর মালিকদিগকে বাধ্য করা হইবে। যে সকল নূতন কারখানা প্রস্তুত হইবে, তাহাদের মালিকদিগকেও প্রথমে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া পরে কারখানার কার্য্য আরম্ভ করিতে বাধ্য করা হইবে।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের কল—

মধ্যপ্রদেশের জিমার জেলায় জি-আই-পি রেলের বরহানপুর-খাণ্ডোয়া শাখার চাঁদনীতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রস্তুত করার জন্য শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপিত হইবে। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কলপ্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিভাগ—

প্রেসিডেন্সি বিভাগের ৪ জেলা (মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, কলিকাতা ও ২৪ পরগণা—যশোহরের অংশ ২৪ পরগণার মধ্যে গিয়াছে) ও রাজসাহী বিভাগের ৪টি জেলা (দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ) লইয়া

নূতন একটি বিভাগ করা হইয়াছে। জলপাইগুড়িতে তাহার সদর কার্য্যালয় থাকিবে ও মিঃ জে-এন-তালুকদার নূতন বিভাগের কমিশনার হইয়াছেন।

বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করায় দাবী—

গত ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে অধ্যাপক শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় বাঙ্গালাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—এই সভা বাঙ্গলা ভাষাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করে এবং গণ-পরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীকে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব-ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ও যোগ্যতা বিবেচনা ও বিচার করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। উক্ত রাষ্ট্র-ভাষা নির্দ্ধারণ কমিটীতে কোন বাঙ্গালী সভ্য না থাকায় এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং গণপরিষদের কোন বঙ্গ ভাষাভাষী সভ্যকে এই কমিটীতে গ্রহণ করার দাবী জানাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণ বাঙ্গালা ভাষার ঐশ্বর্য্যের জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে সমগ্র পাকি-স্থানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমীচীন মনে করে। এই সভা পাকিস্থান গণপরিষদকে এই দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। অনতিবিলম্বে উচ্চ শিক্ষায় ও অফিসে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন করিবার নিমিত্ত সভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

গান্ধীজি ও ধনীসম্প্রদায়—

কলিকাতার হিন্দু মুসলমান ও শ্বেতাঙ্গ ধনী সম্প্রদায় গত ৩১শে আগষ্ট বিকালে কলিকাতা গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক সভায় গান্ধীজিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। সেখানে গান্ধীজি সকলকে বস্তী ও বিধ্বস্ত গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ করে অর্থ-সাহায্য করিতে আবেদন জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি—

গণপরিষদে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল রাষ্ট্র পরিচালনার নিম্নলিখিত মৌলিক নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) আইনকানুন প্রণয়নের সময় এই মৌলিক নীতি প্রযুক্ত হইবে (২) রাষ্ট্র সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবে (৩) রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য



১০ই আগষ্ট গভর্ণর-হাউসে জনতা ফটো—শ্রীপান্না সেন

রাখিবে (ক) স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবিকার্জ্জনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা (খ) সমাজের কল্যাণের জন্য দেশের সম্পদের মালিকানা ও কর্ত্তৃত্ব সমভাবে বণ্টন (গ) প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের মালিকানা ও কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত না হয়, তজ্জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করার ব্যবস্থা (ঘ) নরনারী নির্ব্বিশেষে সমান কাজে সমান বেতনের ব্যবস্থা (ঙ) শক্তি ও স্বাস্থ্যে কুলায় না এরূপ পুরুষ ও নারী শ্রমিক ও অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ না করার ব্যবস্থা। অভাবের তাড়নায় কেহ যাহাতে বয়স ও

সামর্থ্যের অনুপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা (চ) কেহ যাহাতে শিশু ও যুবকদের শক্তির অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থা এবং তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা। (৪) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নাগরিকদের জন্য চাকরী ও শিক্ষা এবং বেকার, রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারের ব্যবস্থা (৫) শ্রমিকরা যাহাতে মানুষের যোগ্য পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে এবং নারী শ্রমিকরা যাহাতে সন্তান প্রসবের সময় ছুটী পায় রাষ্ট্র কর্ত্তৃক তাহার ব্যবস্থা। (৬) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আইন, অর্থনীতিক সংগঠন ও অন্যান্য উপায়ে শিল্পে নিযুক্ত ও অন্যান্য কায়-শ্রমিকদের জন্য চাকরী, বেতন সুষ্ঠু জীবন যাত্রা, ছুটি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা (৭) নাগরিকদের মধ্যে সমান সামাজিক রীতি প্রবর্ত্তনের জন্য আইন (৮) প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দশ বৎসরের মধ্যে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা (অনুন্নত ও দুর্ব্বল সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তপশীলী ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষা, (১০) দেশে পুষ্টি, জীবন ধরণের মান ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য (১) শিল্পকলার নিদর্শন ও ঐতিহাসিক সকল স্মৃতিস্তম্ভ ও স্থান রক্ষার ব্যবস্থা (১২) বিভিন্ন জাতির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা।

সৈন্যদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা—

গত ২৯শে আগষ্ট নয়াদিল্লীতে এক সভায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী পাঞ্জাবের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের পর অভিজ্ঞতা বর্ণনা কালে বলিয়াছেন—"এক সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীনে অন্য সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রেরণ করা নিরাপদ নয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের সৈন্যদের প্রহরাধীন ছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে আসিতে পারিবে, ইহাও আশা করা যায় না। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, সেরূপ ভাবে না হইলেও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বর্ত্তমান। মুসলেম সৈন্যবাহিনীর ন্যায় হিন্দু ও শিখরাও নিজ সম্প্রদায়ের উপর গুলী চালাইতেছে না।" এই বিষ দুরীভূত না হইলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না।



শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে ইঁহার জন্মোৎসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।)

কলিকাতায় রাহাজানি বৃদ্ধি—

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে মোট ২৬টি স্থানে ডাকাতি, লুঠ, রাহাজানি প্রভৃতি হইয়াছে। জিপ গাড়ীতে করিয়া বন্দুক লইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ লুঠতরাজ করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে ১৮ জন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিস উপযুক্ত ব্যবস্থার মনোযোগী হইয়াছে।

গান্ধীজির প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা—

গত ২৮শে আগষ্ট দিল্লীতে গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদ ভবনে মহাত্মা গান্ধীর এক চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। চিত্রটি ৫০ ইঞ্চি লম্বা ও ৪০ ইঞ্চি চওড়া। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে যান, তখন বিখ্যাত চিত্রকর সার ওসওয়াল বীরলে ঐ চিত্র অঙ্কন করেন। সার প্রভাশঙ্কর পত্তনী উহা ক্রয় করেন ও স্বাধীন ভারতের জাতিকে দান করার মনস্থ করেন। তাহার পুত্র গণপরিষদের সদস্য মিঃ এ-পি পত্তনী উহা পরিষদকে দান করিয়াছেন।

পুলিসের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক—

কলিকাতার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে পুলিস বাহিনীর সাহায্যের জন্য এবং পুলিস ও জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা স্থাপনের জন্য একটি অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠনের কথা গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতা লাল-বাজার পুলিস অফিসে এক সভায় আলোচিত হইয়াছে। জনসাধারণের বহু প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তি লইয়া গঠিত হয়, তজ্জন্য সকলেই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুলিস কমিশনার এ বিষয়ে কাজ করিবেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী ১৯৪৮ সালের জন্য ওয়াশিংটন (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিজিটিং প্রফেসার' নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী অমিয়বাবুর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

গান্ধীজি ও নেতাজী—

গত ২৮শে আগষ্ট কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী ছাত্রগণকে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রের জীবনযাত্রা সন্ন্যাসীর অনুরূপ হওয়া উচিত। প্রত্যেক ছাত্রের আচরণ আত্মসংযমের আদর্শ হইবে। গান্ধীজি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নেতাজী নশ্বর দেহে জীবিত নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতসেবকের অন্তরে তিনি বিরাজমান। তাঁহার জীবন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীতে পূর্ণ। তাঁহার দুঃসাহসিকতা অতুলনীয়। স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি যে ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম সামান্য কথা নয়। তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও নেতাজির প্রতি গান্ধীজির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিন্দু-মাত্র হ্রাস পায় নাই। ছাত্রগণ হিংসা বা অহিংসা যে মতেই বিশ্বাসী হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রয়োজন—এই কথা তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

১৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে জাতি সংঘের সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব করিবার জন্য শ্রীযুক্তা



শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কো হইতে নিউইয়র্ক যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার কন্যা চন্দ্রলেখা পণ্ডিত ও সেক্রেটারী মিঃ টি-এন-কাউল যাইবেন। মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসে সকলে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন।

কোলাঘাটে ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ১০ই ভাদ্র বুধবার মধ্যরাত্রির কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের কোলাঘাট

ষ্টেশনে (মেদিনীপুর জেলা) ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ১৭ জন নিহত ও ১১৮ জন আহত হইয়াছে। আপ হাওড়া পুরুলিয়া টাটানগর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল—আপ হাওড়া নাগপুর প্যাসেঞ্জার তাহার উপর যাইয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা হয়। বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটা হইতে লাইন পুনরায় ট্রেণ চলাচলের উপযুক্ত হয়। ঘটনার পর ৫।৭ দিনে আরও বহু আহত ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

হরিহরানন্দ আরণ্যের দেহত্যাগ—

মধুপুর (সাঁওতাল পরগণা) কপিল মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহারাজ গত ৫ই বৈশাখ ৭৯



স্বামী হরিহরানন্দ

বৎসর বয়সে মধুপুর কাপিল গুহায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আবাল্য সন্ন্যাসী ছিলেন ও ২১ বৎসর যাবৎ একটি গুহায় প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত যোগদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

পাকিস্থানের লক্ষ্য ও মিঃ জিন্না—

গত ২৫শে আগষ্ট করাচী মিউনিসিপালিটী হইতে কায়েদে আজম জিন্নাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইলে তাহার উত্তরে মিঃ জিন্না বলেন—"আমরা আশা করি পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবে এবং পরস্পর সৌহার্দ্দ্য ও শান্তির মধ্যে বাস করিয়া একে অন্যের শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমরা আরও আশা করি যে, ভবিষ্যতে এই দুই ডোমিনিয়ান বিশ্বের দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। যে কোন প্রকারের ভয় ও অভাব দূর করাই কেবল নয়, পবিত্র ইসলামের আদর্শে স্বাধীনতা, সৌহার্দ্দ্য ও সাম্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৭ সালের বি-এস্-সি পরীক্ষায় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র



বিদ্যাভূষণের পুত্র শ্রীমান ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান, উভয় বিষয়ে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালা বিভাগ সম্বন্ধে বিবেচনা—

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ ঘোষণা করিয়াছেন যে বিষয়ে বিচার বিবেচনার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত সদস্যদিগকে লইয়া এক সাবকমিটী গঠন করিয়াছেন—পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল, সর্দ্দার বলদেব সিং, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডক্টর আম্বেদকর ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পাইকারী জরিমানা মুকুব—

১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতা ও সহরতলীতে যে সব পাইকারী

জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে, তাহা মকুব করা ও এ পর্য্যন্ত যে সব পাইকারী জরিমানা আদায় করা হইয়াছে তাহা প্রত্যর্পণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির উপর যে জামানত দাবী করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।

পরলোকে কবিরাজ হিরণ্ময় সেন—

পরলোগত কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ হিরণ্ময় সেন গত ২৫শে আগষ্ট ৫২ বৎসর বয়সে



৺হিরন্ময় সেন

তাঁহাদের নিমতলা ঘাটষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মাড়োয়ারী হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ও বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দিল্লীতে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা—

গত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে দিল্লী প্রদেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। ফলে ট্রেণ চলাচল, তার, টেলিফোন, এমন কি বিমান যাতায়াত পর্য্যন্ত কয়েক দিন বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর হইতে তথায় যে নিখিল ভারত সাহিত্যিক সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, তাহাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার পেটেল প্রভৃতি হাঙ্গামা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি—

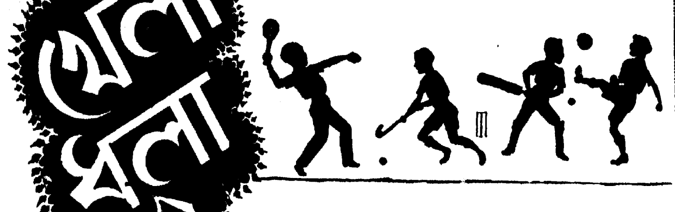
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা, তাঁহার গ্রন্থাদির প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কলিকাতায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণকে সভাপতি ও ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সম্পাদক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমিতি নামক এক সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে; কলিকাতা কাশীপুর ৬৬ মণ্ডলপাড়া লেনে সমিতির প্রধান কার্য্যালয় করিয়া এ বিষয়ে কাজ চলিতেছে। লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে সমিতির এই কার্য্য প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

পাঞ্জাবের আশ্রয়হীনদিগের সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু একটি বিশেষ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। ৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মন্ত্রিসভায় এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। ক্ষিতীশবাবু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি—তাঁহার এই নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

বাঙ্গালায় মন্ত্রী পরিবর্ত্তন—

পশ্চিম বাঙ্গালার ১০ জন মন্ত্রীর মধ্যে গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার তিনজন মন্ত্রী—শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীযুত রাধানাথ দাস ও শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ পদত্যাগ করিয়াছেন। গভর্ণর ঐ দিনই তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীকে নূতন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। অন্নদাবাবু অর্থ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জন স্বাস্থ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন ও শ্রীযুত ভাণ্ডারীর উপর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার পড়িয়াছে।



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ইংলণ্ড ও মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ক্রিকেট খেলায় পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী দু'টি রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯২৫ সালে জ্যাক হবস ক্রিকেট খেলার এক মরসুমে ১৬টি সেঞ্চুরী ক'রে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলায় যে নতুন রেকর্ড করেছিলেন তা দীর্ঘ ২১ বছর পর গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডেনিস কম্পটন ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে ভঙ্গ ক'রেছেন। হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করা এবং নতুন রেকর্ড স্থাপন করা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে হবসের তুলনায় কম্পটন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৬টী সেঞ্চুরী করতে জ্যাক হবসের ৪৮ ইনিংস খেলার প্রয়োজন হয়েছিল কিন্তু ৪৫ ইনিংসেই কম্পটন ১৬টি সেঞ্চুরী করেন। কম্পটন তাঁর ৪৬ ইনিংসের খেলায় ১৭টি সেঞ্চুরী ক'রে হবসের রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। ঐ সময়ের খেলায় হবস পাঁচবার নট আউট থাকেন, অন্য দিকে কম্পটন ছিলেন ৭ বার। হবসের ৭০·৩২ এভারেজ এবং কম্পটনের ৮৫·৯৪ এভারেজ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যখন উভয়েই ১৬টি সেঞ্চুরী পূর্ণ ক'রেছেন সে সময়ে হবসের গড়পড়তা রাণ ৩,০২৪, কম্পটনের ৩,২৬৬। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ডেনিস কম্পটন যে রেকর্ড স্থাপন করলেন তা অতিক্রম করা কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে না। কম্পটনের ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান খ্যাতনামা বোলার ডগ্‌লাস রাইট বলেছেন ২৯ বছর বয়সের মিডলসেক্স ক্রিকেট খেলোয়াড় এমন পদ্ধতির ক্রিকেট খেলেছেন যা খেলার গোঁড়ামী শূন্য, অথচ ক্রিকেট খেলার পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্নধারাগুলি নিখুঁতভাবেই তিনি পালন করেছেন।

একই মরসুমে বেশীসংখ্যক সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ

খেলোয়াড়ের নাম	সাল	সংখ্যা
জ্যাক হবস	১৯২৫	১৬
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	১৫
সাটক্লিফ	১৯৩৫	১৪
ব্র্যাডম্যান	১৯৩৮	১৩
সি বি ফ্রাই	১৯০১	১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩ ও ৩৭	১৩
হেওয়ার্ড	১৯০৬	১৩
হেনড্রেন	১৯২৩, ২৭, ২৮	১৩
মীড	১৯২৮	১৩
সাটক্লিফ	১৯২৮ ও ১৯৩১	১৩

উক্ত রেকর্ড ছাড়া ১৯০৬ সালে সারের ক্রিকেট খেলোয়াড় টম হেওয়ার্ড (Tom Hayword) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক মরসুমে ৩,৫১৮ রাণের পৃথিবীর রেকর্ডও ডেনিস কম্পটন ভঙ্গ ক'রে নতুন রেকর্ড করেছেন। সম্প্রতি স্যর পেলহাম ওয়ার্নারের দলের বিপক্ষে দক্ষিণ ইংলণ্ডের পক্ষে এক প্রদর্শনী খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে নটআউট ৩৫ রাণ করলে পর তাঁর মোট ৩,৫১৯ রাণ উঠে টম হেওয়ার্ডের পূর্ব্ব ৩,৫১৮ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করে। এই রাণ তুলতে কম্পটনকে ৪৯ ইনিংস খেলতে হয়। অন্যদিকে হেওয়ার্ডের রেকর্ড করতে লেগেছিল ৬১ ইনিংস। এই মরসুমের শেষ খেলায় কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ান মিডলসেক্সের পক্ষে খেলে ইংলণ্ডের অবশিষ্ট দলের বিপক্ষে কম্পটন ২৪৬ রাণ তুলতে সক্ষম হন। ইংলণ্ডে ইহাই তাঁর সর্ব্বোচ্চ রাণ। এই রাণ তোলায়

কম্পটন স্থাপিত এক মরসুমে পৃথিবীর রেকর্ড রাণ সংখ্যা ৩৮১৬তে দাঁড়াল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কম্পটন ছাড়া মিডলসেক্সের বিল এডরিচও এই মরসুমে টম হেওয়ার্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মরসুমে তাঁর রাণ সমষ্টি ৩৫৩৯ হয়েছে।

ডেনিস কম্পটন ও এডরিচ ছাড়া নিম্নলিখিত ১৫ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় তিন সহস্রাধিক রাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এঁদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার একই মরসুমে ডেনিস কম্পটনই করেছেন সর্ব্বাধিক রাণ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খ্যাতনামা ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জিৎসিংজী ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলে ১৮৯৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে সর্ব্বপ্রথম ৩,১৫৯ রাণ তুলে পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

খেলোয়াড়	বছর	মোট	এভারেজ
হেওয়ার্ড	১৯০৬	৩,৫১৮	৬৬·৩৭
উলি	১৯২৮	৩,৩৫২	৬১·০৩
সাটক্লিফ	১৯৩২	৩,৩৩৬	৭৪·১৩
হ্যামণ্ড	১৯৩৩	৩,৩২৩	৬৭·৮১
হেনড্রেন	১৯২৮	৩,৩১১	৭০·৪৪
এবেল	১৯০১	৩,৩০৯	৫৫·১৫
হ্যামণ্ড	১৯৩৭	৩,২৫২	৬৫·০৪
হেনড্রেন	১৯৩৩	৩,১৮৬	৫৬·৮৯
মীড (সি. পি)	১৯২১	৩,১৭৯	৬৯·১০
হেওয়ার্ড	১৯০৪	৩,১৭০	৫৪·৬৫
রণজিৎসিংজী	১৮৯৯	৩,১৫৯	৬৩·১৮
ফ্রাই	১৯০১	৩,১৪৭	৭৮·৬৭
রণজিৎসিংজী	১৯০০	৩,০৬৫	৮৭·৫৭
এমেস	১৯৩৩	৩,০৫৮	৫৮·৮০
টিলডেসলি (জেটি)	১৯০১	৩,০৪১	৫৫·২৯
মীড (সি পি)	১৯২৮	৩,০২৭	৭৫·৬৭
হবস	১৯০৫	৩,০২৪	৭০·৩২
টিনডেসলি (ই)	১৯২৮	৩,০২৪	৭৯·৫৭
হ্যামণ্ড	১৯৩৮	৩,০১১	৭৫·২৭
হেনড্রেন	১৯২৩	৩,০১০	৭৭·১৭
সাটক্লিফ	১৯৩১	৩,০৬৬	৯৬·৯৬
পার্কস (জে এইচ)	১৯৩৭	৩,০০৩	৫০·৮৯
সাটক্লিফ	১৯২৮	৩,০০২	৭৬·৯৭

এ পর্য্যন্ত একই মরসুমের খেলায় সাটক্লিফ, হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড তিনবার তিন সহস্রাধিক রাণ করেন। রণজিৎসিংজী মীড ও হেওয়ার্ড করেন দু' বার।

ক্রিকেট খেলায় স্মরণীয় ঘটনা ঃ

পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে সব থেকে দীর্ঘ দিন খেলোয়াড়জীবন যাপন করেছিলেন জর্জ্জ হার্স্ট। তিনি ১৮৮৯ সালে ইয়র্কসায়ারের পক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলেছিলেন। তাঁর সর্ব্বশেষ খেলা ১৯২৯ সালে।

* * * *

১৯১৯ সালে অনুষ্ঠিত ডার্বিসায়ার বনাম ওয়ারউইকসায়ারের ক্রিকেট খেলায় যে অভূতপূর্ব্ব রাজযোটক যোগ দেখা গিয়েছিল তা এ পর্য্যন্ত কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯১৯ সালের উক্ত খেলায় ডবলউ জি কোয়াইফ এবং তাঁর পুত্র বি ডবলউ কোয়াইফ একত্র জুটী হয়ে খেলতে থাকেন এবং অপরদিকে যাঁরা তাঁদের জুটী ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হলেন ডবলউ বেষ্টউইক ও আর বেষ্টউইক —দু'জনের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ।

ফুটবল খেলার লটারী ঃ

'ফুটবল পুল' প্রতিযোগিতায় খেলার ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে ৪৭ বছর বয়সের ষ্টোকার জর্জ্জ স্মিথ নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। বৃটিশ চ্যান্সেলার অফ দি এক্সচেকার ডাঃ ডালটন গত এপ্রিল মাসে সিগারেটের উপর আর এক সিলিং ট্যাক্স চাপিয়ে দিলে জর্জ্জ স্মিথ বিরক্ত হয়ে ধূমপান একেবারে বর্জ্জন ক'রে সিগারেট খরচার টাকাটা 'ফুটবল পুলে' খাটাতে লাগলেন। সেই থেকেই তাঁর ভাগ্য আজ ফিরেছে। তিনি ৩,০০,০০০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছেন।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদল ঃ

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাপটেন ভি এম মার্চেন্ট শেষ পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলে যোগদান করতে সক্ষম হলেন না ; তাঁর স্থলে লালা অমরনাথ দলের অধিনায়কত্ব করবেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে কোন এক তারিখে বি ও এ সি এরোপ্লেনে ১৪জন খেলোয়াড়সহ দলের ম্যানেজার অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন।

ডেভিস কাপ ঃ

গত বছরের ডেভিসকাপ বিজয়ী আমেরিকা ৪-১ ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে এ বছরও ডেভিস কাপ বিজয়ী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ১৩বার উক্ত কাপ বিজয়ী হয়ে সব থেকে বেশীবার ডেভিস কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে।

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের খেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-২, ৬-১ ও ৬-২ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ডিনি পেল্সকে (Dinny Pails) সহজেই পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসের দ্বিতীয় খেলায় Tod Schroeder ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩ ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার .নং খেলোয়াড় জন ব্রোমউইচকে পরাজিত করেন। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে জন ব্রোমউইচ ও কোলিন লং (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ২-৬, ৬ ২, ৬-৪ গেমে জ্যাক ক্রামার ও টেড সক্রোডারকে (আমেরিকা) পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

অপর এক সিঙ্গলসের খেলায় জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে জন ব্রোমউইচকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলসে টড সক্রোডার (আমেরিকা) ৬-৩, ৮-৬, :-৬, ৮-১১, ও ১০-৮ গেমে ডিনি পেলসকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

'ইউরোপীয়ান সুইমিং চ্যাম্পিয়ানসীপ' প্রতিযোগিতায় ১৭ বছর বয়সে ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়ান এলেক্স জেনী ২০০ মিটার দূরত্ব ২ মিঃ ৪·৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাঁর পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পূর্ব্বের থেকে তিনি এক সেকেণ্ড কম সময়ে উক্ত দূরত্ব পথ অতিক্রম করেন। এ ছাড়া এলেক্স জেনী সাঁতারে ৪০০ মিটার দূরত্ব ৪ মিঃ ৩৫·২সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে আমেরিকার বিল স্মিথ প্রতিষ্ঠিত ৪ মিঃ ৩৮৫ সেকেণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ইংলণ্ডঃ ৪২৭ (এল হাটন ৮৩) ও ৩২৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ডি কম্পটন ১১৩) দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৩০২ (বি মিচেল ১২০) ও ৪২৩ (৭ উইঃ মিচেল নট আউট ১৮৯, নোর্স ৯৭) ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ 'ড্র' গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বি মিচেল উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বিবস্ত্র মানব"—৪৲
শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে কানাই বসু কর্ত্তৃক প্রদত্ত নাট্যরূপ "বিরাজ-বৌ"—২।০
রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মন্দাক্রান্তা"—৩।০
অন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস "বাঁধন হারা"—২৷০
শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাত্রি"—২৲
শ্রীপবিত্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "রাশিয়ার রূপ"—১৷০
বিজয় ব্যানার্জ্জী প্রণীত "সংগ্রাম ও সমর-নায়ক"—৩৲, "নূতন পথে বিজ্ঞান"—১৷০
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "আমাদের বাঙ্গলা" (১ম পর্ব্ব)—১৷০
সমৎ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "গণপরিষদ ও কংগ্রেস"—৩৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "তবলা-বিজ্ঞান ও বাণী"—২৷০
প্রণব রায় প্রণীত "সাত নম্বর বাড়ী"—২।০
শ্রীসুধীরকুমার মিত্র সঙ্কলিত "নয়া-বাঙ্গলা"—৩৲
বনস্পতি—সম্পাদিত উপন্যাস "দুঃসাহসিক অলক"—২৲
শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত প্রণীত "শাশ্বত তরুণ"—২৲
ঋষি দাস কর্ত্তৃক রোমাঁ রোলাঁ রচিত গ্রন্থের অনুবাদ "মহাত্মা গান্ধী"—২৷০
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত "শ্রীশ্রীমহানাম রসমাধুরী—৷০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "ভগবানের চাবুক"—১৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী উপন্যাস "কলঙ্কী চাঁদ"—১৲
বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "শহীদ প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম"—।০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৫৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা



বৌদ্ধধর্ম্ম ও নারী

শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায়

বৈদিক বা প্রাক্‌ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে ফল্গুধারার ন্যায় একটি বৈশিষ্ট্যের ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেই ফল্গুধারা বেদ উপনিষদের ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকের সাধনার অমৃতরসে পুষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখনই সমাজে গ্লানি, অনাচার প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ধর্ম্মলোপ পাইয়াছে ও অধর্ম্ম শির উন্নত করিয়াছে, ফলে মনুষ্য সমাজের অন্তরাত্মা সত্য শিব সুন্দরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখনই ইঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমাজ এমনই ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে সাধারণ লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বরাদিকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার পূর্ব্বে বৈদিক ঋষিগণ যে ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেবগণের আরাধনা করিতেন, সে ভাবের লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন ঋষিগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মহিমা ঘোষণা করিয়া যে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্ব মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সাধারণ লোকের নিকট তাহা বোধগম্য হইত না। ফলে নানা শ্রেণীর পুরোহিত পরিচালিত বলি, হোম, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠান এমন অলস, প্রাণহীন ও নীরস হইয়া পড়িল যে সেগুলি কাহারও চিত্তে ধর্ম্মবোধের সঞ্চার করিত না। ফলে সমাজে ধর্ম্মদ্রোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও চার্ব্বাক প্রমুখ ভোগবিলাসিগণের মতবাদের প্রচারের সুবিধা হইল। কিন্তু ভোগবিলাস লইয়া কোন সমাজ সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। পথভ্রষ্টের মত অসত্যের অন্ধকার যত গাঢ় হইবে, সত্যের আলোকের জন্য আকুলতা ততই বাড়িতে থাকিবে। সেই সুদূর অতীতকালে অনাবশ্যক কর্ম্মকাণ্ডের বোঝা হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের অন্তরাত্মা যখন আকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দন হিমালয়ের পাদদেশে শৈলশ্রেণী বেষ্টিত মনোরম রাজপ্রাসাদে রাজসুখে লালিত-পালিত কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজপুত্র একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, একটি ব্যাধিগ্রস্ত রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের সম্মুখে সমস্ত

মানব জাতির ভয়াবহ পরিণাম ভাসিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্ম কঠিন সাধনা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে; মানব সমাজের জর্জ্জরিত দেহে তাঁহাকেই শান্তিসুধার প্রলেপ দিতে হইবে। সত্যের সন্ধান তাঁহাকেই করিতে হইবে ও সেই সত্যের আলোকে তাঁহাকেই সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি যে ব্রহ্মচারীকে একদিন পথে দেখিতে পাইলেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র হইলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার ভাবী জীবন চিত্র মানসপটে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র অপরিসর রাজপ্রাসাদ আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুন্দরী গুণশালিনী বধূ ও নবজাত পুত্র কেহই তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিল না। মানব জাতিকে মুক্তি পথের সন্ধান দিবার জন্ম তিনি ক্ষুদ্র রাজ-সংসারের গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন।

সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২৯ বৎসর। তারপর নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে স্বচ্ছসলিলা নিরঞ্জনার তীরে উরু-বিল্ব বনে উপস্থিত হইয়া তিনি পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এত ক্লেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না; তিনি পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে কৃচ্ছ্র সাধনা, শরীর-শোষণ ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতির দ্বারা বাসনার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে না। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ যুক্তপানাহার দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া মনকে সত্যলোকের সন্ধানে নিযুক্ত করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। কঠোর তপশ্চরণ পরিত্যাগ করিবার জন্ম সেই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাঁহার পঞ্চশিষ্য কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর তিনি নিরঞ্জনাতীরে এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিত পরেই সেনানীগ্রামের এক ধনবান বণিকের পুণ্যবতী দুহিতা সুজাতা বহু সাধনার ফলে একটি পুত্রধন লাভ করিয়া সুবর্ণপাত্রে পায়সান্ন সাজাইয়া বনদেবতার পূজা দিতে আসিলেন। তিনি তরুমূলে উপবিষ্ট কৃচ্ছ্র সাধনে ম্রিয়মান তপস্বীর ধ্যানমুগ্ধ মুখের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং ভক্তি সহকারে সেই দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থ হৃষ্টচিত্তে সুজাতার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ভাবে পরম সাধ্বী রমণী সুজাতাই সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধার্থের আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হন। অতঃপর দুগ্ধপানে শরীরে বল পাইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে যোগাসীন হইলেন। এই সময় 'মার' স্বীয় পুত্র-কন্যা ও দলবল লইয়া নানা প্রকার প্রলোভন ও বিভীষিকা দ্বারা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প করিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
[illegible]
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

এই যোগাসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই মানুষের সকল দুঃখের কারণ এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। সকল বাসনা, সকল কামনা ও সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী—এই নাম ধারণ করেন। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামাত্র তাঁহার চিত্ত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার সাধনলব্ধ অমৃতান্ন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন পঞ্চভিক্ষুর কথা স্মরণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার মানসে বারাণসী যাত্রা করেন। প্রথমে শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন সিদ্ধার্থের তেজঃপুঞ্জ রূপরাশি দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সদ্ধর্ম্মের অমৃতরসে নিজেদের হৃদয়ভাণ্ড পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

কিছু দিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা ষাট্ হইল এবং তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমৃত উৎসের রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল। হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের বিরুদ্ধে মানবচিত্ত যখন বিদ্রোহ হইয়া উঠিল—তখন বুদ্ধ সেই উপনিষদের ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত উচ্চতত্ত্ব ছাড়িয়া সহজ কথায় তাঁহার অন্তরের পরম সত্য প্রচারপূর্ব্বক জনসাধারণের মন জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার ধর্ম্ম কতিপয় পণ্ডিতের ধর্ম্ম হইল না, সকল দেশের সকল মানবের ধর্ম্ম হইল। তাঁহার অপূর্ব্ব করুণা ও মৈত্রীমূলক ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের নানাভাষাভাষীদিগকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার আলোক মানবের গন্তব্যপথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করেন তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সেই সত্য বিশ্বজনীন জাতিভেদ বা বর্ণবিচারে সীমাবদ্ধ নহে। বুদ্ধশিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, নর ও নারী সকলেই একীভূত। একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে যে নির্ব্বাণ লাভের অধিকারী তাহা নহে—উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, আর্য্য-অনার্য্য, সুর, নর—সকলেরই চিত্তে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্ত্মে পরিচালিত করিত।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ যে সত্যলাভ করেন—উহার আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইলেন তাঁহাদিগকে [illegible]

হইল। বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জনসঙ্ঘ। বৌদ্ধযুগে ভারতে যে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—সাধনানিরত বৌদ্ধভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস হইতেই সেই ধারা উত্থিত হইয়াছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

ভগবান বুদ্ধ নরনারী উভয়কেই তাঁহার সদ্ধর্ম্ম প্রচারের তুল্য অধিকার প্রদান করেন। বুদ্ধসঙ্ঘে প্রথমে রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেবের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত শাক্যমহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশঙ্কা এই—ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম্মের স্থায়ী পবিত্রতা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। নীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয়—সেজন্য বুদ্ধের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। বুদ্ধদেব বৌদ্ধতপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন। মনুর যে বিধান—"শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না"—ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধের অষ্টানুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। অতঃপর আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রমণীরা সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল, এইভাবে বহু সাধ্যসাধনার ফলে বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিয়া প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রীশিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও রমণীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনিই মস্তকমুণ্ডন করিয়া পীতবসন পরিধান করেন। ভগবান বুদ্ধ জননী গৌতমীকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘের শিরোমণি এবং পরিচালিকা নিযুক্ত করেন। অতঃপর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত মহত্ত্ব লাভ করেন। যে পাঁচশত ভিক্ষুরমণী তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও যথাসময়ে মহত্ত্ব লাভে সমর্থ হন।

নারী সম্প্রদায়ের ভিতর শাক্যপরিবারের মহিলারাই সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব জানিতে পারেন। শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া বহুবিবাহপ্রথা তাঁহাদের মধ্যে আইনবিরুদ্ধ ছিল—সেজন্য শাক্যরমণীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ ছিল। বুদ্ধের জ্ঞান, বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত সহজ-সত্য, বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তাঁহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এই সকল কারণে তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মার মুক্তি কামনায় ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করিয়া সুকঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা মহত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তথাগতের সঙ্ঘের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর বুদ্ধের পত্নী যশোধরা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী অসাধারণ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যশোধরাকে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়। বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুলও নবধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

যে সকল রমণী বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ ভ্রাতাদের সমকক্ষ ছিলেন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধসাহিত্যে শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নারীজাতি কি অসাধারণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন—তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা 'থেরী' অর্থাৎ স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা বলিয়া সকলের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের থেরী-সঙ্ঘ এক অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। শত শত থেরী স্বাধীন চিন্তাশক্তি দ্বারা সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন। ভিক্ষুণী বা থেরীরা ধর্ম্মনিষ্ঠা, মনস্বিতা ও অন্তর্দৃষ্টির জন্য সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। পালিধর্ম্মগ্রন্থসমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় থেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর ও লেখিকার সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। থেরী পূর্ণা গৌতমীর মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ণে, পূর্ণ কর প্রাণ পূর্ণিমার চন্দ্রসম।
পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তম॥"

থেরীদের স্বরচিত শ্লোকগুলি ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করে।

বক্তৃতা করিতে পারিতেন এমন কয়েকটি রমণীর নাম বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায়। রাজা বিম্বিসারের মহিষী ক্ষেমা অতিশয় সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল এবং পাঁচশত ভিক্ষু তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। তিনি বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে নারী দেহের সৌন্দর্য্যের অসারতা বুঝাইয়া দিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেন। পরে ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং গভীর জ্ঞানের জন্য যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। ভদ্রা চেণ্ডুলকেশা পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞানপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র ব্যতীত অপর কেহ তর্কে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। ধর্ম্মাশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। বিনয় পিঠকে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অন্য লোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মহাথেরী সঙ্ঘমিত্রার নিকট সিংহ রাজার পত্নী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সহচরী পরিবৃতা হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং প্রজ্ঞালাভে সমর্থ হন। রাজা শ্রীহর্ষের ধর্ম্মসভায় তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী অপরোক্ষভাবে যোগদান করিতেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয় পিঠক আয়ত্ত করেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী। তিনি অতি প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। পটাচারা থেরী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম

প্রচারে আপনার অনন্যসুলভ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচশত শিষ্যা ছিলেন, তাঁহারা নানা পরিবার ও নানাস্থান হইতে আগমন করেন। বহু শোক-বিহ্বল রমণীকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে তাঁহার স্বামী, দুই শিশু পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা সকলকেই হারাইয়াছিলেন। পরিশেষে এই শোকোন্মত্তা নারী বুদ্ধের সদ্‌ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া নবজীবন লাভ করেন।

বুদ্ধের ধর্ম্ম সমাজের সকল স্তরের নরনারীর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের মর্ম্মস্পর্শী বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক পতিতা নারী জ্ঞানবৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মের পুণ্যপ্রবাহ অনেক নর্ত্তকী ও বারবনিতার অন্তরের পাপরাশি ধৌত করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দেয়। বৈশালীর সুপ্রসিদ্ধ বারবনিতা অম্বপালীর গৃহে ভগবান্ বুদ্ধ আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি মহাপুরুষের মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড পুরী তিনি শ্রমণদের বাসের জন্য দান করেন। অড্‌ঢকাশী নামে বারাণসীতে আর একজন সুবিখ্যাত বারবনিতা ছিল। সে তাহার শেষ বয়সে ভিক্ষুণীজীবন গ্রহণ করে। এইরূপে একাগ্রচিত্তে বুদ্ধবাণী শ্রবণ করিয়া বহু সুন্দরী স্ত্রীলোকের নশ্বর সৌন্দর্য্যের অহমিকা নষ্ট হয় এবং ক্রমে তাঁহারা অর্হৎ হন। জনসাধারণও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারীরূপে তাঁহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠে।

ক্রীতদাসীরা বুদ্ধের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর খুজ্জুত্তরা নামে ক্রীতদাসী রাণীর প্রদত্ত অর্থ কাহাপনের মধ্যে প্রত্যহ চারি কাহাপনের ফুল ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট চারিটী কাহাপন চুরি করিত, একদিবস সে বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম শ্রবণ করে এবং পবিত্রতার প্রথম সোপানের ফল লাভ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে। অতঃপর দাসীর নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া রাণী শ্যামাবতী সোতাপত্তি ফল লাভ করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে, বিশাখা তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। বুদ্ধদেবের দানশীলা নারী ভক্তদের মধ্যে মিগারের মাতা বিশাখাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি যতদিন জীবিতা ছিলেন, ততদিন পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধপথ্য প্রদান, অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ এবং ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান করেন। ভিক্ষুদের প্রতি বিশাখার অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। বৌদ্ধসঙ্ঘ বিশাখার নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী ছিল।

সুপ্রিয়া নামে বারাণসীর এক গৃহস্থের পত্নী সর্ব্বথা বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। একদা একজন ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়া সুপ্রিয়াকে তাঁহার আহারোপযোগী কোনও মাংস রন্ধন করিয়া দিতে বলেন। তিনি রন্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন বটে—কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণী খুঁজিয়া পাইলেন না। অতঃপর নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিলেন। তাঁহার এই আদর্শ ত্যাগের জন্য ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং বুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

আর একসময় এক রাণী তাঁহার একমাত্র পুত্রসন্তান হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কিসাগোতমী, সেই মৃতদেহটি লইয়া তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন—"তুমি যদি এরূপ গৃহ হইতে একটি সর্ষপ আনিতে পার যে গৃহে কেহ কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই—তবে আমি তোমার পুত্রকে প্রাণদান করিব।" কিসাগোতমী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কিসাগোতমী অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া বুদ্ধের চরণে প্রণতা হইলেন।

এইরূপে অনেক দুঃখিতা মাতা, সন্তানহীনা বিধবা এবং অনুতপ্তা বারবনিতা গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখ, তিরস্কার ও অনুশোচনার হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সকল কোমলদেহা নারী বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিয়মিতরূপ শীলানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র জীবনযাপন করেন। ধনীর স্ত্রী অলস জীবনের অসারত্ব বুঝিতে পারিয়া গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং দরিদ্রের পত্নীরাও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। এইভাবে স্ত্রীলোকেরা প্রজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নিত্য বিদ্যা, বুদ্ধি ও পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন, এমন কি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি মার' এই সকল বৌদ্ধ-তপস্বিনীদের প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং দুশ্চরিত্র লোকের দ্বারা ইঁহাদের মনে কামলিপ্সা উদ্রেক করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়াছে। থেরী শুভাজীবক নামক এক ব্যক্তি আম্রকাননে বেড়াইবার সময় এক ধূর্ত্তের হস্তে পড়িয়াছিলেন। সেই অসচ্চরিত্র লোক তাঁহার সতীত্ব নাশ করিতে চেষ্টা করে। তারপর শুভা তাঁহার চক্ষু দুইটি উৎপাটন করিয়া ধূর্ত্তের হস্তে প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া সেই লোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এইরূপে ধূর্ত্তের মনের পাপলালসা দূর হয়। শুভা ধূর্ত্তের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ভগবান্ বুদ্ধের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেও তাঁহার কৃপায় দিব্য-চক্ষু লাভ করেন। অতঃপর তিনি ভগবান্ তথাগতের কৃপাপ্রার্থী হইয়া উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সময়ে স্ত্রীলোক এইভাবে সাংসারিক জীবনের সুখলালসা পরিহারপূর্ব্বক যতীন্দ্রিয় রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন—বিশেষ করিয়া 'মার' যখন নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-লালসার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ ও বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিত, তখন তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যভাবময় শ্লোকসকল রচনা করিয়া গান করিতেন।

থেরীগাথা এবং তাহার ভাষ্য হইতে জানা যায়, কি ভাবে স্ত্রীলোকেরা পুনর্জন্মের ভয়ে পিতামাতা, স্বামী এবং প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণীলীলা যাপন করিতেন, অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে নানাপ্রকার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দুঃখ-মুক্তির কামনায় রমণীরা সন্তান, পিতামাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের পথে অবহেলা করিয়াও সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহু স্ত্রীলোক সদ্ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক জন্মান্তরে সুখের আশায় বা মৃত ফকীরের কল্যাণকামনায় ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী-দিগকে প্রচুর অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য দান করেন। রমণীসুলভ ধর্ম্মগুলি বিশেষভাবে থেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে সকল স্ত্রীজাতির উপর কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা, বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারত ইতিহাসের সেই গৌরবময় যুগে গঙ্গাপ্রবাহিত প্রদেশে শত শত থেরী বুদ্ধের অমৃতমধুর ধর্ম্মকথা প্রচার করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। সেই সকল বৌদ্ধতাপসীগণ শীলবতী, বহুশাস্ত্রে পটু, বক্তৃ ও সুগত ধর্ম্মে রতা বলিয়া জনসমাজে বহু মানের পাত্রী ছিলেন। ইঁহারা জ্ঞানগৌরবে ও ধর্ম্মগৌরবে গরীয়সী ছিলেন। তথা অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যাপীঠে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিনা—সে বিষয়ে কোন ইঙ্গিত বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহারা যে পরিবারের মধ্যে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ললিতকলায় নারীরা পারদর্শিনী ছিলেন। নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন—তখন তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ বা অবগুণ্ঠন ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধের চরিত্রের উদারতা এমন বিশ্বব্যাপিনী ছিল যে—তাঁহাকে সকলেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। তিনি নারীজাতিকে ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়া নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর চিত্তে আলোক দান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কেন এই কথা স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষাপূর্ব্বক বিশিষ্ট ধর্ম্মরূপে হিন্দুধর্ম্মের পার্শ্বে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিল না—ইহা ভারত ইতিহাসের এক অমীমাংসিত সমস্যা। বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত পোষণ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রভাব, মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুত্থান, বৌদ্ধধর্ম্মে ভজন পূজনের অভাব, তান্ত্রিক-কাণ্ডের প্রভাববশতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা, ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের এবং ভিক্ষুণীদের সহিত সাধারণ লোকের মেলামেশায় বহুবিধ অশান্তির সৃষ্টি—এইগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি বা অবনতির অনেকগুলি কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, এই সদ্ধর্ম্ম এদেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই—ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাতে নূতনত্ব দান করিয়াছ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণপূর্ব্বক অহিংসা ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করেন। 'প্রাণীহিংসা করিব না'—ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সেজন্য কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।—"

বৌদ্ধেরাই সংযম, সাহস, স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠা ও জ্বলন্ত ধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ধর্ম্মের মহিমা হিন্দুসমাজ হইতে কখনই লুপ্ত হইবার নহে—সেই ধর্ম্ম ভারতে চির-রক্ষিত থাকিবে। এখনও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও সেই মহাপুরুষের শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সৌরভ ও পবিত্রধর্ম্মের বাণী অসংখ্য নর-নারীর চিত্ত হরণ করিতেছে।

তুমি নাই ঃ কত কথা আজ মনে পড়ে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রু সরোবরে মম ফুটেছিলে অনুরাগে বেদনায় শুচি-স্মিতা শতদল সম
মৌনমুগ্ধ অভিসারে পরাণ-হিল্লোলে। সুনীল অম্বরতলে লাবণ্যের সর্ব্বোত্তম
দেখেছিনু রশ্মি তব অশ্রুতে হাসিতে ; উষার নির্ঝর কোলে মায়ামৃগ
ছিল সুখী,
তুমি যে রজনীগন্ধা দুঃখের দুর্য্যোগে মম, আশার উদয়প্রান্তে তুমি সূর্য্যমুখী।
নীরব সম্ভ্রমে তুমি দিগন্তের পরপারে সত্যের অমৃতরূপ লুকানো যেথায়,
সন্ধ্যার তিমির দ্বারে দাঁড়াইয়া নতশিরে তোমায় প্রণাম দিতে ধ্যান মমতায়।
তব মনোহরণের মাধবীকুঞ্জের গীতি রাত্রির প্রতিমা পাশে হইত যে পাওয়া,
তাহারি সম্মুখে ছিল কৃষাণ কুটিরগুলি কৃষাণীর সরমের আবরণে ছাওয়া।
তুমি তো চলিয়া গেলে হৃদয় অতীত করি স্বপ্নে মম দোলে তব সচকিত-ছায়া,
সংসার-সমাজে আমি তৃষিত মরুসম : আমারে ঘিরিয়া আছে মরীচিকামায়া।

তুমি কি দিবে না দেখা ! নিবাত দীপের মত সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
বসে আছি একা,
সকরুণ সুরে পাখীদের ডাক শুনি, তোমার কুটিরে নামে
প্রভাতের রেখা।
তোমার প্রেমের হবে জন্মান্তর জানি, নব নব পুষ্পদলে
সৃষ্টির সূত্রটী ঘিরে—
নব নব পেলব-পল্লবে হে কল্যাণী ! আমি হেথা রহিলাম
নিরাশার নদী তীরে।
বিরহে মিলনে ত্যাগে জীবনের উপলব্ধিমত হৃদয়ের সমাধির বক্ষে সবি রাখি
শুভ্র কুসুমের সম। উৎসব ফুরায়ে গেছে, পড়ে আছে শুষ্কমালা,
কাঁদে প্রাণপাখী।



বনফুল

২৩

"এই সেই জায়গা"—স্বয়ম্প্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ড্রাইভারের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজের বেঁটে ছাতার বাঁট দিয়ে মোটরের জানলার কাচে আঘাত করতে লাগলেন।

"থামাও, থামাও গাড়ি, এই ড্রাইভার, শুনতে পাচ্ছে না না কি। থামতে বল ওকে, ঘুমুচ্ছ না কি তুমি—"

জিতুবাবু ঢুলছিলেন। চমকে উঠে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "কতদূর এলাম আমরা. ঢুল ধরেছিল একটু।"

"কৎমোরংপুর। নাব"—বেশ ঝেঁপে জবাব দিলেন স্বয়ম্প্রভা।

জিতুবাবু অবিশ্বাসভরে ড্রাইভারের দিকে চাইলেন।

"আমরা এসে গেলাম নাকি "

ড্রাইভারও ঠিক করতে পারছিল না কিছু। হোটেলের মতো কি একটা সে এই মাত্র অতিক্রম করে' এল। পিছন দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে সেই দিকেই চাইতে লাগল সে।

জিতুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, "আমরা এসে গেলাম নাকি।"

"তাই তো মনে হচ্ছে"

"বেশ দূর আছে তো। সেই কখন চড়েছি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দূর আছে বই কি। যতটা আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়েও দূর"

"বাংলা দেশ পার হয়ে এলাম না কি"

"আজ্ঞে প্রায় তাই বটে। রাস্তাও দারুণ খারাপ"

"কি কাণ্ড"—অস্ফুট কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"তুমি নাববে কিনা"—ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাইলেন ভর্তার দিকে।

"নাবব, কিন্তু একটু সবুর কর। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করবে এখুনি। ওহে, গাড়িটা ব্যাক করে' ওই হোটেলটার সামনে নিয়ে চল। নাবছি, একটু সবুর কর না। গাড়ি ব্যাক করার সময় নাবতে গিয়ে একজনের পা ভেঙে গিয়েছিল আমি জানি।"

"তা তো জানবেই। যত সব উজবুক গাড়োলের খবরই তো রাখ তুমি"

স্বয়ম্প্রভার চোখের দৃষ্টি থেকে আর এক ঝলক আগুন নির্গত হল।

"দেখো দেখো"—জিতুবাবু ড্রাইভারকে বললেন—"আর একখানা মোটর রয়েছে। ধাক্কা মেরো না যেন"

ড্রাইভার নানা রকম কৌশল করে' অবশেষে গাড়িটা ব্রজেশ্বরবাবুর মোটরের পিছনে এনে লাগালে। স্বয়ম্প্রভা অবতরণ করলেন এবং নাক কুঁচকে এমনভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলেন যেন তাঁকে আস্তাকুড়ের মাঝখানে নাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনীতাও নাবল। জিতুবাবু ড্রাইভারকে কি যেন বলছিলেন। বলতে বলতে ভীতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে চাইলেন। ব্যাপারটা বুঝতে স্বয়ম্প্রভার দেরী হ'ল না।

"কি? থাকতে চাইছে না ও? আচ্ছা, আমি ওর সঙ্গে কথা কইছি। গাড়ি থেকে ব্যাগটা নাবিয়ে নাও, আর তুমি দয়া করে' সরে' থাক একটু।"

দৃঢ় পদবিক্ষেপে স্বয়ম্প্রভা এগিয়ে গেলেন মোটরের দিকে এবং সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন ড্রাইভারকে।

জিতুবাবু সরে' এসে ঘাড় উঁচু করে' হোটেলের সাইনবোর্ডটা পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অনীতা হোটেলের কপাটটা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভিতরে বাঁহাতি একটা ঘর, তার কপাটটাও খোলা। ঘরে ঢুকেই কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল সে, পিছন থেকে কে যেন জড়িয়ে ধরল তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে, দেখে সুশোভন।

"তুমি! ওঃ—" সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

"বস, বস, লক্ষ্মীটি—এই চেয়ারটায় বস। ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই, যা রাস্তা। একটু জিরিয়ে নাও আগে, তারপর সব বলছি। চা আনাব?"

"না, তুমি বস। কোথাও যেও না তুমি"

"ও, আচ্ছা—"

পিছনের দিকের কপাটটি সন্তর্পণে ঠেলে দীর্ঘাকৃতি ব্রজেশ্বরবাবু ঢুকলেন। ঢুকেই বেরিয়ে গেলেন।

"উনি কে"—চোখ বড় বড় করে' জিগ্যেস করলে অনীতা।

"ব্রজেশ্বরবাবু। আমাদের বন্ধু একজন। উনিও প্যাঁচে পড়েছেন। ওঁর স্ত্রীই তো ষ্টেশনে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে যান এবং তাঁকে তুলতে গিয়েই তো ট্রেণটা ছেড়ে গেল। ছি, ছি, কি কাণ্ড"—একটু থেমে—"রাগ করেছ তো খুব?—"

অনীতার রাগ আর ছিল না। মুখে বরং হাসি ফুটেছিল। যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সুশোভনকে জড়িয়ে কত কথাই না সে ভাবছিল তার সঙ্গে সুশোভনের বন্ধুত্বও যখন অক্ষুণ্ণ আছে তখন ভাববার কিছু নেই।

পিছনের দরজায় দু' তিনটি টোকা শোনা গেল। সুশোভন উঠে গেল এবং দরজা খুলে বললে, "আসুন না আপনি ভিতরে, অনীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই"

"না, আমি জিগোস করতে এসেছি, চা আনাব কি ?"

"সে সব পরে হবে এখন। ভিতরে আসুন"

ব্রজেশ্বরবাবু ভিতরে এলেন। অনীতা দাঁড়িয়ে উঠল। নমস্কার বিনিময় হল। কি বলবেন ভেবে না পেয়ে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেশ্বরবাবু। বাম ভ্রূটা ঈষৎ লাফিয়ে উঠল একবার।

"ও ! তুমি এখনও এখানে আছ"

স্বয়ম্প্রভা দ্বারপ্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বরবপু দিয়ে সমগ্র দ্বার পথটা প্রায় অবরুদ্ধ করে' পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছিলেন। মনে হচ্ছিল হাতে একটা বাইনাকুলার থাকলে আরও যেন মানাতো। তাঁর গাম্ভীর্য্য কিন্তু অটুট রইল না, মনে হল পিছন থেকে কেউ ঠেলছে তাঁকে।

সুশোভন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

"হ্যাঁ। আপনারা আসছেন খবর পেয়ে ফিরে এলাম আবার এখানে। আপনারা এসে পড়েছেন খুব ভাল হয়েছে, এমন আনন্দ হচ্ছে আমার। আসুন পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবু—আমার একজন বন্ধু—"

স্বয়ম্প্রভা দু'পা এগিয়ে এলেন এবং গম্ভীরভাবে দায়-সারা গোছ নমস্কার করলেন একটা।

"বাবা কোথায় গেলেন, তাঁর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দি এঁর"

"ভিতরে এস না তুমি, বাইরে কি করছ"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঢুকতেই পারছি না যে। সর একটু"

স্বয়ম্প্রভা পথ করে' দিতে জিতুবাবু ভিতরে প্রবেশ করলেন।

"কপাট বন্ধ করে' দাও"

"দিচ্ছি দিচ্ছি"

স্বয়ম্প্রভা ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন—"ইনি আমার স্বামী"

ব্রজেশ্বরবাবু নমস্কার করলেন।

সুশোভন অনীতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"গোড়াতেই একটা কথা জানিয়ে দেওয়া দরকার"—সুশোভন বললে—"যে মহিলাটির সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে আমার দেখা হয়েছিল এবং যাঁর জন্যে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে ট্রেণ ফেল করতে হল তিনি এই ভদ্রলোকটির স্ত্রী"

এই সংবাদে স্বয়ম্প্রভা একটু মুষড়ে পড়লেন যেন। কি ভাবায় সুশোভনকে তিনি আক্রমণ করবেন তা এতক্ষণ মনে মনে ভাঁজছিলেন। অনেকগুলি তীরই সুশাণিত করে' রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু এই কথা শুনে সব যেন গুলিয়ে গেল তাঁর।

"সুশোভনবাবুর স্ত্রী যে কত অসুবিধায় পড়েছিলেন তা আমি শুনেছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত"—এই কথাগুলি উচ্চারিত হল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখ থেকে। আড়চোখে একবার অনীতার দিকে চেয়ে একটু থেমে এবং ঈষৎ হেসে আবার বললেন তিনি—"আমার দিক দিয়ে অবশ্য খুবই সুবিধা হয়ে গিয়েছিল, উনি সান্ত্বনাকে মোটর করে' নিয়ে এসেছিলেন। সুশোভনবাবু ট্রেণ ফেল করে' একটা ট্যাক্‌সি ভাড়া করেছিলেন—সময় মতো যাতে গিয়ে পড়তে পারেন, মিসেস নন্দী যাতে অপরিচিত স্থানে গিয়ে অসুবিধায় না পড়েন। আমি পরে আর একটা মোটরে এঁদের অনুসরণ করি"

সুশোভন সবিস্ময়ে চেয়েছিল। এই মার্জিত মিথ্যুকটি শুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপারটাকে বেশ গুছিয়ে এনেছেন তো। অনীতার চোখ মুখ দিয়েও আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল। জিতুবাবুও অস্ফুট ভাঙা-ভাঙা জোড়া-তালি লাগানো বাক্যাবলীর দ্বারা নিজের সন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। স্বয়ম্প্রভা বাম হস্ত উত্তোলন করে' নীরব করে' দিলেন তাঁকে এবং ফোঁস করে' নিশ্বাস টেনে নিলেন সজোরে।

"ও। কিন্তু একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে এলেন না কেন। তিনি তো অপেক্ষা করতে পারতেন একটু"

নিশ্চয় পারতেন। অপেক্ষা করতে চাইছিলেনও, কিন্তু আমারই আসার ঠিক ছিল না যে। এসেম্ব্লীর ব্যাপারে আমাদের কংগ্রেসের পার্টি মিটিং হবার কথা ছিল একটা, যদিও শেষ পর্য্যন্ত হল না সেটা"

"আপনিই কি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে !"—জিতুবাবু সসম্ভ্রমে বলে' উঠলেন।

"হ্যাঁ, উনিই"—মাথা নেড়ে সমর্থন করলেন সুশোভন।

ব্রজেশ্বরবাবু বিনীত ভাবে নমস্কার করে' বললেন—"আমি বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমি কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী বটে, অধ্যাপনাও করে থাকি"

জিতুবাবু হঠাৎ কামিজের গলার বোতামটা লাগিয়ে নিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে দেখতে লাগলেন লোকটিকে।

স্বয়ম্প্রভার চিবুক ও স্কন্ধযুগল অস্থির হয়ে উঠেছিল। "ও, আপনি বুঝি শুনলেন তারপর—যে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আপনার স্ত্রী চলে এসেছেন"

ঘাড়টি ঈষৎ কাৎ করে' সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এ খবরও পেলাম পরে যে, পথে ওঁদের মোটরে কি একটা 'অ্যাক্‌সিডেণ্ট' হয়েছে এবং ওঁরা এই হোটেলটায় এসে আশ্রয় নিয়েছেন। শুনে আমিও চলে এলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে"

"ভাগ্যে এসেছেন"—মৃদুকণ্ঠে বলতে হল স্বয়ম্প্রভাকে—যদিও সুশোভনের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি।

সুশোভনের মনে হল তাঁর নাকের ডগাটা কাঁপছে। ঠাণ্ডায় না রাগে গবেষণা করতে লাগল সে মনে মনে।

"কি যে সব কাণ্ড"—জিতুবাবু বললেন—"তখনই বলেছিলাম আমি। হোটেলওলা কোথা ?"

"তিনি বেরিয়ে গেছেন। হোটেলে কেউ নেই"—সুশোভন বললে।

"কে একজন যে উঁকিঝুঁকি মারছিল"

"ও গোকুল। পাশে ওর তাড়ির দোকান আছে। ওকে বসিয়ে রেখে হোটেলের চাকরটা শুদ্ধ বেরিয়ে গেছে"

"কেন, কি করবে তুমি ওকে নিয়ে"—স্বয়ম্প্রভা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবুকে।

"না, কিছু নয়। ওকে বলব ভাবছিলাম যে আমাদের কিছু চাই না"

"কি দরকার তা বলবার"

ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে তারপর স্বয়ম্প্রভা বললেন, "দেখুন মেয়েকে নিয়ে আমরা এমনভাবে এসে পড়লাম এখানে"—একটু ইতস্তত করে' থেমে গেলেন তিনি, ঠিক কথাগুলো মুখে জোগাল না। উপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

"আমাদের সঙ্গে আছেন ?"—ব্রজেশ্বরবাবু ধীরকণ্ঠে বাক্যটা সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস পেলেন। স্বয়ম্প্রভা তথাপি নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তিনি ঠিক কেন যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এতদূর ধাওয়া করেছেন তা এই শান্ত গম্ভীর লোকটির কাছে প্রকাশ করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে পড়ছিল।

সুশোভন নীরবতা ভঙ্গ করলে। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারছিল না।

"এদের সঙ্গে থাকাটা কি গর্হিত বলে' বিবেচনা করছেন আপনি ?"

স্বয়ম্প্রভার ইতস্তত ভাবটা গেল।

"না, বাবা তা মনে করছি না। কিন্তু আমরা শুনেছিলাম যে তুমি নাকি অনীতাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ট্যাক্সি করে' চলে এসেছ এবং এখানে নাকি রাত কাটিয়েছ। কিছু মনে কোরো না বাবা, কিন্তু তোমার বিষয়ে যে সব কানাঘুসো শুনি তাতে এই খবর শুনে আমাদের—"

"ও"—সুশোভন এর বেশী আর বলতে পারলে না কিছু।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"যাক এখন আপনাদের ভুল ধারণাটা ভেঙে গেছে আশা করি। আমি এখন দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে যেতে চাই। সুশোভনবাবু যদি সস্ত্রীক সেখানে যেতে চান আমার মোটরে আসতে পারেন ?"

এই শুনে অনীতা বললে, "কিন্তু আমি কাপড় চোপড় যে কিছু আনি নি। এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া চলে কি"

"তাতে কি হয়েছে"—সুশোভন বললে—"ফোনে বলে' দিলে কাপড়-চোপড় কালই চলে আসবে। এক রাত্রে এমন আর কি এসে যাবে। কাপড়-চোপড় আনবার জন্যে এখন কোলকাতা ফিরে যাওয়া যায় না তো"

অনীতা সুশোভনের দিকে চেয়ে দেখলে একবার ভুরু কুঁচকে। মায়ের সঙ্গে আবার কোলকাতা ফিরে যেতে তারও ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে এক কাপড়ে যাওয়া যায় কি ?

"ওপরে ক'খানা শোবার ঘর আছে"—হঠাৎ জিগ্যেস করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দু'খানা"—সুশোভন জবাব দিলে।

"নীচে থেকে দেখে তো মনে হয় না। খুব ছোট ঘর বুঝি"

"খুবই ছোট। শোবার খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন।

"হু"

ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে পুনরায় নিষ্পিষ্ট করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমাকে এবার যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আপনারা যাচ্ছেন না তাহলে"—একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ব্রজেশ্বর।

"না আমাদের যাওয়া হবে না। অনেক ধন্যবাদ"—মৃদু হেসে জবাব দিলে অনীতা।

"আচ্ছা আমি তাহলে ওপর থেকে ঘুরে আসি"

ব্রজেশ্বরবাবু কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

"কোথা গেলেন উনি ? দোতলায় উঠলেন মনে হচ্ছে" সুশোভনকে প্রশ্ন করলে অনীতা।

"দোতলার ভদ্রমহিলাটি কোথাও যেতে পারবেন না এখন। কাল রাত্রে তাঁর একেবারে ঘুম হয় নি, সমস্ত রাত বসে' কেটেছে। তিনি এখনই আবার মোটরে যেতে চাচ্ছেন না। তিনি ব্রজেশ্বরবাবুকে বলছেন—মোটরে করে' দিগ্বিজয়বাবুর কাছে গিয়ে একবার ঘুরে আসতে। একেবারে না গেলে বড় খারাপ দেখাবে। তাঁরা কোনও খবর তো পাননি, ভাবছেন হয়তো। উনি আজ জিরিয়ে কাল ওখানে যাবেন ঠিক করেছেন"

"সে মাগী এখনও আছে নাকি এখানে ?"—প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আছেন"

"আর তার স্বামী তাকে এখানে ফেলে যাচ্ছে ?"

"উনিই তো ব্রজেশ্বরবাবুকে জোর করে' পাঠাচ্ছেন"—সুশোভন উত্তর দিলে নিরীহভাবে।

"তেমন কিছু অসুখ হয় নি তাহলে"—অনীতা বললে।

"অসুখ তো হয় নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"বিছানায় শুয়ে আছে ?"

"হ্যাঁ"

সুশোভনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল একটা।

অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে—"আচ্ছা, দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে কে কে আছে"

"বিশেষ কেউ না। আমরা আর ব্রজেশ্বরবাবুরা। কেন?"

"ভাবছি, চল না হয় চলেই যাই তোমার সঙ্গে। ছোট একটা স্যুটকেসে আছে খানকয়েক শাড়ি, তাতেই না হয় চালিয়ে নেব কোনরকমে"

হঠাৎ মত বদলে ফেললে অনীতা। রাগ দুঃখ কিছু ছিল না তার আর। সুশোভন যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, এর প্রমাণ সে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়বার মানেটা কি! না, চোখে চোখে রাখাই উচিত। ও ডাকিনীর কাছ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব দূরে সরে' যাওয়া যায় ততই ভালো। এখানে আর একদণ্ডও থাকা নয়।

জিতুবাবুরা যে গাড়িতে এসেছিলেন সুশোভন বেরিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির ড্রাইভারকে গোপনে বলে এল সে যেন তাড়া দিয়ে স্বয়ম্প্রভাকে নিয়ে চলে যায় এক্ষুণি। ক্রমাগত তাড়া দেয় যেন। ড্রাইভারের নিজেরই ফেরবার তাড়া ছিল, সুশোভনের কাছ থেকে কিছু বখশিস পেয়ে সানন্দে রাজি হয়ে গেল সে।

২৪

স্বামী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্প্রভা দেবী বাইরের ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মোটরের 'গিয়ার' বদলানো হ'ল, হর্ণও শোনা গেল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। খানিকটা ধোঁয়া এবং ধুলো ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। সুশোভন আর অনীতাকে নিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু মোটরে চলে গেলেন। চেয়ারটায় এসে বসলেন স্বয়ম্প্রভা। চুপ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। পরাজয়ের গ্লানিতে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ। গ্লানিটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল জিতুবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর বিরক্ত চোখ মুখ যেন নীরব ভাষায় বলছে—তখনই বলেছিলাম!

"হাসছ?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"না তো"

"হাতের নখগুলোকে কামড়াচ্ছ কেন। কি যে মুদ্রাদোষ তোমার"

"দেখ সম্পু, আর মাথা খারাপ করে' লাভ নেই। বরং যা হয়েছে তাতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত"

"কে মাথা খারাপ করছে"

"সুশোভন ছেলেটি যে ভালো এ আমি বরাবরই জানি, কিন্তু তোমার ধারণা ঠিক উলটো। তোমার ধারণা যে ভুল তাতো প্রমাণ করেছি, এইবার বাড়ি চল"

"তুমি প্রমাণ করেছ? আমি না জোর করলে কি তুমি বাড়ি থেকে নড়তে?"

"বাজে ব্যাপারে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে এবার বাড়ি চল"

"আমি একটু চা খাব"

"তাহলে তো ওই গোকুল মা কে—তারই শরণাপন্ন হতে হয়। তাড়ির দোকানে চা-ও বিক্রি করে হয়তো। দেখি—"

"এই ছুতোয় তুমি গিয়ে আবার যেন তাড়ি খেও না"

"আমার একটা কিছু খাওয়ার দরকার কিন্তু। শরীর আর বইছে না। এখানে 'বিয়ার' পাওয়া যাবে কি? তাড়ি জিনিসটাও অবশ্য খারাপ নয়—"

"তুমি কি আপিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'বিয়ার' খাও না কি!"

"জিনিসটা খারাপ নয়। প্রস্রাব সরল রাখে"

"লজ্জা করে না তোমার!"

"লজ্জার কি আছে এতে"—মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন জিতুবাবু—"দেখি, চা পাওয়া যায় কি না—"

প্রজ্বলিত-দৃষ্টি জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন।

স্বয়ম্প্রভা চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুজলেন, মনে হল যেন প্রার্থনা করছেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চোখ খুলতে হল। রাস্তায় 'মেশিন্ গান্'এর শব্দ।

"আরে তুমি"

"আরে বাঃ"

জিতুবাবু এবং সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বর যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

"সম্পুও পাশের ঘরে মজুত"—জিতুবাবু বলছেন—স্বয়ম্প্রভা শুনতে পেলেন। 'মজুত'—আহা কথা বলার কি শ্রী, মনে হল তাঁর। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল ঈষৎ।

"তুমি এখানে হঠাৎ। কি মনে করে'? এস ভেতরে এস" সোজা হয়ে বসে' সদারঙ্গবিহারীলালকে আহ্বান করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি কিন্তু এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না মশাই। যেতে হয়তো চলুন, আর আপনাদের দেরী থাকে তো ভাড়া মিটিয়ে দিন আমার"

ড্রাইভার জিতুবাবুকে বললে।

"এক্ষুণি যাব আমরা। একটু সবুর কর"—জিতুবাবু মৃদু হেসে বললেন।

"নিশ্চয় সবুর করবে। তাড়া দিতে মানা কর ওকে। আস্পর্দ্ধা তো কম নয়। ওকে আমরা ভাড়া করে' এনেছি, কাজ শেষ করে' যাব। ওয়েটিং চার্জ যা লাগে তা দেওয়া যাবে। তারপর সদারঙ্গ, তুমি এখানে এলে কোথা থেকে"

সদারঙ্গবিহারীলাল হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন। স্বয়ম্প্রভা সম্পর্কে তাঁর দিদি হন।

"আপনিও এখানে! যাচ্চলে—বাঃ—আরে রাম রাম—কল্পনাতীত মানে—বাঃ"

"শ্—শ্—আস্তে—হাঁা, নিশ্চয়ই"—জিতুবাবুর গলা শোনা গেল বাইরে ড্রাইভারকে শান্ত করছেন।

"তুমি এখানে এলে হঠাৎ যে"—পুনরায় প্রশ্ন করলেন স্বয়ম্প্রভা।

"আমি? অনেকক্ষণ আগেই আসা উচিত ছিল আমার। বাইকটাই গড়বড়িয়ে দিলে! মিঠুয়ু যে কেমন করে' সামালে তা জানি না।

একটা না একটা ট্রাবল লেগেই আছে। আজকেরটা বোধহয় স্প্রোকেট্‌স্ (Sprokets) গুলোর দরুণই প্রধানত। ম্যাগ্‌নেটোর ভিতর কিছু তেলও ঢুকেছিল। ম্যাগ্‌নেটোতে তেল ঢুকলেই বাস্‌। সমস্ত খুলে সাফ করতে হল। তারপর থেকে ক্রমাগত লাফাচ্ছি। এখন এক একটা জার্ক দিচ্ছে—"

"বাইকের কথা থাক। এখানে কেন এসেছ—তাই বল"

ড্রাইভারের গলা আবার শোনা গেল।

"ভাড়া করেছেন বলে' কি সমস্ত দিন থাকতে হবে না কি। মোটর কি আপনার নিজের—"

"আরে চেঁচাচ্ছ কেন বাপু। সম্পূ আমরা কতক্ষণ আর—"

"ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও"

"ও কেবল জানতে চাইছে আমরা কতক্ষণ—"

"তুমি ভেতরে এস। কপাট বন্ধ করে' দাও"

"আসছি। এখুনি আসছি"—ড্রাইভারকে আশ্বাস দিয়ে জিতুবাবু ঘরে ঢুকলেন।

"দেখুন, কিন্তু একটা কথা, আমি আপনাদের আটকাচ্ছি না তো! না, না, তার দরকার নেই মোটেই—যাই হোক, আটকাতে চাই না। আমি আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা বিনা মেঘে বজ্রপাত গোছ—মানে, প্রায় অ্যাটম বম্‌—"

"তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তুমি"—স্বয়ম্প্রভা জিজ্ঞেস না করে' পারলেন না।

"দেখা করতে, মানে, অকপটে বলতে গেলে খোঁজেই এসেছিলাম। একটি ভদ্রলোককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত গোছের মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে রাউরপুর রুইনসে আলাপ হল। এই হোটেলেই পরশু রাত্রে আর একজন ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁদেরও আলাপ হয়েছিল। তাঁদের কথা প্রথম ভদ্রলোককে বলতেই তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন; তারপর চট্‌ করে' একটা মোটর ভাড়া করে' ঊর্দ্ধশ্বাসে এইদিক পানে বেরিয়ে এলেন। তারি পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, হয় তো তাঁকে এমন কিছু বলে' থাকব যা হয় তো বলা উচিত ছিল না। একটু কেমন যেন গোলক ধাঁধা গোছ লাগছে। শুনবেন ব্যাপারটা, যদি অবশ্য আপনাদের যাবার তাড়া না থাকে"

"শুনব বই কি। যাবার কিছু তাড়া নেই"—স্বয়ম্প্রভার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এসেছিল—"ওগো, তুমি ব'স না। জানলার দিকে হাত নাড়ছ কেন—"

"ড্রাইভারটা জানলার কাছে এসেছে"

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র থেকে ফোঁৎ করে' একটা শব্দ বার হল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"ভয়ে ভয়েই সমস্ত জীবনটা কাটল তোমার"—এই কথাগুলি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। ড্রাইভার নিজের সীটে গিয়ে বসতে পথ পেল না। কেঁচো হয়ে গেল একেবারে নিমেষের মধ্যে।

"এইবার বল"—স্বয়ম্প্রভা সদারঙ্গবিহারীলালকে আদেশ করলেন।

...কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই ড্রাইভারের আত্মসম্মান প্রবুদ্ধ হল আবার। লজ্জাও হল একটু। ছি, ছি, সামান্য একটা মেয়েমানুষের ধমকে ঘাবড়ে গেল সে। নেবে বুকটা একটু চিতিয়ে আবার এগিয়ে গেল সে জানলার দিকে।

...স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ঝুঁকে সদারঙ্গবিহারীলালের কথা শুনছিলেন। স্মিতমুখে একাগ্র দৃষ্টিতে এমন ভাবে চেয়েছিলেন তিনি, মনে হচ্ছিল যেন কোন অপরূপ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করছেন। শুধু প্রত্যক্ষ করছেন না, যেন উপভোগও করছেন সেটা।

জিতুবাবু টেবিলের এক কোণে বসে' নিরুপদ্রবে নিবিষ্টচিত্তে নখ কামড়াচ্ছিলেন। সদারঙ্গবিহারী বক্তৃতা করে চলেছিলেন। হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

"বুঝেছি। তুমি উপরে গিয়ে দেখে এস কেউ আছেন কি না, আর যদি থাকেন, তিনি তোমার সেই সান্ত্বনা দেবী কি না"

সদারঙ্গ একটু আমতা আমতা করে' বললেন, "একজন ভদ্রমহিলার ঘরে উঁকি দেওয়াটা কি ঠিক হবে—মানে—"

"বাজে কথা বোলো না, যা বলছি কর। যাও, দেখে এস"

সদারঙ্গ তাঁর কোটের গলার বোতামটা খুললেন, আবার লাগালেন। আবার খুললেন।

"করছ কি তুমি, যাও না"

"অন্য কোনও উপায়ে যদি"

"যাও বলছি"

অনন্যোপায় সদারঙ্গবিহারীকে যেতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের যে ঘরটিতে গোঁসাইজির অসুস্থা গুরু-ভগ্নীটি হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। বন্ধদ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিলেন একবার। ভিতর থেকে যে ধরণের শব্দ এল তাতে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। ভব্যতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন।

...যাবার সময় সদারঙ্গবিহারীলাল ঘরের দ্বারটি ঈষৎ খুলে রেখে গিয়েছিলেন। সেই দ্বার পথে সাহস করে' ড্রাইভারটি এসে ঢুকল। দ্বারের দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন বলে স্বয়ম্প্রভা দেখতে পেলেন না। ড্রাইভারটি কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দাম্পত্যালাপ শুরু হয়ে গেল। ড্রাইভার কথা না বলে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল সব।

"শুনলে তো এইবার? বলেছিলাম না?"

"ও সব আমি বিশ্বাস করি না। আমি ফিরে যাচ্ছি—"

"ফিরে যাচ্ছ? আমি কিন্তু যাব না। আমি মুচুকুণ্ডুতে যাব"

"পাগল না কি! সেখানে কি এমন ভাবে যাওয়া যায়—"

"খুব যায়"

"যাও তাহলে। আমি ফিরে যাচ্ছি। সদারঙ্গ সমস্ত ব্যাপারটা

জানে না, কি বুঝতে কি বুঝেছে, কি বলতে কি বলছে, ওর মধ্যে আমি আর নেই"

"পুরুষ মানুষ হয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না তোমার? একটা লম্পটের হাতে নিজের মেয়েকে ফেলে পালিয়ে যাবে তুমি? যেতে চাও যাও, আমি যাব না"

"সুশোভন যে লম্পট তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আর তোমার ওই সদারঙ্গবিহারীও যে অভ্রান্ত যুধিষ্ঠির একথাও মানতে রাজি নই আমি। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গোলমাল আছে তাই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না"

"সেই গোলমালটা যে কি—তাই জানতেই তো মুচুকুণ্ডে যেতে চাইছি"

"সে ধীরে সুস্থে জানা যেতে পারে, তার জন্যে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে হুড়মুড় করে' যাওয়ার দরকার নেই"

"আছে"

"কি যে পাগলের মতো করছ তুমি সম্পু"

"পাগল আমি নই, পাগল তুমি। শুধু পাগল নয়—পাষাণ। বাপ হয়ে মেয়েকে এমন ভাবে একটা গুণ্ডার হাতে ফেলে পালাতে পার"

"ছি ছি অত চেঁচিও না, লোকে বলবে কি"

"লোকের বলার কি হয়েছে এখন। যখন ঢিঢিক্কার পড়ে যাবে তখন শুনতে পাবে"

"ছি ছি কি করছ তুমি সম্পু। আচ্ছা, এখন ওই দিগিন্দ্রবাবুর ওখানে গিয়ে কি করতে চাও তুমি শুনি"

"আমি অনীতাকে বলতে চাই যে তার স্বামী ওই ব্রজলালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। আমি অনেক কিছু করতে চাই সেখানে গিয়ে। আমি সুশোভনের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ব্রজলালবাবুর সঙ্গেও বোঝাপড়া করতে চাই। ওপরের ঘরে যিনি আছেন তিনি যদি ব্রজলালবাবুর স্ত্রী না হন—খুব সম্ভবত নন—তাহলে ব্রজলালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চাই। এদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে যদিও আমরা আমাদের মেয়েকে ভুল করে' একটা পাষণ্ডের হাতে দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু সব কথা জানবার পর আর আমরা তাকে তার কাছে থাকতে দেব না"

"কি করে' যাবে তুমি মুচকুন্দপুরে?"

"ওই মোটরে। ওই ড্রাইভারই নিয়ে যাবে"

"না আমি যাব না"—নাটকীয়ভাবে বলে' উঠল ড্রাইভার দ্বারপ্রান্ত থেকে।

স্বয়ম্প্রভা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন এবং তড়াক্ করে উঠে দাঁড়ালেন। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটতে লাগল চোখের দৃষ্টি থেকে।

"আমাদের কথা দাঁড়িয়ে শুনছিলে তুমি?"

"শুনছিলাম"

তারপর জিতুবাবুর দিকে ফিরে সে বললে—"আপনি যদি আমার সঙ্গে আসতে চান আসুন। আমি এখুনি ফিরে যাচ্ছি"

জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"সম্পু, ব্যাপারটা ভেবে দেখ, বুঝলে—"

"যাও না তুমি। যাও। ব্যাগটা রেখে চলে যাও"

"না, না, আমি যেতে চাইছি না—কিন্তু—"

"হ্যাঁ, তুমি যেতেই তো চাইছ, তাই তো বলছিলে এতক্ষণ। যাও, আমাকে ফেলে রেখে চলে যাও"

"সম্পু, দেখ আমি—"

"আমি মোটর ষ্টার্ট করছি মশাই। এত কৈফেৎ বরদাস্ত হয় না আমার—"

হঠাৎ মনস্থির করে ফেললেন জিতুবাবু।

"বেশ, আমি চললাম তাহলে—"

দ্বারপ্রান্তে একটু ইতস্তত করলেন ভদ্রলোক। গোঁফ ঝুলে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে ধুলো, চোখে কাতর মিনতি। বড় করুণ দৃশ্য। স্বয়ম্প্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। জিতুবাবুকে একাই চলে যেতে হল।

সদারঙ্গবিহারীলাল নেমে এলেন।

বললেন, "আমি যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। বাঃ—এ যে অদ্ভুত মনে হচ্ছে—মানে"—তারপর একটু থেমে হাত দুটো ঘসে, হঠাৎ বলে উঠলেন—"ছি, ছি, যাচ্ছে তাই"

"ওপরে কে রয়েছে দেখে এলে? সান্ত্বনাদেবী?"

"সান্ত্বনাদেবী তো নেই। একটি হাঁপানি রুগী রয়েছেন। আপনারা শুনতে ভুল করেন নি তো"

"ভুল? মোটেই না"

"ওকি, মোটরটা ষ্টার্ট করছে দেখছি। চলে যাচ্ছে নাকি"

"উনি ফিরে যাচ্ছেন"

"ও। আর আপনি?"

"আমি মুচুকুণ্ডু যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে"

"মুচুকুণ্ডু? মানে, মুচুকুন্দ কুণ্ডলেশ্বরী? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

স্বয়ম্প্রভা মাথা নাড়লেন।

সদারঙ্গ মাথা চুলকে বললেন, "কিন্তু দেখুন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না সেখানে"

"আমারও করছে না"—দৃঢ়কণ্ঠে স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু মায়ের কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে, তা সে যতই না কেন অপ্রিয় হোক"

"ও। কিন্তু আমাকে যদি বাদ দেন, ক্ষতি কি"

"তোমাকে যেতেই হবে। উনি তো আমাকে ফেলে চলে গেলেন। আমার প্রতি অনীতার প্রতি তোমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। তা ছাড়া তোমার মুখেই খবর পেলাম যে কতবড় ধড়িবাজ ওরা। তুমিই হলে প্রধান সাক্ষী। তোমাকে যেতেই হবে"

"চিঠি লিখে দিলে কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে যদি—মানে—জনার্দ্দনবাবুকে কথা দিয়েছি ভোটগুলো জোগাড় করে দেব—হনুমানপুরটা সেরে ফেলেছি যদিও—"

"ওসব পরে কোরো। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের মুচকুন্দপুরে

পৌঁছতে হবে। ওই ছুটো লোক আমাকে ভাঁওতা দিয়ে অনীতাকে নিয়ে সরে পড়েছে। অনীতার বিপদ চরমে পৌঁছবার আগে আমাদের সেখানে পৌঁছতেই হবে, যেমন করে' হোক"

"পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল দেখছি। দেখুন দিদি, মাপ করুন আমাকে, আমি, মানে, এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না"

"এখুনি বললে ওই লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আবার বলছ এসবে নিজেকে জড়াতে চাই না। বুঝলাম না ঠিক"

"ও ভদ্রলোক যে কে তা তো আমি জানতাম না। এখনও ঠিক জানিনা। আমার বিশ্বাস হয় না যে সান্ত্বনা দেবী—না, এখন মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় আসলে সান্ত্বনা দেবীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে—"

"বুঝেছি। মেয়েটির জাদু করবার ক্ষমতা আছে দেখছি। বেশ, তাকে রক্ষা করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য তা হলেও তো এই সুযোগ। কারণ, আমি তাকেও ছেড়ে কথা কইব না। তুমি যদি রক্ষা করতে চাও তাকে চল আমার সঙ্গে"

সদারঙ্গবিহারীলাল গলার সাঁকিটায় হাত বুলোতে লাগলেন।

"বেশ"—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাজি হয়ে গেলেন অবশেষে।

"তুমি কোথায় থাক এখানে"

"বেশী দূর নয়, পাঁচ মাইল হবে এখান থেকে"

"সেখানেই চল যাই আগে। সেখান থেকে একটা মোটর ভাড়া করতে হবে। তারপর যাওয়া যাবে মুচুকুণ্ডু"

সদারঙ্গ ঘাড় নাড়লেন। তিনি যেখানে থাকেন সেখানকার হাল-চাল বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে তাঁর।

"কিন্তু অত দূরই বা আপনি যাবেন কি করে'। আমি তো হাঁটতে পারব না। একবার চেষ্টা করেছিলাম। ভয়ানক ক্লান্তিজনক। আপনি যাবেন কি করে। হাঁটতে পারবেন কি ?"

"দরকার হলে আমি দৌড়তাম"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"কিন্তু এখন দৌড়েও যে কূল পাব না। দৌড়লেও দেরি হয়ে যাবে—"

ঘাড়টা বেঁকিয়ে রাস্তার দিকে চাইলেন তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে'—যেন শত্রুকে নিরীক্ষণ করছেন।

"তোমার পিছনে সেটা নেই ?"

"আমার পিছনে ? মানে ?"

ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখবার চেষ্টা করলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"তোমার বাইকের পিছনে"

"ও, কেরিয়ার। হ্যাঁ, তা আছে একটা চলনসইগোছ। আপনি তার উপর চেপে যাবেন বলছেন ? গড ! তা কি সম্ভব ? তা ছাড়া আমার বাইক মোটে আড়াই হর্স পাওয়ার"

"তোমার বাড়ি পর্য্যন্ত যাব"

"কিন্তু সেটাও কি—"

"জিনিস-পত্র এখানেই থাক। রাত্রে এখানেই ফিরে আসব। চল। সময় নষ্ট করলে চলবে না"

"কিন্তু দিদি, শুনুন একটা কথা। সত্যি বলছি—"

"প্রতিবাদ কোরো না, যা ঠিক করে' ফেলেছি তা করবই, কথা বললে সময় নষ্ট হ'বে খালি। চল। বাইকে চড়। দাঁড়াও তোমার কোটটা খুলে দাও, পেতে বসব তার উপর। দেরি করছ কেন, দাও"

সদারঙ্গ তাড়াতাড়ি কোটটা খুলে দিলেন।

বাইরে বাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।

"আমার কেরিয়ারটা তেমন বড়ও নয় তো, মানে—"

"চড়"—আদেশ করলেন স্বয়ম্প্রভা।

২৫

শাস্ত্রকারগণ ঠিকই ধরেছিলেন—স্ত্রীলোকেরাই শক্তি। ওঁরাই শক্তির ধারক বাহক—সব। পুরুষরা মাঝে মাঝে যে শক্তির পরিচয় দেন তা স্ত্রীলোকদের গর্ভোদ্ভূত বলেই সম্ভবত। তা না হলে পারতেন কিনা সন্দেহ। হলদিঘাটের যুদ্ধই বলুন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসিই বলুন, আসল উৎস নারী।

স্বয়ম্প্রভা মোটর বাইকের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে চলেছিলেন। এত কষ্ট স্বীকার করে' তিনি যে সুশোভন এবং তার দলকে হাতে-নাতে ধরতে যাচ্ছিলেন তার কারণ এ নয় যে তারা ওঁকে একটু আগে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। গোড়া থেকেই তিনি অনুমান করেছিলেন—অনুভব করেছিলেন—যে সুশোভনকে বিয়ে করে' অনীতা একটা গুণ্ডার ষড়যন্ত্রে পড়েছে। সেই গুণ্ডার দলকে তাড়া করে' ছত্রভঙ্গ করে' ছিন্নভিন্ন করে' উৎখাত করে' তবে তিনি থামবেন। তাদের দেখিয়ে দেবেন যে মেয়েমানুষ বলে' তিনি দুর্ব্বল নন এবং এ মুলুক মগের মুলুক নয়। সদারঙ্গবিহারীলালের মোটর বাইক মফঃস্বলের বন্ধুর রাস্তায় লাফাতে লাফাতে ছুটছিল। বাইকের ঝাঁকানিতে স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ-চোয়াল-সংলগ্ন মাংস-মেদ কাঁপছিল থল থল করে'। সমস্ত চোখে মুখে অদ্ভুত রকম ভয়ানক একটা দুর্দ্ধর্ষ শক্তির ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছিল। সদারঙ্গবিহারীর কোমরটা জাপটে ধরেছিলেন তিনি। এতে যে অসুবিধা বা অশোভনতার সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপও ছিল না তাঁর। যে কোনও মুহূর্ত্তে যে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে সে আশঙ্কাও ছিল বলে' মনে হচ্ছিল না। একাগ্রচিত্তে একটি কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন—কেমন করে' কত শীঘ্র তিনি মুচুকুন্দ কুণ্ডলে-শ্বরীতে পৌঁছবেন। যদি কেউ এরোপ্লেনে করে' উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে প্যারাশুটে করে' তাঁকে সেখানে নাবিয়ে দিত, তাতেও তিনি রাজি হয়ে যেতেন সানন্দে।

...একটু আগে যে জন্তে ওরা হাত ফসকে পালিয়েছে তাতে এক হিসেবে লাভই হয়েছে বলতে হবে। খড়াং। ব্রজলাল লোকটাকে চেনা গেল। ওদেরই দলের লোক নিশ্চয়। সান্ত্বনার স্বামী সেজে এসেছে, কিম্বা...খড়াং...খড়াং...। কিম্বা হয়তো সান্ত্বনাকে নিয়েই হাঙ্গা করে সবাই, আজকালকার মেয়েতো কিছুই বলা যায় না—

নীতাকেও ওই রকম করতে চায়—ভোঁক্—ভোঁক...উঃ ভাবা যায় ...বড়াং...ভোঁ-ও-ও-ক্...মানুষের এত অধঃপতন হতে পারে!

হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা উল্টে গেলেন বোঁ করে' এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার ধারে মাঠের মাঝখানে বসে' পড়লেন একটা ঝোপের ভিতর। কাঁটার ঝোপ। সামনে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা গরুর গাড়ি এসে পড়ায় এবং ধাক্কা বাঁচাবার চেষ্টা করায় এই কাণ্ড। গরুর গাড়িতে গোঁসাইজি, কদকা, আর নিতাই বৈরাগী।

সদারঙ্গবিহারীলাল পড়ে' যান নি। তিনি গাড়ি থেকে নেবে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ঝোপটার কাছে।

ইস্! লাগেনি তো? ওই গরুর গাড়িটা, বুঝলেন। আনাড়ি গাড়োয়ান, ষাঁড়ও আনকোরা সম্ভবত। লেগেছে?"

"না"

"যাক। কিন্তু ভারী দুঃখিত আমি। জোরে ব্রেক কসা ছাড়া উপায় ছিল না। দুরন্ত ষাঁড়"

"আমাকে তোল"

"কারও লেগেছে না কি গো"—গাড়ির গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে রাস্তা থেকে।

"আমার হাতটা ধরে' নিজেকে একটু টেনে তোলবার চেষ্টা করুন। শক্ত বুঝতে পারছি, ঝোপে আটকা পড়ে গেলে নিজেকে টেনে বার করা খুবই কঠিন। আমার অভিজ্ঞতা আছে। লাগেটাগে নি তো"

"না"—দাঁতে দাঁত চেপে স্বয়ম্প্রভা বললেন এবং নিজেকে টেনে তোলবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগলেন।

"ছি, ছি—হ্যাঁ ওই রকম—আবার করুন—হেঁইও—"

"জখম হল না কি কেউ গো"—গাড়োয়ান প্রশ্ন করলে আবার।

"না চোট টোট লাগেনি কারও। এইবার—হেঁইও হেঁইও—"

"না পারছি না। চুপ কর, হেঁইও হেঁইও কোরো না"

"ও আচ্ছা। সত্যি ভারী ইয়ে হ'য়ে গেল তো। ছি, ছি কি মুশকিলে পড়ে গেলেন আপনি। একটু গুঁড়ি মেরে—হামাগুড়ি দেওয়া গোছ—পারবেন?"

"না"

"কি করা যায় তাহলে। কোমরে টোমরে লাগে নি তো? ব্যথা করছে কোথাও? অনেক সময় প্রথমটা 'ফীল' করা যায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন, আমার দুটো কাঁধের উপর ভর দিয়ে উঠতে পারবেন কি না দেখুন তো"

"না। দিক কোরো না আমাকে"

"ও আচ্ছা। আচমকা পড়ে গেলে অনেক সময় কিছু জোর পাওয়া যায় না—মানে নার্ভাস গোছের হয়ে যেতে হয়—তা হয় নি তো"

"না"

"তবে? কিছু একটা হয়েইছে নিশ্চয়। চেষ্টা করুন, পারবেন ঠিক উঠতে। উঠতে হবেই, কারণ একটা ঝোপের ভিতর আর কতক্ষণ বসে' থাকবেন। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দিন না, আমি টেনে তুলে দি আপনাকে"

"থাম। কোথাও আটকে গেছি মনে হচ্ছে"

"আটকে? ও, থামুন, বুঝেছি, 'জাম' হয়ে গেছে। এক মিনিট। টানাটানি করলে শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে—দাঁড়ান। যন্ত্রটন্ত্র জাম হয়ে গেলে তার তলার দিকটা বেশ করে' লুব্রিকেট করে' দিলে খুলে যায় অনেক সময়—কিন্তু আপনাকে—"

"তুমি চুপ কর। ওদিকে সরে যাও তুমি। আমি নিজেই ঠিক করে' নিচ্ছি। দূরে সরে' যাও। এদিকে দেখো না"

"ও, আচ্ছা, আচ্ছা। মহাবিপদে পড়া গেল তো। ছি ছি"—মুখ ঘুরিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল রাস্তার দিকে চাইলেন।

"আরে গোঁসাইজি যে। নমস্কার, নমস্কার। কি কাণ্ড! আপনি এখানে"

"ওদের এখান থেকে সরে' যেতে বল"—ঝোপের ভিতর থেকে নিদারুণ-কসরৎ-রতা স্বয়ম্প্রভার তর্জ্জন শোনা গেল।

"আরে, বৈরাগী মশাইও যে। নমস্কার। আপনি এ অঞ্চলে হঠাৎ যে আজ?"

"ওই লোকগুলোকে সরে' যেতে বলবে কি না"

"মাঠাকরুণের লেগেছে না কি"

গাড়োয়ানটিও গাড়ি থেকে নেবে এসে দাঁড়াল।

"না লাগেনি। আটকে গেছেন। কিন্তু উনি চান না যে—"

"আটকে গেছেন?"

বলিষ্ঠ ঘোঁতন গাড়োয়ান ঈষৎ ঝুঁকে এমন ভাবে এগিয়ে এল যেন তাকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। অনেক আটকানো গাড়ির চাকা তুলেছে সে জীবনে।

"আটকে গেছেন? তাতে কি হয়েছে! পাঁজাকোলা করে' টেনে তুলে দিলেই মিটে যায়"

"কিন্তু উনি চান না যে আমরা কোন রকম সাহায্য করি—চটে যাচ্ছেন—ঠিক করে' নেবেন এখন নিজেই বোধহয়—হয় তো একটু সময় লাগবে—কিন্তু—"

"চলে যাও এখান থেকে সব"—আবার চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। নিজেকে মুক্ত করবার প্রয়াসে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছিল তাঁর।

ঘোঁতন নীরবে দন্তবিকশিত করে' হাসল একবার। তারপর কোমর বেঁধে মালকোচা মারল। তারপর অগ্রসর হল ধীরে ধীরে।

"ছটফট করবেন না মাঠাকরুণ। সব ঠিক করে দিচ্ছি। বৈরিগি মশাই একটু সরে' দাঁড়ান দিকি"

ঘোঁতনের দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না কারও। সসম্ভ্রমে সকলেই সরে' দাঁড়ালেন। গোঁসাইজির মুখে নানা ভাবের সংমিশ্রণে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছিল একটা।

"সদারঙ্গ! এই—এই গাড়োয়ান—খবরদার—খবরদার, আমার গায়ে হাত দিও না বলছি—এ কি আস্পর্দ্ধা—"

ঈষৎ ঝুঁকে ঘোঁতন খপ করে' স্বয়ম্প্রভার কোমরটা জাপটে ধরেছিল। জবাই করবার পূর্ব্বে হাঁস বা মুরগী ঘাতকের মুঠোর মধ্যে যেমন ছটফট করে স্বয়ম্প্রভাও অনেকটা তেমনি করতে লাগলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সদারঙ্গবিহারী ঈষৎ-ব্যাদত্ত আননে ঘোরা ফেরা করছিলেন কেবল চঞ্চল হয়ে।

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও"—তারস্বরে আদেশ করতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"ঘোঁতন ছেড়ে দাও বুঝলে—যদিও তুমি ওঁর ভালোর জন্যেই করছ—তবু বুঝলে—উনি যখন সেটা চাইছেন না তখন—বাঃ প্রায় তুলে ফেলেছিলে যে! বাঃ—আর একবার"

সদারঙ্গ যেতে বল ওকে। তুমিও ওকে ওসকাচ্ছ? ছেড়ে দাও, ছাড় বলছি—ছাড়"

"না না করুক। আপনি বুঝছেন না দিদি। ও ঠিক টেনে তুলে ফেলবে। ঘোঁতন আর একবার"

"আমি মেয়েমানুষ, আমার গায়ে একটা পরপুরুষ হাত দিচ্ছে আর তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ সেটা—"

"না, না, ব্যাপারটা ওভাবে নেবেন না। আপনার ভালর জন্যেই ও করছে—ঝোপের মধ্যে বরাবর বসে' থাকবেন নাকি! ঘোঁতন—হ্যাঁ—ঠিক—টান। হেঁইও—ও না! হয়েছে—হয়েছে—বাঃ—"

"মারো জোয়ান হেঁইও"—ঘোঁতন বলে' উঠল।

"হেঁইও"—বৈরাগী মশাইও বললেন।

"হেঁইও"—ফদকাও বললে।

"হেঁইও হেঁইও হেঁইও"—আত্মবিস্মৃত সদারঙ্গবিহারীলাল নৃত্য করতে লাগলেন দু'হাত তুলে।

চর্‌র্‌র্‌র্—! কাপড় ছেঁড়ার একটা শব্দ হল এবং পরমুহূর্ত্তেই স্বয়ম্প্রভা ঝোপমুক্ত হলেন। ঘোঁতন তাঁকে পাঁজাকোলা করে' তুলে এনে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে মাথার ঘাম মুছলে।

"অসভ্য বখাটে গুণ্ডা জানোয়ার"—ক্রোধে স্বয়ম্প্রভার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—"শাড়িটা ছিঁড়ে ফ্যাতাফুঁতি করে' দিলে একেবারে—"

"শাড়ি যে আটকে গিয়েছিল মাঠাকুরুণ। তলার দিকে হাত চালিয়েও বাঁচানো গেল না, ছিঁড়ে গেল কি করব, ওর কোন চারা ছিল না। শাড়ি বাঁচাবার জন্যেই তলার দিকে হাত চালিয়েছিলাম, কিন্তু হল না"

"সরে' যাও এখান থেকে। চলে' যাও সবাই"

স্বয়ম্প্রভার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন, "গাড়োল কোথাকার"

"আমি কি করব বলুন"

"তুমি ওসকাচ্ছিলে কেন? আবার বলা হচ্ছে কি করব"

"ওসকানো কথাটা ঠিক হচ্ছে না, না—না, ওসকানো—বাঃ। এক্ষেত্রে ওছাড়া উপায়ই বা কি ছিল বলুন। ঘোঁতন না এসে পড়লে সমস্ত দিন ওই ঝোপে বসে থাকতে হ'ত—হয়ত সমস্ত রাতও। মারাত্মক আটকে পড়েছিলেন যে"

"ওদের চলে যেতে বল। আমার শাড়ি একেবারে ছিঁড়ে গেছে"

"ওদের ওপর চটবেন না। আমার পরিচিত লোক সব। আর প্রত্যেকটি ভালো লোক। উঁচু দরের। বৈরাগীমশাই ভক্ত লোক একজন। ইনি হচ্ছেন গোঁসাইজি, এঁরই হরিমটর হোটেল, সেইখানেই আজ রাত্রে আপনাকে থাকতে হবে হয়তো"

গোঁসাইজি ভ্রূকুঞ্চিত করে' দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "ক্ষমা করবেন, আপাতত আমি অতিথি সৎকার করতে অক্ষম"

"কিন্তু একটা ঘর তো খালি আছে দেখে এলাম"

"সে ঘরে আমার বন্ধু বৈরাগী মশাই থাকবেন আজ রাত্রে। আমার গুরুভগ্নী অসুস্থা। ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি রাত্রে সেবার দরকার হতে পারে। সে বিষয়ে সিদ্ধহস্ত উনি"

"ও"

সদারঙ্গবিহারীলাল একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

"শুনছেন দিদি, এ আবার এক প্যাঁচ হল। বেশ, উঁচু দরের প্যাঁচ—"

স্বয়ম্প্রভা সরে' গিয়ে আর একটি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে স্বীয় শাড়ি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। এই ছেঁড়া শাড়ি পরে' তাঁকে যে হোটেলে ফিরতে হবে না এ সংবাদে তিনি আশ্বস্ত হলেন কিঞ্চিৎ। এ শাড়ি পরে' ভদ্রসমাজে বেরোন অসম্ভব।

বৈরাগী মশায়ের মনে হল হোটেলের ঘরটি এঁরা যে পেলেন না সে জন্যে পরোক্ষভাবে তিনিই সম্ভবত দায়ী। সুতরাং একটু জবাবদিহি করা প্রয়োজন। এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত কচলে বললেন, "দেখুন গোঁসাইজির গুরুভগ্নীটি অসুস্থ হয়ে পড়া গতিকেই আমাকে আসতে হল। গোঁসাইজির কথা ঠেলা যায় না, তাছাড়া এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্যও তো বটে—অ্যাঁ, কি বলেন। খালি ঘরও তো মাত্র একটি—তা নইলে না হয়—"

"তা' তো বুঝলাম। কিন্তু আমি কি জঘন্য প্যাঁচে পড়লাম সেটা ভাবুন। গোঁসাইজি, কোন রকমেই কি হয় না?"

"না"—গোঁসাইজি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"প্রকাশ্য দিবালোকে যে স্ত্রীলোক একজন পুরুষের কোমর ধরে' তার বাইসিকলের পিছনে চড়ে' আসতে পারেন তাঁকে কিছুতেই আমি স্থান দিতে পারি না, ঘর খালি থাকলেও পারি না। কেবল পয়সা লোটবার জন্যেই যে আমি হোটেল খুলি নি একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে। আমার ওটা হোটেল নয় হিন্দু-পান্থনিবাস"

ঝোপের আড়াল থেকে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "ওখান থেকে চলে এস তুমি"...গোঁসাইজির দল দিয়ে শকটে আরোহণ করলেন। (ক্রমশঃ)

সিংহলের স্বাধীনতা উৎসব

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলন গভীর আকার ধারণ করে। ইন্দো চায়না, ভিয়েটনাম, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হইয়া উঠে। তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্বেই যখন ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে, তখন কূট রাজনীতিবিদ ইংরাজ এই আন্দোলনকে হীনবল করিবার বাসনায় ব্রহ্মদেশ ও সিংহলকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ইংরাজেরই সৃষ্টি। এই সমস্যা সৃষ্ট দ্বারা ইংরাজ ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও ভারত এই দুই ইউনিয়নে বিভাগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশ কঠোর দৃঢ়তা দ্বারা বৃটিশ কমনওয়েলথের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া গত ৬ই জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বেই গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের ভাগ্যাকাশকে রক্তিম রাগে রঞ্জিত করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী পরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-সূর্য্য উদিত হইয়াছে। এশিয়ার এই নবজাগরণে ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপও মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে রক্তহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছে। ১৩৩ বৎসর পরাধীনতার পর গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সিংহলের অঙ্গ হইতে কঠিন ও কঠোর লৌহ শৃঙ্খল খসিয়া পড়িয়াছে। আজ সিংহলের বাতাসে মুক্তির হিল্লোল; আকাশে নানা বর্ণ ও আলোকের ছটা। সিংহলবাসীর হৃদয়ে আজ অসীম উদ্দীপনা, প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্য। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে তাহার আত্মার যে অপমৃত্যু হইয়াছিল—তাহারই মুক্তির দিন গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। এই দিনটি সিংহলের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

সিংহলের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্ক বহু দিনের। সে আজ দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বের কথা—যে দিন বাংলার উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত রাজপুত্র বিজয়সিংহ বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সাত শত অনুচর লইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলেন। জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়া চলিল। পর্ব্বতপ্রমাণ উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া, মাসের পর মাস অকূল পাথারে ভাসিতে ভাসিতে, আট শত মাইল দীর্ঘ পর্ব্বতসঙ্কুল উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া তাহারা এক দ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। বহুকাল সমুদ্রবাসে অনুচরগণের শরীর অবসন্ন, অন্তর চিন্তাকুল, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দেহ অভিভূত। সমুদ্রতীরে এক সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—দ্বীপটির নাম লঙ্কা। তারপর বিজয়সিংহ দেখিলেন—এক পরমা সুন্দরী যক্ষিণী—তাহার নাম কুবেনী। তাহাদের অবস্থা শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া যক্ষিণী রাজপুত্রকে বহু পরিমাণে সুখাদ্য আনিয়া দিল। বিজয় সিংহ ও তাঁহার অনুচরগণ আহার ও পানে হৃষ্ট হইলেন। পরদিন রাজপুত্র মালা বদল করিয়া যক্ষিণীকে বিবাহ করিলেন।

তখন সেই দ্বীপের রাজা ছিলেন কাল সেন। তাঁহার বিবাহ উৎসব আসন্ন। বিবাহের রাত্রে খুব ধুমধাম নানা উৎসব আয়োজন। সকলেই ব্যস্ত। সেই রাত্রে এক হাতে মশাল ও আর এক হাতে তরবারি লইয়া সাত শত অনুচর সমেত বিজয়সিংহ রাজ-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি তখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, প্রহরীরা ঝিমাইতেছে। সকলে আমোদ-প্রমোদ ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাজা কালসেন বিবাহ শেষে নব বধুর হস্ত ধরিয়া বহু পরিচারিকাসহ অন্দরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে বিজয়সিংহ "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া বীরবিক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়সিংহ রাজার মাথা কাটিয়া ফেলিয়া রাজমুকুটটি নিজের মাথায় পরিলেন। চারিদিকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য। সকলের ঘুম ছুটিয়া গেল। রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল। বিজয়সিংহের সাত শত অনুচর রাজ-বাড়ী অধিকার করিয়া বসিল। পরদিন প্রভাতে সকলে জানিল রাজপুত্র বিজয়সিংহ লঙ্কার রাজা। লঙ্কা দ্বীপের নূতন নাম হইল সিংহল।

অনেকে বলেন, বর্ত্তমান সিংহলীগণ বঙ্গের রাজকুমার বিজয় ও তাঁহার সহচরগণের বংশধর। আর এই জন্যই সিংহলীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের সহিত আকৃতিগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য এত প্রবল। প্রাচীন সিংহলীয় অর্দ্ধেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার শব্দ। সিংহলবাসীগণ বঙ্গদেশবাসীদেরই নিকট আত্মীয়।

ধর্ম্মের দিক হইতে ভারতের সহিত সিংহলের সম্পর্কও গভীর। মহারাজ অশোক সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাই আজ সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—

> ওই শৈশব তার রাক্ষস, আর যক্ষের বশ, হায়
> আর যৌবন তার 'সিংহের' বশ,—সিংহল নাম যার
> এই বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ প্রায়—প্রান্তর তার ছায়,
> আজ বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায়।

সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উচ্চে কৃত্রিম হ্রদের তীরে অবস্থিত কান্দী নগরী পূর্ব্বে সিংহলের রাজধানী ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও এই কান্দী নগরীই পুনরায় সিংহলের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দিরের নাম দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহার। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত আছে। এই মন্দিরে বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে। এখানকার পূর্ব্বতন রাজগণের সিংহাসন আরোহণের সময় যে সিংহাসনটি ব্যবহৃত হইত সেই সিংহাসনটি এতদিন লণ্ডনে ছিল। ১৯৩৪ সালে ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার যখন সিংহল ভ্রমণে আসেন, তখন এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রত্যর্পণ করেন।

কান্দী হইতে ৮০ মাইল দূরে অনুরাধাপুর নামে একটি প্রাচীন নগরী আছে। গৌতমবুদ্ধ বুদ্ধগয়ার যে বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যানাসনে বসিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এই অনুরাধাপুরে তাহারই একটি শাখা আছে। এই নগরী খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিংহলের রাজধানী ছিল। এই বোধিবৃক্ষের একটি শাখা আনিয়া পুনরায় সারনাথে রোপিত হইয়াছে।

সিংহলের কলম্বো নগরী ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ অধিকার করে। কৃষ্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে তাহারা এই নগরের নাম রাখে কলম্বো। পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে ওলন্দাজগণ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে এই নগরী কাড়িয়া লয়। তাহাদের নিকট হইতে পুনরায় ইংরাজগণ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর অধিকার করে। এখানকার উৎপন্ন চা, রবার, নারিকেল, দারুচিনি, কোকো প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ইংরাজের প্রবল লোভ।

সিংহলের তদানীন্তন রাজধানী ইংরাজ অধিকার করিয়াছিল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। তারপর দীর্ঘ ১৩৩ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংরাজ সিংহলবাসীগণের কণ্ঠে পরাধীনতার নাগপাশ পরাইয়া তাহার দেশকে পিষ্ট ও নিষ্পেষিত করিয়াছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাহাদের কণ্ঠ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে পরাধীনতার সেই কঠোর নাগপাশ। সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধ হইতে নামিয়া পড়িয়া দৈত্য তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। আজ সিংহলবাসী মুক্ত—স্বাধীন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, সকাল সাড়ে সাতটা। জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন—প্রভাতে এই শুভক্ষণে স্বাধীনতা উৎসব আরম্ভ হইবার সময়। সমগ্র সিংহলবাসী আজ আনন্দে আত্মহারা। চারিদিকে উৎসব ও আনন্দ, মন্দিরে মন্দিরে পূজা ও আরতি, সন্ধ্যায় নগরী অসংখ্য দীপালোকে আলোকিত। চারিদিক আলোকমালায় নববেশ ধারণ করিয়াছে। গগনে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে আলোক মঞ্জরী।

প্রভাতে উৎসবের আরম্ভে এখানকার গবর্ণর স্যর হেনরী মঙ্ক-মেসন মুর স্বাধীন সিংহলের গবর্ণর-জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। রাজপথে লোহিত ভেলভেটের উপর স্বর্ণবর্ণের কারুকার্য্যময় বস্ত্রে সুশোভিত শতাধিক হস্তী শোভাযাত্রা সহকারে প্রাচীন মন্দিরে চলিয়াছে। তাহাদের অঙ্গে আবদ্ধ শত শত রৌপ্য ঘণ্টা হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। তাহাদের সম্মুখে চলিয়াছে এক বিরাটকায় সুসজ্জিত দ্বিরদ হস্তী। আর পিছনে চলিয়াছে স্বাধীনতা দিবসে ধৃত একটি হস্তীশিশু। এই শোভাযাত্রার পিছনে চলিয়াছে চারিশত বীভৎসকায় মুখাবরণধারী নর্ত্তক। শত শত বাদ্যযন্ত্র সহকারে তাহারা নৃত্যে রত। শোভাযাত্রা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে কান্দীর হ্রদের মধ্যস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে নানাবিধ বাজি ও আলোকসজ্জা আরম্ভ হইল। দালাদা মালিগাওয়া মন্দিরে ১৩৩ বৎসর পরে স্বাধীন সিংহলের সিংহপতাকা বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়ক, ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার ও তাঁহার পত্নী ও গবর্ণর জেনারেল ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন করেন।

গবর্ণর ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৭ সালের আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া সিংহলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্ণর যে প্রাসাদে বাস করেন তাহার নাম 'কুইনস হাউস।' সেইদিন হইতে তাঁহার বার্ষিক বেতন হইল ৮০০০ পাউণ্ড। তিনি এক বৎসর পরে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই স্বাধীনতা উৎসব দুই সপ্তাহ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টার ও তাঁহার পত্নী বিলাত হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ডমিনিয়ম পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করেন। কাউন্সিলের প্রাচীন গৃহে এই উৎসব সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া টরিংটন স্কয়ারে রিজওয়েগসফ লিঙ্কের উপর এক বিশাল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সিংহলের প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত এই প্রাসাদে ৬০০০ মন্ত্রী, সরকারী কর্ম্মচারী ও নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাসাদের বাহিরে ১২০০০ ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল ১৫০০ ছাত্র। এই প্রাসাদের প্রধান দ্বারের সম্মুখে কান্দির শেষ রাজা শ্রীবিক্রম রাজ সিংহের সিংহ পতাকা উড্ডীন হয়। লাল কাপড়ের উপর হরিদ্রা বর্ণের সিংহ একটি পতাকা ধরিয়া আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্দীবাসীগণের সহিত যুদ্ধের পর ইংরাজ রাজ-সিংহাসন ও পতাকা ইংলণ্ডে লইয়া যায়। উভয়ই সিংহলকে প্রত্যর্পিত হইয়াছে।

ডিউক অফ গ্লাউসেষ্টর রাজার বাণী পাঠ করিয়া পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করেন। কুইনস হাউস হইতে তিনি পার্লামেণ্টে শোভাযাত্রা সহকারে গমন করেন। তথা হইতে ডিউক ও তাঁহার পত্নী কলম্বো হইতে ৭২ মাইল দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজধানী কান্দীতে ৫ মাইল দীর্ঘ মোটরের শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হন। সেখানে ডিউক সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই দিন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অফ ল" উপাধিতে ভূষিত করেন। এখানকার দীর্ঘতম নদী মহাকালী গঙ্গার উপর অতি রমণীয় পরিবেশের মধ্যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইবে।

১২ই ফেব্রুয়ারী ডিউক কান্দী পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা পরাক্রম বাহু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পোলোন্নারুয়া এবং নগরীর ধ্বংসাবশেষ এবং অনুরাধাপুর পরিদর্শনে গমন করেন। প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অনুরাধাপুর লঙ্কা দ্বীপের রাজধানী ছিল। ডিউক পুনরায় কলম্বোয় ফিরিয়া আসিয়া লঙ্কার দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস দুইঘণ্টার নাট্যাভিনয় দর্শন করেন। তাঁহারা ১৭ই ফেব্রুয়ারী এরোপ্লেনে সিংহল ত্যাগ করেন।

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী ডন ষ্টিফেন সেনানায়েক ১৮ বৎসর যাবৎ মিরিগামা হইতে পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি একদিন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি ডন ব্যারণ জায়তিলকের

স্থানে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন সেই সময় বহু অর্থব্যয়ে সিংহলের জঙ্গলাকীর্ণ বহু স্থান চাষের উপযোগী করেন। কয়েকটি স্থানে খনন তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। তিনি মহাবীর পরাক্রমবাহুর প্রাচীন ও জঙ্গলাকীর্ণ পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করেন। ম্যালেরিয়াপূর্ণ অনুর্ব্বরস্থানে তিনি বহুব্যক্তির বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত, ব্রহ্মদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে সিংহলে প্রধানতঃ খাদ্য আমদানী হয়। যাহাতে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আনয়ন করিতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

গত ২৫ বৎসর হইতে মিঃ সেনানায়ক ও তাঁহার দুই ভ্রাতা সিংহলের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। দেশে স্বাধীনতা আজ আসিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় আজ জীবিত নাই। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিনটি মিঃ সেনানায়কের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। এই দিবস তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধ সেনানায়ক পরাধীন, পিষ্ঠ ও নিপীড়িত সিংহলবাসীগণকে ইংরাজের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন—তাহাদের স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন। ১৯১৫ সালে যখন সিংহলের গবর্ণর স্যর রিচার্ড চেমার্স সিংহলবাসী ও মুসলমানগণের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া তাহাই দমনের নামে দেশে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাহাতে অংশ গ্রহণের জন্য মিঃ সেনানায়ক অল্পের জন্য ফাঁসির হাত হইতে রক্ষা পান।

মিঃ সেনানায়কের মন্ত্রী সভার সদস্য স্যর অলিভার গুণতিলক স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার লইয়াছেন; মিঃ ভাণ্ডার নায়েক স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ ও কর্ণেল কোটেলাওয়েলা যান বাহন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। আর বাণিজ্য বিভাগের ভার লইয়াছেন মিঃ সি সুন্দরলিঙ্গম্। তিনি পূর্ব্বে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সিংহলী তামিল বংশজাত।

ইংরাজের শতাধিক বর্ষ শোষণের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের ন্যায় সিংহলের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত হীন। অর্থ নৈতিক সমস্যাই আজ সিংহলের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে, সিংহলবাসীর জীবনের মান উন্নত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবে। সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাই আজ সিংহলবাসী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আজ উন্নততর উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান, দেশে বহুল পরিমাণে বাণিজ্য বিস্তারের উপর সিংহলবাসীর অন্ন সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। এই আশায় আজ সিংহলের অগণিত দরিদ্র নরনারী মিঃ সেনানায়কের দিকে তাকাইয়া আছে।

মনীষী ডালটন

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

রাসায়নিক ছাত্রদের নিকট ডালটনের নাম অপরিচিত নয়। ইনি রসায়নশাস্ত্রের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত সংজ্ঞাটীর নাম আণবিক সূত্র (Atomic theory); ডালটনের সূত্রটীর উপর দাঁড়াইয়াই নব্য-রসায়ন আজ এতটা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, যদিও বর্ত্তমানে ইহার উপর গুরুত্বপূর্ণ কারুকার্য্য সাধিত হইয়াছে।

ডালটন সাহেব ইংলণ্ডের এক কোয়েকার বংশে ১৭৬৬ খৃঃ জন্মলাভ করেন। তাহার পিতা জোসেব ডালটন একজন তাঁতি ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকাতে ছেলেরা অতি অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হন। ডালটন কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়া ১১ বৎসর বয়সে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালায় থাকিতেই শিক্ষক মহাশয় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। অঙ্ক শাস্ত্র ও দর্শনের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক প্রীতি দেখিয়া ডালটনের একজন আত্মীয় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ইনি ছিলেন একজন খনিজ-তত্ত্ববিদ্; এই আত্মীয়ের চেষ্টায় ইঁহার আরও কিছু বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা হইয়াছিল। জন গাফ্ নামক অপর একজনভদ্রলোকও এ বিষয়ে তাঁহাকেযথেষ্ট সাহায্য করেন। গাফের কতকগুলি খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পত্রিকা ছিল—ঐগুলি পাঠ করিয়া ডালটন বায়ু ও অন্যান্য গ্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ করেন। শুনা যায় ঐ সময় বায়ু ও বায়বীয় অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন জানিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং এই গবেষণার পরিপক্ক ফল ঐ আণবিক সূত্র। ডালটন ঐ সময় নিজ হস্তে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়াছিলেন। ঐগুলি আজকালকার যন্ত্রপাতির মত ততটা নির্ভুল না হইলেও কাজ চলিয়া যাইত। এমন কি তাঁহার প্রস্তুত যন্ত্রাদি সে সময় বিক্রয় হইত। তাঁহার বন্ধু রবীনসন, ইঁহার নিকট হইতে দুইটী চাপমান যন্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন।

সে যুগের অসুবিধার কথা বলার নয়, তাপমান যন্ত্রের পারদ গরম করিতে মোমবাতি ছাড়া অপর কোন ব্যবস্থা ছিল না।

২০।২১ বৎসরে ডালটন বক্তৃতা করিয়া কিছু কিছু রোজগার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কোন সুবিধা হয় না। কারণ তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না এবং তাঁহার পরীক্ষাগুলি প্রায়ই ভুল হইত। এ সময় তিনি কিছুদিন ডাক্তারী পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ এ চেষ্টা হইতে তাঁহাকে বিরত করেন। ১৭৯৩ খৃঃ ডালটন মাঞ্চেষ্টারে গিয়া একটি শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা পড়াইতেন। স্থানটি তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছিল। বাসস্থানের নিকট একটি বিরাট পুস্তকালয় থাকাতে তাঁহার পড়াশুনারও খুব সুবিধা হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা ডলটনের ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়ায় সবদিক দিয়াই তাঁহার দিনগুলি ভাল কাটিতেছিল। লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করিতে পয়সা লাগিত না, বন্ধুগণ অবসরমত নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ ত লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি অসুবিধা ছিল। স্কুল ও গৃহ-শিক্ষকের কাজ অত্যন্ত বেশী করিতে হইত বলিয়া তিনি নিজে গবেষণা বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সময় পাইতেন না। এজন্য কিছুদিন পর তিনি স্কুলের কাজ ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে তিনি আর কোনদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন নাই।

ডালটনের একটি অদ্ভুত গুণ ছিল। নিজ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপরের সাহায্য নেওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। আত্মবিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, বায়ু ও অন্যান্য গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনার সময় তিনি কখনও পরমতাপেক্ষী হন্ নাই। তিনি যে একমাত্র নিজ চিন্তাশক্তি দ্বারা আণবিক সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার প্রমাণ লিখিত কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। ১৮০৩-১৮০৯ খৃঃএর মধ্যে তিনি লণ্ডনের রয়েল ইন্সটিটিউশনে কয়েকটা বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতাগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বক্তৃতাতে আণবিক সূত্র গ্রহণ করিবার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সূত্রটা পরিষ্কার প্রকাশিত হয় ১৮০৮ খৃঃ। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি আর একটি বিখ্যাত রাসায়নিক আইন খাড়া করেন।

ডালটন একজন কোয়েকার ছিলেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে পর্য্যন্ত নিজের সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইত। প্যাণ্ট, মোজা, নেকটাই সবটাতেই কোয়েকার বংশের রূপ ফুটিয়া উঠিত। তিনি সুন্দর একটি ছড়ি হাতে বেড়াইতে বাহির হইতেন। কেহ কেহ বলেন ডালটনের আকৃতিতে নিউটনের সাদৃশ্য ছিল। এমন কি তাঁহার মর্ম্মর-মূর্ত্তি দেখিয়া কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত নিউটন বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ইনি সমস্ত জীবন একটি অনাবিল, সহজ, সরল ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বদা উচ্চ-চিন্তায় মগ্ন থাকাতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। এত বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অতি সামান্য আয়ে জীবনাতিবাহিত করিতেন। একজন মহিলা ডালটন সম্বন্ধে সুন্দর লিখিয়াছেন: "ডাক্তারের জীবন এরূপ অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন ছিল যে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গেলে অতি সংক্ষেপেই কাহিনী শেষ করা যায়। রবিবারদিন তিনি একটি অতি পরিষ্কার কোয়েকার পোষাক পরিয়া দুইবার গির্জ্জায় যাইতেন।......তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান ও ভগবত্তার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। আমি দেখিয়াছি রবিবার দিন যদি কেহ ধর্ম্ম-কর্ম্মে অবহেলা করিত তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন এবং এজন্য তিরস্কার করিতেও দ্বিধা করিতেন না। রবিবার ও বৃহস্পতিবারের বৈকাল ছাড়া তিনি অপর দিনগুলি গবেষণাগারেই অতিবাহিত করিতেন। বৃহস্পতিবার বৈকালে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র হইয়া বাহির হইতেন। দলের মধ্যে দেখিতাম তিনি কথা মোটেই বলিতেন না, কেবলমাত্র মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসিতেন এবং অনবরত সিগারেট টানিতেন। ঐ সঙ্গে সময় সময় আরও কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি।"

ডালটন সম্বন্ধে কতকথাই মনে হয়। এরূপ চমৎকার জীবন বেশী দেখা যায় না। পৃথিবীর একজন মনীষী জীবনভোর একটি ক্ষুদ্র নগণ্য ঘরে বাস করিয়াছেন এবং ছোট ছোট ছেলেদের পড়াইয়া জীবনধারণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এত বড় বিজ্ঞানীকেও ইংরেজজাতি অতি কৃপণতার সহিত সম্মান দিয়াছেন। মাত্র ১৮২২ খৃঃ তিনি রয়েল সোসাইটীর সভ্য হন। ইহার অনেক পূর্ব্বে ফরাসীজাতি তাঁহাকে সম্মান দিয়াছিলেন।

১৮২২ খৃঃ ডালটন একবার ফ্রান্সএ যান। থেনাউ, গে-লুজাক, এম্পিয়ার প্রভৃতি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করেন। ডালটন বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকের গবেষণাস্থান পরিদর্শন করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার একজন সঙ্গী লিখিয়াছেন "গাড়ী হইতে নামিলে অতি সমাদরে আমাদের গ্রহণ করা হয়।······খাবার টেবিলে ডালটনের এক পাশে বসিলেন বার্থোলেট, অপর পার্শ্বে ম্যাডাম লাপ্লাস্।···দুইজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। লাপ্লাস্ ও বার্থোলেট্‌কে সঙ্গে নিয়া তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিতেছেন এ দৃশ্য আমি কখনও ভুলিব না।"

ডালটনের চোখে একটি দোষ ছিল। শুনা যায় একবার, তিনি কেনডেল (Kendall) হইতে মায়ের জন্য একটি চমৎকার মোজা কিনিয়া বাড়ী আসেন। মা ইহা দেখিয়া বলিলেন "বাঃ, সুন্দর মোজাটা তুমি আমার জন্য আনিয়াছ, কিন্তু এ রং তুমি কেন পছন্দ করিলে বলিতে পার? আমি যে ইহা পায়ে দিয়া সভায় যাইতে পারি না।" "কেন মা? ইহা যে লাল চেরীফুলের বর্ণ!" প্রকৃতপক্ষে ডালটনের চোখের দোষে তাঁহার বর্ণ ভুল হইয়াছিল। ডালটন ইহা বুঝিতে পারিয়া 'বর্ণ অন্ধতা' সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন।

১৮২৩ খৃঃ রয়াল সোসাইটী ডালটনকে রয়াল পদক প্রদান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। তারপর ১৮৩৩ খৃঃ সরকার তাহাকে ১৫০ পাউণ্ডের ভাতা দেন, ইহাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৮৩৪ খৃঃ ইনি বিখ্যাত শিল্পী চেটনির (chetney) নিকটে বসিয়া তাঁহাকে নিজ মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে অবসর দেন। ঐ মূর্ত্তি আজও ম্যানচেষ্টার টাউন-হলে বিরাজ করিতেছে।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাল আমি সুলতান মামুদগজনীর ভারতবিজয় কাহিনী আনসারীর কাব্যে পড়েছিলাম। সেখানে লেখা ছিল :—

মামুদ ভারতে যে রক্তধারা বইয়েছিলেন তার চিহ্ন আজও দেশ থেকে মুছে যায় নি; ভারতভূমি আজও রক্তরঞ্জিত—ভারতের আকাশ এখনও রক্তিমমেঘে আবৃত। মামুদ গঙ্গাতীরের ও থানেশ্বরের সুন্দর বসতিগুলি ধ্বংস করেছিলেন, কারণ সেগুলি ছিল হিন্দুর তীর্থক্ষেত্র। তিনি দেবমূর্ত্তিগুলি গজনীর প্রবেশ পথের ধূলায় ছড়িয়ে দিলেন, কারণ দেবতা ছিল ভারতের শৌর্য্যের প্রতীক। * * * * * বিস্তৃত ভূমিতে শত্রুর রক্তধারা আরও কত কাল বয়ে যাবে। যে ভয়ার্ত্তা জননী সন্তানের রক্তে রঞ্জিত যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষদর্শিনী—তিনি নতুন সন্তানের মাতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করবেন। আজও গজনীর উষ্ট্র-পদরেখা রক্তরঞ্জিত, গজনীবাসীর তরবারি রক্তরঞ্জিত।

জ্ঞানীগণ চিন্তান্বিত, নারীকুল শোকার্ত্তা—কে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে?—মানুষের অন্তরে রয়েছে ব্যাঘ্রের হিংস্রবৃত্তি।

১০৬৭ খৃঃ জুন—হাজি আহিরা মাসে সম্রাট শাহাজানাবাদে রোগ-শয্যা গ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহর রজনীতে আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হলাম, আমার মনে হয় যেন আমার শিবিকা বাহকের পদধ্বনিতে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হচ্ছিল। নানা চিন্তাস্রোত গঙ্গার মতন বয়ে গেল, মনে হল যেন তৈমুরবংশের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

আমি পিতার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হ'য়ে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলাম—"পিতার প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করব না," কারণ আমার সম্রাট পিতা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলেন, এমন কি আমার ন্যায় হতভাগিনীদের তিনি ভয় করতেন। তিনি জানতেন তাঁর দুঃসাধ্য রোগের সংবাদে সমস্ত দেশব্যাপী কি বিরাট ঝড় উঠবে। তিনি বল্লেন—"আমার করতল চুম্বন করে দেখো আমার হাতে কি আপেলের সুমিষ্ট গন্ধ আছে?" আমার মাতাকে এক সন্ন্যাসী দুটী অকালপক্ক আপেল উপহার দিয়েছিলেন—সেকথা সম্রাট বিস্মৃত হন নি, সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন—"হে, জগদাশ্রয়! যেদিন তোমার হাত থেকে এই আপেলের গন্ধ চলে যাবে, সেদিন জানবে, তোমার জীবনশক্তি নিঃশেষিত হয়ে আসছে।" তারপর পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—"আমার কোন পুত্র আমার চাগতাই মুঘলসাম্রাজ্য ধ্বংস করবে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন—"সে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবর্ণ।" সে ছিল ঔরঙ্গজেব। যদিও তখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর। সেদিন থেকে সম্রাট তাঁর তৃতীয় পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ দৃষ্টি ফেললেন। ঔরঙ্গজেবকে তিনি বলতেন "শ্বেতসর্প।"

রোগের প্রথম দিন হতেই রাজপ্রাসাদ ত্রিশ সহস্র প্রহরীবেষ্টিত করা হয়। সেই প্রহরী ছিল রাজপুত ; কারণ একমাত্র রাজপুতবাহিনী তাঁর বিশ্বাসের পাত্র ছিল। শাহ্ বুলন্দ ইকবাল দারাই একমাত্র রাজপ্রাসাদে সামান্য অনুচর নিয়ে দিনে দুইবার প্রবেশের অনুমতি পেলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে পিতার মৃত্যু আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল। দারা পিতার রোগ সংবাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত বীজের মতন মিথ্যা সংবাদ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল—সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে ! দামামার শব্দে যুদ্ধের অশ্ব যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে—তেমনি করে মানুষ যুদ্ধের জন্য তরবারি শাণিত করতে আরম্ভ করল। আমীর ওমরাহ্ সকলেই প্রস্তুত। তস্কর দস্যু সকলেই নিজের স্বার্থ-সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনদিন তিনরাত্রি আমরা উদ্বেগে বিমূঢ় হয়ে রইলাম। সমস্ত বিপণি রুদ্ধদ্বার, দোকানপাট বন্ধ ; গোপন পথে সংবাদ চলাচল চলে।

আমার ভগ্নী রোশেনারা গোপনে বার্ত্তা-প্রেরণে অভ্যস্ত, ঔরঙ্গজেব গোপনবার্ত্তা গ্রহণে সুকৌশলী। আমার অন্য দুটী ভগ্নীও তাদের ভ্রাতাদের কাছে গোপন সংবাদ প্রেরণ করতেন। যে স্ফুলিঙ্গ অন্তঃপুরে ভস্মাচ্ছাদিত ছিল—তা' অগ্নিশিখা হয়ে ফুটে উঠল ভ্রাতৃবিরোধ রূপে। তাজ বেগমের চার পুত্র যুদ্ধধ্বনি করে উঠল—'ইয়া তক্ত ইয়া তাবু ত'। হয় সিংহাসন, নয় মৃত্যু। কিন্তু যুবরাজ দারা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তার কাছে সকলেই বশ্যতা স্বীকার করল।

প্রথমে অভিযান আরম্ভ করল সুজা বাঙ্গালা থেকে। দারার নিপুণ সৈন্যদলের একাংশ সুজার সঙ্গে যোগ দিল। সে সংবাদ রটনা করল—সম্রাট শাহ্জাহানকে দারা বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন, কিন্তু দারার বীরপুত্র সুলেমান শুকো সুজাকে পরাজিত করল।

পিতা অল্প দিনের মধ্যে রোগমুক্ত হলেন। সমস্ত দরবার দিল্লী থেকে আগ্রা চলে গেল—সমস্ত দেশ যেন জানতে পারে—সম্রাট জীবিত। মুরাদ গুজরাট থেকে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। সুচতুর সুকৌশলী মায়াবী ঔরঙ্গজেব মুরাদকে তার দলে টেনে নিলেন। ঔরঙ্গজেব জানতেন, মুরাদ বীর, সাহসী যোদ্ধা, তাঁরা সমবেত শক্তি নিয়ে দারাকে পরাজিত করবেন স্থির করলেন। দারাকে তাঁরা ঘৃণা করতেন কারণ দারা ইসলাম-বিচ্যুত। দারাকে তাঁরা বিধর্ম্মী "কাফের" আখ্যা দিলেন।

আমি দেখলাম, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন বাঙ্গালা দেশ থেকে সর্পের দল ছুটে চলেছে। সম্রাটের জ্যোতিষীগণ ভবিষ্যৎ বাণী করলেন—রাজ্যের অমঙ্গল কেটে যাবে, সম্রাট নিরোগ হবেন। আমার কিন্তু মনে হল যে কৃষ্ণ সর্পের মস্তকে যে শ্বেত সর্প বসেছিল সে সর্প স্বয়ং ঔরঙ্গজেব, আজ সেই সর্প শির উত্তোলন করেছে, মন্থরগতিতে তৈমুর বংশের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করছে, কিন্তু কোথায় যাবে ? আকাশ-পথে নক্ষত্রের গতি অনুসরণ করে কি তার উত্তর স্থির হবে ?

বিদ্রোহের সংবাদ পেলাম আমরা বিলোচপুরে—সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের পথে। তখন সম্রাট আবার ফিরে চলেছেন রাজধানীর দিকে। সুতরাং আমরা সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফিরে চল্লাম।

এবার হতভাগ্য সম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তনের গতি অতি গুরুভার মনে হল। "বিলোচপুর"—এই নামটি তীরের মতন আমাদের বিদ্ধ করল। এইখানে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজকুমার শাহ্জাহান তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন।

আকাশে সূর্য্য তীক্ষ্ণ কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা রাজপথের পার্শ্বস্থিত দীর্ঘ বিটপীশ্রেণীর আচ্ছাদনের মধ্য দিয়ে চলেছি। আমি পিতার পার্শ্বে বিরাট শকটের অভ্যন্তরে বসে আছি. এই শকটখানি ইউরোপ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ পেয়েছিলেন। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলেছি—নীরবে। শাহ্জানাবাদ ত্যাগ করে মনে হল যেন আমরা পরাজিত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করছি।

আমি আমার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে-ছিলাম—এ যে আমার যৌবনে প্রত্যাবর্ত্তন করার মতন। আমার বিশ্বাস হয়েছিল, যেন দুজেরা রাজধানীতে ফিরে এসেছেন ; আওরঙ্গজেবের শিবির থেকে তাঁর পুরাতন পদে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। এই কয়েক বৎসরের ঘৃণা, হতাশা, বিস্মৃতির ব্যবধানে ফিরোজশাহ্ পরিখা তীরসংলগ্ন বনশাখার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত অস্ত-সূর্য্যের কিরণ আমাকে খুব অভিভূত করেছিল। সেখানে আমার মনে হল যেন সব জিনিষই যেমনটি ছিল তেমনটি আছে—যেন কোন কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নি।

মধ্যপথে একটী মর্ম্মর কূপের পার্শ্বে এসে আমাদের বাহিনী বিশ্রাম নিল। আমাদের শ্বেত অশ্বচতুষ্টয়কে স্নান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সমরখন্দের তরমুজ আহার করলাম, আমার সুরাপাত্র থেকে সরাব পান করলাম। তারপর পিতা খুব দ্রুত শকট পরিচালনার জন্য আদেশ দিলেন।

পিতা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এই প্রথম অনুভব করলাম, পিতা কত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্বর্ণগোলাপখচিত রাজভূষণের মধ্যে তিনি যেন কুঞ্চিত হয়ে পড়েছেন—তাঁর পরিচ্ছদে সরাবের ধারা বয়ে পড়েছিল। সম্রাটের আকৃতিতে তাঁর প্রথম জীবনের পৌরুষের চিহ্ন মাত্র ছিল না। তাঁর বিশ্ববিজয়ী চক্ষুর জ্যোতি ম্লান হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বুঝলাম যে, এক বিরাট অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে।

সম্রাট মীরজুমলার কথা বলছিলেন—তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। এই পারস্য-সন্তানকেই না সম্রাট রাজসম্মানে বিভূষিত করেছিলেন, মুয়াজ্জম খাঁন উপাধি মণ্ডিত করেছিলেন ? তাঁর আশা ছিল যে হিন্দুস্থানের জন্য কান্দাহার জয় করবেন। আজ সেই মীরজুমলাই সম্রাটকে প্রবঞ্চনা করেছে। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন কিছু ছিল না। আমরা যতই দিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছি, আমার মন ততই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

এই মীরজুমলাইত একদিন গোলকুণ্ডার পথে পাদুকা বিক্রয় করেছিল, তারপর সে অর্জ্জন করল অর্থ ও শক্তি ; লাভ হল গোলকুণ্ডার উজিরের আসন, শেষে পেল ঔরঙ্গজেবের বন্ধুত্ব। একদিন মীরজুমলা

গোলকুণ্ডার রাজমহিষীকে বিপথচারিণী করল, রাজা তাঁকে কারাগারে বন্দী করবার উদ্যোগ করলেন। মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের সাহায্য প্রার্থনা করল। ঔরঙ্গজেব সাহায্য কর্ত্তে এসে লুণ্ঠন করলেন রাজধানী, সেখানে করলেন প্রাচীন রাজবংশের সমাধির রত্ন অপহরণ। এই করেই ত ঔরঙ্গজেবের শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হল।

আমি বারম্বার সম্রাটকে মীরজুমলার সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম। আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম মীরজুমলার বিরুদ্ধে। একদিন ছিল, যখন সম্রাট শাহজাহান আমার পরামর্শ শুনতেন—যেমন শুনতেন আমার মায়ের কথা। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি দূরে সরে গেলেন আমার কাছ থেকে—মার কাছ থেকেও……

আমরা বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করলাম—বাদশাহ, আপনার মনে পড়ে কি ?—আমি ও দারা আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—ঔরঙ্গজেবকে গোলকুণ্ডা থেকে ফিরিয়ে আনুন—যেন সে খুব শক্তিশালী হয়ে না পড়ে? আপনার মনে পড়ে কি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীতে মীরজুমলা আপনাকে একখণ্ড হীরক উপহার দিয়ে বলেছিল—কান্দাহারের রাজকোষে সে হীরকখণ্ডের সমতুল্য কোন হীরক নেই। যদি মীরজুমলাকে একদল বাদশাহের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা হয় তবে সে বিজাপুর গোলকুণ্ডা সিংহল করমণ্ডল প্রদেশ জয় করে অগণিত হীরক বাদশাহকে উপহার দিতে পারবে। তারপর আবার মীরজুমলা একমুষ্টি প্রস্তর সম্রাটকে উপহার দিয়েছিল। সম্রাট মীরজুমলার অধীনে সৈন্যের ব্যবস্থা করলেন। আমি আর দারা কত নিষেধ করেছিলাম। আজ সেই সৈন্যের সঙ্গে মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছে। পিতা, সে কথা মনে পড়ে কি ? সম্রাট একটু অবহিত হয়ে বসলেন। মনে হল যেন, তিনি অসংখ্য রাজমুকুটের আলোয় মণ্ডিত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করে আছেন, সে আলোর দীপ্তি তৈমুরের রাজ্যের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমার মনে হল, সম্রাট শাহজাহান তাঁর রাজদণ্ড নিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসন করছেন। তারপর মুহূর্ত্তের জন্য সম্রাট নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন—আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম, সম্রাটের উপর পুনরায় আমার অধিকার ফিরে পেতে হবে। আমি আবার বলে উঠলাম :—ফকির ঔরঙ্গজেব এমন লোক নয় যে, বাহিরাড়ম্বরের চাকচিক্য দ্বারা মুগ্ধ হবে, আপনার মনে আছে ঔরঙ্গজেব কি উপায়ে তার দরবেশী বন্ধুদের ১লক্ষ টাকা প্রতারণা করেছিল। একবার ঔরঙ্গজেব বলেছিল তাদের কাছে কিছু মুক্তা খরিদ করবে। কিন্তু তার ওস্তাদ সেখ মীর বন্ধু বলেছিল—এই মুক্তা অপেক্ষা আরও বৃহৎ মুক্তা আছে হিন্দুস্থানে। যদি সেই মুক্তা লাভের ইচ্ছা থাকে, তবে এই অর্থ দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ কর, তাতে বৃহৎ মুক্তাখণ্ড তোমার করে এসে পড়বে। ঔরঙ্গজেব তাই করেছিলেন। সেই সৈন্য দিয়ে আমার সুরাট বন্দর অধিকার করেছে। আগ্রার আমাদের মণিমুক্তার প্রয়োজন নাই—আমরা চাই রক্ত মাংস—সৈন্য অশ্ব।

এবার আমি নীরব হলাম—আমার ভয় হল, আমার স্বর আবেগে কাঁপছে। পিতা আমার দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর দেহযষ্টি কি কুব্জ হ'য়ে গেছে? তাঁর নয়নে কি সন্তান বাৎসল্য ফুটে উঠছে? যেমনটি ফুটে উঠত আমার শৈশবে—যখন খেলতে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম?

পিতা বল্লেন—"কন্যা জাহানারা। তোমার কি মনে নাই—কে আমাকে অনুরোধ করেছিল ঔরঙ্গজেবকে ক্ষমা করতে, তাকে গুজরাট থেকে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়ে নিতে। সেই দাক্ষিণাত্যেই ত সে আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে।" আমার কপালে পিতা তাঁর উত্তপ্ত করতল বুলিয়ে দিলেন। পিতা বলে চল্লেন—"তোমার মনে পড়ে? কতবার তোমায় সাবধান করেছিলাম—বেশী বিশ্বাস করো না। আপাতঃদৃষ্টিতে সাপ খুব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে সাপ বিষ বয়ে বেড়ায়। জন্মের ছয়দিন পরে দারার ললাটে আমি দুর্ভাগ্যের চিহ্ন দেখেছিলাম—কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ললাটে ছিল জয়তিলক—অদৃষ্টের আবরণ যদি কালো সুতো দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে, সমস্ত জলাশয়ের জলধারা তাকে শুভ্র করে দিতে পারে না।" অবনমিত হয়ে আমি পিতার হস্তচুম্বন করলাম। পিতার অভিযোগ যথার্থই সত্য? কতবার আমি আর দারা ঔরঙ্গজেবের পত্র দ্বারা বিভ্রান্ত হ'য়েছি। পত্রে সে কি ভীষণ প্রবঞ্চনা ছিল—তা বুঝতে পারিনি। কতবার পিতার কাছে ঔরঙ্গজেবকে সমর্থন করে ক্ষমা-প্রার্থনা করেছি।

আমরা বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্লাম। আজ মনে হচ্ছে যেন অদ্ভুত গৌরবর্ণ কৃষ্ণচক্ষু রাজকুমার ঔরঙ্গজেব আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—যেমন আসে ব্যাঘ্র লোলুপদৃষ্টিতে শীকারের দিকে। সে কি তৈমুর-বংশের শেষ সন্তানকে আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে? কিন্তু, রাজদণ্ড ত শাহজাহানের হস্তচ্যুত হয়নি।

আমরা আগ্রার অদূরবর্তী সেকেন্দ্রায় প্রবেশ করেছি। পিতা ও আমি—আমরা দু'জনমাত্র সেই বিরাট প্রাচীরের সুবিশাল তোরণ অতিক্রম করলাম। সেখানে আকবর সমাধিতে বিশ্রাম করছেন। আজকের মতন কখনো এই সমাধির শুচিতা আমাকে অভিভূত করেনি। রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত অতুলনীয় বিরাট প্রাসাদের সম্মুখে আমরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানালাম। আমি কিন্তু আমার মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম—সেই ছিল সম্রাটের সভার অনুশাসন, তারপর আমরা সমাধির শিলাতলে আরোহণ করলাম। সমাধির চতুষ্পার্শ্বে ছিল বিভিন্ন দিকে প্রসারিত তোরণশ্রেণী, আর বিচিত্র কারুকার্য্যময় মর্ম্মরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টিত শিবির।

এখানে কোন মানুষ ভারাক্রান্ত নয়, এখানে কোন অত্যাচার নাই। এখানে মানুষ স্বস্তিতে নিশ্বাস নেয়, যতগুলি মানব আত্মা ততগুলি পথ ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে—এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম সেকেন্দ্রার প্রাসাদে।

সম্রাট আকবরের কি অভিলাষ ছিল তাঁর মৃত্যুর পর দীন-ই-ইলাহি সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে সম্মেলিত হবে? সম্রাট আকবর তাঁ পাঁচমহল সমাধি নির্ম্মাণ করবার সময় কি সম্রাট অশোকের কথা ভেবেছিলেন? সম্রাট অশোক সুচারু কারুকার্য্যমণ্ডিত বিরাট মন্দিরোপম বৌদ্ধমঠে তাঁর সংঘারামের শ্রমণদের আহ্বান করতেন।

সেখানে সহস্র সহস্র সংবভ্রাতা মক্ষিকার মতন প্রকৃতির মধুচক্র থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।

আমার সম্রাট পিতা ক্রমশঃ চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন—তোরণের পাশে ইতঃস্তত পদচারণা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কি তাঁর পিতামহের স্নেহের কথা স্মরণ করলেন? সম্রাট আকবরের মৃত্যুশয্যায় ষড়যন্ত্রের আবর্ত্তে বিদ্রোহী পুত্র সেলিম তাঁর পিতার সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহস করেন নি; কারণ তিনি পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

সেই সময় শাহজাহান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যতদিন সম্রাট আকবর জীবিত থাকবেন ততদিন সম্রাটকে ত্যাগ করবেন না। সম্রাট শাহজাহানের কি স্মরণে উদয় হচ্ছিল যে, এই সমাধিতে শায়িত মহাপুরুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন—এই শিশুই ভবিষ্যতে এক বিরাট ব্রত উদযাপন করবেন।

আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি, আমি উপরের তলে চলে গেলাম—সে তলটী ছিল সম্পূর্ণ শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত। সম্রাট আকবরের সমাধি প্রকোষ্ঠ ছিল প্রস্তর নির্ম্মিত জালের আবেষ্টনীবদ্ধ; দূর থেকে মনে হয় যেন সারিবদ্ধ গবাক্ষের সমাবেশ। গবাক্ষ মধ্য দিয়ে উদ্যানের সবুজ তৃণগুচ্ছ মানুষের দৃষ্টি পথে ধরা দেয়। স্বর্ণমণ্ডিত সমাধির গম্বুজটী আকাশের মতই গোলাকৃতি, শ্বেতমর্ম্মর, পুষ্প, কৃষ্ণমণি রেখাঙ্কিত শবাধারটী দিবসে সূর্য্য কিরণে এবং নিশীথে চন্দ্রালোকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠে। নিম্নতলে একটী গহ্বরে শুভ্র মর্ম্মর শবাধারে শায়িত রয়েছেন হিন্দুস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠবীর। উদীয়মান সূর্য্যের দিকে রক্ষিত তাঁর মুখমণ্ডল। প্রাচীর গাত্রের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে স্ফুরিত সূর্য্যালোক তাঁকে উদ্ভাসিত করে তুলছিল।

সেই শুভ্র শবাধারের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে আমি প্রণাম করলাম—আমার নয়ন থেকে ঝরে পড়ছিল তপ্ত অশ্রুবিন্দু মর্ম্মর গোলাপের উপরে। আমি যদি প্রাচীন ঋষিদের মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হতে পারতাম—আমার প্রার্থনা দ্বারা যদি আমি সেই বিরাট পুরুষকে পুনর্জীবন দিতে পারতাম,—তিনি আবার ভারতবর্ষকে অন্ধকার বিমুক্ত করে দিতেন। আমার মনে হল—তিনি সেই প্রস্তর সমাধি ভেদ করে তাঁর বক্ষ উত্তোলন করলেন—তাঁর প্রস্তরখণ্ড বিচূর্ণ হয়ে গেল। তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন:—

"আমার সাম্রাজ্যকে চিরন্তন করে দাও—" (ক্রমশঃ)

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

২৪

গণসমিতির হস্তে আমাদের পণ্য কপিষার সমাবর্ত্তিত সার্থবাহ ও বণিকগণের মধ্যে বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত হইবার পক্ষান্তের মধ্যেই আমাদের পণ্যসম্ভার বিক্রীত হইয়া গেল। এইরূপ সত্বর বিক্রয় হেতু আমাদিগকে কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং আমরা ইহাতে আশাতীত লাভবান হইলাম। প্রতীচ্য হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহগণ আমাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেন। আমাদের পণ্যবাহী নৌকাগুলি সম্ভারমুক্ত হইয়া পুরুষপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। ইহাদের সহিত আমাদের অবস্থানের জন্য নৌকাখানিও ফিরিয়া যাইবে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু আমাদের বাহ্লিকাভিযানের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া নৌকাগুলিকে কপিষার পোতে রাখিতে হইল। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন নৌকর্ম্মীকে নিযুক্ত করিয়া নৌকাগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের আদেশ প্রদান করিলাম। বাহ্লিকের অভিযানে আমাদিগকে বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে—সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট, ক্ষুদ্রস্রোতবাহী উপত্যকা প্রদেশ ও উচ্চ অধিত্যকা পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তদুপযোগী যান বাহনের এখনও পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। বাহ্লিকাভিযাত্রী সার্থবাহগণের মধ্যেও অভিযানায়োজনের ব্যবস্থার এখনও শেষ হয় নাই। প্রতীচ্য হইতে এখনও বণিক ও সার্থবাহগণের সমাগম হইতেছে। কপিষার বিপণী সমূহে, সার্থবাহ ও বণিক বীথিতে ক্রয়-বিক্রয় এখনও মন্দীভূত হয় নাই। এখানকার বীথিতে বাণিজ্য শ্লথ না হইলে অন্যত্র অভিযান গণ-সমিতির মতে অবিধেয়। অতএব বাহ্লিকাভিযানের জন্য আয়োজনানুষ্ঠানের এখনও বিলম্ব হইবে। অন্ততঃ প্রতীচ্য হইতে সমাগত বণিক ও সার্থবাহগণের অভাব পূর্ণ হইয়া তাহাদের স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন সূচীত না হওয়া অবধি কফেনসের বাণিজ্য শ্লথ হইবার সম্ভাবনা নাই।—সুতরাং অন্যত্র অভিযানের চিন্তা আপাততঃ গণ-সমিতির নায়কদিগের মনে স্থান পাইবে না। গণ-সমিতি হইতে বাহিরে আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে জন-কয়েক অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া, বিশেষতঃ প্রভূত অর্থসহ বাহ্লিকগমন কোনও প্রকারেই নিরাপদ নহে।—তাহার পর এই অভিযানের জন্য পার্ব্বত্য পথে গমনাগমনে অভ্যস্ত অশ্ব ও অশ্বতর কিংবা উষ্ট্রের প্রয়োজন;—আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আস্তরীয় অধিত্যকা প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর এই সময়ে কফেনসের বীথিতে একদল অশ্বপাল, অশ্ব ও অশ্বতর লইয়া বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তাহারা আসিবে—না আসিবার

কোনও কারণে এ পর্য্যন্ত উদ্ভব হয় নাই। তাহাদের আগমনের এখনও বিলম্ব আছে। ইহাদের অশ্ব ও অশ্বতর সযত্ন পালিত, সবল ও সুশিক্ষিত। অভিযানোপযোগী আমাদের ব্যবহার্য্য অশ্ব ও অশ্বতর আমরা ইহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিব এইরূপ স্থির করিয়াছি। সুবর্ণবিহারের মহাস্থবির বলিলেন, তাহারা প্রতিবৎসরই আসিয়া থাকে—এ বৎসরও আসিবে এবং আমাদের ও সার্থবাহগণের বাহ্লিকাভিযানের পূর্ব্বেই যে তাহারা কপিষায় সমাগত হইবে তাহা সুনিশ্চিত; কারণ পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের জন্য তাহাদের আনীত বহু অশ্ব ও অশ্বতর ক্রীত হইয়া থাকে—অভিযাত্রী বণিক ও সার্থবাহগণ সকলেই অবগত আছে যে ইহাদের আনীত অশ্ব ও অশ্বতর সকল পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে যাতায়াতে অভ্যস্ত এবং অধিত্যকা ও উপত্যকায় আরোহণ ও অবরোহণে সুশিক্ষিত।

এই অশ্বপালগণের আগমন প্রতীক্ষায় ও গণ-সমিতির অভিযানারোহণানুষ্ঠান অবধি আমাদের নৌকাগুলির প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইবে না; কারণ, প্রকল্পিত অভিযানের প্রারম্ভ অবধি আমাদিগের সতর্কতার সহিত ও সশস্ত্র হইয়া এই সুরক্ষিত পোতাশ্রয়েই অবস্থান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আমাদের হস্তে এখন প্রচুর অর্থ; উহা লইয়া নগরীতে, অপরিচিত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থিতি সুবিবেচিত ও নিরাপদ হইবে না।

সপ্তাহান্তে—আসুর ও মিডিআ দেশ এবং কস্তপ সাগর তীরের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে, বহু অশ্ব ও অশ্বতরসহ অশ্ব ব্যবসায়ীগণ ককেনসের বাণিজ্যকেন্দ্রে সমাগত হইল। পিতার সহিত যে সকল বাণিজ্য অভিযানে আমি পূর্ব্বে প্রতীচ্যে আসিয়াছিলাম তাহাতে ইহাদের সহিত আমার বিশেষরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ হয় নাই ও তাহার আবশ্যকও অনুভব করি নাই। পূর্ব্বে যতবার আমি পিতার সহিত আসিয়াছিলাম, আমরা পুরুষপুর হইতে আমাদের যানবাহন—অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বলীবর্দ্ধ আনয়ন করিয়াছিলাম; ইহারা আমাদের পণ্যসম্ভার পণ্টস্ অবধি বহন করিয়াছিল। এবার বাহ্লিকের পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনের জন্য পুরুষপুর হইতে যানবাহন আনয়নের সুবিধা হয় নাই। কপিষায় পোতাশ্রয়ে তাহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় অভিযানের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের ছিল। পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম এবং যে কয়বার ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমি প্রতীচ্যে আসিয়াছিলাম, তাহাতে আমারও ধারণা ছিল যে বাহ্লিক যাত্রার জন্য যানবাহনের সুবিধা ও সুব্যবস্থা কপিষা পোতাশ্রয় হইতেই হইবে। আমি জানি যে প্রতিবৎসর এই সময়ে আসুরীয় অধিত্যকা প্রদেশ হইতে অশ্বপালগণ, বহু অশ্ব ও অশ্বতর বিক্রয়ের জন্য কপিষায় আনয়ন করিয়া থাকে; আমাদের নিকট অর্থেরও অভাব নাই; অতএব প্রয়োজনীয় যানবাহনের জন্য কোনওপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, তাহা সুনিশ্চয়।

এই নবাগত বণিকবাহিনীর সকলেই দেখিতে অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ। সকলেরই দেহ সবল ও সুগঠিত। ইহাদের ললাট প্রশস্ত ও সমুন্নত। আয়ত ও সমুজ্জ্বল চক্ষু, তন্মধ্যে শরতের মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় নীলাভ অক্ষিতারকা। সুবিন্যস্ত গণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সুগঠিত এবং উন্নত ও ঈষৎ বক্রাগ্র নাসিকা। ইহাদের কেশ তরঙ্গায়িত ও স্বর্ণাভ পিঙ্গল। গুম্ফ শ্মশ্রু পরিশোভিত সুদৃশ্য ও সুসংযত রক্তাভ অধরোষ্ঠ এবং ইহাদের দেহকান্তি হেমাভ গৌর।

পিতার সহিত পূর্ব্বে যখন বাণিজ্যাভিযানে আসিয়াছিল্যম, তখন একবার ঘটনার সমাবেশে, এই সকল অশ্বপালগণের মধ্যে জনকয়েকের সহিত আমার আলাপ হইবার সুবিধা হইয়াছিল। ইহারা গন্ধার পুরুষপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাহাদিগেরই ন্যায় ইহারা সুরীয়স্ বা সূর্য্য, ইন্দ্র, নাসত্যৌ ও বরুণের উপাসক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অপর কোনও দেবতার স্থান ইহাদের সুরলোকে আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। ইহাদের ভাষা সুমিষ্ট ও গন্ধারবাসীর নিকট একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে—অনেকগুলি শব্দের প্রয়োগ একই অর্থে উভয় ভাষাতেই দৃষ্ট হয়।

ইহাদের কপিষায় আগমন সংবাদ আমরা শ্রমণ মঞ্জুকান্তির নিকট প্রাপ্ত হইলাম। সুবর্ণবিহারের মহাস্থবির শ্রমণকে এই বার্ত্তা আমাদিগকে জানাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমরা অশ্বপালগণের নেতার নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলাম যে আমরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য ও দূর পার্ব্বত্য পথে গমনের উদ্দেশ্যে কয়েকটী সবল ও কর্ম্মঠ অশ্ব এবং আমাদের তৈজস ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহনের জন্য, কয়েকটি অশ্বতর ক্রয়েচ্ছু। তজ্জন্য আমরা জনৈক অশ্ব ও অশ্বতর বিক্রেতার সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহি। শ্রমণ মঞ্জুকান্তি বিহারে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অর্ষপালগণের অভিযান-নায়ককে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের এই বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরদিবস প্রাতে একজন বিরল-শ্মশ্রু কিশোর-বয়স্ক অশ্বপাল আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। তাহার দীর্ঘাকার, সৌম্য, সুগঠিত, সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ বাস্তবিক নয়নানন্দকর। তাহার অপরিস্ফুট যৌবনসুষমা নবোদ্গত কিশলয়ের ন্যায়, তাহার দেহকান্তিকে এক ললিত সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সে আসিয়া পুরুষপুর হইতে আগত থেওডোটস্ ও সফোনিডস্ যবন সার্থবাহদ্বয়ের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া আমাদের অনুসন্ধান করিতেছিল। আমি আনন্দকে দিয়া তাহাকে আমাদের নৌকায় ডাকিয়া আনিলাম ও আমাদের নিকট বসাইয়া প্রজ্ঞা ও আমি তাহার সহিত, তাহাদের বিক্রেয় অশ্ব ও অশ্বতর সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সে আমাদের প্রয়োজন অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কতদূরে ও কোথায় যাইবেন জানিতে পারি কি?"

আমি বলিলাম, "বাহ্লিক নগরীতে।"

—সে আর বেশী দূর কি? তবে, পথ বন্ধুর বটে। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে যবন সার্থবাহদ্বয়ের সন্ধানে আসিয়াছি—আপনারাই কি সেই থেওডোটস্ ও সফোনিডস্—আপনারাই কি পুরুষপুর হইতে আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন।" আমি প্রজ্ঞাকে দেখাইয়া বলিলাম, "ইনি সর্কোনিডস্ এবং আমি খেওডোটস্ নামে পরিচিত।"

অশ্বপাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কিরূপ অশ্ব বা অশ্বতর আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন ?"

আমি বলিলাম, "আমাদের আবশ্যক কয়েকটি সবল, পার্ব্বত্য পথে গমনে অভ্যস্ত ও কর্ম্মঠ অশ্ব ও অশ্বতর।"

—বেশ ; আপনারা, আপনাদের অনুচরসহ, আমাদের এখানকার অশ্বশালায় আগমন করিয়া, আপনাদের আবশ্যক মত অশ্ব ও অশ্বতর পরীক্ষা পূর্ব্বক মনোনয়ন করিয়া লউন। আমার সহিত আমাদের অশ্বশালায় এখন আসিতে পারিবেন কি ?"

প্রজ্ঞা ও আমি পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিতেছি যে আমাদের কখন যাইবার সুবিধা হইবে এবং কয়টি অশ্ব ও অশ্বতর আমাদের আবশ্যক, তখন অশ্বপাল আমাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আপনাদের অশ্ব ও অশ্বতরের প্রয়োজন চিরদিনের ব্যবহারের জন্য—না, কেবল বাহ্লিকে উপনীত হইবার জন্য ?—সে কয়েক দিবসের কথা।—যদি মাত্র কিয়দ্দিবসের জন্যই হয় তাহা হইলে ভাড়াও পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আপনাদের কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না—বরং ইহাতে সুবিধাই আছে।—প্রতি অশ্ব ও অশ্বতরের পরিচর্য্যার জন্য আমরা একজন করিয়া পরিচারক দিব—তজ্জন্য আমরা স্বতন্ত্রভাবে কোনও অর্থ গ্রহণ করিব না।—আপনারা অশ্ব ও অশ্বতর সম্বন্ধে আপনাদের বিবেচনা ও অভিলাষ মত ব্যবস্থা করিবেন।—এখন অশ্বশালায় আগমন করিয়া, অশ্ব ও অশ্বতর পরীক্ষা পূর্ব্বক, মনোনয়ন করিয়া লউন।"

প্রজ্ঞা ও আমি পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম যে অশ্বপালের শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য এবং কিঞ্চিৎ অর্থদান পূর্ব্বক পরিচারকসহ অশ্ব ও অশ্বতর অভিযানকালব্যাপী ব্যবহার ব্যপদেশে ঋণ গ্রহণই শ্রেয়স্কর।

আমি বলিলাম, "বেশ—আমরা বাহ্লিকে উপনীত হওয়া অবধি পরিচারকসহ অশ্ব ও অশ্বতর ঋণ গ্রহণ করিয়া অভিযান কার্য্যসমাধা করিব—এইরূপই স্থির করিলাম।—এখন, চলুন, আপনার অশ্বশালায় গমনপূর্ব্বক, ঋণগ্রহণযোগ্য অশ্ব ও অশ্বতর মনোনয়ন করিয়া আসি।"

বাহন পরিদর্শন ও নির্ব্বাচন মানসে এবং অভিযানকালব্যাপী তাহাদের সম্যক্ ব্যবহার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ইহারা আমাদিগের নিকট গ্রহণ করিবে তাহা নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে, আমরা উভয়ে অশ্বপালের সহ গমন করিলাম। আমাদিগের প্রস্তাব সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বপালকে দেয় অর্থের কিয়দংশ অগ্রে প্রদান করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে লইয়া চলিলাম। তরুণ অশ্বপাল আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একজন প্রধান ব্যক্তির নিকট গেল। ইনি অশ্বপালগণের অভিযান-নায়ক। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন বিজ্ঞাপিত করিলাম। তিনি আমাদের আবশ্যকমত কয়েকটি পার্ব্বত্য পথে গমনযোগ্য কর্ম্মঠ, ও বলিষ্ঠ অশ্ব ও অশ্বতর, পরিচারকসহ—আমাদের বাহ্লিকে উপনীত হওয়া অবধি ব্যবহারের জন্য, ঋণ প্রদানে স্বীকৃত হইলেন এবং আমাদিগকে অশ্ব ও অশ্বতর মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা কতকটা তাঁহার মতানুযায়ী এবং কতকটা আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুসারে চারিটি অশ্ব ও চারিটি অশ্বতর মনোনয়ন করিলাম। স্থির হইল যে আমাদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ সহস্র আথেনীয় সুবর্ণ ড্রাক্‌ম্ প্রদান করিতে হইবে এবং আরও স্থির হইল যে সমুদয় দেয় অর্থ অভিযানের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবে আমরা এইরূপ ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক ইহা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে অশ্বপালগণের নায়কের হস্তে অগ্রে সহস্র সুবর্ণ ড্রাক্‌ম্ প্রদান করিলাম এবং কথা রহিল যে অভিযান দিবসের প্রাতঃকালে অবশিষ্ট একাদশ সহস্র ড্রাক্‌ম্ প্রদত্ত হইবে। এই অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণের জন্য অশ্বপালগণের নায়ক আমাদের নৌকায় আগমন করিবেন ও তথায় তিনি আমাদিগের নিকট হইতে অভিযান সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ পাইবেন। তিনি আগামী দিবসত্রয়ের মধ্যে একদিন প্রাতঃকালে আমাদের নৌকায় আসিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক অভিযান বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশসমূহ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অশ্বপালগণকে আমাদিগের নির্ব্বাচিত অশ্ব ও অশ্বতর মসীদ্বারা চিহ্নিত করিয়া অশ্বশালায় স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষার আদেশ প্রদান করিলেন।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে
অশ্ব ও অশ্বতর নির্ব্বাচন
নামক চতুর্বিংশতি
বিবৃতি

(ক্রমশঃ)



শিলালিপি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সুতপার সঙ্গে পরিচয়টা হল এই ভাবেই। কিন্তু পরিণতি যা ঘটল বিস্ময়কর।

একটু একটু করে কী ভাবে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল সেটা মনে পড়ে না। কিন্তু একটা জিনিস বেশ মনে আছে. দেখা হলেই ঠোকাঠুকি বাধত। রঞ্জুকে খোঁচা দিয়ে একটা আশ্চর্য কৌতুক বোধ করত সুতপা।

—কবিরা ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী।

রঞ্জু ক্যাঁচ করে উঠত : কিসে বুঝলেন ?

—অত সাজিয়ে কথা বলা দেখে। ছন্দ দিয়ে যারা কথা গুছিয়ে তোলে, সত্যের চাইতে গোছানোর দিকেই তাদের নজর থাকে বেশি। অমাবস্যার ঘুটঘুটে আঁধার রাত্তিরে তারা পূর্ণিমা নিয়ে কবিতা লেখে।

—আপনার তো হিংসে হবেই। সম্পাদকেরা লেখা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা।

সুতপা হেসে উঠত। ধারালো ঝকঝকে হাসি।

—তর্ক করতে গিয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ ? এটা বে-আইনি।

—বা রে. আপনি যা তা বলবেন তাই বলে ?

আর একদিন।

সুতপা বলে বসল, আপনি কয় মণ ওজন তুলতে পারেন ? বিশ মণ ?

—পাগল নাকি ? কোনো মানুষে তা পারে !

—আপনি পারেন—কবিরা নিশ্চয় পারে।

আক্রমণের গতিটা বুঝতে না পেরে বিস্মিতদৃষ্টিতে রঞ্জু তাকিয়ে রইল : তার মানে ?

—মানে, পরিমল এসেছিল।

—তবু কিছু বোঝা গেল না।

—বোঝা গেল না. না ?—মুখ টিপে টিপে তীক্ষ্ণ হাসি হাসল সুতপা : পরিমল এসে একেবারে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। বললে, রঞ্জু যা একটা কবিতা লিখেছে তা একেবারে প্রলয়ঙ্কর।

মনে মনে পরিমলের ওপর অত্যন্ত চটে গিয়ে বিব্রতমুখে রঞ্জু বললে, যাঃ।

—যাঃ ? তবে এই লাইনগুলো কার ?

'হিমালয় ধরে দেব নাড়াচাড়া, সাগরে তুলব ঘোর তুফান ?'

রঞ্জু ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

সুতপা সকৌতুকে বললে, হিমালয় ধরে যে নাড়াচাড়া দিতে চায় সে বিশ পঁচিশ মণ ওজন তুলতে পারবেনা ?

—বাঃ, ওটা যে কবিতা।

—ওই জন্যেই তো বলছিলাম কবিরা মিথ্যেবাদী।

—কী আশ্চর্য, আপনি—মানে—কী আশ্চর্য—অসহিষ্ণুর আর সীমা রইলনা। এমনভাবে যে লোক কবিতার ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে তর্ক চলবে কী উপায়ে। একেবারেই অরসিক বন্ধু।

তবু তর্ক চলত। রাগ হয়ে যেত, ভালো লাগত তবু। মিতা নয়, করুণাদি নয়—এ একেবারে আলাদা জাতের মেয়ে। মিতার কাছে গেলে কেমন নার্ভাস হয়ে যেতে হয়, করুণাদির প্রভাব মনকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে ফেলে। কিন্তু সুতপার কাছে এক ধরণের সমধর্মিতা মেলে—কোথায় যেন খুঁজে পাওয়া যায় মানসিক সংযোগ।

কিন্তু একটা জিনিস মাঝে মাঝে ভারী খারাপ লাগে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সুতপা। কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়। মুখের ওপর শুষ্ক মেঘাচ্ছন্নতার মতো কী একটা আসে ঘনিয়ে, চোখ দুটো কোথায় যেন তলিয়ে যায় তার। মনে হয় আপাতত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সে হারিয়ে গেছে কোনো একটা অতলান্ত সমুদ্রের গভীরে, সরে গেছে কোনো এক দুর্লক্ষ্য নীহারিকার আলোক লোকে। মুখের একপাশে পড়া কঠিনের আলোয় কেমন অসমাপ্ত, খণ্ডিত দেখাচ্ছে তাকে—তার সম্পূর্ণ সত্তাটা চলে গেছে রঞ্জুর বোধের বাইরে, তার বিচারের সীমারেখা পার হয়ে।

আর তখনি উঠে পড়ে সে। তখনি মনে পড়ে সুতপার মুহূর্তগুলোতে এখানে তার প্রবেশ নিষেধ—সে একান্তভাবে অনধিকারী। বলে, আচ্ছা, তবে আমি আজ চলি—

সুতপা জবাব দেয়না—শুধু মাথা নাড়ে। নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায় রঞ্জু। বুঝতে পারেনা যে এত উজ্জ্বল, এত সহজ—হঠাৎ তার চেহারে এমনভাবে কিসের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। কোনখান থেকে আসে রাহু—সূর্যের আলোকে আড়াল করে দেয় একটা কালো আবরণ বিছিয়ে দিয়ে ?

মন এলোমেলো ভাবনার জাল বুনতে চায়।

কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল একদিন।

সুতপা একটা বই পড়তে চেয়েছিল ওর কাছে। বইটা জোগাড় করে নিয়ে দুপুরের দিকে এল রঞ্জু।

রোদে ভরা বাড়িটায় স্তব্ধতা। সুতপার দাদা অবনী রায় অফিসে বেরিয়ে গেছেন। অবনী ওদের দলের উৎসাহী কর্মী। বাড়িতে এক বিধবা মাসী থাকেন, তিনি কিছু দেখেও দেখেননা। তাই মাঝেমাঝে এ বাড়িতেই ওদের সভাসমিতিগুলো বসত।

মাসিমা বারান্দায় বসে টাকুতে পৈতে কাটছিলেন। রঞ্জুকে দেখে বললেন, খুকুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? ওর তো জ্বর হয়েছে।

—জ্বর? কবে থেকে?

—কাল রাত্তিরে। খুব জ্বর এসেছে।

—তাই নাকি?—রঞ্জু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: একটা বই দিতে এসেছিলাম যে—

—যাও না, শুয়ে আছে ওঘরে—। যদি জেগে থাকে দেখা করে যাও।

সাবধানে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল সে, আস্তে ধাক্কা দিয়ে খুলল ভেজানো দরজাটা।

বালিশের ওপর রুক্ষ চুলগুলো মেলে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে সুতপা। একহাতে কপালটা রেখেছে, আর একটি নিরাভরণ বাহু ক্লান্ত শিথিলভাবে এলিয়ে দিয়েছে পাশে। কোমর অবধি টানা চাদরটা বিস্রস্তভাবে পড়ে আছে—একটা আশ্চর্য করুণতা যেন ঘিরে ধরেছে তার রোগশয্যাকে। তলোয়ারের মতো ধারালো মেয়েটিকে কী অসহায় বলে বোধ হচ্ছে। কী অবিশ্বাস্য দেখাচ্ছে এখন এই করুণ আত্ম-নিবেদনের ভঙ্গিটা! তেমনি সন্তর্পণে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু সামান্য একটু শব্দ হল পায়ের চটিটায়। আর চোখ মেলে তাকালো সুতপা। জ্বরের ধমকে টকটকে দুটো লাল চোখ।

—কে?—দুর্বল গলায় ডাক এল।

—আমি রঞ্জন।

—ওঃ, আসুন।

—নাঃ, আপনি অসুস্থ। আজ আর বিরক্ত করবনা। এই বইটা রেখে চলে যাচ্ছি।

—না—না, যাবেননা—হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় সুতপা যেন বিছানা থেকে আধখানা উঠে বসতে চাইল: আপনি যাবেন না। আজকে আপনাকে আমার ভয়ঙ্কর দরকার। বড্ড বেশি দরকার।

জ্বরতপ্ত চোখের দৃষ্টি আর জ্বরের উত্তেজনায় রঞ্জুর যেন চমক লাগল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আসুন—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো রঞ্জু এগিয়ে এল।

—বসুন।

একটা টুল টেনে নিয়ে রঞ্জু দ্বিধাভরে বসল। বললে—আপনি অসুস্থ, এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা—

—না, না।—সুতপা মাথা নাড়ল: আমি আপনাকে খুঁজছিলুম, জানেন, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

—কেন খুঁজছিলেন আমাকে?

—জানেন, আমি আর বাঁচব না।

রঞ্জু সভয়ে বললে, ছিঃ, ছিঃ, এসব কী বলছেন আপনি। জ্বর হয়েছে, দু-দিন পরেই ছেড়ে যাবে।

—না, যাবেনা।—সুতপার আরক্ত চোখ দিয়ে আগুনের আভার মতো জ্বরের উত্তাপ ঠিকরে পড়তে লাগল: আমি আর বাঁচব না।

রঞ্জুর ভয় করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল সুতপার কপালে একটুখানি হাত বুলিয়ে দেয় সে, জলের পটি লাগিয়ে দেয় একটা। কিন্তু অগ্নিকন্যাকে ছোঁবার শক্তি নেই, স্পর্ধাও নেই, ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল সে।

ফিস্ ফিস্ করে সুতপা বললে, আপনি কবি, আপনি লেখক। আমি মরে গেলে আপনি একটা গল্প লিখবেন?

—গল্প?

জ্বরের মাতলামিতে সুতপার স্বর কাঁপতে লাগল: হাঁ গল্প। বলুন, লিখবেন আপনি?

বিপন্ন মুখে রঞ্জু বললে, ওসব থাক এখন। পরে আর একদিন হবে না হয়।

—না, না, আর একদিন নয়। আর কোনো দিন হয় তো সুযোগই ঘটবে না। বলুন, আপনি লিখবেন এ গল্প?

রঞ্জু হাল ছেড়ে দিলে। বিশীর্ণ স্বরে বললে, কী গল্প?

জ্বরতপ্ত গলায় পাগলের মতো যেন প্রলাপ বকে গেল সুতপা। শুনতে শুনতে রঞ্জুর সমস্ত শরীর যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রেমের গল্প! আশ্চর্য, সুতপা বলছে প্রেমের গল্প! উজ্জ্বল তলোয়ারের ধারালো ফলকটা মুহূর্তে কোমল আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে রজনীগন্ধার বৃন্তের মতো। মশালের মুখে আগুন জ্বলছে না, ফুলের বুকে টলোমলো করছে ভোরের শিশির!

এ প্রলাপ শোনা উচিত নয়, উঠে যাওয়া উচিত এখান থেকে। এখনি, এই মুহূর্তেই। একটা নিষিদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুভূতি হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডে ধক্ ধক্ করে আওয়াজ হচ্ছে, গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। সুতপার আগুন-ঝরা অমানুষিক রক্ত চোখ দুটোর দিকে চাইতে পারল না রঞ্জু, বসে রইল নত মস্তকে।

সেই পুরোনো রূপকথার গল্প। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক সঙ্গে তারা কলেজে পড়ত, এক সঙ্গে তারা আলোচনা করত, এক সঙ্গেও চা-ও খেত মাঝে মাঝে। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই এল প্রেম।

তারও পর একদিন যখন নদীর ওপারে সূর্য ডুবে যাচ্ছে, বালির চরে কাশ ফুলগুলোকে যখন শেষ আলোয় একরাশ সোনার ফেনার মতো মনে হচ্ছে চারদিক নির্জনতার শান্তিতে ডুবিয়ে আছে, সেই দুর্বল মুহূর্তের অবকাশে ছেলেটি মেয়েটির হাত ধরল।

সাপের কামড় খাওয়ার মতো মেয়েটি সভয়ে হাত ছিনিয়ে নিলে: না—না।

—না কেন?—ছেলেটি আহত বিস্ময়ে বললে, তুমি তো আমাকে—

—না, না।—মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

—এর মানে?

—জানতে চেয়োনা।—অসহায় স্বরে মেয়েটি বললে: তুমি বুঝবে না।

কঠোর হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ: তা হলে কি তুমি আর কাউকে?—

দু-হাতে মুখ ঢেকে মেয়েটি বললে, না, তাও নয়।

—তবে কি আমরা বিপ্লবী, সেই জন্যই ? কিন্তু মৃত্যুর পথে যদি আমরা পাশাপাশি চলতে পারি, তার চেয়ে বড় আর কী আছে ?

—না, ওসব কিছুই নয়।

ছেলেটি অধীর উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল : বলো, সব খুলে বলো আমাকে।

—আমি পারবনা—কান্নার মধ্যে জবাব এল মেয়েটির।

—আচ্ছা বেশ—ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে মেয়েটিই তার হাত চেপে ধরল। চোখের জল মুছে ফেলে আর্তকণ্ঠে বললে, তবে শোনো। আমি বিবাহিত।

—বিবাহিত !—ছেলেটি চমকে উঠল : কই জানতাম না তো। এ কথা তো আমায় বলোনি।

—বলতে পারিনি—মৃতকণ্ঠে মেয়েটি জবাব দিলে।

—আমায় ক্ষমা কোরো—আমি জানতাম না—ছেলেটি চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

—না, না, যেয়ো না। যখন শুনেছ, তখন সব কথাই শুনে যাও। তেমনি মৃতস্বরে মেয়েটি বললে, তুমি জানো, আমার স্বামী কে ?

—কী হবে জেনে ?—শ্রান্ত স্বরে ছেলেটি বললে।

—শুধু তোমার জানা দরকার। শোনো, আমার স্বামী নীলমাধব।

—নীলমাধব ?

—হ্যাঁ, পাথরের ঠাকুর।

চমকে উঠল ছেলেটি : তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ ?

—না, ঠাট্টা নয়। এর চাইতে বড় সত্যি কথা আমি জীবনে কখনো বলিনি—ছেলেটির মনে হল কেমন যেন অপরিচিত হয়ে গেছে মেয়েটির গলার স্বর, যেন কোন্ বহুদূর দিগন্তের ওপার থেকে সে কথা কইছে :

—একটা আশ্চর্য কাহিনী শোনো। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমার জীবনে এ কাহিনী সব চেয়ে ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে আছে। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব নিবেদন করে দিয়ে তিনি ধন্য হতে চেয়েছিলেন। তাই ছেলেবেলায় আমাকেও তিনি নীলমাধবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন। আমি দেবদাসী, আমার বিয়ে করবার অধিকার নেই।

আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল যেন। ছেলেটির কণ্ঠ থেকে শুধু অব্যক্ত অস্পষ্ট শব্দ বেরুল একটা। দুর্ভেদ্য কঠিন স্তব্ধতায় চারদিক গেল আচ্ছন্ন হয়ে, উঠল অতি তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক, নদীর ওপারে সূর্যের শেষ আলোও মিলিয়ে গেল।

স্তব্ধতা ভেঙে অবরুদ্ধ স্বরে ছেলেটি বললে, বাজে।

—না।

—এ সংস্কার তুমি মানো ?

তেমনি বহুদূরের থেকে, যেন এই চর আর নদীর ওপার থেকে [illegible] এল : না।

—তা হলে কেন এ সংস্কার ভাঙবে না তুমি ?

—পারব না। সে জোর আর আমার নেই—কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক বর্ণহীন শীতল প্রশান্তি ফুটল তার স্বরে : মানতে পারি না, ভাঙতেও পারি না।

—বিপ্লবীর সমস্ত শক্তি দিয়েও নয় ?

—উপায় নেই।

মেয়েটিই উঠে দাঁড়ালো এবার—মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল, যেন ছুটে পালিয়ে যেতে চায়।

আগুনভরা প্রলাপ-জড়ানো চোখে সুতপা গল্প শেষ করল।

মন্ত্রমুগ্ধ রঞ্জু যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। যান্ত্রিক স্বরে বলে ফেলল : বেণুদা ?

আর সেই মুহূর্তেই সুতপা যেন চেতনা লাভ করল। হঠাৎ যেন বিকার কেটে গেছে তার, যেন চকিতে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সে।

তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সুতপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : যান্—যান্ আপনি—

রঞ্জু আর অপেক্ষা করল না।

পথ দিয়ে চলতে চলতে নিজের চোখ সে কচলালো বারকয়েক। এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন। যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেই সাবানের বুদ্বুদের মতো ভেঙে পড়বে এর রঙ।—সুতপার নিরাভরণ গ্রীবদেশে অলোগ্যের ফলক ; তার চারদিকে আগ্নেয়-বৃত্ত ! বেণুদা—লোহায়-গড়া নিষ্ঠুর মানুষ। ভালোবাসা। আর সংস্কারের বেড়ায় বন্দী সুতপা, শপথ নিয়েছে দাসত্বের শিকল ভাঙবার—অথচ যাকে ভালোবাসে সংস্কার ভেঙে তার কাছে এগিয়ে যাওয়ার জোর নেই তার—জোর নেই সুতপার।

তাই কি অত করে সংস্কার ভাঙবার কথাটা ভাবছিল সে ? শক্ত করে নিতে চাইছিল নিজের দুর্বলতার ভিত্তি ? আর—[illegible] জন্যেই কি গাড়ির আলো নেবাবার কথায় ভয় পেয়েছিল সে ?

একটা অর্থহীন কল-কোলাহলে রঞ্জুর সমস্ত ভাবনাগুলো যেন একাকার হয়ে গেল।

বারো

আরো ছ মাস ? ছ মাস, না আরো কম ? ঠিক খেয়াল নেই, ভালো করে মনে পড়েনা এতদিন পরে। নানা রঙের দিনগুলি পাখা মেলেছে, উড়ে গেছে ঝড়ের বাতাসে। উনিশ শো তিরিশ সালের বন্যা—তেরশো তিরিশ সালের বন্যা। জীবনে বন্যার বেগ এসেছে, এসেছে খরপ্রবাহ।

সুতপা ! একটা রাত্রির আশ্চর্য স্বপ্ন যেন। এখনো ঠিক বোঝা যায় না সেদিন সে কথাগুলো সে সত্যি সত্যিই শুনেছিল কিনা !

তারপরে আর দেখা হয়নি, দেখা করবার সুযোগও ঘটেনি। টাইফয়েড্ থেকে ওঠবার পরে সুতপা চলে গেছে দেওঘর, সে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল। কিন্তু বেণুদার দিকে আজকাল সে তাকায় একটা নতুন প্রশ্ন নিয়ে, তার অর্থ বোধ করতে চায় একটা নতুন জিজ্ঞাসার আলোকে। কেন যেন মনে পড়ে যায়—বহুদিন আগেকার

একটা রাত্রির কথা। গোয়েঙ্কা সাহেবের কুঠিবাড়ি থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সেই গান: "করুণাময়, মাগি শরণ।" সেই অসহায় বেড়ালের ছানাটাকে খানা থেকে কুড়িয়ে বুকে তুলে নেওয়া, পাথরের আড়াল ভেঙে ফুটে ওঠা একটা ফুলের মতো অপরূপ কোমলতা। মনে হয় সেদিনকার সে ব্যবহারের যেন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে— যেন কী একটা সঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে তার।

আর স্বতপার সেই আংটি দেওয়া। সেকি শুধু পার্টির জন্যে সর্বস্ব দেবার আকুলতা? অথবা আরো কিছু আছে তার আড়ালে, আরো কোনো গভীরতর আত্ম-নিবেদন? শুধু আংটি দেওয়া, না সেই সঙ্গে—

রঞ্জু নিজের মনকে শাসানি দিলে একবার। এ শুধু অনধিকার চর্চা নয়, পাকামিও বটে। হালে কতগুলো বাংলা উপন্যাস পড়ে এইগুলো আজকাল ডাল পাকাচ্ছে তার মগজের মধ্যে। এসব ভুলে যাওয়া উচিত। সৈনিক, শুধু কাজ করো, শুধু নেতার আদেশ পালন করো। যদি ক্লান্ত লাগে, জেনো নিজের দুর্বলতা; যদি কোনো ব্যাপারে সংশয় জাগে, জেনো সে তোমার বুদ্ধির বাইরে।

অনেকদিন কবিতা লেখেনি। আজ আবার কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসল। কিন্তু কিছু আসছে না। দুলাইন লিখল, কেটে দিলে আবার। একটা নতুন ছন্দ গানের সুরের মতো গুনগুনিয়ে উঠছে—

দূর গিরি-সঙ্কট দুর্গম পথরেখা একা পথে শঙ্কিত যাত্রী,
তবু তো ইন্দ্র রাগে রঞ্জিত গিরিচূড়া অবসিত দুর্যোগ রাত্রি—

নাঃ—এ শুধু কথা—এতে প্রাণ নেই। শব্দের ঝঙ্কার কানে আসে, মন দোলায় না। দুর্গম পথে একক যাত্রীর মনেও কি তেমন করে দোলা লাগে না আর?

— March on, march on friend—there calls the martyr's heaven—

ভালো কথা, করুণাদি ডেকেছিলেন। আজকাল করুণাদি যেন মন থেকে সরে গেছেন খানিকটা। সরে গেছেন—না নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বলা শক্ত। কোথায় একটা ব্যবধান এসে যেন আড়াল করে ধরেছে শক্ত হাতে। কার দোষ? রঞ্জুর? বেণুদার বোন কি বিপ্লবীর পথচলাকে মেনে নিতে পারেননি মন থেকে?

তবু একবার ঘুরে আসা যাক।

বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ করে বৈঠক করছিলেন বেণুদা। দাদারা সবাই এসেছেন—এ আলোচনায় ওরা যোগ দিতে পারে না, এটা গুপ্ততার ব্যাপার। একটা থমথমে গাম্ভীর্য সকলের মুখে। রঞ্জু বুঝতে পারে। চারদিক থেকে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে একটা। সেই ডাকাতিটার পরে পুলিশের তাণ্ডব চলছে অবিরাম, এর মধ্যেই বার তিনেক সার্চ হয়েছে বেণুদার বাড়ি। দলের আট দশজন ছেলে হাজতে। বেণুদাকে এখনো ধরেনি, বোধ হয় আরো উদ্যোগ আয়োজন করে জাল গুটোবার মতলব আছে ধরেবেঁধে। সবাই সেটা জানে। কাজেই ঘন ঘন জরুরি বৈঠক বসছে আজকাল। কী করা যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। টাকা দরকার—দরকার অর্গানাইজেশনকে আরো শক্ত করা। তাই কোনো প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে বোধ হয়।

বেণুদা বললেন, ভেতরে যাও।

শীতের রোদে স্নান করা সকাল। মিষ্টি নরম রোদ। বারান্দায় সে রোদ পড়েছে, আর সদ্যোস্নান করা চুল এলিয়ে দিয়ে রোদের দিকে পিঠ করে কী যেন সেলাই করছেন করুণাদি।

—করুণাদি?

—রঞ্জন? এসো—হাসিমুখে অভ্যর্থনা এল।

—আমাকে ডেকেছিলেন?—মাদুরের একপাশে রঞ্জু বসে পড়ল।

—হাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। পিঠে করেছি কাল রাত্রে, ভাবলাম ব্রাহ্মণ ভোজন না করালে পুণ্য হবে না।

—তাই বেছে বেছে আমাকে বুঝি ব্রাহ্মণ পেলেন?

—তা বইকি। বেশ ছোটখাটো ব্রাহ্মণ—অগস্ত্যের মতো খায় না, কিন্তু খেয়ে খুশি হয়।

রঞ্জু হাসল: পরিমল শুনলে কিন্তু চটে যাবে।

—ওই হতভাগা?—করুণাদি সস্নেহে বললেন, ওর কথা আর বোলো না। ওকে ডাকতে হয় না, আপনিই এসে জুটে যায়। কাল রাত্রে এসে অর্ধেক সাবাড় করে গেছে।

—বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে? কী বিশ্বাসঘাতক।

—ওই তো। চিনে রাখো কেমন বন্ধু তোমার—হেসে করুণাদি উঠে গেলেন।

রঞ্জু ভাবতে লাগল। এখানে এসে হঠাৎ যেন মনে হল আবার ফিরে পেয়েছে বাড়ির স্নিগ্ধতা, সেখানকার মমতা ভরা নিবিড় আশ্রয়—যা ছিল মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত। এখন আর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। ঠাকুরমার কান্না অসহ্য লাগে। সমস্ত একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে, দুমাস থেকে বাবার চিঠিপত্র আসে না, শোনা যায় আজকাল নাকি যোগ-সাধনা শুরু করেছেন তিনি।

আজ বড় ভালো লাগল এখানে। আরো ভালো লাগল—অনেকদিন পরে যেন আবার খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছেন করুণাদি। সেই পুরোনো হাসি, সেই স্নেহের স্নিগ্ধ উত্তাপ, সকালবেলাকার মিষ্টি নরম রোদের মতো কবোষ্ণ মাদক অনুভূতি।

করুণাদি পিঠে নিয়ে এলেন।

—এত?

—খেয়ে নাও।

—পারব না তো।

—আর দর বাড়াতে হবে না—খেয়ে নাও।—করুণাদি ধমক দিলেন।

খেতে খেতে উঠোনের দিকে তাকালো রঞ্জু। এক কোণে কতগুলো গাঁদা ফুল ফুটেছে—এত রাশি রাশি ফুটেছে যে পাতাগুলোকে পর্যন্ত যেন দেখা যায় না। শিশিরে ভিজে ভিজে ফুলগুলো, সকালের রোদ এখনো সে শিশির শুকিয়ে নিতে পারেনি। কতগুলো পায়রা ঝিমোচ্ছে

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। ইঁদারার ধারে একটা পেঁপে গাছ, তিন চারটে শালিক কিচির মিচির করছে তার ওপরে।

শান্তি, বিশ্রাম। যেন করুণাদি তাঁর নিজের চারপাশে একটা মধুচক্র রচনা করে রেখেছেন। আর বাইরের ঘর। এর একেবারে বিপরীত। বাইরের সূর্যের আলোকে রুদ্ধ করে দিয়ে, এই গাঁদা ফুলে ভরা ভোরের শিশিরকে অস্বীকার করে সেখানে একটা আগ্নেয় পরিবেশ। জটিল তর্ক, কুটিল সমস্যা। সুন্দর স্নেহভরা ঘরের মোহ নয়, ঝড়ের ঝাপটা-লাগা সমুদ্রের ডাক; পায়রার খুঁটে খুঁটে খুদ খাওয়া নয়, কাঁটার পথ দিয়ে রক্তাক্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলা।

—জানো, আমি চলে যাচ্ছি।

গলায় গিঠে আটকে গেল রঞ্জুর, কেবল একটা অবাক শব্দ।

—হাঁ, সত্যিই চলে যাচ্ছি।

রঞ্জু চকের পলকে খাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নিলে: যাঃ।

—না, মিথ্যে কথা বলিনি। সকালের নরম রোদে ভারী করুণ আর ক্লান্ত মনে হল করুণাদির চোখ: চলে যেতেই হবে ভাই, থাকতে পারব না।

—কিন্তু কোথায় যাবেন?

—কোথায়?—করুণাদি প্রাণহীন একটা নীরক্ত হাসি টেনে আনতে চেষ্টা করলেন ঠোঁটের আগায়: কেন, আমার শ্বশুর-বাড়িতে। মেয়েমানুষকে বিয়ে হলে যেখানে যেতে হয় সেখানেই।

তা বটে। এর ওপর কোনো কথা চলে না, যে কোনো প্রশ্নই অবান্তর মনে হয়। কিন্তু এর জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না রঞ্জুর বোধের মধ্যে। করুণাদিরও শ্বশুর বাড়ি আছে, যেখানে মাথায় একগলা ঘোমটা টেনে তাঁকে সংসারের কাজকর্ম করতে হবে, পরিচর্যা করতে হবে স্বামীপুত্রের, যেখানে করুণাদি অতি সাধারণ—একেবারেই সাধারণ।

—ওঃ, জানতাম না।—নির্বোধের মতো উচ্চারণ করলে রঞ্জু। কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে। জলন্ত রৌদ্রের মধ্যে, অতি প্রখর আগুনের কণার বালুছড়ানো দিগ্‌বিস্তার মরুভূমির পথ দিয়ে আজ যাত্রা শুরু হয়েছে। ক্লান্তি লাগে মাঝে মাঝে, আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় আকুলি-বিকুলি জাগে মনের মধ্যে। সেই আশ্রয় সে পেয়েছিল করুণাদির মধ্যে, মরুভূমির মধ্যে ছায়ার দাক্ষিণ্য দিয়েছিল এই পান্থ-পাদপ।

—রঞ্জু?

ধরা গলায় করুণাদি ডাকলেন।

চোখ তুলতে পারল না রঞ্জু। ওই গলার স্বর সে চেনে, ওর সঙ্গে তার মনের আড়ালে সেই গূঢ় অপরাধবোধটা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

—আমি চলে যাচ্ছি ভাই। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না গিয়ে আর উপায় নেই আমার।

নীরবতা। শিশির-ভেজা গাঁদা ফুলগুলোতে ঝিকমিক করছে সোনার মতো একটা উজ্জ্বল দীপ্তি। তেমনি ধান খুঁটে খুঁটে [illegible]।

অবশেষে করুণাদি বললেন, তোমাকে একটা কথা অনেক দিন ধরে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি। হয়তো আজ ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু সারাক্ষণ আমার বুক কাঁপে। যে আগুনে সারাক্ষণ আমি জ্বলছি, ভয় করে একদিন সে আগুনে তোমরা জ্বলে না যাও।

সেই পুরোনো কথা। সেই দুর্বোধ্য ইঙ্গিত।

রঞ্জু মাথা নত করে বসে রইল। ব্যথিত একটা জিজ্ঞাসা এসেছে গলার কাছে, আকুলতার একটা আবেগ রণরণিয়ে উঠেছে রক্তের গভীরে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায় না, শুধু আচ্ছন্নের মতো বসে থাকতে হয় চুপ করে।

—কাল আমি চলে যাব। হয়তো কোনোদিন আর দেখা হবেনা তোমার সঙ্গে।—কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল করুণাদির গলা: কিন্তু কথাটা মনে রেখো ভাই। সব পথ সকলের জন্যে নয়। পারো তো বেরিয়ে চলে এসো—এই আগুনের ভেতর থেকে, বাঁচতে চেষ্টা কোরো গুণীর মতো, শিল্পীর মতো। মরতে পারা সবচেয়ে সহজ কিন্তু মহৎ হয়ে বাঁচতে জানা তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন।

বিহ্বলভাবে মাথা নীচু করে তেমনি বসে রইল রঞ্জু। তারপর যখন চোখ তুলল রঞ্জু, তখন দেখল সামনে করুণাদি নেই। কানে এল ঘরের ভেতর কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অসহায় যন্ত্রণায়।

দু কান ভরে সেই কান্না আর বুক ভরে সেই যন্ত্রণা—সেই দুর্বোধ্য যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সকালের সোনার আলো চোখের সামনে কালো হয়ে গেছে তার। সামনে মরুভূমির পথটা ধুধু করছে—পান্থপাদপের বন—ছায়ার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও।

পরিমল খবর দিলে পরের দিন। করুণাদি চলে গেছেন সকালের ট্রেনে। যাওয়ার আগে আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন রঞ্জুকে, করে গেছেন তার কল্যাণ কামনা।

মাকে হারানোর ব্যথাটা যেন বুকের মধ্যে আবার মোচড় দিয়ে উঠল তার। যাওয়ার সময় কেন সে একবার দেখা করতে পারল না করুণাদির সঙ্গে, নিতে পারল না তাঁর পায়ের ধুলো?

নাঃ—কিছু না ওসব। 'একলা চলো রে।' কোনো বন্ধন নেই বিপ্লবীর জীবনে। মোহ তুচ্ছ, মায়া অর্থহীন। ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে আজ শুধু বিচ্ছেদের হাহাকারই মুখরিত হচ্ছে দিকে দিকে।

'বন্দরের কাল হল শেষ!'

তারও পরের দিন রঞ্জুদের বাসার সামনে সাইকেলের একটা ঘণ্টা বাজল ক্রিং ক্রিং করে।

ইমাম আলী। ছাই রঙের কোট গায়ে সেই লোকটা।

ব্যঙ্গমিশ্রিত একটা কুটিল হাসি হাসলে ইমাম আলী: বড়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এখুনি আপনাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে আই-বি অফিসে।

ঝড়ের হাওয়া উঠল প্রথম। (ক্রমশ)



স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোয়েন্দা ও পুলিশ কর্ম্মচারী-হত্যার সংস্রবে পুলিশ চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের পুনরায় খোঁজ করিতেছিল—তাই তাঁহারা তিনজনে গুপ্ত জীবন যাপন করিতেছিলেন। চিত্তপ্রিয়ের নামে ছিল হত্যার অভিযোগ। আই. বি. ইন্‌সপেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বিপ্লবীরা এই সময় অতিশয় অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। নানা কারণে যতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে হত্যার আদেশ দেন। বিপ্লবীরা বহুবার তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করেন—কিন্তু বিফল হন। ইহাতে যতীন্দ্রনাথ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন এবং একদিন সঙ্কল্প করেন যে সেইদিনই তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সুরেশ মুখোপাধ্যায়ের হত্যার সংবাদ না পাইলে আর জলগ্রহণ করিবেন না।



মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

তাঁহার এই সঙ্কল্পে বিপ্লবীরা বিচলিত হইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে হত্যার অভিপ্রায়ে নানা দলে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বিপ্লবীরা সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বড়লাটের আগমন উপলক্ষে আবশ্যক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় সেইদিন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তখন চিত্তপ্রিয় হেদোর নিকট কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর প্রকাশ্য স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন এবং নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন অপেক্ষাকৃত রহিলেন একটু দূরেই। তাঁহাদের আশা ছিল যে, হত্যার অভিযোগ যাঁহার নামে আছে, চিত্তপ্রিয়ের মত সেইরূপ একজন আসামীকে সম্মুখে দেখিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার প্রলোভন সুরেশ মুখোপাধ্যায় সহজে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তখন প্রলুব্ধ হইয়া তিনি সেখানে থামিলে তাঁহারা তিনজনে তাঁহাকে নিহত করিবেন।

সত্যই শিকার ফাঁদে পড়িল। চিত্তপ্রিয়কে দেখিতে পাইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি চিত্তপ্রিয় কিনা। চিত্তপ্রিয়ের মুখে "হ্যাঁ" উত্তর পাইয়া সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে ধরিতে যাইতেই চিত্তপ্রিয়ের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল; কিন্তু গুলি করিবার পূর্ব্বেই সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলায় গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন নিকট হইতে মনোরঞ্জনও গুলি নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে সুরেশচন্দ্র ভূতলশায়ী হইলেন। চিত্তপ্রিয়ের নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় গুলিতে সুরেশচন্দ্রের বক্ষ বিদ্ধ হইল। এইভাবে একটি জনবহুল রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গী জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারী ভয়ে ডাষ্টবিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বক্ষশোণিতে পিস্তলের মুখ রঞ্জিত করিয়া লইয়া শূন্যে গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিপ্লবী তিনজন পলায়ন করিলেন এবং যতীন্দ্রনাথের গুপ্ত গৃহে উপস্থিত হইয়া সাফল্যের সংবাদ ঘোষণা করিলেন।

বেলিয়াঘাটা ট্যাক্সি ডাকাতির পর পাথুরিয়াঘাটায় একটি বাড়ীতে সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ যখন অবস্থান করিতেছিলেন—তখন নীরদ হালদার নামক একজন গোয়েন্দা বাড়ীটির সন্ধান পাইল। ১৯১৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সে যতীন্দ্রনাথের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাড়ীটির ভিতরে প্রবেশ করিল। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন শায়িত অবস্থায় এবং তাঁহার পার্শ্বে দুইজন সঙ্গী উপবিষ্ট ছিলেন। নীরদ হালদারকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই যতীন্দ্রনাথ তাহাকে গুলি করিবার আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। ইহার পর জিনিষ-পত্র লইয়া অতি দ্রুত সঙ্গিগণসহ যতীন্দ্রনাথ বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। নীরদ হালদারের কিন্তু তখনও মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে সে যতীন্দ্রনাথের নাম বলিয়া যায় এবং তাঁহার সঙ্গীদের চেহারার বর্ণনা দেয়। তাহা হইতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, ঘটনার সময় চিত্তপ্রিয় ও নীরেন্দ্রই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন এবং নীরদ হালদার সম্ভবতঃ নীরেন্দ্রের গুলিতেই নিহত হইয়া থাকিবে।

যাহা হউক, উক্ত ঘটনার পর যতীন্দ্রনাথের কলিকাতা ত্যাগ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করা হইলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অপরাপর সঙ্গীদেরও

কলিকাতা ত্যাগের ও নিরাপত্তার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে না জানিতে পারিলে তিনি যাইতে পারিবেন না। ইহারই কয়েকদিন পরে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে তিনি পূর্ব্বকথিত চারিজন সঙ্গীসহ বালেশ্বরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। বালেশ্বরের পথে তিনি মেদিনীপুরের এখানে-ওখানেও কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পুলিশ কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহও করিল। তাহারা জানিতে পারিল যে, যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও অতুল ঘোষ শ্রমজীবী-সমবায় নামে একটি স্বদেশী বস্ত্রালয়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রামচন্দ্র মজুমদার নামক দুইজন মালিকের সহিত তাঁহাদের দোকানে বহু পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র রাখিবার জন্য আলোচনা চালাইতেছেন। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে জাহাজ হইতে অস্ত্রাদি নামাইবার ব্যবস্থার বিষয়ও জুলাই মাসে পুলিশ জানিয়া ফেলিল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বিত হইল। "মেভারিক" জাহাজ শেষ পর্য্যন্ত আর আসিয়া পৌঁছায় নাই। মাল-পত্র না লইয়াই জাহাজখানি ক্যালিফোর্ণিয়া হইতে বাহির হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, "অ্যানি লার্সেন" নামক আর একখানি জাহাজ হইতে পথিমধ্যে অস্ত্রাদি তুলিয়া লইয়া উহা বাংলায় আসিবে; কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক "অ্যানি লার্সেন" ধৃত ও উহার অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত হয়; ইহার ফলে "মেভারিক" জাহাজও আর আসিতে পারে নাই। হেলফারিকের নিকট হইতে পুনরায় সংবাদ পাওয়া যায়—পাঁচ হাজার রাইফেল, গুলি-বারুদ ও এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু পুলিশ ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া রীতিমত ধরপাকড় আরম্ভ করিয়া দিল। বাংলার অবস্থা জ্ঞাত করাইয়া হেলফারিককেও সাবধান করিয়া দিবার জন্য বোম্বাই হইতে বিপ্লবীরা তারে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন তাঁহার নিকট। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করিবার মানসে অপর একজন সঙ্গীসহ নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া যাত্রা করিলেন।

ইহার পর সাংহাইস্থিত জার্ম্মাণ কন্‌সাল জেনারল কর্ত্তৃক আরও দুইখানি অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ রায়মঙ্গল (হাতিয়া?) ও বালেশ্বরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়—কিন্তু তাহাও শেষ পর্য্যন্ত আসে নাই। "হেনরী এস" নামক আর একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ অস্ত্রাদি লইয়া ম্যানিলা হইতে ভারতে যাত্রার পূর্ব্বেই ধৃত হয়। দুইজন চীনাম্যান কাঠের তক্তার মধ্যে গোপনে কতকগুলি পিস্তল ও বহু গোলা-বারুদ লইয়া আসিতেছিল শ্রমজীবী-সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। নীলসেন নামক একজন জার্ম্মাণের নির্দ্দেশেই তাহারা এই কাজ করিতেছিল। সাংহাই-এর মিউনিসিপ্যাল পুলিশের দ্বারা ধৃত হওয়ায় তাহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চন্দন-নগরে পলাইয়া যান। রাসবিহারী বসু ও অবিনাশচন্দ্র রায় তখন নীলসেনের বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইবার বহু [illegible] নাই। যে অবনী মুখোপাধ্যায়কে জাপানে পাঠান হইয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি সিঙ্গাপুরে ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যও আমেরিকায় "মেভারিক" জাহাজযোগে পলাইয়া যাইবার পর ধৃত হইলেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাটাভিয়া গমন করিলে তাঁহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ না পাইয়া বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অপর একজন যুবক পর্ত্তুগীজ অধিকৃত গোয়া হইতে তারে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে পুণা জেলে ভোলানাথ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

মহানদী যেখানে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে, বালেশ্বরের সেই স্থানের জঙ্গলের মধ্যে জাহাজের প্রতীক্ষায় যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন সঙ্গীসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দলের সন্ধানে পুলিশ তখন চতুর্দ্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছিল। মার্চ্চ



নীরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

মাসের শেষাশেষি পুলিশ জানিতে পারিল যে, বালেশ্বরের কোনও স্থানে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন।

ভারত-জার্ম্মাণ ষড়্‌যন্ত্রের তথ্যাদি পুলিশ যাহা জানিতে পারে, তাহার ফলে ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিপ্লবীদের আড্ডা "হ্যারি এণ্ড সন্স" নামক দোকানটিতে খানা-তল্লাস হয় এবং কলিকাতার একদল গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার বালেশ্বরে গিয়া সেখানে "ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়াম" নামক "হ্যারি এণ্ড সন্সের" একটি শাখা অফিসেও ৪ঠা সেপ্টেম্বর তল্লাসী করে। এই প্রসঙ্গে অনেক বাঙ্গালী যুবকও ধৃত হয়। তাহার নিকট পুলিশ সংবাদ পায় যে, ময়ূরভঞ্জের নিকটস্থ পার্ব্বত্য জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথ আত্মগোপন করিয়া আছেন। বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবি কলিকাতার দুইজন পুলিশ

অফিসার মিঃ টেগার্ট ও মিঃ বার্ডকে সঙ্গে লইয়া ময়ূরভঞ্জের মহলদিয়াতে ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে উপস্থিত হইলেন।

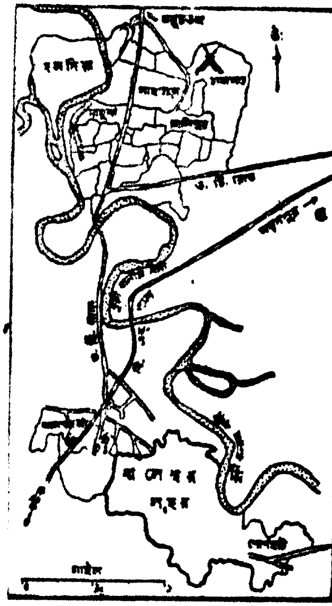
লোকের নিকট হইতে জানা গেল যে, কয়েকজন বাহিরের লোক কিছুদিন হইতে ঐ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। একজন লোককে সঙ্গে লইয়া তখন সেই বাহিরের লোকদের আস্তানার দিকে পুলিশ অগ্রসর হইল। এক বস্তীর সংলগ্ন একখানি ঘর দূর হইতে দেখাইয়া পথপ্রদর্শনকারী লোকটি এক সময় থামিয়া পড়িল। পুলিশ সাবধানে অগ্রসর হইয়া দেখিল কুটীরের দ্বার রুদ্ধ। বহু তোড়জোড় করিয়া অস্ত্র উঁচাইয়া পুলিশ বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দিলেও দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধই রহিল। তখন দরজা খুলিবার সামান্য চেষ্টা করিতেই দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখা গেল, ভিতরে কেহ নাই। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পুলিশ কাপ্তিপদার জঙ্গলে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে চলিল।

গভীর রাত্রিতে যতীন্দ্রনাথ লোক মারফত সংবাদ পাইলেন, তিনজন সাহেব হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার কুটীর হইতে কাপ্তিপদার দিকে গিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গী চতুষ্টয় সকলেই একই স্থানে থাকিতেন না। তিনজন থাকিতেন মহলদিয়ায় ও দুইজন থাকিতেন প্রায় বারো মাইল দূরবর্ত্তী তালদাধ নামক স্থানে। কাপ্তিপদা বালেশ্বর হইতে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যতীন্দ্রনাথ রাত্রিকালেই সংবাদ দিয়া তালদাধে লোক পাঠাইয়া কুটীর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইবেন—তাহাও তিনি লোক মারফত বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।

কাপ্তিপদায় বিপ্লবীদের ঘাঁটি তল্লাস করিয়া পুলিশ সুন্দরবনের একখানি মানচিত্র এবং পেনাং হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্রের কাটিং পায়। উক্ত কাটিং-এ "মেভারিক" জাহাজের খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ৮ই তারিখ সারা দিন ও রাত্রি তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া পলাইয়া বেড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর সকালে তাঁহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া খাদ্য গ্রহণের আশায় একটি দোকানে উপস্থিত হইলে সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিল যে, সেই অঞ্চলে তৎকালে অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলির সহিত তাঁহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নহে, সুতরাং অবিলম্বে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। যতীন্দ্রনাথের দল আত্মপক্ষ সমর্থনে জানাইলেন, তাঁহারা শিকারী এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের কথা অনেকেই বিশ্বাস করিল না। দূরে দূরে থাকিয়া একদল লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

জনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বন্দুকের আওয়াজে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরঞ্জন বন্দুক ছুঁড়িলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে একজন আহত হইল। ইহার ফলে লোকের সন্দেহ গেল আরও বাড়িয়া এবং মধ্যে অধিকতর ব্যবধান রাখিয়া তাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পুলিশও আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্যোতিষ পাল সহসা আহত হইয়া পড়ায় স্থানান্তরে পলায়নও আর সহজ হইল না। তখন নিরুপায় বাঘা যতীন সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদী-তীরে চাষাখন্দ নামক গাঁয়ে পরিখা খনন করিয়া অতি দ্রুত রণক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যগণ লইয়া জঙ্গল ঘেরাও করিয়া ভীষণভাবে আক্রমণ সুরু করিলেন। উভয়পক্ষেই গুলি-বিনিময় চলিতে লাগিল। একদিকে প্রায় তিন শত সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য—আর অপরদিকে সামান্যমাত্র অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাঁচটি বাঙ্গালী



চাষাখন্দের রণক্ষেত্র

বীর যোদ্ধা! যুদ্ধ চলিল শক্তিশালী ও দুর্ব্বলে—কিন্তু বিক্রমে পাঁচজনই তিন শতের সমকক্ষ হইলেন।

ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিতে থাকায় সহসাই একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের উরুদেশে বিদ্ধ হইল; তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াই সমান তেজে লড়াই চালাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্তপ্রিয় সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইতে গেলে আর একটি গুলি আসিয়া যতীন্দ্রনাথের পেটে বিদ্ধ হইল। গুরুতর আঘাতে তিনিও আহত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সাদা রুমাল উড়াইবার নির্দ্দেশ দিলেন। নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জন ইহাতে খুব আপত্তি জানাইলেন—এইভাবে আত্মসমর্পণের তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু অবশিষ্ট অমূল্য জীবনগুলিকে বৃথা মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে যতীন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক

হইলেন। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—উহাই তাঁহাদের নেতার আদেশ, সুতরাং তাঁহাদিগকে উহা মান্য করিতেই হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সাদা নিশান ঊর্দ্ধে তুলিতে হইল। সমাপ্ত হইল চাষাখন্দের সংগ্রাম।

চিত্তপ্রিয় রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আহত অবস্থায় যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ গ্রেপ্তার হইলেন।

হাসপাতালে নীত হইয়া যতীন্দ্রনাথ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টেগার্ট সাহেব স্বয়ং একগ্লাস জল লইয়া যতীন্দ্রনাথকে দিতে গেলেন; কিন্তু যতীন্দ্রনাথ উহা পান করিলেন না। যাঁহার রক্তে তিনি চাহিয়াছিলেন নিহত বিপ্লবীদিগের তর্পণ করিতে—তাঁহার দেওয়া জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

জীবিত সঙ্গীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, সকল কিছুর জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। বাঙ্গালীদের জন্য তিনি তাঁহার বাণী দিয়াছিলেন,—"Tell the people of Bengal that Chittapriya Rai and I sacrificed our lives in vindicating the honour of Bengal."

টেগার্ট সাহেবও এই অধীন দেশের ঐ অসমসাহসী তেজস্বী বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; তাই পুলিশ-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন,—"I had to do my duties, but I have a great admiration for him. He was the only Bengalee who died fighting from a trench."

বালেশ্বরের হাসপাতালে আহত অবস্থায় আনীত হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পরেই যতীন্দ্রনাথের দেহাবসান হয়। বিচারে নীরেন্দ্র ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির আদেশ হইল এবং সেই আদেশ কার্য্যকরী করা হইল কটক জেলে। জ্যোতিষের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। আন্দামানে গিয়া পীড়নে ও পরিশ্রমে জ্যোতিষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় এবং তাঁহাকে পুনরায় এদেশে আনা হয়। পরবর্ত্তীকালে বহরমপুর (মতান্তরে রংপুর) জেলে থাকাকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নদীয়া জেলার খোকসা গ্রামে জ্যোতিষের বাড়ী ছিল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে বাংলার পাঁচটি বীর সন্তানের ইহাই অতুলনীয় অবদান। বাঙালী ভীরু, বাঙালী কাপুরুষ—এই হীন প্রচারণার বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁহারা বুড়ী-বালামের তীরে চাষাখন্দ-রণক্ষেত্রে চিরকালের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহা অনন্তকাল ধরিয়া জাতিকে যোগাইবে দুর্জ্জয় সাহস এবং প্রেরণা। তাঁহাদের অমর স্মৃতি জাতির নিকট হইয়া থাকিবে চিরন্তন অমূল্য সম্পদ।

যাহা হউক, ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হইল আরও কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। পুলিশ সাব্-ইন্‌স্পেক্টর গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় নিহত হইলেন এবং আর একজন হইল আহত। ময়মনসিংহে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ও তাঁহার পুত্র প্রাণ হারাইলেন।

১৯১৬ সালে পুলিশের তৎপরতায় বহু বিপ্লবী ধৃত হইলেন এবং বহু ষড়্‌যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হইল।

১৯১৭ সালে বাংলা গভর্ণমেণ্টের দমননীতি যখন চরম হইয়া উঠিল, তখন বিপ্লবীদের পক্ষে বাংলায় অবস্থান আর সম্ভব হইল না। যে সকল বিপ্লবী-নেতা তখনও ধৃত হন নাই, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, বাংলার বাহিরের কোনও কেন্দ্র হইতে গুপ্ত-আন্দোলন পরিচালিত করিতে হইবে। তদনুযায়ী গৌহাটিতে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল, এবং সেখান হইতেই বিপ্লবীরা কার্য্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। পুলিশ খবর পাইয়া একদিন সেই আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। বিপ্লবীরা সুকৌশলে সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কামাখ্যা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। পুলিশ সেখানেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের বাধিয়া গেল একটি খণ্ড-যুদ্ধ। শেষ পর্য্যন্ত দুইজন বিপ্লবী ব্যতীত প্রায় সকল বিপ্লবীই ধৃত হইলেন। যে দুইজন তখন পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নলিনী বাগ্‌চী ও প্রবোধ দাশগুপ্ত। প্রবোধ পরে ধরা পড়িয়াছিলেন। নলিনী কলিকাতায় আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সতীশচন্দ্র পাকড়াশী তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলেন। পুলিশের গুলিতে ঢাকায় পরবর্ত্তীকালে নলিনী প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তুর্ক-ইতালী যুদ্ধের সময় তুরস্কের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে অর্থ ও ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

যুদ্ধের সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারত আক্রমণের এক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল এবং উক্ত অভিযানে ভারতীয়গণেরও সাহায্যলাভের আশা করা হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যেই মৌলনা ওবেদুল্লা সিন্ধী কয়েকজন সঙ্গীসহ ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাবুলে যে তুর্ক-জার্ম্মাণ মিশন আসিয়াছিল—উহার সহিত তাঁহাদের এই বিষয়ে আলোচনা হয়। হেজাজের তুর্কী সামরিক গভর্ণর গালিব পাশাও এই আলোচনায় যোগদান করেন। স্থির হয় যে, বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া অস্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ভারত ত্যাগ করিয়াছিলেন ১৯১৪ সালের শেষের দিকে। তিনি ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং গদর-দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সহিত জেনেভায় তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জার্ম্মাণীতে কাইজারের সহিতও তিনি আলাপ করিয়াছিলেন। কাবুলে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

তাঁহাদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে লিখিত চিঠি-পত্রাদির কতকগুলি কোনওপ্রকারে বৃটিশের হস্তগত হয়। পত্রগুলি ছিল হরিদ্রাবর্ণের রেশ্‌মী কাপড়ের উপর লিখিত। সেই জন্যই এই ষড়্‌যন্ত্রকে "রেশ্‌মী চিঠি ষড়্‌যন্ত্র" বলা হইয়া থাকে। এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় ১৯১৬ সালে ফাঁস হইয়া যায় এবং এই সালের জুন মাসে ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান নেতা মক্কার শেরীফ তুর্কীদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করায় এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

(ক্রমশঃ)

বিয়ের আগে

শ্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ফল্‌টি লাভ, কোর্ট বদলে বাঁদিকের কোণ থেকে আবার সার্ভ করলে, আমার র‍্যাকেটে লেগে বল চলে গেল বাইরে, গেম্, লাভ্ গেম্, সেট্—হেসে বললে শিপ্রা।

লনের বাইরে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম শিপ্রা আর আমি—শিপ্রা বললে, একেবারে লাভ্ গেম্ খেলে!

হেসে বললাম, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধই তো লাভ্ গেমের লাভ্, পিওর লাভ। শিপ্রার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল; না ব্যারিষ্টারের মেয়ে শিপ্রা, এমন কথা দিনে চল্লিশবার অন্তত শোনে আমার মুখ থেকে।

ড্রাইভার—ডাকলে শিপ্রা। ড্রাইভার এল, শিপ্রা বললে, গাড়ি, এখনি বেরুব। লম্বা এক সেলাম ঠুকে চলে গেল ড্রাইভার।

নির্মল, ঠিক হয়ে নাও, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি—বলে তর তর করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল শিপ্রা, ছবির পর্দায় রূপমুগ্ধকে তাক লাগিয়ে নায়িকার হঠাৎ চলে যাওয়ার মত। ফিরে এল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, মুখে পাউডার, ঠোঁটে রুজ, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরণে ফিকে সবুজ ভয়েল সাড়ি, পায়ে ভেলভেট স্লিপার, একেবারে সোজা গিয়ে উঠল মোটরে। আমিও বসলাম শিপ্রার পাশে। গাড়ি ছাড়ল।

কোথায় যাবে?—প্রশ্ন করলাম।

কলকাতার বাইরে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে, যেখানে একঘণ্টা শেষ হবে, সেখান থেকেই ফিরব।

গাড়ি গতি নিয়েছে, গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের উচ্ছলতাও বেড়ে চলেছে হুহু করে, বললাম, দি আইডিয়া!

হেমন্তের শেষ, শীতের শুরু, ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক থেকে থেকে এসে লাগছে শিপ্রার অলকগুচ্ছের ওপর, সিঁথির আলগা চুলগুলো উড়ছে এদিক সেদিক। মোটর চলেছে হুহু করে শহর ছাড়িয়ে নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে, হেডলাইটের আলো আগিয়ে চলেছে কালো আঁধারের বুক চিরে।

কোমর থেকে পা পর্যন্ত আমাদের ঢাকা বিলিতি কম্বলে, মাথা এলিয়ে পড়েছে সিটের ওপর, শিপ্রারও, আমারও। শিপ্রার উড়ন্ত চুলের পরশ থেকে থেকে লাগছে আমার গালে, চোখে, মুখে। অনাত্মীয় সঙ্গীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে দেহের শুচিতা রক্ষার আড়ম্বর শিপ্রার নেই, শিপ্রা বলে, শুচিতা মনে...তাই লজ্জায় রাঙাও হয়ে ওঠে না কথায় কথায়। মুখে কোন ভাবান্তর নেই, একেবারেই স্বাভাবিক।

আমার দিকে তাকিয়ে শিপ্রা বললে, আমি এখন কি ভাবছি জান?

জানি।

কি বল তো?

যদি কেউ এখন বাদাম ভাজা বেচতে আসত!

মানে?

মানে, ভাবছ গাড়ি থামিয়ে তাহলে চারপয়সা কিনে খেতে কেমন মজা লাগত! তারপর বাদামগুলো ছাড়িয়ে খোসাগুলো দিতে উড়িয়ে চলন্ত গাড়ির বাইরে, চেয়ে থাকতে তাদের পানে, দেখতে বাতাসে উড়ে চলেছে তারা, কোথায়, কোন অজানায় কে জানে! শেষের কথাগুলো বললাম আবৃত্তির সুরে।

হাসল শিপ্রা, বললে, তুমিও কি ভাবছ আমি জানি। তুমি ভাবছ পথে যদি কোথাও মেলা বসত, গাড়ি থামিয়ে, নেমে, নাগরদোলায় কয়েক পাক দোল খেয়ে নিতে। আর সেই দোলার ছোঁয়াচ লাগত তোমার মনে, তোমার গানে, তোমার প্রাণে, কেমন? শিপ্রার শেষের কথাগুলোর মধ্যে আবৃত্তির সুর।

হেসে উঠলাম দুজনেই।

একটু থেমে গম্ভীর হয়েই শিপ্রা বললে, সত্যি, আমি কি ভাবছি জান? পৃথিবীর যদি কারও দুঃখব্যথা না থাকত, সবাই যদি হোত সুখী!

হঠাৎ এই অহেতুক উদারতা?—জিজ্ঞাসা করলাম।

অহেতুক নয়, বললে শিপ্রা। তুমি হয়তো বুঝবে না—গাড়ির গতি যখন আনে মনের মাঝে গতির দোলা, মনটা আপনা থেকেই হয়ে ওঠে উদার, অন্যের হয় কিনা জানিনে, আমার তো হয়। একটু থেমে আবার বললে, বাড়িতে,

ক্লাবে, কলেজে মনটা থাকে পঙ্গু হয়ে, বাড়তে পারে না। এই যে চলেছি, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, মনটা আপনা থেকেই বড় হয়ে যায়। পায়ে হেঁটে যখন চলি, নিজের ক্লান্তিতেই শ্রান্ত, পরের দুঃখ দূর করব কি। বাড়িতে কেউ দুঃখের কথা জানালে হাত ওঠে না, গাড়ির গতির মধ্যে হাতের চুড়িও খুলে দিতে পারি।

একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশের গায়, শীতের কুহেলি-মাখা আবরণ ঠেলে রাস্তা মাঠ গাছপালার আঁধার এখনও কাটেনি, আকাশের বুকে কালো নীলের ওপর শুভ্রতার একটু আভাষ শুধু।

কৌতুক করেই হেসে বললাম, বড়লোকের মর্জি, মোটরের স্পীড্ থামলে, লোকটাকে ডেকে চুরি করার অপরাধে জেলে দেবে না তো?

না—অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললে শিপ্রা।

দুজনেই মৌন, পাহাড়ের গুহায় ঝরণার উচ্ছলতা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার মত। গাড়ি চলেছে উদ্দাম গতিতে, কত দূর এসেছি জানি না, নির্জন রাস্তার বুক কাঁপিয়ে চলেছে গাড়ি, পাশ দিয়েই সমান্তরাল হয়ে চলেছে রেলের লাইন, দূরে সিগন্যালের লাল আলো ক্রমেই আসছে নিকটতর হয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, রাগ করেছ?

তোমার ওপর রাগ করার মত মনের অবস্থা এখন নয়।

অনুরাগ? আবহাওয়াটাকে হাল্কা করার উদ্দেশ্যে বললাম।

না।

তোমার মাকে আজই বলে দেব—তোমাকে আর যেন মোটরে বেড়াতে না দেন!

অপরাধ? অবজ্ঞার সাথে ঠাট্টা মিশিয়ে বললে শিপ্রা।

হাতের চুড়িগুলো তাহলে একগাছাও অবশিষ্ট থাকবে না।

তাতে তোমার ক্ষতিটা কি?

ক্ষতি? তা একটু আছে বৈকি! ভাবী-পত্নীর ওপর দায়িত্ব ভাবী-স্বামীর থাকা স্বাভাবিক শুধু নয়, প্রয়োজনীয়। সে যখন তোমার পত্নী হয়ে তোমার মোটরে চড়ে চুড়ি বিলিয়ে বেড়াব তখন বোলো, এখন বলা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অনধিকার চর্চাও।

শিপ্রার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, এটাও কি অনধিকার চর্চা?

জানিনে—বললে শিপ্রা।

তোমার রাগ এখনও পড়েনি তাহলে। একটু থেমে আবার বললাম, তোমার সাড়ির পাড়টা বেশ।

তোমার সার্টের কলারটা কিন্তু পাড়াগাঁয়ের পরিচয় দেয়, সেদিন কলেজে তন্দ্রাও বলছিল।

কি বলছিল?

তোমার মধ্যে পাড়াগাঁয়ের ভাব আছে।

চোখের তন্দ্রা টুটে গেলে আর বলবেনা।

ও না বললেও আমি বলব।

তুমিও বলবে না।

কি করে জানলে?

স্বামীর নিন্দে কি স্ত্রী করে, তাছাড়া তুমি আমায় ভালবাস।

ভালবাসি বলে খুঁৎ থাকলে বলতে পারব না?

শ্রদ্ধা না থাকলে ভালবাসা যায় না।

শিপ্রা নিরুত্তর, বাইরের দিকে চেয়ে কি ভাবছে যেন। মুখ ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে ছোট্ট মেয়েটির মতই শিপ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমিও শ্রদ্ধা কর আমায়?

করি না? তুমি আমার শিপ্রারাণী—বললাম আমি।

চাঁদের হাসির কণাগুলো এতক্ষণে গাছের মাথা থেকে পিছনে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, রাস্তায়, মাঠে। শিপ্রার আঁচল উড়ছে বাতাসে, চুলের মিষ্টি গন্ধ মনটাকে উদাস করে দিচ্ছে!

ড্রাইভার, ফিরে চল—আস্তে আস্তে বললে শিপ্রা, হাতঘড়িটা আর একবার দেখে নিলে।

দুবছর আগের কথা। কলকাতার বাইরে ছোট শহর, কলেজে পড়ি, থাকি হোষ্টেলে। কলেজের বাৎসরিক উৎসব, গান, আবৃত্তি, তর্কের সভা। কলকাতা থেকে মিষ্টার সেন, বার-এ্যাট-ল এসেছেন সেদিন—এক চাঞ্চল্যকর মামলায় আসামী পক্ষের ব্রীফ নিয়ে। ডাকবাঙলায় গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা হোল আমাদের তর্কসভার বিচারক হতে। রাজি হলেন তিনি।

সজ্জিত কলেজ প্রাঙ্গণ, মিষ্টার সেন এলেন। কলেজের

অধ্যক্ষ অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। শুরু হোল তর্ক, ইংরিজিতে। বিষয়, বিভিন্ন দেশের নারী-জাগরণ ও তার ফলাফল। নারী-জাগরণের শুভদিকটার প্রধান বক্তা আমি। আমার বক্তৃতা শুনে মিষ্টার সেন বলেছিলেন, এ রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গী কোন ছাত্রের তিনি শোনেন নি। আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার ভবিষ্যত গড়ে উঠবে হাইকোর্টে, আমিই তার ভার নেব, ওয়াণ্ডারফুল্ তোমার বলার ষ্টাইল্। আবার ঠিকানা নিলেন, পত্রালাপ চলল, তারপর একদিন সে কলেজ ছেড়ে ভর্তি হলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। থাকবার স্থান হোল সেন সাহেবের বাড়ি, একেবারে বাড়ির ছেলের মত। মিষ্টার সেন—শিপ্রার পিতা।

বন্ধুর বোন মালতী। সেই শহরের কলেজে পড়বার সময় তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, রূপও আছে, রুচিও আছে।

একদিন সন্ধ্যায় মালতী বললে, আপনি ভয়ানক ইয়ে।

ইয়েটা কি?—জিজ্ঞাসা করলাম হেসে।

লজ্জা নেই আপনার একটুও।

কেন?

আমার সামনে মাকে কি বলে বললেন—বিয়ে করবেন আমাকে!

বাঃ, তোমার মা যখন বলেন, নির্মলের সঙ্গে মালতীর বিয়ে হলে বেশ হয়!

মা বলে বোলে আপনিও বলবেন?

কেন, বিয়ে তো হবে, তুমিও জান, আমিও জানি।

জানি বলেই বুঝি বেহায়ার মত—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে—

বেশ, আমি খুব ইয়ে, করবনা তোমায় বিয়ে, হোল তো?—বলে হেসে তার হাত-দুটো ধরে বসিয়ে দিলাম সামনের চেয়ারে। আজ পড়া বুঝে নিলে না, কাল বুঝি মারের ভয় নেই ইস্কুলে?

পরণে নীলাম্বরী সাড়ি, গায়ে ঘন লাল ব্লাউজ, খোঁপায় করবীর মালা। মুখে লজ্জার দাগ এখনও মিলায়নি। সন্ধ্যা আসছে নেমে ধীরে—চোখে আমার স্বপ্ন, মালতীর স্বপ্ন। আবৃত্তির সুরে বললাম—

"কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁক নয়নে।"

তারপর বললাম—দেখ, বিয়ের পর একদিন ঠিক ঐ কবিতার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে কেতকীর পরাগে সুরভি হবে তোমার কালো চুল, কটিতে দুলবে করবীর মালা, বিছানায় কদম্বের রেণু, আর চোখে কাজল! দেখব, তোমার দেহের ছন্দে কবিতার ছন্দ।

আলগাভাবে বন্ধ দুয়ার আচম্কা বাতাসে খুলে যাওয়ার মত আবৃত্তির উচ্ছ্বাস আর তার ভাষ্যে মালতীর মনের দুয়োরটা একটু খুলল যেন। ছলছল চোখে চেয়ে মালতী বললে, নির্মলদা, এত সুন্দর আপনি বলতে পারেন, আমি কি আপনাকে সুখী করতে পারব?

আমি মালতীর হাতটা হাতে নিয়ে শুধু ডাকলাম, মালতী।

মালতী চোখ তুলে তাকালে।

দিদি, দিদি—ঘরে ঢুকল শান্তি, মালতীর ছ' বছরের বোন। উৎসাহের সুরে বললে—দিদি, বাবা আমায় ছবির বই দেবে বলেছে। তোমাকে দেবনা কিন্তু! শান্তিকে কাছে ডেকে আদর করে বললাম—দিদিকে দেবেনা, আমাকেও দেবেনা?

না, আপনাকেও না—জোর দিয়েই বললে শান্তি।

মালতীকে বললাম—বাবা, ছবির বই দেবে তাতেই শান্তির কত আনন্দ, আর মা তোমাকে আমার মত বর দেবেন, তাতেও তুমি ঝগড়া করছ আমার সঙ্গে।

বেশ করছি, ভারি ইয়ে আপনি, শান্তি রয়েছে না!

শান্তিকে ডেকে বললাম—শান্তি, মাকে গিয়ে বলতো, দিদি তোমার নির্মলদার সঙ্গে ঝগড়া করছে। ছুটল শান্তি, মালতীর মানা শুনলেনা।

মা এলেন। তখনি নয়, একটু পরে। ঝগড়া মেটাতে নয়, উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে। হেসে বললাম, দেখুনতো মা, মালতী ঝগড়া করছে আমার সঙ্গে। বিয়ের কথা বলেছি—আপনার কাছে তাই আমায় বলছে বেহায়া।

আবদারে ছেলের মত মালতীর মার সঙ্গে ব্যবহার করতাম। নিজের মার মতই দেখতাম তাঁকে।

মা হেসে বললেন, মালতীর কপালে এখন হলে হয়, উনি তো বলছিলেন, শ্রাবণেই যাতে হয়। তোমার বাবার মত হবে তো বাবা?

হবে না? বললাম আমি, এমন মেয়ে পাবেন কোথায়? আর মাতো বলেই দিয়েছেন, বিয়ে হবে আমার পছন্দ মত।

তাই যেন হয় বাবা—মনে মনে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করে মা চলে গেলেন।

লাফিয়ে উঠল মালতী—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে, আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

বিয়ে হলেও না?

না।

ফুলশয্যার রাতেও না?

না।

ভালই হবে, শ্রাবণের সেই বৃষ্টি-ভেজা রাতটিতে তুমি হবে মূক, আমি হব মুখর—বলে তার খোঁপার মালাটা টান দিয়ে খুলে নিয়ে পরলাম নিজের গলে। কেউ দেখে ফেলার আতঙ্কে শিউরে উঠে মালতী বললে—যান, আপনি ভয়ানক ইয়ে!—ঘর ছেড়ে চলে গেল মালতী।

শ্রাবণের আগেই এল কলেজের বাৎসরিক উৎসব, এলেন মিষ্টার সেন, গেলাম শিপ্রার সান্নিধ্যে।

•

আরও দু বছর আগে।

গাছপালা, পুকুর, মন্দির ঘেরা আমাদের গ্রাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও ঘনিয়ে আসেনি, গোধুলিরও আগে, আকাশের বুকে ভেসে যাওয়া সাদা মেঘগুলোর গায় আবির মাখানো যেন।

মা বললেন—নিমু, অনাদি ঠাকুরপোকে একবার দেখে আয়, কাল থেকে জ্বর হয়েছে। অনাদি ঠাকুরপো বাবার আত্মীয়, দূরসম্পর্কের ভাই।

নিমুদা, নিমুদা—হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল নন্দা। এ সময় ঘরে মার উপস্থিতির কথা ভাবেনি নন্দা। মাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নাম তার নন্দরাণী। আমি আর মা ডাকি নন্দা বলে।

কিরে নন্দা, হাঁপাচ্ছিস কেন, কি হোল?—মা জিজ্ঞাসা করলেন হেসে। একটু স্নেহের চোখেই মা নন্দাকে দেখেন।

কিছু নয়।—মার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে দাঁড়িয়ে রইল নন্দা।

আমি বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে অনাদি কাকাকে দেখতে যাবার জন্যে, পিছু পিছু এল নন্দা। রাস্তায় এসে বললে, নিমুদা, চলতো আমাদের বাড়ি, মা বলে কি, বড় হয়েছিস, রাতদিন ধেই ধেই করে নেচে বেড়ানো আর চলবে না।

বড় হয়েছে নন্দা! এতদিন লক্ষ্য করিনি তো! তাকালাম তার দিকে, দেখলাম মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত, চোখ এসে একটু যেন থমকে আটকে গেল তার বুকের প্রান্তে, চোখেও ভাষা ফুটেছে যেন! এমনিতে অনেকিছু চোখে পড়ে না—চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে না দিলে।

হেসে বললাম, তার জন্যে তোর মার সঙ্গে ঝগড়া করতে যেতে হবে নাকি?

হবেই তো!

মেটে রাস্তা, লোকজন নেই, সন্ধ্যার মায়া বুলানো গ্রামের পথ। দূরের কুটীর থেকে ভেসে আসছে মিটি-মিটি প্রদীপের রেখা। নন্দার হাতটা ধরে বললাম, শোন, লক্ষী মেয়ে হয়ে দিনকতক থাক না! নাইবা বেড়ালি পাড়ায় পাড়ায়? শুধু আমাদের বাড়ি আসিস, আর কোথাও যাসনে।

তুমি আসবে না আমাদের বাড়ি?

যাব না? নন্দার চোখে চোখ রেখে বললাম।

ঘনায়মান সন্ধ্যার শান্ত আকাশের নীচে এত আদরের ভাষণ নন্দা কখনও পায়নি আমার কাছে। চোখে তার লাগল উৎসাহের চমক, আমার চোখে তার বড় হওয়ার হঠাৎ দেখা ছবি!

মুহূর্ত্তের জন্যে চোখটা নামিয়ে নন্দা বললে, কি দেখছ আমার চোখে?

দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছিস তুই!

সেটা বুঝি চোখে লেখা থাকে?

চোখেই তো আসে তার প্রথম আভাষ।

অত কবিত্ব তোমার বুঝিনে নিমুদা—মানে, তুমিও মার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে চাও, নেচে বেড়ানো আর চলবে না, এই তো?

খুব যে কথা শিখেছিস? এখন যদি নাচতে হয়, নাচবি শুধু আমার সামনে, বুঝলি?

মাথাটা সে দুলিয়ে দিলে 'না' বলার ভঙ্গিতে, চোখেই প্রকাশ করলে ভাবটা, মুখে বললে, উঁহু। মাথা দুলিয়ে উঁহু বলাটা বড় সুন্দর লাগল চোখে, হাতটা ধরে আলগা-ভাবে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, দুষ্টুমি হচ্চে?

আবার মাথা দুলিয়ে বললে, উঁহু! মুখে সেই মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি। নন্দাকে দেখলাম নতুন রূপে, রূপকথার ঘুমন্ত মেয়েটা যেন সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। কাছে টানতে গেলাম, দূরে সরে গেল, মুখে সেই দুষ্টুমি-মাখা হাসির সঙ্গে মাথা দুলিয়ে বলা, উঁহু।

আগে হলে হয়তো বলত—ধ্যেৎ, এখন হাসির সঙ্গে উঁহু, ধরা দিতে আপত্তি নেই, ধরা পড়তে আপত্তি! বড় তাহলে সত্যিই হয়েছে নন্দা!......

নন্দা আরও বড় হওয়ার আগেই গ্রামের পাঠ সাঙ্গ করে করে এলাম ছোট শহরের বড় কলেজে।

শিপ্রার সাথে মোটর অভিযানের দু বছর পর।

শিপ্রার মন-তটে কুটীর বেঁধে বিলাত-ফেরত নবাগত তরুণ জয়ন্ত। মালতীকুঞ্জে গুঞ্জন করে কলেজ হতে নবাগত কমলেশ। আর নন্দা অভিনন্দন জানালে রমাপ্রসাদকে, জেল হতে নবাগত দেশভক্ত রমাপ্রসাদ।

আমি মালা দিয়েছি মিলার গলে, অপরিচয়ের অন্তরাল হতে নবাগতা শিক্ষিতা তরুণী মিলা।

বিছানায় ছড়ানো ফুলের রাশি—বেলা, যুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ, আরও কত কি। মিষ্টি একটা সৌরভ। ফুলশয্যার রাত। অপরিচয়ের আড়াল মনের আড়ালে কখন কি ভাবে খসে পড়ল—জানা গেল না। শিহরণ সমস্ত দেহে, স্বপ্নের আবেশ মনে। মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, বিয়ের আগে ভালবাসতে না কাউকে?

মিলাকে বুকের নিবিড়তায় টেনে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, নাঃ।

প্রশ্ন করলাম, তুমি?

একই উত্তর, নাঃ।

শঙ্খ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

সিন্ধুতলের গহন গুহায়
কবে তুমি জন্ম নিলে,
বাল্যে তুমি ইন্দিরা মার
সাঙ্গ্য খেলার সঙ্গী ছিলে।
কোথায় গভীর সিন্ধুপুরী
যারে রবির কর না চুমে।
কোথায় শ্যামল বধূরা
পল্লীভবন বঙ্গভূমে।
কে আনিল হেথায় তোমা
এলে তুমি কিসের তরে?
মৃত্যু পথের দুঃখে দহি
এলে যে এই লোকান্তরে।
রাঙা ঠোঁটের চুমায় তোমার
অঙ্গে আবার শিহর লাগে।
রক্ত পরশ পেয়ে ও শ্বেত
কঙ্কালে কোন জীবন জাগে।

অম্বুনিধির সুগম্ভীরা
সুপ্ত ধ্বনি আনলে বয়ে,
ও পঞ্জরে কম্বু তোমার
জাগে আবার পূর্ণ হ'য়ে।
বধূর মণিবন্ধ দুটি
বাঁধলে তুমি শ্রীবন্ধনে,
সেবা শোভা শুভের মাঝে
লক্ষ্মী মায়ের আমন্ত্রণে।
শঙ্খ তুমিই জানিয়ে দিলে
সিন্ধু-ভবন ছেড়ে এসে,
গৃহে গৃহে রাজেন হেথা
পদ্মালয়া হৃদয় বেশে।
লক্ষ্মী-ছাড়া হ'তে মরেও
চাওনি তুমি। কেউ না জানে
কেন এলে, কেউ জানে নি
এলে তুমি প্রাণের টানে

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

সানফ্রান্সিস্‌কোতে চীনেদেরও বেশ একটি বড় ঘাঁটি আছে—তাকে বলা হয় China Town। এই চীনে পল্লীর বাড়ীগুলি চীনদেশের

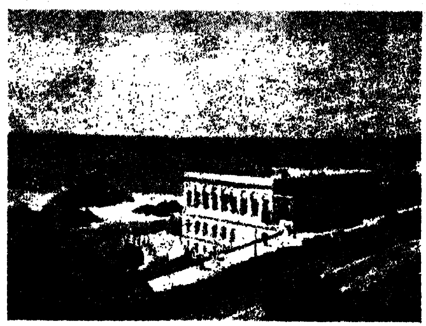


সানফ্রান্সিস্‌কোর চায়না টাউন



ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটি (ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিয়ন)

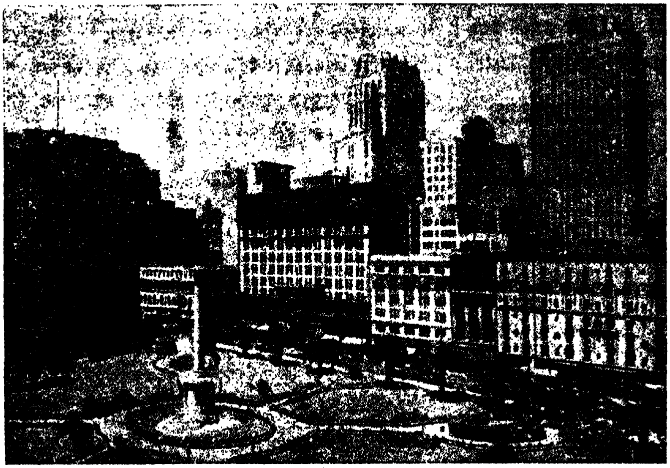
শিল্পানুকরণেই তৈরী। পল্লীর ভেতরে ঢুকলে মনে হয় চীনদেশে এলাম। চীন দেশের স্বাতন্ত্র্য ও শিল্প এখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাড়ী, ঘর, দোকান, রেষ্টুরেন্ট সবই তাদের দেশীয় কায়দায় সাজানো। আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের লোক তাদের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-গঠন করে বসবাস করছে এবং সবাই মিলে হয়েছে "আমেরিকান" জাতি। আমরা সমুদ্র-সৈকতে এসে নামলাম। প্রশান্ত মহাসাগর তীরে বালির



সানফ্রান্সিস্‌কো ক্লিফ হাউস ও শীলশৈল (সমুদ্র গর্ভের এই ছোট ছোট পাহাড়গুলিতে সর্ব্বদা শীল মাছ থাকে)

ওপর দাঁড়িয়ে মনে হলো—ঐতো ও পারেই আমাদের দেশ, আমরা ঘুরতে ঘুরতে ভারতবর্ষের কত কাছে এসে পড়েছি। মাঝখানে এই সাগরটুকুই যা ব্যবধান। সমুদ্রের পাড়ের কাছে অর্দ্ধজল-মগ্ন দুটী শীলা-খণ্ডের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বড় শীলাস্তুপটির উপর অসংখ্য শীল মাছ শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কতকগুলি আবার পাথরের গা-বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলে নামছে। পাশের আরেকটি শীলায় এক ঝাঁক Seagulf বসে আছে। শীতকালে শীল মাছগুলি জলের তলায় চলে যায় এবং পাখীর ঝাঁকও উড়ে পালায়; আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গেই এসে উপস্থিত হয়। এই সাগর তীরে বেড়াতে বেড়াতে কত নূতন দেশের মানুষের সাথে আলাপ পরিচয় হ'লো। আমেরিকার দক্ষিণ ষ্টেটেরও লোক দেখলাম। আমাদের এই ভারতীয় পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাদের কৌতুহল একটু অতি মাত্রায় দেখা যাচ্ছিল। সাঁচ্চা জরির সূক্ষ্ম কাজ ও সাঁচ্চা সিল্কের শাড়ী দেখে তারা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। এদেশে ক্যাসেট লোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। সকল দুঃখ ও সকল

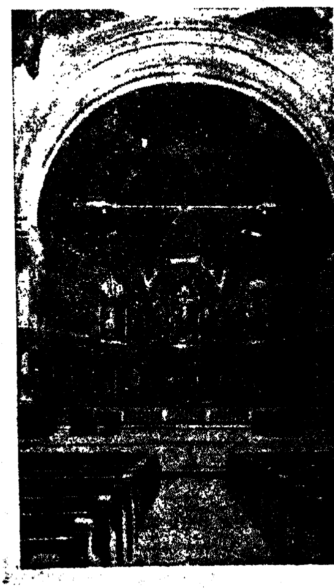
পাথরের ছড়া ছড়ি। মেয়েরা যথেষ্টই গহনা পরে থাকে। গলায় পরে মোটা শিকল প্যাটার্ণের হার, আর হাতে জড়ানো 'বিজ্ঞাপনের' মালা—



সানফ্রান্সিস্কো য়ুনিয়ন স্কোয়ার

অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানীর মার্কামারা জিনিষগুলি ছোট ছোট খেলনার মত তৈরী করে এই মালায় ঝোলানো। অনেকের সঙ্গেই যথেষ্ট আলাপ পরিচয় হ'লো, ছবি তোলা ও নাম ঠিকানার পালা শেষ হ'লে হোটেলের দিকে রওনা হ'লাম। আজ রাত ৮টায় Rotaryর প্রথম উদ্বোধন উৎসব দেখতে Civic Auditoriumএ গেলাম। হল ঘরে ঢুকে লোক দেখে অবাক। প্রায় বিশ হাজার লোক আসন অধিকার করে বসে আছে। সামনে একটা বিরাট ষ্টেজ, ষ্টেজের ওপরে ঝুলছে প্রকাণ্ড একখানি চক্রচিহ্নিত পতাকা। জমকালো পোষাক-পরা কণসার্ট-পার্টির বাজনা শেষ হ'লে নাচগানের পালা সুরু হ'লো। শেষে Californiaর Pagentry দেখান হোলো। কিছুক্ষণ যেন আমরা Californiaর প্রাচীন যুগের জীবন ধারার মধ্যে এসে পড়লাম। এই নিভৃতকোণের অজ্ঞাত স্থানটি কেমন করে সুসভ্য মানব সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমিতে পরিণত হ'ল তারই জীবন্ত ছবি চোখের সামনে যেন রূপায়িত হ'য়ে উঠলো। রাত প্রায় ১১টায় আমরা ফিরে এলাম।

১০ই জুন। San Franciscoতে আসার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল Californiaর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিন কয়েক বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করা। Rotary conventionএর উৎসবে যোগ দিয়ে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছে। সকালে বেড়াতে বেড়িয়েছি, একটা সুন্দর পার্কে এসে দেখি পার্কের নীচে মাটির তলায় (underground) মস্ত বড় একটি গাড়ীর গ্যারেজ রয়েছে। সেখানে প্রায় ২০০০ গাড়ী রাখা যায়। এই সব গাড়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিতরে রীতিমত পাকা রকম বন্দোবস্ত রয়েছে। হোটেলে ফিরে এসে অলস বিশ্রামে দুপুরটা কাটানো গেলো। বিকেলে শহর ঘুরতে বেরোলাম। এ কয়দিন সকাল সন্ধ্যা Rotary convention এর নানারকম প্রোগ্রাম চলছে। বেড়িয়ে হোটেলে এসে সান্ধ্য আহারের জন্যে Coffee Shopএ যাচ্ছি, এমন সময় একদল Rotarian সেই-খানেই আলাপ জমিয়ে একরকম জোরকরে ডিনার খাবার জন্যে একটি ইটালিয়ান Rendeu-vousএ নিয়ে গেলেন। এঁরা সব Oakland অধিবাসী। রেষ্টু-রেণ্টে গিয়ে দেখি বড় একটি টেবিল সুন্দর সাজানো রয়েছে; বুঝলাম পূর্ব্বেই রিজার্ভ করা ছিল। সুন্দর Italian Serenade বাজছে; আমরা টেবিল ঘিরে বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে লাউড-স্পীকার মারফৎ হোটেল ম্যানেজার, "ভারতীয় Rotarian মিত্র পরি-বারকে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি" বলে ঘোষণা করলেন। Song of India গানটী বাজানো হ'লো। একব্যক্তি মাইক্রোফোণের

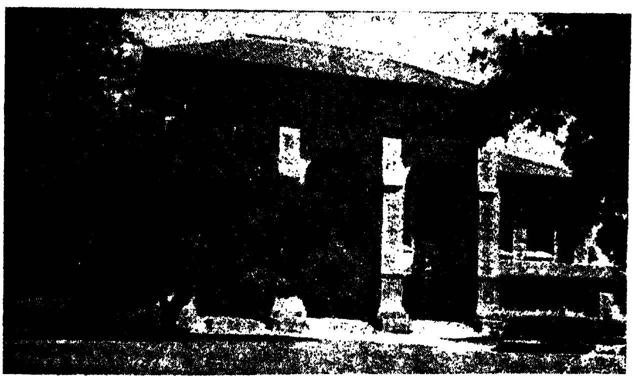


উপাসনা মন্দিরের অভ্যন্তর

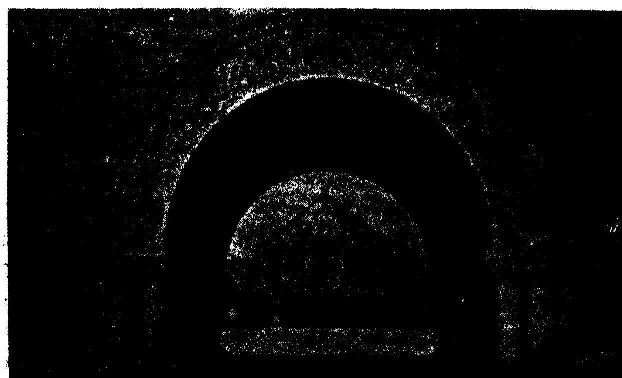
সামনে এসে গান ধরলেন। টেবিলে খাবার এলো—লাল বড় বড় কাঁকড়ার দাঁড়া সেদ্ধ একটি ডিসে সাজানো, তার সঙ্গে রয়েছে কিছু



ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির
যাদুঘর



ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির
লাইব্রেরী

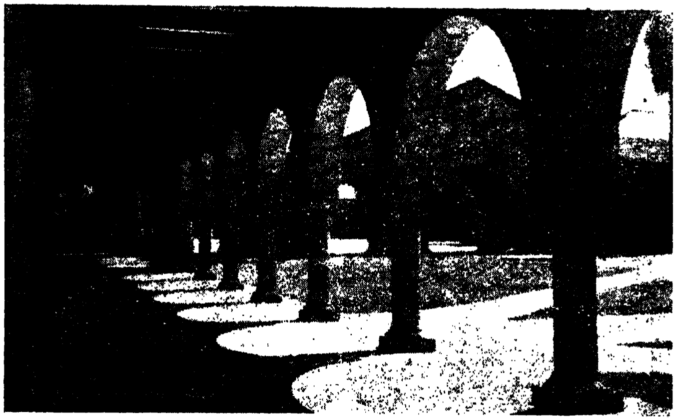


ষ্ট্যানফোর্ড য়ুনিভার্সিটির স্মরণী
গির্জা বা উপাসনা মন্দির

কাঁচা সবজি ও চাটনি। আর বড় বড় দাড়াগুলি এমন সুন্দর করে ভাঙা যে হাতে ধরে খোলা খুলে অনায়াসে কাঁটার সাহায্যে মাছ বার করে খাওয়া যায়। খুব খুশী হ'য়ে আমি আর খুকু কাঁকড়া খেতে লাগলাম। বন্ধুরা নৃত্য সুরু করলেন; আমাদের জাতীয় সঙ্গীত শোনাবার জন্যে লাউড্‌স্পীকার মারফৎ অনুরোধ এলো। কি করি, ভীষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলো—"বন্দেমাতরম্‌" সঙ্গীতের এককলি গেয়ে ফিরে এলাম। কয়েকটি ইটালিয়ান গান শুনে আমার খুবই ভালো লাগলো। সুরের ঝঙ্কার তুলে দ্রুতগতির গানগুলি বেশ মাতিয়ে তুলেছিল। Waiter বিল নিয়ে এলো, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একমুঠো ডলার তুলে বিলের ওপর ফেলে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। গোনাগুন্তির বালাই নেই। উনি উঠলেন বিল দেবার জন্যে, ভদ্রলোক ওর হাত ধরে বল্লেন "আপনারা আমাদের অতিথি, আমরা যখন আপনাদের দেশে যাবো আপনারাও আমাদের খাওয়াবেন।" তারপর সবাই মিলে Civic Auditorium এ গেলাম। সেখানে সেদিন রেটারিয়ান পরিবারদের উৎসব চলেছিল। আমরা Balconyতে বসে দেখতে লাগলাম। হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে নেচে চলেছে। চারিদিকেকালো কালো মাথাই ঘুরছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

বুধবার ১১ই জুন। আজ আমরা Standford university দেখতে যাবো। সেখানে একজন প্রফেসারের সঙ্গে ওঁর কিছু কাজও রয়েছে। সকালের আহার সেরে Bus ষ্টেশনে গেলাম। Standford university San Foransisco থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে। দূরে যাতায়াতের জন্য এই বাস ষ্টেশনগুলিতে অতি সুন্দর বন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা Loud speakerএর নির্দেশমত বাসে গিয়ে উঠলাম। সমুদ্রের ধারে ধারে চলেছি, একদিকে পাহাড় আর একদিকে জল—মাঝখানের সরু পথ দিয়ে চলেছে আমাদের বাস। খুকু আর উনি একদিকে বসেছেন, আমার পাশের সিটটি খালি। মাঝ পথে একটি নিগ্রো পুরুষ ও মহিলা উঠলো। মহিলাটী আমার পাশে এসে বসলো, নিগ্রো পুরুষটি জনৈকা আমেরিকান মহিলার পাশে একটি খালি সিটে গিয়ে বসলো। আমেরিকান মহিলাটি বেশ উসখুস করে উঠলেন। Coloured People পাশে বসেছে, অসোয়াস্তির সীমা নেই, অবশেষে আমার পাশের সেই নিগ্রো মহিলাটিকে ডেকে গদগদ ভাবে বললেন "তোমরা দুজনে একজায়গায় বসতে পেলে নিশ্চয় খুসী হবে। আমার মনে হয় তুমি আমার জায়গায় এসে বসো, আমি তোমার সিটে গিয়ে বসি।"

নিগ্রোমহিলাটি এর অর্থ বুঝেছিলো; সে উত্তর দিলো, "Seat makes no difference to me" আমার কাছে সিটের স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই, তুমি যদি ইচ্ছা করো তো অন্য সিটে উঠে যেতে পার।" মুখের উপর উত্তর পেয়ে আমেরিকান মহিলাটি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলেন। নিরুপায় হ'য়ে তিনি চুপ করে বসে রইলেন। Coloured Peopleএর (নিগ্রোজাতি) ভাগ্যে এদেশে নিত্য এই রকম বহু অসম্মানকর ঘটনা ঘটে। অপমানে ও অমর্য্যাদায় দিন কাটানো এদের জন্মকাল থেকেই অভ্যাস করে নিতে হয়। সামান্য পথে ঘাটে চলাফেরা থেকে আরম্ভ করে ইউনিভার্সিটির উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্ক ও সাবধান হ'য়ে স্বতন্ত্র আইন কানুনের নিষেধাজ্ঞা পালন করে চলতে হয়। বড় বড় সিনেমায়, থিয়েটারে, হোটেলে,—রেষ্টুরেন্টে, হাসপাতালে, স্কুল কলেজে এমন কি ইউনিভার্সিটিতে পর্য্যন্ত এদের প্রবেশ নিষেধ। এদের খাবার ঘর, স্কুল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি সবই স্বতন্ত্র। তবে মুটে মজুর ও দাসদাসীর কাজে এদের সর্ব্বত্রই দেখা যায়—সেখানে এরা একান্ত অপরিহার্য্য। এমনও দেখা গিয়েছে যে, শ্রেষ্ঠ গুণী ও বিদ্বান নিগ্রোর সঙ্গে আমেরিকানদের কোন অফিসে কাজ করতে হলে অফিসের দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে তাঁরা নিগ্রো সহকর্ম্মীকে চিনতেই পারেন না এবং পরিচয়ও অস্বীকার করে থাকেন। অথচ এই আমেরিকানরাই ভারতের Caste System নিয়ে সমালোচনায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। এ দেশে এখন নিগ্রোর সংখ্যা খুব কম নয়, প্রায় ১ কোটী ৩০ লক্ষ। প্রতি দশ জনের একজন হল নিগ্রো।



উপাসনা মন্দিরের দীর্ঘ প্রশস্ত অলিন্দ

বীর রমণী মাতঙ্গিনী হাজরা

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মহাত্মা গান্ধী বলতেন—যুদ্ধে শত্রুকে হত্যা করা এবং শত্রুর দ্বারা নিহত হওয়া সাহসের পরিচায়ক ; কিন্তু শত্রুর আক্রমণ সহ্য করা এবং সে জন্ম প্রতিশোধ গ্রহণ না করা, তার চেয়েও বড় সাহসের কাজ।

মহাত্মার এই মহৎ বাণীকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট বিপ্লবের সময় কাজে রূপ দিয়েছিলেন, তারই মন্ত্র-শিষ্যা বাঙ্গলার এক বীর রমণী। এক হাতে রণশঙ্খ, অপর হাতে ভারতের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক জাতীয় পতাকা নিয়ে, হাসিমুখে তিনি শত্রুসৈন্যের প্রচণ্ড বুলেট ললাটে বরণ ক'রে প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারতের গৌরব বাঙ্গলার এই মহিয়সী মহিলার নাম মাতঙ্গিনী হাজরা।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে ১২৭৭ বঙ্গাব্দে এক মাহিষ্য-পরিবারে মাতঙ্গিনীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস মাইতি। ঠাকুরদাসের কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তবে মাতঙ্গিনী ভিন্ন তাঁর আরও দুইটি কন্যা ছিল। ঠাকুরদাসের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। গরীব পিতার গৃহে সাধারণ আর পাঁচজন মেয়ের ন্যায়ই মাতঙ্গিনীরও শৈশব অতিবাহিত হয়।

হোগলা গ্রামের নিকটবর্তী আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে বাল্য বয়সেই মাতঙ্গিনীর বিবাহ হয়। মাতঙ্গিনী ছিলেন ত্রিলোচন হাজরার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। ত্রিলোচন হাজরার প্রথম পক্ষের স্ত্রী, মহেন্দ্র নামে একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা গেলে, তিনি দ্বিতীয়বারে মাতঙ্গিনীকে বিবাহ করেছিলেন। ত্রিলোচনবাবু অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করার অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মাতঙ্গিনী দেবীর বয়স তখন মাত্র ১৮ বৎসর। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। তবে তিনি মহেন্দ্রকে নিজের পুত্র ব'লেই মনে করতেন এবং মহেন্দ্রও বিমাতাকে নিজের মায়ের মতই দেখতেন।

বিধবা হবার পরই মাতঙ্গিনী দেবী তাঁদের কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেন এবং অতি শুদ্ধভাবে বিধবার জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি এক বেলা মাত্র আতপ চালের অন্নগ্রহণ করতেন এবং নিয়মিত ইষ্টমন্ত্র জপ করতেন। ইষ্টমন্ত্র জপ না ক'রে তিনি কখনও জলগ্রহণ করতেন না। এইভাবেই নিজের ধর্ম-কর্ম ও সংসারের কাজকর্ম নিয়েই মাতঙ্গিনীর জীবনের অনেক বছর কেটে যায়।

এরপর আসে ১৯৩০ সাল। এই বছরের প্রথম দিকেই মহাত্মা গান্ধী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেসকে আইন অমান্যের নির্দেশ দিলেন। মহাত্মা গান্ধী নিজে লবণ-আইন অমান্য করবার জন্য পদব্রজে বেরুলেন তাঁর আশ্রম থেকে দু'শ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী অভিমুখে। মহাত্মার ডাণ্ডী-অভিযানের প্রতিপদক্ষেপে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল, আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত। এই আন্দোলনের এক প্রবল বন্যা এল, ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত মেদিনীপুরেও। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, মেদিনীপুরের বীর সন্তান দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে সমগ্র মেদিনীপুর ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনে।

মাতঙ্গিনী দেবীর শ্বশুরালয় আলিনান গ্রামেও এই বন্যার একটা ঢেউ এসে পৌঁছল। আলিনানের আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেই গা ভাসালেন এই স্রোতে। মাতঙ্গিনী দেবীর বয়স তখন প্রায় ৬০ বছর। বিধবা মাতঙ্গিনী কিন্তু এই সময়েও তাঁর ধর্মকর্ম ছেড়ে তেমন সক্রিয় ভাবে যোগ দিলেন না এই আন্দোলনে। তবে আন্দোলনের সুরু থেকেই তিনি এর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং একটা যোগসূত্র বজায় রেখে-ছিলেন। কারণ এই আন্দোলনকালে আলিনানের যুবকরা যে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন, সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শিবির স্থাপিত হয়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবীর দেওয়া তাঁরই জায়গায় এবং শিবিরটি ছিল আবার তাঁরই বাড়ীর ঠিক সম্মুখে।

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে, কংগ্রেসের লবণ-আইনে অনেকাংশে জয় হ'লে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং এই সময়েই তিনি ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে বিলাতে গেলেন গোলটেবিল বৈঠকে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ইংরাজের কূট চালে গোলটেবিল বৈঠক বিফলতায় পর্যবসিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী তখন শূন্যহস্তেই ভারতে ফিরে এলেন। মহাত্মার ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার দিকে দিকে আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। এটা তখন ১৯৩২ সাল।

সমগ্র দেশের সঙ্গে আলিনানের কংগ্রেস কর্মীরাও পুনরায় সেই আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেন। এই বৎসর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবসে আলিনানের কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক'রে ও স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ ক'রে এক শোভাযাত্রা বা'র করলেন। সেদিন ঐ শোভাযাত্রায় কোনও মহিলা ছিল না, শুধু মাত্র কয়েকটি বালিকা শঙ্খধ্বনি করতে করতে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল।

এই শোভাযাত্রাটি যখন মাতঙ্গিনী দেবীর কুটীরের কাছাকাছি এল, মাতঙ্গিনী দেবীও তখন একটা শাঁখ নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন এবং শঙ্খধ্বনি করতে করতেই এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। তারপর শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে শঙ্খধ্বনি করতে করতে সকলের সঙ্গে সমগ্র ইউনিয়ন প্রদক্ষিণ করলেন।

এই দিনটি মাতঙ্গিনী দেবীর জীবনের এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এইদিন হতেই তিনি কংগ্রেসে একরূপ পুরাপুরিভাবেই যোগ দিলেন, এবং তাঁর গুরুর দেওয়া ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পাঠ ক'রে কংগ্রেসের অহিংসা মন্ত্রেও দীক্ষা নিলেন। তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনটিতে তিনি আর একটি ব্রত নিয়ে ছিলেন। সেটি ছিল মহাত্মা

গান্ধীর নির্দেশিত গঠনমূলক কর্ম পদ্ধতির অন্যতম নির্দেশ মাদক-বর্জন। মাতঙ্গিনী দেবী বার্ধক্যে বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বাতের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য একটু একটু আফিং খেতেন। মাদক-বর্জন নীতি হিসাবে তিনি এই দিন হতেই বরাবরের জন্ম আফিং ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরপর থেকে তিনি আর কোনও দিনই বাতে আক্রান্ত হন নি।

কংগ্রেসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে মাতঙ্গিনী দেবী ১৯৩২ সালেই কয়েক স্থানে আইন অমান্য করলেন এবং ঐ বৎসর শেষের দিকে তিনি তমলুক থানা ও তমলুক দেওয়ানী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। আইন অমান্যকালে পুলিস প্রতিবারেই তাঁকে গ্রেপ্তার করল, তবে বৃদ্ধা ব'লে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ক'রে আটক রেখে তাঁকে ছেড়ে দিল।

১৯৩৩ সালে বাঙ্গলার সেই সময়কার গবর্ণর তমলুকের এক সরকারী সভায় তমলুকবাসীদের শান্ত করবার জন্ম বক্তৃতা দিতে যান। এই সময় মাতঙ্গিনী দেবী কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের এক শোভা-যাত্রা পরিচালনা ক'রে "গবর্ণর ফিরে যাও" ধ্বনি করতে করতে সভার নিকটবর্তী হন। সেই সময় পুলিস বাধ্য হয়ে মাতঙ্গিনী দেবীকে গ্রেপ্তার করেছিল। এই গ্রেপ্তারের ফলে মাতঙ্গিনী দেবীর ছ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

জেল থেকে বেরিয়ে মাতঙ্গিনী দেবী এবার কংগ্রেসের কাজে আরও নিবিড় ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের একজন সেরা সৈনিক হিসাবেই কাজ ক'রে গেলেন। ১৯৩২ সালের পর থেকে তমলুক কংগ্রেসের সকল কাজে ও অনুষ্ঠানেই তিনি যোগ দিতেন।

স্বল্পায়ু বাঙ্গালীর জীবনে, যারা বা কদাচিৎ সত্তর বাহাত্তর বৎসর বয়সে গিয়ে পৌছায়, তাদের প্রায় সকলেই এই বয়সে বার্ধক্যে অকর্মণ্য হয়ে, মরণের জন্ম দিন গণতে থাকে। কিন্তু মাতঙ্গিনী দেবী তাঁর এইরূপ বয়সেও দশ পনর মাইল পর্যন্ত গেঁয়ো মেঠো পথ হেঁটে গিয়ে কংগ্রেসের সভায় ও কাজে যোগ দিতেন। ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের মহিলা শাখার যে অধিবেশন হয়, তাতেও তিনি তমলুক থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

মাতঙ্গিনী দেবী কংগ্রেসের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানার চেষ্টা করতেন। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর থেকে তিনি মহাত্মার নির্দেশানুযায়ী অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন চরকায় সূতা কাটতেন এবং নিজের হাতেকাটা সূতায় বোনা কাপড় পরতেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এই বৃদ্ধার এমনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল যে, কখন যদি তাঁর অসুখ করত, তিনি আদৌ ওষুধ খেতেন না; মহাত্মা গান্ধীর নামে "সিদ্ধিজল" খেতেন এবং তাতেই নাকি তাঁর অধিকাংশ ব্যাধিও সেরে যেত। মহাত্মার প্রতি এত শ্রদ্ধা ছিল ব'লে মেদিনীপুরের লোকে তাঁকে "গান্ধীবুড়ী" ব'লে ডাকত।

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকুমারচন্দ্র জানা, তমলুকের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা প্রায়ই মাতঙ্গিনী দেবীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবী স্বহস্তে পাক ক'রে তাঁদের খাওয়াতেন। অতিথি সেবা করা এই বৃদ্ধার যেন এক ব্যাধি বিশেষ ছিল। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গেও মাতঙ্গিনী দেবীর বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি নিজে মাঝে মাঝে নানা রকমের খাদ্য প্রস্তুত ক'রে আশ্রমের সাধুদের জন্ম পাঠিয়ে দিতেন। এই সব বিশিষ্ট অতিথি ছাড়াও পাড়ার কি গ্রামের কেউ অভুক্ত থাকলে, তিনি তাকে ডেকে এনে খাওয়াতেন, অথবা তার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। কেউ কাপড়ের অভাবে পড়লে, তিনি তাকে কাপড়ও কিনে দিতেন। এসব ছাড়াও তিনি নিজের গ্রামে অথবা আশ পাশের কোন গ্রামে কারও কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ হলেও সেবা করতে যেতেন।

বৃদ্ধ বয়সে মাতঙ্গিনী দেবীর একবার কঠিন আমাশয় হয়। সকলেই তাঁকে ওষুধ খেতে বললেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ওষুধ খেতে চাইলেন না। "গান্ধীজল" খেয়েই পড়ে রইলেন। তিনি সকলকে বললেন—রোগে আমি কখনই মরব না। রোগে আমার মৃত্যু নেই। আমি দেশের জন্ম প্রাণ দোব।

মাতঙ্গিনী দেবীর এই বিশ্বাস সত্য সত্যই কাজে পরিণত হয়েছিল। তিনি কঠিন আমাশয় থেকে সেরে উঠলেন এবং দেশের মুক্তি-সংগ্রামে ১৯৪২ সালের আগষ্ট-বিপ্লবে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতের সুমহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে ইংরাজদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। কংগ্রেস কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে, পরদিন সকালেই ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের সকল নেতাকেই গ্রেপ্তার করল। কংগ্রেস-নেতাদের এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল এবং তারই ফলে ভারতের দিকে দিকে সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনই ভারতের ইতিহাসে আগষ্ট-আন্দোলন নামে খ্যাত।

কর্ণধারহীন তরণী যেমন প্রবল বাত্যায় নিজ ইচ্ছায় এদিকে ও ওদিকে ঘুরতে থাকে, আগষ্ট আন্দোলনে ভারতের বিক্ষুব্ধ জনগণও তেমনি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাভাবে নিজেরাই নিজেদের পথ প্রদর্শক হয়ে আন্দোলনে মেতে উঠেছিল। তাই এই আন্দোলন কোন কোন স্থানে কংগ্রেসের অহিংসার নীতি ত্যাগ ক'রে হিংসার পথও নিয়েছিল; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণ অহিংস পথেই আন্দোলন চালিয়েছিল। কিন্তু সরকারের অত্যাচার ও দমননীতি সর্বত্রই অমানুষিক আকার ধারণ করেছিল।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পরই আগষ্ট-আন্দোলন একপ্রকার যুগপৎ সমগ্র ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। তবে যুক্তপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, বিহার এবং পশ্চিম বাঙ্গলাতেই এই আন্দোলন দ্রুত গতিতে বিস্তা

লাভ করেছিল। বাঙলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সমগ্র মেদিনীপুরেই, বিশেষ ক'রে এই জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। বাঙলা দেশের মধ্যে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা তমলুকেই অধিকসংখ্যক লোক পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। প্রথম থেকেই এখানে আন্দোলন সুরু হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে তমলুক জয়ীও হয়েছিল। তমলুকবাসীরা এখানে দুই বৎসরকাল স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। যে সব শহীদের জীবনের বিনিময়ে এই জয় সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর তমলুকে বিপ্লবীদের ৫টি বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা সুপরিকল্পিত উপায়ে ৫টি বিভিন্ন স্থান থেকে আরম্ভ ক'রে তমলুকের আদালত ও থানার দিকে যেতে থাকে। এই ৫টির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেটি শহরের উত্তর পথ দিয়ে প্রবেশ করে। এই দলেরই পরিচালিকা ছিলেন ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। এই দলে আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। মাতঙ্গিনী দেবী একহাতে শঙ্খ আর একহাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে শোভাযাত্রা পরিচালনা ক'রে নিয়ে চলেছিলেন।

এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৮হাজার লোক ছিল এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মিলিত এই শোভাযাত্রা ছিল। শোভাযাত্রাটি আদালতের অদূরে "বানপুকুরের" নিকটবর্তী হ'লে প্রথম পুলিসের কাছে বাধা পেল।

এই সময় গোরা ও দেশী সৈন্যে তমলুক শহর ভর্তি ছিল এবং শহরটিকে যেন একটি দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। প্রতি সড়কেই লাঠি নিয়ে সিপাহীরা পাহারা দিচ্ছিল এবং সিপাহীদের পিছনে পিছনে সর্বত্র রাইফেলধারী সৈন্য ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবীর পরিচালনায় যে শোভাযাত্রাটি বানপুকুরের কাছে এল, পুলিস তাতে প্রচণ্ডভাবে লাঠি চালাতে আরম্ভ করল। অহিংস ও শান্ত শোভাযাত্রা লাঠি উপেক্ষা ক'রেই অগ্রসর হতে লাগল। দু'একজন যারা লাঠির আঘাতে ইতস্তত: হয়ে পড়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবী চীৎকার ক'রে তাঁদের বলতে লাগলেন—ভাই সব ভয় পেও না কেউ। মেদিনীপুরের বীর সন্তান তোমরা। এগিয়ে এস। একদিন ত মরতেই হবে, আজ বীরের মতই মরি এস।

দু একজন যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, মাতঙ্গিনী দেবীর আহ্বানে তারা আবার ফিরে দাঁড়াল। এই সময় রণরঙ্গিণীর ন্যায় মাতঙ্গিনী দেবী বীরদর্পে আগিয়ে চললেন শোভাযাত্রা নিয়ে। বামহাতে তাঁর যে রণশঙ্খ ছিল, তাতে তিনি ধ্বনি করতে লাগলেন এবং তাঁর ডান হাতের জাতীয় পতাকা বাতাসে উড়তে লাগল পত্ পত্ করে।

এই সময় লাঠি চালনা ব্যর্থ হ'ল দেখে সেনাবাহিনীর কর্তা অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য বেপরোয়া গুলি চালাতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পেয়ে এগিয়ে এল রাইফেলধারী সৈন্যদল। মাতঙ্গিনী দেবী ছিলেন শোভাযাত্রার পুরোভাগে; তাই প্রথমেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হ'ল। প্রথম গুলি এসে লাগল তাঁর বামহাতে। ফিনিক দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। তবুও ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধার চলার গতি বন্ধ হ'ল না। কারণ এক অপূর্ব প্রেরণা নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি আজ।

"ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণকালে মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশবাসীকে এক মন্ত্র দিয়েছিলেন—"করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করব, না হয় মরব। মাতঙ্গিনী দেবী সেই মন্ত্র আজ সফল করার পণ নিয়ে বেরিয়েছেন। শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুবার সময় তিনি ব'লে বেরিয়েছিলেন—আজ আমি আর ফিরছি না। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" মন্ত্র সফল করবই।

তাই গুলিবিদ্ধ হয়েও মাতঙ্গিনী দেবী ফিরলেন না, বা এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করলেন না। শোভাযাত্রা নিয়ে যেমন চলেছিলেন তাঁর চলার গতি তেমনিই অব্যাহত রইল। বরং গুলির আঘাত খেয়ে তাঁর প্রেরণা আরও দ্বিগুণ বর্ধিত হ'ল। ঠিক এই সময়ে সৈন্যদের বন্দুক থেকে আর একটা গুলি গর্জন ক'রে ছুটে এল। সেটা এসে বিঁধল তাঁর ডানহাতে। মাতঙ্গিনী দেবী গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকা কিছুতেই হাত থেকে ছাড়লেন না। হাতের ঝরা রক্তে জাতীয় পতাকার দণ্ড লাল হয়ে উঠল। মাতঙ্গিনী দেবী তবুও এগিয়ে চললেন তাঁর লক্ষ্য পথে। অন্তরে আজ যেমনি তাঁর দেশপ্রেমের এক অপূর্ব প্রেরণা, প্রকৃত অহিংস সৈনিকের ন্যায় মুখে তাঁর তেমনি হাসি ও বিনীত অনুরোধ। তিনি ভারতীয় সৈন্যদের বিনীতভাবে অনুরোধ ক'রে বলতে লাগলেন—বৃটিশের সৈন্য-বিভাগ ছেড়ে দিয়ে আপনারা দেশের কাজে যোগ দিন। মাতঙ্গিনী দেবীর এই অনুরোধের উত্তর এল কিন্তু আর একটা প্রচণ্ড বুলেট। এই বুলেট এসে ভেদ করল বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী দেবীর কুঞ্চিত ললাট।

৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী এবার নিজের ললাটের রক্তে তাম্রলিপ্তের মাটি রঞ্জিত ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখনও কিন্তু তাঁর ডানহাতে জাতীয় পতাকা তেমনিভাবেই ধরা রইল এবং বাতাসেও উড়তে লাগল। এই সময় একজন সৈন্য "বীরদর্পে" ছুটে এসে মাতঙ্গিনীর হাতে পদাঘাত ক'রে জাতীয় পতাকা দূরে ফেলে দিল।

মাতঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে ঐদিন সৈন্যদলের বেপরোয়া গুলিতে আরও ৪জন সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ দিলেন এবং বহু ব্যক্তি আহত হলেন। শহর অভিমুখে ঐদিন আরও যেকটি শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, সেগুলিও পুলিসের লাঠি এবং সৈন্যদের গুলির হাত থেকে রেহাই পায়নি। তার ফলে সেখানেও কয়েকজন হতাহত হলেন।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের অনেক বীর রমণীই জীবনদান ক'রে গেছেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে বোধ করি মাতঙ্গিনী হাজরার তুলনা নাই। মহাত্মা গান্ধীর তথা কংগ্রেসের অহিংস আদর্শকে এই বৃদ্ধার ন্যায় এমনভাবে গ্রহণ ক'রে আর কেউ জীবন উৎসর্গ করেছেন ব'লে কেউ কোনদিন শোনে নি। জনসাধারণের দেওয়া "গান্ধীবুড়ী" নাম সত্যই সার্থক ক'রে গেছেন তিনি।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জয়পুর

২

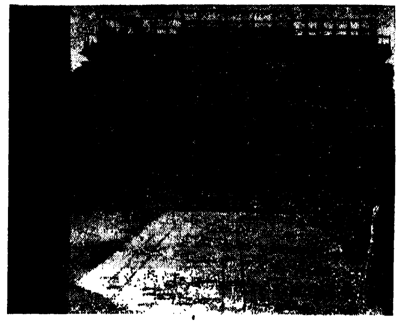
কুশল পরের দিন কলেজ যাবার পথে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমরা কাল অম্বর যাবো শুনে নিষেধ করলে। বললে শহরের বাইরে দুদিন পরে যেও। এখানে হিন্দু মুসলমানে একটা ভীষণ 'টেন্‌শান' চলছে। মোস্‌লেম লীগের হেডকোয়ার্টার থেকে মহারাজাকে 'আল্টিমেটাম্' দিয়েছে। তিনদিনের মধ্যে সেনাপতি মেজর ভরত সিংহকে মহারাজা বরখাস্ত না করলে ওরা জয়পুরে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দেবে।



জয়পুর রাজপ্রাসাদে (পুরাতন)

প্রশ্ন করলুম—সে ভদ্রলোকের উপর এদের এত রাগ কেন ?

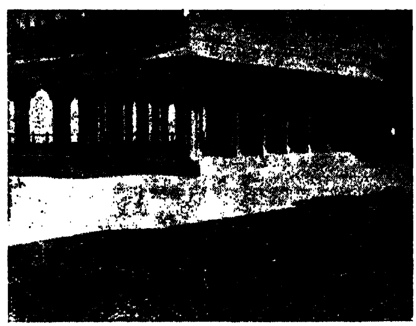
কুশল বললে—কিছুদিন আগে এখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মৃত্যুতে এক বিরাট শোক সভা হয়। সেই শোক সভায় পৌরোহিত্য করতে গিয়ে মহারাজের খুড়ো মেজর ভরত সিং তাঁর বক্তৃতায় প্রসঙ্গ-ক্রমে বলেন—বাংলা দেশের কলকাতা শহরে ও নোয়াখালিতে যে সব কাণ্ড হয়েছে জয়পুরে যদি সেরকম কিছু হ'ত, তাহ'লে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি জয়পুর মুসলমান শূন্য করে ফেলতুম! ব্যস্! আর যাবে কোথা? খবর চলে গেল লীগের হেডকোয়ার্টারে। সেখান থেকে মহারাজার উপর টেলিগ্রামে চরম পত্র এসে হাজির! এখনি প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং ভরত সিংকে



কিতাব খানা (লাইব্রেরী)

বরখাস্ত করো। সাতদিন মাত্র সময় দেওয়া হল। লীগের দাবী পূর্ণ না হলে জয়পুরে আগুন জ্বলে উঠবে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ৭ দিনের আর কদিন বাকী? কুশল বললে, হ'য়ে এসেছে। আর দু'দিন। এই তারিখে ওদের' ডাইরেক্ট



দরবার হল

এ্যাক্‌শন শুরু হবার কথা। সুতরাং ৯ই ১০ই দুটো দিন দেখে ১১ই বেরিয়ো।

বললুম—মহারাজ, আলটিমেটামের কী জবাব দিলেন?

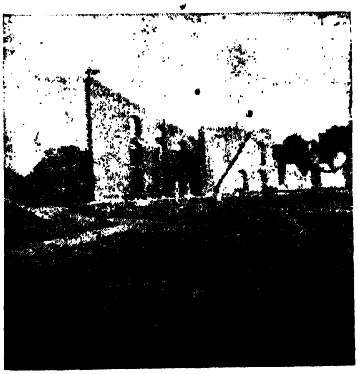
কুশল বললে—ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন এবং সেনাপতিকে ডেকে হুকুম দিলেন—এখনি 'ষ্টেট্‌ফোর্স' এবং 'মিলিটারী-

পুলিশ গিয়ে সমস্ত মোস্‌লেম পল্লী ঘেরোয়া করে ফেলুক এবং শহরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কুচ্‌কাওয়াজ করে রুট মার্চ্চ চলুক প্রত্যহ।

—তারপর?

—কুশল বললে—তারপর আর কি! এইতেই ঠাণ্ডা। খুব সম্ভব ৯ই তারিখে কিছুই হবে না, তবু একটু সাবধানে থাকাই ভালো, তোমাদের বিদেশী দেখে সুযোগ নিতে পারে। তোমরা একয়দিন পুরাণো রাজপ্রাসাদ, হাওয়া মহল, এলবার্ট মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, গোবিন্দজীর মন্দির, আর্ট স্কুল, রামবাগ, মেয়োহাসপাতাল, ষ্টেট্‌ লাইব্রেরী, সংস্কৃত কলেজ—এই গুলো দেখে নাও। তারপর যাবে অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ দেখতে। গল্‌তার পবিত্র প্রস্রবণ ও সূর্য্য মন্দিরও দেখে এসো। আর একদিন যেও মিঙ্গারায় প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির দেখে আসতে। সেই পথেই প'ড়বে মহারাজার নব নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ। সেও একটা দেখবার মতো, তবে অনেকটা ইংরিজী ষ্টাইলে তৈরী।

অগত্যা আমরা প্রথমেই শ্রীগোবিন্দজীর মন্দির এবং পুরাতন



জয়পুর মানমন্দির (যন্ত্র)

রাজপ্রাসাদ ও কেতাবখানা দেখতে গেলুম। কুশল বা ধীরেন কেউই আমাদের বলে দেয়নি যে বাঙালীর বেশে অর্থাৎ লম্বা কোঁচা আর খোলা মাথায় জয়পুর প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ। দ্বার পথে প্রহরী বাধা দিলে। অগত্যা মালকোঁচা বেঁধে এবং দুটি মাড়োয়ারী টুপী ভাড়া করে বাবাজী ও আমি মাথা ঢেকে একটি গাইড সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলুম। প্রাসাদ প্রাঙ্গণেই একধারে জয়পুরের প্রসিদ্ধ মান-মন্দির! এরা বলে 'যন্ত্র'! জয়পুরের এই মানমন্দিরটিই সবচেয়ে বড়। দ্বিতীয় জয়সিংহ ভারতের আরও নানা স্থানে এই রকম 'যন্ত্র' বা মানমন্দির নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বারাণসীতে তাঁর তৈরী আরও চারটি মানমন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। রাজপ্রাসাদের সুরক্ষিত উদ্যানটি দেখে মনটা খুশী হল। প্রাসাদ এমন কিছু অপরূপ নয়। বাইরের জড়টাই খুব চিত্তাকর্ষক। এক একটা কটক দোতোলার সমান। রাজার 'দরবার হল'টি ভাল। আর ভালো লাগলো জেনানা মহল। আর প্রাসাদ প্রাঙ্গণের 'মেঘমহল' খুব সম্ভব—হুগলীর বাঙালী ইঞ্জিনীয়ার বিদ্যাধর কালিদাসের মেঘদূত থেকে অলকার প্রেরণা পেয়ে এই 'মেঘ মহল' বানিয়েছিলেন। শোনা গেল মহারাণা সন্ধ্যায় এখানে রাণীদের নিয়ে বিহার করতেন। চারিদিকের জলযন্ত্র থেকে উৎস ধারায় জলতরঙ্গ বাজতো। তোরণে তোরণে নহবতে পূরবীর সুর ভেসে আসতো, সে এক নন্দন বিলাস! এই অন্দরের বাগান খানি মনে হল যেন ত্রাট রাণীদের চেয়েও সুন্দরী! স্নিগ্ধ হরিৎ তৃণ কুঞ্জবনের আশে পাশে স্তবকে স্তবকে ফুটে আছে অসংখ্য বর্ণে গন্ধে অনিন্দ্য পুষ্প রাশি! তারই কোলে গোবিন্দজীর মন্দির। কোনও বৈচিত্র্য নেই, কারু কার্য্য নেই, চূড়া নেই, ধ্বজা নেই। অত্যন্ত সাদাসিধা আমাদের দেশের নিঃস্ব জমিদারদের বাড়ীর ঠাকুর দালানের মতো শ্রীহীন। ও বিবর্ণ! উঁচু নয় কিন্তু, একেবারে মাটির সঙ্গে প্রায় সমান। শোনা গেল মোগোল আক্রমণের ভয়ে এঁকেও না কি নিরাপত্তার জন্য বৃন্দাবন থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরতির সময় অন্তঃপুরচারিণী রাণীরা প্রাসাদ থেকেই গোবিন্দজীকে দর্শন করবেন বলেই এইখানে তার বাস। বাঙালী পুরোহিত পূজা করেন। আমাদের সঙ্গে তিনি অনেক আলাপ করলেন। আরতি



জেনানা মহল

দেখে কীর্ত্তন শুনে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরলুন। গোবিন্দজীর অবস্থা ভাল বলে মনে হল না। যেন পড়তি দশা! পুরোহিত বললেন—কী করে হবে? বর্ত্তমান মহারাজা শাক্ত, তিনি যশোরেশ্বরী কালীর ভক্ত। এখন মা-কালীর অবস্থা খুব ভাল যাচ্ছে। গোবিন্দজী অবহেলিত। আগের মহারাজা ছিলেন বৈষ্ণব। তাঁর আমলে এলে দেখতে পেতেন গোবিন্দজীর কী বোলবোলাও ছিল। এখন ভোগ ঢাকতে ছেঁড়া চটের পর্দ্দা জোটে না, তখন দামী রেশমী পর্দ্দা দেওয়া হত। ভোগও তেমন আর নেই! গোবিন্দজীর দুর্দ্দশা দেখে দুঃখ হল। ইনি এখানে বাস্তুহারা ঠাকুর কিনা? বৃন্দাবন ছেড়ে এসে এই হাল হয়েছে বেচারার! পরদিন গেলুম মিউজিয়ম আর চিঁড়িয়াখানা দেখতে রামবাগে। মিউজিয়মের বাড়ীখানি ভারী সুন্দর। স্থাপত্যকলার একটি চমৎকার নিদর্শন। বহু মূল্যবান ও দ্রষ্টব্য দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। চিড়িয়াখানা আমাদের

আলিপুরের চেয়ে ভালো। কারণ এখানে দেখলুম, সমস্ত পশু-পক্ষীদের স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। রামবাগ এক বিরাট পার্ক। এর মধ্যে গাড়ী নিয়ে বেড়াতে হয়। প্রশস্ত পথ আছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এখানে রাখবার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি ছোট সংস্করণ বলা চলে। 'হাওয়া মহল' অনেকটা ফাঁকা আওয়াজের মতো! পর পর ৯তলা খুব পাতলা এক কারুকার্য্য খচিত দালান। তিনতলা পর্য্যন্ত কোনওরকম বসবাস চলে, বাকী ছ'তলা শুধু বাহার! হাওয়া ভিন্ন আর কিছুর প্রবেশ অসাধ্য। সুতরাং 'হাওয়া মহল' নামটা বেশ লাগসই হয়েছে!

ইতিমধ্যে একদিন পুষুমার বাড়ী আমাদের রাত্রে ভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল। আমরা বলে পাঠালুম, এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণের যুগে ওসব হাঙ্গামা কোরো না। আমরা বরং তোমার ওখানে আজ বিকেলে চা খাবো এবং ওখান থেকে তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে বেড়াতে বেরুবো। পুষুমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে চায়েরই ব্যবস্থা করলে। কিন্তু সে কি 'চা'! রীতিমত



মেঘমহল

জলযোগ ও চা পান মিলে এক 'চা-খানা' ব্যাপার! শুনলুম সমস্ত-রকমারী খাবার আমাদের পুষুমা নিজের হাতে তৈরী করেছে। সেই সব সুস্বাদু খাবারের আস্বাদ পেয়ে ধীরেন বাবাজীকে বললুম, মিউনিসিপ্যালিটির চাকরী ছেড়ে দিয়ে একটি 'জয়পুরী-বঙ্গীয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' খোলো। দুদিনে দ্বারিক ঘোষের মতো লক্ষপতি হয়ে উঠবে।

চা' পানের পর আমরা সেদিন সারা জয়পুর শহরের ভাল ভাল অঞ্চল রাত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়ালুম। বেশ লাগলো সেদিনের রমণীয় সন্ধ্যাটি বিদেশে আত্মীয়দের সঙ্গে কাটিয়ে।

লাল দাগ দেওয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ৯ই তারিখ নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তারপর ১০ই। কিছু হল না। তারপর ১১ই। কিছু হল না। জয়পুর শান্ত ও স্বাভাবিক কর্ম্মরত। আমরা দুর্গা বলে ১২ই তারিখে অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ দর্শনে রওনা হয়ে গেলুম। আমাদের গাড়োয়ান ও গাইডের পরামর্শ মতো সকালেই বেরিয়ে পড়লুম। গাড়োয়ান আমাদের দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললো—এই সব মৃত রাজাদের সমাধি মন্দির—এই সব মৃতা রাণীদের সমাধি মন্দির। দেখাতে দেখাতে বোঝাতে বোঝাতে সে গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছে অম্বরের পথে। এই যে সরোবর দেখছেন—সারা জয়পুর শহরের জলসরবরাহ হয় এখান থেকে। ঐ দেখুন 'পানিকল' (ওয়াটার পাম্পিং এণ্ড ফিলটারিং ষ্টেশন) গাড়ী চলেছে—আমরাও অপলক দৃষ্টিতে চারপাশের দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য যেন গিলছিলুম। ঐ লেকের ধারে ঐ যে প্রাসাদ দেখছেন—ওটা রাজার শিকার মহল। মহারাজা বাহাদুর এখানে পাখী শিকার করতে আসেন। গাড়ী চলেছে ধীরে ধীরে—দূরে পর্ব্বতচূড়া দেখা যাচ্ছে! চোখে পড়লো পাহাড়ের গায়ে একটি নির্জ্জন উদ্যান-বাটীকা। গাড়োয়ান বল্লে—এইটি মহারাজের প্রমোদ-বাটিকা বা গুপ্ত-নিবাস! এখানে যা কিছু হয় সে সবই নাকি সমাজ-বিরুদ্ধ বে-আইনী ও বেলেল্লা ব্যাপার!

অম্বরের পার্ব্বত্য গিরিপথে গাড়ী এসে উঠলো। গাড়োয়ান বল্লে—এপথ নতুন তৈরী হয়েছে মহারাজার মোটরে আসার সুবিধার জন্য। নইলে হাতীর পিঠে ছাড়া অম্বরে আসা যেত না আগে।



গোবিন্দজীর মন্দির (পিছনে দেখা যাচ্ছে)

এরা 'অম্বর' বলে না। এরা বলে 'আমের'! হাতী যাবার রাস্তাও এই পথেরই পাশ দিয়ে চলেছে। পথ শেষ হল। পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে। পাশেই গাড়ী রাখবার একটি ঘেরা জায়গা আছে। গাড়োয়ান বল্লে—এইখানে গাড়ী থাকবে। আপনারা নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান উপরে। অম্বর রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করছিল। মহাউৎসাহে আমরা সেই পর্ব্বত সোপান অতিক্রম করে প্রাসাদে প্রবেশ করলুম। প্রাসাদ দেখাবার একজন গাইডও জুটে গেল। সেই 'প্রবেশ পত্র' কিনে এনে দিলে আমাদের। অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ ঘুরে ঘুরে দেখে কেবলই মনে হ'চ্ছে লাগলো, এ যেন আমরা মোগল আমলের আগ্রা বা দিল্লীর বাদশাহী মহলে এসে ঢুকেছি। সেই দেওয়ানী খাশ, দেওয়ানী আম, দরবার হল, জেনানা মহল—সেই সর্ব্বত্র স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কারুকলা! গাইড বল্লে জানেন হুজুর, মানসিংজী এসব বানায়নি। তিনি ওই দুর্গেই থাকতেন। এই

প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন অম্বরপতি প্রথম জয়সিং। প্রথম জয়সিং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অম্বরের অধিপতি ছিলেন। অম্বর প্রাসাদ তৈরী হবার পর তিনি গর্ব্ব করে বলেছিলেন, দিল্লী আগ্রার বাদশাহী মহল এর কাছে তুচ্ছ! কেমন করে এ সংবাদ মোগল সম্রাটের কানে গিয়ে উঠলো। গৃহশত্রু বিভীষণের তো অভাব ছিল না। দিল্লী থেকে ফৌজ এলো এ প্রাসাদ সমভূমি করে দেবার জন্য। মহারাজ জয়সিংহ এ খবর আগেই পেয়েছিলেন। রাতারাতি লোক লাগিয়ে এমন ভাবে সব কারুকার্য্য চুণের পলেস্তারা দিয়ে ঢেকে ফেললেন যে ফৌজদার সাহেব এসে দেখে শুনে খবর মিথ্যা বলে বাদশাহকে জানালেন, তবেই না এই 'আমের' রক্ষা পেয়েছে! নইলে আজ কিছুই দেখতে পেতেন না। সব গুঁড়ো করে দিয়ে যেতো!

কথাটা মিথ্যা নয়। হিন্দুর কত কীর্ত্তিই যে মোগল পাঠানের হাতে ধ্বংস হয়েছে তার সংখ্যা হয় না!

দুর্গ ও প্রাসাদ দেখে আমরা অম্বর প্রাসাদ সংলগ্ন যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রবেশ করলুম। মানসিংহ যখন বাংলার গৌরব মহারাজা



অম্বরের পথে

প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে আসেন সেই সময় যশোরেশ্বরী ভবানী কালিকাকেও তুলে নিয়ে এসেছিলেন। দেখলুম এ মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ নূতন সংস্কার হচ্ছে। বাহিরে এখনও কাজ চলেছে। এখানেও বাঙালী পূজারী। তবে তাঁর কথাবার্ত্তায় একটু হিন্দী টান এসে গেছে। তাঁরা পুরুষানুক্রমে এই যশোরেশ্বরীর পূজা করেন। মানসিংহ নির্ব্বোধ নন। মাকে আনবার সময় পূজারীকেও ধরে এনেছিলেন। এঁরা আজও বাংলা দেশে গিয়েই বিবাহ করে আসেন। পূজারীর মুখে শুনলুম, যশোরেশ্বরীর মন্দির ভেঙে পড়েছিল। বড়ই দুর্দ্দশায় দিন কাটতো। কোনও রকমে নমনম করে পূজা সারা হ'ত। বর্ত্তমান মহারাজা কি জানি কেন হঠাৎ গোবিন্দজীর পরিবর্ত্তে মায়ের ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রতি সপ্তাহে পূজা দিতে আসেন। তাঁরই দৌলতে মায়ের অবস্থা ফিরে গেছে। কারুকার্য্যখচিত দশমহাবিদ্যার মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ রজত মন্দির দ্বার। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ মূল্যবান মর্ম্মর শিলায় মণ্ডিত। মন্দিরেও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। জয়পুরী পাথরে শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনপূর্ণ কুম্ভ, সশীর্ষ ডাব ও কদলী বৃক্ষ মায়ের দুয়ারের দু'পাশে শোভা পাচ্ছে। তোশের পর্দ্দা সাঁচ্চা শল্মার কাজ-করা ভেলভেটের তৈরী। সমস্ত পূজার আসবাব ও সিংহাসন সোনা রূপায় মোড়া। সত্যই মায়ের কপাল ফিরেছে বটে! অনেকক্ষণ বসে পূজারীর সঙ্গে আরও অনেক গল্প করে আমরা যখন হোটেলে ফিরলুম তখন একটা বাজে! কুশল এসেছিল, দেখা পায়নি। লিখে রেখে গেছে, তার বাড়ী আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ! বিকেলে ধীরেন এসে বলে গেল যে, একখানা প্রাইভেট মোটরের ব্যবস্থা করেছে। কাল সকালে আমাদের সিঙ্গাঁয়ার জৈন-মন্দির দেখতে নিয়ে যাবে। ধীরেন সঙ্গে এনেছিল একথালা সন্দেশ! জয়পুরে তখন মেঠাই নিষিদ্ধ। শুনলুম পুতুমা কাল রাত থেকে আয়োজন করে এই অসাধ্য সাধন করেছে। তৎক্ষণাৎ আস্বাদ নিয়ে দেখা গেল ভীম নাগ কোথায় লাগে! চমৎকার সন্দেশ করেছে পুতু।

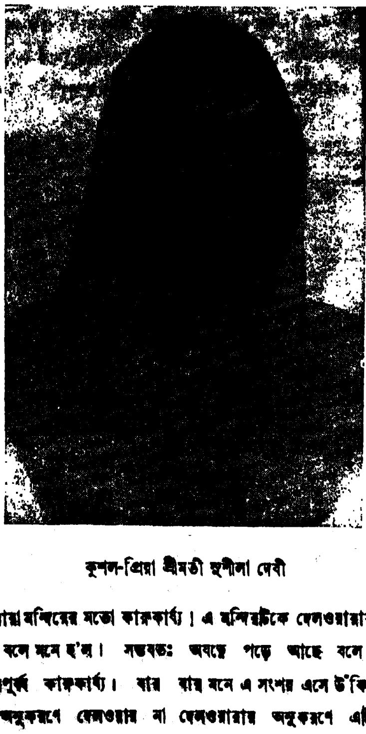


অম্বর প্রাসাদ ও দুর্গ

সন্ধ্যানাগাদ আমরা কুশলের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলুম। রাজকীয় প্রাসাদতুল্য সুন্দর অট্টালিকা, টেনিস কোর্ট, বাগান, লন। মোটর গ্যারেজ ও সার্ভিস কোয়াটার সবই আছে। বললে—ষ্টেট থেকে দিয়েছে। ভাড়া লাগে না। শুনে আনন্দ আরও বেশী হল। শিল্পীর বাড়ী যেমন হয়। আগাগোড়া দামী কার্পেট-মোড়া নানা মূর্ত্তি ও চিত্র সজ্জিত প্রত্যেক ঘরখানি। শিল্পীর প্রিয়তমার সঙ্গে পরিচয় হল এই প্রথম। তিনি যেন শিল্পীর প্রিয়তমা হবার জন্যই আবির্ভূতা হয়েছিলেন এই পৃথিবীতে! ধীরগতি মৃদুভাষিণী হাস্যোজ্জ্বলা সুদর্শনা মহিলা। একটা স্বাভাবিক অভিজাত্য যেন তার সর্বাঙ্গে জড়িত। কুশলের বাড়ীর অতিথি ছিলেন তাঁরই ভগ্নী অর্থাৎ কুশলের এক শ্যালিকা। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী আমাদের খুবই আদর যত্ন করলেন। কতরকম খাওয়ালেন। জয়পুরী ডিশও বানিয়েছিলেন আমাদের জন্য। বন্ধু-পত্নীও শিল্পী ও সুলেখিকা। তাঁর হাতের তৈরী অনেক কারুকার্য্য দেখলুম এবং দেখে মুগ্ধ হয়ে এলুম। জয়পুরে বসে আঁকা কুশলের হাতের অনেকগুলি বড় বড় তৈলচিত্রও দেখবার সৌভাগ্য হল। গানে গল্পে আলাপে হাস্যপরিহাসে ও মুখরোচক খাদ্য পানীয়ে সন্ধ্যা কাটিয়ে ফিরে এলুম হোটেলে।

পরদিন সকালে ধীরেনের পাঠানো মোটর এসে হাজির। আমরা সত্বর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে বেরিয়ে পড়লুম সান্দানীয়ের প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির দেখতে। মন্দিরটি জয়পুর থেকে ২৮ মাইল দূর। যাবার পথে আমরা নূতন রাজপ্রাসাদ দেখে গেলুম। মহারাজ এখন প্রাসাদে রয়েছেন, কাজেই ভিতরে প্রবেশ করা গেল না। বাইরে থেকেই খানিক দর্শন করা গেল।

সান্দানীয়ে পৌঁছে আমরা সেখানকার প্রাচীন জৈন মন্দির দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একেবারে হুবহু আবু পাহাড়ের



কুশল-প্রিয়া শ্রীমতী সুশীলা দেবী

দেলওয়ারা মন্দিরের মতো কারুকার্য্য! এ মন্দিরটিকে দেলওয়ারার চেয়েও প্রাচীন বলে মনে হ'ল। সম্ভবতঃ অযত্নে পড়ে আছে বলে। কিন্তু কী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য। বার বার মনে এ সংশয় এসে উঁকি দিচ্ছিল এরই অনুকরণে দেলওয়ারা না দেলওয়ারার অনুকরণে এটি তৈরী হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে মন্দিরটি দেখে এবং আশে পাশের আরও কয়েকটি মন্দির দেখে আমরা ফিরে এলুম। দেখি কুশল এসে হাজির। বললে, আজ সন্ধ্যায় তোমাদের বায়োস্কোপ দেখতে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আমরা বললুম, জয়পুর যে ছেড়ে যাবো আজ। কুশল বললে, আজ নয়। তোমাদের জন্ত গাড়ী রিজার্ভ করিয়েছি কাল। আমাদের দিল্লী নেমে লক্ষ্ণৌয়ে বন্ধুবর শিল্পী অসিতকুমার হালদারের নিমন্ত্রণ রেখে কলকাতায় ফেরবার কথা ছিল। কুশল বললে—ক্যানসেল করে দাও সমস্ত ট্যুর-প্রোগ্রাম। দিল্লীতে ভীষণ 'রায়ট্' হচ্ছে। সোজা কলকাতা চলে যাও। তোমাদের একেবারে শুধু ক্যালকাটা রিজার্ভ করিয়ে দেবো, যাবার পথে অমুক অমুক ষ্টেশনে একটু সতর্ক থেকো, ভয় নেই বিশেষ।

শুনে একটু মনটা মুষড়ে গেছলো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রি ৯টায় শোতে সিনেমা দেখতে গিয়ে মনটা খুশী হয়ে গেল। কুশল শিল্পী কিনা—ছবি বেছেছিল ভালো। আমরা দেখে এলুম 'সুভদ্রা-হরণ'! বলা বাহুল্য হিন্দী ছবি—কিন্তু প্রযোজনা, অভিনয়, সঙ্গীত, আলোক চিত্র, বাণী সবগুলিই ছিল নির্দ্দোষ।



প্রাচীন জৈনমন্দিরে (সাঙ্গেরী)

পরদিন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা জয়পুর ছাড়লুম। কুশল এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে সে আমাদের যাত্রার সুব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু এসে দিল্লীতে আমাদের রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্টে দেখি বৈমাত্র ভায়েরা দখল করে বসে আছেন। রেলের কর্তৃপক্ষকে জানাতে তাঁরা এসে জনকতককে বলপূর্ব্বক নামিয়ে দিলেন বটে কিন্তু বয়োবৃদ্ধরা নামতে চাইলে না। মিনতি করে বললো ঘুণ্টার জন্ত মাফ করুন। আলিগড়ে নেমে যাবো আমরা। কথায় কথায় জানা গেল তাঁরা দাঙ্গার ভয়ে দিল্লী ছেড়ে আলিগড় পালাচ্ছেন। আলিগড়ে গাড়ী খালি করে দিয়ে নেমে গেলেন। আমরাও আবার শুয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম।

শেষ



ত্রিশ বছর পরে

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ

—"প্রায় শেষ করে এনেছি"

—"কি ?"

—"পথ।"

—"যা কেউ পারলে না, তাই তুমি শেষ করলে ?"

—"পারে না তারা, যারা মনে করে সব পথটাই তাদের"—

—"তাহলে আমিই শুধু পড়ে থাকবো এই পথের পাশে"—

—"যদি মনে করো তোমার চলা শেষ হয় নি"—

—"তোমার এরই মধ্যে শেষ হলো ?"—

—"তুমি যখন এলে তখন তো আমি পথের মাঝে—সেজন্যে এগুতে, আর শেষ করতে বেশী দেরী হলো না"—

—"তাহলে কি করবে এখন"—

—"দেখব কোন নূতন পথের সন্ধান—যদি মেলে সেখানে কোন অপরিচিতের দর্শন"—

—"কেন, পরিচিত বুঝি আন্‌লো বিরক্তি"—

—"তা তো বলি নি, বল্‌ছি অপরিচিত নবীনের সঙ্গে পরিচিত হবো—প্রাচীনকে ত্যাগ করবো বলিনি তো"—

—"তোমার কথা বুঝতে পারি না"—

—"চেষ্টা কর না"—

—"চেষ্টা করি, কিন্তু গুলিয়ে ফেলি"—

—"নিজের জীবনে অনেক গোলযোগ ব'লে"—

অমিতাভ একটু হাসলো।

রাণু চুপ ক'রে রইলো গম্ভীর হোয়ে। চঞ্চল একটা হাওয়া যেন সহসা বন্ধ হোয়ে গেল।

—"রাগ করলে ?"—(অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো অমিতাভ।)

—"না"—(সংক্ষেপে বললো রাণু।)

—"সত্যিই আশ্চর্য্য, তোমরা এতো ঠুন্‌কো ? সামান্যতেই ভেঙ্গে পড়ো"—

—"ভাঙ্গি না গড়ি ?"—

—"কি জানি, জিজ্ঞাসা ক'রো নিজেকে ?"

—"তবু তোমার ধারণা ?"—

—"নাই বা শুন্‌লে"—

"—ক্ষতি কি ?"—

—"যদি আরও ক্ষতি হয় !"—

—"যে ক্ষতি হোত—তুমি বাঁচিয়েছ, তার চেয়েও ক্ষতি"—

—"হোতেও তো পারে !"—

—"বিশ্বাস হয় না"—

—"কাকে ?"—

—"তোমার কথাকে ?"—

—"এতখানি পথ চলার পরেও ?"—

বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলো অমিতাভ

—"আমি আর চললুম কৈ ? তুমিই তো টেনে নিয়ে এলে"—

—"হয় তো চালিয়ে এনেছি, কিন্তু চলার ইচ্ছে তো তোমার হোয়েছিল"—

—"হ্যাঁ, তবে ভয় হোয়েছিল সেই সেদিন"

—"কবে বল তো ?"—

—"সেই দুর্যোগের রাত্রি, যেদিন ওরা আমায় টেনে নিয়ে গেল, আমার স্বামীকে খুন করে"—

—"সে কথা মনে করে রেখেছো !"—

—"রাখবো না ! সেদিন উদ্ধার করলে তুমি, তোমার মাঝে দেখলাম পুরুষকে, তার বিজয়ীরূপকে—সেজন্যেই ভালবাসলাম তোমাকে"—

—"তারপর"—

—"তারপর, সবই তো জানো"—

—"জানি, তবু মনে হয় যেন অনেক ভুলে গেছি"—

—"সমাজ তোমাকে চিনল না—তার শাসন এলো তোমার উপর—তুমি আমাকে বিয়ে করলে বলে"—

—"সেটাকে তুমি সমাজ বলে মেনে নিতে পার মন দিয়ে"—

—"মন দিয়ে মানি নি, তবু তো দেখেছি তার রুদ্র ভীষণ রূপ"—

—"কিন্তু তাতে ভয় পাইনি, কারণ জানতুম ভূতের যে ভয় সেটা তো মৌলিক নয়"—

—"ভয় তুমি করতে না কিন্তু আমি কোরতুম"—

—"সেটুকু তোমার দুর্বলতা, কিংবা হয় তো পারনি আমাকে বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে"—

—"অনেক দিনের কথা, ভুলে গেছি, তবু মনে হয়, হয় তো তাই"—

—"তখনকার দিন, তোমার আমার পথ ছিলো নূতন, সেজন্যেই ভয় হোয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই পথে কত লোক চলেছে, এখন সে পথে এসেছে সমারোহ আনন্দের মেলা—কত নবীন প্রাণের আসর"—

—"তাই তো এ পথ ছাড়তে মায়া লাগছে"—

—"এ পথের কাজ তো শেষ করে এনেছি। যে সমাজকে আমরা ভয় করতাম, সেই ক্ষীণ সঙ্কীর্ণ সমাজ আমাদের ভয় করে—কেননা আমরা আবার গড়ে তুলেছি একটা পরিপুষ্ট সমাজ, একটা গোষ্ঠী—একটা নতুন জগৎ"—

—"আগামী কাল জানবে তাদিকে যারা আমাদের বংশধর"—

—"আদর করে নেবে প্রভাতের সোনালী কিরণের মতো—যারা নেবে না তারা থাকবে অন্ধকারে জীবনের পঙ্কিল আবর্ত্তে—দুনিয়া এগিয়ে চলবে কালকে এড়িয়ে, অতীতকে পিছনে ফেলে"—

—"যাক্ চল—অনেক রাত হোয়ে গেছে।"—

রাণু অনুরোধ করলে। সামনের আকাশের একটা তারকাও যেন তাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েকটা দিন পরে……আকাশে এলোমেলো মেঘের যাওয়া-আসা। যেন সারি সারি বলাকা পাখা মেলে উড়ে চলেছে কোন অজানা দেশে। বন্ধনহীন মন, রাণু ভাবছিলো ফেলে-আসা তিরিশটা বছরের কথা।

অমিতাভ জিগ্‌গেস করলেন—

—"কি ভাবছ, রাণু?"

—"ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা"—

—"এতদিন পরে!"—

—"কি জানি কেন মনে হলো আবার সেই ভীষণ রাত্রির কথা"—

—"রাতকে যদি ডেকে আনো দিনের আলোর সামনে—তোমাকে কি বলবে জানো?"—

—"পাগল তো?"—

—"হ্যাঁ"—

—"আমার তাতে দুঃখ নেই। ভাবনা হয় আলোককে নিয়ে—আর আমার নিজেকে নিয়ে"—

—"কেন?"—

—"আলোক পাবে সেই সম্মান?"

—"চোখ মেলে চেয়ে দেখো—দেখতে পাবে ভুল আমরা করিনি"—

—"কি ভুল বাবা?"

সহসা আলোক এসে প্রশ্ন করলে?

—"এই তোমার মা'র পাগলামী"—

—"সত্যি বাবা, মা যেন বড় রক্ষণশীল"—

—"কতকটা তাই, এখনও খাপ খাওয়াতে পারলে না চলতি পথের ও কালের সঙ্গে" —

—"আমি মাঝে মাঝে ভাবি, আজ হোতে তিরিশ বছর আগে তখনকার সমাজকে তুচ্ছ ক'রে তুমি এগিয়ে এসেছিলে কি করে?"

—"যা সত্য তাকে অবলম্বন করে—আর আদর্শকে সামনে রেখে। তোমার মাকে যখন বিয়ে কোরলাম—প্রথম ভাবলাম বুঝি আমি ভুল কোরলাম, তোমার মা'র মনকে জয় করতে পারিনি"—

আলোক শুনে যেতে লাগলো পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে।
অমিতাভ বলে যেতে লাগলো—

হয়তো ভাববে আমি তোমার মা'র সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হোয়েছিলাম, কিন্তু বাইরেকার সৌন্দর্য্যই তো সব নয়—ওঁর মনের অন্ধকারকে ঘুচিয়ে যে আলোক দেখতে পেলাম তাকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিশেষত তখনকার সমাজকে বাঁচাবার জন্যই বিয়ে কোরলাম তোমার মা'কে—

—"এটুকু তোমার উদার মনের সুষ্ঠু পরিচয়, বাবা"—

—"এটাকে উদারতা বললে ভুল করা হবে আলোক, এটা ছিলো আমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যেটাকে আশুতোষ বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন ঠিক, সেটাকে আমি অবহেলা করবো কোন যুক্তিতে"—

—"আমাদের সমগ্র হিন্দুসমাজ তখনও তো তা ভাবতে পারেনি"—

—"অনেকগুলো ব্যাপার আছে আলোক, যেগুলো আমরাও সব সময় ঠিক্ বুঝে উঠতে পারিনে, তাই বলে সেগুলোকে অস্বীকার করতে তো পারিনে"—

—"তুমি মনের দিক থেকে আমার চেয়ে এগিয়ে আছো"—

—"আমি তোমার চেয়ে এগিয়ে নেই—এগিয়ে আছো তুমিই আলোক। তবে তোমার ভেতর এসেছে তোমার মা'র দেওয়া রক্ষণশীলতার অন্ধকার—সেটুকু তোমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে—তবেই দেখা দেবে তোমার সামনে নূতন পথ—যে পথে আমার চলবার ইচ্ছে থাকলেও শক্তি নেই"—

—"কেন?"—

—"জীবনের অপরাহ্ণ। এই অবেলায় আর মন চায় না অনির্দ্দিষ্টের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে"—

—"তবুও তো তুমি ছেড়ে চলে যেতে চাও এই তিরিশ বছরের চলা পথ"—

রাণু বললে

—"কেন জানো রাণু? আলোককে পথ দেখিয়ে দিতে—আমার আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে। মনে পড়ে তোমাকে আমি বিয়ে করবার আগেকার কথা—তোমার মন ছিলো আমাদের প্রাচীন কোলকাতার মতো শুধু অন্ধকার আর সঙ্কীর্ণতা। সেখানে এনে দিলাম আলো, যার জন্য পেলে আলোককে—সমাজে হলো প্রতিষ্ঠা"—

—"সেজন্তে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ"—

—"ঠিক তেমনিভাবে আমি চাই আলোকের প্রতিষ্ঠা বৃহত্তর মানুষের সমাজে"—

—"কিন্তু তাহলে তো হারাবো আমরা তাকে"—

—"ক্ষতি কি যদিই হারাই তাকে? আমাদের নাইবা হোল লাভ—তুমিও তো এমনি করে একদিন হারিয়েছিলে সমীরকে"—

—"যখন আমার মন্দিরে এলে তুমি, তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিলাম আমার সমস্ত কিছু দিয়ে"—

—"আলোককে যদি তেমনি করেই কেউ চেয়ে থাকে আমি বাধা দিতে তো পারবনা রাণু"—

—"কিন্তু"...

—"এর ভেতর কোন "কিন্তু" নেই, যা সত্য তাকে উপেক্ষা আমি কোনদিন করিনি এবং কোরবও না"—

—"তাহলে আলোকও আমাদের ছেড়ে যাবে"—

—"যদি আমরা খাপ-খাওয়াতে না পারি, তার ভাব-ধারার সঙ্গে"—

—"তা আমি দোব না"—

রাণু একটু কাতরতার সহিত বলল

—"সে তো ভালো কথা, শিক্ষা যদি পেয়ে থাকো তোমার মনকে আধুনিক কালের উপযোগী করতে—তবেই তো তুমি হবে দুঃখজয়ী, আনন্দের প্রতীক্"—

—"তুমি আমাকে সেই আশীর্বাদই করো"—

—"আবার নূতন করে"—

অমিতাভ হেসে উত্তর দিল

আরও কয়েকটা দিন পরে। শীতের সকাল। সবুজ ঘাসের অঞ্চলে শিশিরের শুভ্র আস্তরণ। অমিতাভ বসেছিলো সামনের বাগানটাতে কা'র অপেক্ষায়। সদ্য স্নাতা মিত্রা। আলোক, অমিতাভের পাশেই বসে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিল। অমিতাভ বললে

—"সত্যি রাণু আজ তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে"—

—"নূতন ক'রে"—

স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলে মিত্রা

—"না, তা নয় রাণী, এই স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সন্তানের মা হিসেবে"—

—"সত্যি মা, তোমাকে এই বেশেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে"—

আলোক মুখে তুলে বললে

প্রশংসমান দৃষ্টিতে অমিতাভ আলোকের দিকে চেয়ে রইলো। রাণু বললে

—"তাহলে বাপ আর ছেলের জন্তে এবার রোজ সকালেই আমাকে চান করে গরদের কাপড় পরতে হবে—কিন্তু আলোক, তোর মা যদি তাতে অসুখ করে ম'রে যায়"—

—"আমাকে ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পারবে না মা"

একটু স্নেহের সহিত আলোক বললে

—"যাক আর একটা চেয়ার নিয়ে এসে ব'সো দিকি এখন"—

অমিতাভ আদেশ করলে মিত্রাকে

—"কেবল গল্প শুনলেই পেট ভরবে তো?"—

—"আহারের প্রয়োজন তখনই হয় রাণু, যখন মন থাকে উপবাসী—আজ শুধু আমার মনে হয় যদি আমি এখন জন্মাতাম। ঝাঁপিয়ে পড়তাম কল্পস্রোতে—সমাজের, দেশের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এনে দিতাম নূতন সঙ্গীত, নূতন রক্তস্রোত"—

—"সত্যিই এটা আমাদের সৌভাগ্য, পরাধীনতার বেদনা আমাদিকে পেতে হয় নি। যখন কল্পনা করি তখন মনে হয় সে যেন একটা বিপুল অন্ধকার—যার মধ্যে ভারত হারিয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য, তার আত্মা ও তার প্রাণকে"—

আলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে কথা কয়টা বলে। অমিতাভ বললে

—"স্বাধীন হোয়ে আমরা দেখলাম জগৎ অনেক দূর এগিয়ে। তাকে ধরবার জন্যে আমরা ছুটেছি প্রাণপণে—তবু এমনও অনেক জায়গা আছে আমাদের মনে ও সমাজে, যেখানে সত্যকার আলোক পৌছতে পারে নি—সেখানটার আলোক এনে দেবার ভার দিয়েছে দেশ তোমাদের উপর"—

—"আমরা জন্মাবার পরই দেখেছি আলো—শুধু আলো—সেজন্যেই বুঝতে পারেনি এতো আলোর মাঝে অন্ধকার কোথায় আছে?"—

—"সে নির্দ্দেশ দোব আমরা—যারা বয়ে এনেছে দুঃখময় অতীতের বেদনাময় স্মৃতি—আর দেবে এই চলমান মহাকাল ও তোমাদের বিবেক, যার উপর গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল ইতিহাস"—

—"তিরিশ বছরের আগেকার ইতিহাস তুলনা করলে দেখতে পাই তোমরা সব শূন্যতাই পূর্ণ করেছ"—

—"তার বিচার করবে তোমরা আর বিশ্বের ইতিহাস। কিন্তু তবুও আমার মনে হয় একটা মস্ত বড় দিক আমরা অবহেলা করে এসেছি—সেটা হোলো আমাদের সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থা"—

—"ওটা তোমার একটা চিরকেলে খেয়াল"—

রাণু একটু যেন অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলল

—"না, মা। বাবা নিজের জীবনে যেটার অভাব উপলব্ধি না করতে পারেন, সেকথা বাবা খেয়ালবশতঃও বলেন না"—

আলোক যেন একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ল

—"আমি চাই আলোক, আমাদের সমাজে প্রকৃত সাম্য। এখনও হয়তো আমরা অনেককে দূরে রেখেছি, কেবলমাত্র আমাদের অহঙ্কার। আমরা ভাবি, আমরা তাদের চেয়ে বড়"—

—"তাহলে তোমার ইচ্ছে মুড়ি-মুড়কী সব এক হোয়ে যাক্"—

রাণু একটু শ্লেষের সহিত বলল—

—"একদিন তো তাই ছিলাম রাণু—যেদিন আমরা কয়েকটা মানুষ পৃথিবীতে এলাম। সেদিন ছিলো কোন প্রভেদ—ঐ ওবাড়ীর নীলিমাতে আর তোমাতে?"—

অমিতাভ প্রশ্ন করলে

—"হয় তো ছিল না, কিন্তু আজ যে ব্যবধান এসেছে ওদের ও আমাদের ভেতর সেটুকু ওদের বৃত্তির জন্যে—এ কথা স্বীকার করতো?"—

রাণু উল্টে প্রশ্ন করলে

—"স্বীকার করি আমাদের এই জাতিভেদের প্রাচীন ইতিহাসকে। কিন্তু আজ যদি দেখি নীলিমা পেয়েছে শিক্ষা, সভ্যতা, মানুষের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই—কেন আমি নেবোনা তাকে আপনার কোরে?"—

অমিতাভ দৃঢ়তার সহিত বললে

—"তুমি পারবে বাবা নীলিমাকে আশীর্বাদ ক'রে ঘরে তুলে নিতে?"—

আলোক একটু চঞ্চল হোয়ে প্রশ্ন করলে

—"কেন পারব না। আমি যে জানি আমাদের সঙ্কীর্ণ সমাজ একদিন মিশে যাবে সমগ্র বিশ্বের মানুষের বৃহত্তম সমাজের মাঝে। বিশেষতঃ যদি দেখি নীলিমার মধ্যে আছে সেই মানুষের রক্ত, সেই আত্মা, যা অনাদিকাল হোতে প্রকাশিত হবার জন্যে ব্যগ্র হোয়ে রয়েছে"—

—"তোমার মনে ঘৃণা হবে না বাবা। সে জন্ম নিয়েছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মাঝে"—

আলোক প্রশ্ন করলে

—"সমাজের এই অন্ধকারের কথাই বলছিলাম আলোক—যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন রয়ে গেছে। কি ক্ষতি যদি আমাদের ভেতরকার ছোট ছোট জাতগুলো ভেঙে একটা বিরাট জাত হোয়ে পড়ি।"—

অমিতাভ উত্তর দিলে।

—"তবে আমার একটু অনুরোধ আলোক, নীলিমাকে খুলে বলতে হবে তোমার জন্ম-ইতিহাস এবং নিজের বিবেকের কাছে জেনে নেবে যে, তাকে তুমি পবিত্রভাবে নিতে পারবে কি না ?"—

রাণু একটু গাম্ভীর্য্যের সহিত বললে

—"নীলিমার বাবার কি মত জানো, মা ? তিনি বলেন, বিবাহ আইনসঙ্গত বা ন্যায়সঙ্গত হোলেই হোলো—শাস্ত্র তো আমাদের নিজেদের তৈরী, সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ ?"—

আলোক উত্তর দিলে

—"আমি শুধু দু-একটা দৃষ্টান্ত চাইনে, আলোক। ভারত চায় তোমাদের মত তরুণের কাছে এক নূতন সমাজ। যেখানে থাকবে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার যুগ্ম-স্রোত। এর পরে আবার যখন আমরা জন্মাব তখন ইতিহাসের পাতা উল্টে যেন বুঝতে না পারি যে তোমাদের গড়া সমাজে এসেছে পাশ্চাত্য উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হারিয়েছে ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সংযম"—

আলোক চলিয়া গেল। অমিতাভ মিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল—

—"খুব ভয় পেয়েছিলে রাণু, তিরিশ বছর আগে যখন এ-পথে আমরা পা দিয়েছিলাম প্রথম"—

—"ভয় হোয়েছিল কেন জানো ? মনে হতো যদি সমাজ ব্যবস্থা না বদ্‌লায় আমরা হোয়ে যাবো অতি নিঃসঙ্গ"—

রাণু বললে—

—"তা হোতে পারে না মিত্রা। যা সত্য তা একদিন প্রকাশিত হবেই তার নিজের উজ্জ্বলতা নিয়ে। সেদিন তোমায় বলেছিলাম একদিন মানুষ তার ভুল বুঝবে। আমার এখনও দুঃখ এই ভেবে যে শুধু আমাদের কাপুরুষতার ও বিবেচনার অভাবে তোমার মত কত মেয়ে—যারা গ'ড়ে তুলতে পারতো সুন্দর শান্তিপূর্ণ ঘর, তাদের জীবন বৃথা হোয়ে গেছে অবহেলায়"—

অমিতাভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

—"সংসারের একটা জীবনের সুরকেও তো তুমি মধুর করে তুলেছো—কিন্তু আরও তোমার মত অনেকে ছিলো—তারা ?"—

—"সেখানেই আমাদের বড় ভুল মিত্রা, যখন আমরা ভাবি আমিই বুঝি লোকসান কোরলাম সংসারের কেনা-বেচায়, আর সবাই হোল লাভবান"—

—"এখন তো তোমার লাভের আশাই বেশী"—

রাণু একটু স্মিত হাস্যের সঙ্গে বলল।

—"সেইটুকুই আমার পুরস্কার মিত্রা—ভগবানের কাছ হোতে"—

রাণু ও অমিতাভ উঠিয়া পড়িল। সামনের গোলাপ-কুঞ্জে তখনও ভ্রমরের মেলা। বাগানের ছোট পৃথিবীতে শুভ্র শেফালীর আলিপনা।

বুদ্ধ ও যুদ্ধ

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধ বলেন—"যুদ্ধ ক'রোনা, হিংসা ক'রোনা, শান্ত হও।"
হেসে মরি—"ওগো ভগবন্ ! তুমি আমার মতন মানুষ নও…
শান্তির কথা বলো যাহা কিছু, সব জানি, সব বুঝি—
তবুও প্রকৃতি নীরমান আমি স্বার্থের তরে যুঝি।

শক্তিমানের দাপটে কাঁপিছে ভয়ে দুর্ব্বল চিত্ত,
তাই তো আমার শক্তি সাধনা, কামনা অর্থ-বিত্ত !
শান্তিপ্রিয় হবো সেই দিন, ভীরু কাপুরুষ যারা—
রুখিয়া দাঁড়ায়ে বলিবে, "তোমারে করিব শক্তি-হারা !"
শক্তির ভার-কেন্দ্র যদি না সাম্য করিতে পারো,
শক্তিমানেরা শান্ত হবে না, যত উপদেশ ঝাড়ো।

দুর্ব্বল যদি সবলের পায়ে নিজে করে মাথা নত—
পদাঘাত হবে ন্যায্য পাওনা, হবে তারা হতাহত।
বাঁচিবার সম-অধিকার দাও—ফেলি' ভিক্ষার ঝুলি
সমানে সমানে সম্ভব হবে—শান্তির কোলাকুলি।

সংস্কৃতির শত্রু মাদক-দ্রব্য

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

মদ্যং অপেয়ং, অদেয়ং, অগ্রাহ্যম্। প্রবচনটি বহুকাল হইতে প্রচলিত হইলেও মদ্যপান ও শৌণ্ডিকালয়ে গমন সরাসরি কখনও বন্ধ হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত প্রাচ্যের পার্থক্য এই যে, মদের প্রশস্তি বন্দনা এদেশে কখনও সমাদৃত হয় নাই।

মদ ও সুরার ন্যায় অহিফেন, গঞ্জিকা, চরস প্রভৃতি উৎকট মাদক দ্রব্য—একাধারে বিষ ও অমৃত। চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত মাত্রায় এই সকল মাদক দ্রব্য, ঔষধ, অমৃত প্রসবিনী ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগীর নিকটে নরকের দ্বার। অনিয়মিত ও অপরিমিত ব্যবহার মানুষকে কুক্রিয়াশক্ত করে এবং পশুর স্তরে নামাইয়া দেয়, জাতির অধিকাংশ নরনারী নির্বিচারে নেশার বশীভূত হইয়া পড়িলে তাহার অমৃত-সঞ্জীবনী শক্তি হইয়া পড়ে ব্যাহত, শুদ্ধসত্ত্বগুণবিবর্জিত নরনারী বামাচারী, শক্তিহীন, নিস্তেজ ও নির্জীব। দারিদ্র্য ও অনাচারে দেশ পূর্ণ হওয়ায় স্বাধীনতা বিকাইয়া যায়, বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

জীবন্ত সমাজ মদ ও মাদক দ্রব্যের অনিয়মিত ব্যবহার কখনও সমর্থন করে নাই ! জাতি যখনই নবীন আদর্শে ডগমগ হইয়া উঠিয়াছে তখনই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এই পুরাতন দুষ্ট ব্যাধির বিরুদ্ধে। কুসুম সুষমামণ্ডিত, কিন্তু কুসুমের অন্তঃস্থলেই কীট বাস করে। বর্ণ-সুষমায় পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথেই কুসুম কীটের অভিসার সুরু হয়। মানব সভ্যতার কাহিনী অনেকটা অনুরূপ, তাহার রাজপথ কখনও কুসুমাস্তীর্ণ হয় নাই। আদিম বন্যতার অভিশাপ তাহার সহযাত্রী, জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকাকালে এই অভিশাপ থাকে রক্তের মধ্যে ঘুমাইয়া নিস্তেজ হতচেতন অবস্থায়। সভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সাথে এই আদিম বন্যতা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নির্মম ও কদাকার অভিযান সুরু হয়। সময় সময় রাষ্ট্র আসিয়া যোগ দেয় এবং এই মর্মান্তিক অত্যাচারকে বিচারের প্রহসনে অসহনীয় করিয়া তোলে, নির্মমতায় সকল মাধুরী লুপ্ত হয়, অত্যাচার যতই তীব্র হয় অনন্ত-মানব-অন্তঃকরণে সুধারস ধারার ক্ষরণ অলক্ষে তত বেশী বৃদ্ধি পায়। একদল আত্মভোলা দরদী মানুষ আত্মার এই অপমানে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে ; বজ্রদহনে আপন পাঁজরা জ্বালাইয়া দিয়া সকলের জন্য আলোকের সমারোহ সৃষ্টি করে। এই বিভিন্নমুখীন, দোটানা স্রোতের কলকাকলী সংক্ষেপে সংস্কৃতির ইতিহাস।

সম্প্রতি বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ায় মানুষের আদিম বন্য চরিত্রের এক নির্মম কাহিনী অবগত হওয়া যায়। অখণ্ড ভারতে গাঁজার চাষ হইত পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু অহিফেন পাকিস্তানে উৎপন্ন হয় না। ভারত বিভক্ত হওয়ায় এক অংশের গঞ্জিকা-সেবীর তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি বন্ধ হয়, কিন্তু অপরাংশের অহিফেন-সেবীর জীবন হয়ে পড়ে মরুভূমি। মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তি তৃপ্তির অসুবিধা বিদূরিত করিবার জন্য একদল মানুষ গাঁজা অহিফেন বিনিময়ের বাজার খোলে। ভারত ব্যবচ্ছেদের লক্ষ লক্ষ বেদনাময় কাহিনীর কারুণ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া সর্পিল পথে উভয় সম্প্রদায়ের এই মিলন-মধুর কাহিনী, অসামাজিক উপায়ে নিজেদের রুজিরোজগার গুছিয়ে লওয়া, আদিম বন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নহে কি ?

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় ভারতবাসী মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। সর্বোদয় মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল গান্ধিজীর শুদ্ধসত্ব রাজনীতির লক্ষ্য। কালিমাময় নোংরা জীবন পরিত্যাগ করিয়া সামাজিক বিশুদ্ধতায় পবিত্র জীবন যাপনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেশী, বিদেশী মদ, গাঁজা, ভাং, চরস ও আফিমের দোকানে 'পিকেটিং' করিবার অপরাধে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সাজা হইয়াছে, তবুও তিনি নিরস্ত হন নাই, পবিত্র চেতনাসম্পন্ন জাতির উদয় ছিল তাঁহার কল্পনা। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন মদ, গাঁজা, তাড়ি ও অহিফেনের অবাধ ব্যবহারে, মানুষের মনুষ্যত্ব ও জাতির মণিকোঠা গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অস্পৃশ্যতা, ধর্ম্মের নামে বুজরুগি এবং সামাজিক বিদ্বেষ এই সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞে হাতে হাত মিলাইয়াছে, তাই কয়েক সহস্র নগরের সহিত ছয়লক্ষ গ্রামের কথা ছিল তাঁহার সমুদয় চিন্তার অগ্রে। জাতির মণিকোঠা, গ্রাম, এতকাল জাগ্রত ছিল বলিয়াই শক, হূণ, যবন, তাতার ও আরব আক্রমণে ভারতের আত্মার মৃত্যু হয় নাই। বৈদেশিক প্লাবনে নগর পুনঃ পুনঃ ধ্বংস হইয়াছে, গ্রামীণ সভ্যতা বৈদেশিক আক্রমণ আত্মস্থ করিয়া পুনরায় ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে নগরের পুনরুত্থানে সাহায্য করিয়াছে, বরং যুগে যুগে মদগর্বিত বিজয়ী আগন্তুক উচ্চচেতনাসম্পন্ন বিজিত জাতির সংস্কৃতির নিকটে পরাভূত হইয়া কালে এই দেশের জাতির দেহে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহারা কেবলমাত্র ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে নাই। বহুক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী তাহারাই দেশ বিদেশে বহন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই গ্রামীণ সভ্যতা ধ্বংস হওয়ায় চিরমুখর ভারত স্তব্ধ হইয়া পড়িল, বৈদেশিক বিজয় দূরের কথা—ঘরে বাইরে পরাজয় ও বিপর্য্যয় তাহার নিত্যদিনের সাথী হইয়া পড়িল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালক তাই এই গ্রামকে, শতাব্দীর অভিশাপে উৎপীড়িত গ্রামীণ সভ্যতাকে, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সামাজিক বিপ্লব আনিতে চাহিয়াছিলেন্। লবণকর ও আবগারীতে সরকারের কোটী কোটী টাকা লাভ হয়, সকলেই জানে জাতি গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু কেবলমাত্র অর্থে জাতির উন্নতি হয় না, বিপুল স্বার্থত্যাগ ব্যতীত জাতি আত্মস্থ হয় না, নবজীবনের প্রভাতে তিতিক্ষা ও ত্যাগধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাই ছিল জাতির পিতার

আকাঙ্ক্ষা। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে প্রদেশে প্রদেশে মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম এবং তাড়ির উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করা হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সরকার জাতিকে ব্যসনে ও নৈতিক কুক্রিয়ায় আসক্ত করিয়া বিপুল অর্থ রোজগার করিত, বর্ত্তমান আজাদী সরকার ঐ বিপুল অর্থের বিনিময়ে জাতির সম্বিত ফিরাইয়া নববিধানের গোড়া পত্তন করিতে চাহিতেছেন। ঠিক এই সময়ে আমাদের দেশে মদ ও মদ্যপের বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে সকল অভিযান চলিয়াছিল এখানে তাহার উল্লেখ হয় তো অস্বাভাবিক হইবেনা।

অতীত যুগে কপিশার উষর প্রান্তরে সোমরস আর্য্যদিগকে গৃহবিবাদে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সোমরসে আচ্ছন্ন নরনারী আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অজানার পথে পাড়ি দিয়াছিল সত্য, কিন্তু সোম-মদিরা চিরদিন তাহাদের তনুমনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। অনুসন্ধিৎসা ও সংগ্রাম তাহাদিগকে নবজীবনের প্রভাতে রূপ রস ও জ্ঞানের আলোকে প্রভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সমুদ্রমন্থনে হলাহলের সহিত সুধাও উঠিয়াছিল। মোহিনীর বিলোল কটাক্ষ ও মোহিনীমায়া সুরগণের অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করিলেও হলাহল হইতে ত্রিভুবন রক্ষা করে কে? দেবকুলনিন্দিত একঘরে উমাপতি সেই হলাহল পান করিয়া জগৎ রক্ষার কারণ হইয়াছিলেন। আর্য্যদের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদে সোমরসের প্রশস্তি পাওয়া গেলেও সোমরসের সুধাধারায় আর্য্য নরনারী ও দেবকুল আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই। সোমলতা মন্থন হইতে সেবন অবধি প্রক্রিয়া একটি ধর্ম্মীয় অনুশাসনে নিষ্পন্ন হইত। সম্ভবতঃ ধর্ম্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ ছিল বলিয়া মদ্যপের বাড়াবাড়ির খবর বিশেষ জানিতে পারা যায় না। ইন্দ্রের রাজসভা কিম্বা নৃত্য-পটিয়সী অপ্সরাদের কথা সাধারণ নরনারীদের বেলায় উঠে না। মর্ত্তে আর্য্যদের মধ্যে কেবলমাত্র কৃষির দেবতা হলধারী বলরাম প্রায়শঃ সোমরসে আচ্ছন্ন থাকিতেন। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে মদিরা ব্যতীত ধর্ম্মচর্চা শাস্ত্রবহির্ভূত ব্যাপার ছিল। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে চক্রে মাংস, মদ ও নারী পূজার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। সাধারণের মধ্যেও যাঁহারা শক্তি চর্চা করিতেন কিম্বা যুদ্ধজীবী ছিলেন মদ তাঁহাদের প্রিয় ছিল। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রকার, স্মৃতি, বৌদ্ধ, জৈন, ও বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা মদ ও মদ্যপদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। স্বাধীন, অনাড়ম্বর ও পবিত্র অন্তঃকরণই অসীমের ধ্যান ধারণা করিবার অধিকারী, সমাজদেহ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের দৈনন্দিন আহার বিহার ও মানসিক অনাবিলতা অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। সৌভাগ্যের বিষয় পুরাকাল হইতে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পানদোষের আধিক্য খুবই অল্প ছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে দৈনিক জীবনে অষ্টশীল পালন অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য ছিল। জৈন মতাবলম্বীরাও অহিংসা এবং কঠোর চারিত্রিক বিশুদ্ধতার উপরে জোর দিতেন। শঙ্করের আবির্ভাবের পরে নব্য হিন্দু সংগঠনে অষ্টাদশ পুরাণ বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারতের অবদান যথেষ্ট। প্রত্যেক গৃহিবর্গী এই সকল গ্রন্থ ভাণ্ডার হইতে দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষা ও সুষমা গ্রহণ করিত। এই কারণে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে সুরাপান অপেয়ং, অদেয়ং, অস্পৃশ্যম্ হইয়াছিল। নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃত পংক্তি হইতে আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

রামায়ণ আর্য্যদের এক অতি পুরাতন ও পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি, সবার উপরে মানুষের সত্যিকার সরল কাহিনী জানিতে পারা যায় বলিয়া ধর্ম্মপুস্তক হওয়া সত্বেও সর্বকালের সর্ব স্তরের সর্ব নরনারীর ইহা প্রিয়। এই রামায়ণের যুগে সাধারণ নরনারী মদ ও মদিরাকে অস্পৃশ্য মনে করিত। কিন্তু রণদুর্ম্মদ ও যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা আসব প্রিয় ছিল, বিশেষতঃ যুদ্ধের পূর্বে উত্তেজক মদ্য পান করান হইত। তথা তাহার এই উত্তেজক আসবকে 'বীরপান' বলা হইত।(১) রাজদরবারে মদ একেবারে অপাংক্তেয় ছিল ইহাও বলা যায় না, রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্র যখন সানুজ লক্ষ্মণ ও পত্নী সমভিব্যাহারে বন গমন করিলেন তখন শোকার্ত্ত রাজা দশরথ রাজ্যের যাবতীয় খাদ্য দ্রব্যাদি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য সুমন্ত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন, কৈকেয়ী সেই আদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব
নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে।

মহারাজ, সব ধন যদি চলেই যায় তবে পীতসার আস্বাদহীন সুরার ন্যায় শূন্য রাজ্য ভরত নেবে না।(২) রাজা-রাজড়াদের মধ্যে সুরার প্রচলন না থাকিলে মহাকবি বাল্মিকী রাণীর শ্রীমুখে সুরার উপমা দিলেন কেন? কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালির মৃত্যুর পরে সুগ্রীব রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় অধীর সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বানর কটক দিয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত, কিন্তু সদ্য রাজশ্রী এবং মহারাণী তারাকে পাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞার কথা সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ অনুযোগ দেওয়ার জন্য সুগ্রীবের প্রাসাদে গমন করিলে রাণী তারা অসময়ে তাহাদের কামভোগে বাধা দেওয়ায় যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানের প্রমত্তাযৌবনমদমত্তা নারীর মুখেও বেমানান মনে হয়।(৩)

ভরত রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সসৈন্যে শ্রীরামের অনুগমন করেন; পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে সসৈন্য ভরতকে আপ্যায়িত করা হয়। সেই মধুর আপ্যায়ন সভায় ভরতের অনুগামী সৈন্য, সামন্ত, দাস-পরিচারকদের জন্য পায়স ও মাংস ব্যতীত নারী ও সুরার ব্যবস্থা ছিল। এক একজন পুরুষকে সাত আটজন সুন্দরী স্ত্রী নদী তীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্যপান করাইতে থাকে। পান ভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হয়ে বলিতে লাগিল—

---

(১) শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় অনূদিত রামায়ণ।

(২) শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয় অনূদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ৯৭ পৃঃ।

(৩) রামায়ণ ২৩৬ পৃঃ,

নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যাম দণ্ডকান্।
কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথাসুখম্॥(৯১।৫৯)

আমরা অযোধ্যায় যাবো না, দণ্ডকারণ্যেও যাবো না, ভরতের মঙ্গল হোক, রামও সুখে থাকুন (৪)। হনুমান লঙ্কা বিধ্বস্ত করিয়া সদম্ভে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে সমস্ত বানর কটক নেতার বিজয় আস্ফালনে পুলকিত হইয়া উঠিল। কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে এই শুভ সংবাদ ভেট দেওয়ার জন্য তাহারা সদলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রাস্তায় মধুবনের নিকট উপস্থিত হওয়ার পরে মধুচক্র দর্শনে তাহাদের পদযুগল গতিহীন হইয়া পড়ে। প্রধান নেতা অঙ্গদ বানরদের অবস্থা বুঝিয়া মধুপান ও সুগন্ধ ফলমূল খাইতে অনুমতি দিলেন। মধুপানে তাহাদের নেশার লক্ষণ সুরু হইল। মহানন্দে ভূতলে, ভূতল হইতে বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঠিয়া মধুপান চলিতে লাগিল। মহাকবি লিখিয়াছেন, মূত্রের সহিত মধু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মধুপানে ক্ষান্ত হয় নাই (৫)।

কুম্ভকর্ণের কথা আরও বিচিত্র। প্রচুর মাংস, শোণিত এর সহিত দুই সহস্র কলস মদ্যপান না করিয়া তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিতেন না। উদাহরণ না বাড়াইয়া সংক্ষেপে বলা যায় রামায়ণের যুগে অন্ততঃ-পক্ষে যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে মদ্যপান প্রথা ছিল। কিন্তু রামচন্দ্র ছিলেন ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয়, আদর্শ নিরাসক্ত গৃহী। রামায়ণকার সকল রকম হিংসা, জিঘাংসা, লোভ ও মাৎসর্য্যের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর কর্ত্তব্যময় অনাবিল আদর্শ গৃহী জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন। মহাভারতেও দেখি রামায়ণের পুনরাবৃত্তি, অধর্ম্মের উপরে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত পার্থসারথি—সঙ্কল্পে দৃঢ়, কর্ত্তব্যে কঠোর, অথচ দয়ায় বিগলিত প্রাণ। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জ্ঞাতি ধ্বংসে নিরুদ্বিগ্ন ও ভয়লেশহীন। কর্ত্তব্যের খর্পরে পাপ সমূলে ধ্বংশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে নিযুক্ত। কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারাবতী, মদ্যপ যদুকুল-ধ্বংশ সর্ব্বত্র একই শিক্ষা। পাপের বধ্যভূমির উপরে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রা।

হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির স্থায় ইসলামের ধর্ম্মশাস্ত্র, কো-রাণশরীফে সুরাপানের তীব্র নিন্দাবাদ আছে। কো-রাণের এই বাণী, এই নির্দেশ লোকের অনেক সাধারণ জীবনেও পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। বিখ্যাত সুফী ও সাধকদের জীবন-আলোচনা করিলে এই পরিচয়—সাধনার তীব্র আলো, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাদশাহ, ওমরাহ আমীর প্রভৃতি সাধারণ সংসারী জীবনে কোরাণের বয়াৎ গোঁড়ামী ব্যতীত সামান্য পরিবর্ত্তনই আনিতে পারিয়াছে। অনেকেই অত্যন্ত সৌখীন, মদ, মাংস ও বারবিলাসিনীপ্রিয় ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা বাদশাহের দরবারে বেশী যাতায়াত করিতেন কিম্বা যে সকল হিন্দু বাদশাহের অধীনে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইতে বাসনা রাখিতেন তাঁহারা অলক্ষ্যে বেশভূষায় কিম্বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর সামাজিক জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের উচ্চস্তরে রাজা মহারাজা কিম্বা নবাবের বিশ্বস্ত আমলাদের জীবনে মদ্যপান সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই এই সময় সামাজিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং হিন্দু সমাজে নবজাগরণ সুরু হয়, বাংলাদেশে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য জাতির অসাড় দেহে নূতন ভক্তিপ্রবাহে প্রাণ সঞ্চার করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠে জানিতে পারা যায়, বহু জগাই মাধাই প্রেমধর্ম্মের সুশীতল বারি পান করিয়া নব-জীবন লাভ করেন। অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সখা। বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার প্রেমানুরাগ মত্ত মাতালের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইলে সংসার ধর্ম্মে রুচি থাকে না, দৈনন্দিন নাওয়া-খাওয়া জীবনে অরুচি আসিয়া যায়। মদমত্ত মানুষেরও স্বাভাবিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, এষণাবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় ক্রমে তাহারা মানুষের অযোগ্য হইয়া যায়, কাজেই দুই বিপরীত মত্ততায় প্রভেদ আছে। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা নরনারী অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে পাগল। শক্তিবাদী কাপালিক কিম্বা তান্ত্রিক সাধু ত্যাগী বৈষ্ণবের এই প্রেমময় জীবন ধারণায় আনিতে অসমর্থ। ইসলাম বিজয় সত্বেও এই দেশে যাহারা পতিত ও নীচ বলিয়া ঘৃণ্য হইত, তাহাদের জীবনেও চৈতন্যের নীতিধর্ম্ম বিরাট পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থান যুগে যুগে এই ভাবেই সংঘটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে কয়েকটি রত্ন কণিকা এইখানে উদ্ধৃত হইল। *

শাক্ত বলে চলো ঝাট মঠেতে আমার
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ

* * *

সন্ন্যাসী সভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে
পরচর্চ্চাকে গতি কভু নাহি ভালে।

* * *

বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল
ঝাট নাহি পলাইলে না হইবেক ভাল

* * *

উদাহরণ বাড়াইয়া লাভ নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের মণিমঞ্জুষা হইতে তৎকালীন আদর্শ চরম নীতিধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিজাতীয় আদর্শ ধীরে ধীরে আমাদের সমাজের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিয়া

(৪) রামায়ণ ১৭২ পৃঃ।

(৫) 'মধু'র এক অর্থ মিষ্টমদ্য, রামায়ণ ২৯৬ পৃঃ।

* শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত।

আনিতেছিল। শক্তি পূজার নামে বিকৃত তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি নীতি-ধর্ম্মের স্থলে সুরা ও পরদার পূজা বৈদেশিক শক্তির সহিত হাত মিলাইয়া ধ্বংশকে পূর্ণতাপ্রদান করিতেছিল, এই সময় চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম, সাম্যের এই নববিধান রাজনৈতিক অসুবিধা সত্বেও দেশ তথা জাতিকে রক্ষা করিল। রাজাধিরাজের ও রাজা আছে, ইহজগতের পরেও এক জগৎ আছে, মানুষের পাপ পুণ্যের যেথানে বিচার হয়। আত্মিক শক্তি যে রাজনৈতিক শক্তির চেয়েও বলশালী। সুখ দুঃখে প্রপীড়িত নরনারী এই নূতন বার্ত্তার সন্ধান পাইয়া দলে দলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ত্যাগ ও নীতিধর্ম্মের আলোকে দেশ ও সভ্যতা রক্ষা পাইল।

কিন্তু মানুষের মন একই প্রবাহের ধারায় চিরদিন স্নাত হয় না। সুখানি দুঃখানি চ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। লোভ ও হিংসার মত্ততা যখন প্রবল হয় তখনই যুগে যুগে আসে পরিবর্ত্তন। মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবে পলাশীর আম্রকাননে ক্লাইভ বিজয়ী হইল। কপট পাশার নূতন দানে ক্রমে ক্রমে ভারতের রাজশ্রী ইংরাজের হাতে চলিয়া গেল। লোকে অবাক হইল, গুটিকয়েক মানুষ বাণিজ্য করিতে আসিয়া বিশাল দেশের রাজা হইয়া গেল। নূতন চিন্তা জাগিল। সাগর পারের এই সাদা বাইবেলপূজক লোকগুলি ত কম নহে! মদগর্বিত পাঠান, মোগলকে কেবল বুদ্ধির প্যাঁচে একেবারে ঘায়েল করিয়া দিল। য়ুরোপে তখন বিজ্ঞানের যুগ আরম্ভ হইয়াছে—বাষ্পীয় পোত, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আস্তে আস্তে এদেশেও দেখা দিল। এদেশের পালওয়ালা জাহাজ, সিপাহীদের ফিতাওয়ালা বন্দুক, ঘোড়ার ডাক ও গোযান একেবারে অবাক হইয়া গেল। প্রাচীন আদব-কায়দা বাঁচাইয়া ধীরে সুস্থে শুঁচি, টিক্‌টিকি মানিয়া দিন-গুজরাণ অভ্যাসের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বণিকদের সহিত বাণিজ্যের বিনিময়সূত্রে কতকগুলি এদেশীয় লোক সাহেবদের বাঁধাধরা বুলি মূলধন করিয়া বিপুল রোজগার করিতে আরম্ভ করিল।* দোভাষীর বৃত্তি অবলম্বনের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল বিদ্যালয়ে রাজভাষা শিক্ষা দেওয়ার সহিত ইংরাজদের আচার ব্যবহার, চালচলন এমন কি তাহাদের ধর্ম-প্রচার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইল। সকল দেশেই ঔপনি-বেশিকদের মধ্যে চারিত্রিক পদস্খলন সাধারণ ঘটনা। তৎকালীন ইংরাজ চরিত্র কিম্বা তাহাদের সামাজিক রুচি ইংলণ্ডীয় সাহেবদের অপেক্ষা অনেক হীন ছিল। এদেশীয় যুবক সম্প্রদায় ইংরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য শিখিবার সুযোগ না পাইয়া স্থানীয় স্খলিত-চরিত্র সওদাগরের বিকৃত সভ্যতা অনুকরণ করিতে লাগিল। এই সময় ডিরোজীও নামক একজন অ্যাংলোইণ্ডিয়ান্ যুবক হিন্দুস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ডিরোজীও খাস বিলাতী সাহেব না হইলেও শিক্ষিত এবং উদার-নৈতিক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এ দেশীয় ছেলেদের সহিত বন্ধুর মত মিশিতেন এবং খাস বিলাতী সভ্যতার নবারুণে এদেশীয় যুবজনচিত্ত জিতিয়া রাখিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক বিজয়ের সহিত সাংস্কৃতিক অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ডিরোজীওর নব প্রচেষ্টায় "ইয়ং বেঙ্গল" দলে বিপ্লব আরম্ভ হইল। দেশীয় যুবকদল কায়মনে শাসক সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান, দেশীয় আচার নিষ্ঠা উল্লঙ্ঘন—তাহাদের প্রিয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে দেশীয় পিতাপিতামহদের আচার সভ্যতা জলাঞ্জলি দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো একদিনে নিগ্রোদের ন্যায় ঠোঁট মোটা কালা সাহেব বনিয়া যাইত! কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ভাবে এই অন্ধ অনুকরণে ভাটা পড়িল। প্রাচীন দেশীয় সংস্কৃতির উপরে আক্রমণ যতই তীব্র আকার ধারণ করিল, ততই ফল্গু নদীর ধারার ন্যায় ইহার অন্তর্নিহিত শুভ বুদ্ধির নির্গমন আরম্ভ হইল। রাজা রামমোহন বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের বীচিমূলে দাঁড়াইয়া উদাত্ত সুরে, বজ্রনাদে ঘোষণা করিলেন। "বৈজ্ঞানিক নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের ভাল মন্দ কিছুই গ্রহণ করিব না।" ক্রমে ক্রমে চিন্তাশীল জনসাধারণের নিকট হইতে এই নিছক বিলাতীপণার বিরুদ্ধে আসিল প্রচণ্ড বাধা। ভারতীয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া বিশেষ বিবেচনার সহিত শাসক জাতির বৈদগ্ধগুণ আয়ত্ব করিতে যাহাদের আগ্রহ ছিল 'তত্ত্ববোধিনী' সভা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অসংখ্য মনীষী এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। † রাজভাষা শিক্ষার সহিত রাজ সভ্যতার মিথ্যা অনুকরণ, দাস-সুলভ অনাচার ও দেশীয় সংস্কৃতির উপরে প্রচণ্ড অবহেলা, নির্বিচারে মদ্যপান এবং অখাদ্য ভক্ষণ, এই সকল সমস্যার সামনে তত্ত্ববোধিনীর ক্ষুরধার তীব্র কশাঘাত দৈববাণীর মতন উপস্থিত হওয়া সত্বেও তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্বকথা শিক্ষিত জনসাধারণের একাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল। সমাজের সকল স্তরেই তখন সুরা রাক্ষসীর প্রবল রাজত্ব পড়িয়া উঠিয়াছিল। রাষ্ট্র যেথানে অনুকূল নহে, সেখানে কঠোর পরিশ্রম ও বহুল ত্যাগ ব্যতীত সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন আন্দোলনে কিছুকাল অতিবাহিত হইল; তারপরে যিনি আসিলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তাঁহার সহিত আসিয়া জুটিলেন হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার প্যারীচরণ সরকার, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সেবাব্রতী শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। স্বামী দয়ানন্দ, মহামতী রাণাডে, গোখেল ও কেলকার প্রভৃতি ইহার পুরোভাগে ছিলেন, মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র যে সমিতি স্থাপন করেন তাহার নাম "মদ্যপান নিবারণী সমিতি।" এই সমিতির মুখপত্রের নাম ছিল "মদ না গরল।" বিদ্যালয়ের

---

* রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ছাত্রদের মধ্যে যে সমিতি কাজ করিত তাহার নাম ছিল "আশা বাহিনী" "BAND OF HOPE।" প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সমিতির নাম ছিল "সুরাপান নিবারণী সমিতি।" সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য তিনি ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল্ উইশার" এবং বাংলা ভাষায় "হিত সাধক" নামক দুইখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। কেশববাবুর মৃত্যুর পরে প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকার মহাশয় মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।* ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রমজীবীদের মধ্যে কাজ করিতেন। বাংলা দেশে তিনিই শ্রমজীবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। এই আন্দোলনে তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য তিনি শ্রমজীবী বিদ্যালয় স্থাপন করেন (Barahanagor Working man's Institute)। শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষা ও সুনীতি প্রচারই ছিল এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ। এই জন্য তিনি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ব্যতীত নিজস্ব পৈতৃক গৃহ, জমি ও অর্থ দান করেন। শ্রীকেশবের নেতৃত্বে মদ্যপান নিবারণী সমিতির প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিপুল শ্রোতার মধ্যে এই সভায় রাজপ্রতিনিধি সহ শতাধিক ইয়োরোপীয়ও যোগদান করেন। আন্দোলন তীব্রতর করিবার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতের প্রধান প্রধান সহরে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মুঙ্গের, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সর্ব্বত্র সাড়া পড়িয়া যায়, এবং সর্ব্বত্র শাখা সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র বিলাতে ভ্রমণে গেলে সেখানকার নানাবিধ কাজের মধ্যেও মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন তিনি বিস্মৃত হ'ন নাই। বহু সভা সমিতিতে ব্রিটিশ শাসনের এই কলঙ্ক ও কুফল তিনি প্রদর্শন করেন। ১৯শে মে তারিখের সেন্ট্ জেমস্ হলের বক্তৃতা আজও বিখ্যাত হইয়া আছে †।

"আমাদের দেশের লোক মদ চায় না। তবুও মদ্য ব্যবসায়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এত উৎসাহ ও আগ্রহ কেন? পল্লীবাসী হিন্দুদের ঘরে গিয়া দেখুন কি সহজ ভাব, শুদ্ধ-সত্ত্ব জীবন, কিন্তু সভ্যতার নামে সভ্যতার অত্যাচারে এই শুদ্ধভাব আর টিকিতে পারিতেছে না। ব্রিটিশ জাতি ভারতের জনগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন কিন্তু সেক্স্পীয়ার ও মিল্টন্ শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে বিয়ার বোতল ও ব্রাণ্ডিপান করাইতে শিখাইয়াছেন। এই পাপে কত শত যুবক প্রাণ দিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ আর নেই।" তিনি জিজ্ঞাসা করেন "মদের বাণিজ্য যদি লাভের জন্য না হয় তবে যে কর্ম্মচারী মদের আয় বাড়াইতে পারে সরকার তাহাকে পুরস্কৃত করেন কেন?"

২৯শে মে অপর এক সভায় বলেন, "যেখানেই ব্রিটিশ যান সেখানেই তাঁহারা তাঁহাদের সাথে মদ্যপান পাপ লইয়া যান। ব্রিটিশগণকে যদি কোনদিন আমাদের দেশ হইতে চলিয়া আসিতে হয় তাহা হইলে ব্রাণ্ডির বোতলগুলি তাহাদের সমাধিলিপি হইয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিবে।" স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় অগ্নিবর্ষী ভাষায় জনমত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে তাঁহার উদ্যোগে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এখানে সাধারণ ভাষা, নীতিশিক্ষা, সূত্রধর কার্য্য, ঘড়ী মেরামত, মুদ্রাঙ্কণ, প্রস্তরলিপি এবং খোদন কার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। শ্রমজীবীদের জীবনে যাহাতে দুর্নীতি না প্রবেশ করে তাহাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ১৮৭৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী আলবার্ট বিদ্যালয়ের বালকদিগকে লইয়া আশাবাহিনী গঠিত হয়, প্রতি বৎসর এই বাহিনীর শোভাযাত্রা হইত, সুসজ্জিত বালকগণ গলায় লাল ফিতা, রক্তবর্ণ জয় পতাকা হাতে বীর বেশে সুরা রাক্ষসী বধ করিবার জন্য গান গাহিতে গাহিতে কলিকাতার বহু রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়া "কমল কুটীরে" উপস্থিত হইত। এই শুভ কার্য্যে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া বালকদিগকে কেশববাবু আশীর্বচন করিতেন। তিনি বলিতেন, "প্রতিজ্ঞা করো, সুরা স্পর্শ করিবে না। বলো জীবনে সুরার মুখ দেখিবে না, সকলকে সমস্বরে বলিবে, ওরে, মদ ছাড়ো, মদ ছাড়ো, তোমাদের প্রতিজ্ঞাতে আগুন জ্বলিবে, দেশের সকলে মদ ছাড়িয়া দিবে।" এই আশাবাহিনীর কাজ বহু বৎসর চলিয়াছিল এবং ছাত্র সমাজে দারুণ উৎসাহ আনিয়াছিল।

[এই ভাবে যুগে যুগে আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান মানুষ ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে। মানুষই বারবার মানুষকে সুরার সর্পিল পথে নামাইয়া দিয়াছে। আপাততঃ মানুষের মনে হয় এই যুদ্ধের যেন শেষ নাই, বিরাম নাই। মানুষের বন্যতা তাহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না, তাই বারবার সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলে, আর বিধাতার উদ্যত খড়্গের আঘাতে আহত হইয়া আপন আলয়ে ফিরিয়া আসে। দুঃখের তিমিরে হারাণ সম্বিত ফিরিয়া পায়। পুনরায় আরম্ভ হয় শক্তিসঞ্চয়ের পালা। ঠিক এই ভাবে সভ্যতার মুক্ত ধারায় বন্ধন পড়িয়াছে বারংবার, কিন্তু শিকল ছেঁড়া যাহাদের কাজ, তাহারা কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। মহাভৈরব যখন জাগ্রত হয় তখন হাতের দড়ি পায়ের দড়া সবই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ শিকল ভাঙ্গার অভয় নৃত্য যাহাদের কানে ভাসিয়া আসে তাহারা অন্তের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না, সুযোগ পাইলেই জন্মের ঋণ পরিশোধের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়ে, সভ্যতার রাজপথ তাই এত বৈচিত্র্যময়, গতি কভু শ্লথ, কভু দ্রুত, যুগ যুগ ধরিয়া সংস্কৃতির অভিযান এই ক্ষুরধার পথেই অগ্রসর হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, কুশিক্ষা ও সমাজগত দৈন্য যত কম থাকিবে, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শ যতদিন উজ্জ্বল থাকিবে, মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ ততদিনই রহিবে অটুট। এই ঐক্যময়, কল্যাণময় পবিত্র যৌথ বিশ্বরাষ্ট্র হইবে গান্ধিজীর সর্ব্বোদয় সমাজের গোড়া পত্তন।]

---

* প্যারীচরণ সরকারের অপর পুস্তিকা "মদ খাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়?"

† উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ৬৭২-৭৩ পৃঃ।

‡ উপাধ্যায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ৬৮৯ পৃঃ।

* অহিফেন বাণিজ্য ও চীন দেশ ৭২৮ পৃঃ।

† উপাধ্যায় প্রণীত আচার্য্য কেশবচন্দ্র ১১৭৩ পৃঃ।

আয়ুর্ব্বেদ ও জাতীয় সরকার

কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী বি-এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। এই স্বাধীনতায় ভারতের বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের আনন্দ করিবার অবসর কই? বিদেশী শাসনের গুরুভারক্লিষ্ট ও অবহেলিত আয়ুর্ব্বেদ আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার হৃতগৌরব পুনরায় উদ্ধার করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনলাভে সহায়তা করিতে পারিবে বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের আয়ুর্ব্বেদের ব্যাপক শক্তির কোন সাহায্যই গ্রহণ করিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যে কতখানি মলিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা স্বাধীন ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধারগণের মনোবৃত্তির অভিব্যক্তির দ্বারা খানিকটা প্রতিফলিত হইতেছে। পাশ্চাত্যভাবাচ্ছন্ন বিদেশীসংশ্লিষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ-বিরোধী সুবিধাবাদীগণের সুর-বদলান অভিনয়ে জাতির সুশিক্ষিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ যে চালিত হইবেন তাহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। পৃথিবীর সভ্যসমাজে ভারতবর্ষ এক শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ভবিষ্যতে এক নূতনতর আলোকে বিশ্ববাসীর হৃদয় আলোকিত করিবে এ আশাও রাখে। এই শ্রদ্ধার আসন অন্যান্য দেশের ন্যায় মারণাস্ত্র আবিষ্কারে বা অন্য কোন জাতিকে কোণঠাসা বা পরাস্ত করিয়া অর্জ্জন করে নাই। এই শ্রদ্ধার উৎস যে কোথায় এবং কি করিয়া একটা পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইল তাহা কি দেশনায়কগণ একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বেদ, উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ তন্ত্র, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, সাহিত্য, সাধুজনবাণী প্রভৃতিকে বাদ দিয়া আজ তাঁহারা একবার বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখুন যে তাহাদের এ স্থান কোন নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। আজ দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে কিন্তু দেশের এই গৌরবের মূলসূত্রটি কোথায় এখনও কি তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না? যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহায়তায় এই পরাধীনতার অভিশপ্ত জীবনে এক পরম কৃতিত্বের পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে ঢক্কা নিনাদ করিতেছেন, কোন অধিকারে তাহাদের উন্নতি ও সংস্কার না করিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া প্রাগৈতিহাসিক হিসাবে তাহাদিগকে যাদুঘরে স্থান দিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে বঞ্চিত করিবেন?

আজ ভারতের এ যুগসন্ধিক্ষণে যাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী বলিয়া দাবী করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাহারা বিভিন্ন রং বদলান প্রাণীবিশেষের ন্যায় উপদেষ্টার পরামর্শে যদি ভ্রান্তপথে পরিচালিত হন, তবে তাহার অনুষ্ঠান পর্ব্বেই জাতীয় সরকার; বরেণ্য নেতৃগণকে সাবধান হইবার জন্য আবেদন জানাইবার প্রয়োজন দেশবাসী অবশ্যই বোধ করিবে। পরাধীন ভারতে তাহাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য ও অনাদৃত হইয়াছে তাহাতে দুঃখ ছিল না, কারণ তাহারা এই সুদিনের অপেক্ষায় ছিল। আজ যদি দাসসুলভ মনোবৃত্তির পুনরভিনয় চলে তবে ভারতের জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে বেশী দেরী হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদসেবীগণ পুঞ্জীভূত বেদনা, অপমান ও ত্যাগ বরণ করিয়া বিশেষ প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যেও ভারতীয় অন্যতম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষীণবর্ত্তিকা আজও জ্বালাইয়া রাখিয়াছে এই দিনের অপেক্ষায়। ভারতীয় চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য, অভিনবত্ব ও বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব বুঝিবার ইচ্ছা যাহাদের নাই, যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইবার অনুপযুক্ত তাহাদের সহায়তায় আয়ুর্ব্বেদকে বাদ দিয়া জাতির স্বাস্থ্য-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা করিলে আমাদের জাতীয় জীবনীশক্তি নিঃসন্দেহে কমিয়া যাইবে!

আপাতদৃষ্টিতে বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ কোন কোন অংশে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে অক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আমরাও তাহা অস্বীকার করি না ও ইহা যে কোন অগৌরবের কারণ তাহাও মনে করিবার যুক্তি নাই। চিকিৎসা-শাস্ত্র কোনদিনই স্বাস্থ্যের ও রোগচিকিৎসায় নিয়ম চিরতরে বাঁধিয়া দিতে পারে না। যুগের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী তাহাকে কালোপযোগী করিতে বাধ্য করিবে। চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদসেবীগণ বহুদিন হইতে এ বিষয় সচেতন আছেন এবং বাংলাদেশের বর্ত্তমান ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিনের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের সুচিন্তিত অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত প্রণালীতেই কলেজগুলিতে আয়ুর্ব্বেদ পাঠ্য ও শিক্ষণীয় ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল গভর্ণমেন্ট-অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তয়শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছাত্র পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে সরকারী স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে কোন স্থান পান নাই বা পাইতেছেন না। ইহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষার মান যে হ্রাস পাইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সরকারের সাহায্য ভিন্ন সাধারণ সাহিত্যের কলেজগুলিতেই উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে পারা যায় না। তাহাতে সরকারের সহানুভূতিহীন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি করিয়া বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থায় সম্ভব তাহা সুধীজনমাত্রেই বুঝিবেন।

কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই রাজশক্তির সাহায্য ছাড়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। বিদেশী মনোবৃত্তির সাহায্যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী বর্ত্তমানে অচল বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে; কিন্তু জাতীয় সরকারের সহায়তায় ইহা যে কতখানি দেশ ও কালোপযোগী হইতে পারে তাহা অনুধাবন ও প্রয়োগ না করা জাতীয় সরকারের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জাতীয় গৌরব ও পৃথিবীর অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা। ইহার চিকিৎসাপ্রণালী

ও ঔষধাদি দেশবাসীর প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল এবং সহজে ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। স্বস্থবৃত্ত, রসায়নচিকিৎসা প্রচলনে রোগোৎপত্তি, রোগের প্রসার, স্বল্পায়ু ও হীনবলের প্রাচুর্য্য কমিয়া যাইবে। হয়ত রোগের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক হিসাবে আর জীবাণু বা জীবাণুর সাংঘাতিক বিষ অথবা পরীক্ষামূলক বিজাতীয় ঔষধাবলী শরীরে প্রবেশ করাইয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না। প্রকৃতিজাত প্রাণী হিসাবে প্রকৃতির সুস্থ ও সুন্দর দানকে আবার আমরা বরণ ও বিশ্বাস করিতে পারিব। এত বড় একটা আয়ুর্বিজ্ঞানকে বুঝিবার ও কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা না করিয়া সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদেশী মনোভাবাপন্ন সুবিধাবাদী দেশহিতৈষী ও একচক্ষু হরিণের মত তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী প্রকৃত অবৈজ্ঞানিক অনুশাসন জাতীয়-সরকারকে প্রভাবান্বিত করিয়েছে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছি।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ আজ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ ও সাহায্যের অভাবে বিভক্ত ও নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া বাঁচিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। উপরন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা এমন কতকগুলি সংস্কারের অধীন হইয়া চলিতেছেন যে তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলি দার্শনিক মতবাদের প্রাধান্যেই পরিসমাপ্তি ঘটিতেছে। রোগের যন্ত্রণা ও মৃত্যু বাস্তব, ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই চিকিৎসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি। পৃথিবীর যেখানেই রোগোপশমের উপাদান পাইবে, মানুষ মাত্রেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা করিবে ইহা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি বাস্তব। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সকল উপাদান দেশকাল পাত্রবিশেষে পরিণামে অকল্যাণকর হইতে পারে কিন্তু রোগক্লিষ্ট মন ও দেহের চাহিদায় তাহার উপস্থিত কার্য্যকরী ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে ও লইবে—যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সে তাহার পরিবর্ত্তে অধিকতর শক্তিশালী স্থায়ী উপকারী উপাদানের সন্ধান পায়। এই কারণেই উন্নতিশীল নূতনত্বের সন্ধানেই যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের প্রচেষ্টা। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বা সম্প্রদায় বলেন যে অনেকক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি খুব শীঘ্রই উপকার দর্শাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু পরিণামে ইহাতে রোগীর জীবনীশক্তি কমাইয়া দেয় কিম্বা অন্য রোগ উৎপাদন করিয়া রোগ জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তোলে। এ কথার সত্যমিথ্যা বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। কারণ বর্ত্তমান যুগের বিমিশ্রিত জীবনধারায় বিভিন্ন জাতি ও দেশের মনীষীবৃন্দের সংস্পর্শে ভারতবাসী আর তার সংস্কৃতিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখিতে চাহে না। সে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আদান-প্রদানে পক্ষপাতী—এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই ভারতীয় রোগক্লিষ্ট জনসাধারণ অন্যান্য দেশের চিন্তাপ্রসূত ফলকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতা দেখিয়া,—নিজের আপাত ক্লেশ ও মৃত্যুকে অসহনীয় মনে করিয়া যাহাকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের থাকিবার আশা করা ভুল।

পূর্ব্বতন ভারতীয় চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদকে কোনদিনই একটা গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া রাখেন নাই। যদি রাখিতেন তবে পারদ, আফিং, নাড়ীজ্ঞান প্রভৃতির অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বর্ত্তমান অবস্থায়ও যাহা আছে তাহাও পাওয়া যাইত না।

মানুষের সামাজিক জীবন কালস্রোতে অবশ্য পরিবর্ত্তনশীল এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও সেই সামাজিক জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ অধিকার করিয়া আছে বলিয়াই ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই কালের আহ্বানকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই। জোর করিয়া চাপিয়া রাখার চেষ্টা শুধু আত্মশক্তির ক্ষয়েই পর্য্যবসিত হইবে।

আজ দেশের চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের সম্মুখে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহাকে সম্যক্‌ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য আমি সমস্যাগুলি সংক্ষেপে জানাইতেছি :—

১। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে—

(ক) যাহারা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদকে আধুনিক বিজ্ঞানের কোন সাহায্য না লইয়া দেশের সমগ্র স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধান করিতে উপযুক্ত মনে করেন, কিন্তু সরকারের সাহায্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতেছে না।

(খ) দ্বিতীয় দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বহু প্রাচীন,—কালস্রোতে মানবসমাজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও বহু নূতনত্বের সন্ধানের সুযোগ আসিয়াছে। উপরন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ও দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে আয়ুর্ব্বেদের কোন কোন অংশ লুপ্ত বা অস্পষ্ট রহিয়াছে—এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতির কোন কোন বিষয় বর্ত্তমান যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে অক্ষম হওয়া অস্বাভাবিক নয় ও সেইজন্য তাহার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা উন্নতিশীল জাতি হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন যুগেও আয়ুর্ব্বেদ-মনীষীগণ প্রয়োজন ও সুবিধামত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতিতে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। অতএব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(গ) তৃতীয় দলের মতবাদ বড়ই অদ্ভুত রকমের। তাহারা অন্তরে দ্বিতীয় দলের সহিত একমত, কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন বিরুদ্ধ জনমতের ভয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বিপন্ন হইবে বলিয়া এমনভাবে নিজেদের অভিভূত রাখিয়াছেন যে সেকথা জোর করিয়া বলিবার সাহস রাখেন না। উপরন্তু অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক জ্ঞানের বা উদারতার অভাবে আয়ুর্ব্বেদও তাহার ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিকূল পরিবেশে চঞ্চল না হইয়া পারিতেছে না।

প্রত্যেক চিন্তাশীল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভাবিয়া দেখিয়া কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিতে অনুরোধ করি :—

(১) জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের মধ্যে বহু পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহারা জগতের এই বাস্তব পরিবর্ত্তনকে মানিয়া লইলে অনায়াসেই তাঁহারা শিক্ষা ও জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও জনগণকে আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে পারিবেন।

(২) যাহারা যেভাবে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারেন

তাঁহাদিগকে সেইভাবেই বুঝাইতে বা গ্রহণ করাইতে হইবে—এই জন্য অভিমান বা ক্রোধ করিয়া অথবা আত্মপরায়ণ হইয়া বর্ত্তমান জীবনধারার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা না করিলে চিরকালই আয়ুর্ব্বেদ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

(৩) সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে জাতীয় সরকারের পরিচালকগণ দেশহিতৈষী ও জনগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহাদিগকে যদি আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা ও উৎকর্ষ বুঝাইতে পারি তবে তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতির যথাযোগ্য চেষ্টা না করিয়া পারিবেন না।

(৪) আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের অনতিবিলম্বে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে ও এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে—

(ক) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কি ভাবে, কোথায়, কখন রোগোপশম ও রোগবিস্তার নিবারণ করিতেছে তাহার নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ প্রমাণ সংগ্রহ।

(খ) আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিচ্ছিন্ন ও বিভক্তদলীয় চিকিৎসার সামঞ্জস্য রক্ষা।

(গ) সমবেত চেষ্টায় একটী গবেষণাগার স্থাপন ও এতদুপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ।

(ঘ) অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণবিকাশ ও প্রয়োগ করার কার্য্যে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইবার উদার মনোভাব সৃষ্টি করা ও এতৎসঙ্গে ইহাকে দেশ ও কালোপযোগী করিয়া তোলা।

(ঙ) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানী ও উৎসাহী চিকিৎসারত ব্যক্তিকেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য করিবার ব্যবস্থা।

(চ) আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের দেশ ও কালোপযোগী সরল ও প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যবস্থা ও প্রচার এবং অন্যান্য প্রদেশের চিকিৎসা প্রণালীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন।

(৫) পরাধীনতার ফলেই হউক বা নিজেদের দোষত্রুটীর জন্যই হউক বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ কায়-চিকিৎসা (Medicine) লইয়াই আছেন। কিন্তু সাধারণ্যে চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে যুগধর্ম্মানুযায়ী রোগের সকল অবস্থা ও পরিণতি আয়ত্তে আনিবার জ্ঞান ও কৌশল চিকিৎসক মাত্রেরই নিকট হইতে জনসাধারণ পাইবার দাবী রাখেন। সেইজন্য প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও হাসপাতালে রোগের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রতিকার সম্বন্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থার বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

(৬) আয়ুর্ব্বেদের শল্যচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুরোগ, রোগ-প্রতিষেধ প্রভৃতির প্রচলন বর্ত্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এইগুলি আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনুসন্ধান করিয়া পুনঃস্থাপন করিতে বহু সময় লাগিবে, কিম্বা সম্পূর্ণভাবে দেশ ও কালোপযোগী হইবে কিনা তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এমতাবস্থায় সকল প্রকার রোগের চিকিৎসার জন্য আপাততঃ প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মর্য্যাদা দিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক হিসাবে পরিগণিত হইতে হইবে।

জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য :—

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের বিরাট দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই ও সুযোগ আসিলে ভবিষ্যতে হয়ত আরও কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের রোগক্লিষ্ট জনগণের মহান উপকার দর্শাইতে পারে। ইহা একমাত্র জাতীয় সরকারের সহায়তায় সম্ভব। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ইতিমধ্যেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ও সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গপ্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির গুরুদায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় সরকারের উপর বর্ত্তাইয়াছে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর, গঙ্গাপ্রসাদ, দ্বারিক, বিজয়রত্ন, যামিনীভূষণ, মাধব, হরিনাথ, পঞ্চানন, নিশিকান্ত, শ্যামাদাস, হারাণ, গণনাথ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কি অসামান্য প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া সমগ্র-ভারতে জাতির সেবা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ও বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহু রাজামহারাজা, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ দিয়া নানারূপ দুরারোগ্য ও জটিল রোগে উপকার পাইয়াছেন। ইহারা ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। জাতীয় সরকার এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন যে আজও আয়ুর্ব্বেদের জনপ্রিয়তা জনসাধারণের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আমাদের প্রাদেশিক সরকারের দুইটী প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে—

(১) বর্ত্তমান চিকিৎসারত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণের অভাব-অভিযোগ নিরাকরণ ও তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা।

(২) ভবিষ্যতে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি নির্দ্ধারণ ও তাহা দেশ ও কালোপযোগী করিয়া জনস্বাস্থ্যে প্রয়োগ।

(ক) প্রথমটীর বিষয় সরকারের কিছু করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান ষ্টেট ফ্যাকাল্টী অফ্ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিন কর্ত্তৃক রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের মধ্য হইতে উক্ত ফ্যাকাল্টীর সহায়তায় উপযুক্ত লোককে বাছাই করিয়া তাহাদিগকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও বিশেষক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রোগনিবারণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি অন্ততঃ পক্ষে এক বৎসর কাল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ও এই সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত ডাক্তারের ন্যায় সমমর্য্যাদা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রতি থানায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃপক্ষে দুইটী ইউনিয়নে দুইজন পূর্ব্বোক্তভাবে শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে সরকার-পরিচালিত দশটী বেডের হাসপাতাল ও আউট-ডোরের ব্যবস্থা করিয়া তাহার এক একটীতে একজনকে নিয়োগ করিতে হইবে। চিকিৎসার ফলাফল নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় সমস্যা সমাধানে সরকারের একটী সুচিন্তিত বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ সরকারের এই নীতির উপর আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে ও এতৎসঙ্গে সরকারের আয়ুর্ব্বেদের উপর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিভঙ্গী সরাইয়া জাতীয় সম্পদ হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া সহানুভূতি লইয়া ইহার উন্নতির প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বিদেশী শাসনের আওতায় বিচ্ছিন্ন এবং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে বাহির হইবার মনের অবস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন ; উপরন্তু বিদেশী শাসকের সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে বহু অনুপযুক্ত লোক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদার লাঘব করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও চিকিৎসককে লোকচক্ষে হেয় বা অচল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া জাতীয় সরকারকে প্রভাবান্বিত করিতেছেন। অতএব সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে অনুপযুক্ত লোক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন না ও আয়ুর্ব্বেদের বিরুদ্ধ প্রচার বন্ধের সহায়তা করিবে।

(৩) কলিকাতায় চারিটী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু নিদারুণ অর্থাভাবে ও ইহাদের নিরুপায় কর্ত্তৃপক্ষ ও শক্তিহীন ফ্যাকাল্টীর পরিচালনায় তাহাদের অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। সরকারের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত তাহা হইতে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিমূলক কোন প্রচেষ্টা পাওয়ার আশা করা সম্ভব নয়। উহাদের একটী জাতীয় সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালে পরিণত করিয়া অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, গবেষণাগার ও কলেজ প্রভৃতি খুলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রণালীর কতখানি দেশ ও কালোপযোগী হইবার উপযুক্ত, সরকার তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(৪) সরকারের অধীনে কয়েকজন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক থানাতে বা ইউনিয়নে নিযুক্ত হইলেই মেধাবী ছাত্রের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় আগ্রহ হইবে।

(৫) উক্ত সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার জন্য পাঁচ জন বিশেষ ভাবে শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ও এক জন বোটানিষ্ট, এক জন কেমিষ্ট, এক জন বায়োকেমিষ্ট ও এক জন প্যাথোলজিষ্ট নিযুক্ত করিয়া ধারাবাহিকভাবে গবেষণায় নিযুক্ত থাকিবেন ও গবেষণার ফলাফল সরকারের তত্ত্বাবধানে একখানি পত্রিকায় প্রতি মাসে প্রকাশ করিবেন। এই ভাবে স্বল্পকালেই একটী ভারতীয় ফারমাকোপিয়া রচনা ও চিকিৎসাপ্রণালী বিধিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করার সুবিধা হইবে।

৬। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে দেশোপযোগী হইতে পারে না ; এই জন্য যাহারাই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইতে চান তাহাদের আয়ুর্ব্বেদের সহিত প্রত্যেককেই ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, বোটানি, বায়োলজি, এনাটমি, ফিজিয়লজি, মেটিরিয়ামেডিকা, প্যাথোলজি সারজারি, মিড-ওয়াইফারি, টক্সিকোলজি ও জুরিস্ বনিয়াদী শিক্ষা হিসাবে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) বিভিন্ন মতবাদসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম প্রচেষ্টার পথনির্দ্দেশক সম্মিলিত অভিমত লাভ করা বর্ত্তমানে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় ; এই বিষয়ে অযথা সময়ক্ষেপ না করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে আপাততঃ জাতীয় সরকারকে স্বহস্তে এই ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ দুইজন, প্রাচীনপন্থী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক দুইজন ও সরকারের প্রতিনিধি এক জন এই পাঁচজনকে লইয়া সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের অধীনে একটী সাবকমিটী গঠন করিয়া তাহার উপর আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ ষ্টেট ফ্যাকাল্টি তাহার অভাব অভিযোগ ও মন্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে এই কমিটীর মধ্য দিয়া সরকারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—চিকিৎসা শাস্ত্র মাত্রেই রোগোপশমের জন্য সৃষ্ট ও কোন চিকিৎসাশাস্ত্রই সম্পূর্ণ বলিয়া দাবী করিতে পারে না এই জন্য রোগোপশমের উপাদান মানুষ যেখানেই পাইবে সেখানেই তাহাকে সে আপন করিয়া লইবে। আয়ুর্ব্বেদে অনেকক্ষেত্রে যুগোপযোগী চাহিদা মিটাইতে পারে না, পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও বহুক্ষেত্রে বিফল হইয়া থাকে। এমত ক্ষেত্রে উন্নতিশীল জাতির প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সরকার ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে কি আছে ও কি নাই ও ইহার কতখানি মানবের রোগমুক্তির সন্ধান দিতে পারে এবং কোন বৈশিষ্ট্যে এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আজও এত প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও কোটী কোটী ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আছে—আন্তরিকতার সহিত তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিসা-পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করিবা আয়ুর্ব্বেদের ত্রিদোষতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, রস, বীর্য্য বিপাক ও ন্যায়দর্শন সাংখ্য দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন (Atomic theory of Kanad) ইত্যাদির রোগচিকিৎসা ব্যাপারে উপযোগীতা কতখানি সে সম্বন্ধে অযথা উপহাস না করিয়া উপযুক্ত মনীষীগণ দ্বারা তথ্যানুসন্ধানে যত্নবান হওয়া জাতীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়কই হইবে। আমরা ভারতবাসী—আমরাও যুগের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কামনা করি কিন্তু বর্ত্তমান ভারত ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা নহে। এখনই যদি আমরা তাহাদের মত একই চালে চলিবার চেষ্টা করিয়া তাহাদের জ্ঞান প্রসূত দ্রব্যাদি অবাধে চালাইবার চেষ্টা করি ও নিজেদের জ্ঞান সম্পৎ অবহেলা বা ঘৃণা করি তবে এই দরিদ্র ও দীর্ঘকাল অভ্যস্ত পরাধীন দেশবাসীর উদ্ভাবনীশক্তি আত্মনির্ভরতা ও আত্মগৌরব কোন কালেই আসিবে না। জাতীয় অর্থ ও আত্মচেতনা অজ্ঞাতসারে অবলুপ্ত হইবে। ভারতের আদর্শ, চিন্তাধারা ও ঐতিহ্য যে মহান মানবতার মধ্যে ফুটিয়াছে আজ স্বাধীন ভারতে সেই গুলিকে অধিকতর মহান করিবার দায়িত্ব জাতীয় সরকারে উপর পড়িয়াছে। দলগত বা ব্যক্তিগত মতামতে জনমতকে উপেক্ষা করিয়া জাতীয় সরকার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির আগ্রহ ও চেষ্টা করিবেন না—ইহা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবিভাগের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তান হইতেই অসংখ্য অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাহ্নে একটা চুক্তি বা বোঝাপড়া হইবার সুযোগ ঘটায় পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তবু কিছুটা ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইঁহাদের এবং পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকারের সমবেত চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকাংশেরই অন্ততঃ একটা সাময়িক গতি হইয়াছে, পূর্ব্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। পূর্ব্বাঞ্চলের এই আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। মোটামুটি ৫০ লক্ষ লোক পশ্চিমপাকিস্তান হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছে। পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকার এবং ভারতসরকার অত্যন্ত উদারতার সহিত ইহাদিগকে পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে পূর্ব্বপাঞ্জাব এবং পূর্ব্বপাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যে (সহর এলাকা) ১৩ লক্ষ, বোম্বাই প্রদেশে ৫ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ৪ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশে ৩ লক্ষ, দিল্লীপ্রদেশে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, মধ্যভারত সংরাষ্ট্রে ২ লক্ষ, মৎস্য সংরাষ্ট্রে ১ লক্ষ, উদয়পুরে ১ লক্ষ এবং আজমীর, বিকানীর, যোধপুর ও বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটিতে ৫০ হাজার করিয়া আশ্রয়প্রার্থীর পুনঃসংস্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। পূর্ব্বপাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যাও গুরুতর কিন্তু ইহাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এ পর্য্যন্ত খুবই সীমাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বড় রকমের স্থানান্তর হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই দারুণ ভয়ের দিনগুলি কাটাইবার পর এখনও নানা কারণে বাধ্য হইয়া যাহারা পূর্ব্বপাকিস্তান ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। সরকারী হিসাবেই প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ জন, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৫৬৭ জন, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৩১১ জন ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৪৮১ জন বাস্তুত্যাগী পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থী-পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব গত ২০শে অক্টোবর সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, বিগত একমাসে প্রায় ২২ হাজার আশ্রয়প্রার্থী শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়াছে। বাস্তুত্যাগীর এই সংখ্যা হইতেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। সরকারী হিসাবে বলা হইয়াছে গত ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৩,৬৮,৭৮৩ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ ছাড়া আরও অনেকে পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সরকারের অজ্ঞাতে নিজেরাই কোনক্রমে আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া বা আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে। মনে হয় সব জড়াইয়া আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য বেশী নয়, এ সম্পর্কে কর্ত্তব্য প্রায় সবটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে করিতে হইতেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের অসংখ্য সমস্যার ভারে প্রপীড়িত। ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্বপাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয়-শিবিরে স্থানদান এবং স্থায়ীভাবে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা একরূপ অসম্ভব। তবু যাঁহারা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া এবং অনেক আশা লইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী এবং তাঁহাদের কাহাকেও বিমুখ করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য। অবস্থাগতিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কর্ত্তব্যপালনে অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার জন্য পশ্চিমবাঙ্গলার সহরগুলিতে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায়, অগণিত নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম হইয়া সহরগুলির খাদ্যপরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য নিদারুণ বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট শরণার্থীর একাংশকে আশ্রয় দিয়াছেন, বাকী সকলকেই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শূন্যে ভাসিতে হইতেছে। ২২শে অক্টোবর পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০ এবং এইগুলিতে আশ্রয় পাইয়াছে মোট ৬৬,৩০৪ জন। বর্ত্তমান অবস্থায় স্থান সংগ্রহ করা কঠিন, তবু সরকার আরও কয়েক সহস্র আশ্রয়প্রার্থীর ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পুনর্বসতি-সচিব শ্রীযুক্ত মাইতির বিবৃতিতে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৫১ হাজারের কিছু বেশী এবং পশ্চিমবাঙ্গলার জেলাসমূহে ১,৫৪,৪৫৯, একুনে ২,০৫,০০০ জন শরণার্থীকে খয়রাতি সাহায্য দিতেছেন। এই হিসাবে সরকারের মাসিক ব্যয় হইতেছে ২৫ লক্ষ টাকার উপর। বলা বাহুল্য, এই সরকারী সাহায্য খাতে ব্যয় কমাইবার প্রশ্ন তো বর্ত্তমান অবস্থায় উঠিতেই পারে না, বরং ইহা বহু পরিমাণে বাড়িলেই ভাল হয়। সকল দিক বিবেচনা করিলে আর্থিক অসচ্ছলতা ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার হিসাবে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই চেষ্টার মূল্য কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কিন্তু সমস্যার বিশালতার বিবেচনায় এই ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্যও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাছাড়া পরিস্থিতি এখনই চূড়ান্ত নয়। পূর্ব্বপাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত যে ৯০ লক্ষের মত অমুসলমান রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আরও কতজন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজিতে আসিবেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে জটিলতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বনিয়াদ অত্যন্ত দুর্ব্বল, ইতিমধ্যেই আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা এই দুর্ব্বল বনিয়াদে বেশ একটি বড় ফাটলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর পশ্চিমবঙ্গে যে স্থায়ীভাবে স্থান হইতে পারে না, একথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার সহিত

পরিচিত সকলেই জানেন। পশ্চিমবাঙ্গলার যা সম্পদ, তাহাতে এখানকার স্থায়ী অধিবাসীদেরই চলে না। বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি আসিতেছে না, বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে শীঘ্র বেশী যন্ত্রপাতি আসিবারও সম্ভাবনা নাই, কাজেই এখানে নূতন শিল্পে প্রচুর কর্ম্ম-সংস্থানের আশা সুদূরপরাহত। পশ্চিমবাঙ্গালায় যে সব শিল্প চালু আছে সেগুলিতে প্রায়ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালী শ্রমিকের রাজত্ব। কৃষির হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে মোট ভূমির পরিমাণ ১,৭৭,৪১,১২০ একর অথবা ৫,৩৮,২৩,৩৭০ বিঘা। লোকের বাস্তু বাদ দিলে কর্ষিত এবং কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ধরিয়াও এখানে মাথাপিছু চাষের জমি দাঁড়ায় ০·৫৭ একর বা ১·০৭ বিঘা। পতিত জমিতে চাষ করা সময়সাপেক্ষ এবং চেষ্টা হইলেও সব জমিতে চাষ করা হয় তো শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবই হইবে না। প্রদেশের অধিকাংশই কৃষিজীবী, কাজেই জমির পরিমাণের এই স্বল্পতার জন্য প্রদেশের আর্থিক দৈন্য চিরস্থায়ী হইয়া উঠিতেছে। বিভাগের ফলে ২ কোটি ১২ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। এ হিসাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৫৭ জন। গ্রেট ব্রিটেনের মত সবদিক হইতে সমৃদ্ধ দেশেও প্রতি বর্গমাইলে এই ঘনত্ব ৬৮৫ জনের বেশী নয়। দেশবাসীর কর্ম্মসংস্থানের সুযোগের হিসাবে গ্রেটব্রিটেনের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনাই চলে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আবার নূতন জনতার চাপ আসিলে এই প্রদেশের অর্থ-নৈতিক ভবিষ্যত নিঃসন্দেহে অন্ধকার হইয়া যাইবে।

এইজন্যই আশ্রয়প্রার্থীদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাহাদের অন্ততঃ একটি বড় অংশকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এভাবে এইসব বিপন্ন হতভাগ্যের জীবনরক্ষার মোটামুটি আয়োজন হইলে আশ্রয়প্রার্থীগণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সকলেই বাঁচে। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্যা দেখা দিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং পণ্যমূল্যবৃদ্ধির চাপে এই প্রদেশের অবস্থা এখন শোচনীয়। অথচ আশ্রয়প্রার্থীদের হাহাকার এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, পশ্চিমবাঙ্গলার নিজস্ব ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দ্দশা কাহারও দৃষ্টিই আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব্ব পাকিস্তানের একাংশের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিবার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। আন্দামান ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের কয়েদখানা ছিল, কয়েদীদের আবাসভূমি এবং জঙ্গলাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থান রূপেই আন্দামান এদেশের অধিকাংশ লোকের নিকট পরিচিত। কাজেই আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী পাঠাইবার কথা উঠিতে না উঠিতেই অনেকে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ সুরু করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা জোরগলায় আন্দামানকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাদের প্রায় সকলেই যে আন্দামান সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহা না বলিলেও চলিবে। ইঁহারা শুধু ঘোরা কথায় এবং হৃদয়াবেগে অত্যন্ত জরুরী একটি সমস্যার গুরুত্ব কমাইয়া দিতেছেন। তা ছাড়া এই সব প্রতিবাদকারী পশ্চিম বাঙ্গলার আর্থিক অবস্থা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্যাগ স্বীকারের সীমা, আশ্রয়-প্রার্থীদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত প্রভৃতি সম্পর্কেও যথোচিত চিন্তা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য পূর্ব্ব পাঞ্জাবের উপর চাপ বেশী পড়িলেও এই আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় দানের ব্যাপারে ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় অনেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য লক্ষণীয় ভাবে আগাইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের সমস্যাও গুরুতর, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যান্য প্রাদেশিক বা দেশীয় রাজ্যের শাসন কর্তৃপক্ষের কার্য্যকরী আগ্রহ মোটেই যথেষ্ট নয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেরও এমন অবস্থা নয় যে এত বহিরাগতকে আশ্রয় দিয়া সকলের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। ইয়োরোপে জনবাহুল্যের জন্যই একদিন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজ পশ্চিমবাঙ্গলার অসম্ভব জনবাহুল্যের চাপ কমাইয়া সর্ব্বহারা ও সকল দিক হইতে অসহায় অন্ততঃ কয়েকলক্ষ আশ্রয়-প্রার্থীকে যদি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মানুষের মত বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা আশার কথা বলিয়াই আমরা মনে করি। সব খবর না লইয়া শুধু জনশ্রুতি ও সংস্কার বশে আপত্তি জানান নিরর্থক, বর্ত্তমান দুঃসময়ে সকলেরই আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী প্রেরণের প্রশ্নটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা দরকার। আন্দামানে যদি একটি বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহা আশ্রয়প্রার্থী ও বাঙ্গালী সমাজের ভবিষ্যতের দিক হইতে কল্যাণকরই হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে আন্দামানে নূতন বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠনের সুযোগ ছাড়িয়া দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। প্রয়োজনের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ভারত সরকার এখন আন্দামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠনে আগ্রহ দেখাইতেছেন, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বিশাল বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাতে সবদিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ বাড়িবে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ, এখানে জাহাজ ও বিমান ঘাঁটি আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তিক ভূমিভাগ পশ্চিমবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিটি দখলে থাকা ভাল। পশ্চিমবঙ্গ আন্দামানে আত্মপ্রসার করিতে না পারিলে মাদ্রাজের ইহাকে গ্রাস করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আন্দামান হইতে মাদ্রাজের দূরত্ব পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমান, পোর্টব্লেয়ার মাদ্রাজ সহর হইতে মাত্র ৭৫০ মাইল দূর। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা আছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ যুগে এত বড় কুমারী ভূমিভাগ বেকার পড়িয়া থাকিতে পারে না। অজ্ঞানতাবশতঃ আন্দামান সম্পর্কে আমাদের মনে নানা আতঙ্ক আছে, অচেনা নূতন জায়গায় স্থায়ী বসবাসের জন্য যাইতে মানুষের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। এই সব কারণেই পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র লোকেরা এখন

আন্দামানে যাইতে চাহিবে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীরা নিরুপায় ও নিঃস্ব, উদারতার সহিত কর্ত্তৃপক্ষ যদি চেষ্টা করেন, এই আশ্রয়প্রার্থীদের একাংশকে আন্দামানে লইয়া যাওয়া যাইবে। অবশ্য ইহাদের খাদ্য বা জীবিকার নিশ্চিত দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষকেই লইতে হইবে। অধিকতর প্রয়োজনের তাগিদে আশ্রয়প্রার্থীদের একদল যদি আন্দামানে গিয়া জীবিকার সুযোগ পায়, তখন এই নিরন্ন দেশ হইতে আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হইবে না। মিথ্যা ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে শুধু পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী নয়, পশ্চিমবঙ্গের অনেক লোকও আন্দামানে পাড়ি জমাইবে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ আগে ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে ইহা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত হইলে ভারত সরকার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই নির্জ্জন দ্বীপটিতে দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের রাখিবার বন্দোবস্ত করেন। বাহিরের লোক এই দ্বীপে আসুক এবং দ্বীপপুঞ্জের উন্নতি হোক, ভারত সরকারের কোনদিনই এরূপ ইচ্ছা ছিল না। নিজেদের কর্ম্মচারীদের স্বার্থে শুধুমাত্র পোর্টব্লেয়ার সহরটিকে তাঁহারা ভদ্রলোকের বসবাসযোগ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাকী সমস্তই অবজ্ঞাত হইয়া পড়িয়া আছে। সারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের যা কিছু উন্নতি, প্রায় সবই এই পোর্টব্লেয়ার সহরে সীমাবদ্ধ। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৩৩,৭৬৮ জন, ইহার মধ্যে একমাত্র আন্দামান সহরেই ৪১১১ জন বাস করে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপের সংখ্যা ২০৪টি, এতগুলি দ্বীপে ভারত সরকারের আমলে মোট ১৮২টি গ্রাম (বা সহর) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব গ্রামের মধ্যে আবার পোর্টব্লেয়ারই উল্লেখযোগ্য, এই গ্রামেই (সহর) চার হাজারের বেশী লোক বাস করে, এ ছাড়া ৪টি গ্রামের মিলিত লোকসংখ্যা ৪৮০৮ জন, এবং অপর ১২টি গ্রামের মিলিত লোকসংখ্যা ৭৫৩৩ জন,—এই ১৭টি গ্রামেই লোকসংখ্যা পাঁচশতের বেশী ; দ্বীপপুঞ্জের বাকী ১৬৫টি গ্রামে পাঁচশতের কম লোক বাস করে। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের হিসাবে এখানে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে এখন মাত্র ১১ জন বাস করে। পশ্চিম বাঙ্গলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৭৫৬ জন, কাজেই জীবিকার সংস্থান হইলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডে (ইহা আয়তনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রায় ১/৪ ভাগ) বহুলোকের স্থান অনায়াসেই হইতে পারে। জীবনধারণের অসুবিধা না থাকিলে এখন আন্দামানে যাইবার লোকের অভাব হওয়ার কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গে যে সব নিঃস্ব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকাটাই এখন তাঁহাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। এই বাঁচার সুব্যবস্থা অন্যত্র হইলে আপেক্ষিক সুবিধার লোভে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বিপদ সৃষ্টিতে তাঁহাদের উৎসাহ না থাকাই উচিত। অবশ্য এই সূত্রে কর্ত্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আন্দামানে বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে এখনকার তুলনায় আন্দামানের সহিত বাঙ্গলা প্রদেশের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। আন্দামান ও বাঙ্গলার মধ্যে যাতায়াত সহজসাধ্য হইয়া যোগাযোগ উন্নত হইলে আন্দামানস্থ বাঙ্গালীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য বাঁচাইয়া রাখা কঠিন হইবে না। আন্দামানের দূরত্বও এমন কিছু বেশী নয়, দ্বীপপুঞ্জের প্রধান সহর পোর্টব্লেয়ার হইতে কলিকাতার দূরত্ব মাত্র ৭৮০ মাইল। এখন কলিকাতা ও আন্দামানের মধ্যে যে ষ্টীমার সারভিস চলিতেছে, তাহা ব্যবসায় হিসাবে চলিতেছে না, ক্ষতি হইলে ভারত সরকার সেই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব লন বলিয়া এবং যাত্রীদের তাগিদ নাই বলিয়া ষ্টীমার কোম্পানী উন্নত ধরণের জলযানের সাহায্যে দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন না। আন্দামানে লোকজন এবং ব্যবসা বাণিজ্য বাড়িলে এই সারভিসটিকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আরও ভাল করিয়া চালানো অবশ্যই সম্ভব হইবে। মনে হয়, একটু ভাল সারভিস হইলেই কলিকাতা হইতে দুই দিনের মধ্যে আন্দামান যাওয়া চলিবে। এই ভাবে দুই দিনে আন্দামান যাওয়া সম্ভব হইলে এবং আন্দামানে নূতন উপনিবেশ গড়িয়া উঠিলে বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান আন্দামান-আতঙ্ক অবশ্যই বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠাইবার আগে কর্ত্তৃপক্ষকে দেখিতে হইবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ কতখানি। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আন্দামান ভারত সরকারের কয়েদঘাঁটি ছিল, তখন সরকার দ্বীপের কোন উন্নতিই করেন নাই। কৃষি বা শিল্প কোনটিই আন্দামানে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বিশাল উপকূলভাগে যে কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি পড়িয়া আছে, তাহাতে বাঁধ দিয়া সুন্দরবনের ন্যায় প্রচুর ধান্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। এখন অবশ্য আন্দামানে বেশী ধান হয় না, দ্বীপগুলিতে বহমান নদী খুব কম, তবে মাটি খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার জমি নিঃসন্দেহে উর্ব্বর। এ ক্ষেত্রে খাল কাটিয়া সেচ ব্যবস্থার একটু সুবিধা করিয়া দিলেই আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জে উন্নত ধরণের চাষ হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এ অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ৬০ ইঞ্চি, এ তুলনায় আন্দামানে বৃষ্টিপাত হয় বৎসরে গড়ে ১১০ ইঞ্চি। কাজেই কর্ত্তৃপক্ষ ও দ্বীপবাসীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে আন্দামানে কৃষি ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে।

নারিকেল আন্দামানের সম্পদ। এখনই আন্দামান হইতে প্রচুর নারিকেল বাহিরে রপ্তানী হয়, একটু চেষ্টা হইলে এই ব্যবসা আরও প্রসারিত হইবে। নারিকেল চালানের সঙ্গে আন্দামানে নারিকেল তৈল, দড়ি, মাদুর প্রভৃতি নারিকেল সম্পর্কিত পণ্যের শিল্পও ভালই চলিতে পারে। এই সব শিল্পে অনেক লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইবে। চর-নিকোবর নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ, একমাত্র এখান হইতেই এখন বৎসরে ৮৫ লক্ষ নারিকেল বাহিরে চালান যায়। সুপারীও এই দ্বীপপুঞ্জের বড় বাণিজ্য পণ্য। আন্দামানের প্রায় সবটাই জঙ্গল, এখানে নানা প্রকার কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যদিও জঙ্গল-গুলি সরকারী বন বিভাগের সম্পত্তি, তথাপি এই দ্বীপে বেসরকারী উদ্যমে কাঠের ব্যবসা প্রসারে বাধা নাই। গর্জ্জন প্রভৃতি মূল্যবান কাঠের

সারা পৃথিবীতেই বাজার আছে। কাঠের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরী (উইমকো) আন্দামানে দেশলাইয়ের কাঠি তৈয়ারীর একটি কারখানা স্থাপন করিয়া সেই কাঠি ভারতবর্ষে পাঠাইতেছে। আন্দামান দ্বীপেই বৃহদাকার দেশলাই-শিল্প গঠনের প্রভূত সুযোগ আছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বাঁশ জন্মায়। এই সব বাঁশের জঙ্গল উচ্চতায় ৩০।৩৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়। উপস্থিত নদী কম থাকায় সুবিধা নাই বটে, তবে খাল খুঁড়িয়া এখানে চাষ আবাদের যেমন প্রসার করা যায়, তেমনি এই খালের ধারে প্রচুর বাঁশের সাহায্যে কাগজের কল গড়িয়া তোলা যাইবে। মনে হয় এই দ্বীপে কাগজের অন্যতম উৎকৃষ্ট উপাদান সবাই ঘাসের ভাল চাষ হইতে পারে। চেষ্টা করিলে হয় তো দ্বীপের অসমতল ভূমিভাগে কিছু তুলাও উৎপন্ন হইতে পারে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উর্ব্বরা মাটিতে প্রায় সকল প্রকার ফলই প্রচুর জন্মায়, এই ফলোৎপাদন সুপরিচালিত করিয়া এখানে বৃহদাকার ফল সংরক্ষণ শিল্প গড়িয়া তোলা কঠিন নয়। আন্দামানের উপকূলভাগের খাড়িগুলিতে ভাল মাছের চাষও হইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত আন্দামানের চাষ আবাদের প্রায় সবটুকু উন্নতিই কয়েদীদের দ্বারা হইয়াছে। স্থানীয় কৃষি বিভাগ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, তবে এই বিভাগ এখনও উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করে নাই। কয়েদীদের বুদ্ধিবিবেচনা সীমাবদ্ধ, আর্থিক কোন দায়িত্ব নেওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কৃষিকার্য্য যতখানি সমৃদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ছিল, তাহারও একাংশও হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দ্বীপপুঞ্জের কয়েদী উপনিবেশ উঠিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এখনই এখানে শ্রমিক-সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই আন্দামানে অবিলম্বে কিছু আশ্রয়প্রার্থীর কর্ম্ম সংস্থান একরূপ নিশ্চিত।

আশ্রয়প্রার্থী শুধু পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে আসিতেছে না, পশ্চিম পাকিস্তানের অসংস্থাপিত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা এখনও অগণ্য। বাঙ্গালী আশ্রয়প্রার্থীরা মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য যদি আন্দামানে যাইতে রাজী না হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীতে আন্দামান অবশ্যই অধ্যুষিত হইবে। বোধ হয় ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কয়েদী উপনিবেশ উঠিয়া যাইবার পর হইতে ৬৫০ জন ভারতবাসী আন্দামানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে গিয়াছে। ইহারা সম্ভবতঃ পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী। পূর্ব্ব পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থীদের সম্মুখে আন্দামানে উপনিবেশ গড়িবার সুযোগ আসিলে সেই সুযোগ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এদিক হইতেও পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করা দরকার।

অবশ্য এ কথা না বলিলেও চলিবে যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই, কেবলমাত্র কেতাবী বিদ্যা হইতেই এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে। এই পুঁথিগত বিদ্যা ত্রুটিশূন্য হইবে, বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় সে কথা জোর করিয়া বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো চেষ্টা করিলেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একাংশমাত্র সভ্য মানুষের বসবাসযোগ্য করিয়া তোলা যাইবে, বাকী অংশ এখনকার মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। কাজেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত দায়িত্ব সরকারী কর্তৃপক্ষকেই লইতে হইবে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের বাঁচাইবার আইনগত দায়িত্ব তাঁহাদের নাই সত্য, কিন্তু এই অসংখ্য অসহায় নর-নারীর জীবন রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব যখন তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন ইহাদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দিক হইতে সহানুভূতির এতটুকু অভাব মারাত্মক হইবে। আন্দামানে আশ্রয়প্রার্থী পাঠাইবার আগে দ্বীপপুঞ্জের স্বাস্থ্য ও আর্থিক ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

সভ্যতার অভিনয়

শ্রীশান্তশীল দাস

অর্থহীন জীবনের প্রতিদিন আসে আর যায় ;
কোন মতে বেঁচে থাকা, দিন গোনা শুধু মরণের :
এর বেশী নাই কিছু, পথ-চলা পাথেয় বিহীন,
সৃজনের ব্যর্থতা, শ্রেষ্ঠতার মিছে অভিমান।

সভ্যতার অভিনয় : আজিও সে আদিম মানুষ,
যুগ যুগ ধরি' শুধু চলে নানা বিফল প্রয়াস ;
দেহের নগ্নতা ঢাকা পড়েছে সে আবরণ মাঝে,
বিনাশ হয়নি আজো পশুতার—আছে সেই মতো।

সেই মতো হানাহানি, কামনার বিকট উল্লাস,
হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চনা, ব্যতিক্রম কিছু নাই তার ;
স্বার্থমগ্ন মানুষের তামসিক বিকৃত জীবন ;
শয়তানের মুখে হাসি : বিধাতার পূর্ণ পরাজয়।

ক্লেদাক্ত ধরণী বুকে দিকে দিকে জাগে হাহাকার,
তমিস্রার বুক চিরে আলোকের লাগি আর্ত্তনাদ ;
মরণের তীরে বসে জীবনের যাচে অবসান ;
নিভে যাক দীপশিখা, শ্রেষ্ঠতার ব্যর্থ পরিহাস।



শুপ্তি ছোঁয়া

বন্ধু : অমন করে ট্রেনের ভীড়ে কেউ বই পড়ে ? মহিলাটির গায়ে এসে পড়েছিলে যে।

পাঠক : সবাই তো বোঝ বন্ধু, তবে কেন মনকে চোখ ঠারো।

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু উক্ত পরিষদের তরফ হইতে জনসাধারণের নিকটে অর্থসাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাদিগকে জনসমাজের মধ্যে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে হইবে। বিজ্ঞানের প্রসার বলিতে ইহাই বুঝায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পরিষদের কাজের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য বিশ হাজার টাকা আবশ্যক। কিছুকাল আগে পরিষদের হইয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় উক্ত টাকার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত না হওয়ায় আবার তাঁহাকে আবেদন করিতে হইয়াছে। আমরা সাধারণের দৃষ্টি পরিষদের আবেদনটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। —পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *

আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও প্রান্তে যে লক্ষ লক্ষ অনক্ষর লোক ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করার দায়িত্ব আজ সরকারকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এই দায়িত্ব পরিহার করিয়া অন্য দায়িত্ব গ্রহণের কথা চিন্তাও করা যায় না। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে যাহারা অক্ষরজ্ঞানযুক্ত নহে, তাহারা শুদ্ধমাত্র অক্ষর জ্ঞানের অভাবেই অদক্ষ শ্রমিক ও অপটু কৃষকের পর্য্যায়ে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়া অনায়াসেই তাহাদিগকে দক্ষ শ্রমিক কৃষকের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায়। সামরিক স্বার্থের দিক হইতে তাহাতে জাতিরও সমূহ লাভ। শিক্ষাহীনতার দ্বারা আমাদের জাতীয় উদ্যম কিভাবে এবং কতদূর অপচিত হইয়েছে তাহা পরিমাপ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত আমরা অপচয়ের পরিমাণ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতাম। শিক্ষাহীনতা মানুষকে শুধু মনের দিক হইতেই পঙ্গু করে না, তাহার উদ্যমের উৎসকেও বিশুষ্ক করে; ফলে তাহাকে শারীরিক দিক হইতেও নির্বীর্য্য করিয়া তোলে। শিক্ষাহীনতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তবেই সমস্তান্তরে মনোযোগ আরোপ করা চলে। —স্বরাজ

* * * *

বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণ এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই বদভ্যাস দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। কারণ ইহা দ্বারা শুধু রেল কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হয় না, সাধারণ লোকের অসাধুতা প্রশ্রয় পায় এবং যাহারা টিকেট করিয়া যায় তাহাদের অসুবিধা বাড়ে, রেলকর্তৃপক্ষ কিছুকাল ধরিয়া এই দুর্নীতিদমনে সচেষ্ট ছিলেন। ইহার ফলে শুধু ই-আই-রেলপথেই একমাসে দুই লক্ষ দুই হাজার সাত শত উনসত্তর টাকা আদায় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাত্রীদের নিকট হইতে টিকেট বাবদ আদায় হইয়াছে ৬০ হাজার ১৮৯ টাকা এবং মালের মাশুল বাবদ আদায় হইয়াছে ৪৭ হাজার ৫৬৬ টাকা। যাত্রীরা ফাঁকি দিবার চেষ্টায় ধরা পড়িয়া বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছে ৯৫ হাজার ১৩ টাকা। এক মাসে শুধু ই-আই-আর-এ আঠারো হাজার ২৬২ জন যাত্রী বিনা টিকেটে ভ্রমণ করিয়া ধরা পড়িয়াছে। যাহারা ধরা পড়ে নাই তাহাদের সংখ্যাও অবশ্যই তুচ্ছ নহে। লোকাল ট্রেণে বিনা টিকেটে কত যাত্রী যে ভ্রমণ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। জনস্বার্থে এবং জাতীয় স্বার্থেই যাত্রী ও জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই শ্রেণীর দুর্নীতি দমনে সহযোগিতা করা উচিত। —হিন্দুস্থান

* * * *

জগতের সত্তরটি দেশ উপনিবেশ হিসাবে আটটি সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অধীন। এই উপনিবেশগুলির রুধির শোষণ করিয়াই এই সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; কাজেই এগুলিকে হাতছাড়া করিতে যে ইউরোপীয় জাতিগুলি কেন অনিচ্ছুক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় জাতিগুলি বলিয়া থাকেন যে, সভ্যতা বিস্তার ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন লক্ষ্যই নাই; কিন্তু তাহাদের কার্য্যকলাপের ধারা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সভ্যতা বিস্তার একটি বেশ লাভজনক ব্যবসায়। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে রুশিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিরা যেন এই সমস্ত উপনিবেশগুলিতে গিয়া সেখানকার শাসনপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পায় এবং এই উপনিবেশগুলির আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের অছিদিগকে এক একখানি বাৎসরিক রিপোর্ট দাখিল করিতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য, বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং ফলে এই প্রস্তাবটি সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হয়। সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বরূপ যে কি, তাহা এই ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। —বিশ্ববার্ত্তা

* * * *

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করিয়াছেন। হঠাৎ এই প্রকার ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড়ের কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ও বাস্তুত্যাগবুদ্ধির সম্ভাবনা কি পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অস্বীকার করেন? ভারতীয় ইউনিয়নের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিকট এ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিবার যে একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, তাহা কি পূর্ব্ববঙ্গ সরকার মনে করেন না? এইরূপেই কি তাঁহারা সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষা করিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু

সমস্যার প্রতিক্রিয়া নানারূপে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়াছে এবং একটা তিক্ত ও বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে। এই বিষ কোন না কোনরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে। বিষের ক্রিয়া কখনও প্রীতিপদ হয় না; পরিণামে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। ইহার আশু প্রতিকার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। —পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেট পাশ করিবার সময় যৌথ ব্যবসায়ের ট্যাক্স বৃদ্ধির এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে জানান যে, ভারতশাসন আইন অনুসারে ব্যবসায়ে সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০৲ টাকার অধিক বর্দ্ধিত করা যায় না। কাজেই এখন ট্যাক্স বাবদ আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৫০৲ টাকার নীচে ট্যাক্সের হার পরিবর্ত্তন করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। সুপারিশটি এইরূপ—ভাড়ার পরিমাণ ৬০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ, কিন্তু ১০০৲ টাকার কম হইলে ট্যাক্সের পরিমাণ হইবে ৪০৲; ভাড়া ৩০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ অথচ ৬০৲ টাকার কম হইলে ২৫৲ টাকা; ভাড়া ২০৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ অথচ ৩০৲ টাকার কম হইলে ১৫৲ টাকা; ভাড়া ১৫৲ টাকা কিন্তু ২০৲ টাকার কম হইলে ট্যাক্স হইবে ১০৲ টাকা। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আয় বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ইহার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের করভার না বাড়াইয়া বড় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সঙ্গত কর আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সর্ব্বোচ্চ ট্যাক্সের পরিমাণ ৫০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া বড় ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে যে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" হইয়াছে, তাহা বাতিল করিবার জন্য আইনের সংশোধন আবশ্যক। আমরা এদিকে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। ইহা ছাড়া নানা উপায়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যেসব ব্যবসায়ীর অভ্যাস, তাহারা নিশ্চয়ই কর্পোরেশনকেও রেহাই দিতেছে না। স্বল্পপুঁজি ছোট ব্যবসায়ীদিগের করভার বৃদ্ধির পূর্ব্বে এই প্রতারক শ্রেণীর বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযান প্রয়োজন। —স্বরাজ

* * *

জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উপনিবেশ এবং অছিকমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ বি শিবরাও সাম্রাজ্যিক শক্তিসমূহের শাসন এবং শোষণ ব্যবস্থার সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুসারে উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং গঠনতান্ত্রিক ব্যাপারে উক্ত সঙ্ঘের হস্তক্ষেপের অধিকার নাই, ইহাই বৃটেনের অভিমত। বৃটেনের মতে উপনিবেশগুলির শাসন ব্যবস্থার জন্য সাম্রাজ্যিক শক্তিই সম্পূর্ণরূপে দায়ী এবং তাহারই নির্দ্দেশ মতো নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে। এক কথায় ইহা একটি ঘরোয়া ব্যাপার, ইহা লইয়া জাতিসঙ্ঘের মাথা ঘামাইবার কারণ নাই। মিঃ বি, শিবরাও এই অভিমত মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি প্রস্তাব করেন যে, কোন সাম্রাজ্যিক শক্তি যদি কোন পূর্ব্বতন উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে ঐ উপনিবেশের শাসনব্যবস্থায় কি কি রূপান্তর সাধিত হইয়াছে, তাহার বিশদ বিবরণ জাতিসঙ্ঘের নিকট পেশ করিতে হইবে। বৃটেনের প্রতিনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপনিবেশগুলির অবস্থা জাতিসঙ্ঘের আলোচনার বহির্ভূত রাখার এই চেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। মনে হয়, মালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটেনের কার্য্যকলাপ গোপন রাখার জন্যই ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। —পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা

* * *

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের আলোচনার ফলে কমনওয়েলথ যদি এইরূপ একটি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, যাহাতে ভারত তাহার স্বাধীন সার্ব্বভৌম সত্ত্বা রক্ষা করিয়া ও জগতের অন্য দেশগুলির সহিত তাহার স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া অন্তর্গঠনের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে কমনওয়েলথে যোগদানের প্রশ্ন আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আজ ইহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, বর্ত্তমান জগতে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতার নীতি খুব বেশী দিন চলিবে না। আন্তর্জ্জাতিক ঘূর্ণিপাক হইতে সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষা করিয়া গঠনমূলক ও সৃজনশালী নীতি অবলম্বন করিতে হইবে—নেতি, নেতি করিয়া আত্মঘাতী বিচ্ছিন্নতার নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলে বিপদ অনিবার্য্য। মোট কথা, ভারত—কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিবে, কি বাহিরে যাইবে, সে প্রশ্ন কেবল ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া দেখিয়া এবং ভবিষ্যতের বিশ্ব রাজনীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থির করিতে হইবে। ভাবোচ্ছ্বাস দ্বারা এই জীবনমরণ প্রশ্ন মীমাংসিত হওয়া উচিত নহে। —হিন্দুস্থান

* * *

কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতে ভাষার ভিত্তিতে হায়দরাবাদ রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে তাহার সন্নিহিত ভারতীয় প্রদেশের সহিত যুক্ত করা উচিত। ইহাতে কিন্তু এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ভারতের রাজ্যবিস্তারের লোভ আছে। হায়দরাবাদের জনগণের যে অংশ হিন্দু তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতে চাহিবে—অবশ্য বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির মত মন্ত্রীসভাযুক্ত প্রদেশপালের অধীনে ভারতের সহিত যুক্ত থাকিতেই তাহারা চাহিবে না। শতকরা ৮৬ জন লোক হিন্দু বলিয়া সেখানকার হিন্দু প্রদেশপাল এবং লোকায়ত্ত শাসন পাইলে খুশী হইবে।

এইসব কথা মনে করিয়া কাশ্মীরের মহারাজাকে নূতন হায়দরাবাদ প্রদেশের শাসনভার লইবার জন্য আহ্বান করা হউক। তাহা হইলে হায়দরাবাদের লোকেদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

বিপরীতমুখে, কাশ্মীরের জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা নিজামকে কাশ্মীরের

প্রদেশপাল নিযুক্ত করুক। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে, পাকিস্থানের গাত্রদাহ শান্ত হইবে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভাল সম্পর্ক স্থাপনের পথ পরিষ্কার হইবে। —'হরিজন পত্রিকা'

* * *

সর্ব্ববিধ ব্যবসায়ের মতো পুস্তকের ব্যবসাও ইদানীং বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। বাঙ্গলা বিভক্ত হওয়ায় বঙ্গভাষাভাষী মুলুকের বৃহত্তর অংশ পাকিস্থানে পড়িয়াছে এবং তথাকার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ধারা অব্যাহত নাই। প্রধানতঃ এই কারণে বইয়ের বিক্রী আশাতীতভাবে কমিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ অন্নবস্ত্র ও জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যেরূপ অবিশ্রান্ত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে প্রাত্যহিক দিন-যাপনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বই কেনা অনেকেরই সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশের পথও সঙ্কট সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। নানা কারণে—কাগজ খোলা বাজারে দুষ্প্রাপ্য, চোরাবাজারে যথেচ্ছ দামে কাগজ বিক্রী হয়। ছাপার মূল্য পাঁচ ছয় গুণ বাড়িয়াছে, তৎসত্ত্বেও কোন ছাপাখানা নির্দ্ধারিত সময়ে বই বাহির করিয়া দিবার দায়িত্ব লয় না। এত অধিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বই প্রকাশ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না—হইলেও তাহার পর বই বেচিয়া তাহাতে কিছুই লাভ হয় না; কাজেই নানা কার্য্যকারণ-বিপাকে বইয়ের ব্যবসা বাঙ্গলায় আজ মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছে। লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তকবিক্রেতা…নানা পর্য্যায়ের লোকই ইহার ফলে যেমন বিপন্ন হইয়াছেন, তেমনি ইহার ফলে দেশের সংস্কৃতি প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে, শিক্ষা জগতেও সবিশেষ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। বহু পাঠ্য-পুস্তকই মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না, অথবা কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে এমন সমস্ত বইয়ের অবশিষ্টাংশ আর শেষ হইতেছে না। ইতিপূর্ব্বে এই শেষোক্ত প্রয়োজনে কিছু পরিমাণ নিউজ প্রিণ্ট বাজারে ছাড়ার কথা হইয়াছিল—তাহা হইয়াছে কি এবং তাহাতে সঙ্কটের কিছু আসান হইয়াছে কি? —গায়ত্রী

* * *

লণ্ডনে বৃটিশ সাম্রাজ্য বা আধুনিক "কমনওয়েলথ" সংজ্ঞাভুক্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীদের লণ্ডন বৈঠকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল যোগ দিবার পর হইতে স্বদেশে ও বিদেশে একটা উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ দেখা দিয়াছে, ভারত ঐ মণ্ডলীর মধ্যে থাকিবে, না বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ মহল হইতে ভারতকে পাকে-চক্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির আওতায় রাখিবার জন্ত কৌশলপূর্ণ প্রচার-কার্য্যও হইতেছে। জাতীয় কংগ্রেস এবং জাতীয় গভর্ণমেণ্টের শত্রুরা ঐ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্য্যের সূত্র ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন কথা রটাইতেছেন যে, দিল্লী গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্ত গোপন চুক্তি ইত্যাদি করিতেছেন। এমন কি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের নেতা জওহরলাল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ঘোষণাকারী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলালের প্রতিও আজ বক্র কটাক্ষের অভাব নাই।

এই দুই প্রকার প্রচারকার্য্যের সমুচিত উত্তর দিয়াছেন ভারতীয় পার্লামেণ্টের সভাপতি শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর। জাতীয়তাবাদী ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি লণ্ডনে ঘোষণা করিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে যাইতে আদৌ ভীত নহে।" ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশায় বা আশঙ্কায় আজ দলবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি করিবার জন্ত যে দুইটি পৃথক শিবির রচিত হইতেছে, সেই কূটনৈতিক চাতুরী-জালের বাহিরে থাকাই ভারতের লক্ষ্য—একথা মবলঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর চিত্ত হইতে বৃথা সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন।

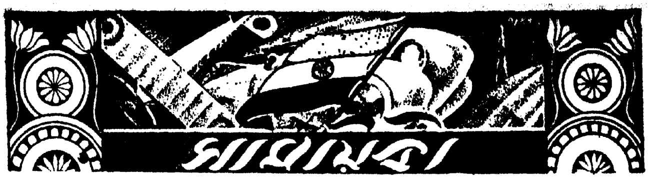
"যদি কোন কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় তাহা হইলে যে কমনওয়েলথ সমগ্র বিশ্বের ঐক্য কামনা করে, ভারত তাহাতেই যোগদান করিবে।"

"যদি কমনওয়েলথ সমগ্র বিশ্বমানবের রক্ষক হয় তবে ভারত তাহাতে যোগদান করিবে, কিন্তু যদি ইহা বিশ্ব সাম্রাজ্য স্থাপনের ছলনা হয়, তবে আমরা তাহার প্রতি নিস্পৃহ হইব এবং কিছুতেই উহার মধ্যে থাকিব না। পাকিস্থান বা সিংহল কি সিদ্ধান্ত করিবে তাহা আমাদের বিবেচ্য নহে।"

আরও অগ্রসর হইয়া মিঃ মবলঙ্কর বলিয়াছেন, "বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে না থাকার অর্থ ইহা নয় যে, আমরা তাহার বিরোধী হইব। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের সাহায্য ব্যতীত আমরা ত্রিশকোটী ভারতবাসী নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে পারিব না, একথা ভাবিতেও আমার ক্লেশ হয়। যদি আমাদের এই অবস্থা, তাহা স্বাধীন জাতি হইবার কোন অর্থ থাকে না।" —স্বরাজ

* * *

আসামের সীমান্তে পাকিস্থান অঞ্চল হইতে একদল সশস্ত্র পাকিস্থানী সৈন্ত বাজারে মৎস্ত বিক্রয়রত জেলেদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে হতাহত করে এবং ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহতদের পাকিস্থানে লইয়া যায়। অন্য আর এক স্থানে ডাক ও তার বিভাগীয় কতিপয় মেরামত, কার্য্যরত কর্ম্মীর উপর গুলীবর্ষণ করিয়া অনুরূপভাবে আহতগণকে লইয়া পাকিস্থানী সৈন্তগণ সরিয়া পড়িয়াছে। আসামের প্রদেশপাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানী সৈন্তগণ রাজাকরনীতি অনুসরণ করিতেছে। তবে পাকিস্থান সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সভ্য, সুতরাং এখানে পুলিশী শাসন করিবার অবসর নাই। পাকিস্থান সরকারের নিকট হয়ত কড়া চিঠি যাইবে; তাহারা সব ব্যাপার অস্বীকার করিবে; তারপর সব চুপ চাপ। যশলমীরে পাকিস্থানী বাহিনী ঢুকিয়া অনেক উৎপাত, নরহত্যা প্রভৃতি করিয়াছিল, ভারত হইতে কড়া চিঠিও গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হইল, তাহা আজাবধি জানা গেল না।



মানভূমবাসী বাঙ্গালীদের দুরবস্থা—

স্বাধীনতা লাভের পর কয়েকটি প্রদেশে প্রাদেশিকতার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সে সকল প্রদেশে দারুণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। উড়িস্যার এক শ্রেণীর অধিবাসীরা তথায় বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল—কিন্তু বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের চেষ্টায় ফল অন্যরূপ হইয়াছে। উড়িস্যায় এখন আর বাঙ্গালী বিদ্বেষ ত নাই, অধিকন্তু উড়িস্যা সরকার ২৫ হাজার পূর্ব্ববঙ্গাগত আশ্রয়প্রার্থীকে স্থান দানে সম্মত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত শত শত বাঙ্গালী চিকিৎসক ও শিক্ষক উড়িস্যায় চাকরী পাইতেছেন। আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারের ফলে পাণ্ডুতে যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সে জন্য শ্রীহট্ট, কাছাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি লইয়া নূতন পূর্ব্বাচল প্রদেশ গঠনের আন্দোলন চলিতেছে। আসামের শতকরা ৩০ জন অধিবাসী মুসলমান—আসামবাসী বাঙ্গালীরা (শতকরা প্রায় ৩০ জন) মুসলমানদের সহিত একত্র হইয়া অসমীয়াদিগকে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ে পরিণত করিলে আসামীদের অসুবিধা যে বাড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী সে কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন ও আসামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু বিহার প্রদেশের অবস্থা অন্যরূপ। ১৯১২ সালে যখন পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গ যুক্ত করিয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়, তখন বিহারের সন্নিহিত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানগুলি বিহারের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়া দেখিয়া কেহ তাহাতে আপত্তি করেন নাই। ফলে পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সিংহভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলাগুলি এখন বিহারের মধ্যে রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানে বাঙ্গালী অধিবাসী সংখ্যায় অধিক—বর্ত্তমানে ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত ছোট প্রদেশ হইয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান দিবার জন্য পর্য্যাপ্ত ভূমি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নাই—এই সব নানাকথা চিন্তা করিয়া এখন ঐ সকল বাঙ্গালী-প্রধান স্থান বিহার হইতে বাহির করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। তাহার ফলে বিহার প্রদেশে বাঙ্গালীর অবস্থা—পূর্ব্বপাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের অবস্থার প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া মানভূম জেলার প্রায় সকল অধিবাসীই বাঙ্গালী, ঐ জেলাটি যাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়—সে জন্য স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই মানভূমের অধিবাসীরা চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৪৭ সালের ২৮শে জুন পুরুলিয়া টাউন হলে এক সভা করিয়া বাঙ্গালীরা ঐ মনোভাব প্রকাশ করেন ও পরে মানভূম-জেলা-উকীল সমিতির সভাতেও ঐ মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গণপরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় এক সভায় বিহার গবর্ণমেণ্টকে মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি জেলায় যাহাতে হিন্দী প্রচারে জোর দেওয়া হয়, সে জন্য অনুরোধ করেন। ফলে ১৯৪৮ সালের প্রথম হইতেই বিহার গভর্ণমেণ্ট এমনভাবে মানভূমে হিন্দী প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যে-সকল বাঙ্গালী শত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে, তাহাদের বালক-বালিকারা বর্ত্তমানে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সহসা সকল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের নামের সাইনবোর্ড পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দী ভাষায় লিখিত বোর্ড দেওয়া হইয়াছে। সকল সরকারী কার্য্যালয়ে শুধু হিন্দী ভাষায় নোটীশ দেওয়া হইতেছে। জেলার সকল পথের মাইল-পোষ্টের সংখ্যাগুলি ইংরাজির পরিবর্ত্তে হিন্দী করা হইয়াছে—অথচ পাশের জেলা রাঁচী ও হাজারীবাগে এখনও সকল মাইল-পোষ্টে ইংরাজিতেই সংখ্যা লেখা আছে। এক জন বাঙ্গালী মানভূম জেলার স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন, তাঁহাকে সরাইয়া একজন বিহারীকে সেই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বিদ্যালয় বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত—যে সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী

শিক্ষকের সংখ্যা অধিক, সে সকল বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা-সম্বলিত বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। আদিবাসীদের জন্য স্থাপিত ৭২টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে এতকাল ধরিয়া বাঙ্গালার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইত—ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কখনও হিন্দী ভাষায় কথা বলে না—তথাপি নূতন আদেশ জারি করিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী বিহারে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে শুধু হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা থাকিবে। যে সকল আদিবাসীর নিজস্ব কোন লিখিত-ভাষা ছিল না—অথচ তাহারা বাঙ্গালাতেই কথা বলিত—তাহাদের হিন্দী 'নিজস্ব ভাষা' বলিয়া ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হইতেছে। অথচ মানভূমবাসী উড়িয়া, কনোজিয়া, মৈথিলী ও মাদ্রাজী—সকলেই বহুকাল ধরিয়া মানভূমের মাতৃভাষা 'বাঙ্গালা' ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। গণপরিষদে জাতির জন্মগত অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে ও তাহাতে বলা হইয়াছে, ভারতের সকল স্থানের সকল লোক নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করিবেন। বিহারের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্য বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলে সভা করিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া লোককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের সে প্রচারকার্য্য সরকারী অনুগ্রহ লাভেও বঞ্চিত হয় না। অথচ গত মার্চ্চ মাসে পুরুলিয়ায় যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল, মানভূমের ডেপুটী কমিশনার তাহার কর্ম্মকর্ত্তা-দিগকে অসম্মানজনক সর্ত্তে সম্মত হইতে বলায়, সে সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঝালদা (মানভূমের অন্তর্গত) হাই স্কুলে জেলা ছাত্র কংগ্রেসের এক সভায় ছাত্ররা ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালাই তাহাদের মাতৃভাষা। তাহার ফলে ছাত্রকংগ্রেসের সভাপতি, উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা হইয়াছে। পুরুলিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, স্থানীয় সিভিল সার্জ্জেন প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারীকে অকারণে মানভূম জেলা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে—ফলে মানভূম জেলায় এখন আর বাঙ্গালী সরকারী কর্ম্মচারী নাই। যাহারা বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, পুলিসের বড়-কর্ত্তারা তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সকল পুলিস কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ দিয়াছেন এবং তাহার ফলে ঐরূপ কর্ম্মীরা নির্য্যাতীত হইতেছেন। মানভূম জেলায় গত ২৮ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী নেতারাই কংগ্রেস আন্দোলন পরিচালন করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, কর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সারা ভারতে সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহারা এই সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করার ফলে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং জেলাকংগ্রেস কমিটীর সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির ৩৮ জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুরুলিয়ার নূতন কলেজকে পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয় এই সর্ত্তে তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন যে, কলেজে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে। যতদিন মানভূম বিহারের অন্তর্গত থাকিবে, ততদিন মানভূমবাসী বাঙ্গালীদের হিন্দী শিক্ষা করিতে কোন আপত্তি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু এই ভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়া লোককে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করার ব্যবস্থাকে কেহই সমর্থন করিতে পারেন না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যথাসময়ে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিহারের অন্তর্গত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানসমূহের বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি-রক্ষার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই। আমরা উপরে শুধু মানভূম জেলার অবস্থার কথাই বলিয়াছি। সিংহভূমেও বাঙ্গালীদের ঐ একই অবস্থা। টাটানগরের মত বাঙ্গালী-প্রধান স্থানেও সকলকে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। সেরাইকোলা ও খরসোয়ান নামক দুইটি রাজ্য উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল ঐ দুইটি রাজ্যেই বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজ্য দুইটিকে জোর করিয়া বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, ফলে তথায় অসন্তোষ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। হাজারীবাগ জেলার গিরিডি

অঞ্চল, সাঁওতাল পরগণার সমস্ত স্থান, পূর্ণিয়ার কয়েকটি অঞ্চলেও এই ভাবে জোর করিয়া লোককে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিয়া তাহাদের হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণার চেষ্টা হইতেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ব্যবস্থার কার্য্যটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা করা হইলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে বিহার গভর্ণমেণ্ট সকল বাঙ্গালী অধিবাসীকে জোর করিয়া হিন্দী ভাষাভাষী করিয়া তুলিয়া বাঙ্গালী-প্রধান অঞ্চলগুলি হইতে বাঙ্গালার সংস্কৃতি নষ্ট করিয়া দিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবেন। সে জন্য এখন হইতে আমাদের অবহিত হইয়া এ বিষয়ে প্রবল অন্দোলন চালাইয়া যাওয়া উচিত। যাহাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে অবহিত হন, সে জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।



মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ফটো—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা—

গত ২ মাস যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রত্যহ ৩।৪ শত করিয়া আশ্রয়প্রার্থী চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের আগমনের কারণ বহুবিধ। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু ঘটনার উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গে বহু স্থানে হিন্দুদের পক্ষে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানগণ সাধারণভাবে ধীরে ধীরে হিন্দুবর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দু ডাক্তারের নিকট মুসলমান রোগী আসে না, হিন্দু উকীলের নিকট মুসলমান মক্কেল আসে না; হিন্দুর দ্বারা মুসলমান ছাত্র শিক্ষালাভ করিতে চাহে. না, হিন্দুর জমী চাষ করিবার জন্য মুসলমান কৃষক পাওয়া যায় না। বাজারে মুসলমান ব্যবসায়ী হিন্দুর নিকট অধিকমূল্যে জিনিষ বিক্রয় করে। তাহার উপর বালিকা ও যুবতীদের লইয়া ঘরে বাস করা অসম্ভব। মুসলমান যুবকগণের অনাচারের ফলে তাহাদের পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না। ইতিপূর্ব্বেই বহু হিন্দু দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; কাজেই যে অল্পসংখ্যক হিন্দু এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেছিল, তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। সেই কারণে লোক সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া, মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও পিতৃ-পুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণ ছাড়া অর্থনীতিক অবস্থাও সেখানে চরমে উঠিয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে চাউলের মণ ৫০।৬০ টাকা, সরিষার তৈলের সের ৫ টাকা, চিনির সের ৪ টাকা, কেরোসিন তেল পাওয়া যায় না, কাপড় অসম্ভব অধিক দরে বিক্রীত হয়—একখানা ধুতির দাম ১২ টাকা, একখানা শাড়ীর দাম ২০ টাকা। এ অবস্থায় লোকের সেখানে বাস করা প্রকৃত পক্ষেই কষ্টকর। প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও তেলের অভাবে তাহা খাইবার উপায় নাই। নূতন আয়ের পথ বন্ধ হওয়ায় সেখানের লোক সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া এতদিন কোনরূপে কায়ক্লেশে দিন কাটাইতেছিল, এখন এই দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যে সেখানে বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পরিচিতদের ও হিন্দুদের মধ্যে তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হওয়াও লোক অধিক কাম্য মনে করিতেছে। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদেরও দুর্দ্দশা বাড়িয়া গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণ-মেণ্টের পক্ষে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও সাধ্যাতীত হইয়াছে। সে জন্য সম্প্রতি ভারত-গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সাকসেনা কলিকাতায়

আসিয়া বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ সভা করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে উক্ত তিনটি প্রদেশের খালি স্থানগুলিতে বাস করানো যায়, সেজন্য চেষ্টা চলিতেছে। তাহা ছাড়া আন্দামান দ্বীপেও আশ্রয়প্রার্থীদের দ্বারা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদিন কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য দান করিয়াছিলেন। তাহাদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বেকারদিগকে খাদ্য ও বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছে; লোক যাহাতে কাজকর্ম্ম পায় সে জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় দান এত অল্প যে তাহা সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কাজ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এ দেশে আসিয়াছে। তাহাদের বাসস্থান বা খাদ্যপ্রদান করা কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব নহে। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাবস্থা এমন যে—যে কোন সময়ে রেশন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানেও চাউলের মণ ৫০।৬০ টাকায় উঠিয়া যাইবে। এখনই কলিকাতা সহরে কালো বাজারে ৪০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালায় এত অধিক আশ্রয়প্রার্থী সহসা চলিয়া আসায় এ দেশের খাদ্য-সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। বাজারে সুলভ খাদ্যগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যায়—থোড়, মোচা, কাঁচকলা, শাক প্রভৃতি পাওয়ার উপায় নাই। তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে লোকের ক্রয় শক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। অধিক মূল্যের জিনিষ—যথা আলু, কপি, বেগুন প্রভৃতি কিনিবার ক্ষমতা লোকের চলিয়া গিয়াছে। মাত্র কয়েকজন ধনী কর্ত্তৃকই সেগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই খাদ্যাবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলে লোক নানাবিধ রোগে ভুগিয়া মারা যাইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন তাহা বলা যায় না—কিন্তু তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও ইহার প্রতীকারের কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। ফলে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র মন্ত্রীদের কার্য্যের নিন্দা শুনা যাইতেছে। মানুষ, তাহার প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্য, খাদ্য না পাইলে যে উন্মাদ হইয়া যাইবে ও যাহা খুসী তাহা বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এখন প্রত্যেক দেশবাসীর নীরব থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেকে কি ভাবে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়া এই দুর্দ্দশার অবসান ঘটাইতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিবার ও কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে। নচেৎ সকলকে একযোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে।



কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন বিচারপতি
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায়

বস্ত্র সমস্যা—

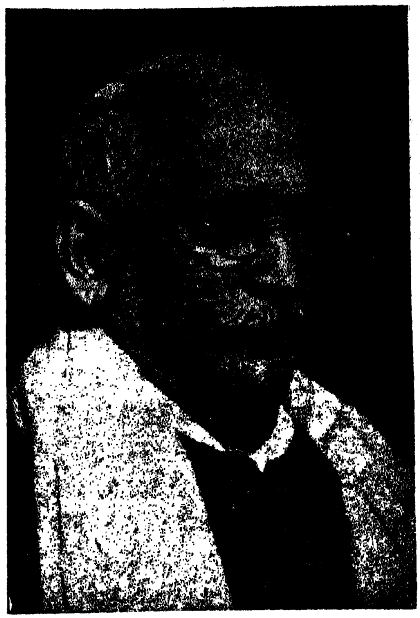
বাঙ্গালাদেশে বস্ত্রসমস্যা গত প্রায় এক বৎসরকাল দেশবাসীকে ভীষণভাবে বিব্রত করিতেছে। কাপড়ের কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের হাতে সমস্ত কাপড় চলিয়া যায় ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ গাঁট কাপড় পাকিস্তানে চলিয়া যায়। তাহার ফলে এদেশে বস্ত্রমূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। গত ২।৩ মাস গভর্ণমেণ্ট বস্ত্র সমস্যা সমাধানের যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কোনটাই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ১লা নভেম্বর হইতে পুনরায় কাপড়ের রেশনিং হইবার কথা ছিল, তাহাও হয় নাই। শুনা যাইতেছে, রেশনিং হইতে আরও ২ মাস সময় লাগিবে। শীত আসিয়াছে, বস্ত্র না হইলে লোকের চলিবে না। কালোবাজার পুরাদমে চলিতেছে, সেখানে কাপড় ক্রয় করা দরিদ্র জনসাধারণের ক্ষমতাতীত। এ অবস্থায় কেন যে রেশনিং প্রথা পিছাইয়া দেওয়া হইল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মানুষ ক্রমে সব দিক দিয়া নিরুপায় হইতেছে। কাজেই তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া সম্পর্ক প্রদর্শনী—

কলিকাতা করপোরেশন কমার্শিয়াল মিউজিয়মে এই প্রদর্শনী ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে ৩রা অক্টোবর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিম-বাঙ্গালার দেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কার্ট্জু। প্রদর্শনী দেখিয়া সকলে প্রীত হইয়াছেন। মামুলী প্রদর্শনী হইতে ইহার রূপ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ছিল। এইরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সকলে স্বীকার করিবেন। আমাদের নেতৃস্থানীয়েরা যখন বিভিন্ন সম্মেলনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছেন সেই সময়ে এইরূপ একটী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া কমার্শিয়াল মিউজিয়াম সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা "আমরা ও আমাদের প্রতিবাসী" সময়োপযোগী হইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে ইহাতে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি বিভাগ ও কলিকাতাস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত ও চৈনিক বাণিজ্যিকসংঘের সভাপতি এই প্রদর্শনীতে বহু মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক দ্রব্য এবং জ্ঞাতব্য মানচিত্র ও প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করেন। বে-সরকারী কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানও এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ দর্শনীয় জিনিষ রাখিয়া প্রদর্শনীর শ্রীবৃদ্ধি করেন। এই উপলক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়াম যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ প্রাচীর-পত্র ও মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছে তাহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির সম্বন্ধে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ বিষয়ে বিশেষ তথ্যপূর্ণ। মোটের উপর প্রদর্শনীতে দেখিবার শিখিবার ও ভাবিবার খোরাক প্রচুর ছিল।

নূতন রাষ্ট্রপতি—

আগামী ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইবে তাহার সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশবাসী শ্রীপুরুষোত্তম দাস টাণ্ডনকে ১৫০ অধিক ভোটে পরাজিত করিয়া মাদ্রাজের ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নূতন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই প্রবীণ কংগ্রেসকর্ম্মী। জীবনের গত ৩০ বৎসরকাল উভয়েই মুক্তি সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এই ভোটাভুটি না না হইলেই দেশের লোক সন্তুষ্ট হইত। কংগ্রেসের প্রধান পরিচালকগণ এই দ্বন্দ্বে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ডাঃ সীতারামিয়া বহু বৎসর যাবৎ



শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামিয়া

দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য কাজ করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাদের ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোকের ভোট পাইয়াই ডাঃ সীতারামিয়া জয়যুক্ত হইয়াছেন।

বিপ্লববাদ—

দেশ স্বাধীন হইলেও দেশের সকল রাজনীতিক দল এই স্বাধীনতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সকল দলের লোক লইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কোন বিশেষ দলের লোক নানা অজুহাত দেখাইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য হন নাই। তাঁহাদেরই নেতৃত্বে দেশে বিপ্লববাদ চলিতেছে। একদল কর্ম্মী শ্রমিকদের মধ্যে

আন্দোলন করেন—তাহার ফলে গত এক বৎসরে দেশে শ্রমিকদের মধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হইয়াছে—দেশের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে ও লভ্যাংশ কমিয়া গিয়াছে। আমরা গান্ধীজির সর্ব্বোদয় সমাজের আদর্শ সমর্থন করি। তবে যে ভাবে লোককে ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত না করিয়া শুধু তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ করা হইতেছে, তাহার ফল কখনই দেশের পক্ষে সম্মানজনক হইবে বলিয়া মনে করি না। ঐ দল শুধু দেশের ধনিকদের বিরুদ্ধে নহে, বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্যে নানারূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন এবং গোপনে শাসনযন্ত্র অচল করার নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল—তাহা অবশ্য ব্যর্থতায় পরিণত হয়। সম্প্রতি কলিকাতার টেলিফোন একস্‌চেঞ্জে আগুন লাগিয়া গভর্ণমেণ্টের কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও কলিকাতার ব্যবসার বাজার অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ অবশ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। ইতিমধ্যে দেশে যে একদল বিপ্লববাদী নানাভাবে দেশবাসীকে, দেশের কলকারখানাগুলিকে ও দেশের শাসনব্যবস্থাকে অচল করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যাহাতে বিপ্লববাদীর সংখ্যা বৃদ্ধি না পায়, এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা না করিলে দেশে বিপ্লব অনিবার্য্য। একদিকে ধনিকগণ, আর এক দিকে বিপ্লববাদীদল—উভয় পক্ষই শাসন ব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ধনিকদলকেও দুর্নীতির জন্য কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। দুর্নীতির জন্য গভর্ণমেণ্ট মাত্র কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বা কয়েকটি মাত্র ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহা সত্য। কিন্তু ব্যাপকভাবে এই কার্য্য না করিলে দেশ হইতে দুর্নীতি দূর করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। এই কার্য্যে দেশের জনসাধারণ অবশ্যই গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবে। উভয় পক্ষকে দমন না করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সচল রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। প্রয়োজন হইলে, উভয় কার্য্যেই দেশবাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় অগ্রসর হইবে। উভয় পক্ষকে দমন না করিলে দেশে যে অশান্তির উদ্ভব হইবে, তাহার ফল শুধু গভর্ণমেণ্টকে নহে, শান্তিপ্রিয় দেশবাসীকেও ধ্বংস করিবে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ৩রা অক্টোবর সকালে ৯টার সময় পশ্চিম বঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার সময় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরিয়াদহ



আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

অনাথ ভাণ্ডার (২৪পরগণা) পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিমলবাবুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং ২৪পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিজয়-কৃষ্ণ আচার্য্য আই-সি-এস তথায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব-প্রাঙ্গণে স্থানীয় ও কলিকাতার বহু লোক উপস্থিত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। মন্ত্রী প্রফুল্লবাবুর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার জনাব সাত্তার, সেক্রেটারী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। মন্ত্রী সেন মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রাণবন্ত যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। সকলের সমবেত চেষ্টায় অনাথ



আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন

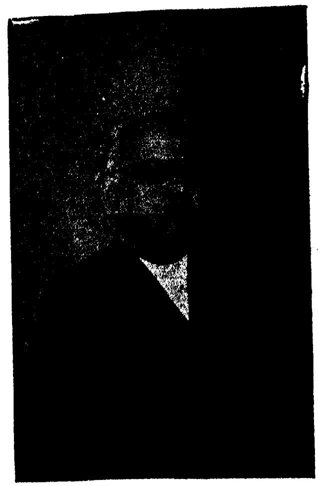
ভাণ্ডার গৃহের দ্বিতলে সুবৃহৎ শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনাথ ভাণ্ডারের বহুমুখী জনকল্যাণ কর্ম্মধারা দেখিয়া সকলেই আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য বাণীমন্দির—

কলিকাতার প্রাচ্য বাণীমন্দিরের নয়াদিল্লীতে একটি শাখা আছে। গত ১৭ই অক্টোবর নয়াদিল্লীর ওয়াই-এম-সি-এ হলে তাহার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। 'মাদাম আর্জ্জিনা' সভায় 'রুশরাষ্ট্রে প্রাচ্য গবেষণাগার' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীনিশিকান্ত সেন সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লীতে বাঙ্গালীদের পরিচালিত এই কৃষ্টিকেন্দ্র তথায় বাঙ্গালার গৌরব প্রচার করিতেছে।

নরেন্দ্রনাথ শেঠ—

কলিকাতা ৭৮ বীডন ষ্ট্রীট নিবাসী স্বনামখ্যাত দেশকর্ম্মী নরেন্দ্রনাথ শেঠ গত ১৫ই অক্টোবর ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার পুরাতন শেঠ পরিবারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ ও পরে আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হন। ১৯০৫ সাল হইতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি দ্বারা জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ১৯০৮ সালের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তিনি স্বেচ্ছাসেবক গঠনের অন্যতম নেতা ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার জন্য তিনি ও তাঁহার পরিবারের বহু লোক ধৃত ও নির্য্যাতীত হইয়াছিলেন। অপর ভ্রাতাদের সহিত নরেন্দ্রনাথ অন্তরীণ হন



৺নরেন্দ্রনাথ শেঠ

এবং সন্দীপের সর্পময় দ্বীপে তাঁহাকে আটক রাখা হয়। সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় ও ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি একাধারে ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ও প্রবন্ধাদি লিখিতে পারিতেন। সারাজীবন তিনি কোন না কোন পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। দেশের সকল জনহিতকর আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি নির্ভীকভাবে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার মত অসাধারণ পাণ্ডিত্য, স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের চিফ কেমিষ্ট ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ভারতসরকারের

বাণিজ্য দপ্তরের আহ্বানে দেশের রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বৃটীশ ও আমেরিকা অধিকৃত জার্ম্মাণীতে গমন করিয়াছেন। তিনি শিল্প-সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা দিতেন। খাদ্য সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের অন্যতম। তাঁহার নবলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেশকে তিনি আরও সমৃদ্ধ করুন, ইহাই আমরা কামনা করি।

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা ১১২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ২১শে আশ্বিন ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৬৫ সালের ১১ই চৈত্র বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটে তাঁহার জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি ব্যবসায়ে মন দেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চায় সময় যাপন করিতেন। তাঁহার লিখিত 'ভট্টাচার্য্য পরিবার' 'বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। তিনি পরলোকগতা পত্নীর নামে দাঁইহাটে 'প্রাণদাসুন্দরী মাতৃ সদন' নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শশধর তর্কচূড়ামণি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতেন। ৮০ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র, ২ কন্যা প্রভৃতি বর্ত্তমান।



২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ আচার্য্য আই-সি-এস

ফটো—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোকে হেমন্তকুমারী দেবী—

যশোহর, মাগুরার অন্ধ ঔপন্যাসিক ও স্বদেশসেবক ৺যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের পত্নী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মাতা হেমন্তকুমারী দেবী গত ১লা আশ্বিন সকাল ৬টায় হুগলী—চাঁপদানীতে ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দয়াশীলা, ধর্ম্মপ্রাণা তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, চার কন্যা ও অনেকগুলি নাতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাই।

অগ্নিময়ী

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়

অগ্নিময়ি! অন্তরে মোর আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো,
তিমিরহরা মূর্ত্তিতে আজ ঘুচাও মনের সকল কালো।
মিথ্যা মনের অহংকারে,
আঘাত করো বারে বারে,
জঞ্জাল-সব উঠুক জ্বলে, যা' কিছু মোর আছে ভালো।

রক্তে আমার দাও গো দোলা, অগ্নিরূপা বিজয়িনি!
অনল জ্বালার তীব্র দাহে আপন ভুলে তোমায় চিনি।
বাজাও বিষাণ গুরু গুরু,
প্রলয় নাচন হউক সুরু,
নাচের তালে জ্বালাও তুমি, জ্বালাও আমার প্রাণের আলো।

আফ্রিকায় দুর্গাপূজা ও হিন্দু সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে পূর্ব্ব-আফ্রিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ নগরী মাউঞ্জায় শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা ও মাউঞ্জা প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের তিনটি অধিবেশন সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ নিজেরাই একখানি বৃহৎ প্রতিমা নির্ম্মাণ করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে সমগ্র পূর্ব্ব-আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুগণ আমন্ত্রিত হন এবং বহু প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ ট্রেণ ষ্টীমার, মোটর ও বিমানযোগে এই উৎসব ও সম্মেলনে যোগদান করেন।

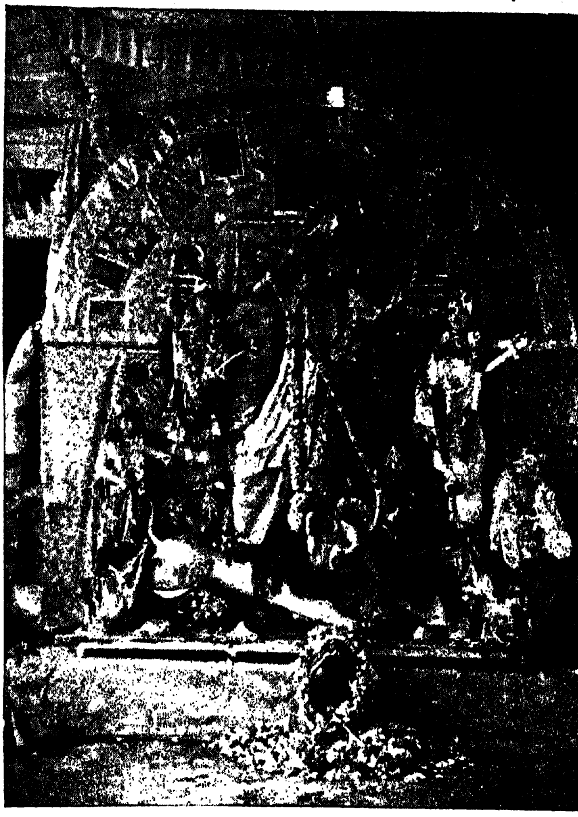
প্রথম অধিবেশনে মাউঞ্জা প্রাদেশিক হিন্দু ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত হরিলাল এম, সংঘবী সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি হিন্দু ধর্ম্মে শক্তি সাধনা ও স্বামী প্রণবানন্দজীর নির্দ্দেশ বাণী উল্লেখ করিয়া বলেন—এ যুগে স্বামীজী ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম শক্তিদান করে না, যে ধর্ম্মের আচরণে হৃদয়ে বিদ্যুদ্বীর্য্যের সঞ্চার ঘটে না তাহা হিন্দুর ধর্ম্ম নহে—ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম্মে কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতার স্থান নাই। আজ আমরা ধর্ম্মের নামে যাহা আচরণ করি তাহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম নহে। (সনাতন ধর্ম্ম সতত জ্ঞান ও শক্তির প্রেরণা যোগায়)। মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—"শ্রীশ্রীদুর্গাই ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিমূর্ত্তি। ন্যায় নীতির প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। অন্যায় অত্যাচারকে দমন করাই হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। হিন্দু কোনদিন রাষ্ট্র ও ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেখে নাই। বর্ত্তমানে যে সংকীর্ণ ধর্ম্মের প্রভাব জাতির উপর আসিয়া পড়িয়াছে তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—ইহা হিন্দু ধর্ম্মের অন্যতম শিক্ষা। রাষ্ট্রবাদ, শক্তিবাদ, সংগঠনবাদ, সেবা ও সমন্বয়বাদের ভিত্তিতে আজ পুনরায় প্রকৃত



পূর্ব্ব আফ্রিকায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। জাতি যখন স্বাধীনতা হারাইয়া দুর্ব্বল হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল তখনই দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। দুর্গা পূজার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া স্বামীজী বলেন—যে চারিটী শক্তি জাতীয় জীবনে একান্ত অপরিহার্য্য দেবী



পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক দুর্গোৎসব

প্রতিমার মধ্যে আমরা সেই চারিটী শক্তিই দেখিতে পাই। সরস্বতী জ্ঞানশক্তি, লক্ষ্মী ধনশক্তি, কার্ত্তিক ক্ষাত্রশক্তি, গণেশ জনশক্তি বা গণশক্তির প্রতিমূর্ত্তি এবং এই চারি শক্তির সমন্বয়েই দুর্গামাতা আদর্শ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ রূপ। গত ষাট বৎসরের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আমরা উক্ত মহাশক্তিরই জাগৃতি কামনা করিয়া আসিয়াছি। স্বামী পরমানন্দজী ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্বংস সাধন করিতে যখন আসুরিকতার উদ্ভব হইয়াছিল তখন দেবীর আবির্ভাব। আজ জগতের বুকে যে ভাবে আসুরিকতার তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রচারের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এই মিশন প্রেরণ করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা শ্রীযুত শিবাভাই এস, প্যাটেল এবং তৃতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীযুত [illegible] কাণজী সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুত জে, এন, পাণ্ডে (বার এট-ল), শ্রীযুত গিরিধরলাল সংঘবী, শ্রীযুত রুপারেলী, শ্রীযুত এন, ডি, আচার্য্য এবং

আরও কতিপয় বক্তা কয়েকটা প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যেক দিন সভার প্রারম্ভে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু, তলোয়ার প্রভৃতি আত্মরক্ষা-মূলক ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। সভার পরে শ্রীশ্রীদেবীর বীর ভাবোদ্দীপক আরতি, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বহু ইউরোপীয়ন এবং আফ্রিকান এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীতে শোভাযাত্রা সহকারে দেবী প্রতিমা ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আফ্রিকায় এই জাতীয় অনুষ্ঠান ইহাই সর্ব্বপ্রথম। সম্মেলনে নিম্ন-লিখিত তিনটী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

১। জগত আজ দ্রুত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহাকে ধ্বংসের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু সংস্কৃতির উদার মতবাদ প্রচারের আবশ্যক। মাউঞ্জা প্রদেশের হিন্দুজনগণের এই সম্মেলনে ভারত সরকার তথা ভারতীয় জনসাধারণকে এই সংস্কৃতির প্রচারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।



পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে শোভাযাত্রা

২। ভারতীয় রাষ্ট্র নেতাগণের সমর্থনে এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে যে সাংস্কৃতিক মিশন আফ্রিকা মহাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে এই সম্মেলন ভারতীয় নেতৃগণকে তথা সঙ্ঘকে অনুরোধ করিতেছে।



পূর্ব্ব আফ্রিকায় ডার-এস সালেম শহরে শংকরাশ্রম

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

৩। আফ্রিকাবাসীগণের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তাহার জন্য এই সম্মেলন আফ্রিকাপ্রবাসী ভারতীয়গণকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছে।



পূর্ব্ব আফ্রিকায় ডার-এস্ সালেম শহর

ফটো—ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ (ভারত সেবাশ্রম সংঘ)

খেলা-ধূলা



শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন হ'ল ফুটবল খেলার মরসুম শেষ হয়ে গেছে। ফুটবল খেলা পরিচালনার কর্ম্মব্যস্ততা এবং খেলায় আধিপত্যলাভের উত্তেজনা বহুদিন আগে প্রশমিত হয়ে গেছে। আগামী ফুটবল মরসুমের জন্য তোড়জোড় এখনও আরম্ভ হয়নি। এই দীর্ঘ শান্তপূর্ণ অবসর সময়ে জনসাধারণ এবং আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু গঠনমূলক কাজের প্রস্তাব করা যাক্। জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ এবং উভয়ের শুভবুদ্ধির জাগরণের উপর বাংলার ফুটবল খেলার উজ্জল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে আলোচ্য প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। পাঠকদের কাছ থেকে অভিমত এবং প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে।

আমাদের দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে কোন উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। লাখে একটা মিলে কিনা সন্দেহ যা অব্যবস্থা এবং দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নয়। পঙ্কোদ্ধার কার্য্য একেবারে যেন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনহিতকর কাজে কিছু দান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বহু প্রশংসাপত্রধারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবে—কিন্তু হিসাব নিয়ে সৎ এবং প্রকৃতকাজের প্রতিষ্ঠান খুঁজতে গেলে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, মানুষের দানের হাত হতাশা, সন্দেহ এবং পূর্ব্বের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সঙ্কুচিত হয়ে কঞ্জুস সেজে আছে। আই-এফ-এ-কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর লীগ এবং শীল্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলি স্থানীয় চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে পরিচালনা ক'রে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। এই অর্থ সৎ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই যে ব্যয়িত হয়, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সাধারণের আস্থাভাজনের নিমিত্ত এবং নৈতিক দায়িত্ব পালনের দিক থেকে আই-এফ-এর অধিকতর সতর্ক এবং কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন মনে করি। চ্যারিটি ম্যাচ খেলায় যে দুই ফুটবল দল যোগদান করে তাদের সভ্যদের দেয় ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা ছাড়া চ্যারিটির জন্য সভ্যদের পৃথক খেলার টিকিট কিনতে হয়। এটা সভ্যদের অতিরিক্ত ব্যয়। চ্যারিটি কথাটির যথার্থ মর্ম্ম ধরলে বুঝায়, যা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচে সভ্যরা যে অতিরিক্ত খরচ হিসাবে টিকিট কিনেন এবং দর্শকরা দ্বিগুণ মূল্যে যে টিকিট কিনতে বাধ্য হন, তা প্রকৃতপক্ষে দর্শকদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে আদায় করা ছাড়া অপর কিছুই নয়। কেউ যদি মনে করেন, জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই মহৎ উদ্দেশ্যে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কিনে থাকেন তাহলে লীগের নিম্নদিকের কোন দুটি দলের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচ খেলানোর ব্যবস্থা ক'রে ফলাফল উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি। আই-এফ-এর চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট কিনে জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান করাই যদি ক্লাবের সভ্য এবং জনসাধারণের প্রধান অভিপ্রায় থাকে, তাহলে কখনই তাঁরা খেলার গুরুত্ব বিচার না ক'রে যে কোন ধরণের খেলায় টিকিট কিনে অর্থ সাহায্য করবেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা একথা জোর ক'রে বলা চলে যে, দর্শকরা খেলার গুরুত্বের উপরই টিকিট কিনে থাকেন, অর্থ সাহায্যদানের জন্য নয়। সুতরাং একথা বলা ভুল হবে না যে, গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলাগুলিকে চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা ক'রে সভ্য এবং দর্শকদের টিকিট কিনতে বাধ্য করা হয়; ঐ খেলাগুলি চ্যারিটি হিসাবে ঘোষণা না করলে খেলায় যোগদানকারী ক্লাবের সভ্যরা টিকিটের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না ক'রে সভ্য

হিসাবে দেখতে পেতেন এবং সাধারণ দর্শকেরা কম মূল্যের টিকিটে খেলা দেখার সুযোগ পেতেন। চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট ন্যায্যমূল্যে সংগ্রহ করাও কম :হায়রাণি নয়। ক্লাবের সভ্যদের থেকে সাধারণ দর্শকদের হায়রাণি বেশী। চ্যারিটি খেলার দিন খেলা আরম্ভের দশ এগার ঘণ্টা পূর্ব্বে খেলার মাঠে টিকিট ঘরের মুখে-লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় প্রচণ্ড রোদ এবং প্রবল বারি-বর্ষণের মধ্যেও। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি—লাইন দিয়ে দীর্ঘ ঘণ্টা দাঁড়ানোর পর সার্জেন্ট এবং ঘোড়সোয়ারা পুলিস এসে চার্জ ক'রে তা ভেঙ্গে দিয়ে দর্শকদের হায়রাণি করেছে এবং খুশীমত ব্যবস্থা অনুসরণে দর্শকদের বাধ্য করেছে। তাই যদি পূর্ব্বাহ্নেই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা পালনের নির্দ্দেশ থাকতো, তাহলে দীর্ঘঘণ্টাব্যাপী লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ভাগ্যবিড়ম্বনায় পড়ে আহত হয়ে দর্শকদের বাড়ি ফিরতে হ'ত না। পুরাতন দিনের সংবাদপত্রের ফাইল খুঁজলে দর্শকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার কাহিনী পাওয়া যাবে; সমস্ত বাধাবিপত্তির ঝুঁকি নিয়ে যে ভাগ্যবান ব্যক্তি মাঠে প্রথম প্রবেশ ক'রে খেলা দেখার অদম্য উৎসাহ চরিতার্থ করতো তার নামের একটা সাংবাদিক সৌজন্য সুলভ স্বীকারোক্তি সংবাদপত্রে থাকতো। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের অব্যবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। অল্প আয়াসে আই-এফ-এর পরিচালক-মণ্ডলী আরও সুব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁরা যদি খেলার দিন সংবাদপত্র মারফৎ জনসাধারণকে জানিয়ে দেন—খেলার মাঠে টিকিট বিক্রী আরম্ভের নির্দ্দিষ্ট সময় এবং কি পরিমাণ টিকিট দর্শকদের বিক্রীর জন্য সংরক্ষিত আছে তাহলে দর্শকদের সুবিধা হয়। টিকিটের সংখ্যাটা পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারলে লোক অনুমাণ করতে পারবে লম্বা মানুষের সারিতে কোনখান পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেইমত অবস্থা বুঝে দর্শকেরা আপন আপন বিচারমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সারিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা এবং শেষ পর্য্যন্ত টিকিট না পাওয়ার জন্য হতাশ হওয়ার যে ঝুঁকি তা দর্শকদেরই হাতে; কর্ত্তৃপক্ষ বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত থেকেই মুক্ত হবেন না, কর্ত্তব্যপরায়ণ হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষও জনসাধারণকে প্রভূত সহযোগিতা করতে পারেন—কি ভাবে লাইন দিতে হবে তার নির্দ্দেশ দিয়ে এবং একদিন লাইনের লোক গণনা ক'রে লাইনের কোন স্থান পর্য্যন্ত টিকিট পাওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত ক'রে। লোকের সারিতে দীর্ঘকাল রোদ এবং বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে বহু দর্শক বিশেষ করে ছোট ছেলেদের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়ে অসুস্থ হ'তে দেখা যায়। সুতরাং তাদের শুশ্রূষার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। কয়েক বছর আগে জনসাধারণকে জল বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা পুনঃপ্রবর্ত্তন করলে সাধারণের কষ্টের যথেষ্ট লাঘব হয়। এই দুটী কাজ খুব সোজা ব্যাপার নয়। অনেকগুলি শিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ স্বেচ্ছাসেবক দলের দরকার। দর্শকেরা যে দীর্ঘ সময় মাঠে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা খুবই পীড়াদায়ক। খেলার একঘণ্টা আগে থেকে যদি সারি দিতে আরম্ভ করা যায় তাহলে কেবল সময়ের অপব্যয় হয় না, শারীরিক দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এরজন্য সাধারণের মধ্যে সহযোগিতা এবং মনের এ দৃঢ়তা প্রয়োজন যে, খেলা আরম্ভের ৭।৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সারি না দিয়ে মাঠের চারিপাশের ছায়াশীতল গাছতলায় বরং বিশ্রাম করা এবং খেলা আরম্ভের ঠিক একঘণ্টা পূর্ব্ব থেকে শান্তি-রক্ষকদের নির্দ্দেশমত সুশৃঙ্খলভাবে সারিতে দাঁড়ানো। খেলা আরম্ভের এক ঘণ্টা সময়ের বেশী পূর্ব্বে খেলার মাঠের চারিপাশে যাওয়া নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশ করার মাফিক বলে যদি সকলেই মনে করেন এবং আইনভঙ্গ থেকে বিরত থাকেন তাহলে মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষকেই কেবল যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় না, পরস্পরের যথেষ্ট সুবিধা করা হয়।

চ্যারিটি ম্যাচে কি পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয় তার একটি আনুমাণিক হিসাব চ্যারিটি খেলার বিবরণের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া জনসাধারণ আর কিছু জানতে পারে না। চ্যারিটি ফণ্ডে দেয় অর্থ কি কি বাবদ ব্যয় করা হচ্ছে তার পূর্ণ বিবরণ জানবার কৌতূহল জন-সাধারণের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক; যেমন এ সম্পর্কে হিসাব তলব করার অধিকার জনসাধারণের আছে, তেমনি নৈতিক দিক থেকে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণকে হিসাব জানাতে বাধ্য আছেন। সুতরাং বার্ষিক বিবরণীতে

চ্যারিটি ম্যাচে সংগৃহীত অর্থের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

চ্যারিটি খেলার দিন মাঠের আনাচে কানাচে এক একজন লোকের হাতে গোছা গোছা টিকিট এবং তা দ্বিগুণ কখনও বা চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রী হতে দেখা গেছে। এরা ব্যবসাদার লোক; সিনেমার টিকিট আগে যেমন বে-আইনী ভাবে বিক্রী হ'ত এ ঠিক সেই ধরণের ব্যাপারই। এই ঘটনা থেকে লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, যেক্ষেত্রে আই-এফ-এ অফিসে টিকিট বিক্রী বন্ধ অথবা নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে এত টিকিট এসব অশিক্ষিত লোভী ব্যবসাদারদের হাতে কি ভাবে এলো। এর উত্তর দুইভাবে জনসাধারণ পেতে পারে—হয় এই টিকিটসব আই-এফ-এ-র কোন ভিতরের লোকের সহযোগিতায় এসেছে, কিম্বা আই-এফ-এ-কে প্রবঞ্চনা ক'রে জাল ছাপা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ এবং আই-এফ-এ অফিসের কর্ম্মকর্ত্তাদের চোখের সামনে এ টিকিটের অবাধ ব্যবসা কি ক'রে চলতে পারে জনসাধারণ তার উত্তর খুঁজে পায় না। আই-এফ-এ-র সুনাম প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চ মূল্যে বে-আইনী টিকিট কেনা থেকে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য এবং চ্যারিটি ম্যাচের প্রভূত আয় থেকে এই ভাবে আই-এফ-এ-কে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। ফুটবল মাঠে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অপর কারও টিকিট বিক্রী নিষিদ্ধ করা উচিত। যদি কোন দর্শক কোন কারণে খেলা দেখতে অক্ষম হ'ন এবং সেই টিকিটখানি বিক্রীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মাঠে আই-এফ-এ-র টিকিট বিক্রেতাদের মারফৎ তা বিক্রী করা উচিত। টিকিট বিক্রী এবং বিলি ব্যবস্থার জন্য আই-এফ-এ-র একটি নতুন চ্যারিটি ম্যাচ সাবকমিটি গঠন করা দরকার। এই কমিটিতে থাকবেন যে দুইদল চ্যারিটি ম্যাচ খেলবে তাদের থেকে একজন ক'রে দুইজন প্রতিনিধি, আই-এফ-এ-র সভাপতি এবং সম্পাদক। টিকিট মুদ্রণ সম্পর্কে সতর্কতা, টিকিট বিক্রী ব্যবস্থা, সংগৃহীত অর্থের হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এই সাবকমিটির পরামর্শ এবং নির্দ্দেশ দানের ক্ষমতা থাকবে। আই-এফ-এ-র কর্ম্মসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংযোগসাধন আশা করি অযৌক্তিক হবে না। (১) আই-এফ-এ-র নির্দ্দিষ্ট বাৎসরিক চাঁদা দিয়ে যেসব ক্লাব সভ্যপদ লাভ করে তাদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য আর না রেখে, আই-এফ-এ পরিচালনায় তাদের ভোটদানের অধিকার স্বীকার করা (২) এদেশের ফুটবল খেলার পদ্ধতির উন্নতির জন্য ইংলণ্ডের এফ-এ কর্তৃক গৃহীত 'Instructional Film'টি করে উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রদর্শনের ব্যবস্থা (৩) প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র মারফৎ কি পরিমাণ টিকিট বিক্রী হবে তার সংখ্যা এবং বিক্রয়ের সময় ঘোষণা (৪) চ্যারিটি ম্যাচের সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করা হয়েছে, তার পূর্ণ তালিকা বার্ষিক হিসাব-নিকাশ পুস্তকে প্রকাশের ব্যবস্থা (৫) খেলার মাঠে উচ্চ মূল্যে চ্যারিটি টিকিট বিক্রী বন্ধের জন্য পুলিসের সহযোগিতায় উপযুক্ত ব্যবস্থা (৬) মাঠ থেকে মাইক মারফৎ জনসাধারণের উদ্দেশে যে উপদেশ বিতরণের ব্যবস্থা আছে সেই সঙ্গে ফুটবল খেলার জটিল আইনগুলির ব্যাখ্যার ব্যবস্থা (৭) মাঠ থেকে আহত খেলোয়াড় বহনের জন্য আই-এফ-এ-র নিজস্ব ষ্ট্রেচার, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ ব্যবস্থা (৮) জনসাধারণের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য চ্যারিটি ম্যাচে যোগদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের দুইজন প্রতিনিধি এবং আই-এফ-এ-র দুইজন প্রতিনিধিসহ একটি চ্যারিটি ম্যাচ সাব-কমিটি গঠন; এই কমিটির ক্ষমতা থাকবে ন্যায্য টিকিট বণ্টন করা এবং বিক্রীত টিকিটের হিসাব রক্ষা করা (৯) ফুটবল খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার যে গুরুদায়িত্ব ক্লাবগুলির আছে তাদের সাহায্যের জন্য চ্যারিটি ও অন্যান্য ম্যাচে যোগদানকারী দুই দলকে খেলায় সংগৃহীত অর্থের মোটা অংশের বিলি ব্যবস্থা (১০) ফুটবল খেলোয়াড়দের অর্থ-নৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের উন্নতির জন্য এ দেশে অবিলম্বে পেশাদারী ফুটবল খেলা সরকারীভাবে স্বীকার করা (১১) আই-এফ-এ-র নিজস্ব গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোক নিয়ে একটি কমিটি গঠন (১২) জনসাধারণের খেলা দেখার সুবিধার জন্য একটি ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে আই-এফ-এ-র অংশ গ্রহণ।

আই-এফ-এ-র পরিচালক মণ্ডলীর প্রধান কাজ হ'ল নাম-করা প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালনা করা এবং ফলাফল ঘোষণা করা। একমাত্র খেলা পরিচালনার মধ্যেই যদি আই-এফ-এ-র কার্য্যসূচী সীমাবদ্ধ এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষার কাজ ক্লাবগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভুল করা হবে। ফুটবল খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশনের কার্য্যতালিকা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সে দেশের ফুটবল খেলার মানবৃদ্ধির এবং জনপ্রিয়তার জন্য কি ভাবে বিবিধ গঠনমূলক কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের ফুটবল এসোসিয়েশনগুলির নাম এবং সরকারী প্রচেষ্টারও উল্লেখ করা যায়।

খেলার মাঠে দর্শকদের ফুটবল খেলা সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য যে বিক্ষোভ দেখা দেয় কর্ত্তৃপক্ষ তা অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহার বলে নিন্দা ক'রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু এ অজ্ঞতার কারণ আমাদের দেশে গত ৭/৮ বছর ধরে আই-এফ-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফুটবল খেলার আইন পুস্তকখানি অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকার জন্যই কি নয়? যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের এফ-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকখানি বহুদিন এ দেশে আমদানি হয়নি, সম্প্রতি বাজারে এসেছে। এই বইখানি আই-এফ-এ প্রকাশিত বই অপেক্ষা অনেক ভাল; বিবিধ আইনের সুন্দর ব্যাখ্যা এবং নির্দ্দেশ সন্নিবেশিত করা আছে। কিন্তু যে দেশে শতকরা মাত্র ১৪ জন লোক কোনপ্রকারে মাতৃভাষায় একখানি পোষ্টকার্ড লিখতে বা পড়তে পারে সেদেশে ইংরাজি ভাষায় লিখিত পুস্তক জনসাধারণের আইন জ্ঞান কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারে! ফুটবল খেলার আইন জ্ঞানের অজ্ঞতার জন্য দর্শকদের বিক্ষোভ তিরস্কৃত করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠে—এরজন্য আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের কম কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটেনি; কারণ নিয়মিত-ভাবে খেলার আইন প্রকাশের ব্যবস্থা না ক'রে তাঁরাই কি জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখেন নি? আই-এফ-এ কর্ত্তৃক লীগ খেলার এবং শীল্ড খেলার যে বই প্রকাশিত হয় অনায়াসে এই বই দুইখানিতে বাংলায় এবং ইংরাজিতে ফুটবল খেলার আইনগুলি সন্নিবেশিত করা যায়; কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদেরও তো নেই। আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ যদি জনসাধারণের অবগতির জন্য খেলার আইন পুস্তক প্রচারে যথাযথ ব্যবস্থা করতেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আইন-অনভিজ্ঞ দর্শকদের বিক্ষোভ অপেক্ষা আই-এফ-এ-র ত্রুটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—এ কথা তখন আর কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলতেন না।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য—২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাষিক-গ্রাহকের টাকা পাইব না, তাঁহাদের পৌষ সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। ছয় মাসের জন্য গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৪৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ৪।৵• আনা লাগে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ২•শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন। কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

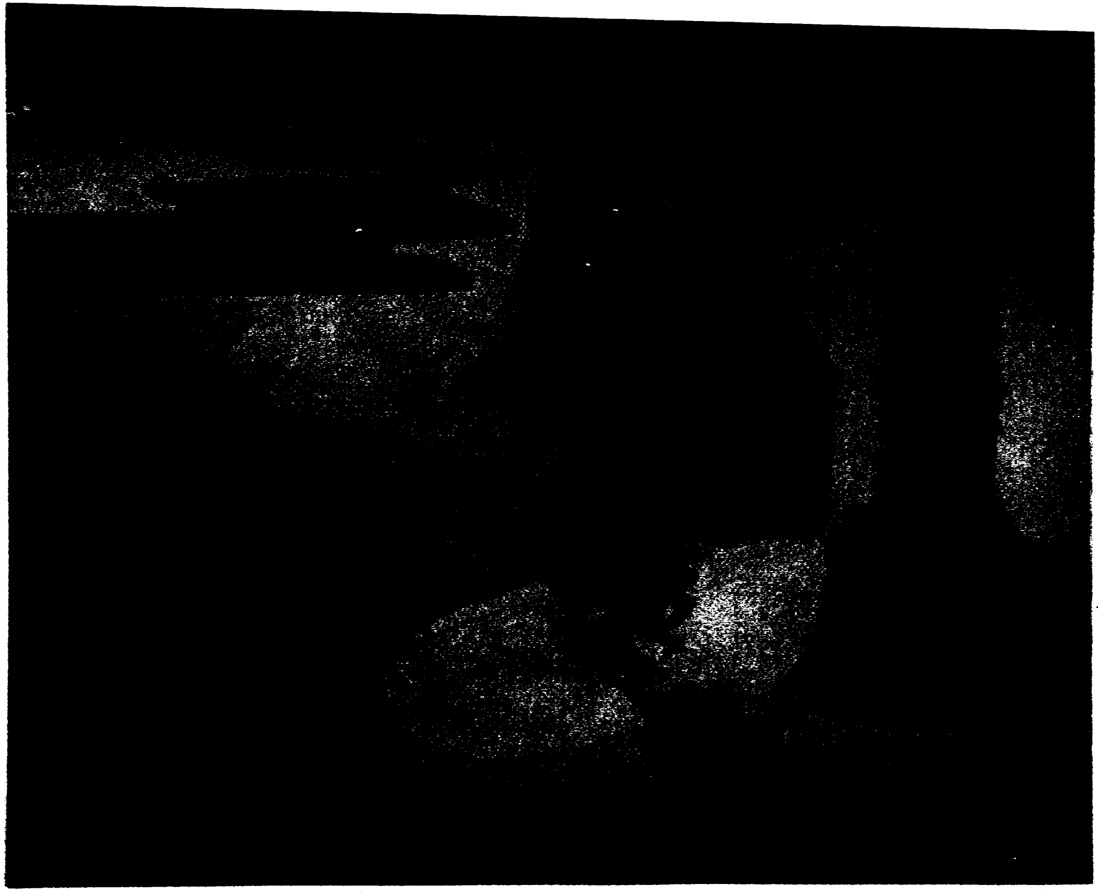
সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী

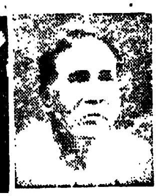


শিল্পী—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়　　সাঁওতালী মেয়ে　　ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্





ভারতবর্ষ



মাঘ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড | ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শাহিরাজ্যের পতন

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

উত্তর পশ্চিম ভারত এবং আফ্‌গানিস্থানের বিস্তৃত অঞ্চলে শাহিবংশীয় হিন্দু সম্রাট্‌গণ রাজত্ব করিতেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবজাতীয় মুসলমানেরা পারস্য দেশ অধিকার করে; তখন হইতেই শাহিরাজগণের সহিত তাহাদের বিরোধ চলিতে থাকে। প্রায় দুইশত বৎসর শাহিরা আরব আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি ইয়াকুব কাবুল অধিকার করেন। ইহার ফলে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল শাহিরাজের হস্তচ্যুত হইল। তখন শাহিরাজ সিন্ধুনদের তীরস্থিত উদ্‌ভাণ্ডপুর হইতে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। প্রাচীন উদ্‌ভাণ্ডপুর অর্থাৎ আধুনিক আটকের নিকটবর্ত্তী উণ্ড্ পূর্ব্বে শাহিসাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের রাজধানী ছিল। যাহা হউক, এই সময়েও আফ্‌গানিস্থানের লঘ্‌মান বা লম্‌ঘান প্রদেশ (প্রাচীন 'লম্পাক' দেশ) হইতে পঞ্জাবের অন্তর্গত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীরের দক্ষিণ হইতে মূলতানের উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য শাহিরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। তখনও শাহিরাজকে উত্তরাপথের (অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে 'বংক্ষু' বা অক্‌সস্ নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিম বিভাগের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া স্বীকার করা যাইত। নবম শতাব্দীর শেষাংশে লল্লির শাহি উদ্‌ভাণ্ডপুরে রাজত্ব করিতেন। কাশ্মীরের প্রাচীন ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, উত্তরাপথের রাজমণ্ডলের লল্লিয়শাহির স্থান ছিল নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায়; শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত অসংখ্য নরপতি তাঁহার আশ্রয়ে নির্ভয়ে উদ্‌ভাণ্ডপুরে বাস করিতেন। কিন্তু দশম শতাব্দীতে গজনীতে তুর্কী জাতীয় মুসলমানদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারা নূতন উদ্যমে শাহিরাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে।

এই শতাব্দীর শেষভাগে শাহিরাজ জয়পাল একাধিক বার গজনীরাজ্য অধিকারের চেষ্টা করেন ; কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় তাঁহার উদ্যম সফল হয় নাই। জয়পালের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গজনীর তুর্কীশাসক সবুক্তগীন ও তাঁহার সুবিখ্যাত পুত্র সুল্তান মহ্মূদ ; ইঁহারা উভয়েই অতিশয় রণদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। ইঁহাদের আক্রমণে জয়পালকে বারবার বিব্রত হইতে হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর সূচনায় জয়পালের পুত্র আনন্দপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুল্তান মহ্মূদের আক্রমণ হইতে শাহিরাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

শাহিরাজ আনন্দপালের কার্য্যকলাপ ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শাহিরাজ্যের দক্ষিণে মূলতান ; সেখানে আরব মুসলমানেরা রাজত্ব করিত। তাহাদের সহিত শাহিরাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একবার সুল্তান মহ্মূদ মূলতান আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। তিনি দেখিলেন, শাহিরাজ্যের ভিতর দিয়া মূলতানে প্রবেশ করা সহজসাধ্য। তাই তিনি আনন্দপালের নিকট শাহিরাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহার পূর্ব্বেই সুল্তানের হস্তে পরাজিত হইয়া শাহিরাজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার সন্ধিসত্ত্বেও আরবেরা তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে জয়পাল ও আনন্দপালকে কিছুমাত্র সাহায্য করে নাই। বিশেষতঃ আনন্দপাল জানিতেন যে, সুলতানের বিরোধী হইলে তাঁহার পক্ষে উহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। সুতরাং শাহিরাজ অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সে বিষয়ে মহমূদের কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আনন্দপালের চরিত্র স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার মনে হইল, অকারণে নিরপেক্ষ মিত্ররাজ্যের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করা বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তিনি সুল্তানের প্রস্তাবে সন্ধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইলেন না। ইহার ফলে মহমূদ শাহিরাজ্য আক্রমণ করিলেন। আনন্দপাল বারবার পরাজিত হইয়া শাহিরাজ্যের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ লম্‌্মান ও পেশোয়ার (প্রাচীন 'পুরুষপুর') অঞ্চলের অধিকার হারাইলেন। এই সময়ে সুখপাল নামক শাহিরাজ্যের একপুত্রকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নওয়াসা শাহ নাম দেওয়া হয়। ইহাতে তুর্কীদিগের প্রতি মর্ম্মাহত শাহিরাজের বিদ্বেষ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

ইতিমধ্যে সুল্তান মহ্মূদের এক ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হয়। মধ্য-এশিয়া হইতে ইলক্ খাঁ নামক এক শক্তিশালী তুর্কী নায়ক অক্সস্ নদী পার হইয়া গজনীরাজ্য আক্রমণ করেন। মহমূদ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাধাদিতে অগ্রসর হইলেন। লম্‌্মান-পেশোয়ার অঞ্চলের শাসনভার তিনি নওয়াসা শাহ্ অর্থাৎ শাহিরাজপুত্র সুখপালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গেলেন। মহমূদ খোরাসানে ইলক্ খাঁয়ের সহিত যুদ্ধে বিব্রত। তুর্কীতে-তুর্কীতে যুদ্ধ ; জয়লক্ষ্মী কাহাকে অনুগৃহীত করিবেন, তাহা অনিশ্চিত। সুলতানের এই বিপদের সুযোগ লইয়া সুখপাল আবার হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিলেন। মুসলমান কর্ম্মচারী ও সেনানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া অবিলম্বে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্যে তিনি আনন্দপালের নিকট হইতে কোনই সাহায্য পান নাই। অবশ্য সুখপাল ও আনন্দপাল সম্মিলিত হইলে পরিণামে তুর্কী আক্রমণ রোধ করা কতদূর সম্ভব হইত, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। যাহা হউক, শাহিরাজ কেবল যে পুত্রকে বিদ্রোহে সাহায্যে করেন নাই, তাহা নহে ; এই সময়ে তিনি সুল্তানকে একখানি অদ্ভুত পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এই : "শুনিলাম, তুর্কীরা বিদ্রোহী হইয়া খোরাসান অধিকারে অগ্রসর হইয়াছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং একশত হস্তী লইয়া স্বয়ং আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে পারি ; অথবা ইহার দ্বিগুণ সৈন্যসহ আমার পুত্রকে আপনার সাহায্যের জন্য পাঠাইতে পারি। আমি যে আপনার কাছ হইতে কিছু প্রতিদানের আশায় আপনাকে সাহায্য করিতে চাহিতেছি, সেরূপ মনে করিবেন না। আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন ; আমি চাহিনা যে আপনি আর কাহারও হস্তে পরাজিত হন।"

শত্রুর বিপদের সময় উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করিয়া আনন্দপাল যে রাজনৈতিক অদূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ হইবে না। কিন্তু যে শত্রুকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করিতেন, তাহারও বিপদের দিনে এইরূপ উদার ব্যবহার যে অনেকখানি মহত্ত্বেও পরিচায়ক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্যই শাহিরাজগণের চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচীন মুসলমান পণ্ডিত

অল্‌বীরূণী লিখিয়া গিয়াছেন, "একথা নিশ্চিত যে, শাহিরাজগণ কেবল আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না; সৎকার্য্য এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহারা কদাপি পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহাদের চরিত্র মহৎ এবং ব্যবহার উদার ছিল।"

যাহা হউক, শীঘ্রই আনন্দপালের অদূরদর্শিতার ফল ফলিল। শাহিরাজের দুর্ভাগ্যক্রমে সুল্‌তান মহ্‌মুদ খোরাসানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিঃসহায় সুখপাল সহজেই পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে চার লক্ষ মুদ্রা জরিমানা আদায় করিয়া তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ করা হইল। তারপর সুল্‌তানের মূলতান আক্রমণে বাধা সৃষ্টি করার অজুহাতে আনন্দপালের রাজ্য পুনরায় আক্রান্ত হইল। পরাজিত শাহিরাজ—সম্পূর্ণরূপে সুল্‌তানের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। কিছুকাল পরে শাহিরাজের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া মহমুদ থানেশ্বরের চক্রস্বামীর মন্দির ধ্বংস করেন এবং বিগ্রহটি গজনীতে লইয়া যান; সে সময় দুর্ভাগ্য আনন্দপাল নানাভাবে সুল্‌তানের সৈন্যদলকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সুল্‌তান শাহিরাজকে মনে মনে ভয় করিতেন; তাই তিনি থানেশ্বরের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। সুল্‌তানের মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে, শাহিরাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত যমুনা ও গঙ্গানদীর তীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সুতরাং কিছুকাল পরে পুনরায় শাহিরাজ্য আক্রমণ করা হইল।

ইতিমধ্যে আনন্দপালের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল ঝেলম নদীর তীরবর্ত্তী বালনাথ পর্ব্বতের উপরে নন্দনদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্গ মুসলমান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ লইল। শাহিরাজ ত্রিলোচনপাল পুত্র ভীমপালের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ কাশ্মীরের পার্ব্বত্য অঞ্চল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। এই দুর্ভাগ্যের দিনে ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের অধিপতি সংগ্রামরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। তখন উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ তুর্কী মুসলমানের কবলিত; সমগ্র ভারতবর্ষ বিপন্ন। কাশ্মীররাজ ভারতের এই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। শাহিরাজের প্রার্থনার উত্তরে তিনি বিরাট একদল সৈন্যসহ প্রাচীন সেনাপতি তুঙ্গকে তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। বহু যুদ্ধ জয় করিয়া তুঙ্গ কাশ্মীরদেশে মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসে তুঙ্গের অধীন কাশ্মীরসৈন্য ত্রিলোচনপাল ও তাঁহার পুত্রের সহিত মিলিত হইল। ঝেলমের শাখা তৌষী (আধুনিক 'তোহী') নদীর তীরে কাশ্মীরের অন্তর্গত পুঞ্চ (প্রাচীন 'পর্ণোৎস') দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করা হইল।

পিতামহের আমল হইতে ত্রিলোচনপাল তুর্কীমুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। তিনি মুসলমানদিগের যুদ্ধকৌশল অবগত ছিলেন এবং তুর্কী প্রথায় নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পাঁচছয় দিন কাশ্মীর সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শাহিরাজ নিরাশ হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, কাশ্মীর সেনাদলে রাত্রিতে পাহারার কোন ব্যবস্থা নাই; স্থানে স্থানে চর বসাইয়া শত্রুর আগমন পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা নাই; এমন কি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র চালনার অভ্যাসও অজ্ঞাত। শাহিরাজ তুঙ্গকে বলিলেন, "সেনাপতি, তুরস্কদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে যে রীতিতে সৈন্য শিক্ষিত করা প্রয়োজন, আপনার সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যতদিন পর্য্যন্ত আপনার সেনাদল উপযুক্ত শিক্ষা না পায়, ততদিন আমাদিগকে এই পর্ব্বতের আশ্রয়েই থাকিতে হইবে। কোনক্রমেই নদী পার হইয়া সমতলভূমিতে যাওয়া উচিত হইবে না।" প্রাচীন সেনাপতি তুঙ্গ অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজেকে অজেয় মনে করিতেন। তুর্কীদিগের বলবীর্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কাশ্মীর সেনার সহিত যুদ্ধ হইলে মুসলমানেরা একদণ্ডও টিকিতে পারিবে না। তিনি শাহিরাজের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দম্ভভরে বলিলেন, "আপনি অত ভয় পাইতেছেন কেন? কাশ্মীর সেনাপতি মুসলমানদের তৃণজ্ঞান করে। আমার সেনাদল তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে।" বিপন্ন ত্রিলোচনপাল বারবার অনুরোধ করিয়াও তুঙ্গের আত্মবিশ্বাস ভাঙিতে পারিলেন না।

একদিন তৌষী নদীর পরপারে ক্ষুদ্র একদল তুর্কী সেনা দেখা গেল। উহারা হিন্দু সৈন্যের অবস্থান নির্ণয়

এবং অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছিল। কাশ্মীর সেনাপতি অবিলম্বে ঐ সেনাদলকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু শাহিরাজ তাঁহাকে বারবার নিষেধ করিলেন। তুর্কীদিগকে হিন্দুসৈন্যের অবস্থান জানিতে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। সমগ্র তুর্কী সেনাদল যদি হিন্দু সেনার সন্ধান না পাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইত, তবে সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্যপথে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু উদ্ধত কাশ্মীর সেনাপতি শাহিরাজের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তুঙ্গের আদেশে একদল হিন্দু সেনা নদী পার হইয়া মুঘলদিগকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তুর্কীরা পরাজিত হইল; তাহাদের ক্ষুদ্রদলের অধিকাংশ সেনাই নিহত হইল। তুঙ্গ গর্ব্বিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কেমন শাহিরাজ, কাশ্মীর সেনার বীরত্ব দেখিলেন ত? আপনি বৃথাই তুর্কীদিগের ভয় করিতেছেন। হম্মীর ('আমীর' অর্থাৎ সুলতান মহমুদ) স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেও তাঁহাকে এইরূপ শিক্ষা দিতে আমাদের বিলম্ব হইবে না।" 'আহব-তত্ত্বজ্ঞ' (অর্থাৎ যুদ্ধ শাস্ত্র পারদর্শী) ত্রিলোচনপাল উত্তর দিলেন, "আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখনও সেই কথাই বলি। পার্ব্বত্য আশ্রয় ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কোনমতেই শুভ হইবে না। তাহাতে আমরা জয়ী হইতে পারিব না।" বিজয়গর্ব্বী তুঙ্গ অভিজ্ঞ শাহিরাজের আশঙ্কাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের সহিত হিন্দু সৈন্যের সংঘর্ষের সংবাদ সুলতান মহমুদের কর্ণগোচর হইল। সেই 'ছলাহববিশারদ' (অর্থাৎ কূট-কৌশলী সেনাপতি) সুলতান শত্রুসৈন্যের অবস্থান জানিয়া আনন্দিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালেই তিনি সমগ্র তুর্কী সেনাদলের সহিত তৌষী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবারেও শাহিরাজ তুঙ্গকে পর্ব্বতের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বারবার নিষেধ করিলেন। কিন্তু বলগর্ব্বিত কাশ্মীর সেনাপতি তুর্কী সৈন্য পরাজিত করিয়া খ্যাতিলাভের আশায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে সমুদয় কাশ্মীরসৈন্য নদীর পরপারে লইবার ব্যবস্থা করিলেন। শাহিরাজ প্রমাদ গণিলেন; কিন্তু তুঙ্গের অনুসরণ ব্যতীত তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না।

তারপর শাহিরাজ ও তুঙ্গের সেনাদলের সহিত তুর্কী সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই ত্রিলোচন পালের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যে পরিণত হইল। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর কাশ্মীরসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি তুঙ্গের সহিত অধিকাংশ সৈন্য পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। আরও কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর শাহিরাজের সেনাদলও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু শাহিরাজ ত্রিলোচন পাল এবং জয়সিংহ, শ্রীবর্দ্ধন ও বিক্রমার্ক নামক তিনজন কাশ্মীরদেশীয় বীর প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ত্রিলোচন পাল অসংখ্য শত্রু বেষ্টিত হইয়াও যুদ্ধে বিমুখ হইলেন না। তিনি অগণিত তুর্কী সেনা সংহার করিলেন; কিন্তু নিঃসহায় পাইয়াও মুসলমানেরা তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারিল না। চারিদিকে চাহিয়া শাহিরাজ যখন বুঝিলেন যে, আর জয়ের আশা নাই, তখন তিনি ক্ষুণ্ণমনে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ত্রিলোচন পালের বলবীর্য্যের উল্লেখ করিয়া কাশ্মীরের প্রাচীন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "হম্মীর যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু ত্রিলোচনের অমানুষিক বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া তিনি জয়ের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলেন না। রাজ্যভ্রষ্ট ত্রিলোচনপাল মহোৎসাহে হস্তি-সৈন্যের সাহায্যে হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইলেন।" কিন্তু হতভাগ্য ত্রিলোচনপাল ভ্রষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। শাহিরাজ্যের পতন সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, "বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। যাহা স্বপ্নের অতীত, যাহা কল্পনার অগোচর, বিধাতা তাহা অনায়াসে সম্পাদন করেন। পূর্ব্বে যে শাহিরাজ্যের বিশালতার সামান্যমাত্র উল্লেখ করিয়াছি, বিধির বিধানে আজ রাজা, অমাত্য ও সেনাদলসহ সেই সুবিশাল সাম্রাজ্য কোনদিন ছিল কি ছিল না, ইহাই লোকের বিতর্কের বিষয় হইয়াছে।" সেনাপতি তুঙ্গের অদূরদর্শিতার নিন্দা করিয়া ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "তারপর তুঙ্গ আপন পরাজয়ের দ্বারা সমগ্রদেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) তুরস্কদিগের প্রথম আগমন ঘটাইয়া ধীরে ধীরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রণক্ষেত্র হইতে প্রহৃত শৃগালের ন্যায় পলাইয়া আসিয়াছিলেন।"

১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহিরাজ ত্রিলোচনপাল রাহীব নদীর

তীরে মহ্‌মুদ পরিচালিত তুর্কীসেনাকে বাধা দিতে শেষ চেষ্টা করেন। এই সময়ে তিনি মধ্যভারতের চন্দেল্ল-বংশীয় পরাক্রান্ত নরপতি বিদ্যাধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাধর তাঁহার সাহায্যের জন্য সৈন্য প্রেরণের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু সাহায্য পৌছিবার পূর্ব্বেই ত্রিলোচনপালকে পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে হয়। সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে সুলতান বলিলেন যে, শাহিরাজ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে সন্ধি করা হইবে না। ধর্ম্মান্তরগ্রহণ ত্রিলোচন পালের অভিপ্রেত ছিল না; তখনও তিনি শাহিরাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেন। নিরুপায় হইয়া তিনি চন্দেল্লরাজ বিদ্যাধরের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, দুর্ভাগ্য শাহিরাজ চন্দেল্ল দেশে পৌছিতে পারেন নাই। তৎপূর্ব্বে কয়েকজন হিন্দু আততায়ী তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। ১০২১ খৃষ্টাব্দে ত্রিলোচন পালের মৃত্যু হয়। পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র ভীমপালও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁর পর তুর্কী মুসলমানেরা পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে থাকে।

শাহিরাজ ত্রিলোচন পালের প্রকৃত হত্যাকারা কাহারা, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে কেবল যে তুর্কী মুসলমানেরাই তাঁহার শত্রু ছিল, তাহা নহে। চন্দ্ররাজ নামক একজন প্রতিবেশী হিন্দুরাজার সহিতও ত্রিলোচনপালের শত্রুতা ছিল বলিয়া জানা যায়। বহুদিন যুদ্ধ বিগ্রহের পর উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। সন্ধিবন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে শাহি-রাজ পুত্র ভীমপালের সহিত চন্দ্ররাজের কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ভীমপাল বিবাহের জন্য চন্দ্ররাজ ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বন্দী করা হয়। শাহিরাজপুত্রের মুক্তিপণস্বরূপ চন্দ্ররাজ প্রচুর অর্থ দাবী করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকজন শাহিবংশীয় নরপতি সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনীর ঐতিহাসিক কাঠামো উপস্থিত করা হইল। ইহার ভিত্তিতে কল্পনার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচিত হইতে পারে।

যা বলেছি

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্‌

যা বলেছি সে কী মোর সব?
কামনা-কম্পিত বক্ষে, বন্ধু, লক্ষ কথা রহিল নীরব!
ভুলের ভুবনে কে আনিল তাহা
বাক্য যাহা
ভাষা দিয়া করিল প্রকাশ?
সে তো শুধু বুঝাবার বিফল প্রয়াস!
জীবনে জোয়ার জাগে:
সোনালী-সূর্য্য ক্ষণে ক্ষণে অমরার প্রেম মাগে—
মনে হয়
ধরণীর যত কিছু অপচয়—
যত শঙ্কা, যত ভয়
মুহূর্ত্তেকে পেয়ে গেছে লয়!
যৌবনের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে
দিগন্তের রেখা টানি অন্ত-হীন নীলাকাশে
অঙ্কলিত করিবার আশা বুঝি আসে!
তুমি কি গো খুঁজে পাও বাণী
আকাশের তারালোক করে যবে কানাকানি—
নিখিলের সরম-শয্যায়: হিয়া যবে ওঠে পূর্ণ হয়ে,
আপনাতে আপনি হারায়, নিশাশেষে ব্যাকুল-বিস্ময়ে?
আবেগ-কম্পিত বক্ষে কোটী কথা এই মুখে
চাহে বাহিরিতে—তবু হায় রয়ে যায় বুকে
কত বাণী বাক্য-হারা: অশ্রু শুধু নামে চোখে—
হেথা দেখি স্বপ্ন জাগে অমরার অমৃত-লোকে!

* * * *

যুগে যুগে মানবের লক্ষ কথা হয় নাকো বলা;
শুধু দ্বার হতে দ্বারে চলা!
কত নারী আসে চারিপাশে—
কেহ তুচ্ছ করে: কেহ অকারণে ভালবাসে:
সবে এরা নহে সোনা,
কারো চোখে অগ্নি-রেখা; কারো অশ্রু লোনা!
তবু তাই ভালো—
আমার ভুবন আমি রচিয়াছি নিজে,
যেথা জ্বলে শুধু এক তারা মরমের মনসিজে!



ভীমপলশ্রী

বনফুল

২৭

"অনীতা কোথা? এত দেরি কেন তোমার! এতক্ষণ আমাকে কি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছ বলতো। তোমার পাঁচীর-মাকে আমি দূর করে' দিয়েছি। অত্যন্ত অবাধ্য। অনীতা কই?"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঢুকতেই স্বয়ম্প্রভা উপরোক্তভাবে সম্ভাষণ করলেন। ক্লান্ত সদারঙ্গ চশমা খুলে লেন্স থেকে ধুলো পরিষ্কার করলেন আগে। এত ধুলো জমে ছিল যে ভাল করে' দেখতে পাচ্ছিলেন না তিনি।

"অনীতা আসে নি?"

স্বয়ম্প্রভা আত্মসম্বরণ করে' রইলেন যতটা পারলেন। তারপর সংযত কণ্ঠেই বললেন, "তুমি গিয়েছিলে তাকে আনতে—ফিরে এসে আমাকে জিগ্যেস করছ সে এসেছে কিনা। তুমি—"

"এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। আশ্চর্য্য তো। ফানি! সে আমার আগে মোটরে' করে' বেরিয়েছে। বাঃ—"

"সে বেরিয়েছে ঠিক তো?"

"ঠিক বই কি! মোটরে করে"

"আমার চিঠি পড়ে কি বললে"

"তা শুনিনি। শুনলাম চুপ করে ছিল। কিন্তু বেশ মজা হ'ল তো। বাঃ। হয় তো—"

"তুমি তার সঙ্গে দেখা করনি?"

"সে দোতলায় ছিল। আমি সেখানে উঠব কি করে'। সুরেশ্বরী দেবী চিঠিটা নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়েছিলেন"

"বাবাজি ছিলেন কোথা"

"বাবাজি? মানে, ওদের ঠাকুর?"—বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"ইয়ার্কি করছ নাকি"

"ঠাকুরকেই তো বাবাজি বলি আমরা, মানে এ অঞ্চলে সবাই বলে" —বিস্মিত সদারঙ্গ উত্তর দিলেন—"ওদের ঠাকুরটা কোথায় ছিল জানতে চাইছেন?"

"ওর স্বামী কোথা ছিল"

"কার স্বামী? সুরেশ্বরী দেবীর?"

"আরে না, না—কি গাড়োলের পাল্লাতেই পড়েছি! অনীতার স্বামী সুশোভন"

"জানি না"

"সে ওর কাছে ছিল না?"

"কার কাছে?"

"অনীতার কাছে। তুমি কি ভেবে ছিলে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে বলছি?"

"হ্যাঁ"

"সুরেশ্বরী দেবীর কাছে ছিল?"

"না। আমি ভেবেছিলাম সুরেশ্বরী দেবীর কাছে সুশোভন আছে কিনা আপনি জানতে চাইছেন"

"আহ্ হ্। ওকে দেখে ছিলে?"

"কাকে"

"কি বিপদ। সুশোভনকে, সুশোভনকে"

"বললাম তো। ওর খবর জানি না"

"না বলনি তুমি"—অযথা ধমকে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে এলেন আবার।

"অনীতা আমার চিঠি পড়ে' মোটরে করে' বেরিয়েছে সেখান থেকে?"

"হ্যাঁ। এ কথাও তো বলেছি আপনাকে। দেখুন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কিছু খেয়ে নি। শরীর আর বইছে না"

"সুশোভন কোনও সুলুক-সন্ধান পায় নি তো?"

"সুলুক?"

"সুলুক-সন্ধান। ও টের পায় নি তো যে অনীতা চলে এসেছে?"

"না। এক মিনিট, একটু সবুর করুন। গোড়া থেকে সব বলব আবার। হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে নিতে দিন আমাকে"

"অনীতাকে আনতে গেলে, কিন্তু সে-ই এখনও এল না। তার খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারব না"

"এক্ষুণি আসবে। ড্রাইভার হয় তো রাস্তা চেনে না, কিম্বা বাড়ি চেনে না। ঘুরছে। এক্ষুণি এসে পড়বে"

"ঠিক বলেছ। আশ-পাশেই ঘুরছে হয় তো। তুমি এক কাজ কর না হয়"

"কি"

"রাস্তায় গিয়ে তোমার মোটর সাইকেলের হর্ণটা বাজাও। তাহলে ওরা বুঝতে পারবে। অন্ধকারে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক। যাও—"

"দেখুন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। আর পেরে উঠছি না। সেই সকাল থেকে সমস্ত দিন—মানে এক নাগাড়েই প্রায়। তা ছাড়া আপনি এমন অস্থির হচ্ছেন কেন তাও তো বুঝছি না। আমি গোড়া থেকেই তো বলছি—সান্ত্বনা মেয়েটি খুব ভাল—একা একটা নাইট-স্কুল চালাত—রীতিমত 'গুড' যাকে বলে—সুরেশ্বরী দেবীও 'কনফার্ম' করলেন এ কথা"

"বাজে বক্তৃতা না করে' যা বলছি কর গে যাও। রাস্তায় হর্ণ বাজাও গিয়ে। যাও, আর দেরি কোরো না"

সদারঙ্গ আর প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হর্ণ বাজাতে লাগলেন। কোনও ফল হল না। ফিরে এসে খেতে বসলেন। স্বর্ণপ্রভার তাড়ায় খেতে খেতেও বার দুই উঠে গিয়ে হর্ণ বাজিয়ে আসতে হ'ল তাঁকে। কিন্তু অনীতার মোটর এল না।

গোঁসাইজি প্রাত্যাহিক নিয়ম অনুসারে হোটেল বন্ধ করবার পূর্ব্বে চারিদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন একবার। দোরগোড়ায় ঠেসানো বাইসিকলটার দিকে একবার চাইলেন। কখন এসে ভদ্রলোক নিয়ে যাবেন কে জানে। বাইরের ঘরে একটা ব্যাগ আর একটা বেঁটে ছাতা রয়েছে, সেই মেয়েটির বোধ হয়, যিনি হোটেলে এসে রাত্রিবাস করতে চাইছিলেন। নাক কুঁচকে এমনভাবে চাইলেন সেগুলোর দিকে—যেন সেগুলো থেকে কোনও দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। তারপর উপরে গেলেন। গুরু-ভগ্নীর খোঁজ নিলেন একবার। নাবছেন এমন সময় দেখলেন একটি মোটর এসে দাঁড়াল তাঁর হোটেলের সামনে। আবার কে জুটল এসে এ সময়। বাইরের ঘরটাতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি যে আপাতক অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম এই কথাগুলি আর একবার উচ্চারণ করবার সুযোগ পেয়ে ঈষৎ পুলকিতও হলেন মনে মনে।

অনীতা মোটর থেকে নেবে এল।

"আপনিই কি এই হোটেলের মালিক"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপাতত অতিথি-সৎকার করতে অক্ষম আমি। আমার দু'টি ঘরেই লোক আছে"

"এখানে সকালের দিকে আমি এসেছিলাম একবার। তখন আপনি ছিলেন না—"

"ও। এই জিনিসগুলি আপনার তাহলে"

"হ্যাঁ"

"তাহলে নিয়ে যান। এখানে তো স্থান নেই। আর একজন মহিলাও আসতে চেয়েছিলেন—তিনি সদারঙ্গবাবুর বাইকের পিছনে চড়ে যাচ্ছিলেন—আমি ভেবেছিলাম এগুলো তাঁরই বুঝি"

"হ্যাঁ, আমাদেরই। আমি তাঁর মেয়ে"

"ও! এই বয়সেও আপনার মায়ের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। বাইসিকলের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া কম সাহসের কাজ নয়, বিশেষত এ বয়সে। জিনিসগুলো নিতেই এসেছেন তাহলে আপনি"

"হ্যাঁ। আর একটু কাজও আছে—"

"আবার কি"

"একটা খবর যদি দিতে পারেন"

"কিসের খবর"

"দেখুন, আপনার এই হোটেলকে কেন্দ্র করে' নানা রকম অদ্ভুত খবর শোনা যাচ্ছে। আমিও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। আপনার মুখ থেকে সত্যি কথাটা শুনতে চাই"

"আমার হোটেল সম্বন্ধে অদ্ভুত খবর! শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি। কে বলেছে—"

"সদারঙ্গবিহারীলাল বলে এক ভদ্রলোক। তিনি নাকি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন—"

"ও, তিনি! তাঁর অসাধ্য কিছু নেই"

"তিনি কাল রাত্রে এখানে না কি একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে দেখেন। তাঁরা এখানে না কি কাল রাত্রে ছিলেনও। তাঁদের সঙ্গে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ছিল কি?"

"কংগ্রেসকর্ম্মী অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আর তাঁর স্ত্রীর কথা বলছেন কি"

"হ্যাঁ। অন্তত—তাঁরা দু'জনে কি ছিলেন এখানে?"

"আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই আমি জানবেন। ওরকম ভাবে জেরা যদি করেন কিছু বলব না। তবে ভদ্রভাবে যদি জানতে চান বলছি, হ্যাঁ তাঁরা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ছিল অবশ্য—"

"দেখুন সমস্ত ঘটনা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার। আপনি দয়া করে যা জানেন খুলে বলুন। খবরগুলো আমাকে জানতেই হবে যেমন করে' হোক। দরকার হ'লে আইনের সাহায্যও নিতে হবে শেষ পর্য্যন্ত—"

"আইনের সাহায্য! আপনি কি বলতে চান, আমার হোটেলে বে-আইনী কিছু করি আমি? আইন দেখাচ্ছেন আমাকে! জানেন আমার হোটেল যে আইন অনুসারে চালাই আমি—তা একেবারে নিখুঁত? সন্দেহজনক কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না এখানে"

"তা জানি বলেই তো আপনাকে এত কথা জিগ্যেস করছি"

গোঁসাইজির ভাব-ভঙ্গী দেখে অনীতা ঈষৎ মোলায়েম সুর ধরলে। তা না হলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। তার এ কথায় প্রীতও হলেন গোঁসাইজি। বললেন, "কোনও বাজে লোককে ঢুকতে দিই না আমি এখানে। এখানে ও-সব চালাকি চলবার উপায় নেই"

ঈষৎ হেসে অনীতা বললে—"কিন্তু আপনাকে কেউ ঠকাতেও তো পারে"

"ঠকাবে? আমাকে? আমি কি কচি খোকা?"

"ধরুন, কাল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যে ব্রজেশ্বরবাবু আর তাঁর স্ত্রী এ কি করে' জানলেন আপনি"

"সৎরংবাবু এই সব বলে' বেড়াচ্ছেন বুঝি! দেখুন, আমি প্রমাণ না রেখে কোনও কাজ করি না। একবার এক অ্যানার্কিষ্ট ছোকরা আমাকে ফাঁকি দিয়েছিল, তার পর থেকে আমি সাবধান হয়েছি। তা ছাড়া একজন কংগ্রেসকর্মী অধ্যাপক কি মিছে কথা বলবেন?"

"তিনি হয়তো বলবেন না, কিন্তু তাঁর নাম করে' অপর কেউ আপনাকে ঠকিয়ে যেতে পারে"

"তাঁর নাম করে'?"—ঈষৎ থতমত খেয়ে গেলেন গোঁসাইজি, তার পর অযৌক্তিকভাবে বলে' উঠলেন—"দেখুন, আপনি যদি আইনের সাহায্য নেন আপনার বন্ধু সৎরংবাবু মানহানির দায়ে পড়ে' যাবেন বলে দিচ্ছি। আমার হোটেলের নামে এ রকম যা তা কথা রটিয়ে পরিত্রাণ পাবেন না উনি—"

"না, তাঁর কথায় বিশ্বাস করি নি আমি। আমি শুধু জানতে চাইছি যিনি এসেছিলেন তিনিই যে ব্রজেশ্বরবাবু এর কোনও প্রমাণ আছে কি আপনার?"

"প্রমাণ? তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একঘরে এক খাটে শুয়েছিলেন আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি—মানে, দৈবাৎ দেখে ফেলেছি"

"এটা কি একটা প্রমাণ হল? আপনিই বলুন"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অনীতার দিকে। সভীন মেয়ে তো! কালে কালে হচ্ছে কি!

"আরও প্রমাণ আছে, আসুন আমার সঙ্গে। আমি যতটা পেরেছি প্রমাণ রেখেছি। আসুন—"

অনীতার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোঁসাইজির পিছু পিছু আপিস ঘরে ঢুকল সে। আশা আর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল তার মনে। বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছিল।

গোঁসাইজি তাঁর 'অ্যাডমিশন রেজিষ্টার'খানি পাড়লেন।

"এই খাতায় প্রত্যেক অতিথিকে স্বহস্তে নিজের নাম এবং পরিচয় লিখে দিতে হয়। আমি স্বচক্ষে ব্রজেশ্বরবাবুকে এই খাতায় নিজের নাম এবং পরিচয় লিখতে দেখেছি। এই দেখুন—"

"দেখি"

দেখেই অনীতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আপনি স্বচক্ষে তাঁকে লিখতে দেখেছেন?"

"তিনি যখন লিখছিলেন আমি ঘরে এসে ঢুকলাম। স্বচক্ষে দেখেছি বই কি—"

অনীতার বুকের ভিতরটা সহসা মুচড়ে উঠল অনুতাপে। ছি, ছি, সুশোভনের প্রতি কি অবিচারই করেছে সে। এ হাতের লেখা সুশোভনের হতেই পারে না। এমন স্পষ্ট গোটাগোটা করে' লিখতেই পারে না সুশোভন। তার লেখা তো অর্দ্ধেক পড়াই যায় না, এমন হিজিবিজি করে' লেখে সে।

খাতা বন্ধ করে অনীতা বেরিয়ে এল আপিস ঘর থেকে। গোঁসাইজিও এলেন।

"দেখুন, আমার হোটেলের বদনাম দেবার সাহস হয় নি আজ পর্য্যন্ত কারও—তা তিনি সৎরংই হোন বা সত্যিক্রমই হোন। কোনও খুঁত রাখি নি আমি। এটা হোটেল নয়, পান্থনিবাস—"

"না, আপনার ব্যবস্থা সত্যিই খুব ভাল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার—"

অনীতা মোটরে চড়ে বসল। কতকগুলো সমস্যার সমাধান হল না এখনও। সুশোভন কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিল? সুশোভন বললে কাল রাত্রে সে এখানে ছিল। কোথা শুয়েছিল তাহলে? যাই হোক, একটা ব্যাপার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—সুশোভনকে মিছে সন্দেহ করেছিল তারা। কাল রাত্রে সুশোভন যাই করে' থাক, সে নির্দ্দোষ। বেচারি বারবার চেষ্টা করেছে নিজের দোষস্খালন করবার—কিন্তু সে তার কথায় কর্ণপাত পর্য্যন্ত করে নি।

"এখন কোথায় যাব মা?"—ড্রাইভার জিগ্যেস করল।

"ফিরে চল—"

"বাড়ি?"

"হ্যাঁ"

"এই থাম থাম"—

চীৎকার করে' উঠল সুশোভন।

"দিগ্বিজয়বাবুর গাড়ি না কি"

ক্যাঁচ করে থেমে গেল গাড়িটা।

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—ড্রাইভার জবাব দিলে মুখ বাড়িয়ে।

"শোন, আমি গাড়ি নিয়ে ছিপ্‌ছরামারি বা ফাৎনা ফিরিজিপুরে যাব—মানে, অনীতাকে যেখানে রেখে এসেছ সেইখানে রেখে এস আমাকে। জরুরি দরকার"

"তুমি!"

"অনীতা!"

"এস, ভিতরে ঢোক"

তড়াক করে' মোটরে উঠে বসল সুশোভন।

"দেখ, আমি সব বুঝিয়ে বলতে চাই। তুমি অমন অবুঝের মতো করছ কেন। বুঝিয়ে বলছি সব, শোন আগে—"

"দরকার নেই। কিছু বলবার দরকার নেই। পরে বোলো কোন সময়ে যদি তোমার ইচ্ছে হয়। আমি সব খবর নিয়েছি। বড় অন্যায় হয়ে গেছে আমার। রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি। প্রথমটা মনে হয়েছিল—আমায় মাপ কর তুমি—মাপ কর—বল, মাপ করেছ?"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। ঘটনা-পরম্পরা যে এমন নাটকীয়ভাবে হঠাৎ ডিগবাজি খেয়ে যাবে তা তার কল্পনাতীত ছিল।

"মাপ? মোটেই না, মানে ও প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে ভুল বুঝে তোমরা কেন যে এমন করছ—"

"আর কক্ষণো করব না। এইবারটি মাপ কর"

"না, না, মাপ মানে—উঃ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে উঠলাম মনে হচ্ছে। যাক্, এখন কি করা যায় বল তো"

সুশোভনের ইচ্ছে করছিল বেলুনের মতো উড়তে।

"চল দু'জনে কোলকাতা ফিরে যাই"

"তা তো যাবই। রাতটা কোথায় কাটানো যায়? এখানে ভালো হোটেল আছে কোথাও বলতে পার"

"দীঘড়াতে আছে। কাছেই"—ড্রাইভার উত্তর দিলে।

"তাহলে সেইখানেই নিয়ে চল আমাদের"

গাড়ি দীঘড়া অভিমুখে ধাবিত হল।

"এইবার সব বলি তাহলে খুলে"—অনীতার দিকে ঘুরে বলল সুশোভন।

"কি দরকার—আসল কথাটা জেনেই গেছি যখন"

"কি করে' জানলে"

"গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে'। অ্যাডমিশন রেজিষ্টারটা দেখেছি। দু'একটা কথা যদিও স্পষ্ট হয় নি এখনও, কিন্তু সে পরে হলেও চলবে"

গাড়ী দীঘড়ায় এসে পৌঁছল।

নেমেই সুশোভন চেঁচিয়ে উঠল—"আরে গণেশ যে! তুমি এখনও যাও নি!"

গোঁফ চুমরে গণেশ বললে, "এইবার যাব। সমস্ত দিন লেগে গেল রেডিয়েটারটা সারাতে। এখানকার মিস্ত্রি সব অতি বাজে। ঝালতেই জানে না"

"ঠিক হয়েছে এখন?"

"হয়েছে"

"গাড়ি কোথায় তোমার"

"মিস্ত্রির বাড়ির সামনে"

"চল তাহলে তোমার গাড়িতেই ফিরি। এখনি যাব কিন্তু"

"বেশ। গাড়িটা আনি তাহলে"

গণেশ চলে গেল।

সুশোভন অনীতার দিকে ফিরে বললে, "দিগ্বিজয়বাবুকে একটা চিঠি লিখে দি তাহলে—যে পরে কোনও এক সময় আসব আমরা। এখন ফিরে চললুম"

"বেশ"

পকেটবুক থেকে একখানা পাতা ছিঁড়ে সুশোভন একখানা চিঠি লিখে দিলে। ড্রাইভারকে বখশিসও দিলে। তারপর হোটেলে ঢুকল। গরম ভাত, মুগের ডাল, আর গরম মাছভাজা পাওয়া গেল। অপৌষ্ট।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনীতা বললে—"কোলকাতা যাবার আগে মাকে কিন্তু খবরটা দিতে হবে"

"হ্যাঁ, সদারঙ্গ-বিহারীলালকেও"

"আমি গিয়ে দেখা করে' এলে কেমন হয়। কাছেই তো, না?"

সুশোভন ইতস্তত করতে লাগল।

"তোমার গিয়ে দরকার নেই। এখানকার পথঘাট ভাল নয়, তাছাড়া তোমাকে তোমার মা হয় তো ছাড়তে চাইবেন না,—সে আবার এক বখেড়া হবে। তার চেয়ে আমিই যাই বরং। খবরটা দেওয়া তো কেবল—"

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখে দিই না হয় যে ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমাদের আশঙ্কা অমূলক—কি বল—"

মুচকি হেসে সুশোভনের দিকে চাইলে অনীতা।

"বেশ তাই দাও"

হোটেলওলার কাছ থেকে কাগজ চেয়ে অনীতা চিঠি লিখতে বসল। লিখতে লিখতে অনীতা হঠাৎ জিগ্যেস করলে "আচ্ছা কাল রাত্রে তুমি ছিলে কোথা? তুমিও ওইখানেই ছিলে?"

"সে অনেক কথা। পরে শুনো"

"এইটুকু বল না এখন—"

"হ্যাঁ, ওই হোটেলেই ছিলাম। তবে নানা স্থানে। ঘর তো একটি। কখনও বারান্দায়, কখনও খাবার ঘরে, কখনও উঠোনে, কখনও সিঁড়িতে—এইভাবে কাটিয়েছি আর কি। ভিজেও ছিলাম বেশ—"

"ছি, ছি, কি দুর্গতি"

"চরম"

"অসুখ না করে"

"না, কিছু হবে না"

"কিন্তু তোমরা দু'জনে মিলে মিথ্যে কথাটা বললে কেন তা এখনও বুঝতে পারছি না আমি। সান্ত্বনা হোটেলে আছে—মিছে করে' একথা বলতে গেলে কেন"

"না বললে তুমি আমাদের সঙ্গে মোটরে আসতে না"

"আহা"

"নাও, চিঠিটা লিখে ফেল চটপট"

"এতো সঙীন প্যাঁচ হ'ল দেখছি"—সদারঙ্গবিহারী চিবুক চুলকে বলে উঠলেন।

"প্যাঁচ! মেয়েটা অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, সেটা তোমার কাছে প্যাঁচ মনে হচ্ছে! আবার যাও, দেখ কি হ'ল"

"রাস্তায় গিয়ে আমি আর কি করব। দু'বার তো গেলাম। দিগ্বিজয়বাবুর 'কারে' এসেছে, চিন্তার কোনও কারণ আছে বলে' মনে হয় না। প্যাঁচ অন্য কারণে বলছিলাম। আমাদের কি হবে"

"আমাদের?"

"মানে, শোবার কথা ভাবছি। দোতলায় পাঁচির মায়ের ঘরটায় অবশ্য আপনি শুতে পারেন"

"আমি ঘুমুব না। চিন্তায় আমার ঘুম আসবে না। যেখানেই আমাকে শুতে দাও—খাড়া বসে থাকব আমি সারারাত"

"ও। তাহলে, মানে রাগ করবেন না, আমিই ভাবছিলাম পাঁচির মায়ের ঘরটায় শোব। আপনার সেখানে হয় তো কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি যদি জেগে থাকাই 'ডিসাইড' করে' থাকেন তাহলে—ঘরটা কিন্তু—"

"আমি দেখেছি সে ঘর, রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব"

"বেশ। কিন্তু আপনি গায়ে কি দেবেন? পাঁচির মায়ের লেপ ছিল একটা—"

"চল দেখি গিয়ে"

"সেই ভাল। না হয় পাড়া থেকে চেয়ে চিন্তে আনব একটা। জনার্দনবাবু একটা এক্‌স্‌ট্রা লেপ করিয়েছেন এবার জানি"

"চল"

একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন দু'জনে। পাঁচির মা থাকত ছাতের ছোট্ট ঘরটায়। সিঁড়ির দুয়ারে মিলারের তালা লাগানো ছিল একটা, চাবি লাগাবামাত্র লাফিয়ে খুলে যায় যেগুলো—আবার টিপলেই বন্ধ হয়ে যায়। সদারঙ্গ চাবিটা খুললেন। রিংসমেত তালাটা 'সুর্ সে'তে ঝুলতে লাগল।

...পাঁচির মার তক্তাপোষের উপর কোণের দিকে বিছানার মতো কি একটা গোটানো ছিল। স্বয়ম্প্রভা—খুলে দেখলেন সেটা। দেখে নাক সেঁটকালেন।

সদারঙ্গবিহারী বললেন, "আপনি যদি ওটা গায়ে না দিতে চান, আমিই দেব না হয়। আমার লেপটা আপনি নিন। তাহলে পাড়ায় বেরিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না আর। রাত প্রায় দশটা হল তো—"

"বেশ তাই হবে। চল নীচে যাই। সিঁড়ির কপাট আবার বন্ধ করতে গেলে কেন। খোল"

"বন্ধ তো করি নি। হাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। খুলছি। আরে—এ কি—"

"কি হ'ল"

"এ যে বন্ধ। বাইরে থেকে বন্ধ—আরে"

"শিগ্‌গির কপাট খোল বলছি। রসিকতা করবার সময় এ নয়"

"খুলছে না। এ কি—আরে"

"খোল বলছি"

"পারছি না, বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল"

"বাজে কথা। ধাক্কা মার। বন্ধ করতে আসবে কে? আর করবেই বা কেন? ঠেল, জোরে ঠেল, ধাক্কা দাও"

সদারঙ্গ-বিহারীলাল ধাক্কা দিলেন, ঠেললেন, তারপর স্বয়ম্প্রভার দিকে চাইলেন একবার। মুখে করুণ হাসি। মাথা নাড়লেন। আবার ঠেললেন। কিন্তু না, কপাট খুলল না।

"বাইরে থেকে বন্ধ করে' দিয়েছে কেউ। তালাটা বাইরে ঝুলছিল কি না। কেউ হয়তো ঠাট্টা করে' কিম্বা, কি জানি—"

"আবার ঠেল। ঠেল। গুঁতো মার। গায়ে জোর নেই না কি! সর—"

"দেখুন আপনি যদি পারেন। দেখুন। পারবেন না। অসম্ভব"

স্বয়ম্প্রভা চেষ্টা করলেন। দাঁতে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করলেন। হ'ল না। তারপর হঠাৎ তিনি রুখে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তুমিই ষড় করেছিলে বোধহয় কারও সঙ্গে—"

"ষড়! রামঃ—না—না—ছি—বাঃ। পা ছুঁয়ে বলতে পারি আপনার"

"কে তবে বন্ধ করলে কপাট"

"কি করে—বলব। আপনিও যেখানে আমিও সেখানে। হয়তো পাড়ার কেউ ঢুকেছিল, ইয়ার্কি করে' গেছে। অন্যায় কিন্তু। দুঃ: ভাবতেই পারি না"

"যেমন করে হোক বেরুতেই হবে"

"কি করে" তাতো বুঝতে পারছি না"

"সমস্ত রাত এখানে থাকব বলতে চাও তোমার সঙ্গে। বেরুতে হবে যেমন করে' হোক। অনীতা যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে"

"তা পারে। কিন্তু—ছি—কি কাণ্ড। কি করি বলুন তো"

"চেঁচাও। পাড়ার সবাইকে জাগাও। চেঁচাও—"

"না, না, ছি, সে কি হয়! আমি এখানে বাস করি, আমার একটা মানসম্ভ্রম আছে এখানে। না—চেঁচানো চলবে না। লোকে হাততালি দেবে। চেনেন না আপনি এদের। গুজবের চোটে কান পাতা যাবে না। সে ভয়ানক ব্যাপার হবে। আপনার পক্ষেও। ঘাবড়ে যা তা করবেন না। দাঁড়ান—"

স্বয়ম্প্রভা পাঁচির মার খাটের উপর বসে' পড়লেন। বিস্রস্ত কেশ স্ফীতনাসারন্ধ্র। সদারঙ্গবিহারী লাল চশমাটা খুলে মুছলেন। তারপর সেটা পরে' সভয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

"সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে এই ঘরে থাকতে হবে না কি"—চীৎকার করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা।

"দোহাই আপনার, চেঁচাবেন না অমন করে"

"কপাট খোল এক্ষুণি। তা নাহলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব আমি—"

"না, না, লোকে হয়তো ভাববে আমি বলাৎ—মানে, খারাপ কিছু করছি বুঝি একটা। একটু সবুর করুন। আমি দূরে থেকে দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে দেখি। হয় তো ভেঙেও যেতে পারে—ভয়ানক শব্দ হবে কিন্তু—"

"যা করবার কর। আমি এখানে আর একদণ্ড থাকতে চাই না"

ছোট ঘর। দৌড়বার বেশী স্থান ছিল না। মালকোচা মেরে সামান্ত একটু ছুটে এসে সদারঙ্গবিহারী যে ধাক্কাটা মারলেন তা নিতান্তই হাস্যকর। কপাট খোলা দূরে থাক তেমন কোনও শব্দও হল না।

"ঠেল, ঠেল, জোরে, আরও জোরে"—চেঁচাতে লাগলেন স্বয়ম্প্রভা।

"হেঁইও—হেঁইও"—সদারঙ্গ চেঁচাতে লাগলেন ঠেলতে ঠেলতে।

"ঠেল, ঠেল, আরও জোরে—"

"বাপ্ স্—উঃ। চেঁচাবেন না অত জোরে দোহাই আপনার। পাড়ার লোকে যদি শুনে ফেলে—বুঝতেই পারছেন"

২৮

অনুসন্ধান করতে করতে সুশোভন সদারঙ্গবিহারীর বাসায় এসে দেখলে কপাট খোলা। আলো জ্বলছে। ঘরে নেই কেউ। ছাতাটি এবং ব্যাগটি সে মেঝেতে নামিয়ে রাখলে। তারপর অনীতার চিঠিটা বার করে' টেবিলের উপর ঠিক সামনেই এমন ভাবে রাখলে যাতে ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে।

উপরে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—সিঁড়ি রয়েছে একটা বারান্দার দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে, কথাবার্ত্তাও শোনা যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পায়ে ছিল রবার সোলড জুতো, কোনও শব্দ হ'ল না। সিঁড়ির কপাটটা হাওয়াতে আপনিই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোদুল্যমান তালাটা চোখে পড়ল। সদারঙ্গবিহারীলাল এবং স্বয়ম্প্রভার কথার টুকরো শুনতে পেলে দু' একটা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুশোভন। পরমুহূর্ত্তেই হাসি চিকমিক করে' উঠল তার চোখে। আস্তে আস্তে উঠে তালাটি কুট করে' লাগিয়ে দিয়ে নেবে এল সে। চাবির রিংটি টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে পড়ল। মিনিট দশেকের মধ্যেই হোটেলে পৌঁছে গেল আবার।

"খুব চট করে' ফিরলে তো"

"হ্যাঁ, চিঠিটা সদারঙ্গবাবুকে দিয়েই চলে এলাম। কথাবার্ত্তা হ'ল না তেমন কিছু"

"মাকে কেমন দেখলে"

"তিনি পাশের ঘরে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করি নি"

"চটবেন খুব"

"গণেশ এসেছে"

"হ্যাঁ"

"চল তবে আর দেরি কেন"

"চল"

মোটর ছুটে চলেছে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অন্ধকার ভেদ করে'। ঘেঁসাঘেঁসি করে' পাশাপাশি বসে' আছে অনীতা আর সুশোভন। সুশোভনের ঘাড়ে মাথা রেখে অনীতা ঘুমুচ্ছে।

সমাপ্ত

ভারতের খাদ্য-সমস্যা

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই ভারতবাসীর সামনে খাদ্য সমস্যা প্রথমে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময়ে সেই অবস্থা চরমে উঠে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সম্ভব হয় এই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্যসম্পদশালিনী প্রদেশ বঙ্গদেশে ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ মন্বন্তর। সেই ভয়ানক দিনগুলিও আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারও পর আমরা ছিন্ন করিয়া আসিয়াছি আমাদের দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অধীনতার নাগপাশ। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না সেই যুদ্ধ-পূর্ব্ব দিনগুলি। খাদ্য সমস্যা দিন দিন প্রকট হইতে প্রকটতর হইয়া উঠিতেছে; দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—আর অর্দ্ধাহার ও অনাহারে মৃত্যু-পথ-যাত্রী-জাতি তিলে তিলে আগাইয়া যাইতেছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু কেন?

ইহার উত্তরে অনেক অর্থনীতিবিদ্ বলেন—লোকসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই নাকি এই প্রকটতর খাদ্য-সমস্যার মূল কারণ। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই উক্তিরই সমর্থনে তাঁহার "ফুড সাপ্লাই এণ্ড পপুলেশন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে—'বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় খাদ্য ও লোকসংখ্যা প্রায় সমান সমান হইয়া আসিয়াছিল। পরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হইতে আরম্ভ হয়—১৯৩০-৩১ সালে লোক সংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন দাঁড়ায় শতকরা ১৫ ভাগ কম।'

অবশ্য বিগত কয়েক শতাব্দীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব দেখিলে দেখা যাইবে যে উপরোক্ত উক্তিগুলি অনেকাংশে সমর্থনযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের লোক সংখ্যা ছিল ১০ কোটি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয় ১৩ কোটি। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দীতে পর পর ৩১টী দুর্ভিক্ষে মৃত আনুমানিক তিন কোটি লোককে বাদ দিয়াও শতাব্দীর শেষে ১৯০১ সালের আদম সুমারীতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৯ কোটি। একটী শতাব্দীতে ১৬ কোটি লোক

সংখ্যা বৃদ্ধি সত্যই বিস্ময়কর। কিন্তু সেই বিস্ময়কর লোক সংখ্যা বৃদ্ধিই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণান্তকর হইয়া উঠিল দ্রুত লোক সংখ্যা বৃদ্ধির তালে তালে। আদম সুমারীর হিসাব অনুযায়ী প্রতি দশ বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৯৩১ ও ১৯৪১ সালে যথাক্রমে এদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়াইল ৩৫ কোটী ও ৪০ কোটী। এই বৃদ্ধির সহিত খাদ্য উৎপাদন তাল রাখিতে পারিল না। অবশ্য যেখানে তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শোষণই ছিল অন্যতম নীতি, সেখানে তাল রাখিতে না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারই ফলে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল খাদ্য-ব্যবস্থা।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথা পিছু জমির পরিমাণও কমিয়া গেল। জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার ফলে অভাবের তাড়নায় নগদ পয়সার মোহে মানুষ হইল শহরাভিমুখী। শিল্পাঞ্চলের প্রয়োজনে হাজার হাজার চাষী হইল মজুর আর শ্রমিক। চাষের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আসিল কমিয়া। এমনি সাধারণ অবস্থাতেই ভারতবর্ষে চাউলের গড়পড়তা বাৎসরিক উৎপাদন হইত ২৬৪৪ লক্ষ টনের মত। সেই উৎপাদনও কমিয়া আসিতে লাগিল। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভেই ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। সেই চাউলের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪ লক্ষ টন।

শুধু তাহাই নহে, এই ভারতের কৃষিসম্পদের অন্যতম মেরুদণ্ড চাষীকুলও দিন দিন হতবল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে, আর সেই কারণগুলির অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে—ভারতের চাষীদের শতকরা ৬০ ভাগ চাষীর নিজস্ব জমির পরিমাণ হইতেছে পাঁচ একরের কম। সেই পাঁচ একর পরিমিত জমি হইতে একটা সাধারণ চাষীর পরিবারের সারা বৎসরের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। কয়েকটী প্রধান প্রধান শস্য অঞ্চলের হিসাব হইতে দেখা যায় যে—বাঙলার চাষীদের শতকরা ৮০ জন চাষীর জমি আছে দুই একর বা তাহার কম এবং যথাক্রমে মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের চাষীদের শতকরা ৭০ ভাগের, মধ্যপ্রদেশের চাষীদের শতকরা ৩৮ ভাগের ও বোম্বাই প্রদেশের চাষীদের শতকরা ৫০ ভাগের জমি আছে পরিবার পিছু পাঁচ একরের কম। কাজেই এই বিপুলসংখ্যক চাষীদের দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্য অনেককেই কাজ-কর্মে মনোযোগ দিতে হয় ও সেই সঙ্গে চাষের দিকে তাহারা অনেকটা অমনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহার ফলেও অনেকখানি ব্যাহত হয় খাদ্য উৎপাদন।

অবশ্য জগতের অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের জমির একর পিছু ফলনও অত্যন্ত কম। এই কম ফলন বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী জনসাধারণ ও সরকার; আর প্রকৃতপক্ষে ইহা চাষের প্রতি তাহাদের অমনোযোগিতারই একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নিম্নের ১নং ছকটীতে কয়েকটা দেশের গড়পড়তা একর পিছু ফলন, পৃথিবীর একর পিছু ফলন ও ভারতের একর পিছু ফলনের হিসাব দিলাম।

১নং ছক :— একর পিছু ফলন

(পাউণ্ড)

	চাউল	গম
ভারতবর্ষ	৭৩৮	৬৩৬
চীন	২৪৩৩	৯৮৯
জাপান	৩০৭০	১৩৫০
আমেরিকা	১৬৮০	৯৯০
পৃথিবী	১৪৪০	৮৪০

উপরিউক্ত ছকটী হইতে এই কথাই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিলে খাদ্য-সমস্যা আমাদের অনেকখানি কমিতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় সেচের সুব্যবস্থা ও চাষের উন্নততর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিলে ভারতবর্ষের ও জমির একর পিছু ফলন আরও বেশী হইত তাহার অনেক প্রমাণ এদেশেই আছে। নিম্নের ২ (ক) ও ২ (খ) নং ছক দুইটীতে এদেশেরই কয়েকটী প্রদেশের সেচযুক্ত ও সেচবিহীন অঞ্চলের ধান ও গমের একর পিছু ফলনের তারতম্যের একটা হিসাব দিলাম। ছক দুইটা হইতে দেখা যায় যে—সুযোগ ও সুবিধা পাইলে এদেশের চাষীরাও অন্যান্য দেশের মত ফসল ফলাইতে পারিবে। হিসাব দুইটা সংগৃহীত হইয়াছে ভারতসরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'টেকনোলজিক্যাল পসিবিলিটিজ অব এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া' হইতে।

২ (ক) নং ছক :—

ধান

একর পিছু ফলন।

(পাউণ্ড)

প্রদেশ	সেচযুক্ত অঞ্চল	সেচবিহীন অঞ্চল
মাদ্রাজ	১৬৯৪	১১৩৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১২০০	৯০০
যুক্তপ্রদেশ	১১০০	৮৫০
পাঞ্জাব	১২৬৯	৫৮৭

২ (খ) নং ছক :—

গম

একর পিছু ফলন।

(পাউণ্ড)

প্রদেশ	সেচযুক্ত অঞ্চল	সেচবিহীন অঞ্চল
পাঞ্জাব	৯৬৭	৫৭২
যুক্তপ্রদেশ	১২০০	৮০০
বোম্বাই	১২৫০	৫০১

সেচের সুবিধা পাওয়া ও না পাওয়ার ফলে একই প্রদেশে একর পিছু ফলনের এই যে বিরাট পার্থক্য, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ইহা নিশ্চয়ই দূর করা যায়। ভারতসরকারের দামোদর পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী

পরিকল্পনা, মেট্টুর পরিকল্পনা প্রভৃতি সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো সেই দুর্দিনেরই পথ নির্দ্দেশ করবে।

যাই হোক, এইবার বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ ও সংখ্যাতাত্ত্বিকের হিসাব হইতে উদ্ধৃত করিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও যে খাদ্যসমস্যার অন্যতম কারণ সেই কথাটাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। পর পর কয়েকটী ছকে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের কয়েকটী প্রধান শস্য অঞ্চলের বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা, মাথা পিছু উৎপন্ন চাউল ও মাথা পিছু প্রয়োজনীয় চাউলের হিসাব দিলাম।

৩নং ছক :—

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব।

(লক্ষের হিসাবে)

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
বাঙ্গলা	৪৫৪	৪৬৭	৫০১	৬০৩
বিহার উড়িষ্যা	৩৪৪	৩৩৯	৩৭৬	৪৫০
মাদ্রাজ	৩৯১	৪০১	৪৪২	৪৯৩
যুক্তপ্রদেশ	৪৬৮	৪৫৩	৪৮৪	৫৫০
আসাম	৬৫	৭৪	৮৬	১০২

৪নং ছক :—

মাথা পিছু উৎপন্ন চাউল।

(পাউণ্ডে)

প্রদেশ	১৯১০-১৫	১৯২০-২৫	১৯৩০-৩৫	১৯৩৫-৪০
বাঙ্গলা	৫১৮	৩৯৮	৪০২	৩১৪
বিহার উড়িষ্যা	৪৭২	৩৯৯	২৯২	২২৩
মাদ্রাজ	২৫২	২৯১	২৬৭	২০৯
যুক্তপ্রদেশ	৮৬	১০২	৮১	৮৬
আসাম	৫৩৪	৪৪২	৪০১	৩৭৩

৫নং ছক :—

মাথা পিছু উৎপন্ন চাউলের তুলনায় মাথা পিছু প্রয়োজনীয় চাউল ও হার।

(পাউণ্ড)

	উৎপন্ন চাউল	প্রয়োজনীয় চাউল	শতকরা কত ভাগ কম
প্রদেশ	১৯৩৫-৪০	১৯৩৪-৩৮	
বাঙ্গলা	৩১৪	৩৪৪	১০
বিহার উড়িষ্যা	২২৩	২৫৯	১৬
মাদ্রাজ	২০৯	২৩০	১০
যুক্তপ্রদেশ	৮৬	৯৪	৯
আসাম	৩৭৩	৩৮২	৩

অবশ্য গত পঞ্চাশ বৎসরে চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই তুলনায় সার ও পরিচর্য্যার অভাবে জমির উৎপাদনী শক্তি দিন দিন কমিয়া যাওয়ার ফলে ও সেই সঙ্গে সেচ-ব্যবস্থার অভাবে মোট ফসল আমরা পাইয়াছি অনেক কম। ভারতবর্ষের মোট জমির শতকরা প্রায় ৪২ ভাগ ব্যবহৃত হয় চাষাবাদের কাজে, যথাক্রমে ১০ ও ১৩ ভাগ আছে পতিত ও জঙ্গল, আর বাকী ৩৫ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ চাষের জন্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও খাদ্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহী হইলে শেষ ১৭ ভাগকে আমরা পাইতে পারি চাষের জন্য। মোট জমির যে শতকরা ১৭ ভাগ আমরা পাইতে পারি চাষের জন্য—তাহার পরিমাণ আনুমানিক ১১ কোটী একর। এই সংখ্যা নিশ্চয়ই নগণ্য নয়। কিন্তু নগণ্য না হইলেও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এই বিপুল পরিমাণ ভূমিখণ্ডের সংস্কারের প্রয়োজন আছে, আর সেই সঙ্গে এই ভূমিখণ্ডকে চাষোপযোগী করিতে হইলে প্রয়োজন আছে জনসাধারণের উৎসাহের ও সেই সঙ্গে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার। আর সেই প্রয়োজন নিছক দৈনন্দিন প্রয়োজনেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এই বৎসরেও ভারতবর্ষকে বাহির হইতে ১২০ কোটী টাকার মত খাদ্য শস্য আমদানী করিতে হইবে। যদিও ভারত বিভাগের ফলে পূর্ব্বোক্ত ৪০ কোটী লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটিতে, তবু ও খাদ্য সমস্যার প্রকটতার ভাব কমে নাই, বরঞ্চ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার শস্য অঞ্চলকে বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিবার পরে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দিতে হইয়াছে বলিয়া ঐ সমস্যা আরও বাড়িয়াছে।

ইতিমধ্যেই ভারতসরকারকে চলতি বৎসরের খাদ্য শস্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ ২০ হাজার টন গম, ৬ লক্ষ ১৮ হাজার টন চাউল, ২ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ভূট্টা, ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন যব, ১ লক্ষ টন ময়দা ও আরও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হইয়াছে। শুধু এই বৎসরই নয়; প্রতি বৎসরই আমাদিগকে এই ধরণের খাদ্য-শস্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষে ধান ও চাউল আসিয়াছিল ৪ কোটী টাকার, গম আসিয়াছিল ১০ কোটী টাকার, ময়দা ১ কোটী টাকার ও অন্যান্য খাদ্যশস্য আসিয়াছিল ৩ কোটী টাকার মত। আর শুধু ধান, গম, যবই যে আমাদের কিনিতে হয় তাহা নহে, প্রতি বৎসর মাছ, তরিতরকারী, ফল, দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যামজেলী ইত্যাদি আমরা কিনিয়া থাকি কোটী কোটী টাকার। খাদ্যশস্য ক্রয় করিবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রতিবৎসর আমাদের ব্যয় করিতে হয় ও খাদ্যশস্যের জন্য যে সমস্ত অমূল্য খনিজ পদার্থ বা বনজ সম্পদ বাধ্য হইয়া অল্পমূল্যে বা বিনিময়ে বিলাইয়া দিতে হয় তাহার দ্বারা ভারতবর্ষ যে কোন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের সমকক্ষ হইতে পারিত, যদি কেবলমাত্র খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইত এই ভারতভূমি।

১৯৪৫ সালে ভারতের মোট উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন, ১৯৪৬ সালে ছিল ৪ কোটি টন, ১৯৪৭ সালে উৎপন্ন হইয়াছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ টন। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে, উক্ত তিন বৎসরে ভারতবর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু উৎপাদন সেই তুলনায় মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ গত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে পাঁচ কোটির মত।

তবে হায়দরাবাদ সহ ভারত ইউনিয়নে আলোচ্য বৎসরে জোয়ার ও ছোলার চাষ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে। যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ৩ কোটী ৭৮ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে ৫২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছিল ; আলোচ্য বৎসরে সেখানে ৩ কোটী ৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে জোয়ার উৎপন্ন হইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন। আর যেখানে ১৯৪৬-৪৭ সালে ১ কোটী ৬৯ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছিল ৩৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টন, সেখানে আলোচ্য বৎসরে ছোলা উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটী ৮৪ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে ৪৩ লক্ষ ১০ হাজার টন।

অন্যান্য উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বিস্তারিত বিবরণ না পাওয়ায় ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপন্ন কয়েকটী প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের আবাদী জমির ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিম্নে দিলাম। ছকটা সংগৃহীত হইয়াছে ভারতসরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে।

৬নং ছক :—

বৎসর	জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপন্ন দ্রব্য (লক্ষ টন)
	চাউল	
১৯৩৮-৩৯	৬৯৯	২২৯
১৯৩৯-৪০	৭০১	২৪৬
১৯৪০-৪১	৬৮৮	২১০
১৯৪১-৪২	৬৯৬	২৪৩
১৯৪২-৪৩	৭০৪	২৩০
	গম	
১৯৩৮-৩৯	২৬৮	৮০
১৯৩৯-৪০	২৬১	৮৯
১৯৪০-৪১	২৬৪	৮১
১৯৪১-৪২	২৬১	৮২
১৯৪২-৪৩	২৫৯	৯০
	বার্লি	
১৯৩৭-৩৮	৬৩	২১
১৯৩৮-৩৯	৬২	১৯
১৯৩৯-৪০	৬১	২০
১৯৪০-৪১	৬৩	২৩
১৯৪১-৪২	৬৫	২০
	বজরা	
১৯৩৭-৩৮	১২৫	১৯
১৯৩৮-৩৯	১২৮	১৮
১৯৩৯-৪০	১৩৪	২০
১৯৪০-৪১	১৪১৫	২৩
১৯৪১-৪২	১৪২	২২

উপরিলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে খাদ্যশস্যের বর্ত্তমান অবস্থা না জানা যাইলেও কতকটা আভাষ যে পাওয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সংখ্যাগুলিই যথেষ্ট নয়। খাদ্য সমস্যার আতঙ্কে ও ভয়াবহ আশঙ্কায় কোটী কোটী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আজ যে ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক নাগরিক জীবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে সুরু করিতে হইবে সত্যকার 'ফসল ফলাও' আন্দোলন। মনে রাখিতে হইবে যে শুধু বড় বড় বিজ্ঞাপন ও সভা সমিতি 'ফসল ফলানর' পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ যখন লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অর্দ্ধাহার আর অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহাদের সামনে এই ধরণের আশার সৌধ রচনা করা মর্ম্মান্তিক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'ফুড ফর ফোর হানড্রেড মিলিয়নস্' গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'আমাদের দেশে যা আবাদযোগ্য জমিতে এখনো চাষ হয়, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করিলে বর্ত্তমান জনসংখ্যা তো দূরের কথা, আরও সাত কোটী লোকের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। তিনি সেই কথা লিখিয়াছিলেন ১৯৩৮ সালে। আজ দশ বৎসর পরে ১৯৪৮ সালেও আমরা সেই প্রয়োজনই অনুভব করিতেছি। বিগত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও উন্নততর সেচ ব্যবস্থা করিয়া চাষের উন্নতি করিয়া খাদ্য সমস্যা রোধ করার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। তাই আজও আমাদের নতুনতর ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে। আর আছে বলিয়াই ব্যবস্থা হইতেছে বিভিন্ন নদীর উপত্যকায়—উন্নততর সেচ ব্যবস্থার। কিন্তু যেভাবে সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা লইয়া সরকার অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে সেদিনকার আনন্দোচ্ছল দিনগুলিকে দেখিয়া যাইবার মত সৌভাগ্য অনেকেরই হইবে কিনা সন্দেহ। তবু সুফল যে ফলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিগত পাটনা অধিবেশনে ডাঃ বীরেশ গুহ এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, সেই কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রতি একর জমিতে খাদ্য শস্যের শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তবে, তার জন্য আগে প্রয়োজন জমি বিলি ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্ত্তন ও কৃষি জীবীদের সাহায্য দান।......

......বৃটেন বৎসরে ৪০০ কোটী টাকা ব্যয় করে কৃষি খাতে। আমাদের অন্ততঃ ৫০ কোটী টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন।"

ভেজাল

শ্রীকানাইলাল বসু

১নং গল্প

যাত্রা করিবার সময় হইল।

এতক্ষণ যে ক্রন্দন চাপা ছিল, ছলছল চক্ষু ও ফোঁস ফোঁস নাসার মধ্যে বন্দী ছিল। তাহা এইবার মুখ ফুটিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মা কাঁদিয়া উঠিলেন—'ও গো তুমি কোথা গেলে গো—তোমার এত আদরের নাতুকে একবার দেখে যাও গো···'

পিসিমাও গলা দিলেন—'ও গো দাদা গো, একটিবার এস গো। এমন রাজপুত্তুর ছেলেকে ফেলে কেমন করে চলে গেলে গো···'

বাড়ীর সামনে অনেক লোকের ভিড়। কতক সঙ্গে যাইবে বলিয়া সাজিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। কতক আসিয়াছে দেখা করিতে, এইখান হইতেই লৌকিকতা রক্ষা করিয়া বিদায় লইবে। আর অনেকে আছে নিঃসম্পর্কীয় দর্শক, তাহাদের মধ্যে পাড়াপড়শীও আছে, পথের পথিকও আছে—চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। ভিড়ে রাস্তা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ভিড় ঠেলিয়া পাড়ার মুরুব্বি সেজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত ও কর্মী লোক। পাড়া সুদ্ধ সকলেরই সেজবাবু। সকলের সকল প্রয়োজনেই আছেন। শ্মশানে বা রাজদ্বারে, উৎসবে ও ব্যসনে তাঁহাকে বাদ দিয়া কাহারও চলে না। শবদাহই হোক আর ফুলশয্যাই হোক, সেজবাবুর ব্যবস্থা ফর্দ হাঁকডাক না হইলে কোন কার্যই সুসম্পাদিত হয় না।

সেজবাবু আসিয়াই হাঁকিলেন—'কই হে, তোমরা এখনও বেরোও নি? এখনও সব গুলতুনি করছ এখানে? ছি ছি—'

একজন বলিলেন 'না, এই যে ফুলের মালাগুলো আনতে গিয়েছিল কিনা—'

'এত রাত্তিরে ফুলের মালা আনতে গেছে? কেন, এতক্ষণ কী করছিল সব? দরকার নেই ফুল, বেরিয়ে পড়—'

'আজ্ঞে না, সে এসে গেছে। আমরা রেডি। নাতু নাব্‌লেই হয়, তাহলেই বেরিয়ে পড়ি।'

সেজবাবু কিঞ্চিৎ নরমস্বরে বলিলেন—"হাঁ, আর দেরি করা নয়। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। এই বিষ্টিবাদলার রাত, অনেকখানি পথ। কই, নাতুকে ডাকো না। কী করছে সে? ডাকো ডাকো।"

বলিতে বলিতে অপরের ডাকের অপেক্ষায় না থাকিয়া তিনি নিজেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং উঠানে দাঁড়াইয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ উচ্চতর করিয়া হাঁক পাড়িলেন—'নাতু-উ-উ-নাতু কোথায়? নেমে এস, নেমে এস। আর দেরি করবার সময় নেই। ওখানে কে দাঁড়িয়ে? নেপেনবাবু? নাতুকে নিয়ে নেমে আসুন!'

উপরের বারান্দা হইতে নাতু নামক এবাড়ীর বড় ছেলের মাতুল নৃপেনবাবু জবাব দিলেন—'হাঁ, এই যে, মেয়েরা সব ছাড়ছেন না।' সেজবাবু ধমক দিলেন—"আঃ, মেয়েদের কথা ছেড়ে দিন। মেয়েদের সঙ্গে আপনারাও কি মেয়ে হয়ে গেলেন নাকি? হোপ্‌লেস্!"

নাতু রহিয়াছে মেয়েদের মধ্যে। তাহাকে ও তাহার বিধবা জননীকে ঘেরিয়া পিসি মাসি খুড়ী জেঠীর দল। নৃপেনবাবু অদূরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন—'নাতু, বাবা, আর দেরি কোরো না। চলে এস বাবা।'

কিন্তু চলিয়া আসা অত সহজ নহে। কান্না আর থামে না। মা পিসি তো আছেন, সমবেত মহিলারা সকলেই চোখ মুছিতেছেন, নাক টানিতেছেন। যাঁহারা বলিতে কহিতে পারেন, তাঁহারা বুঝাইতেছেন—"অমন কোরো না, ও নাতুর মা, চুপ করো, চুপ করো।"

"কী করবে বল দিদি, সংসারের নিয়মই এই। তুমি কেঁদে কী করবে বল। ছেড়ে দাও নাতুকে।"

"হ্যাঁ। তোমার নাতু খাঁতু বেঁচে থাক। ওদের নিয়ে সুখী হও মা। কাঁদতে নেই। ভগবানের বিধেন। কেঁদো না মা, কেঁদো না" ইত্যাদি ইত্যাদি।

২নং গল্প

বৃদ্ধ রাধানাথ শান্তভাবে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

ইহা আর একদিনের, আর এক বাড়ীর কথা। এক নং গল্পের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। তবে ইহাও ভেজাল। তাই এক সঙ্গে বিবৃত হইতেছে।

এক গৃহস্থ-বাড়ীর এক কক্ষে গৃহস্বামী বৃদ্ধ রাধানাথ এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মৃদু হাস্যমাখা তাঁহার প্রশান্ত মুখ। সেই কক্ষে এক কিশোরী কন্যার অঙ্গসজ্জার আয়োজন চলিতেছে। সুবাসিত তেল, স্নো, পাউডার, আলতা, ক্রিম ইত্যাদি আসিয়াছে। বড় বোন চুল আঁচড়াইয়া দিল, মেজ বোন মুখে স্নো ঘষিয়া পাউডারের মৃদু প্রলেপ মাখাইয়া দিল, সুন্দর দুইটি নিমীলিত চোখের কোলে অঞ্জনের সূক্ষ্ম রেখা টানিয়া দিল ও দুইটি বঙ্কিম ভ্রূর সংযোগস্থলে অস্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল স্নিগ্ধ রক্তবর্ণের টিপ্ আঁকিয়া দিল। মাসীমা অলক্তরাগে দুই চরণ রাঙ্গাইয়া দিল। বড় বোন কেশচর্য্যা সারিয়া চন্দনের তারকায় ললাট হইতে কপোল অবধি চিত্রিত করিয়া দিল। স্বভাবসুন্দর তরুণ মুখখানি অপার্থিব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

কন্যার সেই নয়নাভিরাম মুখখানি স্নেহকরুণ দৃষ্টিতে নির্নিমেষে দেখিতেছেন রাধুবাবু, তাঁহার মুখে শিশুর মতো অর্থহীন হাসির আভাস।

এমন সময় এক যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"হল তোমাদের? আর দেরী করিসনে সরো, ছেড়ে দে।"

বড় বোন সরোজ বলিল—"এই হয়েছে। খালি কাপড়টা জামাটা পরাবো এইবার। বাবাকে নিয়ে বাইরে যাও সুধীরদা।"

রাধুবাবুর কাছে গিয়া সুধীর বলিল—"আসুন কাকা, আমরা বাইরে যাই এবার।"

"বাইরে? কেন, বাইরে যাব কেন?" সরল অবোধ চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন রাধুবাবু।

সুধীর বলিল—"কাপড় পরাবে কিনা, তাই। আসুন।"

"কাপড় পরাবে? ও, আচ্ছা, আচ্ছা।" আমি যাচ্ছি। অত্যন্ত অনাবশ্যক রকম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন রাধুবাবু। দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, কোন কাপড়টা পরাচ্ছিস সরো?"

সরো বলিল—"এই যে, এই নতুন ফিরোজা রঙের শাড়ীখানা।"

"ফিরোজা? দেখি।"

হাতে লইয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাধুবাবু বলিলেন—"এটা তো ও-ই পছন্দ করে কিনেছিল নারে? তা বেশ, দে, এইটেই পরিয়ে দে।"

কাপড় ফিরাইয়া দিয়া বৃদ্ধ চুপি চুপি সুধীরকে বলিলেন—"দেখেছ সুধীর? মুখখানি দেখেছ? এই মেয়েকে তুমি কালো মেয়ে বলবে?"

উহারা বাহির হইলে মেয়েদের একজন উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া সুধীর কহিল—"আপনি আর এদিকে থেকে কী করবেন কাকা? নীচে আসুন না। নীচে হরিচরণদা এসেছেন, কালু জ্যাঠা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।"

রাধুবাবু মাথা নাড়িয়া কহিলেন—"নাঃ, বড়ো বকায় ওরা। কেবল এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, জ্বর কতো, কাশি কেমন। ও আমার ভালো লাগে না। আমি এইখানেই থাকি।"

"কাকীমার কাছে কে আছে? সেখানে কি—"

"সেখানে আছে, লোক আছে। নতুন নার্সটা আছে। আমি এখানেই থাকি।"

সুধীর নামিয়া গেল। রাধানাথ বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

১নং গল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দুমদাম্ পা ফেলিয়া ভারী শরীর লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেজবাবু উঠিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে তটস্থ হইল। এমন কি রোদনধ্বনিও স্তব্ধ হইয়া গেল। নিতান্ত বৃদ্ধারা ব্যতীত সকলেরই গুরুজন সেজবাবু। তাঁহার রসনাকে ভয় করে না এমন লোক প্রায় নাই পাড়ায়।

সেজবাবু গর্জ্জন করিলেন—"কী মনে করেছ তোমরা

সব শুনি? সমস্ত রাত এমনি কান্নাকাটিই চলবে না কি? হ্যাঁ বৌঠান?"

নাদুর জননী উত্তর দিলেন না, কেবল মাথার কাপড়টা সামান্য টানিয়া দিলেন।

"যত সব মেয়েলি কাণ্ড! দেখদিকি, ছেলেটাকে সুদ্ধু কাঁদাচ্ছ তোমরা। ধন্যি আক্কেল তোমাদের। কাঁদতে পেলেই হোলো, আর কিছু চাও না।"

এক বৃদ্ধা নাক ঝাড়িয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"ওমা, অমন কথা বলিসনে ফটে, কাঁদবে না? এতটুকুটি রেখে বাপ গেলো, সেই নাদু আজ মানুষ হয়েছে। রাজপুত্তুর সেজে বউ আনতে যাচ্ছে, আহা কাঁদবে না? আজ যদি ওর বাবা বেঁচে থাকতো—"

সেজবাবু ধমক দিলেন—"থামো ছোটখুড়ি। তোমাদের কেবল ঐ আছে। সেই বিশ বছরের শোক আজ উথলে উঠলো শুভকর্ম্মের গন্ধ পেয়ে! একটা ছুতো পেলে হয়, অমনি কান্নার পুঁটুলি খুলে বসলে। এই ছুঁড়িগুলো, তোরা হাঁ করে শাঁক হাতে করে দাঁড়িয়ে আছিস যে? বাজাতে জানিস না?"

ভাড়া-করা রাজবেশ-পরিহিত শ্রীমান নাদুকে লইয়া সেজবাবু নীচে চলিলেন। এক সঙ্গে অনেকগুলি শাঁকের ধ্বনি উঠিল।

এবং তাহার মধ্যে সেই বৃদ্ধা বিড় বিড় করিতে লাগিল—"ফটেটার সবই যেন গোঁয়ার্ত্তুমি। আহা কাঁদবে না গা, কী অনাচ্ছিষ্টি কথা।"

২নং গল্প

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৃদ্ধ রাধানাথ হাসিতেছেন।

তাঁহাকে ঘেরিয়া পাড়ার কয়েকটি সহানুভূতিশীল প্রবীণ ব্যক্তি বসিয়া আছে। সুধীরও আছে। রাধানাথ হঠাৎ হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—"দরজাটা বন্ধ করে দাও সুধীর। তোমার কাকীমার কানে গেলে চমকে উঠবেন।"

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সুধীর বলিল—"চুপ করুন কাকা। অমন করে হাসছেন কেন? চুপ করুন।"

রাধানাথ বলিলেন—"হাসবো না? কালুদার কথা শুনেছিস? আমাকে বোঝাচ্ছেন দুঃখ করো না, জন্ম-মৃত্যু সবই ভগবানের হাত, আমাকে বোঝাচ্ছেন। আরে দুঃখুটা আমি করলুম কখন বল? আমি কি জানি নে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মেয়েটা আর দু'বছর পরে গেলে, সে তো যেতোই, মাথা গোঁজা বাড়ীখানাও বিক্রি করিয়ে যেতো। বুদ্ধিমতী মেয়ে, জানে তো বড়দি মেজদির জন্যে বাঁধা পড়েছিল, এবার তার জন্যে বিক্রি করতেই হোতো। তাই চলে গেল আগে হতেই। তার জন্যে দুঃখু করব আমি? পাগল নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ…"

কালুবাবু জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কাকীমার অবস্থাটা আজ কেমন সুধীর? তিনি শুনেছেন নাকি?"

সুধীর বলিল—"অবস্থা সেই একই, আচ্ছন্নভাবে পড়ে আছেন। এক একবার হুঁশ হয়, জিজ্ঞেস করেন খুকি কেমন আছে? মিথ্যে কথা বলা হয়—ভালো আছে। শোনালে এখুনি হয়ে যাবেন, আর না শোনালেও হার্টের যা অবস্থা, উনিও আর বেশি দিন নন।"

"আহা। এমন দুঃসময়ও মানুষের হয়।" কালুবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিবারণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েরা সব কোথায়? কান্না-কাটি করছে খুব?"

কালুবাবু বলিলেন—"আহা, তা আর করবে না, অত বড় বোনটা—"

সুধীর কহিল—"আজ্ঞে না, কাঁদবার কি উপায় আছে? কাকীমার কাছেই তো আছে সব। এতক্ষণ এটাকে সাজিয়ে টাজিয়ে দিচ্ছিল। ওরা ঘেরিয়ে গেলে আমি বল্লুম—চ ও-বাড়ী থেকে, মানে আমাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসবি। তা গেল না। বলে, যতক্ষণ মায়ের কাছে থাকতে পাই। তাদেরই হয়েছে সবচেয়ে বিপদ, কান্না গিলে ফেলে মুখে কাপড় পুরে দিয়ে বসে আছে।"

শ্রোতারা 'আহা' করিয়া উঠিল। হরিচরণ বলিলেন—"উঃ, কী শাস্তি! অত বড়ো মেয়েটা মরে গেল, মায়ের পেটের বোন, তা মুখ ফুটে একবার কাঁদবার জো নেই। ওদিকে মাটা শুষছে, এদিকে বাপটার মাথার ঠিক নেই। ভগবানের যে কী লীলা তা বুঝি না। আহা।"

রাধানাথ বলিলেন—"আহা আহা করছো কেন গো?

দেখেছ বুঝি? আমার খুকীমাকে দেখেছ? যাও, দেখে এস গে ওপোরে গিয়ে। মনে কর কালো মেয়ে বুঝি সুন্দর হয় না। যাও, একবার দেখে এস। বলে কিনা কালো মেয়ে—হাঃ হাঃ হাঃ···"

সুধীর বলিল—'আপনি আবার হাসছেন কাকা? খুকী মরে গেছে, তাকে এই মাত্তর শ্মশানে নিয়ে গেছে, আর আপনি হাসছেন? আপনার খুকী মরে গেছে, বুঝতে পারছেন না?

বুঝিয়াছেন এই ভাবে মাথা নাড়েন রাধানাথ। তাঁহার মুখের বিকৃত হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টায়, তাঁহার চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু আনাইবার উদ্দেশ্যে সুধীর নির্মম হইয়া বার বার শুনাইতেছে—তাঁহার স্নেহের কন্যা মারা গিয়াছে।

কেমন এক রকম ভাবে চাহিয়া শোনেন রাধানাথ, মাথা নাড়েন, কিন্তু মুখের হাসি তাঁহার নিবিতে চায় না।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য ও অশোক

ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)

মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠনের ইতিহাসে অশোকের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে কয়েকটি সিদ্ধান্ত যথা সম্ভব নির্ভুল হওয়া উচিত। কারণ কতকগুলি ভ্রান্ত বা অর্দ্ধ-সত্য ধারণা লইয়া এ ক্ষেত্রে বিচার করিতে অগ্রসর হইলে আমরা আসল তথ্য উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইব। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাহা শুনাইয়াছেন, তাহা হইতে সাধারণতঃ আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি :—

(১) যে বিরাট মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পরিচয় অশোক-অনুশাসন ও অন্যান্য প্রমাণাদিতে পাওয়া যায়, অশোকের পূর্ব্বেই সেই সাম্রাজ্য মোটামুটিভাবে তার চিহ্নিত সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, অশোক শুধু কলিঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন ; ইহা ছাড়া তিনি আর কোন দেশই জয় করেন নাই।

(২) কলিঙ্গদেশ বিজয়ের পর অশোক ধর্ম্ম-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার নিজ জীবনের কর্ম্ম-তালিকা দিবার সময় অশোক যে অর্থে 'ধর্ম্ম বিজয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতেছে তাঁহার প্রচারিত 'ধর্ম্মের' সাফল্য ; ধর্ম্ম বিজয় তাঁহার নিজ জীবনে রাজনীতি-সংজ্ঞাজ্ঞাপক কোন বিশেষ অর্থ বহন করে নাই।

(৩) অশোক যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান তত্ত্ব ছিল—অহিংসানীতি ও অস্ত্র প্রয়োগের অস্বীকৃতি। তিনি সৈন্য-বিভাগ উঠাইয়া দেন নাই, কিন্তু তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর কোন সামরিক উদ্যম ও প্রচেষ্টায় সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। সামরিক বিভাগ দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম অবস্থায় থাকিয়া হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ, অশোকের সামরিক নিস্পৃহতা ও সৈন্যবাহিনীর উপর উক্ত নীতির প্রভাব।

এই সিদ্ধান্তগুলি যে সকল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার কতকগুলি ত্রুটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বাধ্য ; সেই ত্রুটিগুলির প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না ; কারণ অশোককে আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মপ্রচারক বৌদ্ধ সম্রাট্‌রূপে দেখিতেই অভ্যস্ত হইয়াছি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবংবিধ নৃপতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা স্বাভাবিক, এই অবিসংবাদিত সত্য মানিয়া লইয়া অশোককে বিচার করিয়া একদিকে তাঁহাকে যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিবৃন্দের সঙ্গে একাসনে বসাইয়াছি, অন্যদিকে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন-সংশ্লিষ্ট বহু দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনার জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছি। কেহ কেহ অবশ্য তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিয়া এই দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তিতে অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত যে প্রমাণ সাক্ষেপ সেই মৌলিক প্রমাণ পরীক্ষা করিবার বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রচলিত সমস্ত যুক্তির বিচার অসম্ভব, শুধু উপরি উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব। প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এইরূপ :—

অশোকের পূর্ব্বে মৌর্য্য সাম্রাজ্য যে পরিপূর্ণভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন অভ্রান্ত প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোক-অনুশাসনে যে সীমানার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই সীমানা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেই চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, ইহা কিছুটা ঐতিহাসিকের ধারণা মাত্র। বৈদেশিক লেখক বলিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত সারা ভারত জয় করিয়াছিলেন, কিংবা বহু পরবর্ত্তী যুগের লিপিতে বা তামিল সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন কিম্বদন্তীতে দক্ষিণ ভারতে চন্দ্রগুপ্ত বা মৌর্য্যদিগের অধিকার স্থাপনের কথা পাইয়া কিংবা দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে রচিত রুদ্রদমনের গির্ণার অনুশাসনে চন্দ্রগুপ্তের নাম দেখিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছি, তাহার প্রমাণ আমাদের

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, অনুকূল ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে চন্দ্রগুপ্ত কি তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মৌর্য্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি যে, উঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনই নিশ্চয় এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোক তাঁহার অনুশাসনে যে সকল দেশের উল্লেখ করিয়াছেন, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধের কথা জানিতে পারি, সেই সকল দেশের সহিত ঠিক ঐ সম্বন্ধ অশোক-পূর্ব্ব যুগ হইতেই বর্ত্তমান ছিল, না অশোকের রাজত্বকালেই তাহার উদ্ভব হইয়াছিল, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অবশ্য, যখন অশোকের অনুশাসন ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার অনুশাসনে বহু দেশ বিজয়ের কোন প্রত্যক্ষ দাবীর কথা উল্লিখিত হয় নাই, তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধিকাংশই যে অশোক-পূর্ব্ব যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল তাহা সন্দেহ না করিলেও চলিতে পারে। সাধারণভাবে এই ধারণার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু সাম্রাজ্যের যে বিশিষ্ট মূর্ত্তিটির সহিত অশোক-অনুশাসনের মধ্য দিয়া আমাদের পরিচয় ঘটে, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সেই মূর্ত্তিটি কোন্ ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিগূঢ় নিয়মে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে অশোকের কতখানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে অবশ্য বিশ্বাস্য সমসাময়িক প্রমাণের অভাব আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অশোকের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সহিত অন্ধ্রদিগের যে সংযোগ লক্ষ্য করা যায় তাহা কত প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করিবার কি কোন অভ্রান্ত প্রমাণ বাহির হইয়াছে? অশোক ভোজ, রিষ্টিকের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাদের সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মৌর্য্যদিগের সম্বন্ধ অনুরূপ ছিল কি না, তাহাও কি সঠিকভাবে আমাদের জানার উপায় আছে? মহাপদ্ম নন্দ ক্ষত্রিয়দিগকে নির্ম্মূল করিয়া একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, পুরাণোক্ত এই প্রমাণের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া ও কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসনে নন্দ নামের উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ায় আমরা মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধন সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মোট কথা, মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠনের গৌরব শুধু চন্দ্রগুপ্ত বা বিন্দুসার বা এই দুইজনের উপর যুক্তভাবে আরোপ করিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, অশোককে শুধু কলিঙ্গদেশ জয়ীরূপে স্বীকার করিয়া সেই গৌরবের সামান্য একটু অংশ অর্পণ করিতে দ্বিধা করি নাই, কিন্তু মনে হয় তাঁহার প্রাপ্য আরও অনেকটা বেশী।

এইবার আমরা প্রমাণের উল্লেখ করিব :—

প্রথমে অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিখানি আর একবার পড়িয়া দেখিতেছি। এই গিরিলিপি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—(১) প্রথমাংশে কলিঙ্গ যুদ্ধ এবং ঐ যুদ্ধে লোকক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) দ্বিতীয়াংশে ধর্ম্ম-বিজয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত এবং উহার ভৌগলিক সীমানা সূচিত হইয়াছে; (৩) তৃতীয়াংশে অশোক তদীয় পুত্র প্রপৌত্রদিগের উদ্দেশ্যে দেশ-বিজয় সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমাংশ পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারি, কলিঙ্গযুদ্ধের ফলেই কলিঙ্গদেশ অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু একটি কথা অনুধাবন করা প্রয়োজন, ত্রয়োদশ গিরিলিপির কোথাও অশোক বলেন নাই, তিনি কলিঙ্গবিজয়ের পর দেশ জয়ের সংকল্প একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না।

এই কথা অবশ্য সত্য, কলিঙ্গযুদ্ধে যে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, তজ্জন্য অশোক অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—ঐ ক্ষতির শত বা সহস্র ভাগ ক্ষতি ঘটিলেও তিনি তীব্র অনুশোচনা বোধ করিতেন, অর্থাৎ যে যুদ্ধে উক্ত পরিমাণ লোকক্ষয় ও অন্যান্য ক্ষতি হয়, সেই যুদ্ধের প্রতি অশোকের সত্যই বৈরাগ্য আসিয়াছিল। অনুতাপের কারণ শুধু কলিঙ্গ যুদ্ধই নয়, অন্য কারণেও তাঁহার অনুতাপের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কারণটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া প্রয়োজন। কলিঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখের অব্যবহিত পরেই অশোক আটবিক দেশের নাম করিয়াছেন এবং ইহার কথা বলিতে গিয়া তিনি আবার তাঁহার অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায় আটবিক দেশজয় করিতে তাঁহাকে সামরিক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই মতের বিরুদ্ধে কোন যুক্তির অবতারণা করা যায় কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। আটবিক দেশের কথা বলিতে গিয়া অশোক তাহাকে 'বিজিত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ('বিজিতে ভোতি')। উহা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এই ধারণা করিলে অশোকের অনুতাপের কোন কারণ এবং সেই অনুতাপ কলিঙ্গযুদ্ধজনিত অনুতাপের সহিত সমপর্য্যায়ে প্রকাশ করিবার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং 'বিজিতে ভোতি'র অর্থ এইভাবে করিতে হইবে; যাহা বিজিত হইয়াছে, অর্থাৎ অশোক স্বয়ং যাহা বিজয় করিয়াছেন। আটবিক ভূভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অশোক ঐ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ গিরিলিপি যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত ঐ দেশের প্রতিপক্ষতা বা বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই, অশোকের উক্তি হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। তিনি বলিয়াছেন,—ঐ দেশের অধিবাসিগণ যেন তাহাদের ব্যবহারে অনুতপ্ত হয়। তাহা হইলেই তিনি উহাদের ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন করিবেন না; তাহারা যেন হৃদয়ঙ্গম করে অশোক স্বয়ং, অনুতপ্ত হইলেও প্রভাবশীল। মনে হয়, কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তিনি আটবিক দেশের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত যুদ্ধের সহিত কলিঙ্গযুদ্ধের পার্থক্য, এই স্থানে যে, তিনি উহাতে অবারিতভাবে ক্ষতিসাধন করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। তথাপি এই যুদ্ধে যতটুকু ক্ষতি হইয়াছিল তাহার জন্যও মহানুভব সম্রাটের অনুশোচনার উদ্রেক হইয়াছিল। ইহার পর ধর্ম্মবিজয় প্রসঙ্গে যে সকল দেশ বা রাজার

নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে 'অনুতাপ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। কলিঙ্গদেশ বিজয়ের পর ঐ দেশস্থ অপকর্ম্মকারীদিগের প্রতি তাঁহার নীতি কি হইবে তাহা যেমন অল্প কথায় তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তেমনই আটবিকদিগের প্রতি তৎকর্তৃক কি নীতি অবলম্বিত হইবে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। অনুনয়ের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা বিজিত আটবিকদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহারা তাঁহাদের ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করিলেই তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। তাহাদের লজ্জিত হইবার কারণ কি? যদিও ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর অশোক-বচনে পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি এই অনুমান করা যাইতে পারে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দেশ যদি অশোকের স্থায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার উত্তেজনা প্রদর্শন করে, কিংবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আমন্ত্রণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের অনুসৃত নীতি ও কৃতকর্ম্মের প্রশংসা করা চলে না। স্বাধীনতাকামী কলিঙ্গ দেশ ও আটবিক দেশ উভয়েরই দোষ একই শ্রেণীর; শুধু কলিঙ্গ দেশ নয়, আটবিক দেশেও সংগ্রামের দ্বারা অশোক তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্যই কলিঙ্গ ও আটবিক ভূভাগকে একই সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। অশোক একদিকে যেমন তাঁহার অনুতাপের কথা বলিয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহার প্রভাব ও ক্ষমতার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; প্রয়োজন হইলে তিনি অপকারকদিগের নিধন সাধন করিয়া তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, এই উক্তি করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ইহার পর ত্রয়োদশ গিরিলিপির দ্বিতীয় অংশের আরম্ভ। এই অংশে তিনি ধর্ম্মবিজয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, যাহাকে ধর্ম্মবিজয় আখ্যা দেওয়া হয়, সেই ধর্ম্মবিজয়কেই প্রিয়দর্শী শ্রেষ্ঠ বিজয়রূপে গণ্য করিয়া থাকেন, "অয় চ মুখ-মুত বিজয়ে দেবনংপ্রিয়স যো ধ্রমবিজয়ো।" ঠিক এই ঘোষণার আগেই যে কয়টি কথা আছে, অশোকের নীতি অবগত হইবার পক্ষে তাহার চেয়ে মূল্যবান্ কথা আর কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই, এই কথা কয়টি হইল—'ইচ্ছতি হি দেবনংপ্রিয়ো সর্ব-ভুতন অক্ষতি সংযমং সম (চ) রিয়ং রভসিয়ে'। উদ্ধৃত অংশের শেষ শব্দ 'রভসিয়ে' শুধু সাহ্‌বাজগঢ়হিতে প্রাপ্ত ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেই পাওয়া যায়। অন্যত্র এই শব্দের স্থলে 'মাদব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মনিয়র উইলিয়ামস 'রভস' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে গিয়া যে সকল ইংরাজি প্রতিশব্দ দিয়াছেন তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি,—Violent, impetuous, fierce, wild। বিনা বাধায় আমরা অশোক-ব্যবহৃত শব্দটি সংগ্রাম-অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। এই সংগ্রামে বলপ্রয়োগ খুব উগ্র ধরণের হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অশোক বলিতেছেন, সংঘর্ষ ঘটিলেও তিনি অক্ষতি, সংযম ও সমচর্য্যা এই ত্রিবিধ গুণপ্রয়োগেরই পক্ষপাতী। অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিলেও তিনি অহৈতুকভাবে লোকক্ষয় হইতে দিবেন না; এক কথায় সামরিক শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য্য হইলেও তিনি প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নন। এই কথা কয়টিতেই অশোকের ধর্ম্ম বিজয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারি—অশোক কখনও যুদ্ধ করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই। প্রয়োজন হইলে, তিনি যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু মাত্রা অতিক্রম করিবেন না—ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। আমরা যে তিনটি ভাগে ত্রয়োদশ গিরিলিপি বিভক্ত করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটিতে অশোক তাঁহার নিজের নীতি ও ধর্ম্মবিজয়ে সাফল্যেরই আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার যে-বাণী আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নিজকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। উহাতে যে নীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার সাফল্যের উপরই অশোকের ধর্ম্ম বিজয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতেছি না। সেই ধর্ম্ম বিজয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন—পাঁচটি গ্রীক রাজ্যে; দক্ষিণ-ভারতস্থ তামিল রাষ্ট্র চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্রে; তাম্রপর্ণীতে (সিংহল কিংবা দক্ষিণ ভারতে); এবং যোন-কম্বোজ-নভক-নভপংক্তি, ভোজ-পিতিনিক, অন্ধ্র, পালদ প্রভৃতি দেশে। অবশ্য, সর্ব্বত্রই যে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা নাও হইতে পারে; যদি কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ না করিয়াই তাঁহার নীতির প্রতি সম্মান দেখাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা হইলে অশোক নিশ্চয়ই তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন নাই।

তৃতীয় অংশে সম্রাট্ অশোক পুত্র প্রপৌত্র দিগের উদ্দেশ্যে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে বর্ণিত ধর্ম্ম-বিজয়ের নীতির সহিত তাঁহারা প্রদত্ত উপদেশের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে পারি। এই উপদেশের মূল কথা এই হইল যে, তাঁহার নিজবংশীয় পরবর্ত্তী শাসকগণও যেন নূতন বিজয়ের কথা মনে স্থান না দেন,—"কিতি পুত্র পপৌত্র মে অস্থ নবংবিজয়ং ম বিজতবিজ।" যদি সামরিক অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা বিজয়লাভের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্ষান্তি ও লঘুদণ্ডের নীতি যেন তাঁহাদের মনঃপূত হয়। যে বিজয়কে ধর্ম্ম বিজয় বলা হয়, সেই ধর্ম্ম বিজয়ের পথই যেন তাঁহারা অবলম্বন করেন।" অর্থাৎ যে ধর্ম্ম বিজয়ের প্রস্তাব তিনি এই সূত্রে উত্থাপন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্ম বিজয়ে সামরিক শক্তির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্ষান্তি ও লঘুদণ্ডের নীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া চাই, তাহা হইলেই এই প্রকার বিজয় 'ধর্ম্ম বিজয়' নাম গ্রহণ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এই উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন নূতন বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। এই নূতন বিজয়ের অর্থ "নূতন দেশ জয়" না ধরিয়া, ইহা তাঁহার বর্ণিত বিজয়ের পন্থা হইতে কোন স্বতন্ত্র পন্থা সূচিত করিতেছে—এই অর্থ ধরিলেই তাঁহার উক্তির পৌর্ব্বাপর্য্য ও সামঞ্জস্যের সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আসলে তিনি বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নীতি বা পরিকল্পনা বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্ম বিজয়ের পথ ছাড়িয়া তাঁহারা যেন বিজয়ের উদ্দেশ্যে অন্য কোন নীতি সমর্থন বা অবলম্বন না করেন।

দেখা যাইতেছে, মোটামুটিভাবে তিনি নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই একই নীতি তিনি তাঁহার বংশধরদিগকে অনুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম বিজয়ের যে ব্যাখ্যা তাঁহার নিজ জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহা আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তদীয় বংশধরদিগের রাজত্বে সেই ব্যাখ্যাই প্রশস্ত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে একটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। অশোক নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে তৎপ্রবর্ত্তিত 'ধর্ম্ম' প্রচারের ভৌগোলিক গণ্ডীর প্রসারতা সম্পাদনে যে স্বকীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী শাসকগণের কাছে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এই জন্য তাঁহার উপদেশের মধ্যে 'ধর্ম্ম' প্রচারের কোন উল্লেখ নাই। অথচ অশোকের ধর্ম্ম বিজয়ের সহিত তাঁহার 'ধর্ম্ম' প্রচারের সম্বন্ধ এত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, যে ধর্ম্ম বিজয় ও 'ধর্ম্ম' প্রচার একই অর্থ-দ্যোতক বলিয়া ভুল করিলে তাহা অস্বাভাবিক অপরাধ বলিয়া মনে করা চলে না।

অশোকের উপদেশে দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তিনি নিজ জীবনে ধর্ম্ম বিজয়ের যে চক্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সতর্ক থাকার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি যাঁহারা ঐ বিজয়ের নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের কথা ও কার্য্যে আস্থা রক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন ও চিন্তামুক্ত হইতে পারেন তজ্জন্য অশোককে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বের অবসানে যাহাতে তাঁহার নীতি পরিত্যক্ত হইয়া নূতন পরিস্থিতির সঞ্চার না করে, সেই বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক হইতে হইয়াছিল।

এবার আমরা দ্বিতীয় পৃথক গিরিলিপিতে (যে গিরিলিপি শুধু কলিঙ্গস্থিত ধৌলি ও জৌগড়ে পাওয়া গিয়াছে) প্রাপ্ত তথ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যে কলিঙ্গদেশ বিজয় করিতে গিয়া অশোককে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল, সেই কলিঙ্গদেশে স্থিত তাঁহার অধীন রাজপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি এই গিরিলিপি প্রচার করিয়াছিলেন। এই লিপিতে তিনি কলিঙ্গ প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী 'অবিজিত' দেশের অধিবাসীদিগের প্রতি কি নীতি অবলম্বিত হইবে তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল লোক নিশ্চয়ই জানিতে চাহে, তাহাদের সম্বন্ধে অশোকের কি ইচ্ছা—"অংতানং [অ] বিজিতানং কিং ছংদে সু লাজা অফেসুতি।" প্রথমেই পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে, এই সকল ব্যক্তি বা ইহাদের দেশ উক্ত গিরিলিপি প্রণয়নের সময় পর্য্যন্ত অশোক কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। অশোক এইবার উহাদের প্রতি কি নীতি প্রযুক্ত হইবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। কলিঙ্গস্থিত রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে যেন বুঝাইয়া বলেন, তিনি উহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করিতেছেন, তাহাদিগকে কোন দুঃখই দেওয়া হইবে না; তাহারা সুখে অবস্থান করুক, তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে তাহা ক্ষমার যোগ্য হইলে তিনি নিশ্চয়ই উহা ক্ষমা করিবেন। তাহাদিগকে যেন তাঁহার অচল প্রতিজ্ঞা ও ধৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়—"সর্ব্বদেশের" সহিত গভীর সংযোগ স্থাপন করিতে তিনি সংকল্পবদ্ধ হইয়াছেন এবং এই সংকল্প হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হইবেন না। কলিঙ্গের রাজপুরুষগণ ধীর, স্থির রাজনীতির পথ ধরিয়া ক্রমশঃ পার্শ্ববর্ত্তী অবিজিত দেশের অধিবাসীদিগকে আকৃষ্ট করিয়া ইহাদের সহিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, অশোকের আজ্ঞা-পত্রের উদ্দেশ্য তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নয়।" কলিঙ্গ সীমানার বহিঃস্থিত যে অবিজিত অন্তের কথা বলা হইয়াছে সেই অন্ত ও আটবিক দেশ যে এক নয়, তাহার প্রমাণ এই যে আটবিক দেশ অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল, কিন্তু এই অন্ত ছিল 'অবিজিত'।

ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতে জানা যায়, অশোক প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের পক্ষে এই সংবাদটুকু যথেষ্ট; তিনি যে ধর্ম্মবিজয় চক্রের সীমানা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মচক্র গঠন করিতে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার কথিত নীতি অবলম্বন করিয়া পরিমিত-ভাবে সামরিক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে বাধা নাই। কিন্তু ধর্ম্ম বিজয়ী অশোকের আদৌ অস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে কোন্ কোন্ দেশের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন,সাক্ষাৎ প্রমাণাভাবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিবার উপায় নাই। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, তিনি যে দেশে ব্রাহ্মণ-শ্রমণের সাক্ষাৎ মিলিত ও যে দেশে মিলিত না এই দুই দেশের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কলিঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-শ্রমণে ভক্তিমান্ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের প্রভূত ক্ষতি হয়, এজন্য তাঁহার অনুশোচনা তীব্রতর হইয়াছিল। যে দেশে যুদ্ধের ফলে ঐরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না সেই দেশের সহিত ধর্ম্ম বিজয়ের উদ্দেশ্য পরিপূরক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে তাঁহার মানসিক উদ্বেগ যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন এবং তাঁহার যুদ্ধ বিরোধী সংস্কার ক্ষীণতর হইত তাহা বুঝা যাইতেছে। যবন দেশে যে ব্রাহ্মণ শ্রমণ ছিল না তাহাও তিনি—এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, শুধু সাহ্‌বাজ্‌গঢ়িতেই ধর্ম্ম বিজয়ের প্রসঙ্গে তিনি সংযম-মিশ্রিত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অঞ্চলেই যত গোলমাল, ইহারই নিকটবর্ত্তী দেশগুলি গ্রীকদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরিয়ার গ্রীক অধিপতির বিরুদ্ধে পার্থিয়ায় ও ব্যাকট্রিয়াস্থিত গ্রীক শাসকদিগের স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও দেশ হইতে বিপদের আশঙ্কা অশোক অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। প্রয়োজন হইলে তিনি যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, সেই কথা তিনি ঐ অঞ্চলে দৃঢ়কণ্ঠে প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। ঘনায়মান বিপদজাল বেষ্টিত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির নিকটবর্ত্তিতায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছিল, তাহার সহিত তাহার যুদ্ধার্থে প্রস্তুতি ও সংগ্রামের

আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রগুলির সহিত তিনি যে সৌহার্দ্যের কথা বলিয়াছেন, সেই সৌহার্দ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। এই সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই কূটনৈতিক কৌশল কিংবা সামরিক ও অন্যান্য শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বা উভয়েরই পরিচয় দিতে হইয়াছিল। ভারতের অন্তর্গত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সহিত তাঁহার যে ধর্ম্ম বিজয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধ স্থাপনে হয়ত 'সাহবাজগড়ি লিপিতে উল্লিখিত পরিমিত যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয় নাই। মনে হয়, অশোকের সহিত এই রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধ যে বরাবর একই প্রকারের ছিল তাহা নাও হইতে পারে। তাঁহার লিপিগুলিতে চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র এই চারিটি রাষ্ট্রই নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। স্বাধীন গ্রীক রাজ্যগুলির সব কয়টিও যে একই সময়ে তাঁহার সহিত সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয় গিরিলিপিতে মাত্র দুইটি গ্রীক রাজার নাম ও অনির্দ্দিষ্টভাবে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের কথার উল্লেখ আছে, কিন্তু শুধু ত্রয়োদশ গিরিলিপিতেই পাঁচটি রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। অশোকের কর্ম্মবহুল জীবনে বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া অপর রাষ্ট্রগুলির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তা ও উদ্যম যে কখনও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি না। পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সহিত সংযোগ রাখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যগঠনে অশোকের অবদান নিরূপণ করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করিতে হইবে :—

(১) তিনি যুদ্ধের দ্বারা কলিঙ্গ ও আটবিক দেশ জয় করিয়াছিলেন।

(২) তিনি ধর্ম্ম-বিজয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া পাঁচটি গ্রীক রাজ্য ও সম্ভবতঃ সিংহলের সহিত সম্প্রীতিমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শুধু মিশর ও সিরিয়ার সহিত অশোক-পূর্ব্ব মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্বন্ধ তাঁহার রাজত্বকালেই সংঘটিত হয়। তামিল রাষ্ট্রগুলিও দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লিখিত অশোক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত অশোক-পূর্ব্ব মৌর্য্যসাম্রাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় না থাকায় এই ক্ষেত্রে অশোকের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব পরিমাপের উপযোগী মানদণ্ড অবর্ত্তমান। কিন্তু যে ধর্ম্মবিজয় অশোকের কাম্য ছিল, এই সকল দেশের সহিত তাহার পরিপোষক সম্বন্ধের স্থাপন অশোকের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল, আর সেই ধর্ম্মবিজয় স্থাপনে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অশোক কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় মনে হয়, তাঁহার সময় ইহাদের সহিত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের একটা নূতন রকমের ও দৃঢ়তর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার করিলেও অশোকের কৃতিত্বকে খর্ব্ব করা চলে না।

(৩) এই সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া সম্ভবতঃ অশোককে জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার দ্বারা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

(৪) অশোক ভারতস্থিত 'অবিজিত' অন্ত স্বচক্রে আনয়ন করিবার জন্য উৎসুক ও উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার প্রজাবাৎসল্যের কথা, তাঁহার অপরিসীম শক্তির কথা, ইহাদের মধ্যে প্রচার করিয়া ক্রমশঃ ইহাদের মনহরণ করিবার নীতির প্রয়োগে তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

(৫) অশোক বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাইয়াছিলেন। দূতগণ বিদেশে তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিজয়ের প্রসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের কথা উল্লিখিত হওয়ায় সাধারণতঃ ধারণা করা হইয়া থাকে, ধর্ম্মপ্রচারই যেন তাঁহার মুখ্য কাজ ছিল এবং যেখানে সে প্রচার সার্থক হইয়াছে, সেইখানেই যেন শুধু 'ধর্ম্মবিজয়' লব্ধ হইয়াছে। এই ধারণার পক্ষে প্রমাণের অভাব দেখিতেছি। দূতের মুখ্য কাজ ধর্ম্মপ্রচার নয়, তাহা গৌণ ও আনুসঙ্গিক মাত্র হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অশোক যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কেবল ভারতে প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলির সহিতই সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনি ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, আজীবিক, নির্গ্রন্থ—ইঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কোথাও অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর পৃথক উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের সংস্কৃতি রক্ষণে তিনি যে আগ্রহশীল ছিলেন তাহা ত্রয়োদশ গিরিলিপি হইতে জানা যায়। যবনদেশে এই দুই সম্প্রদায় পরিলক্ষিত হইত না, তাহাও তিনি জানিতেন। যে যবন দেশগুলিতে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হইত না, সেই সকল দেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি আকারে প্রচারিত ও কতখানি স্থানকালপাত্রের উপযোগী হইয়াছিল, তাহা সম্যক্‌ভাবে বিচার করিবার সমসাময়িক প্রমাণের অভাব রহিয়াছে। মৌর্য্য রাজত্বকালে বৈদেশিকদের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় বেশ খানিকটা ঘনিষ্ট রকমেরই ছিল। বহু বৈদেশিককে সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে দেখা যাইত এবং তাহাদের স্বার্থসংরক্ষণ এবং সুবিধা সৌকর্য্যের ভার একটি বিশেষ পৌরসমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহাদের ধর্ম্মমতের কোন উল্লেখ অশোক অনুশাসনে দেখি না। সুতরাং অশোক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রসারিত ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই ছিল, অন্যত্র তাহার সার্থকতা খানিকটা সীমাবদ্ধ ছিল, ইহা নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই সকল দেশে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে কথাও তিনি কোথাও বলেন নাই। এজন্য মনে হয় তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যে রাজনৈতিক দিকটা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে,—যুদ্ধের কুফল সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা,—সম্ভবতঃ ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক সম্বন্ধ সুদৃঢ়ীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সহানুভূতিপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের তথ্যই দূতের সাহায্যে বিদেশে প্রচারে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল অশোক মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

এই সময়ে তিনি যেমন বৃহৎ যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তেমনই হয়ত পরিমিতভাবে সাময়িক শক্তির প্রয়োগ করিয়া বা যুক্তিসঙ্গতভাবে ভীতিপ্রদর্শন ও অন্যান্য উপায়ে তাঁহার ক্ষমতার প্রতি বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কগণকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও আনুগত্যশীল করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে কাহারও সাহস হয় নাই। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের যে চিত্র অশোক অনুশাসনে পাওয়া যাইতেছে, সেই চিত্র চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সময়েই প্রায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল ইহা অনেকটা অনুমান মাত্র। ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ কিংবা সাম্রাজ্যের চতুঃসীমানার অন্তর্গত বিশিষ্ট দেশগুলিতে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহার সার্ব্বজনীন মতবাদ গ্রহণে যে আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল—তাহা নিছক রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধকেও সঞ্জীবিত ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল।

ভাঙা-দেউলের দেবতা

শ্রীআশা দেবী এম-এ

(কোনার্ক)

কোথায় কবে যেন ছোট্ট একটু ভালোলাগা মনকে গভীর ভাবে ছুঁয়ে যায়—, সেই বিলীয়মান অনুভূতিটুকু মধুর করে তোলে মানুষের কর্ম্মহীন অবসর মুহূর্ত্ত—কোনার্ক থেকে বহু শত মাইল দূরে বসে আজ আমি সেই কালজয়ী সূর্য্য-সারথি-রথ পরিকল্পনার কথাই ভাবছি।

রাত এগারোটা।—নিশুতি আঁধার ভেদ করে আকাশের বুকে জেগে ছিল নিদ্রাহীন তারাদল নীরব সাক্ষীর মতো ; আর নিচে নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করছিল বঙ্গোপসাগর—সেই আলোহীন জনহীন পথে আমরা চলেছিলাম দুটী গোযানে—পাঁচটী প্রাণী।

উড়িষ্যার নিদ্রালু গ্রামগুলো গোরুর পায়ের শব্দে যেন চমকে উঠছিল। দূরে মর্ম্মরিত নারিকেল বীথি কালো আকাশের বুকে প্রকাণ্ড প্রেতিনীর মতই দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নাম-না-জানা পাখীর কুলায় ; স্বপ্নকাকলীর কলতানের মধ্যে দিয়ে রাত্রের বীণা তার নৈশ-রাগিণী সমাপ্ত করলে—; পথের পাশে পাশে উষর শুভ্র বালিয়াড়ীতে দণ্ডায়মান ঝাউএর শ্রেণী প্রভাতী মিঠে বাতাসে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠলো—; উৎকলের তৃণহীন অঙ্গের মত বালির উপর তরুণ সূর্য্য মুঠি মুঠি সোনা ছড়িয়ে দিলো।

পথের ধারে ভৈরবী রাগিণীতে আলাপ সুরু করলে ছোট বড় পাখীর ঝাঁক। গ্রামের পথে তাম্বুল-রাগরঞ্জিত অধর ও কোমরে বটুয়া সমেত দর্শন দিলেন কলির দ্রৌপদীর বংশধর একটা ছুটী করে। আলো আঁধারের নিরিবিলিতে মধুপদে চলাফেরা করছিল দুটী একটী শৃগালমাতা ;—সঙ্গে দু'একটা পুত্রকন্যাও ছিল। প্রাতরাশের সন্ধানে বৃথায় বালিতে খুঁজে মরছিল লম্বা লম্বা পাওয়ালা পাখীর দল। কাকের দল স্বভাবসিদ্ধ মধুক্ষরা কণ্ঠে বনভূমিকে সচকিত করে তুলছিল—।

প্রভাতী উষ্ণ পানীয়ের জন্য যে আমাদেরও মনটা ছট্‌ফট্ করছিল না তা হলপ করে বলতে পারিনে। কিন্তু উড়িষ্যার বিচক্ষণ গাড়োয়ান জগুয়া আমাদের অন্তরের কথা বাক্যে প্রকাশ করলে ;

চা খাবেন বাবু, চা?—চলুন না আমার বাসায়। খাওয়াও হবে আপনাদের, আমার বলদ দুটোও একটু বিশ্রাম পাবে!

বলা বাহুল্য আমরা মৌন হোয়েই সম্মতি দিলাম—। জগুয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় বলদ দুটোকে গাল দিয়ে বাড়ীর পথ ধরলে।

দুধারে আবার দেখা দিল নূতন শ্যামলতার সমারোহ! ধরিত্রীমাতা এবার মানুষের নিত্য প্রয়োজনের মত প্রসব করেছে শাক, সব্জি, আনাজ তরকারি। ফলের গাছও বাদ পড়েনি—অপ্রয়োজনে ফুলের গাছ ও বাগান আলো করে আছে।

জগুয়ার বাড়ী পৌছুলাম—। গাড়ী দাঁড়াল বাড়ীর একধারে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যহীন হতশ্রী নগ্ন ছেলের দল গাড়ী ঘিরে দাঁড়াল—। দাওরায় সারি দিয়ে দেখতে

লাগলো বুড়োর দল, ঘুলঘুলির রন্ধ্রপথে পর্য্যবেক্ষণরতা অবগুণ্ঠনবতীদেরও চাপা কণ্ঠে কথাবার্ত্তা শোনা গেল।

গাড়ী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক বর্ষীয়সী খেদ প্রকাশ করলে—জগুয়ার স্ত্রী বাড়ী নেই—আমাদের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হবে। কিন্তু ত্রুটি হতে দিলে না জগুয়া। একগাছা বেড়া ভাঙা কঞ্চি নিয়ে সে সামনের স্কুল ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—।

জনা চোদ্দ পনর ছাত্র নিয়ে স্কুল ঘর। মাষ্টারও ছাত্রদের সঙ্গে পাটিতে বসা, কিন্তু তার মেজাজ ভালো নয়; কারণ সামনের উন্মুক্ত অপরিসর বাতায়নপথে তাদের চোদ্দ জোড়া চোখ আমাদের উপর নিবদ্ধ। মাষ্টারের কড়া শাসনও তাদের মনোযোগ পাঠে নিবদ্ধ করাতে পারছিল না—! জগুয়া ঘরে ঢুকেই মাষ্টারের হাতের কঞ্চিটা নিয়ে উনুনে দিলে—। মাষ্টারও লেগে গেল আমাদের পরিচর্য্যায়; ছাত্রেরা বাঁচলো—তাদের ছুটী আজ আমাদের সম্মানার্থে।

সামনের পুকুরের ঘোলা জলে চা তৈরী হোলো অত্যন্ত সমারোহে। সবাই তা খেয়ে প্রত্যূষের ক্লান্তি দূর করলেন—জগুয়াও প্রসাদ পেলো।

কিন্তু আমার যেন খাওয়ায় কোন রুচি নেই। ঐ অপরিষ্কার জল—ঐ ময়লা পাত্র আমার মনের ভেতর এনে দিয়েছিল বিরাগ। গ্রাম্য অশিক্ষিত গাড়োয়ান তার বাড়ী থেকে অভুক্ত মাকে ছেড়ে দিতে চাইলে না। বারবার খাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে—। বারম্বার না করা সত্ত্বেও খাঁটী উত্তপ্ত এক বাটি দুধ এনে সামনে বিনীত মুখে এসে উপস্থিত করলে।

ওর আগ্রহভরা ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে ফেরাতে পারলাম না। পাত্রটা হাতে তুলে নিলাম। মুখে দিতে গিয়ে গিয়ে দাওয়ায় বসা জীর্ণ হাড়গিলের মত ছেলেগুলোর দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো, ওরা আমার দিকেই চেয়েছিল—হয়তো অকারণ কৌতূহল, কিন্তু মনে হলো আমায় বিনা প্রয়োজনে এরা জোর করে খাওয়াচ্ছে, আর ঐ অস্থি-চর্ম্মসার ছেলেগুলোর মধ্যে যে কোন একটীকে আজ হয়তো উপোসী থাকতে হবে।

গাড়ী আবার চলেছে—পিছে পড়ে রইলো গ্রাম;—জনারণ্য—আবাস—চন্দ্রভাগা সবই। অতীত যেন আমাদের আকর্ষণ করছে। আকর্ষণ করছে তার শত সহস্র শতাব্দীর জীর্ণ কঙ্কালসার বাহু দিয়ে!

গোরু দুটো ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে। সুদক্ষ চালক জগুয়া গাড়ীতে বোসেই ঝিমোচ্ছে! সম্মুখে উন্মুক্ত, রোদে পোড়া তামাটে আকাশের গায়ে ফুটে উঠলো সূর্য্য-সারথি রথচূড়ো। সামনে এখনো পথ অনেক পড়ে আছে। চলেছি এগিয়ে, ক্রমে ঝাউএর শ্রেণী আরো নিবিড় হলো। অরণ্য আরো নিস্তব্ধ হলো—নিস্তব্ধতা আরো গভীর হলো। ভগ্ন প্রাচীর প্রাসাদ, প্রস্তর-স্তূপ নিরালা পথের যাত্রীপঞ্চককে টেনে নিয়ে চললো—আজ থেকে হাজার বছর আগেকার বিস্মৃত দেব-দেউলে—।

অতীতের তমসা ভেদ করে সেখানকার অধিবাসীরা যেন এক সঙ্গে জেগে উঠলো কথা কয়ে—পথের পাশে পাশে ঝাউশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে তাদের কলগুঞ্জন যেন ভেসে আসতে লাগলো।

কোন এক নরসিংহদেব হয়তো বা কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য এ সূর্য্য পূজার আয়োজন করেছিলেন; আজ সে ভক্তও নেই, দেবতাও বিদায় নিয়েছে, শুধু পড়ে আছে আয়োজন সম্ভার এই রুক্ষ শুষ্ক প্রান্তরের বনবাসে! কত কিম্বদন্তী না শোনা যায়—এর চূড়ায় নাকি চুম্বক ছিল, সেটা নাকি পর্ত্তুগীজ জাহাজ আকর্ষণ করত—। মাতাল উন্মাদ সমুদ্র নাকি এরই পাশে ছিল নির্জ্জনতার সাথী হয়ে; কিন্তু আজ তা হোয়ে রইলো ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকের চিন্তনীয় বিষয়বস্তু।—আমরা এর মুগ্ধ দ্রষ্টা, আমাদের কাছে এর শিল্পই সত্য, সত্য এই কালজয়ী স্থপতি নিদর্শন!

ডাক বাংলোয় আশ্রয় পেলাম। বাংলোর তত্ত্বাবধায়ক অর্জ্জুন বিনীতমুখে অভ্যর্থনা জানালো এবং কারণে অকারণে তাকে নির্ভয়ে ডাকাডাকি করবার জন্য ব্যাকুল মিনতি জানিয়ে প্রস্থান করলে। চা খাওয়া হলো। স্নান হলো! আহার্য্য প্রস্তুতের ভার অর্জ্জুনই নিলে—। আমাদের এবার দেখবার পালা সুরু হলো!

ইতিহাসের কতগুলো পাতা একসঙ্গে উল্টে গেলাম। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান মোগল বিজয়ের অবসান; পাল ও সেন বংশের রাজত্ব কালের কথা ভাবতে ভাবতে তপ্ত বালুরাশি পার হয়ে রথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত

হলাম। অতীতের হাড় মালা বিরাটের বুকে দুলছে যেন সত্যিই! কি বিশাল সে মন্দির! পথের ধারে রথচ্যুত পাথর অযত্নে আরো ভেঙেছে। কিন্তু কি তার বর্ণ, কি কারু কাজ, চোখ জুড়িয়ে দেয়! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো এর শিল্পীকে। আজ সে সব কারিকর পটুয়া কোথায়! তারা কি এক যোগে সবাই অতীতের সমাধিগর্ভে লীন হলো—! যাদের হস্ত-চিহ্ন উৎকলের প্রতি মন্দিরে দেখা যায়, যাদের হাতের কারু নীলমাধবের মন্দিরেও ভাস্বর হয়ে আছে অভগ্ন অবস্থায়, তারা আজ কোথায়—। আর পুরীর মন্দিরের সে প্রচণ্ডরূপী পাণ্ডাবেশী উড়িয়া কাবুলী-ওয়ালা, এরা কি সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রূপদক্ষদেরই উত্তরাধিকারী এবং উত্তরসাধক?

সবাই দেখতে ছুটেছে—; ছুটেছে এধারে ওধারে। দল ছত্রভঙ্গ—আমি একা, আর সামনে এই বিশাল রথ! হঠাৎ যেন মনে হয় হাজার বছরের অতীত যদি এ মুহূর্তে প্রাণ পায়! ঐ যে নিখুঁত হাতে গড়া রথচক্র, ওরা যদি এই ক্ষণে গতি পেয়ে ওঠে। অরুণ যদি সপ্ত অশ্বের বল্গা টেনে আবার ছুটিয়ে দেয় তার এই বিশাল শিলা-শকট, সমগ্র অরণ্যপথ কাঁপিয়ে যদি এ প্রস্তর রথ চলতে থাকে! কিন্তু অকারণে দৃষ্টি পড়ে সিংহাসন শূন্য, রাজা নেই। রাজা আকাশের মধ্যভাগে নিষ্ঠুর ভাবে দুহাতে মুঠো মুঠো আগুন ছড়াচ্ছে। আপাততঃ তার নেমে আসবার কোন প্রয়োজন নেই।

রথচক্রের কারুকার্য্য, রথ নির্ম্মাণ ও পরিকল্পনা অপূর্ব্ব! রথের সম্মুখ থেকে আরম্ভ করে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত নিখুঁত শিল্প কৌশল। সমগ্র মন্দিরের গায়ে চোখে পড়ে অসংখ্য নগ্ন মিথুন। কিন্তু প্রকৃতির এই নিরাবরণ বুকে, গ্রামের এমন নির্জ্জন একান্তে এরা চোখকে বিব্রত করলেও মনকে বিপর্য্যস্ত করে না। রথের আয়োজন সম্ভারের মধ্যে ভগ্ন হস্তী, গজ, সিংহ, অশ্ব ও নানা আকারের রথ থেকে খসা অংশও চোখে পড়ে। এসব উদ্যোক্তার আয়োজন সম্ভার। আজ তাদের কাজ ফুরিয়েছে, কাজেই তারা পথে পড়ে আছে। যারা এদের দেশ বিদেশ থেকে এনে জড়ো করেছিল তারা আর নেই, কাজেই এদের কদরও নেই। আজ সেই উদ্যোক্তাদের কথাই আমার মনে পড়ছিল—।

একটু দূরে এসে একটী জীর্ণ বেদীর ওপর এসে বসলাম—। নীল আকাশ, আরো নীল ঝাউ শ্রেণীর পটভূমিতে যেন আঁকা এই রক্তাভ সূর্য্যরথ তৃণহীন নীরস মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—; পথে পড়ে আছে অসংখ্য ঝরা ঝাউপাতা ও ফল; চৈতালী বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা এদিক থেকে ওদিক লক্ষ্যহীন ভাবে, আর বিমনা পথিকের পায়ে এঁকে দিচ্ছে আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রক্তের আঁচড়ে—।

এই মুহূর্ত্তে নিজেকে ভারি বিপন্ন, ভারি একা লাগছে—যারা একে গড়েছে তারা নেই—; যারা উদ্যোক্তা তারা নেই, শুধু যেন আমি একা বসে নীরব অতীতের কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছি—কেন হাজার বছরের শিল্পকে আধুনিক চোখে বিচার করছি—কী আমার অধিকার?

ঠিক এমনি মহাধ্বংসের সম্মুখে দাঁড়াবার সৌভাগ্য হোয়েছিল আরো দুবার, নালান্দায়, মৃগদাব সারনাথে—; সে মহাবিহারও এমনি নিস্তব্ধ—এমনি সমাহিত, তবে এর চাইতেও সে আরো জরাগ্রস্ত, আরো পুরাতন! কিন্তু তাদের সঙ্গে এ মন্দিরের একটা মুখ্য পার্থক্য চোখে পড়লো—বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে নিরলস অধ্যয়নের কঠিন সাধনার শুভ্রতার ছাপ; আর এখানে জীবন এবং সাধনা—প্রিয় এবং দেবতা অঙ্গাঙ্গীভূত, একাকার। কাজেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর চুলচেরা দৃষ্টিতে বিচার করলে এখানে হয়তো রুচি বিকার চোখে পড়বে। কিন্তু সেদিন যারা দেবতাকে প্রিয়, আর প্রিয়কে দেবতা বলে জেনেছিল—এ উন্নাসিক শ্লীলতা-বুদ্ধি তাদের ছিল না।

এবার বিদায়ের পালা! হে মহাদ্যুতিমান সূর্য্যদেব, তুমি তো প্রগতি-পথে এগিয়ে চলেছ—, চলেছ তো তোমার সাত-রঙা রামধনু রথ ও সপ্ত অশ্বের বল্গা টেনে—। তুমি তো তোমার প্রাত্যহিক পরিক্রমা শেষ করে পূবে থেকে পশ্চিমের আকাশে ক্লান্ত হোয়ে হেলে পড়লে—। তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে জগৎ এগিয়ে চলেছে। দিন থেকে সপ্তাহ, সপ্তাহ থেকে মাস, মাস থেকে যুগে যুগান্তরে। তোমার পূজারীর অর্ঘ্য তো পড়ে রইলো—। তুমি চলেছ এগিয়ে, কিন্তু তোমার পৃথিবীর এই রথ কেন

অচল ; প্রগতি পথে সে থেমে দাঁড়িয়েছে চিরদিনের মত। কালকে সে অতিক্রম করতে পারলো না যা তুমি পেরেছ ; তোমার ভক্ত আর নেই, কিন্তু তুমি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ কোরো—পৃথিবী কলুষমুক্ত করো।

আবার চলেছি। বাহু বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঝাউ এর শ্রেণী বনমর্ম্মরের সাথে তাল মিলিয়ে বিদায় রাগিণী গাইছে, গোযান চক্রেও তুলেছে করুণ আর্ত্তনাদ—। আমরা পেরিয়ে চলেছি গ্রাম—নগর—বন—মাঠ—

চন্দ্রভাগায় জোয়ার এসেছে—। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মালিন্য মুক্ত আলোতে মাঠ ঘাট ঝলমল করছে দূরে—বহুদূরে দেখা গেল বিলীয়মান সূর্য্যসারথি, চিরস্থির প্রস্তর-রথ—যেন আকাশের বুকে তুলিতে আঁকা কাজলকালো ছবি—।

শব্দপ্রয়োগে অনবধানতা

অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

শব্দের অপপ্রয়োগের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। কয়েকটি চলিত পদের অর্থবিচার প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা করিব।

আঙ্গিক

আঙ্গিক শব্দ techniqueএর প্রতিশব্দরূপে বাংলায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অঙ্গের সহিত techniqueএর কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যুত আঙ্গিকের ভিন্ন এক অর্থ সুপ্রসিদ্ধ। নাট্যশাস্ত্রে চারিপ্রকার অভিনয়ের নাম পাওয়া যায়—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিলে তাহা হয় আঙ্গিক অভিনয়।

টেক্‌নিক অর্থে স্থলবিশেষে কৌশল, কলাকৌশল, প্রয়োগকৌশল এবং সাধারণভাবে 'প্রযুক্তি' চলিতে পারে। তাহা হইলে Technologyর বাংলা হইবে 'প্রযুক্তিবিদ্যা', technologistএর নাম হইবে 'প্রাযুক্তিক' বা 'প্রযুক্তিবিৎ'।

প্র-পূর্বক যুজ্‌ ধাতু হইতে প্রযুক্তি পদ সিদ্ধ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে বিশিষ্ট কৌশল বা শিল্পজ্ঞান বুঝাইবার জন্য যুজ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন 'যোগ' ও 'যুক্তি' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। গীতায় কর্মের কৌশলকে যোগ বলা হইয়াছে—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। বাৎস্যায়নসূত্রে চতুঃষষ্টি কলাবিজ্ঞান যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে—যেমন 'কেশশেখরাপীড়-যোগ'। 'যুক্তিকল্পতরু'-নামক গ্রন্থে বাস্তুযুক্তি, আসনযুক্তি, ছত্রযুক্তি, ধ্বজযুক্তি, যানযুক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে নানাপ্রকার শিল্পযুক্তির আলোচনা আছে। কিন্তু যোগ ও যুক্তি বাংলায় ভিন্ন অর্থে প্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রযুক্তি হইবে techniqueএর উপযুক্ত প্রতিশব্দ।

Technical শব্দের অনুবাদে প্রকরণভেদে বিভিন্নরূপ প্রকাশভঙ্গী আবশ্যক হইবে—যেমন technical knowledge—বিশেষজ্ঞান ; technical treatise—লাক্ষণিক গ্রন্থ ; technical defect—নামতঃ ত্রুটি, শব্দপরক ত্রুটি ; technical discussion—বিশেষ-ধর্মিক আলোচনা কিংবা কূট, সূক্ষ্ম বা লাক্ষণিক আলোচনা।

আবহ-সঙ্গীত

আবহ-সঙ্গীত পদটি background musicএর পরিবর্তে অল্পদিন ব্যবহৃত হইতেছে। চলচ্চিত্রে বীর, করুণ, হাস্য, মধুর যখন যে রসের অভিনয় হয়, তাহার সঙ্গে রসানুকূল যন্ত্রসঙ্গীত চলিতে থাকে। ইহাই background music। অনুকূল ভাব বহন করিয়া আনে বলিয়া আবহসঙ্গীত নামকরণ হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু এস্থলে প্রসঙ্গবাদ্য, প্রসঙ্গসঙ্গীত, অনুগসঙ্গীত, অনুগুণবাদ্য, সংবাদী-সঙ্গীত প্রকৃত ভাবপ্রকাশে যোগ্যতর শব্দ।

আবহ পদ সংযুক্তবর্ণরহিত এবং স্বল্পাক্ষর, সুতরাং প্রয়োগের পক্ষে লোভনীয়। শুনিয়াছি—এক সময়ে তিনজন বিজ্ঞানী পণ্ডিত স্বতন্ত্রভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনজনের মধ্যে যে ব্যক্তির নাম সুখোচ্চার্য ছিল, তাঁহার নামে আবিষ্কৃত তথ্যটির নাম-করণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আবহ সুশ্রব বলিয়াই উহার অপব্যবহার অনুচিত।

ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে আকাশের বিভিন্ন বায়ুস্তরের সাতটি নাম পাওয়া যায়। প্রথম স্তরের বায়ুর নাম 'আবহ'। তদনুসারে পৃথিবীর atmospheric regionএর নাম হইবে 'আবহমণ্ডল'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিভাষাসমিতি' Meteorologyর (=the study of the earth's atmosphere in relation to weather and climate) নাম দিয়াছেন 'আবহবিদ্যা'। সংজ্ঞাটি সুনির্বাচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

উপাধ্যক্ষ

উপাধ্যক্ষ পদ Vice-Chancellorএর প্রতিশব্দরূপে বেশ চলিয়া গিয়াছে। সরকারী পরিভাষায় Deputy Magistrateকে উপশাসক নাম দেওয়ায় যাঁহারা উপপতির কথা তুলিয়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাঁহারাও Vice Chancellorকে উপাধ্যক্ষ বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। শব্দটি শুদ্ধ। কিন্তু কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালকে অধ্যক্ষ বলিলে ভাইস্-চ্যান্‌সেলরের উপাধ্যক্ষ নাম বড়ই বিসদৃশ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাইস্ প্রিন্‌সিপ্যালকে উপাধ্যক্ষ বলা সমীচীন। ভাইস্-চ্যান্‌সেলরের জন্য একটি যোগ্য সংজ্ঞা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

ভাইস্ চ্যান্‌সেলরের উপর ইউনিভার্সিটির পালনকর্ম ন্যস্ত থাকে।

অনুসারে তাঁহাকে 'বিদ্যাপাল' বলা অসংগত নয়। বিদ্যাপালের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দগত সাহচর্য ভালই চলিবে। পাল-শব্দের গুণ এই যে, উচ্চ নীচ সকল পদে ইহার প্রয়োগ থাটে। দেশপাল, দ্বারপাল, নরপাল, পশুপাল—সর্বত্র 'পাল' তাহার পদানুযায়ী মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলে। ভাইস্ চ্যান্সেলর 'বিদ্যাপাল' হইলে চ্যান্সেলর 'বিদ্যাধিপাল' হইতে পারিবেন। সম্ভত প্রয়োগের ক্ষেত্রে হয়তো কালক্রমে ইঁহারা কেবল 'পাল' ও অধিপালে পরিণত হইবেন।

Vice Chancellor বা Chancellorএর মূল অর্থের সঙ্গে বিদ্যার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং উঁহাদের অনুবাদেও 'বিদ্যা' পদ বাদ দিয়া শুদ্ধ অধিপাল, মহাধিপাল কিংবা অধিপ মহাধিপ বলা যায়। তাহা হইলে ভাইস্ চ্যান্সেলর হইবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিপাল বা অধিপ, চ্যান্সেলর হইবেন মহাধিপাল বা মহাধিপ। ভাইস্ চ্যান্সেলরকে কোন ক্রমেই উপাধ্যক্ষ বলা উচিত নয়।

জাতীয়করণ

জাতীয়করণ শব্দ সংবাদপত্রে nationalisationএর অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনও শিল্প ব্যবসায় বা সম্পত্তি যখন ব্যক্তি বা সংঘবিশেষের হাত হইতে রাষ্ট্রের অধিকারে আসে, তখন তাহার nationalisation হইল বলা হয়। ঐ অর্থে 'জাতীয়করণ' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রসাৎ-করণ' ভাল কথা। রাষ্ট্রসাৎ পদের অর্থ 'রাষ্ট্রায়ত্ত'। এরূপ স্থলে 'তদধীন' অর্থে সাতি প্রত্যয় হইয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে একাধিক অর্থে সাতি প্রত্যয় হইতে পারে—যেমন অগ্নিসাৎ (অগ্নিময়) গৃহ, ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) পুস্তক, রাজসাৎ (রাজায়ত্ত) দেশ, পাত্রসাৎ (পাত্রাধীন) কন্যা। বাংলায় আত্মসাৎ, উদরসাৎ প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সমস্ত সাতি-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ঐরূপ দুশ্চেষ্টাবোধক হইবে। চৈতন্য ভাগবতে আছে—

দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।
শেষ খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ॥

এস্থলে 'কৃষ্ণসাৎ' অর্থ কৃষ্ণাধীন। রাষ্ট্রসাৎ শব্দের অর্থও হইবে রাষ্ট্রাধীন। তাহা হইলে nationalisationএর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এইরূপ বলিতে পারিব—"ভারত সরকার কয়লা ও কৌশশিল্পকে রাষ্ট্রসাৎ করার কথা ভাবিতেছেন।" "ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিকোষ Reserve Bank 'সংবিধান সভার' বিধানে রাষ্ট্রসাৎ হইয়া গেল।" জাতীয়করণের পরিবর্তে 'রাষ্ট্রস্বীকরণ'ও চলিতে পারে। রাষ্ট্রস্বীকরণ শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে রাষ্ট্রের স্ব (=সম্পত্তি) ছিল না, তাহাকে রাষ্ট্রের স্ব করা। প্রচলিত জাতীয়করণ অপেক্ষা প্রস্তাবিত শব্দ দুইটির অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশে সামর্থ্য অধিক। 'রাষ্ট্রীয়করণ' শব্দও জাতীয়করণ অপেক্ষা ভাল।

পূর্তবিভাগ

পূর্তবিভাগ বহুদিন যাবৎ Water Works, Public Works এবং Engineering Departmentএর প্রতিশব্দরূপে চলিতেছে। প্রাচীনকালে ধর্মার্থী গৃহস্থগণ 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত' কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্যার্জন করিতেন। ইষ্ট শব্দে কূপাদিখনন, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান, আর উদ্যানরচনা বুঝাইত। গ্রহণ, সংক্রান্তি, দ্বাদশী উপলক্ষে দানও পূর্তকর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। পুষ্করিণীখননের সহিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অন্নদান, অর্থদান এ সকলও পূর্তের মধ্যে পড়ে। পূর্ত একেবারেই প্রাতিজনিক ধর্মকার্য। সুতরাং সার্বজনিক Water worksএর অনুবাদে শব্দটি শোভন হইয়াছে বলা চলে না। বিশেষতঃ Public Works বা Engineering অর্থে পূর্ত শব্দের প্রয়োগ নিতান্তই অসংগত। ঐ অর্থে 'বাস্তু' পদ অধিক উপযোগী হইবে।

বাস্তু শব্দে কেবল বাসভূমিই বুঝায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'বাস্তুকম্' নাম দিয়া তিনটি অধ্যায় (৩।৮-১০) আছে। তাহাতে দেখা যায়—গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান, সেতু, তড়াগ, আধার এ সকল বাস্তু। জলনির্গম-পথ, মলমূত্রের স্থান, পথের সংক্রম প্রভৃতিও উক্ত তিন অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বাস্তুবিদ্যার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মানসার' (৩য় অধ্যায়) অনুসারে ভূমি, প্রাসাদ, মণ্ডপ, সভা, শালা, প্রপা, রঙ্গ, শিবিকা, রথ, মঞ্চ, আসন প্রভৃতি বাস্তুর অন্তর্গত।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীপ্রসন্নকুমার আচার্য তাঁহার *Dictionary of Hindu Architecture* গ্রন্থে (৫৪৮ পৃঃ) বাস্তুকর্ম পদের বিবরণ দিয়াছেন এইরূপ—

"Vastukarman—The building work; the actual work of constructing temples, palaces, houses, villages, towns, forts, tanks, canals, roads, bridges, gates, drains, moats, sewers, thrones, couches, bedsteads, conveyances, ornaments and dresses, images of gods and sages."

এই বিবরণ অনুসারে বাস্তুকর্ম হইবে প্রকৃত Public Works, পূর্তকর্ম নয়।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নবরচিত সরকারী পরিভাষায় Civil Engineerকে 'বাস্তুকার, বাস্তুবিৎ' নাম দেওয়ায় কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন।

কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রস্তাব করিয়াছেন এইরূপ (শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫)—

"বিশ্বকর্মা শব্দের অন্তস্থ কর্ম শব্দটির ভিতর Engineering বিভাগের প্রাণ লুকায়িত।…ইঞ্জিনীয়ার গোত্রীয় মানব মুখ্যত কর্ম লইয়া চিরজীবন ব্যস্ত থাকেন।…বিশ্বকর্মার ন্যায় তাঁহারা সকলেই 'কর্মা', কেহ 'যন্ত্রকর্মা', কেহ 'স্বাস্থ্যকর্মা', কেহ 'পূর্তকর্মা'…। 'কর্মা' শব্দটি যদি লঘু বিবেচিত হয়, তবে 'কর্মবিৎ' শব্দটি গ্রহণ করা যাইতে পারে।…তাহা হইলে পরিভাষা এইরূপ দাঁড়ায়—

Building Engineer বাস্তুকর্মা, বাস্তুকর্মবিৎ
Mechanical Engineer যন্ত্রকর্মা, যন্ত্রকর্মবিৎ
Naval Engineer নৌকর্মা, নৌকর্মবিৎ

Chief Engineer মুখ্যকর্মা, মুখ্যকর্মবিৎ

College of Engineering কর্মবিস্তায়তন

Engineering Service কর্মকৃত্যক" ইত্যাদি।

Engineering শব্দ সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আলোচনা করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৫)। তাঁহার বক্তব্য এই যে, Engineer প্রধানতঃ নির্মাণ কার্যে অভিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে 'নির্মাণবিৎ' বলা সমীচীন।

সুচিন্তিত প্রস্তাব, সহায়ক পরামর্শ উপেক্ষণীয় নয়। সরকারী 'পরিভাষাসংসদ্' অবশ্য এসকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন। Engineerএর জন্য অল্পাক্ষরে 'নির্মাণী' শব্দ চলে কিনা তাহাও বিবেচনার যোগ্য। 'নির্মাণী' সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানী ও রসায়নীর সমগোষ্ঠীরূপে ভাষায় স্থান করিয়া লইবে। বিভিন্ন প্রকারের Engineerকে বাস্তুনির্মাণী, যন্ত্রনির্মাণী, নৌনির্মাণী, মুখ্যনির্মাণী প্রভৃতি নাম দেওয়া চলিবে। Engineering হইবে 'নির্মাণবিদ্যা', Engineering Service হইবে 'নির্মাণকৃত্যক' আর College of Engineering and Technologyর বাংলা নাম হইবে 'নৈর্মাণিক ও প্রাযুক্তিক মহাবিদ্যালয়'।

সর্বজনীন ও সার্বজনীন

সর্বজনীন সার্বজনীন এই দুইটি পদ সাধারণের অনুষ্ঠেয় পূজা-পার্বণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ দুর্গোৎসবের সময় সর্বজনীন সার্বজনীন দুই প্রকারের লেখাই পথে ঘাটে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয় পদই সুন্দর, কিন্তু উভয়ের অর্থ ভিন্ন।

'তস্মৈ হিতম্' অর্থে সর্বজন শব্দের উত্তর খ (=ঈন) প্রত্যয়ে সর্বজনীন পদ সিদ্ধ হয়। উহার অর্থ 'সর্বজনের হিতকর'। যে ধর্মানুষ্ঠান সাধারণের চাঁদায় সর্বজনের হিতার্থে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সর্বজনীন আখ্যা সংগত। জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র, আপন্নাশ্রয় প্রভৃতিও অবশ্যই সর্বজনীন। খ প্রত্যয়যোগে বৃদ্ধি হয় না সুতরাং সর্বশব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি (সার্ব) হয় নাই।

'তত্র সাধুঃ' অর্থে সর্বজন শব্দ খঞ্ (=ঈন) প্রত্যয়ে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। এস্থলে প্রত্যয়স্থ ঞ্-যোগে সর্বপদে বৃদ্ধি হইয়াছে সার্বজনীন শব্দের অর্থ 'সর্বজনের মধ্যে যোগ্য বা প্রবীণ'। সুতরাং দুর্গোৎসবকে সার্বজনীন বলা যায় না। যদি বলি—'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সার্বজনীন নেতা ছিলেন' তাহা হইলে সার্বজনীন শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয়। অর্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া শব্দ দুইটিকে যথাযথ প্রয়োগ করা কঠিন নয়। সর্বজনীন অর্থ সকলের হিতকর, আর সার্বজনীন অর্থ—সকলের মান্য।

ব্যপদেশ

ব্যপদেশ শব্দ উপলক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ ছল। রামচন্দ্র জানকীর ইচ্ছাপূরণ ব্যপদেশে তাঁহাকে বনে পাঠাইয়াছিলেন এরূপ বাক্য শুদ্ধ। কিন্তু দুষ্মন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে বনে যাইয়া শকুন্তলা লাভ করেন এরূপ বলিলে ভুল হইবে। সীতা অরণ্য দর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, অরণ্য দেখাইবার ছলে তাঁহাকে নির্বাসন দেওয়া হয়—ইহা রামায়ণের কথা। কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে আছে—দুষ্মন্ত মৃগয়া উপলক্ষে শকুন্তলার আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন, মৃগয়ার ছলে নয়। ছল, উক্তি, নাম, বংশ, কুলবোধক পদবী এই সকল অর্থে ব্যপদেশ শব্দের ব্যবহার আছে, উপলক্ষ অর্থ প্রামাণিক অভিধানে পাওয়া যায় না, প্রাচীন প্রয়োগেও দেখা যায় না। বণিজ্যব্যপদেশ, উৎকণ্ঠাব্যপদেশ, রোগব্যপদেশ, শিরঃশূলব্যপদেশ, বন্ধুদিদৃক্ষাব্যপদেশ প্রভৃতি প্রয়োগ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সর্বত্রই ব্যপদেশের অর্থ ছল। উপলক্ষ অর্থে শব্দটির ব্যবহার স্পষ্টই ভ্রান্তিমূলক।

আলোচিত আঙ্গিক, আবহ, ব্যপদেশ, সার্বজনীন সবই তৎসম শব্দ। প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োগের অভাব নাই, অনুসন্ধান করিলেই অর্থ জানা যায়। সুন্দর ও সুষম শব্দ স্বভাবতঃই লেখককে প্রলুব্ধ করে, অনবধান হইলে স্খলনের আশঙ্কা আছে। লেখকের পথ সংকটময়। তাঁহার মুহূর্তের ত্রুটি ভাষায় চিরন্তন অনর্থের সৃষ্টি করে। সাধারণের গুণাগুণ বিচার করিবার প্রবৃত্তিও নাই, অবসরও নাই। হাতের কাছে শব্দ পাইলেই তাঁহারা নিঃসংশয়ে চালাইয়া যান। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৬ মাঘ, ১৩৫০) লিখিয়াছিলেন—

"লেখকরা যদি নিরঙ্কুশ হন এবং তাঁদের ভুল বারংবার ছাপার অক্ষরে দেখা দেয়, তবে তা সংক্রামক রোগের মত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ;"

কথা সত্য। বাংলা ভাষায় দিন দিন অপপ্রয়োগ বাড়িয়া চলিয়াছে। অনুচিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াও বহু শব্দ চলিত পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছে। অবদান, অভ্যর্থনা, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দের কথা পূর্বে বলিয়াছি। বিদ্বান ও খ্যাতিমান লেখকগণও এ সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বরেন না।

বাংলা জীবন্ত ভাষা, সুতরাং সর্বত্র ব্যাকরণের শাসন বা অভিধানের নির্দেশ মানিয়া চলিবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু কোন প্রয়োগটি একান্তই লেখকের অনবধানতার ফল, আর কোন প্রয়োগের মূলে ভাষার প্রাণধর্মের প্রেরণা আছে, তাহা চিন্তার বিষয়। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা বঙ্গভাষার যোগক্ষেমবহনের গুরু দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সেই সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ শব্দের নির্মাণ ও যোজনকালে অবহিত হইবেন।

এতক্ষণ বিশেষধর্মিক শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সাধারণ ইংরেজী শব্দের অনুবাদেও বড় অনিয়ম চলিতেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

সেদিন চোখে পড়িল—একখানি মাসিক পত্রে অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত খেলোয়াড় ব্র্যাড্‌মান 'ক্রিকেটদানব'রূপে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। এখানে giantএর অনুবাদে 'দানব' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় কল্পনায় 'দানব' দুর্বৃত্তগন্ধী। এরূপ স্থলে ক্রিকেটবীর, ক্রিকেটশূর বা ক্রিকেটবিশারদ বলা সংগত।

আর একখানি সাময়িক পত্রে এক বিদেশী গল্পের অনুবাদে অনুবাদক লিখিয়াছেন—"যে বিষয় হৃষ্টমনে উপেক্ষা করা উচিত, পৃথিবী মানুষকে তারই বিজ্ঞপ্তি নিতে বাধ্য করে।" বিজ্ঞপ্তি অবশ্য notice শব্দের অনুবাদ। অভিধানে notice এর এক অর্থ আছে বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন—তাহা সকলে জানেন। কিন্তু "তারই বিজ্ঞপ্তি নিতে" স্থলে লেখা উচিত ছিল 'তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে' 'তাতে মনোযোগ দিতে' কিংবা 'সে দিকে দৃষ্টি দিতে'।

আজকাল কলিকাতার পথে পথে 'বিভাগীয় বিপণি' খোলা হইতেছে। এই নবরচিত শব্দটি departmental store এর অনুবাদ। কিন্তু বাংলায় বিভাগীয় বলিলে বিভাগ সম্বন্ধীয় অর্থ আসে। বিভাগীয় অপেক্ষা 'বিভাজিত' শব্দ প্রকৃত অর্থ প্রকাশে অধিক উপযোগী।

অভিধান হইতে নির্বিচারে শব্দ চয়ন করিলে পদে পদে বিপত্তির সম্ভাবনা আছে, উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ।

ভারত-তীর্থ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমরা আজ স্বাধীন দেশের অধিবাসী! কিন্তু এই স্বাধীনতা অধিকার ক'র্‌বার জন্য দেশের যে বলীয়ান্ সন্তানেরা একদিন "মুক্তি অথবা মৃত্যু"-পণ গ্রহণ ক'রেছিল, তাদের কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

উপল-কঠিন নির্ম্মম পথে সুরু হ'য়েছিল তা'দের দুরন্ত অভিযান; পশ্চাতে ফেলে এসেছিল তা'রা ছন্দোময় জীবনের গীতি-ঝঙ্কার। সম্মুখে ছিল—তা'দের মৃত্যুর ইঙ্গিতময় আহ্বান-ভেরী। স্বপ্নালস জীবনের জড়িমা ত্যাগ ক'রে শঙ্কাভয়হীন চিত্তে তা'রা দলে দলে এগিয়ে চ'লেছিল সেই মৃত্যু-ভয়ঙ্কর পথে! মহাত্মাজীর অভয়-শঙ্খ-নিনাদে মূর্চ্ছাপন্ন ভারত মোহনিদ্রা হ'তে জেগে উঠ্‌ল—অপূর্ব্ব ত্যাগের দীপ্ত মহিমায় মুগ্ধ নিখিল বিশ্ব সেই মহামানবের বন্দনা-গানে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আত্মাহুতির সেই অলৌকিক দৃশ্যে পূর্ব্বগগনে ফুটে উঠেছিল নবারুণ-রাগের রক্তিম আলিম্পন, যুগান্তরের তমিস্রা ভেদ ক'রে—!

যুগান্তরের তমিস্রা ছেদি', ছোঁয়ায়ে তরল সোনা,
পূর্ব্বগগনে নবারুণ রাগে আঁকি' দিল আলিপনা;
অরুণ আভাসে সুপ্তি ত্যজিয়া উঠিল নিখিল নর—
নহে নবারুণ, মহামানবেরে বন্দিল চরাচর।
মূর্চ্ছা-মগন ছিল এ ভারত, ছিল এ বঙ্গভূমি,
ফুকারি' তোমার অভয় শঙ্খ জাগায়ে দিয়েছো তুমি!
তরুণ ভারত পেয়েছে শক্তি, পেয়েছে অমর প্রাণ,
শুনেছে সকলে অন্তর মাঝে, তোমার বজ্র গান।

অমৃত পুত্র, রক্ত-তিলক ঝলকিছে তব ভালে,
জাগো রে নূতন, পুণ্যতীর্থে শুভ প্রত্যুষকালে!
"মৃত্যু অথবা মুক্তি" সকলে শুধু এই কর পণ,
সুচির নিদ্রা অথবা তোমার অনন্ত জাগরণ!
গিরি-কান্তার সঘনে কাঁপিল, কাঁপিল সাগর জল,
দিকে দিকে ওঠে হোমানল শিখা, বুকের বজ্রানল;
সুপ্তি-জড়িমা নিমেষে টুটিল, উঠিল দৃপ্ত তেজে,
চরণে বাজিছে শৃঙ্খল তবু বুকে হাসি ওঠে বেজে!
নিদ্রা-অলস নেত্র মেলিয়া, চমকিয়া ওঠে সবে,
পূর্ব্বগগনে রক্ত লেখায় ডাকিছে মহোৎসবে।
আহ্বান-ভেরী গরজে সঘন—জাগে জীবনের গান;—
ঘুমাবে সে কি?—না—দিবে প্রাণাহুতি কণ্টক অভিযান!
দলে দলে চলে ভক্ত পথিক—না জানে শঙ্কা ভয়;
সত্যের লাগি' এ কারাবরণ, মৃত্যুর পরাজয়।
উপল-কঠিন নির্ম্মম পথে সুরু হ'ল অভিযান;—
পশ্চাতে কাঁদে জীবনের গীতি, সুমুখে মরণ-গান!

অনাগত দিবসের বৈভবে উন্মুখ, আর অতীতের মহিমায় মগ্ন তা'দের স্বপ্ন ছিল সততায় রঞ্জিত। মৃত্যুকে যা'রা তুচ্ছ ক'রেছিল, সেই শহীদগণের জাগরণ-মন্ত্র সর্ব্বহারার গণতন্ত্র রচনা ক'রে মর্ম্মহারার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল সুগভীর সান্ত্বনা। নেতাজীর "জয়হিন্দ" ডঙ্কা মৃত্যুপথযাত্রীর রক্ত-প্রবাহের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল অগ্নির উদ্দীপনা—ঐ জাগে নব-যুগ-সূর্য্য—ঐ শোনো স্বাধীনতার তূর্য্য-

নিনাদ! ফাঁসির মঞ্চে উৎসর্গ-করা শত শত প্রাণ, যারা মুক্ত ক'রেছে চরণের শৃঙ্খল—ইতিহাসের পাতায় রক্ত-পাগল করা ছন্দে লেখা তা'দের বন্দনা-গীতি শ্রবণ কর।

কত শত প্রাণ দিল ফাঁসীর মঞ্চে যা'রা
ইতিহাস তাহাদের বন্দে—
ভেসে আসে দিগন্তে সেই গীতি-ঝঙ্কার—
রক্ত-পাগল-করা ছন্দে
রচিয়াছে শহীদের চির-নিদ্রার বেদী
তৃষার্ত ধরণীর বক্ষে—
ঘনায়ে উঠিল তাই পুঞ্জিত ব্যথা যত
অন্ধ সে কারাগার-কক্ষে!
মরণের বেদীমূলে ঝরে যায় আঁখিজল
শুব্ধ কাকলী মৃদু মন্দ,
চকিতে থামিয়া যায় বিহগের কলতান,
বিরহীর মরমিয়া ছন্দ।
স্বপ্ন তাদের ছিল সততায় রঞ্জিত,
উচ্ছল অন্তর-লগ্ন,
অনাগত দিবসে বৈভবে উন্মুখ
অতীতের মহিমায় মগ্ন!
মুক্ত ক'রেছে যা'রা চরণের শৃঙ্খল
আনিয়াছে জাগরণ-মন্ত্র—
মর্ম্মহারার বুকে সুগভীর সান্ত্বনা—
সর্ব্বহারার গণতন্ত্র!
বিশ্ব কাঁপায়ে জাগে সেই মহাসঙ্গীত
দীর্ণ দলিত ভয় শঙ্কা—
মৃত্যু পথের জয়-যাত্রীর রক্তে
নেতাজীর "জয়হিন্দ্" ডঙ্কা!

ঐ জাগে নব যুগ সূর্য্য—
আকাশ বাতাস আর উছলিয়া ক্ষিতি জল,
মন্দ্রিত স্বাধীনতা-তূর্য্য!

তিমির-রাত্রির অবসানে আজ গৌরবময় প্রভাতের অভিসূচনা! আকাশ, ধরণী, সাগরের জল আজ রঙীণ উষার রক্ত-রাঙা ফাগে রঞ্জিত। উপনিষদের সেই অমৃতময়ী বাণী "তমসো মা জ্যোতির্গময়" আজ ভারতবর্ষ সফল ক'রেছে—তমসা থেকে জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ ক'রে।

হে আলোক! হে দুঃখ-তিমির-বিনাশিনী আনন্দ-রূপিণী প্রভা! আজ আমরা তোমার উপাসনা করি। তোমার পবিত্র অংশুধারায় স্নাত হ'য়ে পাপ আজ পুণ্যে রূপান্তরিত হোক—অবসাদ রূপান্তরিত হোক্ উৎসাহে। উচ্ছল জীবনের উদ্দীপনা-দৃপ্ত গানের মধ্য দিয়ে অভিযান সুরু হোক্ নূতনের! আজ ভারতের উদয়-শিখরে অপরূপ রূপরাগে নবারুণ আভা জাগ্রত!

অপরূপ রূপরাগে
ভারতের রবি জাগে;
উদয় শিখরে নবারুণ আভা
ধরণীর বুকে লাগে!
শ্যামল বনানী মাঝে
মিলন রাগিণী বাজে,
আকাশ বাতাস সাগরের হিয়া
রঞ্জিত রাঙা ফাগে!
নরনারী সবে করিল বরণ
অরুণ-কিরণ-ভাতি—
গৌরবে আজ ফুটেছে প্রভাত
কেটেছে তিমির রাতি!
এলো জীবনের গান—
নূতনের অভিযান;
চঞ্চল আজি তরুণ ভারত
উচ্ছল অনুরাগে!

এই তরুণের অভিযানে, হে ভারতের নরনারী, তোমরা সকলে জাগ্রত হও। দুঃখাবরিত রজনীর শেষে, আজ শৃঙ্খলের অবসান হ'য়েছে।

এই বিমুক্তি অর্জ্জন ক'রবার জন্য যে অপরিমিত মূল্য দিতে হ'য়েছে—সেই নির্দ্দয় হানাহানি, নিষ্ঠুর রক্তপাত, আর দুর্ব্বহ অপমান বিস্মৃত হও। মিলন-তীর্থ এই ভারতবর্ষে মৃত্যুর পরাজয় ঘটেছে। শুধু প্রেমেই শঙ্কাভয় পরাজিত হ'বে। শত শহীদের তপ্ত রুধিরে দেশ জননীর যে বেদী রঞ্জিত হ'য়েছে, সেখানকার প্রেম-তর্পণে, জীবনের জয় গানে, হে ভারতের নরনারী তোমরা জাগ্রত হও।

জাগো ভারতের নরনারী, আজ
তরুণের অভিযান—

ছিন্ন হ'য়েছে বন্ধন যত
শৃঙ্খল অবসান!
ভুলে যাও যত হানাহানি, আর
রক্তের পথে, গতি দুর্ব্বার,
ভুলে যাও সেই জীবনের ভার—
দুর্ব্বহ অপমান!
মিলন-তীর্থ এ মহাভারতে
মৃত্যুর পরাজয়—
শুধু প্রেম আর প্রেম দিয়ে শুধু
জিনিব শঙ্কাভয়!
শত শহীদের তপ্ত রুধির-
-রঞ্জিত বেদী দেশ-জননীর;
প্রেম-তর্পণে জাগে যেন সেথা
জীবনের জয় গান!

ঘন অন্ধকারের বুক চিরে আজ স্বাধীন ভারতের জয়-রথ বহ্নি-বাণের মত ছুটে চ'লেছে! এ দুর্ম্মদ গতি-তরঙ্গ রোধের শক্তি কা'র আছে? পরাধীনতার শত লাঞ্ছনার আজ অবসান। শ্রাবণের গহন তিমির হ'তে ঘুমন্ত ধরণী, ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে, চেয়ে দেখ।

ঘুমন্ত ধরণীরে
শ্রাবণ গহন তিমির হইতে
কে জাগালো ধীরে ধীরে।
কত জয়গান, কত কলরোল,
কত উৎসব ছন্দ-বিভোল,
নবীন সূর্য্য গৌরবে আজ
রাঙিয়া উঠিল ফিরে!
পরাধীনতার শত লাঞ্ছনা
হ'য়ে গেল অবসান—
ধরণীর বুকে ধ্বনিয়া উঠিল
ভারতের জয়গান।
স্বাধীন আমরা, স্বাধীন ভারত
বিজয়-দীপ্ত তা'র জয়রথ
ছুটিল বহ্নি-বাণ সম ঘন
আঁধারের বুক চিরে।

বহু যুগের পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাজিত, খণ্ডিত হ'য়ে স্বাধীন ভারতের পদ চুম্বন ক'র্‌ছে। বহুদিনের ভুলে যাওয়া স্বাধীনতার গান আজ ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত। বাধা বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে সৌধে উড়ছে বহু সাধনার ত্রিবর্ণ পতাকা!

এত বড় সৌভাগ্যের মূলে কি আছে, জানো? আছে মেবার সূর্য্য রাণা প্রতাপের বীরত্বের তূর্য্যনাদ, আছে মারাঠাবীর শিবাজীর হর হর হর রণ হুঙ্কার, আর অসির ঝন্ ঝন্ শব্দ; আছে গুরু গোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য, রাজা সীতারাম, বীর শশাঙ্ক ও চাঁদ কেদারের দুর্জ্জয় সংগ্রাম, আছে ঝান্সীর রাণীর বৃটেনের বুক কাঁপানো বীরত্বের প্রদীপ্ত ইতিহাস; আর আছে প্রাচীদিগন্তে মণিপুর-প্রাঙ্গণে সুভাষের জ্বলন্ত সমর-বহ্নির অপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক কাহিনী।

বহুদিন পরে—বহুদিন পরে আমরা নিজের ঘর ফিরে পেয়েছি, তাই আজ রক্তস্নাত ধরণীর বুকে 'মুক্ত ভারতে দীপ্ত পতাকা উড়িছে সৌধ পরে—'

ভুলে যাওয়া সেই স্বাধীনতা গান জাগে
প্রতি ঘরে ঘরে!
শ্রাবণের ঘন মেঘের অঙ্কে নাচেরে বিজলী-শিখা—
নব-জাগ্রত জাতির ললাটে জ্বলেরে বিজয় টীকা।
মেবার-সূর্য্য রাণা প্রতাপেরে বন্দিল ইতিহাস—
তূর্য্য-নিনাদে কীর্ত্তি যাহার ছাইল ভারতাকাশ।
বাধা বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া বীর—
বরিল মৃত্যু, হয়নি নমিত তবু উন্নত শির!
দুর্দ্দম সেই মারাঠা বীর, গৈরিক আভরণ,—
হর হর হর রণ হুঙ্কারে অসি বাজে ঝন্ ঝন্!
প্রাণের অর্ঘ্য ঢালিয়াছে মা'র চরণ-যুগল চুমি',—
আপন শৌর্য্যে আপন বীর্য্যে রচিল তীর্থ-ভূমি!
গুরুগোবিন্দ, প্রতাপাদিত্য,
হেথা রাজা সীতারাম—
বীর শশাঙ্ক, চাঁদ কেদারের দুর্জ্জয় সংগ্রাম!
ঝান্সীর রাণী গরজি' উঠিল, ছুটিল অশ্বারোহে—
বৃটেনের বুক কাঁপিয়া উঠিল সিপাহীর বিদ্রোহে!
সে সব সাধনা করিতে সফল,
প্রাচীদিগন্ত কোণে—
জ্বালিল সুভাষ সমর-বহ্নি মণিপুর প্রাঙ্গণে!
দধীচি দিয়াছে আপন অস্থি শত্রু নিধন লাগি'—
সেই আদর্শ এ মহাজাতির স্মরণে রহিবে জাগি'!
রক্ত-স্নাত ধরণীর বুকে পেয়েছি আপন ঘর—
দুঃখ-দহন-অবসানে মোরা ভুলেছি আত্মপর!
বহুযুগ পরে পরাধীনতার খণ্ডিত শৃঙ্খল—
মুক্ত স্বাধীন মহাভারতের চুম্বিছে পদতল।

বন্দে মাতরম্ *

* এই গীতালেখ্যটী কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও ভাষা

কৌটিল্য

আজ যে সকল সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ঘটনার কারণ সহজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অতীতে সমাজ-জীবনে কালভেদে বস্তুর বিভিন্ন মূল্য-জ্ঞানের ইতিহাস সে সন্ধান দিতে পারে। অর্থনীতির ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দিক আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজের রূপবিকাশের অনেক বিস্মৃত খেই সংগ্রহ করা যায়। সামাজিক ইতিহাস আলোচনা কখনই সার্থক হয় না, যদি না সে আলোচনা বর্তমান সমাজকে বুঝতে এবং প্রয়োজন হলে সংস্কার করতে সাহায্য করে।

অধিক দিনের ইতিহাস নয়, ১০০০ বছর আগের বাংলা থেকে ধরলে দেখতে পাই বাংলার মানুষ বিত্ত সম্বন্ধে একটি মারাত্মক রকম ভুল করেছিল। আজ সেই ভুলের পরিণতি হয়েছে বাংলা বিভাগের মূল কারণ। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধারা হাজার হাজার বছর ধরে কুটিল পঙ্কিল পথে চলতে চলতে সঙ্কীর্ণ ও দুষ্ট হয়ে উঠে, শুধু বাংলায় নয় সমগ্র ভারতে। কাল'দুষ্ট এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাংলার অদূরদর্শী সমাজপতি বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা নামে এক বিজ্ঞান ও নীতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থার সূচনা করেন। বহুবার বিয়ে করে নিষ্কর্মা (কুলীন) যেদিন থেকে সমাজের পূজ্য হলো, সেদিন থেকেই বাংলার সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেল। বাংলার মানুষ পশুর পর্যায়ে ক্রমে নেমে দাঁড়ালো। মানুষের মূল্য একদিকে যেমন অসম্ভব রকম কমে গেল, অপরদিকে বিজেতা মুসলমান বাদশাগণের ভোগ ও অর্থলিপ্সার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙ্গালী বিত্ত সম্বন্ধে ধারণা করে নিল, টাকাকড়িই প্রকৃত ধন, আর শিল্প বাণিজ্য একান্তভাবে অনুন্নত; এই দেশে টাকাকড়ি লাভের একমাত্র উপায় হলো ছলে বলে ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করা। ধনবলের প্রতি দোষনীয় আগ্রহ এ আর জনবলের প্রতি অন্যায় অবজ্ঞার ফলে ½ বাংলা ও প্রায় সমপরিমাণ বাঙ্গালী আজ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলার জনসংখ্যা সম্বন্ধে সামান্য ধারণা যাঁর আছে, কি সব অবাঞ্ছিত কারণে বাংলার হিন্দু দলে দলে বিধর্মী হয়ে গেছে, সে সত্য তাঁর অবিদিত নয়। অদূরদর্শী বঙ্গ সমাজ একদিকে ভূসম্পত্তির ক্রমক্ষয়িষ্ণু বিপর্যয়ের বিষয় অনবহিত থেকে ও অপরদিকে মানুষকে পায়ে ঠেলে যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে সে সম্বন্ধে আজও যদি হিন্দু (পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বাংলার) সচেতন না হয় তবে বাংলার যে বিপর্যয় ঘটবে ১৯৪৩/৪৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগ সে তুলনায় অতি তুচ্ছ মনে হবে।

মনে পড়ে কিছুদিন আগে বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের স্বপক্ষে বক্তৃতা করতে উঠে নয়া দিল্লীতে এক সভায় শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ মশাই ও অন্যান্য বক্তাগণ নতুন বাংলার এক অতি মনোরম চিত্র এঁকেছিলেন। কল্পিত সেই বাংলা কতই না সুন্দর ও সুখের হবে। আজ সেই কল্পনার বাংলা বাস্তবরূপ ধারণ করেছে, কিন্তু তার সে আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও সুখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আদি বঙ্গ জননীকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি—নতুন দেবীর কাঠামো আজ আমাদের সুমুখে, তাতে রূপ, রস ও প্রাণ সঞ্চার আমাদের করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বা প্রাদেশিক সরকার এই কাজ করতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার নেই। বাঙ্গালীর যৌথ চেষ্টার বলেই একাজ সাধ্য। আর এই জীবনপণ শুভ প্রচেষ্টায় সজীব বাংলা ভাষা আমাদের অন্তরের সংযোগ ও বাইরের অগ্রগতিকে পুষ্ট করবে। বাঙ্গালীর এই নতুন দায়িত্ব ও বাংলা ভাষার এই অভিনব প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ভাববার সময় আজ এসেছে।

বঙ্কিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রতি আমার উপযুক্ত পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে। যাঁরা বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের আপেক্ষিক অবগতি ঘটেছে মনে করে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তাঁদের দুর্ভাবনা অমূলক বলেই মনে করি। আকাশে দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি রবি ও শশীর উদয় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য গগনে রবি ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে সম্ভব। বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনা যুগোপযোগী চরম সার্থকতা লাভ করেছে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে। এই সিদ্ধি সাধনের সম্বল নিয়ে আবার নতুন সাধনা চাই অনাগত যুগে অভিনব সার্থকতা লাভের জন্য। পক্ষান্তরে যাঁরা মহা উল্লাসে আজ ঘোষণা করছেন—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ এসেছে—Bengali Literature goes left, ইত্যাদি, তাঁদের ক্ষীণদৃষ্টি ও অল্প প্রাণ বলে মনে হয়। বাংলার গত কয়েক বছরের ঘটনার কথা বলছি। শয়তানসম টেগার্ট (ক'লকাতা), প্রেসবী (ঢাকা) ও এণ্ডারসনের (স্যার জন—গভর্ণর) কুশাসন ও অসহনীয় অত্যাচার বারোজের (বাংলার শেষ বৃটিস্ গভর্ণর) উদ্ভিদসম অবর্ণনীয় নিষ্ক্রিয়তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই যে ১৯৪৩-৪৪ সালে পঙ্গু, দুষ্ট ও বর্বরোচিত শাসন ব্যবস্থার জন্য বাংলার পথে ঘাটে হা অন্ন হা অন্ন বলতে বলতে একটি নয়, দুটি নয়, শত কি সহস্রটি নয়, ৫০ লক্ষ লোক মরল, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও এমন একটা শোচনীয় ঘটনার তুলনা কি কোথায়ও মিলে! এই একটি মাত্র ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী শত শত সাহিত্যিককে উগ্র বামপন্থী করে তুলতে পারে। কিন্তু বাংলার মানুষ কি ভাবে মরেছে, বাঙ্গালী সেই মহামৃত্যু কি ভাবে দেখেছে—সে ইতিহাস বড়ই কলঙ্কময়। অশ্রু যেটুকু গড়িয়ে পড়েছে, বাঙ্গালীর লেখনী মুখে যে সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে, ঘটনার তুলনায় তা অতি অকিঞ্চিৎকর। বাম পথ বড় বন্ধুর ও কণ্টকময় পথ,

সে পথে ছায়াতরু নেই, পান্থশালা নেই, সান্ত্বনা দেবার সহচর মিলে না। ঐ সর্বনাশা পথের আহ্বানে গৃহ ছেড়ে যে একবার বেরুবে, আর তার গৃহে ফেরা ভার। ভরতসম রাজপাদুকা মাথায় ধরে, মিত্র চার্চিলকে নিয়মিতভাবে ভোজসভায় আপ্যায়িত করে সে এটলী-মার্কা বামপন্থী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা প্রতিক্রিয়াশীল পরিহাস বই আর কিছুই নয়। বাম পথের যাত্রা শেষে গৌরবময় প্রভাতের উদয় হবে—শুধু এই আশায় বুক বেঁধে ঘোর অন্ধকার সীমাহীন দুঃখাস্তীর্ণ পথে চলেছে বামপন্থীর সুদীর্ঘ অভিজান। বালীগঞ্জে, না হয় নিদেন পক্ষে সহরতলীতে কোথাও সুন্দর ছোট্ট একখানা কোঠাবাড়ি হবে, একটু আরাম, একটু আয়াস মিলিবে, এই আশায় সম্পাদকের মুখ চেয়ে পাঠকের নাড়ীতে এক হাত রেখে আর সব করা যেতে পারে—বামপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। যা হক, বামপথ ও বাংলা সাহিত্যকে যদি এক সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় তবে আমি বর্তমানে এইটুকু স্বীকার করতে রাজি আছি—Bengali literature looks left—একে বামপথের দিকে দৃষ্টি বলা যেতে পারে, বামপথে চলা বলা যায় না। এই বামপথের দিকে ফিরে দেখবার শক্তি ও সাহস যাঁদের আছে তাঁদের অভিনন্দন জানাবার ও উৎসাহ দেবার সময় এসেছে। আর যারা পঙ্কিল দক্ষিণ পথে চলে স্বার্থের খাতিরে বামপথের বুলি আওড়াচ্ছেন তাদেরও সতর্ক করে দেবার সময় উপস্থিত।

বাংলায় ও বাংলার বাইরে বাঙ্গালী সমাজে সাহিত্যিক সাজা কিছু কঠিন কাজ নয়। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্সি বা ঐ রকম যা হয় একটা কিছু কাজে দু পয়সা বেশ আয় থাকলে যে কোন ক্লাবের সাহিত্য-শাখার সেক্রেটারী হওয়া যায়। যুবজন আয়োজিত রবীন্দ্র সাহিত্য-বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে হলে "ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন," এই দু'ছত্র রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলেই যথেষ্ট। রসায়ন শাস্ত্রের একজন ডি-এস-সি, পি-এইচ্‌-ডি, যিনি কোন এক সরকারী বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের কাজে নিযুক্ত আছেন, সেদিন দেখালেন তাঁর ইংরেজী কবিতা কাগজে ছাপা হয়েছে। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যে সুযোগ পেলে নিজ নিজ কবিতা ও গল্পের খাতা বার করে ধরেন সেরূপ ঘটনা বাংলায় বিরল নয়। কিন্তু এই বিশেষজ্ঞগণ নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে বাংলায় কিছু লেখার কথা ভেবেও দেখেন না। বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদের অধিকারী বাঙ্গালী মাত্রেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক সকলেই কবিতা ও গল্প লিখচেন—এমনটি হতে পারে না দু'কারণে—প্রথমত সকলের কবিতা ও গল্প লিখবার ক্ষমতা থাকে না, আর দ্বিতীয় কারণ—বাংলা ভাষাকে আরও সম্পদশালী করবার জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে লেখার কাজে এই সব বিশেষজ্ঞগণের প্রয়োজন। একবার বাংলার কোন একটি বিখ্যাত কাপড়ের মিলের গ্রন্থাগার দেখি। সেখানে গল্প, নাটক, নভেল সব রকম বই-ই (ইংরেজী ও বাংলা) রয়েছে, কিন্তু বয়নশিল্প সম্বন্ধে কোন বই দেখতে পেলাম না (বাংলায় ইতিমধ্যে বয়নশিল্প সম্বন্ধে মিলের কর্মী ও শিক্ষানবীশগণের হিতার্থে কোন বই লেখা হয়েছে কিনা জানি না)। কিছু না লিখে (গতিক দেখে মনে হয়, হয়ত বা কিছু না পড়েও) সাহিত্যিক হওয়া যায়। আর সাহিত্য বিষয়ে না লিখেও লেখক হওয়া যায়। বাংলায় সাহিত্যিক অনেক, লেখক কম। এই অবস্থার জন্য কে কতটা দায়ী সে আলোচনায় লাভ হবে না ; বরং যে সব কারণে এ অবস্থা বর্তমান, সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করলে ভবিষ্যতে ফল ভাল হতে পারে। বাংলার বর্তমান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিকিৎসক সকলেই ইংরেজীর মারফত নিজ নিজ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। বাংলা ভাষার সাহায্যে এই সব বিষয়ে লেখা যায়, একথা তাঁদের অনেকেরই ধারণার বাইরে। সঠিকভাবে না বলতে পারলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—আমাদের বিশ্ববিত্তালয়ের অধিকাংশ ডক্টরেট পর্যন্ত উপাধি লাভের জন্য যে থিসিস্ লেখেন তাই তাঁদের প্রথম ও শেষ লেখা। অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম—বাংলা দেশে (পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে) হাইস্কুল ও কলেজে প্রায় ১৫,০০০ শিক্ষক ও অধ্যাপক রয়েছেন, তাঁদের সকলের নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে সম্বৎসরের লেখা একত্রিত করলেও একখানা মাসিক পত্রের সমান আকার ধারণ করবে কিনা সন্দেহ। এই গেল একদিক, অপরদিকে শিক্ষা দীক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় লেখা তৈরী হলেই বা ছাপা হবে কোথায় ? অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দেশীয় ভাষায় উপযুক্তসংখ্যক সাময়িক পত্রাদিও নেই। যে কয়েকখানা বাংলা সাধারণ সাময়িক পত্র রয়েছে তাদের গ্রাহক সংখ্যা খুবই কম। অনিবার্য কারণে কবিতা, গল্প ও চলতি ঘটনার সমালোচনাই সেগুলিতে অধিক স্থান পায়। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি একপ্রকার অচল বলেই ছাপা হয় না। স্কুলের শিক্ষকগণের আর্থিক অবস্থা অবর্ণনীয়, বাংলার কলেজের অধ্যাপকগণ আজও ১০০-১৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করছেন। উচ্চশিক্ষার ফলে জীবন যাত্রার এক উন্নতমান আকাঙ্ক্ষা করে যখন এই সকল ব্যক্তিগণ বাস্তবজীবনে এইরূপ ব্যর্থতার সম্মুখীন হন তখন নিজের সাধনার বিষয়ের প্রতিও ঔদাসিন্য, এমনকি অশ্রদ্ধা জন্মে। যদি কেহ জোর-জবরদস্তি করে এই ব্যর্থতাকে অস্বীকার করে নিজ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখে কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠান তবে সে লেখা অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনাই অধিক। আর যে ক্ষেত্রে সম্পাদক মশাই বিশেষ সুবিবেচক, সে ক্ষেত্রে লেখা ছাপা হলেও লেখককে উৎসাহ (বিশেষ প্রয়োজনীয়) দেবার কোন ব্যবস্থা প্রায়ই হয় না। গল্প কবিতা লিখলে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক কখন কখন মিলে থাকে। কিন্তু কোন তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার কোন দাম নেই বললেই চলে। এই সব অবস্থা সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের একান্ত পরিপন্থী। এ বিষয়ের প্রতি বাংলার প্রকাশক, সম্পাদক ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় এসেছে। বাংলা আজ আমাদের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় ভাষা। বাংলার উন্নতির জন্য আজ উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদদিগকে কলম ধরতে হবে। বাংলা ভাষায় এই অভিনব প্রয়োগের সাহায্যে নতুন বাংলাকে সজীব ও সার্থক করে তুলতে হবে।

পেনিসিলিন ও অন্যান্য অ্যান্টিসেপটিক

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি, ডি-ফিল্

আমরা সচরাচর যে সব রোগে ভুগে থাকি সেগুলিকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :—প্রথম খাদ্যের কোনও নির্দিষ্ট উপাদানের অভাব বা অল্পতাজনিত ব্যাধি। দ্বিতীয়—জীবাণুঘটিত ব্যাধি।

প্রথম শ্রেণীর ব্যাধির মধ্যে বেরিবেরি, রিকেট্স, স্কার্ভি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রোগগুলি প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত হলেও এবং তাদের প্রতিষেধকের বিষয় মোটামুটি জানা থাকলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রসায়নশাস্ত্রের অদ্ভুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যস্থ কোন্ কোন্ পদার্থের অভাবে এই রোগগুলি জন্মে তাহা সঠিক নির্ণীত হয়েছে। ভিটামিন বি, বেরিবেরি, ভিটামিন ডি রিকেট্সের এবং ভিটামিন সি স্কার্ভির প্রতিষেধক বলে সাধারণ লোকেও আজ জান্‌তে পেরেছেন। খাদ্যে ঐ পদার্থগুলির সম্পূর্ণ অভাব ঘটলে ঐ ব্যাধিগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

জীবাণু ঘটিত ব্যাধিগুলির চারটি উপবিভাগ করা যেতে পারে—

খাদ্য ও পানীয়ের সহিত শরীরে ব্যাধি-বীজাণু প্রবেশের দরুণ ব্যাধি—যেমন, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি।

মশা, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি বাহিত ব্যাধি জীবাণু ঘটিত অসুখ—যেমন, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া, টাইফাস, প্লেগ প্রভৃতি।

সংস্পর্শ ঘটিত ব্যাধি—যেমন, উপদংশ, গণোরিয়া প্রভৃতি।

কাটা, ছেঁড়া প্রভৃতি আহত স্থানে বাতাস ও মাটি লেগে জীবাণুঘটিত ব্যাধি—যেমন, দুষ্ট ক্ষত, ধনুষ্টংকার প্রভৃতি।

জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে অ্যান্টিসেপ্‌টিক শ্রেণীর ঔষধ-গুলির ক্রিয়া এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রচলিত অ্যান্টিসেপটিক-গুলির সঙ্গে সম্প্রতি আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের পার্থক্য কোথায় সে বিষয়ে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাচ্ছে।

অ্যান্টিসেপটিক কথাটির প্রকৃত অর্থ যে পদার্থে পচন নিবারণ করে। কিন্তু সাধারণ বীজাণুনাশক হিসাবেও এখন এ কথাটির প্রচলন হয়েছে। অ্যান্টিসেপটিকের মধ্যে কার্ব্বলিক অ্যাসিডের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রথিত-যশা বৈজ্ঞানিক লিষ্টার অস্ত্রোপচারে এই পদার্থের প্রথম ব্যবহার আরম্ভ করেন। তার আগে অস্ত্রোপচারের পর ক্ষত দূষিত হয়ে বহু লোক প্রাণ হারাত। কিন্তু লিষ্টারের এই আবিষ্কারের ফলে ক্ষত দূষিত হয়ে প্রাণহানি খুব কমে যায়। লিষ্টারের আবিষ্কারের পরে আরও অনেক অ্যান্টি-সেপটিক্ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলি যে কেবল ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হয় তাহা নহে—ব্যাধি বিশেষে অনেক প্রকার অ্যান্টিসেপটিক্ ঔষধ সেবন করা হয়ে থাকে কোনও কোনটি বা ইনজেকশনরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাশায় এন্টারো-ভায়োফরম নামক যে ঔষধটি খাওয়া হয় বা কালাজ্বরে ইউরিয়াষ্টিবামিন নামে যে ঔষধটি ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে এ ঔষধগুলিও অ্যান্টিসেপটিক শ্রেণীর ঔষধরূপে পরিগণিত, অ্যান্টিসেপটিক পদার্থের মধ্যে কার্ব্বলিক অ্যাসিড, ইউসল, অ্যাক্রিফ্ল্যাভিন মারকিউরিক ক্লোরাইড, সেটাভিয়ন, সালফন অ্যামাইড ও নব আবিষ্কৃত পেনিসিলিন সুপরিচিত।

অনেকেই জানেন, রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি শরীরের স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিক। মানুষের শরীরে অর্থাৎ রক্ত-স্রোতে যখন কোনও ব্যাধিবীজ প্রবেশ করে তখন রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি আগন্তুক জীবাণুগুলির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষতস্থানে যে শ্বেতবর্ণের পুঁজ জমতে দেখা যায় সেগুলি আগন্তুক জীবাণুর সহিত যুদ্ধে নিহত শ্বেতরক্ত-কণিকার সমষ্টি মাত্র। পূর্ব্বে যে সব অ্যান্টিসেপটিকের উল্লেখ করা হ'ল তাদের ক্রিয়া বুঝতে হলে শ্বেতরক্ত-কণিকার ক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার বলে তার উল্লেখ করা হ'ল।

আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, বিভিন্ন ব্যাধি বীজাণুর উপর অ্যান্টিসেপটিক্‌গুলির ক্রিয়া বিভিন্ন ধরণের। কোনও অ্যান্টিসেপটিক্ কয়েক প্রকারের ব্যাধির জীবাণু নাশ করতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যাধির জীবাণু নাশে তার অক্ষমতা দেখা যায়। প্রথম যুগের আবিষ্কৃত কার্ব্বলিক

অ্যাসিড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, হাইপোক্লোরাইট প্রভৃতি অ্যান্টিসেপটিকের কিন্তু প্রায় সকল ব্যাধি বীজাণুর উপরেই সুস্পষ্ট ক্রিয়া বিদ্যমান। কিন্তু পরে যে সব অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের ক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, কাচের পাত্রে উপযুক্ত মিডিয়াম যোগে বর্দ্ধিত বীজাণুর উপনিবেশের উপর কোনও অ্যান্টিসেপটিক অতি মাত্রায় সক্রিয় হ'লেও ঐ বীজাণু যখন মানুষের শরীরের মধ্যে থাকে তখন তার উপর ঐ অ্যান্টিসেপটিকের হয় তো কোনও ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না। সাপকে পরিষ্কার জায়গায় পেলে তাকে হত্যা করা যেমন সহজ, অথচ ঝোপঝাপ বা গর্ত্তের মধ্যের সাপকে মারা যেমন কষ্টকর এমন কি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব—এও যেন সেইরূপ ব্যাপার। মানুষের শরীরে রক্তের বিভিন্ন উপাদান মধ্যে ব্যাধি বীজাণুগুলি এমন ওতপ্রোতভাবে থাকে যে অনেক অ্যান্টিসেপটিক সেগুলি ভেদ করে তাদের মুখোমুখি পৌছতে না পারায় কোনও ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে না। অনেক ব্যাধির বীজাণু এমন কঠিন বর্ম্ম তৈরী করে অবস্থিতি করে যে তা ভেদ করে কোনও অ্যান্টিসেপটিক তাদের নাগাল পায় না। উদাহরণ স্বরূপ, যক্ষ্মা রোগের জীবাণুগুলি এরূপ ঘন কফ জাতীয় পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে যে এখনও পর্য্যন্ত সেগুলি ভেদ করে তাদের আক্রমণ করবার মত কোনও অ্যান্টিসেপটিকই আবিষ্কৃত হয় নাই। আর একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, সালফোন অ্যামাইড প্রভৃতি অনেক অ্যান্টিসেপটিক ব্যাধি বীজাণুনাশক ঠিক নয়—পরন্তু ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধক (Bacterio static)। উপযুক্ত মাত্রায় এদের প্রয়োগে শরীরের মধ্যে ব্যাধি বীজাণুগুলি আর বংশ বিস্তার করতে পারে না—ইতিমধ্যে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি এসে ঐ বীজাণুগুলিকে মেরে ফেলে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ যে সব অ্যান্টিসেপটিক প্রস্তুত করেন সেগুলি শরীরের স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিক অর্থাৎ শ্বেত রক্ত কণিকাগুলির সহায়তা করে মাত্র। কোন অ্যান্টিসেপটিক কি পরিমাণে ব্যবহারে শরীরস্থ স্বাভাবিক অ্যান্টিসেপটিককে সব চেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারে শরীর বিজ্ঞানবিদের নিকট সেইটি বড় সমস্যা। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত প্রকার অ্যান্টিসেপটিক জানা ছিল সবগুলিই ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে শরীরস্থ শ্বেতকণিকাগুলিরও অল্প বিস্তর বিনাশ সাধন করে থাকে। সুতরাং অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কারকের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমন পদার্থের সন্ধান করা—যার ন্যূনতম মাত্রাতেই ব্যাধি বীজাণু প্রতিরোধ করবে, অথচ সেই মাত্রায় উহা রক্তের শ্বেত কণিকাগুলির আদৌ কোনও ক্ষতি করবে না।

পরিচিত অ্যান্টিসেপটিকগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ৩২০ ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড থাকলে তাতে ব্যাধি বীজাণুর বৃদ্ধি স্থগিত হয়, কিন্তু ১২৮০ ভাগ রক্তে ১ ভাগ কার্বলিক অ্যাসিড থাকলেই শ্বেত রক্ত কণিকার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে রক্তের মধ্যে প্রবেশকালে কার্বলিক অ্যাসিড উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই বেশী করে। অনেকে বল্‌তে পারেন পুঁজযুক্ত ক্ষতস্থানে কার্বলিক অ্যাসিড প্রয়োগেও সুফল পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে এমন মাত্রায় কার্বলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় যে উহা পুঁজ কোষগুলি নষ্ট ক'রে দেয়, তখন নূতন নূতন দল শ্বেত রক্তকণিকা এসে সেখানকার ব্যাধি বীজাণুর বিনাশ সাধন করে। পক্ষান্তরে, ২ লক্ষ ভাগ রক্তের মধ্যে মাত্র ১ ভাগ সালফোন অ্যাসাইড থাকলেই উহা ষ্ট্রেপটোকোকাস বীজাণুর বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে, অথচ ২০০ ভাগ রক্তের মধ্যে ১ ভাগ সালফোন অ্যাসাইড থাকলে তাতে রক্তের শ্বেত কণিকার ক্ষতিকারক হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরিমাণ সালফোন অ্যাসাইড ব্যাধি বীজাণু নিরোধের জন্য আবশ্যক, তাতে শ্বেতরক্ত কণিকার আদৌ কোনও ক্ষতি হয় না।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংএর আবিষ্কৃত পেনিসিলিন এ বিষয়ে সালফোন অ্যাসাইডকেও আশ্চর্য্যরূপে পিছনে ফেলে গিয়াছে। কারণ, ৫ কোটি ভাগ রক্তে ১ ভাগ পেনিসিলিন থাকলেই রক্তস্থ ষ্ট্যাফাইলোকোকাস বীজাণুর বংশবৃদ্ধি নিবারণে সক্ষম, অথচ রক্তের একশত ভাগে এক ভাগ পেনিসিলিন থাকলে উহা রক্তস্থ শ্বেতকণিকার ক্রিয়া নিরোধ করতে পারে। অনেকেই জানে ফোঁড়া এবং কার্বাংকলের প্রধান বীজাণু এই ষ্ট্যাফাইলোকোকাস। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

যে পরিমাণ পেনিসিলিন রোগ নিবারণে আবশ্যক তার হাজার হাজার গুণ বেশী মাত্রায় দিলেও রক্তের ক্ষতি হতে পারে না। সুতরাং চোখ বুঁজে যে কোন মাত্রায় পেনিসিলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানেই পেনিসিলিনের সঙ্গে অন্যান্য ঔষধের পার্থক্য। এতদিন যে সব অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির ব্যবহারে চিকিৎসককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হত যে মাত্রাধিক্যে রোগীর শরীরে বিষক্রিয়া না ঘটে। অনেকক্ষেত্রে এই আশঙ্কায় অল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করায় ব্যাধি বীজাণুগুলি ঐ ঔষধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পরে সহজে ঐ ঔষধে কোনও ফল পাওয়া যায় না। একটিবার মাত্র কড়া মাত্রায় পেনিসিলিন প্রয়োগে গণোরিয়া প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি নির্দোষভাবে সেরে যাচ্ছে বলে শুনা যায়। সালফোন অ্যাসাইড ও তজ্জাতীয় ঔষধগুলির চেয়ে পেনিসিলিন অন্য একটি গুণের জন্যও উৎকৃষ্টতর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সালফোন অ্যাসাইড শ্রেণীর ঔষধগুলি পুঁজের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে কিন্তু পেনিসিলিন পুঁজের মধ্যেও বেশ সক্রিয় থাকে। সুতরাং পুঁজ সংযুক্ত ক্ষত বা ফোঁড়ার মধ্যে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন করে সুফল পাওয়া যায়। কথায় বলে চাঁদের কলঙ্ক আছে সুতরাং পেনিসিলিনকেও আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে আশা করতে পারি না। পূর্বেই বলেছি পেনিসিলিন সব ব্যাধি বীজাণুর উপর সক্রিয় নয়—হয়ত ভগবানের সেরূপ অভিপ্রেতও নয়। কারণ এক ঔষধে সব ব্যারাম সারলে আমাদের ঔষধের কারখানাগুলিই যে উঠে যেত এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিকিৎসককেও হাত পা গুটিয়ে বসতে হত। পেনিসিলিন খাওয়া চলে না, কারণ ইনসুলিন প্রভৃতির মত পাকস্থলীর অম্লরস সংস্পর্শে পেনিসিলিন নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। অবশ্য খুব অল্প দিন হ'ল অনেক গবেষণার পর বিশেষ প্রকারের কোটিংএর সাহায্যে পেনিসিলিন ট্যাবলেট আকারে খাবার ঔষধরূপেও বের হয়েছে বলে প্রকাশ।

পেনিসিলিন ব্যবহারের আর একটি বড় অসুবিধা এই যে, ইহা শরীর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। এজন্য ঘন ঘন পেনিসিলিন ইনজেকশনের প্রয়োজন হয়। ইহা তৈরী করে খুব বেশী দিন রাখাও যায় না। কয়েক মাসের মধ্যেই এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের মধ্যে বেশীক্ষণ থেকে যাতে বেশী কাজ করতে পারে সে সম্বন্ধে পেনিসিলিন নিয়ে অনেক গবেষণা চলেছে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে কিছু সাফল্যও দেখা গেছে। প্যারা অ্যামিনো হিপিউরিক অ্যাসিড নামক পদার্থের সহযোগে প্রয়োগ করায় পেনিসিলিন শরীরের মধ্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় বলে জানা গেছে। রোমানস্কি এবং রিটম্যান সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন যে, বাদাম তেল এবং মোমের মিশ্রণ সহযোগে ব্যবহার করায় রক্তের মধ্যে পেনিসিলিন ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সক্রিয় থাকে। অবশ্য ঐ মাত্রায় পেনিসিলিন সাধারণ লবণ দ্রব (স্যালাইন) সহযোগে ইনজেকশন দিলে মাত্র ২ ঘণ্টা কাল রক্তস্রোতে থাকে।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পেনিসিলিন প্রস্তুতের বিরাট বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের একনিষ্ঠ সাধনায় ইহার প্রস্তুত, সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে পেনিসিলিনের রাসায়নিক অবয়বও স্থিরীকৃত হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভিটামিন বি প্রভৃতির ন্যায় পেনিসিলিনও কৃত্রিম উপায়ে রসায়নাগারে প্রস্তুতের ব্যবস্থা হবে। মূল সালফোন অ্যাসাইডের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে যেমন বিভিন্ন ব্যারামে উপকারী বহু সংখ্যক অমূল্য ঔষধের আবিষ্কার হয়েছে, পেনিসিলিন সম্বন্ধেও আরও গবেষণা হলে পেনিসিলিনের মূল কাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য সক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে পেনিসিলিনের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী এবং অধুনা যে সব ব্যারামে পেনিসিলিনের কোনও ক্রিয়া নাই ব'লে প্রমাণিত হয়েছে সে সব ব্যারামেরও অব্যর্থ ঔষধের আবিষ্কার হওয়া আশ্চর্য্য নয়। পক্ষান্তরে যে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছাতা (mold) থেকে পেনিসিলিন প্রস্তুত হচ্ছে, বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় কোনও নূতন প্রকারের ছাতা থেকে পেনিসিলিনের চেয়ে সক্রিয় এবং অধুনা দুরারোগ্য অনেক ব্যাধিতে ফলপ্রদ নূতন নূতন ঔষধেরও সন্ধান মিলিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ও ধনিকগণের উদ্যোগে আমাদের দেশেও এ বিষয়ে জোর গবেষণা চলা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি-কল্পে উপযুক্ত কারখানা স্থাপন করে প্রভূত পরিমাণে পেনিসিলিন দেশেই তৈরীর ব্যবস্থা করাও সর্বাগ্রে কর্তব্য।

বৈদিক-সংস্কৃতির সার্ব্বজনীনতা

ডাঃ শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, পি এচ্-ডি

ভারতীয় কৃষ্টি বেদ-সাহিত্যের রসে রসায়িত। নানা উত্থান পতন, নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও বৈদিক সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ জয় যাত্রাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার এই অমূল্য পিতৃধনের যদি সদ্ব্যবহার করে, তবে ভারতের অগ্রগতি ধ্রুব ও নিশ্চিত হইবে।

ভারতীয় দৃষ্টি দ্বৈপায়ন ও কৌশিক এ কথা অনেকেই বলেন, কিন্তু যখন মূল বেদ অধ্যয়ন করি তখন ঋষিদের বিশ্বজনীন আদর্শ ও সমুদার দৃষ্টি আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

সাধারণ মানুষ মনে করে যে বেদে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই। স্মৃতির বচনের উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষ তাই বেদপাঠ ও বেদের পঠনকে একান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা অন্যভাবে ভাবিতেন। বেদের অনেক সূক্ত নারী কবিদের লেখা। অনেক শূদ্র বেদমন্ত্র রচনা করিয়াছেন। বেদ সুস্পষ্ট স্বরে বেদের অমৃতবাণী বিশ্ব-মানবকে দিতে বলিয়াছেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্ শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়চ।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং
মে কামঃ সমৃদ্ধ্যতামুপ মাদো নমতু॥

যজুর্ব্বেদ ২৬ অধ্যায় ২ বর্ত্তিকা

এই অমৃতময়ী কল্যাণী বাণী আমি সমস্ত বিশ্বজনকে উপহার দিব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, আত্মীয় অনাত্মীয় সমস্ত লোকের নিকট এই অভয় মন্ত্র উচ্চারণ করিব। এই প্রচারের ফলে আমি দেবতাদের প্রিয় হইব। দক্ষিণাদাতা যাজ্ঞিকেরা আমার উপর প্রীতিমান হইবেন। আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হইবে। আমার মনোবাঞ্ছা দেবকৃপায় সফল হউক।

এই মন্ত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইতেছে যে বেদবাণী সর্ব্বজনগ্রাহ্য। সকল মানুষেরই বেদের মধুময় কল্যাণময় মন্ত্র পাঠে অবাধ অধিকার। বেদবাক্য স্মৃতি অনুসরণ করিয়া আমরা যেন তমোনিষ্ঠ না হই।

বেদের মূল কথা যজ্ঞ-জীবন। যজ্ঞকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভুল বুঝিয়াছেন—যজ্ঞ দেবতাদিগকে খুসি করিবার উৎসব নহে—অমৃতস্য চেতনং যজ্ঞং—যজ্ঞ অমৃতত্বের চেতন করে। যজ্ঞ বিশ্বে মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া বিশ্বকেন্দ্রিক হইতে বলে। কেবলাদো কেবলাঘো ভবতি—যে কেবল নিজের জন্য ব্যস্ত সে কেবল পাপেরই সেবা করে—যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিতে হইবে। ধনলোভী হইলে যজ্ঞচক্র ব্যাহত হইবে। পৃথিবীতে আজ যে ঘোর অর্থনৈতিক বিপ্লব—তাহার মূল কারণ মানুষের স্বার্থান্ধ আত্মীয়তা। মানুষ ভাবিতেছে সে কেবল নিবে, কিছুই দিবে না। এই আত্মগ্রাসী ক্ষুধা সমস্ত দুঃখ ও বিপর্য্যয়ের কারণ। তাই সকলকে যজ্ঞার্থ জীবন যাপন করিতে শিখাইতে হইবে—তবেই পৃথিবীর শান্তি।

এই যজ্ঞে সকল মানুষের সমান অধিকার। অগ্নি বিশ্পতি, বিশে বিশে তিনি পূজা পান। সমস্ত সেবক তাঁহারই পূজা করে। মধুচ্ছন্দা ঋষি বলিতেছেন—

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥

ইন্দ্র বিশ্বজনের দেবতা। সেই বিশ্বজনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেতনা দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিব। একান্তই তিনি আমাদের হউক।

এই আহ্বান সকলের জন্য। বিশ্বের সমস্ত মানুষ আসিয়া আজ সর্ব্বমেধযজ্ঞ আরম্ভ করুন। সকলের শান্তি হউক। সকলের কল্যাণ হউক।

যে ভেদ, সে ছেদ ভারতকে শতধা বিভক্ত করিয়াছে বৈদিক যুগে তাহা ছিল না। মনুষ্যত্ব তখন আপন তপস্যার দীপ্তির উপর নির্ভর করিত। জন্মগত গৌরবের প্রত্যাশায় কেহ লোভী ছিল না। এই মনোভাব সম্ভবপর ছিল, কারণ বেদের ঋষির মনে সর্ব্বত্রাত্মা ঈশ্বরের অনুভূতি—তাই সর্ব্বাত্মদর্শন তাহার পথে বুদ্ধির চাতুর্য্য ছিল না—স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল।

ঈশোপনিষদ যজুর্ব্বেদেরই অংশ। যজ্ঞ কর্ম্মের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ শেষ করিয়া এখানে যে পরম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাকে শ্রদ্ধায় ও বিশ্বাসে আমাদের বারংবার স্মরণ করা উচিত।

পৃথিবীকে ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে—যাহা কিছু এই বিশ্বচরাচরে তাহাকে ঈশ্বরময় করিয়া দেখিলে পরাশান্তি লাভ হয়। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে অপরের ধন লোভ করিবে না।

বিশ্বসৃষ্টি সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ পরম পুরুষের আত্মবলি। পুরুষ সূক্তে বিশ্বনাথের এই আত্মবিসর্জ্জন লীলা ঋষির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি আপনাকে আহুতি দিয়া জগৎ-চক্রের লীলা চালাইতেছেন। তিনি যেমন নিজেকে বলি দিয়াছেন—সমস্ত মানুষই তেমনই আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া তাহার লীলা-নাট্যে খেলা করিবে। সেই বিরাট-যজ্ঞে সকলের সমান দাবি—সকলের সমান অধিকার। সেই মহোৎসবে কেহই অনিমন্ত্রিত নহে—কেহই বারিত নহে।

অগ্নিকে বৈদিক ঋষিরা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বিশ্বনরের, তাই তিনি বৈশ্বানর। এই বৈশ্বানরের নিকট ঋষি সংবনন বিশ্ববাসীর ঐক্যের প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছেন

সকলের এক মন্ত্র, এক সংঘ ও এক আকুতি। আজিও সে স্বপ্ন সফল হয় নাই। কিন্তু তবু আজ তারস্বরে সেই মন্ত্র বলিবার প্রয়োজন আছে—

সং গচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম।

তোমরা এক সাথে সবাই চল, এক সাথে সবাই বল—তোমাদের সকলের মন একই হউক।

বিশ্বস্বাধীনতার আজ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের বিজ্ঞান ও কলা অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বিশ্বজগৎকে একত্র করিয়াছে। কিন্তু আণবিক বোমার মত মৃত্যুবাণও মানুষের হাতে আসিয়াছে। আমরা যদি মৈত্রী ও করুণা পন্থা বাহির করিতে না পারি—যদি ঐক্য ও মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করিতে না পারি তবে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

বেদ বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে একই সত্যের ও একই সৎ পদার্থের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে সেই পরমাত্মায় অমৃতস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্ত বিশ্বমানুষকে ডাকিয়াছেন।

এই জগৎ বিশ্ব বিধাতার লীলার ক্ষেত্র—ইহা হেলার নহে—ইহা তুচ্ছ নহে। তাই বৈদিক ঋষি পার্থিব ধন ও সম্পৎ প্রার্থনা করেন।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্॥

অগ্নি দেবেন পরিপূর্ণতা—যে পরিপূর্ণতা প্রতিদিন নব নব রূপে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া ওঠে যাহা দিক হইতে দিগন্তের নব নব বাণীর সন্ধানে চলে—সেই চির অপ্রাপ্য অথচ চির ঈপ্সিত প্রগতির জন্ত ঋষি ব্যাকুল। জীবনে চাই যশোগৌরব—চাই পরিপূর্ণ বীর্য্য ও ওজস্বিতা।

কিন্তু কেবল পার্থিব ধন লইয়াই মানুষের চলে না। তাহার মনে-জাগে অসীমের আকুতি—অজানার অবকাশ। অনন্ত অদিতির উপলব্ধি হয় তাহার জীবনের এক শুভক্ষণে তখন সমস্ত জীবনকে মধুময় মনে হয়। তখন মধুরতায় জগৎ প্লাবিত হয়। তখন তিনি অমৃতের নিধি মধুবাতের নিকট অমৃতত্ব প্রার্থনা করেন :—

যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ
ততো নো দেহি জীবসে।

হে বায়ু, তোমার ঐ গৃহে অমৃতনিধি গোপন রহিয়াছে—পরিপূর্ণ জীবনের জন্ত আমরা সেই অমৃত প্রার্থনা করি।

এই প্রার্থনা একার নহে—বাতায়ন ঋষির নহে—সর্ব্ব মানবের—সর্ব্ব জগতের।

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সংচ পশ্যতি। স নঃ পর্ষদতি দ্বিষঃ।

কারণ সেই পরম সমস্ত বিশ্বকে দেখেন—তাহার স্নিগ্ধ প্রেম দৃষ্টি দিয়া সকলকে তিনি বোঝেন। তাই ত আমরা নির্ভয়। তিনি আমাদের সমস্ত অন্তরায়, সমস্ত রিষ্টি হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

ভারতবর্ষে গৃহে গৃহে আবার ধ্বনিত হউক বেদ মন্ত্র। স্বাধীন ও বলিষ্ঠ ভারত তাহার অমৃত সত্যের বাণী দিয়া জগৎকে তৃপ্ত ও শান্ত করুক। ভারতের অভ্যুদয় কেবল পার্থিব সমৃদ্ধিতে নহে—তাহা অপার্থিব কল্যাণে দীপ্ত হউক—অমর অধ্যাত্ম প্রেরণায় সঞ্জীবিত হউক—আজ এই কামনাই করি।

মৌন-রাত্রি

শ্রীবটকৃষ্ণ দে

উত্তর সমুদ্রে আজ তীব্র ঝড়—উত্তাল কল্লোল
সন্ত্রাসে মৃত্তিকা-নীড় কেঁপে ওঠে, বুঝি ভেঙ্গে যায়!
বিষাক্ত পৃথ্বীতে হবে বাতাসের কম্পিত হিল্লোল
বজ্রের নির্ঘোষ জাগে ধ্বংসের চেতনা লয়ে হায়!
জানি জানি অন্তিমের ক্ষুব্ধ বাণী প্রকৃতি শোনায়,
যাযাবরী গতি আজ রুদ্ধ হ'বে প্রচণ্ড আঘাতে
চিরন্তনী আশা আজি নৈরাশ্যের ধূসর ছায়ায়
ক্ষণিকের দীপ্তি শেষে নিভে যাবে উন্মত্ত হাওয়াতে!
পুঞ্জীকৃত আবর্জনা শ্যামলের যে স্বপ্নে বিভোর,
সে শুধু অলীক মায়া—বাস্তবের নৈরাজ্যে আসন,
মদ-দৃপ্ত ক্রামশিক আকাঙ্ক্ষার উষ্ণ-আঁখি-লোর
সনাতন সত্যরূপে ধরা দেবে—এই প্রবচন!
(আজ) জাগরীর মত্ততায় কুম্ভকর্ণ সমুখে দাঁড়াক—
হিমেল মরুর ঘুম—মৌনতার রাত্রিরে বিছাক্!

চাওয়া ও পাওয়া

কুমারী চন্দ্রা রায়

যখন আমি তোমায় খুঁজে ফিরি
বিশ্ব মাঝে সবার ঘরে ঘরে,
তখন তুমি বিলীন হয়ে থাক
লতায় পাতায় বিরাট চরাচরে।

যখন তোমার চরণ আঁকি বুকে
আকুল বুকের জানাই নিবেদন।
তখন তুমি লুকিয়ে বসে থাকো,
খুঁজে তোমায় নয়ন অকারণ।

আবার যখন ক্লান্ত নতশিরে,
ফিরিয়া যাই ব্যাকুল হতাশায়
তখন তুমি পিছন হতে ডাক
চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ধায়।

নায়িকা মেনকা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেনকাকে এক কথায় দিল্লীতে আনিয়া মনে একটা খটকা লাগিল। যাদের সঙ্গে হুল্লোড় করিয়া দিল্লীতে সে কয়েকটা দিন কাটাইতে পারিত, সরকারী চাকরির খাতিরে তার সেই পরিচিত গোষ্ঠী সদলবলে সিমলায় গিয়াছে পক্ষকাল আগেই।

দিল্লীতে আনিয়া মেনকাকে একটু মুস্কিলেও ফেলিয়াছি। তবে দিল্লীতে যখন আসিতে পারিয়াছে, সিমলা পর্যন্ত বাকি পাহাড়ী পথটুকু উৎরানো তার পক্ষে এমন কিছুই নয়। মেনকাকে আমি যে-ভাবে মানুষ করিয়াছি, সে-কথা চিন্তা করিলে তার বর্তমান মানসিক পরিস্থিতিতে সুটকেস মাত্র সম্বল করিয়া সিমলায় যাইতে যে বিশেষ আপত্তি হইবে না তা বুঝি। আপত্তিটা আমার নিজের।

তবে? মেনকাকে এখন দিল্লীতেই রাখিব, না কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিব! ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুম ভাঙিল গৃহিণী অমলার ডাকে।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—সদ্যস্নাতা অমলার এক হাতে ধূমায়িত চা, অন্য হাতে গরম নিমকি। কিন্তু তার কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের নীচে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আবার চোখ বুজিলাম।

ঠক ও ঠকাস করিয়া দুইটা শব্দ হইল—চা ও নিমকি টিপয়ের উপর রাখা হইল বোধ হয়।

"জেগে মানুষ ঘুমোয় কি করে বুঝি নে। তা বাপু রোজ তো ডাকি নে। নিজেই কথা দিয়েছিলে—আগামী রবিবার প্রাতে অতীনদের বাড়ি নিশ্চয় যাব। এদিকে ঘড়িতে আটটা বাজতে চলল—সকালে যাবে—না বিকালে যাবে তা বলবে কি?"

কয়েক মিনিটের মধ্যে চা ও নিমকি খাইয়া পথে বাহির হইলাম।

অমলার মামাতো বোন রুবির স্বামী অতীন আমার বাল্যবন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা ধাপ উৎরাইবার সময় সে সরস্বতীর চেয়ে লক্ষ্মীর বন্দনা-সুরগুলিই গোপনে সাধিয়া রাখিয়াছিল তাহা জানিতে পারিলাম—যখন শুনিলাম বি-এ পাশ করার কয়েক মাসের মধ্যে সে অর্ডার সাপ্লাইএর কাজে নামিয়া মোটা কিছু কামাইতেছে। তারপর গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েকটা বছরে রৌদ্রোজ্জ্বল বাঁধানো পথ বাহিয়া অতীনের টাকা আসিয়াছে মুঠায় মুঠায়, ব্যাঙ্কের খাতার পৃষ্ঠাগুলি পূর্ণ করিয়া ও রুবির সর্বাঙ্গ ভরিয়া।

অমলার কাছে অতীন সেদিন বলিয়া গিয়াছিল, সে নাকি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেনের জন্য একটা ভালো কাজ জুটাইয়া দিতে পারে। তাই ঠিক করিয়াছিলাম এই রবিবার অতীনের সহিত আলোচনা করিয়া একটা কিছু স্থির করিব।

ছোট ভাই রমেনকে বর্তমানে বেকার বলিয়া পরিচয় দিলে তাকে ছোট করাই হইবে। দু'বছর আগে সে বি-কম্ পাশ করিয়াছিল এবং এ যাবৎ অর্থকরী কাজে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে না পারিলেও সে বেকার নয়। দু'বছর আগে সে যেমন বিলুচিস্থান থেকে লিথুনিয়া পর্যন্ত বহু দেশের বহু জাতির সমাজনীতি ও রাজনীতি লইয়া প্রচুর গবেষণা করিত, বর্তমানেও তেমনি আফ্রিকার মাদাগস্করী সাহিত্যের সাম্প্রতিক বিবর্তন ও দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডারে ডেমোক্রাটিক দলের নবোদ্যম, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। সুতরাং রমেনকে বেকার আখ্যা দিলে আমার নিজেরই যে অখ্যাতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতীনের বাড়ি পৌঁছিতে একটু দেরী হইল। আসিয়া শুনিলাম, অতীন কিছুক্ষণ আগেই বাহিরে গিয়াছে, তবে গাড়ি লইয়া গিয়াছে বলিয়া শীঘ্রই ফিরিবে এবং আমি যেন তার জন্য অপেক্ষা করি।

বসিব কি উঠিব ভাবিতেছি এমন সময় অতীনের স্ত্রী রুবি আসিয়া আমাকে প্রায় টানিতে টানিতে তার নিজের ঘরে লইয়া গিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিল :—"বাবাঃ, সেই যে কাল আসবো বলে চলে গেলেন তারপর এই এতদিনে আর দেখা নেই। যাক আজ আর সহজে ছাড়ছি নে, অনেক

কথা আছে। ভালো কথা—ওঁর এক লেখক বন্ধু এই বইটা দিয়েছেন, আর এই বইটার—দাঁড়ান আগে চা নিয়ে আসি, তারপর সব বলছি—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া রুবি আমার হাতে একখানা সুন্দর মলাটের ঝকঝকে নূতন বই দিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইল।

রুবি চা আনিতে গেল, কিন্তু তার রঙীন শাড়ির ঝলমলানির হাওয়া ও সারা অঙ্গে দেড় সের ওজনের অলঙ্কারের মৃদু ঝন্ঝনানির রেশ রাখিয়া গেল।

সম্পর্কে শ্যালিকা হইলেও রুবিকে খাতির করিয়া চলিতে হয়। তার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনে সে সদাসর্বদা আর্টের আটঘাট বাঁধিয়া চলা ফেরা করে। মাদুর ও সোফায়, পিলসুজ ও টেবিল ল্যাম্পে মিলন ঘটাইবার যাদুমন্ত্র নাকি তার জানা আছে।

রুবি চা আনিতে গেলে নূতন বইখানিতে মনোনিবেশ করিলাম। লেখক হলধর মিত্রের সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও পুস্তকের বহিরাবরণ, সাজসজ্জা ইত্যাদি দেখিয়া মিত্র মহাশয়কে ঈর্ষা না করিয়া পারিলাম না। দুই পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—'উৎসর্গ—অক্লান্তকর্মী বাণিজ্য-বীর বন্ধুবর অতীন্দ্রনাথের করকমলে।'

মিত্র মহাশয়কে মনে মনে নমস্কার জানাইলাম। একটি বিশেষ বিষয়ে তিনি আমার তমসাচ্ছন্ন মনের উপর আলোকপাত করিলেন। আমাদের পাড়ার কাউন্সিলার থেকে মোড়ের ঐ পোষাকের দোকানের স্ফীতবপু মালিক পর্যন্ত অনেকেরই সদ্গুণের পরিচয় পাইয়াছি বহু লেন-দেনের ভিতর দিয়া, কিন্তু পরিচিত সদাশয় ব্যক্তিগণের কারও হাতে আমার একখানি পুস্তকও তুলিয়া দিবার কথা এযাবৎ মনে আসে নাই। লেখকরূপে গুণীজনের গুণ স্বীকারের সহজ উপায়টি চোখে আঙুল দিয়া শিখাইবার জন্য মিত্র মহাশয়কে আবার নমস্কার।

স্থির করিলাম—যে কোম্পানির প্রচার বিভাগটি আমার ঘাড়ে চাপানো আছে সেই কোম্পানির বড়কর্তার নামেই আমার পরবর্তী উপন্যাস উৎসর্গ করিব।

রুবি ফিরিয়া আসিল চা ও খাবার লইয়া। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া গার্হস্থ্য উপন্যাসখানির জন্য হাত বাড়াইতেছি এমন সময় রুবি প্রশ্ন করিল—"বলুন তো সতিদা, জানা নেই শোনা নেই, বাসে একদিন আলাপ হলো—তাতেই মানুষ প্রেমে পড়েছে বলে ব্যক্ত করতে পারে?"

কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকুরিবৃত্তির সন্ধানে আসিয়া কারুর হৃদয়বৃত্তির প্রশ্ন উঠিবে তা জানিতাম না। তবু রুবির কাছে ঠকিতে চাই না বলিয়া পাল্টা প্রশ্ন করিলাম: "কেন, আলাপের পক্ষে বাসটা ভারী বিশ্রী জায়গা বলে মনে হয় না কি?"

রুবি ঠোঁট উলটাইয়া বলিল: "আহা, তাই বলছি নাকি? মানে—একদিনের আলাপের সূত্র ধরে—"

বাধা দিয়া বলিলাম: "সূত্রের গোড়া তো ঐ এক দিনের আলাপ থেকেই—"

—"সে কথা হচ্ছে না। মানে—ঐ আলাপ থেকেই হঠাৎ প্রেমে পড়বে, এ কেমন কথা?"

তার্কিক রুবিকে নিরস্ত করার একমাত্র উপায়, তার কথায় সায় দেওয়া। তাই বলিলাম—"তা যা বলেছো; ও সব ক্ষেত্রে একটু র'য়ে স'য়ে এগুতে হয়। যেমন সর্বাগ্রে দশখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে—'আমি শ্রীমান অমুক সেদিন বাসে শ্রীমতী অমুকার সহিত যে আলাপ হইয়াছিল তাহাতে আমি তাহাকে ভালোবাসিয়াছি।' তারপর—বিজ্ঞাপনটা যদি শ্রীমতী অমুকার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে তখন গাজনের বাজনাদারদের একজনকে ধরে এনে শ্রীমানের ভালোবাসার কথাটা ঢাক পিটিয়ে শ্রীমতীর নিজ পাড়ায় প্রচার করবে। তাতেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তখন করবে—"

—"তখন করবে হাতী।"

রুবি কথঞ্চিৎ চটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাসে কারুর সঙ্গে আলাপ করে মনটা তোমার—"

ফিক করিয়া হাসিয়া রুবি বলিল: "আমার হলে তো কোন কথাই ছিল না। ফ্যাসাদ বাধিয়েছেন হলধরবাবুর হিরো।"

—"হলধরবাবুর হিরো?"

"হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না, শুধু বাসেই চড়েছে।"

—"হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না তাতে তোমার কি?"

—"আমার কি মানে? হলধরবাবুর এই বইটার যে আমরা ফিল্ম তুলছি।"

—"তাই না কি?"

—"আহা, জানেন না যেন কিছু।"

—"শুনেছিলাম বটে অতীন একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলবে, কতদূর এগিয়েছে তা জানতাম না।"

—"কেন, অমলাদি কিছু বলেনি আপনাকে?"

—"হলধর মিত্রের উপন্যাসের ফিল্ম হবে এতে অমলারই বা বিশেষ করে জানবার কি আছে?"

—"আছে সত্যেন, অমলারও জানবার প্রয়োজন আছে বই কি—" বলিতে বলিতে অতীন আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

ব্যাপার কিছুই আঁচ করিতে না পারিয়া অতীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোদের মতলবটা কি বলতো।"

অতীন সহাস্যে উত্তর করিল—"ভয় নেই, অমলাকে ফিল্মে নামতে হবে না।"

—"হবে না? বাঁচালি ভাই।"

অতীন একটু গম্ভীর হইয়া বলিল: "তুমি তো বাঁচলে, এখন আমাকে বাঁচাও।"

বলিলাম: "আমি এসেছি রমেনের জন্যে চাকরির উমেদারি করতে; এর মধ্যে তোমাদের ফিল্মের হিরোর হাত থেকে সবে সামলিয়ে উঠেছি, এখন তুমি ডেকে আনছো ঘরোয়া বিবাদ; সুতরাং আমি নিজের পথ দেখি।"

অতীন আমার হাত ধরিয়া বলিল: "আরে ভাই, বোস বোস। সব কথা বলছি। তুই বোধ হয় শুনেছিস, লেখক হলধর মিত্তিরের এই বইটার আমরা ফিল্ম তুলছি। কিন্তু ছবিটা যত এগুচ্ছে, রুবির মেজাজও তত গরম হচ্ছে—"

রুবি ফোঁস করিয়া বলিল: "আমার মেজাজটাই শুধু দেখলে?"

জিজ্ঞাসা করিলাম: "এ সব ব্যাপারে রুবির মাথা ঘামাবার কি থাকতে পারে?"

অতীন বুঝাইয়া দিল। তার কতকগুলি পৃথক ব্যবসাও আছে; তাই মোট লাভের উপর কোথায় অবশ্য-দেয় একটা মোটা টাকা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তার এই ফিল্ম কোম্পানির মালিকানা রুবির নামেই লিখাইয়াছে। রুবি সম্প্রতি শুধু কাগজে কলমে মালিক হইতে চায় না, কোম্পানির উপর ষোল আনা স্বত্ব কাজেও জাহির করিতে চায়। হাজার হোক, অতীনের চেয়ে সিনেমা সম্বন্ধে তার জ্ঞান অনেক বেশী। ফলে, একাধারে কাহিনীকার ও পরিচালক হলধরবাবু পুস্তকের কাহিনী ও সংলাপ বারকতক ঢালিয়া সাজিয়াও শেষ পর্যন্ত রুবির কাছে হার মানিয়া ছুটি চাহিতেছেন।

এতক্ষণে মিত্র মহাশয়ের আসল অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। মুখে বলিলাম—"ব্যাপার তা হলে মন্দ দাঁড়াচ্ছে না।"

অতীন বলিল: "মন্দটা সামলানো যেতে পারে, যদি আপাতত তোর ভাই রমেনকে হলধরবাবুর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট্ করে নিই।"

—"রমেনকে?"

—"আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একটা ব্যবসায় নামতে হলে তার বাজারে ঢোকবার যতগুলো দরজা আছে সবই চিনে রাখতে হয়। ছায়া জগতের সম্পাদকের কাছে শুনলাম—রমেন ফিল্ম সম্বন্ধে একস্‌পার্ট; কাগজে লেখে, রেডিয়োতে বক্তৃতা দেয়—অবশ্য ছদ্ম নামে।"

—"তাই নাকি?"

—"তুই তো কোন খবর রাখিস না। যাক্ সে কথা। এখন তুই মত করলেই ওকে কাজে লাগিয়ে দিই।"

—"রমেন নিজে যদি রাজী হয়, আমার অমত হবে না।"

অতীন মরুব্বিয়ানা সুরে বলিল: "অবশ্য তোদের মতের অপেক্ষায় আমি বসেছিলাম না। তোর আসতে দেরী দেখে আমি নিজেই চলে গেলাম তোদের বাড়িতে। তুই ছিলিনে বলে রমেনের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা গেল। ও শুধু রাজীই হয় নি, সিনেমা ব্যাপারে আমাকে কিছু উপদেশও দিয়েছে। অমলাও ভারী খুসী; বল্লে—জহুরী না হলে কি আর জহর চিনতে পারে।"

তাইতো, রমেনের সম্বন্ধে এতদিন অবিচারই করিয়াছি। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ছাড়া সিনেমা বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে যে একস্‌পার্ট হইয়াছে, একথা

আজ জানিয়া মনে মনে গর্ব বোধ করিলাম। কিছুদিন আগে কে যেন বলিয়াছিল, রমেন নৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক একখানা চিঠি লিখিয়াছিল ফ্রেড্ অস্টারকে। সে-চিঠি পড়িয়া ফ্রেড্ অস্টার নাকি অ-স্টার জনোচিত মুখভঙ্গী করিয়াছিল। এখন বুঝিলাম—কথাটা নেহাৎ নিন্দুকের রটনা।

রুবি বলিল: "এত ভাবছেন কি সতিদা? রমেন-বাবুকে পেলে হাতের বইখানা শেষ হলে হলধরবাবুকে একেবারেই ছুটি দেবো।"

রুবি দেখি মিত্র মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছে।

অতীন বলিল—"তারপর নতুন ধারায় কাজ চলবে। রুবি প্রডিউসার, আর রমেন ডিরেকটার—মানে ফিল্ম জগতে যুগান্তর।"

অতীন ঝানু ব্যবসাদার।

অতীন বলিল—"আর একটা কথা আছে, কথাটা অবশ্য রুবির।"

—"রুবির?" বলিয়া রুবির দিকে তাকাইতেই সে যে ভঙ্গীটা দেখাইল, রূপালি পর্দায় তাহা কতখানি মানাইত জানি না, তবে সিনেমা সংক্রান্ত ব্যবসাদারি কথার মাঝখানে একেবারে অচল।

ভ্রূ-জোড়া কপালে তুলিয়া রুবি বলিল—"না না, আমি তোমার ও-সব কথার মধ্যে আর থাকতে চাইনে।"

হঠাৎ ওর কি হইল বুঝিলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি রুবি?"

অতীন বিষয়টা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল। নিতান্ত আত্মীয়জন বলিয়া আমার উপন্যাসের ওপর ওদের যথেষ্ট দাবী আছে এবং পাঁচমাস আগে আমি না কি কথাও দিয়াছিলাম যে কোম্পানিটা খোলা হইলে লেখা দিয়া ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

কবে কি কথা দিয়াছিলাম মনে করিতে পারিলাম না। হইতে পারে, রুবির মুখের তর্কের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য কোন দিন কথার কথা একটা কিছু বলিয়া ফেলিয়াছি।

অতীন শেষে সোজাসুজি বলিল: "তুই বর্তমানে যে নভেলটা লিখছিস, শুনলাম তার মধ্যে এমন সব মাল-মশলা আছে যার ফিল্ম তুল্লে—"

বাধা দিয়া বলিলাম—"কি যা তা বলিস। যত সব বাজে খবর কোত্থেকে পেলি জানি নে—"

—"খবর যেখান থেকেই পাই তোর জেনে কাজ নেই। তুই শুধু ডজনখানেক গান জুড়ে দিবি।"

—"গান?"

—"গান হচ্ছে ফিল্মের প্রাণ—"

—"অর্থাৎ আমার প্রাণান্ত।"

অতীন আমার কথায় কান না দিয়া বলিল—"অমলারও খুব ইচ্ছে…তাই আগে থেকে বলে রাখছি বইটা ছাপাবার আগে আমার সঙ্গে যদি পাকা বন্দোবস্ত না করিস, তা হলে—কি আর বলবো—"

রুবি বলিল—"থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না।"

রুবির কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলাম—"সেই ভালো, যা বলবার তুমিই একদিন ধীরে সুস্থে বলো। অনেক বেলা হয়েছে, এখন উঠি—" বলিয়া দরজার দিকে পা বাড়াইলাম।

রুবি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া নীচু গলায় বলিল—"লেখা হলে বইটা কিন্তু আমার হাতে দেবেন, ওকে নয়।"

—"শেষ তো হোক আগে"—বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম।

পথে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু বাঁচিলাম মনে করিলেই বাঁচা যায় না। কোথা থেকে দ্বিতীয় রিপু আসিয়া মনের মধ্যে ফণা তুলিয়া কার উপর ছোবল মারিবে খুঁজিতে লাগিল। আমার লেখার পাণ্ডুলিপি অমলা ছাড়া আর কেউ নাড়াচাড়া করে না। তার কি মাথা খারাপ হইয়াছে?—আমার অসমাপ্ত উপন্যাসের পাতাগুলি অতীনের কাছে খুলিয়া না ধরিলে তার কি চলিত না?

বাড়ি আসিতেই অমলা বলিল—"মাছের তেলের বড়া ভাজা হয়েছে, দু'খানা গরম গরম খাবে?"

—"মাছের তেলের বড়া?"

—"দাঁড়াও, নিয়ে আসছি" বলিয়া অমলা রান্নাঘরে গেল।

মাছের তেলের বড়া খাইতে মুখরোচক। তাই

জিনিষটার ওপর আজও লোভ আছে। হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসিয়াই রাগটা প্রকাশ করা উচিত হইবে না।

ডিসে করিয়া খানকতক সদ্য-ভাজা বড়া আনিয়া মিষ্ট হাসিয়া আবদারের সুরে অমলা বলিল—"অতীনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

ইচ্ছা হইল বলি—"না", কিন্তু শেষে অমলাই বলিল—"তুমি বেরুবার আধঘণ্টা পরে দেখি অতীনবাবু নিজেই হাজির—হাতে নিয়ে এতবড় এক মাছ।"

বড়া ফুরাইলে মনে মনে মুসাবিদা করিতে লাগিলাম—কোথা থেকে জেরাটা সুরু করিব।

অমলা বলিল : "কি গো, কথা কইছো না যে ?"

এবার বলিয়া ফেলিলাম—"রমেনের কাজটা তোমরাই যখন ঠিক করে রেখেছিলে, অতীনের বাড়ি যাবার জন্যে সকাল বেলা মিছিমিছি আমাকে এত তাগাদা দেবার দরকার কি ছিল ?"

অমলা অবাক হইয়া বলিল—"আমরাই ঠিক করেছিলাম মানে ?"

—"তোমরা করো নি ?"

—"না, অতীনবাবু ঠাকুরপোর কাছে আজ বল্লে যে কাল তার সঙ্গে তোমার যখন দেখা হয়েছিল তখনই কথাবার্তা তোমরা ঠিক করেছিলে। আমি বরং ভাবলাম যে কালকের কথাটা যদি আমাকে জানাতে—তা হলে ভোর বেলা তোমায় ডাকাডাকি করতে হতো না। বেশ লোক তুমি, নিজেই সব ঠিক করে এখন উল্টো চাপ দিচ্ছ আমার ওপর।"

বুঝিলাম, হলধরবাবুকে লইয়া যে সমস্যাটা দাঁড়াইয়াছে তার একটা নিষ্পত্তি করিবার জন্য অচিরে রমেনকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবসাদার অতীন এই চালটি চলিয়াছে।

কিন্তু পাণ্ডুলিপির কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। বলিলাম : 'সে যাই হোক, আমার অর্দ্ধেক লেখা বইটা অতীনকে দেখাতে গেলে কেন ?'

—কি যা তা বলো ?

—'তবে সে বলে কি করে যে আমার নতুন বইটার ফিল্ম তুললে জমবে ভালো, আর তোমারও তাই ইচ্ছে—'

অমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল : 'লোকে শাক দিয়ে মাছ ঢাকে, আর তোমার বন্ধু আজ মাছ দিয়ে শাক ঢেকে গেছে।' অমলা হাসিতে হাসিতে বিষম খাইবার উপক্রম করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম : 'ব্যাপার কি ?'

—'ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করো, সে সব জানে।' বলিয়া অমলা রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অমলার উপর মিছামিছি চটিয়া গিয়া রাগটা যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া ফেলি নাই, সে জন্য নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম। বেচারি অনেকদিন পরে মস্ত একটা মাছ লইয়া যখন উনানের আঁচে তাতিয়া উঠিয়াছিল তখন যদি আমার মনের দ্বিতীয় রিপুটা ফণা তুলিয়া তাকে ছোবল মারিত, ফলটা তাহাতে ভালো হইত না।

খাইতে বসিয়া রমেনই কথাটা পাড়িল। রুবি ফিল্মের সহকারী পরিচালকের পদ সে পাইয়াছে।

আহারাদির পর পাণ্ডুলিপিটা লইয়া বসিলাম। আর কয়েকটা পরিচ্ছেদ জুড়িয়া দিতে পারিলেই বইখানা শেষ হইবে। কিন্তু যে-সব দর্শক আমার উপন্যাসের ফিল্ম দেখিয়া মাথা ঘামাইবে—কাহিনীর মার-প্যাঁচে তাদের মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে এমন সব উপাদান আমার উপন্যাসে আছে কিনা জানি না। নায়িকা মেনকাকে যে সব ধাতু দিয়া গড়িয়াছি তার মধ্যে কোনটা আসল আর কোনটা মেকি বলিয়া রূপালি পর্দায় ফুটিয়া উঠিবে, তাও বিবেচ্য। আর নায়ক প্রবীর···তার কথা তো ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তাকে কোথায় যেন ফেলিয়া আসিয়াছি, স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এ কয়দিন মেনকাকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। প্রবীর তো অতি সাধারণ নিরীহ মানুষ, কিছুটা মুখচোরাও বটে। কয়েক শত দর্শকের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে দিয়া রীতিমত অভিনয় করানো হইতেছে, এ কথা ভাবিলেই তার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে নিশ্চয়। চলনে যার চাল নাই, বাক্যে ব্যঞ্জনা নাই, এরূপ একটি নায়ককে স্টুডিয়োতে পাঠাইলে সেখানকার কর্মকর্তারা তাহাকে লইয়া কি করিবে ?

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি গোবর-গণেশকে উপন্যাসের নায়ক করিলাম কোন আক্কেলে ? উত্তরে বলিতে পারি যে গোবর গণেশই হউক বা আর যাহাই হউক, নায়িকা মেনকা তাকে ভালোবাসিয়াছে, তাও আবার রীতিমত প্রেমে পড়িয়া। প্রেমে পড়িবার আসল

ইতিহাসটা এক্ষেত্রে একেবারে অবান্তর এবং সে বিষয়ে কারও কৌতূহল প্রকাশ না করাই উচিত। তবে এটুকু বলিতে পারি যে চঞ্চলা মেনকা হঠাৎ মুগ্ধ হইয়াছিল প্রবীরের মাথায় কদম ছাঁট চুল দেখিয়া, আর প্রবীর আকৃষ্ট হইয়াছিল মেনকার চোখের বিদ্যুতের ঝলকানিতে।

কেহ হয়তো বলিবে—পাইয়াছি। অর্থাৎ নায়ক গো-বেচারি হইলেও আপত্তি নাই, নায়িকার চোখের বিদ্যুতের ঝলকানিটাই আসর মাৎ করিবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে মেনকার চোখে বিদ্যুতের ঝলকানি থাকিলেও, কণ্ঠে তার সুর নাই। কারণ সঙ্গীতের কোন অঙ্গেই সে হাত বুলায় নাই। অবশ্য গাহিতে না পারিলেও কিছুটা সে নাচিতে পারে, তবে পায়ে ঘুমুর বাঁধিয়া তবলার তালে তাল রাখিয়া নয়। তার মন যাহাতে অধীর হয় সেই কাজে ছুটিবার জন্য পা দুটা তার নাচিয়া ওঠে এবং চলিবার সময় সে মাঝে মাঝে যেন নাচিয়া চলে। মেনকার নৃত্য-পরিচয় ঐ পর্যন্ত।

সুতরাং ভালোমানুষ নায়ক প্রবীরকে যতটা সম্ভব নেপথ্যে রাখিয়া একা মেনকাকে দিয়া কতকগুলা মুখস্থকরা কথা বলাইলেই সমজদাররা যে বাহবা দিবে তাতে সন্দেহ আছে।

তা ছাড়া কাহিনীর মধ্যে পরিস্থিতি বলিয়া একটা কথা আছে। কলমের গতি বাগ মানাইতে না পারিয়া উপন্যাসে যে সব ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছি সেগুলায় জোড়া-তালি দিয়া গল্পটা পর্দার উপর ঠিক মত খাড়া করিতে না পারিলে দর্শকরা হাততালি দিবে না।

কাজেই অগ্র পশ্চাত বিবেচনা না করিয়া উপন্যাসটা স্টুডিয়োতে পাঠাইলে ওখানকার কলা-রসিকদের কাছে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না এবং অতীন তখন বাল্যবন্ধু বলিয়া ক্ষমা করিবে না; রমেনও দাদার লেখা বলিয়া খাতির করিয়া মাথায় তুলিবে না; আর আর্টের আর্ট-ঘাট বাঁধিয়া চলে যে রুবি, তার কাছে তখন মুখ দেখাইতে পারিব না।

ভাবিতে ভাবিতে মাথায় কতকগুলা আইডিয়া কিল-বিল করিয়া উঠিল। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধাইল মেনকার দিল্লী-যাত্রা পর্বটা। ওটার একটা গতি করা দরকার সবার আগে, নহিলে…

—'হ্যাঁগো, জিবরাল্‌টারি গোঁপ কোত্থেকে এলো জানো?'—অমলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—'জিবরাল্‌টারি গোঁফ!'

শব্দটা নিজেই সংশোধন করিয়া অমলা বলিল: 'জিবরাল্‌টারি নয়, গিল্‌বার্টি গোঁফ—'

বলিলাম—'তাই বলো। তা হঠাৎ গোঁফের কথা কেন?'

—'গিল্‌বার্টি গোঁফ যদি হতে পারে, তা হলে প্রবীর-ছাঁট চুল হবে না কেন?'

—'প্রবীর-ছাঁট চুল! এ সব কি বলছো?'

অমলা বলিল: 'ঠিকই বলছি মশাই। তোমার প্রবীরকে ফিল্মে তুললে ওর মাথার কদম ছাঁট চুলের বাহার দেখে লোকে কদম ছাঁটের নতুন নামকরণ করবে—প্রবীর-ছাঁট, তা বুঝি জানো না? প্রবীর-ছাঁট নামে কদম-ছাঁটের তখন কদর বাড়বে।'

ভাবিলাম উত্তরে বলি: তাইতো, এ সম্ভাবনার কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই; আর ফিল্মে প্রতিফলনে ও সাধারণের পরিগ্রহণে এক একটা পদার্থ কেমন ভাবে উৎরাইয়া গিয়া নব কলেবর ও অভিনব সংজ্ঞা লাভ করে, আগে থেকে সে বিষয়ে কিছু ধারণা করা যায় না। মুখে বলিলাম: 'আমি কিন্তু ভাবছি মেনকার কথা। ওকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছি। দশের পরিচ্ছেদে ওর দিল্লীওয়ালা বন্ধুদের সিমলেতে পাঠিয়ে তারপর বারোর পরিচ্ছেদে মেনকাকে দিল্লীতে টেনে এনে শেষ রক্ষা করবো কি করে তাই ভাবছি। অর্থাৎ ওর একটা দীর্ঘ অজ্ঞাত বাস অধ্যায় দেখাতে চাই; সেটা কোথায় এনে উপসংহার টানবো—'

অমলা বাধা দিয়া বলিল—'ও এই কথা? আমি যা ভেবেছি তাই শোনো। প্রথমে, ঐ অজ্ঞাতবাসের অধ্যায়টা খুব খাটো করতে হবে। প্রবীর রাগ করতে জানে কিনা, তাই পরখ করবার জন্যেই মেনকা গেছে দিল্লীতে; কিন্তু সেখানে ওর একা একা ভালো লাগছে না। এদিকে মেনকার দিল্লী যাওয়ার খবর পেয়ে প্রবীর রাগ না করে, প্রকাশ করলে চাঞ্চল্য। অর্থাৎ একটা এরোপ্লেনে চড়ে সেও গেলো দিল্লীতে।'

—'তারপর?'

—'তারপর'—অমলা বলিল—'তারপর দেখা গেল,

প্রবীর যখন দিল্লীর হোটেলে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে, মেনকা তখন কুতব-মিনারে উঠে গান গাইছে। হাওয়ায় সেই চেনা গলার সুর ভেসে এসে হোটেলের জানলা দিয়ে ঢুকে প্রবীরের মরমে প্রবেশ করলো। প্রবীর তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে কুতবমিনারের তলায় এসে মেনকার উদ্দেশ্যে রুমাল উড়াতে লাগলো—'

বাধা দিয়া বলিলাম—'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মেনকার গলায় গানের কোন সুরই যে দিই নি—'

অমলা বলিল: 'আহা, তুমি না দিলেও অতীনবাবুর স্টুডিয়োর কলাবিদরা মেনকার গলায় সুর যে দেবে না, তা ধরে নিচ্ছ কেন ?'

—'যাক, তারপর ?'

—'তারপর'—অমলা বলিল—'মেনকা আর প্রবীর আর একটা এরোপ্লেনে চড়ে কলকাতায় ফিরে আসবে।'

আমি বলিলাম: 'এরোপ্লেনে চড়ে নয়, ঘোড়ায় চড়ে ওরা কলকাতায় ফিরবে—'

—'ঘোড়ায় চড়ে দিল্লী থেকে কলকাতায় আসবে ?'

বলিলাম: 'হলধরবাবুর হিরো ঘোড়ায় চড়তে জানে না। আমার কাহিনীর নায়কনায়িকারা ঘোড়ায় চড়ে হাজার মাইল পথ পার হতে থোড়াই করে—তাই যদি দেখানো যায়—'

অমলা বলিল: 'আঃ থামো। আগে বলো, হলধরবাবু কে ?'

বলিলাম: 'তাও জানো না ? তুমি দেখি কিছুই জানো না।'

অমলা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল: 'আমার জেনে কাজ নেই, শুনে কাজ নেই। আমার উপদেশ যদি ভালো না লাগে, তা হলে পাঁচজন যারা ছবি দেখে তাদের জিজ্ঞেস করো গে। এখন আমায় ঘুমুতে দাও।' কথাটা শেষ করিয়াই অমলা ধুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ঠিক কথা। আপনারা পাঁচজন, অর্থাৎ দশজন বাঁচিয়া থাকিতে আমি অনর্থক ভাবিয়া মরিতেছি কেন ? আপনারা এককালে আমার উপন্যাস পড়িয়া কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন; আসুন, আজ আমাকে পরামর্শ দিন—সাতশো বছরের প্রাচীন কুতবমিনারের চূড়ায় উঠিয়া মেনকা খাঁটি আধুনিক একখানা গান গাহিবে, না ডাউন দিল্লী মেলে চড়িয়া বিরহ-কাতর প্রবীরের কাছে সোজাসুজি ফিরিয়া আসিবে।

আপনারা পাছে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন, সে জন্য আমিই আপনাদের আগামী শনিবার বিকালে চায়ের নিমন্ত্রণ করিলাম। অমলার জন্য ভয় নাই; কষায় অম্ল ঝাল পানসে পদার্থগুলি আপনাদের পাতে পরিবেশন করিবে না। শনিবার বিকালে আসিবার সময় আপনারা যে কিছু চিনি ও এক কৌটা জমাট দুধ সঙ্গে আনিবেন সে-কথা অবশ্য বলিয়া দিতে হইবে না।

স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে !

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পর্ব্বতময় ভীষণ বনানী ঘেরা—
দুর্গম পথে নাহি কোন পথ-চারী।
এ হেন সময় বন্ধু কে এলে নামি—
অঙ্গনে তব ধীর পদ সঞ্চারি ?
অন্ধ-কারায় বন্ধ্যা রজনী শেষে,
বন্ধুর-পথ-যাত্রী থামিল এসে;
কণ্টকাহত রক্ত-ক্ষরিত পদে,
মৃত্তিকা বুকে চরণ চিহ্ন আঁকি;

তন্দ্রামগ্ন নিশীথে উপল-গাত্র
ধ্বনিত করিয়া কেবা সে ফিরিল ডাকি !
তুমি কি সহসা আধ-জাগ্রত হয়ে,
স্মরিলে তোমার পুরাতন পরিচয়ে,
জড়িত-কণ্ঠে ডাকিলে সে প্রিয়তমে
কর-কম্পনে জাগাতো যে তোমা আসি;
শিথিল মনের স্খলিত বাসনা লয়ে—
ঝরিল সে বাণী, 'আজো তোমা ভালবাসি'!

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রৌলট আইন এবং পাঞ্জাবের লোমহর্ষক অত্যাচার আঘাত করিল জনসাধারণের মর্ম্মমূলে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের কোটি কোটি নরনারী আবার নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিল তাহাদের স্বাধীন সত্তাকে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করেন এবং তুর্কী সুলতানের উপর নানা অপমানজনক সন্ধি-সর্ত্তও আরোপ করেন। ইহারই ফলে ভারতীয় মুসলমান-সমাজ হইলেন বিক্ষুব্ধ এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ১৯২০ সালের ২৮শে মে বোম্বাই সহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইতিপূর্ব্বেই গান্ধীজী নিখিল ভারত মোস্‌লেম লীগ কৌন্সিলের এলাহাবাদ অধিবেশনে অসহযোগের অর্থ ও কার্য্যকারিতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দুগণের সহিত একযোগে কাজ করিবার প্রয়োজনীয়তা মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই সময় অনুভব করেন। ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পাইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অমৃতসহর অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার-অনাচারের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বৃটিশ-প্রস্তাব অসন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল। কংগ্রেসের সহিত মোস্‌লেম লীগেরও যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতেও উক্তরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

অহিংস অসহযোগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে সূচনা করিল এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের। সরকারের সাহায্য ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আত্মশক্তির উপর নির্ভরতাই অসহযোগের প্রধান কথা।

সরকারী বিদ্যালয়, আইনসভা, বিচার-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বর্জ্জনের বাণী লইয়া গান্ধীজী এই আন্দোলনের সূচনা করিলেন। মাদক-দ্রব্য ও বিদেশী পণ্য বর্জ্জন এবং স্বদেশী প্রচারের মন্ত্রে সমগ্র দেশ যেন প্রাণময় হইয়া উঠিল। প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারত-আগমন উপলক্ষে ১৯২১ সালের ২১শে নভেম্বর ঘোষিত হইল হরতাল। এই উপলক্ষে ঐদিন হইতে কয়েক দিন যাবৎ বোম্বাই-এ ভীষণ দাঙ্গা চলিতে লাগিল। দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে প্রায়োপবেশন করিতে হইল।

অর্ডিনান্স রচনা করিয়া এই সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চিত্তরঞ্জন, মতিলাল, জওহরলাল প্রভৃতি নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হইলেন। মাহাত্মাজী সিদ্ধান্ত করিলেন বার্দ্দৌলীতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে।

কিন্তু ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উক্ত দিবসে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় পুলিশের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত একদল লোক চৌরীচৌরা নামক থানার একজন দারোগাকে একুশজন কনেষ্টবলসহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করিল। অহিংসায় চির-বিশ্বাসী গান্ধীজী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের জন্য দেশ তখনও প্রস্তুত হয় নাই। ইহার ফলে, ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দৌলীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বার্দ্দৌলীতে করবন্ধ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল এবং গান্ধীজী তাঁহার আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য যাঁহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় তাঁহাদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সকল মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের অনেকে এবং এতদিন যাঁহারা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ কংগ্রেসের গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া পুনরায় কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্ট দল গঠন করিবার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় এই সময় অবনী মুখোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং দেশের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদও প্রসারিত হইতে থাকে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালেই সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের সূচনা হয় এবং নানা গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিপ্লবীরা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছিলেন, গান্ধীজী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করায় তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মনে সৃষ্ট হইল তীব্র প্রতিক্রিয়ার। আন্দোলন দমনকল্পে কর্তৃপক্ষ যে চণ্ডনীতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন, তাহাতেও দেশের আবহাওয়া পুনরায় বিষাক্ত হইয়া উঠিল। এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র (যিনি ১৯৩১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পুলিশের গুলিতে হিজলী বন্দীনিবাসে প্রাণ দিয়া শহীদ হইয়াছেন) প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন দলের দ্বারা দুইটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদিগেরও ইঁহাদের সহিত যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায়।

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে বরেন্দ্র ঘোষ অন্য তিন জন সঙ্গীসহ অপরাহ্নকালে কলিকাতার শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করেন এবং পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের নিকট অর্থ দাবী করেন।

বিপ্লবীদিগের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র আর মুখে ছিল মুখোস। পোষ্টমাষ্টার ইতস্ততঃ করিলে তাঁহার প্রতি গুলি বর্ষিত হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিপ্লবীদের পলায়নকালে পোষ্ট অফিসের দুইজন কর্ম্মচারী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারে গিয়া আগ্নেয়াস্ত্রসহ বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়।

বরেন্দ্রের বাসস্থান খানাতল্লাস করিয়াও পুলিশ দুইটি রিভলভার হস্তগত করে। ঘটনার মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে বরেনের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়।

হাইকোর্টে বিচারের সময় বরেন্দ্র দোষ স্বীকার করেন এবং তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে তাঁহার দ্বীপান্তর দণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণও ছিল না; কিন্তু বিচারপতি মিঃ পেজ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ইহার পর হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে পুনর্বিচারে এবং প্রিভি কৌন্সিলে আপিল করিয়াও কোন ফল হইল না। শেষ পর্য্যন্ত রাজানুকম্পায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

এই ঘটনার পর সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি ষড়্‌যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয় কিন্তু জুরিরা অভিযুক্তদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করার জন্য মিঃ এস্, কে, ঘোষ তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করেন। আসামীদের পক্ষে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি মামলা পরিচালিত করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন-বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্র দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের ৩নং আইনে আটক করা হইল।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড সাধিত করিলেন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। মিঃ আর্ণেষ্ট ডে নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানিতে কাজ করিতেন। তিনি বাস করিতেন লোয়ার সার্কুলার রোডে অবস্থিত লর্ডস বোর্ডিং হাউসে। প্রতিদিনের ন্যায় ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে তিনি সকাল বেলা যথারীতি প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়া যখন চৌরঙ্গীতে হল এণ্ড এণ্ডার্সনের দোকানের সম্মুখে শো-কেসে জিনিষপত্র দেখিতেছিলেন, তখন অতর্কিতভাবে গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। চার্লস টেগার্ট বলিয়া ভুল করিয়াই গোপীনাথ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গুলিতেই মিঃ ডে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন কিন্তু গোপীনাথ তথাপি ক্ষান্ত হইলেন না। উপর্য্যুপরি আরও কয়েকটি গুলি তিনি সাহেবটির উপর বর্ষণ করিলেন। মোট সাতটি গুলি মিঃ ডে-র শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল।

গুলি বর্ষণ শেষ হইলে গোপীনাথ পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। জনৈক ট্যাক্সি-চালক ট্যাক্সি লইয়া তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিলে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। গুলি তাহার তলপেট ভেদ করিয়া গেল। পার্ক ষ্ট্রীট ধরিয়া ছুটিতে ছুটিতে গোপীনাথ একখানি মোটরগাড়ী দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ীর চালককে বলিলেন—তাঁহাকে লইয়া ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের দিকে গাড়ী হাঁকাইতে। গাড়ীর চালক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তিনি তাহার উপরও গুলি চালাইলেন। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে একজন দরোয়ান তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া আহত হইল।

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ও রিপণ ষ্ট্রীট যেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেখানে আসিয়া গোপীনাথ একখানি গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। মিঃ এ, ডব্‌লিউ, অগ্‌ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়া এই সময় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। কয়েকজন কনষ্টেবলও আসিয়া এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিল। গোপীনাথের শরীর তল্লাসী করিয়া পাওয়া গেল—একটি মশার পিস্তল, একটি পাঁচঘরা রিভলভার, কতকগুলি কার্ত্তুজ এবং কার্ত্তুজের খোল।



গোপীনাথ সাহা

ঘটনার দিনেই অপরাহ্নে মিঃ ডে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর যে দুই ব্যক্তি আহত হইয়াছিল, তাহাদেরও অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখিয়া তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হইল।

মিঃ ডে-র মৃত্যুতে কলিকাতার সাহেব মহলে রীতিমত উত্তেজনার সঞ্চার হইল। এম্পায়ার থিয়েটারে ১৪ই জানুয়ারি কলিকাতার ইউরোপীয় এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের এই উপলক্ষে এক প্রতিবাদ সভা হইল এবং বক্তৃতাও দেওয়া হইল তীব্র ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া। একটি প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে কোনও আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া দৃঢ় থাকিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইল এবং গভর্ণমেণ্টের উক্ত অনমনীয়তার নীতিতে ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হইল।

মিঃ রক্সবার্গ তখন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার

এজলাসে ১৪ই জানুয়ারি গোপীনাথের মামলা উঠিল। মিঃ ডে-কে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা এবং অপর তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত হইল। গোপীনাথকে আদালতে হাজির করা হইল কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করিলেন। গোপীনাথের পক্ষে কোনও আইনজীবী দণ্ডায়মান হন নাই। গোপীনাথ নিজেই মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামপুরে গোপীনাথ যে বাড়ীতে বাস করিতেন—মণিমোহন দাস ছিলেন সেই বাড়ীরই একজন ভাড়াটিয়া। তাঁহার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, গোপীনাথের পিতার নাম বিজয়কৃষ্ণ সাহা, গোপীনাথরা চার ভাই এবং তাঁহাদের জননী তখনও জীবিত। গোপীনাথ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামাচরণের সহিত শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনে বাস করিতেন এবং শ্যামাচরণই তাঁহার ভরণপোষণ করিতেন। শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউটে নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত গোপীনাথ পড়াশুনা করিয়াছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ বেভিন-এর সাক্ষ্যে প্রকাশ পাইল যে, শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিসে হানা দেওয়ার সময় যে রকমের কার্ত্তুজ ব্যবহৃত হইয়াছিল, গোপীনাথের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্ত্তুজও তাহারই অনুরূপ।

আদালতে যখন মামলার শুনানী চলিত, তখন গোপীনাথ বসিয়া থাকিতেন নির্ব্বিকারভাবে চুপ করিয়া। তাঁহারই বিরুদ্ধে যে হত্যার অভিযোগে মামলা চলিতেছে, তাহা তাঁহার হাব-ভাব দেখিয়া বুঝা যাইত না। তুচ্ছ সাক্ষ্য-প্রমাণাদির সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিল না। টেগার্ট সাহেবকেও শুনানীর সময় আদালতে আসিতে হইয়াছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ সমাপ্ত হইলে গোপীনাথ আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। সে বিবৃতি যেমন নির্ভীক—তেমনই চাঞ্চল্যকর।

গোপীনাথ তাঁহার বিবৃতিতে পাবলিক প্রসিকিউটরের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেও লালবাজারে ঘুরাফিরা করিতে দেখা গিয়াছে এবং একজন লোকের সহিত বহুবাজারের কোন একটি বাড়ীতে পুলিশ তাঁহাকে একদিন প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে—পাবলিক প্রসিকিউটরের এই উক্তি সত্য নয় বলিয়া তিনি জানাইলেন। তিনি বলিলেন, সকল সময় তিনি একাই বাহির হইতেন এবং সর্ব্ব সময়ই টেগার্ট সাহেবকে নিহত করার জন্ম তাঁহার লক্ষ্য থাকিত (এই কথাগুলি বলিবার সময় তিনি কঠোর দৃষ্টিতে আদালতে উপস্থিত মিঃ টেগার্টের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাস্য করিলেন)। গোপীনাথ জানাইলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি খুব ভালভাবেই চিনিতেন, কিন্তু টেগার্টেরই মত দেখিতে এক নিরপরাধ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছে। টেগার্ট সাহেব পরিত্রাণ পাওয়ায় তাঁহার দেশের একজন শত্রুকে নিপাত করিতে না পারার জন্য তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই আশা ব্যক্ত করিলেন যে, যদিও তাঁহার ভুল হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে অন্য কোনও দেশ-প্রেমিক যুবক থাকিলে তাহার দ্বারা তাঁহার অসম্পন্ন কার্য্য অধিকতর দক্ষতা সহিত নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হইবে।

শুনানীর পর গোপীনাথের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক হাইকোর্টের দায়রায় প্রেরিত হইল। তাঁহার রায় শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বিচারপতি পিয়ার্সনের এজলাসে হাইকোর্টে ১১ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইল।

গোপীনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্ন আদালতে কোনও আইনজীবী না থাকার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে. হাইকোর্টের দায়রায় বিচারের সময় কয়েকজন আইনজীবী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহারা যুক্তি দেখাইলেন যে, যেহেতু গোপীনাথ সুস্থমস্তিষ্ক নন, সেহেতু তাঁহার বিচার চলিতে পারে না।

জুরি মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল আটজন ভারতীয় ও একজন ইউরোপীয় লইয়া। আসামী সুস্থমস্তিষ্ক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার তখন জুরিদের উপর ন্যস্ত হইল। জুরিগণ গোপীনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরদিন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করিলেন যে, আসামী সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক। যাহা হউক, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া গোপীনাথ জানাইলেন, তিনি নিরপরাধ। সরকার পক্ষের সওয়াল জবাবের পর তিনি আদালতে এক বিবৃতি দিলেন। তাহাতে তিনি ঘোষণা করিলেন, টেগার্ট সাহেবকে তিনি বহুবার দেখিয়াছেন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ তিনি বহুবার তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন; এমন কি, একবার তিনি গুলি বর্ষণের জন্যও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃ-আদেশ না পাওয়ার জন্যই তিনি তখন গুলি করেন নাই। ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি অতিশয় মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। গৃহের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি বাহির হইয়া গড়ের মাঠে উপস্থিত হন এবং চলিতে চলিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান। তারপর সহসা একজন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহার টেগার্ট বলিয়া ধারণা জন্মে এবং তাঁহার উপরই তিনি গুলি নিক্ষেপ করেন। গোপীনাথ ইহাও জানাইলেন যে, জেলে জীবন যাপন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া যেন তদনুযায়ী দণ্ডবিধান করা হয়। তিনি তাঁহার মাতার নিকট গমন করিতে উৎসুক।

আসামী পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে গোপীনাথকে যখন আসামীর কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"টেগার্ট সাহেব হয় তো মনে করেন যে তিনি খুব নিরাপদ—কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়ে থাকলেও আমার অসম্পূর্ণ কাজের ভার আমার দেশবাসীর ওপরই দিয়ে গেলাম।"

তাহার পরদিন—অর্থাৎ ১৬ই ফেব্রুয়ারি জুরিরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিলেন। গোপীনাথকে তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে দোষী স্থির করিয়াছিলেন। জজ জুরিদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আদেশ দিলেন গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ডের। সেদিনও কাঠগড়া হইতে লইয়া যাওয়ার

ময় গোপীনাথ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আমার রক্তের প্রতি ফ'টায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ রোপিত হোক।"

জেলে থাকিবার সময় কানাইলালের মত গোপীনাথের শরীরের জনও পাঁচ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও দুশ্চিন্তা ল না এবং হাসি তাঁহার মুখে লাগিয়াই থাকিত। আসন্ন মৃত্যুর জন্য নি প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাঁহার এত নিশ্চিন্তভাব আসে কি করিয়া, হা ভাবিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হইত।

প্রেসিডেন্সি জেলে ১লা মার্চ্চ তারিখে গোপীনাথের ফাঁসি হইয়া গল। শব-সংকারের সুবিধা দিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন রা-হয়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির চেষ্টায় শব-সৎকারের নুমতি মিলিল, কিন্তু জেলের বাহিরে শবদেহ লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব ঞ্জুর হইল না। কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, জেলের অভ্যন্তরে চারিজন াত্মীয় গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির সময় জেল-গেটে উপস্থিত ছিলেন -ভিতরে প্রবেশের অনুমতি তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ফাঁসি শষ হওয়ার বহুক্ষণ পরে বেলা প্রায় সাড়ে আটটার পর গোপীনাথের াত্মীয়দের জেলের মধ্যে যাইতে দেওয়া হইল। শব-সৎকারের পর ঙ্গায় নিক্ষেপ অথবা গয়ায় পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে নাভি বা অস্থি গ্রহণ রিতে দেওয়া হইল না।

গোপীনাথের দেশপ্রেম এবং তাঁহার কর্ম্মপন্থার সমর্থনের ব্যাপার ইয়া বাংলার কংগ্রেসে মতবৈধম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জে এই ময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে গাপীনাথের কার্য্যের প্রশংসামূলক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু গান্ধীজী উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন না করায় পর বৎসর ফরিদপুর অধিবেশনে উক্ত গৃহীত প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গোপীনাথের প্রশংসাসূচক এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে অনেকগুলি ভোটও লাভ করিয়াছিলেন। গোপীনাথের নাম তখন সারা ভারতেই সাড়া তুলিয়াছিল।

চট্টগ্রামে এক ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবীরা এই সময় ১৭ হাজার টাকা হস্তগত করেন এবং কলিকাতা ও ফরিদপুরে দুইটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়।

বিপ্লববাদকে বাংলা দেশে পুনরায় প্রসার লাভ করিতে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। ইহার ফলে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর অর্ডিনান্স জারি করিয়া ৭৩ জন বিপ্লবীকে করা হইল অন্তরীণ। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায় ১৮১৮ সালের ৩ আইনে আটক হইলেন।

এক তহশীলদারের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীরাম রাজু এই সময় দক্ষিণ ভারতে এক বিদ্রোহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দলবল-সহ তিনি কয়েকটি থানা আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করেন এবং বন্দুক প্রভৃতি হস্তগত করেন। গভর্ণমেণ্টের সহিত ছয়বার সংঘর্ষের পর অবশেষে ১৯২৪ সালের মে মাসে তিনি পরাজিত হন। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, শেষবারের সংঘর্ষে রাজু নিহত হইয়াছেন; কিন্তু সেখানকার অনেকের বিশ্বাস এই যে, রাজু নিহত হন নাই—তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন মাত্র।

(ক্রমশঃ)

ভবঘুরে ভিখারী

ভিখারী: (ঘুমুতে ঘুমুতে) কেন রকম ধাক্কা মেরে রসিকতা করছ দা! জানো না তো আমার মেজাজ -আচমকা ঘুম ভাঙালে আমি ভারী টে যাই।

শল্পী—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তেরো

"এখন যে কী ভয়ানক কাজ পড়েছে, তা লিখে তোমায় বোঝাতে পারবনা। সারাটা দিন বাইরে ছুটোছুটি করে এই ফিরে এলাম। এখন রাত প্রায় নটা। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি।

পালপাড়ায় সেই চালের কলগুলোর কথা মনে আছে তো তোমার? ওখানে একটা ইউনিয়ান করেছি আমরা। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে, আমি এক্ষুণি সেখানে বক্তৃতা দিয়ে এলাম? তোমার হাসি পাচ্ছে তো? কিন্তু জানো—যাদের কাছে বলেছি তারা একটুও হাসেনি। কী অদ্ভুত আলোয় জ্বলছিল তাদের চোখ, কী কঠিন হয়ে উঠছিল তাদের মুখের চেহারাটা। থেকে থেকে হাত মুঠো করে ধরছিল তারা—আমার মনে হচ্ছিল যেন মুঠির ভেতর বজ্র পেয়েছে কুড়িয়ে। আশ্চর্য, এতবড় শক্তিকে আমরা এতকাল ভুলেছিলাম কী করে!

আমাদের শান্তিদাকে মনে আছে—সেই Fire-brand শান্তি ভৌমিক? সে আজকাল সন্ন্যাসী হয়েছে—গেরুয়া পরে, শুনছি একটা ব্রহ্মচর্য আশ্রম খুলবে। রাজনীতির নাম শুনলে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। বলে, পরমার্থ ছাড়া পথ নেই। সুতপাদির খবর আরো ইন্টারেষ্টিং। সে তোমায় পরে লিখব।

দাদা গ্রামে গ্রামে ঘুরছে, ন মাসে ছ মাসে একদিন খোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। এখানকার যত কাজের ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হচ্ছে।

এত কাজ—এত অদ্ভুত ভালো লাগে কাজ করতে। তবু তোমাকে এই যে চিঠি লিখতে বসেছি, বাইরে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকার থেকে এই যে ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে, এখন ভাবি, তুমি পাশে থাকলে কত কাজ যে আরো করতে পারতাম! সেদিন তোমাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম—মনে হয়েছিল তুমি একটা বিষাক্ত কালো সাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ মনে হয় তুমিই আমার সবচেয়ে বড় ইন্‌স্পিরেশন!

তুমি কবে আসবে? সবাইকেই তো ছেড়ে দিচ্ছে একে একে, তোমাকে কবে ছাড়বে?

কিন্তু সত্যি, কবে আসবে তুমি?"

চিঠিটা বহু যত্নে খামে ভাঁজ করে রাখল রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। মিতা অপেক্ষা করে আছে। আজ আর ব্যবধান নেই—আজ দুজনের মাঝখানে জীবনের একটা নিশ্চিত পথ তৈরী হয়ে গেছে। পরিমল আর মিতাকে ওদের বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মিতা একটা স্কুলে মাষ্টারী করে, পরিমল ঘোরে গ্রামে গ্রামে। রূপকথার মেয়ে আজ মাটির কন্যা। আজ অবাস্তব কোনো স্বপ্ন-চারণার মধ্য দিয়ে পৌঁছুতে হয়না তার কাছে। মাটির মাধ্যাকর্ষণে ছায়াতরুতে সার্থক হয়েছে আকাশী অর্কিড। কিন্তু সেই—সেদিন?......

......মনে হল রঞ্জু যেন মরে গেছে, তার সত্যিকারের অপমৃত্যু হয়েছে এতদিন পরে। এ সে কী করল? এতদিন ধরে সঞ্চয় করা তার গৌরব, তার বিপ্লবীর ঐতিহ্য সে এমনি করে পথের ধুলোয় মিলিয়ে দিলে! আজ আর বিপ্লবের পথে চলবার অধিকার তার নেই। আজ সে ব্রতভ্রষ্ট, কর্তব্যচ্যুত। সে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে পার্টির কাছে, বিশ্বাসহন্তা হয়েছে তার পরমতম বন্ধু পরিমলের। এই মুহূর্তে মনসাতলার ওই অত্যন্ত হীন, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মার্বেল কোম্পানির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই, কোনো তফাৎ নেই ভোলা, কালী, থাঁদু অথবা পূর্ণের সঙ্গে।

এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো। শুধু ভালো নয়, মৃত্যুই তার প্রাপ্য, তার প্রাপ্য বিশ্বাসঘাতকের সত্যিকারের দণ্ড, প্রাণদণ্ড। তার এখনি গিয়ে একথা বেণুদার কাছে স্বীকার করতে হবে, অকুণ্ঠ অকম্পিত গলায় ঘোষণা করতে হবে নিজের সীমাহীন অপরাধের কাহিনী।

কিন্তু বলবে কী করে? শুধু কি তারই অপরাধ? তার অপরাধের সঙ্গে আর একজনের চরম লজ্জাও তো নিষ্ঠুর ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে! তাদের নিষ্ঠুরতার নীচে দলে যাবে আর একজন—যার চারদিক ঘিরে অর্থহীন গুঞ্জন ওঠে—যার চোখে আকাশের সাতভাই চম্পার স্বপ্ন!

অপরাধ! পাপ! কিন্তু কী অপূর্ব অপরাধ। মিতার বুকের ছোঁয়া এখনো তো কাঁপছে তার নিজের সঙ্গে। যা মৃত্যু তার মধ্যে এমন অমৃত আছে তা কে জানত! তাই কি বেণুদা সুতপাকে—

সুতপা। ঘুমের মধ্যে শোনা সেই আর একটি রূপকথার মায়া কাহিনী। প্রেম একটা নিবিড় ব্যথার মতো লুকিয়ে আছে সেই আগ্নেয় পুরুষের পাথরে তৈরী হৃদয়ের আড়ালে। প্রেম আর সংস্কারের দ্বন্দ্ব মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে সেই অগ্নিকন্যার নিভৃত সত্তাকে। সেদিন সন্ধ্যায় বেণুদা গান করেছিলেন, "দাও দুঃখ বন্ধ তারণ মুক্তির পরিচয়।" সেদিন রাত্রে মনে হচ্ছিল খোলা তলোয়ারের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দীপ্তিটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার ওপর ঝলমল করছে মেঘভাঙা

আলো। সেই থেকেই কি রঞ্জুর মনের মধ্যেও এসেছিল একটা অলক্ষ্য প্রেরণা, যার ফলে আজ তার এই স্খলন, এই অবতরণ?

কিন্তু বেণুদা। তার সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? মৃত্যুবিজয়ী সেনাপতির পাশে দাঁড়িয়ে তার মতো দাবী জানাতে পারে কি একজন সাধারণ সৈনিক? অমন করে নির্ভীক উন্নত মাথা তুলে যে দাঁড়াতে জানে, অমনি করে ভালোবাসবার তারই তো অধিকার আছে। আর সুতপা। রাত্রির জ্যোৎস্নায় যত করেই সে সরে থাকনা কেন, কিন্তু দিনের প্রখর উগ্র আলোয় তাকে তো চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। চট্টগ্রামের রণক্ষেত্রে তার রুক্ষ বিস্রস্ত চুল ঝড়ের বাতাসে উড়ে যায়, বুড়িবালামের তীরে তার চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়তে থাকে।

রঞ্জুর সে জোর কোথায় বেণুদার মতো? মিতা তো অগ্নিকন্যা নয়, ভ্যাটফুলের গন্ধভরা রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে একাকার হয়ে যায়। তবে? তবে সান্ত্বনা কোথায় তার, কোথায় তার জোর? সে বিপ্লবী, সে সৈনিক—সে ভালোবাসল একজন সাধারণ, অতি সাধারণ পরাধীন দুর্বলচেতা মানুষের মতো? চারদিকে যখন অগ্নিকুণ্ড জ্বলেছে, যখন রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের অঞ্জলি দিয়ে যজ্ঞের উদ্‌যাপন করতে হবে, তখন অতি রোম্যাণ্টিক্—অতি পুরোণো ভাবে, আরো দশজন অন্ধ নির্বোধের মতো সে এ কী করল?

এ অবিশ্বাস্য। প্রেম কি কখনো শিথিল করতে পারে বিপ্লবীর সংকল্পের রুদ্র কঠিন গ্রন্থি, ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রত মানুষকে কি কখনো টলাতে পারে তা? ঝর্ণা নেমে আসে বলেই তো হিমালয় কখনো ভেঙে পড়ে না।

কিন্তু—

ঝর্ণা নেমে আসে বলেই হিমালয় কখনো ভেঙে পড়ে না। তাই যদি—হঠাৎ রঞ্জুর মনে নতুন জিজ্ঞাসা দেখা দিলে একটা: তাই যদি, তা হলে মিতাকে এইটুকু ভালোবাসবার মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর অপরাধ কোথায়? ভালোবাসলেই কি নিজের কর্তব্যবোধ শিথিল হয়ে যায়, ভেঙে পড়ে নিজের এত বড় প্রেরণা, এত বড় জোরালো প্রতীতি? মৃত্যুর আর সর্বনাশের পথে যখন সব ছেড়েই বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তখন থাকুক না নিজের জন্যে এইটুকু পাথেয়, এতটুকু সঞ্চয়।

বেণুদার মতো শক্তি নেই তার? না যদি থাকে, তা সে অর্জন করবে। বরাবর একটা অপমানবোধ তার মনের মধ্যে রয়েছে—সে ছোট, সে ছেলেমানুষ; এই অসম্মানিত আত্মপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সময় এসেছে তার। এবার সে প্রমাণ করে দেবে—সে শুধু ছেলেমানুষ নয়, বড়ও হতে পারে, কঠিন কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের একটা নিঃশব্দ আগুনের ফুলকেও জ্বেলে রাখতে পারে প্রাণের গভীরে। মিতা সুতপা নয়? কিন্তু গড়ে তুলতে কতক্ষণ লাগবে? সেও মিতাকে তৈরী করে তুলবে তার পথসঙ্গিনীর উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে, দীপ্তি দিয়ে, শক্তি দিয়ে। আজ যার চোখে সে ঘুমের আমেজ দেখতে পাচ্ছে, কাল তার চোখে কেন সে সঞ্চার করতে পারবে না বজ্রের ঝলক?

পারবে। মিতাও তো তাদের দলের। হোক কোমল, হোক ফুলের মতো। তবু সে ফুল সূর্যমুখী। তার তপস্যা সূর্যের তপস্যা। রঞ্জুর আগুন-ঝরা কবিতাগুলো যখন সে সুরেলা গলায় পড়ে যায় তখন তার সেই পড়ার মধ্যে রঞ্জু শুনতে পায় অগ্নিমন্ত্রের প্রতিধ্বনি। এ তো চরিত্রহীনতা নয়।

তবে কী এ? ঠিক বুঝতে পারছে না। তার এই মানসিক প্রতিক্রিয়াটার সত্যিকারের সংজ্ঞা কী? এ অপরাধ—কিন্তু সত্যিই কি অপরাধ? তাই যদি তবে এ অপরাধ এমন করে তাকে আলো করে তুলল কেন, কেন মনে হচ্ছে এতদিনের ক্লান্তিকর রক্তাক্ত পথচলায় হঠাৎ একটা নতুন পাথেয় কুড়িয়ে পেল সে?

আকস্মিক একটা শব্দে রঞ্জু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বাবার গলা।

"মূঢ়, জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং,
যল্লভসে নিজঃ কর্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং—"

মোহ-মুদ্গর পড়ছেন বাবা। একটা শান্ত বিতৃষ্ণা তাঁর গলায়, একটা তিক্ত বৈরাগ্য। প্রায় ছ মাস পরে কাল তিনি বাসায় এসেছেন, বিচিত্র একটা অনাসক্তি যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কথাবার্তা বলেন না বিশেষ কারও সঙ্গে, নিজের ঘরে চুপচাপ বসে গীতা পড়া ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজই নেই।

অথচ অমন শক্তিমান পুরুষ। দীর্ঘ দেহ, ঋজু মেরুদণ্ড, প্রাণের পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কোনোদিন কথা পর্যন্ত বলতে সাহস পেত না ওরা। সেই বাবা কী হয়ে গেলেন!

"দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ—"

মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ কী হল তাঁর! এক মুহূর্তে জীবনে যেন সমস্ত বন্ধন তাঁর শিথিল হয়ে গেছে। নিজের মধ্যে তিনি সমাহিত হয়ে গেছেন—তাঁর কাছে এই পৃথিবীর কোনো দামই নেই—শুধু একটা অহেতুক আশার ছলনার মতো। কিন্তু সেদিনের কথা সে তো ভোলেনি। চাকরী যাওয়ার পরেকার সেই ঘটনা। হরিণের চামড়ার আসনে বসেছেন উজ্জ্বল দীপ্ত মূর্তি ঋত্বিকের মতো, সর্বাঙ্গ থেকে যেন আলোর মতো কী ঠিকরে পড়ছে তাঁর—কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। তিন ভাইকে তিনি শপথ করিয়েছিলেন—রঞ্জুর জীবনে প্রথম আলোকবাহী সেই অবিনাশ বাবুর চোখ যেন তাঁর চোখে এসে দেখা দিয়েছিল: প্রতিজ্ঞা করো, জীবনে কখনো ইংরেজের চাকরী করবে না, প্রতিজ্ঞা করো—যারা অন্যায় করবে তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না—

সে প্রতিজ্ঞা তো রঞ্জু ভোলেনি। বাড়ির সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে নেমেছে এই আগুনঝরা পথে, কিন্তু এই গোপনতার জন্যে বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ তো জাগেনি তার। সে জেনেছে যা

করতে যাচ্ছে তার, পেছনে বাবার আশীর্বাদ আছে, আছে প্রেরণা। কিন্তু আজ ?

আজও বাবা তেম্‌নি করে আসন পেতে বসেছেন মোহ-মুদ্গর নিয়ে। কিন্তু চাকরী যাওয়াতে যে তেজ আর শক্তি তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল, মার মৃত্যু সে শক্তিকে এমন করে হরণ করল কী করে ? তা হলে কি তাঁর সমস্ত শক্তি ওই একটি উৎসের মধ্যেই লুকিয়েছিল ?

আচ্ছা,—

আচ্ছা, আজ যে এই নতুন আলোয় তার মন ভরিয়ে দিলে মিতা, এ আলো তো তাকে এম্‌নি জোর দিয়ে, এমনি শক্তি দিয়ে পূর্ণ করে দিতে পারে। আর যদি তা হারিয়ে যায়, তা হলে কি এম্‌নি করে সেও ভেঙে পড়তে পারে, হারিয়ে ফেলতে পারে নিজেকে এই গভীর নিস্তব্ধ নির্বেদের মধ্যে ?

দু হাতে মাথা ঢেকে রঞ্জু বসে রইল।

কী করবে জানে না। যদি অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের মোচন করবার পদ্ধতিও বুঝতে পারছে না সে। স্বীকারোক্তি করবে, অপরাধের ভারে নতমস্তক হয়ে গিয়ে দাঁড়াবে বেণুদার সামনে ? কিন্তু সেই সঙ্গে অসীম লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে মিতা, সেই মুহূর্তে যে দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবে পরিমল—

উঃ !

কিন্তু করুণাদি'। মায়ের মতো চোখ। মরুভূমির রুদ্র রৌদ্রে সেই পান্থপাদপ। আজ করুণাদি থাকলে : শুধু অকারণে মনে হতে লাগল : আজ করুণাদি থাকলে যেন একটা নিশ্চিত পথ তিনি দেখিয়ে দিতে পারতেন, দিতে পারতেন একটা নিশ্চয়তার আশ্বাস। পায়ের নীচে এই যে সব কিছু টলমল করছে—যেন দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত, যেন নির্ভর করবার মতো পাওয়া যেত কিছু একটা।

বাবার গলা কানে আসছে। আবেগভরে পড়ে যাচ্ছেন :

সুরবরমন্দির তরুতল বাসঃ,

শয্যাভূতলমজিনং বাসঃ—"

অপরাধ ! নিশ্চয় অপরাধ। কিন্তু কী অপূর্ব সে অপরাধের নেশা। ভাবতে গেলেও হাত পা যেন ঝিম ঝিম করে কাঁপতে থাকে।

সূর্যমুখী ফুলেও মধু আছে। সে মধুর কণামাত্রও কি বেণুদা পাননি অগ্নিকন্তার ভেতরে !

হাতে কপাল চেপে ধরে রঞ্জু তেমনি বসে রইল।

কিন্তু সমাধান এল শেষ পর্যন্ত।

সমস্ত সমস্তার, সমস্ত সংশয়ের। দ্বন্দ্বের এই আকুলতা, এই আকুতি-বিকুতি একদিন আর একটা প্রবল ঝড়ের মধ্যে তার মুক্তি পেল। চারদিক থেকে যে হতাশা, যে ক্লান্তি ঘিরে আসছিল, পার্টির সামনে ঘন হয়ে আসছিল যে অন্ধকার—একদিন বজ্রের আলোয় সে অন্ধকার বিদীর্ণ হয়ে গেল। বিদীর্ণ হয়ে গেল রঞ্জুর মনেরও সঞ্চিত স্তব্ধ তমসার গ্লানি।

ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে জালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওদের নেতা। শহরে বিপ্লবীদলগুলোর অস্তিত্ব প্রায় না থাকার মতোই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সেদিন অনুশীলন দলকে একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে ধনেশ্বর। জেলের মধ্যে নিয়ে নাকি বিশু নন্দীকে এমন মার মেরেছে যে রক্ত আমাশায় সে প্রায় মরো-মরো—ওদিকে 'তরুণ সমিতি'র ভালো ছেলেরা প্রায় সবাই ধনেশ্বরের নজরে পড়ে গেছে। কিছু ধরেছে, বাকী যাকে পাচ্ছে তাকেই ডেকে নিয়ে নির্বিচারে চালাচ্ছে হাণ্টার। ধনেশ্বরের দাপটে সহর সন্ত্রস্ত, সেই এস্ পি, সেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দুর্ধর্ষ পরাক্রমে এক ঘাটে জল খাচ্ছে বাঘে গোরুতে।

হরিনারায়ণ ঘোষের ছেলে অমরকেও একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই রকম বেধড়ক পিটিয়েছে ধনেশ্বর। হরিনারায়ণ ঘোষ মামলা করতে চেয়েছিলেন ধনেশ্বরের নামে—ক্রিমিন্যাল অ্যাসাণ্ট্ আর ইন্‌জুরির চার্জে। কিন্তু সহরের কোনো উকিল তাঁর মামলা নিতে চায়নি। শিউরে উঠে বলেছে—বলেন কি মশাই, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ! ধনেশ্বর বর্মণের নামে কেস্ করতে বলছেন ! একবার যদি শনির নজর পড়ে তা হলে আর রক্ষা আছে ! দেবে সং-ফৌ-আইনে ঠেলে। চলে যান মশাই, ওসব ঝামেলা আর বাড়াবেন না।

—তাই বলে এই অত্যাচার সয়ে যেতে হবে ?

—হবেই তো।—প্রাজ্ঞ উকিলেরা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়েছেন তাঁকে : খালি খালি মাথা গরম করে কী করবেন মশাই ? এখন ওদেরই রাজত্ব। শুধু ছেলেকেই ঠেঙিয়েছে, এইটেকেই ভাগ্য বলে জানবেন। বেশি লাফালাফি করেন তো আপনাকেও ধরে একদিন হাতের সুখ করে নেবে।

হরিনারায়ণ ঘোষ তবু দিন কয়েক তর্জন গর্জন করেছিলেন—তাঁর বৈঠকখানায় আর মনসাতলায় বৈঠকে বসে। কিন্তু তারপরে একদিন তাঁর বাড়ি সার্চ হল, সার্চ করালো ধনেশ্বর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তারও পরে কী হল কে জানে, আশ্চর্যভাবে নীরব হয়ে গেছেন হরিনারায়ণ, বুঝতে পেরেছেন বোবার শত্রু নেই।

কিন্তু এ অসহ্য—এ অবস্থা দুর্বিষহ।

ওদের রক্ত টগবগ করে ফোটে। জিঘাংসায় প্রতি মুহূর্তে মন কালো আর ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছে করে লোকটাকে সাবাড় করে দিতে। না—তাও নয়। শ্মশানকালীর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মতো হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দিতে।

শুধু দাদারা থামিয়ে রাখেন ছেলেদের : না, না।

—না কেন ?

—কী লাভ ?—বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে দাদারা জবাব দেন : অনেক-গুলোই তো সাবাড় করা হয়েছে এদিকে ওদিকে, কিন্তু ওরা রক্তবীজের ঝাড়, কোনোদিন ফুরুবেনা। ওতে করে লাভের মধ্যে খানিকটা রিপ্রেশনই ডেকে আনা হবে, আমাদের আসল উদ্দেশ্যই যাবে পিছিয়ে।

রিপ্রেশন ! ছেলেরা বুঝতে পারে না। রিপ্রেশনের আর বাকীই বা কোথায়। সহরের প্রত্যেকটা ছেলের জীবন যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু ধনেশ্বর আর ইমাদ আলীর মতো লোকা মুখই নয়, গুপ্তচরেরা

চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি মশার মতো। খেলার মাঠ থেকে স্কুলের ক্লাশ পর্যন্ত অবাধ গতিবিধি তাদের, বাতাসে পর্যন্ত তাদের কানপাতা। উৎপাতের চোটে মানুষের আহার নিদ্রা বন্ধ হওয়ার জো হয়েছে।

আর সার্চ করা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক একটা বাড়িতে সে যে কী প্রেত-তাণ্ডব, ভাষায় তার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা তো খুঁজছেই, তারপর খাটের পায়া ভেঙে দেখছে ভেতরে ফোকর আছে কিনা; বালিশ-তোষক ছিঁড়ে তুলোর মধ্যে লুকোনো রিভলভার খুঁজছে; অকারণ-আনন্দে আচমকা বাঁধানো মেজের খানিকটা খুঁড়ে ফেলছে গোটা কয়েক তাজা বোমা পাওয়ার আশায়, ইঁদারার ভেতর ঝালাওয়ালা নামিয়ে এমন অবস্থা করে তুলছে যে সাতদিন আর জল খাওয়ার উপায় থাকছে না গৃহস্থের। রিভলভার না পাক, ঠাং ধরে গোটাকতক ব্যাংকেই ছুঁড়ে দিচ্ছে কুয়োর ওপর।

আর পারা যায় না। কী কষ্টে যে অস্ত্র-শস্ত্রগুলোকে সামলে রাখতে হচ্ছে সে ওরাই জানে। শুধু একদিন একটা দৃশ্য দেখে বড় আরাম পেয়েছিল রঞ্জু, সমস্ত ঘটনাটা ভারী মনোরম বোধ হয়েছিল তার। উকিল সারদাবাবুর বাড়িতে পুলিশ সার্চ করতে এসেছিল। কী মনে করে—বোধ হয় এক জোড়া তাজা পিস্তলের আশায়ই একটা কনস্টেবল্ গর্তের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে, তারপর পরক্ষণেই "আঁই দাদ্দা: মর্ গইরে"—বলে লাফিয়ে উঠল।

তারপরে তার সে কি নৃত্য গীত! কাঁকড়া বিছের কামড়—তার আরামটুকু মনে রাখবার মতো। দৃশ্যটা ভারী উপভোগ করেছিল রঞ্জু। মনে হয়েছিল ধনেশ্বরকে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখে তার গায়ে গোটা কয়েক কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিলে কেমন হয় ব্যাপারটা?

কিন্তু সে যাই হোক—এখন এ অবস্থার একটা প্রতীকার দরকার।

যা বোঝা যাচ্ছে জেলে সকলকেই যেতে হবে। দেশব্যাপী যে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা ছিল নেতাদের, যে প্রত্যাশা ছিল ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে চট্টগ্রামের মতো অগ্নিযজ্ঞ জাগিয়ে রাতারাতি ইংরেজের শাসনকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া—সে আশাকে এখন মরীচিকা মনে হয়, মনে হয় তা আকাশ-কুসুমের চেয়ে বেশি নয়। এ হয় না, এ হতে পারে না। সামান্যতম চেষ্টাও পুলিশের সদা-শানানো চোখ আর ঘরশত্রু বিভীষণের চেষ্টায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, দুর্বল সহকর্মী দুঘা মার খেয়েই কোর্টে দাঁড়াচ্ছে অ্যাপ্রুভার হয়ে। দেশের স্বাধীনতার পথে দেশের মানুষের বাধাই সব চেয়ে প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তিরিশ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মতো কেউ একে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। অস্ত্র চাই—সে জন্যে চাই টাকা। কিন্তু কে টাকা দেবে? নিতে হবে ডাকাতি করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চরম বিয়োগান্ত তার পরিণাম।

আর তা ছাড়া নিজেদের মধ্যেই কি ত্রুটি আছে কম? অবধি নেই দলাদলির। প্রত্যেকেই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকেই কাজে নেমেছে প্রাণের ভেতর আগুন জ্বেলে, নিজের সর্বস্ব বিসর্জনের সংকল্প করে। কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়, এই নির্ভীক মানুষগুলো কেন নিজেদের মুক্ত করতে পারে না দলাদলির ক্ষুদ্রতা থেকে? পরে রঞ্জু জেনেছে, শুধু এই দুটো দলই নয়—আরো আট-দশটা দলউপদল শুধু বাংলা দেশেই আছে এবং পরস্পর সম্পর্কে তাদের বিদ্বেষ আর সন্দেহের যেন অন্ত নেই। শুধু তাই নয়। সংগঠন একটু জোর বেঁধেছে কিংবা হাতে দুটো একটা অস্ত্র এসেছে—তা হলেই আর যেন বীরত্বের ঝোঁক সামলাতে পারে না তারা। অকারণে দুটো চারটে মানুষকে হত্যা করে বসে এবং সেই হত্যার প্রত্যক্ষ ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটাই ভেঙে চুরে তচনচ হয়ে যায়।

দেশের বিরোধিতা, বিশ্বাসদ্রোহিতা, আর নিজেদের ভুল ভ্রান্তি; এক সঙ্গে মিলতে পারে না তাই বড় প্ল্যান নিতে পারে না কোথাও। ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহ—দাদা হওয়ার প্রলোভনও কত লোককে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে—বাড়িয়ে চলে সংখ্যাতীত উপদল। আজকে রঞ্জু জানে, আজকে রঞ্জু বিচার করতে পারে সেদিনকার কত মিথ্যা, কত আত্মদান, অমন বীরত্বের পরিণামও কেন অত বড় শোচনীয় ব্যর্থতায় হারিয়ে গেল।

তা ছাড়া সব চাইতে বড় কারণ যেটা, সেটা বুঝেছিল অনেক পরে। তার আভাস এনেছিল লেনিন ও সাম্যবাদ বইটা, কিন্তু সে ইঙ্গিত সেদিন ধরবার সাধ্যও হয়তো ছিল না কারো। তাই—

তাই নেতাদের মধ্যে হতাশা, নেতাদের চোখেও যেন অসহায় আক্রোশের একটা কাতরতা। ধনেশ্বরের দাপটে সমস্ত যেন ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছে। রঞ্জুর নিজের মধ্যে যে বিচিত্র একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে, চারদিকের এই সংঘাতের কাছে তাও যেন ছোট হয়ে গেছে।

অতএব—

অতএব একটা কিছু করো। যেমন করো হোক অন্তত আত্মঘোষণা করতে হবে। কিছু অস্ত্র চাই, আর সেই অস্ত্রের মুখে প্রকাণ্ড একটা ঘা দিয়ে যাব দেশকে। আর কিছু না হোক একটা বিরাট প্রোপাগাণ্ডার মূল্য আছে তার, অন্তত আজকের এই অগ্নিক্ষরা রক্তঝরা অভিজ্ঞতার পরিণাম থেকে আগামী দিনের মানুষ তার পথ চলবার সংকেতটি খুঁজে নিতে পারবে।

টাকা চাই, চাই অস্ত্র।

জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের সেই পোড়ো বাড়িটার অন্ধকারে গ্রহণ করা হল চরম সিদ্ধান্ত। মথুরানাথ পোদ্দার, মস্ত জোতদার, সংপ্রতি রায়-সাহেব হয়েছে পুলিশকে সাহায্য করে আর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে খানা খাইয়ে। তার কাছ থেকেই কিছু সংগ্রহ করে আনতে হবে। প্রথমে সবিনয়ে প্রার্থনা করা হবে সিন্দুকের চাবিটা, যদি সেটা সহজে না পাওয়া যায় তা হলে বলপূর্বক যাতে চাঁদাটা সংগ্রহ করা যায়, তৈরী হয়ে যেতে হবে তারই জন্যে।

সুতরাং আগামী কাল রাত বারোটা।

রঞ্জুর মনের মধ্যে গোপন-পাপের অনুভূতিটা বিঁধছে যন্ত্রণার মতো। কিছু বলতে পারেনি, স্বীকারোক্তি করতে পারেনি নিজের অপরাধের। আজ তিন দিন ধরে যেন একটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। দলের মধ্যে নৈরাশ্য, তার মনের ভেতরেও যন্ত্রণাভরা অস্থিরতা। বেণুদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পরিমলের দিকে চোখ

পরিভাষার পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ্-ডি

দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে সর্বভারতীয় যোগসূত্র রচনা। কয়েকটি শাসন-সংক্রান্ত কার্যের সংজ্ঞা এক হইলেই যে ভারতীয় ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ মনে করা সমস্যার অন্তর্গূঢ় প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ। প্রাদেশিক ব্যবধানের উপর এরূপ সুলভে সেতু রচনা পূর্তবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনধিগম্য। শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া প্রত্যেক প্রদেশ, কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া, অন্য সব দিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও পরস্পর নিরপেক্ষ। সরকারী কর্মচারীর আন্তঃ-প্রাদেশিক অদল-বদলও যে সচরাচর ঘটিবে এরূপ মনে করার কোনো কারণ নাই। আর যদিই কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ ঘটেও তথাপি স্থানান্তরিত কর্মচারীদিগকে যে পূর্ব সংজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবেই এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। গোলাপ সকল নামেই নিজ সুগন্ধ বিতরণ করিবে—রাজকর্মচারীরও নূতন নাম গ্রহণে কার্যদক্ষতার কোনো ব্যত্যয় ঘটিবে না। তবে অকস্মাৎ ঐক্যের নামে এই পরিভাষা-মরীচিকার অনুসরণে ফল কি ? সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম ও ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া সকল প্রদেশের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় আত্মীয়তার বন্ধন বহুদিন হইতেই অস্তিত্বশীল, কয়েকটি সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞা সাম্যে কি তাহা আরো সুদৃঢ় হইবে ? যেখানে নাড়ীর টান বিদ্যমান, সেখানে আবার দড়ি দিয়া বাঁধিবার প্রয়োজনীয়তা কি ? না হয় যে কয়টি বিভাগ কেন্দ্রী সরকারের সংরক্ষিত বিষয় সেগুলি সম্বন্ধে সর্ব প্রদেশে প্রযোজ্য সাধারণ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হউক। রেলওয়ে, যান-বাহন, ডাক ও তার, আয়কর প্রভৃতি বিভাগগুলি সাধারণ সংজ্ঞার সূত্রে বাঁধা পড়িলে হয়ত কাজের সুবিধা হইতে পারে। মহাপ্রেষাধিকারিক না হয় নিজ সংজ্ঞার বিশাল স্তম্ভের উপর সর্বভারতীয় সংবাদ আদান-প্রদানের গুরুভার দায়িত্ব বহন করিতে থাকুন—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত প্রোথিত প্রত্যেক টেলিগ্রাফ কীলকে তাঁহার নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক। কিন্তু যে সমস্ত কর্মচারী একান্তভাবে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাহারা প্রাদেশিক সংজ্ঞার দ্বারা নির্দিষ্ট হইলে ক্ষতি কি ? ইহাতে ঐক্যের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ প্রদেশের লোকে তাঁহাদের নাম-মহিমা বুঝিতে পারিবে। সর্ব-ভারতীয় বোধগম্যতার নিকট প্রাদেশিকতার বোধগম্যতাকে বলি দেওয়া যেন একটু অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। প্রদেশের জীবনধারার সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, প্রাদেশিক ভাষাতেই তাঁহাদের নামকরণ হওয়া উচিত। যেখানে প্রদেশ প্রচলিত ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোনো পার্থক্য নাই, সেখানে কোনোও অসুবিধা হইবে না; কিন্তু যেখানে বৈষম্য আছে, সেখানে প্রদেশের প্রাধান্যই স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবার তথাকথিত বিশুদ্ধি রক্ষা সম্বন্ধে অত্যুগ্র সচেতনতার বিষয়ে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যে বৈদেশিক শব্দগুলি বাহিরের প্রয়োজনের দেউড়ী পার হইয়া ভাষার অন্তঃপুরে একবার স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে খুঁৎ খুঁতে মনোবৃত্তি বিকৃত শুচিবাইএর নিদর্শন। তাহারা ভাষার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ—উহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। বিদেশী বই দোয়াত কলম বহুকাল ভাষা সরস্বতীর সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ভাষায় চিরস্থায়ী স্বত্ব অর্জন করিয়াছে—এখন গ্রন্থ, মস্যাধার, লেখনী প্রভৃতি অভিজাত বংশীয়েরা সংস্কৃত উদ্ভবের দলিল দেখাইয়া তাহাদিগকে আর স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না। সংস্কৃতে আমার জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আমার কাহারও অপেক্ষা কম নহে। তথাপি এই অনুরাগের দোহাই দিয়া ইতিহাস বিবর্তনের অপ্রতি-বিরোধিতাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত ; এবং তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও বহু শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতের তত্ত্বাবধানে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, সংস্কৃতের ভাব পরিমণ্ডলে বাস, সংস্কৃতের আদর্শের অনুসরণ যুগ যুগ ধরিয়া তাহার অগ্রগতিকে নিয়মিত করিয়াছে। এতদিন সে এক প্রকার সংস্কৃতের করদ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। এখনও যদি কোনো কোনো শব্দ তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়া থাকে ও নূতন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে উহাদিগকে আত্মসাৎ করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু ব্যাপকভাবে ঋণ গ্রহণ আর তাহার আত্মমর্যাদা ও আত্মপুষ্টির পরিপন্থী বিশুদ্ধির একটা মোহ আছে, কিন্তু এই মোহকে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সব সময় প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। হরিদ্বারের গঙ্গার নির্মল সলিল কাহার মনে ভক্তির উদ্রেক না করে ও অবগাহনেচ্ছা না জাগায় ; কিন্তু সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী যখন নিম্নভূমির আকর্ষণে নানা গ্রাম ও জনপদের জীবন যাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির বিচিত্র সৌন্দর্যের ছবি বক্ষে ধারণ করিয়া, গতিবেগ ও পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলুষ ও আবিলতা সঞ্চয় করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে, তখন তাহাকে উৎপত্তি স্থলে ফিরিয়া যাইবার আবেদন জানানোর কি কোনো সার্থকতা আছে ?

৫

এই পর্যন্ত গেল নীতি আলোচনার পর্ব ; এখন আসিতেছে প্রয়োগপর্ব। ভাষা ও সাহিত্যের যতই আপত্তি থাকুক, শাসনযন্ত্র ঘুরিবেই এবং ঘূর্ণ্যমান যন্ত্র হইতে বাহির হইবে নূতন নূতন পদ এবং নবজাত শিশুর ন্যায় এই নবসৃষ্ট পদাবলীর নামকরণ করিতেই হইবে। সুতরাং ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া এই শাসনরথ চারিদিকে ধূলিজাল বিকীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবেই। এখন এই যন্ত্ররাক্ষসের খাদ্য না যোগাইলেই নয়। আর বাস্তবিকই,

স্বাধীনতা লাভের পর যদি গোটাকয়েক নূতন পারিভাষিক শব্দের সংকলন না করা গেল, তবে স্বাধীনতার একটা বাস্তব, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সৃষ্টি করিয়া, জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা যাইবে? অন্ন বস্ত্রের সমস্যা ত এখনও মিটিল না, শাসনব্যবস্থার অন্তঃপ্রকৃতি অপরিবর্তিতই রহিয়া গেল; স্বাধীন মতের বায়ু-প্রবাহও এই মেঘাচ্ছন্ন গুমটধরা আকাশের তলে একরূপ বন্ধ হইয়াই গেছে। সুতরাং লোকের মনে একটা অভিনবত্বের চমক জাগাইবার জন্যও ত এরূপ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ইংরেজীভাষার নাগপাশের বেষ্টনকেই বা কেমন করিয়া অভিনন্দন করা যায়? মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও অভিমানে ঘা লাগে।

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে (আনন্দাশ্রু!)
এখন রাখিবে তারে কিসের ছলে!

কাজেই অতি বড় নাস্তিককেও পরিভাষা সঙ্কলনের দরকারটা মানিয়া লইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কি করিয়া এই পরিবর্তনের পরিধিটুকু যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিয়া ইহাকে ভাষার প্রকৃতি ও প্রবণতার সঙ্গে মিলাইয়া লওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমার প্রথম নিবেদন (Suggestion এর যথোচিত বিনীত প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না) যে সর্বপ্রথম দপ্তরখানার কণ্টকিত ব্যবস্থাগুলি সাফ্ করিতে হইবে। যদি কর্মচারীর সংখ্যাবাহুল্য নিতান্তই কমানো না যায়, তবে অন্ততঃ নামকরণে বৈচিত্র্যবিলাসটা বর্জন করিতে হইবে। ছোটবড় মাঝারি নানাপ্রকার পদমর্যাদা ও বেতন-হার বিশিষ্ট সেবকদের মাথা ছাঁটিয়া সমান করিতে হইবে। আমেরিকার যে গণতান্ত্রিক নীতি আমেরিকান সহরের নামকরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। একজন প্রধান কর্মসচিব ও প্রতি বিভাগের একজন বিভাগীয় কর্মসচিব (Secretary, ইহাকে 'সচিব' আখ্যা ইহার কর্তব্যের দ্যোতক কি না, তাহা বিবেচ্য) থাকুন; কিন্তু তাঁহার সহকারীবৃন্দের এক ক্ষুরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া একই নামে অভিহিত করাই বিধেয়। অ্যাডিসনাল, জয়েণ্ট্, ডেপুটী প্রভৃতির স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নামকরণ হইলে ব্যাপারটা অনেক সরল হয়। এই পরিবর্তনটি সাধিত হইলে একদিকে ভাষার উপর, অন্যদিকে করদাতার কষ্টার্জিত অর্থের উপর চাপটা যেমন কমে, তেমনি দপ্তরখানার যবনিকার অন্তরালে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, বিস্তর মান-অভিমান, হাসি-কান্নার অভিনয়ও অনেকটা সংকুচিত হয়। সহকারীবৃন্দেরও এক একটা সিঁড়ি ডিঙ্গাইবার তদ্বিরে ও পরিশ্রমে গলদঘর্ম হইতে হয় না; প্র-পরা-উপ প্রভৃতি উপসর্গগুলির দেহেও অত্যাচারজনিত রোগের উপসর্গ প্রকাশিত হয় না। বর্ণমালার 'প' ও 'ব' অতি নিকট প্রতিবেশী, কিন্তু হায়, চাকুরীর শব্দকোষে 'অবর' ও 'অপরের' মধ্যে কি মর্মান্তিক ব্যবধান; এবং এই ব্যবধানটুকু কত ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজপরিকরের লবণাশ্রু-নিষেকে পিচ্ছিল।

৬

এবারে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া—যাহাকে বলে গঠনমূলক বক্তব্য পেশ—তাহা করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমেই দেখিতেছি যে "General" কথাটির "মহা" এই পূর্বগামী প্রত্যয়ের দ্বারা ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। 'Accountant ganeral' 'মহাগাণনিক' পর্যন্ত একরকম চলে, কিন্তু যখন দেখি 'Surgeon general'এর প্রতিশব্দ 'মহা-চিকিৎসক' গৃহীত হইয়াছে, তখনই খট্‌কা লাগে ও প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের "শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে" নিষেধ মনে জাগে। 'মহা চিকিৎসক' কথাটির মধ্যে কি একটু আত্মশ্লাঘার স্পর্শ, একটু শ্লেষের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয় না? প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে 'মহা' শব্দের প্রয়োগ একটু বিবেচনার সহিত করা উচিত। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে প্রাচীনযুগে রাজপরিকরের সংজ্ঞার মধ্যে মহামাত্য, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সে যুগে রাজার উপাধি বহুবিশেষণ-ভূষিত ও আড়ম্বরবহুল ছিল; সুতরাং এ বিষয়ে রাজা রাজসভাসদের নামকরণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে রাজমহিমার খর্বতা রাজোপাধির ক্রমক্ষীয়মাণ সংক্ষিপ্ততার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে; এমন কি রাজার সহিত মহাশব্দের বিচ্ছেদও ক্রমশঃ সাধারণ হইয়া উঠিতেছে। যেখানে রাজার কিরীটপ্রভাই মলিন, সেখানে তাঁহার বিচ্ছুরিত জ্যোতি কি রাজভৃত্যের শিরোদেশ বেষ্টন করিয়া থাকিবে? পরিভাষা-সংসদ যে সমস্ত উপাধি প্রাচীন যুগ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই রাজতন্ত্রের ভাবানুষঙ্গ-বিজড়িত; সুতরাং যে যুগে রাজা শাসনতন্ত্র হইতে নির্বাসিত সে যুগের আবহাওয়ার সঙ্গে ইহারা ঠিক খাপ খাইবে না। এই চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া আমার মনে হয় যে 'মহাগাণনিক' 'মহাচিকিৎসক' প্রভৃতির স্থলে 'গাণনিক-প্রধান' 'চিকিৎসক-প্রধান' ইত্যাদি সংজ্ঞা যুগধর্মের অধিক উপযোগী হইবে। 'প্রধান' কথাটি ঠিক শ্রেষ্ঠতা-ব্যঞ্জক নয়, ইহা official head এর ধারণারই দ্যোতক। 'গ্রাম-প্রধান' অর্থে গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুঝায় না; গ্রামের সরকারী নেতাই বুঝায়। অন্ততঃ ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতনা উগ্রভাবে প্রকট নয়। শব্দের পূর্বগামী head ও পরগামী generalকে একই 'প্রধান' নামে অভিহিত করিলে কোনোই ক্ষতি দেখিতেছি না।

আর একটি বহু প্রযুক্ত ও বহু অপপ্রয়োগ লাঞ্ছিত শব্দ হইতেছে 'Commissioner'। ইহা সংসদকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। এই শব্দটির সাধারণ প্রতিশব্দ 'মহাধ্যক্ষ' দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কর্তব্যের পার্থক্য ও গুরুত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন কথাও প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ 'Commissioner ' of a Division'কে 'ভুক্তিপতি' বলা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সরকারী কর্মচারীকে 'পতি' আখ্যা দিতে সংসদ এত উৎসুক কেন? কমিসনার সাহেব হয়ত কর্মচারীদের শীর্ষস্থানীয়; তথাপি তিনি একজন কর্মচারী মাত্র—

'তথাপি সিংহ পশুরেব নাক্ত'। 'পতি' শব্দের সঙ্গে যে আধিপত্যের ভাব জড়ানো তাহা আমরা কোনো কর্মচারীতে, তা সে তিনি যতই উচ্চপদস্থ হউক না কেন, আরোপ করিতে নারাজ। 'পাল' বা 'শাসক' প্রত্যয়টি কিসে অপ্রযুক্ত হইল? গভর্ণর ত প্রদেশপাল। 'অধ্যক্ষ' উপাধির প্রয়োগ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন; অতিবিস্তৃতে ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শুধু অফিসের কর্তাকে 'অধ্যক্ষ' নামে অভিহিত করিলে উহার সঙ্গে যে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যঞ্জনা থাকে তাহার যথার্থ প্রয়োগ হয় না। যেখানে Commissionerএর নীচে আর কোনোও অধীনস্থ কর্মচারী থাকে না, যেমন (Commissioner for workmen's Compensation) সেখানে অধ্যক্ষ অযৌক্তিক; তাহাকে 'শ্রমিক নিষ্ক্রয়-নির্ধারক' নাম দিলে হয়ত অভিধান গৌরব কমে, কিন্তু কর্তব্যের সুষ্ঠুতর নির্দেশ রক্ষিত হয়। সেইরূপ Agricultural Development Commissionerএর (ইহার অধীনস্থ কর্মচারীর নাম তালিকায় দেখিলাম না) প্রতি শব্দ 'কৃষি-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাপক' করিলে মনে হয় যেন ভালই শোনায়। 'কৃষিবর্ধন' কথাটি শিষ্ট প্রয়োগ নহে বলিয়া ঠিক আমাদের হর্ষবর্দ্ধন করে না।

তারপর 'Director' কথাটির প্রয়োগ-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ইহাকে 'অধিকর্তা' শব্দে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। 'অধিকর্তার মধ্যে যেন 'overlordism'এর গন্ধ পাওয়া যায়। হয়ত সংসদ ইহাকে অধিকার পরিচালনার সক্রিয় শক্তি রূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ আমাদের পরিচিত নয়। Directorএর প্রতিশব্দ রূপে 'নিয়ন্তা' বা 'নিয়ামক' শব্দটিই অধিকতর ভাবানুযায়ী বলিয়া মনে হয়। নিয়ামক 'Controllerএর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহার অর্থ 'Director' হইতে ঈষৎ বিভিন্ন। 'Director' স্থায়ী নীতি নির্ধারণ করেন, Controller অনেকটা অস্থায়ীভাবেই হউক, বা বহিরঙ্গমূলকভাবেই হউক নিয়ন্ত্রণ মাত্র করেন। এ ক্ষেত্রে 'Director'কে নিয়ামক বা নিয়ন্তা বলিয়া Controllerকে নিয়ন্ত্রক বলিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্যটুকু বজায় থাকে। 'Director of public Instruction or Director of public Health'কে শিক্ষা নিয়ামক ও স্বাস্থ্য-নিয়ামক বলা বেশ চলে। Director of Fire services'কে controller বলা অধিকতর সঙ্গত হইবে কি না, তাহা তাঁহার কর্তব্যের প্রকৃতি হইতে নির্ধারিত হইতে পারে। 'Director of health services' ও 'Director of public health'এর মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র অভিধানের উপযোগী কোনো পার্থক্য আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া উভয়কে এক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

৭

এইবার কতকগুলি বিশেষ শব্দ লইয়া আলোচনা করিব। 'Assistant-in-charge'—'আযুক্ত সহায়ক' শব্দটি কেমন কেমন ঠেকে। এই Assistant কি কেরাণী না তদূর্ধ পদাধিকারী? যদি কেরাণী হন, তবে সহায়ক পদটির অর্থ কি? তিনিও তাঁহার সাধারণ 'করণিক' নামেই অভিহিত হইতে পারেন। যদি তিনি কোনো অনুবিভাগের কর্তা হন, তবে Head Assistantএর প্রতিশব্দ তাঁহার প্রতি 'প্রযোজ্য', অন্যথা তাঁহাকে 'ভার প্রাপ্ত করণিক' বলা যাইতে পারে। District Magistrate and Collectorকে শুধু জেলা-শাসক বলিলে ক্ষতি কি? তাঁহার রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্তব্যটুকু না হয় একটু অন্তরালেই থাকিল। প্রজা সাধারণের চক্ষে তিনিরাজস্ব-সংগ্রাহকরূপে নন, শাসকরূপেই প্রতিভাত হন। 'Commissioner of Excise'কে 'অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ বলা হইয়াছে—শুল্ক সংগ্রহের সঙ্গে অধ্যক্ষতার যোগসূত্র ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া ঠেকে না। Collector of Exciseকে 'অন্তঃশুল্ক সংগ্রাহক' বলিয়া Commissionerএর প্রতি 'সমাহর্তা' প্রয়োগ করিলে বোধ হয় উভয়ের পদমর্যাদার তারতম্য ঠিক থাকে। Commercial managerএর ব্যাপার-নির্বাহিক অভিধানের তলে তাঁহার অর্থবিষয়ক দায়িত্বটুকু চাপা পড়িয়াছে—বরং তাঁহাকে অর্থব্যাপারিক বলিলে তাঁহার কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যটুকু পরিস্ফুট হয়। Vagrancyর প্রতিশব্দ 'চক্রচর' কথাটি যে পরিমাণে আমাদের চিত্র-সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক করে, সে পরিমাণে অর্থস্ফুটতা আনে না। 'উদ্বাস্তু' বা বাস্তুহীন শব্দটি কবিত্বের দিক দিয়া খাট হইলেও অর্থবোধের দিক দিয়া বোধহয় শ্রেষ্ঠ। Caretaker, Overseer ও Electrical Overseer' এই তিনটি শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য Caretakerএর হয়ত কোনো বিশেষ গুণপনা না থাকিতে পারে—সুতরাং তাহাকে শুধু 'রক্ষক' বলিয়া আর দুইজনকে 'নির্দেশক' বলিলে অন্ততঃ একটি অতিরিক্ত পারিভাষিকের চাপ হইতে ভাষা বাঁচে। "Inspecting Overseer" এর প্রতিশব্দ 'পরিদর্শী উপদর্শক' 'হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়'কে স্মরণ করাইয়া দেয়। 'নিরীক্ষক' তথা 'উপদর্শক' বলিলে কি চলে না? Deputy Administrator general and official trusteeএর মিশ্র কর্মভারের গুরুত্ব ঠিক বুঝি না; সুতরাং নাম বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই পদটির বিখণ্ডতা সম্পাদন সম্ভাব্য কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। Deputy Director of Post and Telegraphs'কে 'ডাক-তার-উপনিয়ামক ও Deputy Postmaster General সহকারী ডাককর্তা নামে অভিহিত করিলে উভয়ের কর্তব্যের পার্থক্য সুপরিস্ফুট হইতে পারে। Deputy Provincial Transport Commissionerএর নামটি অযথা ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ Commissionerএর কোনো সার্থকতা নাই, বরং controller প্রযোজ্যতর মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ Provincial কথাটি যোগ না করিলেইবা ক্ষতি কি? ক্ষুদ্রতর পরিধিজ্ঞাপক সংজ্ঞা যোগ করিলে প্রাদেশিক কর্তার আর বিশেষ পদমর্যাদা বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে না। ইহাকে দুষকর 'উপ-যান-নিয়ামক' বলিলে বুঝিবার কষ্ট হইবে না। Director of Fees ও Director of Employment (এরূপ চাকরী আছে নাকি?) ইহাদিগকে controller নামে অভিহিত করাই অধিক সঙ্গত। Director of Rationing ও controller of Rationingএর প্রতিশব্দ যথাক্রমে দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ামক ও দ্রব্যনিয়ন্ত্রক বলা যাইতে পারে, একজন

ত্তি নির্বাচন করিবেন, অপরজন নির্ধারিত নীতির ব্যবহারিক য়োগ করিবেন।

একণে পুলিশ বিভাগের কয়েকটি পদের নামকরণ আলোচ্য। istrict Police Superintendent ও Deputy Superintendent f Police জেলা-পুলিশাধিনায়ক ও সহকারী জেলা-পুলিশাধিনায়ক ব্দদ্বয়ের দ্বারা নির্দেশিত হইতে পারে। অধিনায়ক শব্দটি পুলিশের াধা-সৈনিক প্রকৃতির সহিত খাপ খায়। Police Inspector ও ub-Inspector of Police পদ দুইটির প্রতিশব্দ নির্বাচনে সংসদ াস্তকর বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। Inspector র্থে পরিদর্শক শব্দটিকে তাঁহারা সর্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভুলিয়া য়াছেন যে ইঁহাদের কাজ পরিদর্শন নয়, অনুসন্ধান। আমি উহাদের জিশ আনুসন্ধানিক ও সহকারী আনুসন্ধানিক এইরূপ নামকরণের স্তাব করিতেছি। আশা করি, আরক্ষা-পরিদর্শক ও অবর-আরক্ষা-রিদর্শক অপেক্ষা এই বৈকল্পিক পদগুলি অধিকতর গ্রহণীয় হইবে।

Extra Assistant পদের প্রতিশব্দরূপে 'অতিরিক্ত' ব্যবহৃত ইয়াছে। এখন Additional এর পরিবর্তে অতিরিক্ত এর প্রয়োগ প্রচলিত Extra Assistant খুব বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে; রন্তু Additional এর প্রয়োগ অনেক বেশী ব্যাপক। সুতরাং 'অপর' থার্টি Extra Assistant সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া Additional এর অতিরিক্ত' সংজ্ঞা পুনর্গঠন করিলে লোকের অভ্যাসের উপর বেশী লুম করা হইবে না। House Surgeon ও Civil Surgeon এর ক যাত্রায় পৃথক ফল হইয়াছে; একজন কেবল চিকিৎসক ও অপরজন র-চিকিৎসক সংজ্ঞাচিহ্নিত হইয়াছেন। উভয়ে একত্র বিধানে কি কোনো বাধা আছে? 'Industrial Chemist'কে হঠাৎ স্ত্রীলোকের বেশে সাজানোর কি প্রয়োজন হইল? 'শিল্প রাসায়নিক' বলিলে কিছু অপরাধ হইত? Instrument keeper এর সংজ্ঞা নির্দেশে াধিত্র' কথাটি যেন একটু বেশি মাত্রায় পাণ্ডিত্য প্রকাশক মনে য়। যন্ত্ররক্ষক বলিলে যদি Engineering বিভাগের সহিত কোনো যোগাযোগ বিবেচক, তবে বন্ধনীর মধ্যে বিভাগ নির্দেশ করিলে সে মের অপনোদন হইতে পারে। Circle Officerকে মণ্ডলাধিকারক বলিয়া মাণ্ডলিক বলিলে অনেক সরকারী কালি ও কাগজ বাঁচিতে ারে। Labour Commissionerকে শ্রম-মহাধ্যক্ষ বলার কোনো যৌক্তিকতা নাই। শ্রমনীতি-বিধায়ক বা 'শ্রম-কল্যাণ-বিধায়ক' প্রয়োগ করিলে মহাধ্যক্ষের মহত্ত্বের অপপ্রয়োগ হয় না। একজন সংস্কৃতজ্ঞ ক্তি Assistant এর প্রতিশব্দরূপে 'সহ' এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছেন, 'সহ' শব্দ সম-মর্যাদাজ্ঞাপক, যথা সহাধ্যায়ী, সহকর্মী। রিভাষায় কিন্তু ইহার মধ্যে অধীনত্ব সূচিত হইতেছে। Assistant র্থে 'সহকারী' শব্দটিই শুদ্ধ। সহকে সহরূপে সহকারীর সংক্ষিপ্ত ংকেত বলিয়া গ্রহণ করিলে এই বৈয়াকরণিক আপত্তির নিরসন হইতে ারে। পরিভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রতি অতিমাত্রায় আনুগত্যশীল ইয়া সংস্কৃত প্রয়োগরীতি কেন উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন বুঝিলাম না।

(৮)

আর বেশী দৃষ্টান্ত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকগুলি প্রতি-ব্দ ভালই হইয়াছে এবং সেগুলি গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে ারে না। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর মূলনীতি পরিবর্তন করা দরকার। সর্ব রভাতকে বুঝাইতে গিয়া নিজ-প্রদেশবাসীর বিভীষিকা উৎপাদন ও নিজের ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিকে উৎকটভাবে উল্লঙ্ঘন করিলে, হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হইবে। 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' —বৈষ্ণব সাধনার এই নীতি বর্তমান যুগে ও অবস্থায় ঠিক প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয় না। ঘর সামলাইয়া বাহিরের সঙ্গে যথাসম্ভব মিতালীতে কোন আপত্তি নাই।

উপসংহারে এইটুকু বলিতে চাই যে, পরিভাষা সংসদের সদস্যবৃন্দের পাণ্ডিত্য বা বিদ্যাবত্তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার আমার অণুমাত্র উদ্দেশ্য নাই। আমার মনে হয় যে এই পরিভাষা প্রণয়ন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংকীর্ণ ধারণার জন্যই তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্তি পায় নাই। ঐরূপ ধারণার লৌহ-বন্ধনের মধ্যে তাঁহাদের মানস স্থিতিস্থাপকতা অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হইলে অপরেরও হয়ত সেই দুর্দশা হইত। অন্ততঃ আমি আমার নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি। হরধনুতে জ্যা আরোপণ পরীক্ষায় অনেক ধনুর্ধরই ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যদি এই ধনুককে বিপরীত দিকে বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ সংযোগ ধনুর্ধর পারদর্শিতার পরীক্ষা বলিয়া বিবেচিত হয়। ধূলিশয়নের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। তবে হয়ত এই কর্তব্য পালন যদি রসবোধ ও মাত্রাজ্ঞানের দ্বারা আর একটু শুদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, তবে কোনো কোনো শব্দ সন্নিবেশের উৎকট অসঙ্গতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইত। সংসদের সদস্যবৃন্দ তাঁহাদের পুস্তিকায় নূতন শব্দ সংকলনে সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ উপযোগিতা, ইহার অতুলনীয় শব্দৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করিয়া এই ভাষা-পিতামহীর অকুণ্ঠ গুণগান করিয়াছেন। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের সহিত একমত। কিন্তু বাংলা দেশে সংস্কৃতের চর্চা আজ যে কি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সংসদের শিক্ষাব্রতী সদস্যেরা নিশ্চয়ই জানেন। এমন কি তাঁহাদের মধ্যেও একজন কি দুইজন ছাড়া অন্যান্য সদস্য রীতিমতো ভাবে সংস্কৃতের আলোচনার সুযোগ পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। মনে হয় যে এই স্থান লাভ না করিলে সংস্কৃতের এই অসাধারণ গুণবত্তা তাঁহাদের নিকট অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পর্যন্ত সংস্কৃতবিদ্যা অনুশীলনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, যে পর্যন্ত না তাহারা সংস্কৃতের রসগ্রহণ ও মহিমা উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করেন, সে পর্যন্ত সদস্যগণের পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসা লোকমতের দ্বারা যথোপযুক্তরূপে অভিনন্দিত না হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পাইলে ইহা ক্রমশঃ অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহারা অভ্যস্ত হইয়া যাইত ও এই অভ্যাস ক্রমে এক প্রকারের অনুমোদনে পরিণতি লাভ করিত। তাঁহারা অসীম ধৈর্য ও শিল্পকৌশলের সহিত পরিভাষার যে রথ খানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাকে চালু করিতে হইলে জনসাধারণের মানস-সমর্থনরূপ ঘোড়ার সহিত ইহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। এখানে ঘোড়া ও রথ দুইই আছে, কিন্তু তাহাদের সংযোগ স্থাপনে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আর রথের গঠনে ত্রুটির জন্য যদি ঘোড়া আঁতকাইয়া উঠে, তবে অন্ততঃ যে পর্যন্ত ঘোড়া সায়েস্তা না হয় সে পর্যন্ত ইহাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া মিউজিয়মের শান্ত, নিরাপদ বেষ্টনীর মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করাই বিধেয়। পাণ্ডিত্যের জয়রথকে রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার উপযুক্ত ঘোড়া এখনও তৈয়ার হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

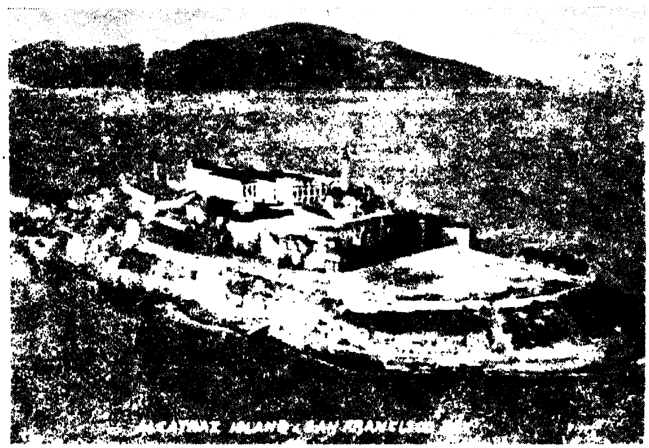
আকাশপথের যাত্রী

শ্রী সুষমা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে দক্ষিণের ষ্টেটগুলিতে নিগ্রোই বেশী। সেখানে চাষের কাজে গতর খাটিয়ে এরা পুরুষানুক্রমে ধনী বণিকের অর্থ সঞ্চয়ে সহায়তা ক'রে আসছে। কিন্তু, তাদের নিজেদের ভালো রকম ভরণ-পোষণ তবুও চলে না, একটু বাসস্থানের সংস্থান হয় না। কথায় বলে—"Negro skins the land and the landlord skins the Negro" আজ অবশ্য আমেরিকায় কাগজে কলমে নিগ্রোদের দাসত্ব-আইন তুলে দিয়ে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাদের কোন অধিকারই কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পদে পদে মনুষ্যত্বের অমর্য্যাদা। কুলি-মজুর ও দাস-দাসী শ্রেণীর লোক এরা। আমাদের দেশের হরিজনদের চেয়েও অস্পৃশ্য হয়ে এরা বাস করছে। তা না হ'লে যে Paul Robeson এর গান শুনতে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সিনেমায় যায় সেই Paul Robeson এর নিজের প্রবেশ অধিকার সে সব সিনেমাতে নেই। যে Dr. Bois বিদ্যায় ও জ্ঞানে Bernard Shaw এবং Einstein এর চেয়ে কোন অংশে কম নন—তাঁরও নাকি Atlanta লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার ছিল না। এই Dr. Bois হচ্ছেন Harvard University র Ph.D এবং বার্লিনপ্রমুখ আরো ৫টী ইউনিভার্সিটির ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত। একই দেশের তথাকথিত স্বাধীন নাগরিক হয়েও এদেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজের লোকেরা পর্য্যন্ত নিগ্রো সহকর্মীকে রাস্তায় দেখলে চিনতে চায় না, এমন কি পরিচয়ও অস্বীকার করে। Democracy র এমন চূড়ান্ত হাস্যকর দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

আফ্রিকা হতে আমদানী করা এই হতভাগ্যের দল স্বদেশ ও স্বজাতির বন্ধন ভুলেছে; এদের অতীত মুছে গেছে; বর্ত্তমান এইরূপ নির্যাতন ও নৈরাশ্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের পথও অজানা। এ যেন কোন দূর দেশের চারা গাছগুলি উৎখাত করে তুলে এনে এক নূতন অসহায় পরিবেশের মাঝে অপরিচিত মাটীতে অযত্নে রোপন করা হয়েছে। অনন্ত দুঃখের মাঝে সুরু হয় এদের জীবনযাত্রা এবং শেষ হয় অসীম অবহেলার মধ্যে। জীবনের এ হেন সংগ্রামে পড়েও এরা নিজেদের শিক্ষার উন্নতির জন্য খুবই সচেষ্ট ও যত্নবান। এদের শিক্ষালয়গুলি সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের স্কুল কলেজে এদের প্রবেশাধিকার নেই। তথাপি শিক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রতিভা যথেষ্ট দেখা যাচ্ছে। অধুনা এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, নিগ্রো গ্রেজুয়েটের সংখ্যা এখন প্রায় ৫৫০০০ হবে।



উপসাগরের মাঝে ছোট্ট এই আলকাট্রস্ দ্বীপে কয়েদীদের জেলখানা করা হয়েছে

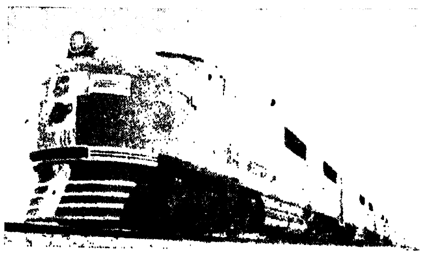
গত মহাযুদ্ধের পর নিগ্রো-জাতির অবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও চাকরির ক্ষেত্রে এদের অধিকার সম্বন্ধে সরকারি মহল হ'তে খুবই সাবধান ও সতর্কতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

পথের মাঝে এই সব নানারকম চিন্তা করতে করতে চলেছি, হঠাৎ দেখি ঝাঁকা দিয়ে গাড়ী দাঁড়াল। উনি বল্লেন, নামতে হবে, Standford University পৌঁছে গেছি। নেমে দেখি Dr. Greulich ও তাঁর স্ত্রী আমাদের নিতে এসেছেন। পরস্পর আলাপ-পরিচয় হল, Mrs. Greulich গাড়ী চালিয়ে আমাদের University Town এ নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের ল্যাবরেটারি রুমে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। পথশ্রমে খুকুকে ক্লান্ত দেখে ডাক্তার অতি সযত্নে তাকে তাঁর আরাম কেদারায় শুইয়ে দিলেন, গায়ে একটি কম্বল ঢেকে দিয়ে ও পরদা টেনে দিয়ে বল্লেন "Honey" "ঘুমাও।" এ দেশে ছোটদের আদর করে 'Darling' বলে না, বলে—"Honey"।

আমরা পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়েছি শুনে তাঁরা দু'জনে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠলেন। কথা-প্রসঙ্গে Dr, Greulich বল্লেন, তাঁরাও দেশবিদেশে বেড়াতে ভালোবাসেন, শীঘ্রই কাজের জন্য তাঁদের জাপানে যেতে হবে। এ্যাটম বোমায় বিধ্বস্ত Hiroshimaর অবশিষ্ট জীবিত অধিবাসীদের দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা করতে যাচ্ছেন তিনি। সরকার মহল থেকে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে।

বেলা ২টোয় নিকটে একটি Charity Homeএ সবাই মিলে খেতে গেলাম। এটি একটি বিকলাঙ্গদের আশ্রম। কয়েকজন স্ত্রীলোক এই আশ্রম পরিচালনা করেন। তাঁরা স্বহস্তে আশ্রমের সকল কাজ ও রোগীর সেবা করে থাকেন। এই রেষ্টুরেণ্টে যা কিছু লাভ হয় সবই সেই অনাথ আতুরদের জন্য ব্যয় করা হয়। খাওয়ার শেষে Mrs. Greulich আমাকে ও খুকুকে University Town ঘুরে দেখাতে নিয়ে গেলন। Standford University একটি ছোটখাট সহর বিশেষ। ছাত্র-জীবনের সাফল্যের জন্য অতি সুচারুরূপে এই University Town তৈরী করা হয়েছে। ছাত্র জীবনকে সুস্থ সবল ও স্বাভাবিকভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক এদের জীবনে শুধু ক্লাশে বা



আমেরিকার ষ্ট্রীম লাইন ট্রেন

ল্যাবরেটারিতেই সীমাবদ্ধ নয়; দৈনন্দিন জীবনের মাঝে ছাত্ররা শিক্ষকদের সাহচর্য্যে সত্যিকার মানুষ হবার বহু উপাদান ও সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এই University Townটি তৈরী হয়েছে। এই Standford Universityর একটি ছোট্ট কাহিনী আছে।

Mr. Standford ছিলেন একজন অতি সাধারণ মানুষ। তিনি সামান্য চাকুরী জীবন হতে আরম্ভ করে পরে ব্যবসায়ে কোটপতি হয়েছিলেন। একবছর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী তাঁদের একটিমাত্র পুত্রসহ পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা ইটালীতে পৌছান, পুত্রটি রোগাক্রান্ত হয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেইখানে মারা যায়। শোকে মুহ্যমান হয়ে মাতা পিতা স্বদেশে ফিরে যান। তাঁদের সেই একমাত্র পুত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে আপন সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক দান করে এই Standford University তৈরী করেন। ছাত্রাবস্থায় যে দীপ নিভে গেছে তার জীবনকে প্রদীপ্ত করে তুললেন শত শত ছাত্রের জীবনের মধ্যে। সার্থক এ স্মৃতি! আমরা Townটি ঘুরে দেখলাম। সহর যেন মূক হয়ে কাজ করে চলেছে। এই নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশের মাঝে এই রকম একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার যথার্থ যোগ্য স্থানই বটে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি সুদৃশ্য chapelএর সামনে এলাম। Mr Greulich গীর্জ্জা দেখতে নিয়ে গেলেন। গীর্জ্জাটির চারিদিকে সবুজ মাঠ ও মাঠের শেষে চার কোনায় চারিটি স্তম্ভ। গীর্জ্জার সামনে সারা দেওয়ালের গায়ে নানা রংএর ইটালিয়ান পাথর দিয়ে যীশুখৃষ্টের জীবনী আঁকা। ভিতরের হলটি অতি জাঁকজমকের সঙ্গে



সানফ্রানসিসকোর Union Square. ইহার তলায় মাটীর নীচে বহুশত গাড়ী রাখিবার গ্যারেজ রয়েছে

সাজানো, সুসজ্জিত বেদীর মধ্যভাগে দেওয়ালের গায়ে Last Supperএর ছবিখানি জীবন্তের মত ফুটে উঠেছে। উপরে Balconyর দু'ধারে বড় বড় পিতলের চোঙগুলি গীর্জ্জার চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে, প্রার্থনাকালে অর্গান বাজলে এই চোঙগুলির ভিতর দিয়ে সুরের ঝঙ্কার ওঠে। শুনলাম Mr Standfordএর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্ম্মিণী বাকি সমুদয় অর্থ দান করে স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই chapelটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্বামী ও পুত্রের স্মৃতি মন্দিরে সর্ব্বস্ব দান করে Mrs. Standford নিঃস্ব হয়ে বাকি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এই গীর্জ্জায় বসে ভগবৎ আরাধনায় কাটিয়ে গেছেন।

আমরা ল্যাবরেটারিতে ফিরে গিয়ে দেখি তখনও Dr. Greulich ও উনি কাজে ব্যস্ত। একটু পরেই রওনা হওয়া গেল। আমাদের বাস-ষ্টেশনে তুলে দিয়ে Dr. ও Mrs. Greulich ফিরে গেলেন।



সানফ্রানসিসকোর মাছ ধরিবার বন্দর

গোধুলির আলোয় মাঠের অপূর্ব্ব শোভা দেখতে দেখতে চলেছি, সাগর-তীরে এসে দেখি—আকাশে তখন লাল রং ছড়িয়ে সূর্য্যদেব সাগর জলে ডুব দিচ্ছেন। অন্ধকারে আকাশ ঢেকে গেল, আমরা San Franciscoতে ফিরে এলাম। (ক্রমশঃ)

বাঙ্‌লার মঞ্চ ও চিত্র কোন পথে

অধ্যাপক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী এম-এ, বি-এল

"A nation is known by its stage"—বহুজন বহুভাবে এই একটি কথাই বলে গেছেন। এটি যে কত বড় সত্য, আজ্‌কার দেশ এবং মঞ্চ ও চিত্রের দিকে চাইলেই সে কথা বড় নিদারুণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ভগ্নহাল, ছিন্নপাল স্রোত-তাড়িত নৌকার মত ভারতবর্ষ আজ ভেসে চলেছে কোন অজানা অনির্দিষ্টের পানে। সকলের সাম্‌নে আছে বাংলা দেশ। তার sentiment তাকে এগিয়ে দিয়েছিল, তার sentiment তাকে পেছিয়ে দিয়েছে। তাই আঘাত যদি লাগে, তাকেই দিতে হবে আত্মবলিদান সকলের আগে। প্রস্তুতি নেই, চেষ্টা নেই, সংযম নেই—আছে শুধু গালভরা বক্তৃতা আর কথার তুবড়ি। জাতির আশাআকাঙ্খা, মঞ্চ আর চিত্রের ঠিক-একই পরিণতি। 'অভাবনীয়' 'অনবদ্য' 'hit' ইত্যাদি বাঁধা বুক্‌নীর অন্তরালে বিরাজ করে নিদারুণ ব্যর্থতা। সস্তার দেশপ্রেম আর ধর্মের কচ্‌কচির চাট্‌নী দিয়ে যে সমস্ত জিনিষ পরিবেশিত হয়, চিন্তাশীল তাতে ভীত হয়ে ওঠেন, জনসাধারণ বিরক্ত হন, ব্যাঙ্ক ফেল হয় এবং শেষকালে প্রযোজক হা-হুতাশ করেন; তবু বিরাম নেই এই একঘেয়েমির। কিন্তু এ হলে চলে না, চল্‌বেও না। স্রোতের মুখে কুটির মত আমরা ভেসে যেতে পারি না—আজকের দিনে পারা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই বাধা দিতেই হবে।

চিত্র আর মঞ্চ কত তাড়াতাড়ি দেশকে গড়ে তুল্‌তে পারে, তার উদাহরণ রাশিয়ার মস্কো আর্ট থিয়েটার। আর এই চিত্র আর মঞ্চ কত তাড়াতাড়ি যে দেশকে ধ্বংসের পথে নামিয়ে আন্‌তে পারে, তার প্রমাণ আমাদের দেশের তথাকথিত নাটক ও ছায়াচিত্র, হলিউড-আগত কুৎস-রুচিপূর্ণ ছবিগুলি এবং তাদেরি অন্ধ এবং ব্যর্থ অনুকরণে তথাকথিত স্বদেশী হিন্দী ছবিগুলি।

আজকাল চিত্র ও মঞ্চের প্রত্যেকটি নাটকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের কথা। এতে করে নায়ক-নায়িকার cheap romance-এর সংগে সেগুলি cheap stunt হয়ে গিয়ে রসিকজনের বিরক্তিই উদ্রেক করে এবং যেটি সত্যিকারের সমস্যা—সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগতভাবে যে সমস্যা মানুষের জীবনকে ওতপ্রোত করে রেখেছে তার পরিস্ফুটনার মহাকল্পনা—কোথাও নেই। শুধু এইটিকে নিয়ে ছেলে ভুলাবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজ-দর্শন, জীবনদর্শন, আত্মদর্শন—এ কথাগুলো শুধু কথা হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এদের নাম হয়েছে 'বুকনী'। কারণ যারা এগুলোর ব্যবহার করে, তাদের নিজেদের এগুলো সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা নেই, তাই তাদের বক্তব্যও সুপরিস্ফুট হতে পারে না। "বাংলার মাটিতে যাই আসুক না কেন, তার একটা বিকৃতরূপ আপ্‌না থেকে গড়ে উঠবেই"—এই বলেই হতাশ হয়ে একদল 'সিনিক' সেজে বসে থাকেন। বেশী realistic যাঁরা জোর করে এগিয়ে আসেন, তাঁরা নেতা হন। স্বার্থ তাঁদের প্রবল সবসময়ে, তাই দেশের কোন লাভ হয় না তাঁদের নেতৃত্বে। আর একদল উদাসীন—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই; বড়-সাহেবের আমলের সুখের গল্পে এঁরা এখনও মাঝে মাঝে উৎসুক হয়ে ওঠেন, তাই কোনদিকে গঠনমূলক প্রচেষ্টা নেই বল্লেই হয়।

প্রায় দু'বছর হতে চল্‌ল, দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। অথচ মানুষের শিক্ষার সবচেয়ে সার্থক medium বলে সারা পৃথিবীতে যার স্থান—সেই মঞ্চ ও চিত্রের দিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া সরকার মনে করেন না। শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার কর্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করেন না—হয় সামর্থ্য নেই, ক্লিকের জোরে গদী দখল করেছেন; আর না হয়, "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব কেন"—এম্‌নি একটা আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা বসে থাকেন; কোন কোন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ চিত্র বা নাটকের শুভ উদ্বোধনের সময় দেশনেতা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোম্‌রাচোম্‌রাদের ধরে এনে সাম্‌নের আসনে বসিয়ে দেন। অর্দ্ধেক দেখবার পর আভিজাত্য বজায় রেখে চলে যাবার সময় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে

তা একটা মন রাখা কথা বলে যান ; আর কর্তৃপক্ষ তাই য়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়ান। কারণ মাল তাঁরা যা তৈরী রেছেন তার ধারের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাঁদের াজেদেরই ; তাই ভার চাই। কাটাতেই হবে যে কোন কারে। জবাব—ব্যবসার দিকটা আপনারা ভাবতে ান না—অর্থাৎ—প্রয়োজন টাকার ; ওটাই সবচেয়ে বড়, ার কিছুই নয়। অথচ টাকা হচ্ছে না, কারণ টাকা ভাবে হয় না—এটা তাঁরা বুঝতে চান্ না কিছুতেই বা াটুকারের দল খোসামোদের চোটে বুঝতে দেয় না কছুতেই। সন্তানের যাঁরা পিতামাতা, সমাজের যাঁরা াতিষ্ঠাতা—তাঁরা এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করেন না। াকটা inferiority complexএর reactionএর দরুণ নজেদের খুব উচ্চস্তরের লোক ভেবে নিয়ে তাঁরা এ ছড়ান্তাটায় যোগ দিতে চান না। শিক্ষিত মার্জিত যে একজন এ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন inflation moneyর মাটা অঙ্কটাই তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে রাখে। তাই biggest medium of mass education এই চিত্র মার রঙ্গমঞ্চ প্রায়ই অক্ষম ক্লিকবাজ লোকের হাতে পড়ে মানুষের সাম্‌নে এমন বিষদুষ্ট জিনিস পরিবেশন করে, াতে তরুণ মনের ক্ষুধার সামগ্রী নেই—পরিণত মনের াান্ত্বনার চিহ্ন নেই। সাধারণ মানুষ হাহুতাশ করে, আর াারা তথাকথিত বড় হয়ে গেছেন, তাঁরা তাঁদের fossilised aste নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন পরম বিজ্ঞের মত।

যে যুগটি এসেছে সেটি সত্যি বড় সাংঘাতিক। মানুষের ান এত বেশী analytical হয়ে পড়েছে, যে তার শান্তি নেই। কেউ নিজের অবস্থায় সুখী নয়, তাই অপরের দিকে য় দৃষ্টি নিয়ে সে তাকায়, তার মধ্যে অপমান, ঈর্ষা আর নীচতা ভর্তি হয়ে গেছে। মানুষ মানুষের সম্মান করে না, শ্রদ্ধা করে না ; টেক্কা দিয়ে চলাই যেন যুগের বিশিষ্টতা। উকিল ব্যারিষ্টার চোর, মাষ্টার প্রফেসার গরীব, ব্যবসাদার কালো-বাজারী, ছাত্র দুর্বিনীত, কেরাণী জগতের সম্বন্ধে নিম্ন ধারণা পোষণ করে, মজুর কৃপার পাত্র—এমন সব ধারণা মানুষের মনে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হতে চলেছে। জাতিকে ধ্বংসের পথে এনে দিতে এই ধারণার মত কার্যকরী হয়ত আর কিছুই নেই। এমন দিনে যে জিনিষটী দিয়ে এই অশান্তির আগুনে একটুখানি জল দেওয়া যেত, তা হচ্ছে চিত্র আর মঞ্চ। হাজার নেতার হাজার বক্তৃতা যা করতে পারে না, একটি মাত্র চিত্রে তা খুবই সম্ভব। আদর্শের publicityর এত বড় medium কল্পনা করা যায় না। গল্পের মাদকতায় শ্রোতা বা দর্শককে মুগ্ধ করে সুবিধামত আদর্শের serum inject করবার মত এত কার্যকরী উপায় আর নেই। তাই এই চিত্র আর মঞ্চের উন্নতির যে কত বড় প্রয়োজন তার ঠিকানা নেই।

এতদিন হয়ে গেল, এখনও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তৈরী হল না। জাতীয় নাটক "কুলীনকুলসর্বস্ব" সমাজের বুকে আঘাত হেনে চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিল। জাতীয় নাটক "নীল দর্পণে" চাষার মুখ দিয়ে নাট্যকার যখন বল্‌লেন—মোরা জেলে পচে মরব, তবু গোরার নীলচাষ করব না—ধ্বংসোন্মুখ বাংলা নবজীবন ফিরে পেল, বিকারগ্রস্ত বাঙালীকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করল বিল্বমঙ্গল, চৈতন্যলীলা, সিরাজদ্দৌলা, রাণাপ্রতাপ। অথচ আজ এমন দিনে যখন এই জাতীয় নাটকের বড় প্রয়োজন, জাতিকে বাঁচাতে যে হবে মৃতসঞ্জীবনী, হতমান ভিক্ষুকে পরিণত মানুষের বুকে যে আনবে আশার আলো, দুর্বলের বুকে যে দেবে অনুপ্রেরণা, সে জাতীয় নাটক রচিত হল না, জাতীয় নাট্যমঞ্চও রচিত হ'ল না।

বাঙলার জলহাওয়ায়, বাঙ্‌লার ইতিহাসে আছে নাটকের বীজ ; তাই বাঙ্‌লা দেশে নাটকের প্রচলন অনেকদিনের কথা। নেপালে প্রাপ্ত নাট্যাবলী তার সাক্ষ প্রমাণ হয়ে আছে। তাই জাতির এত বড় সঙ্কটম মুহূর্তে নাট্যকার সৃষ্টি হয়নি, সে কথা আমি বলতে পাি না। নাট্যকার আছে, হয়ত কোথায় নিভৃতে বসে নিজে সাধনা করে চলেছে। কিন্তু স্বার্থান্ধ যুগ নিজের স্বার্থে খাতিরে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না। তাই সুধীবৃন্দ যাঁরা সত্যিকারের দেশের মঙ্গল চান, তাদের করতে হবে জাতীয় নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা, খুঁজে বের করতে হবে সেই মহানাট্যকারের দলকে। যে ব্যর্থতা, যে সম মুমূর্ষু মানুষের মনের দ্বারে আঘাত দেয় অনবরত, মানুষ য নীচে নামুক, একদিন না একদিন তারই লেখনী অবলম্ব করে রচিত হবে সেই মহানাটক, যার মধ্যে আ অধঃপতিত মানুষের মহা উত্থানের চেতনা।

আজকের যুগে মঞ্চে ও চিত্রে যা পরিবেশিত হচ্ছে, তার খুঁটিনাটি বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সমগ্রভাবে এই কথা বলা যায় এদের মাঝে সত্যিকার বড় ড্রামা কিছু নেই, যা মানুষকে ভাবায়, উদ্বুদ্ধ করে, চেতনা আনে; তাতে থাকে সস্তার romance আর sex stunt। এইভাবে exploitation of adolescence এই যদি নোতুন যুগের স্রষ্টাদের ধারণা হয়, এই অমৃতের নামে বিষ পরিবেশন যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, তাঁদের ধ্বংসেই আনন্দ। যে সুষ্ঠু নাট্যপরিবেশনের মাঝে আছে এত possiblity, যা দিতে পারে কত কিছু, তাকে নিয়ে এই prostitution মনোবৃত্তি অমার্জনীয় অপরাধ। মহামানবের চরিত্রের carricatureএ ধর্মপ্রাণ মানুষকে exploit করে পয়সা উপার্জন—হত্যার চেয়ে জঘন্য অপরাধ; কারণ এ জাতীয় নাটকে সমাজ-সত্তাকে ধীরে ধীরে আরও বিকৃতির পথে আনা হয়, মানুষের মনুষ্যত্ব আহত হয়।

এই অপদার্থতা এবং অন্ধত্বের বিরুদ্ধে সত্যকারের আঘাত হান্‌তে হবে। হয়ত যারা তথাকথিত প্রযোজক, যুদ্ধের কালোবাজারস্ফীত হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রযোজক, যারা মানুষকে exploit করে তাদের ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক আরও মোটা করতে চায়, তাদের ক্ষতি একটু হবে। কিন্তু দেশের স্বার্থের দিকে চেয়ে তাদের উপর করুণা করে কোন লাভ নেই। সর্পদষ্ট আঙ্গুল বেশীদিন দেহের সংগে লেগে থাকা দেহীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয় এতটুকু।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে, যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য জ্বলি ওঠে খরখড়্গ সম…

বাহির বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

চীনের সঙ্কট

চীনে কমুনিষ্টদের বিশাল সামরিক সাফল্যে মার্শাল চিয়াংএর আসন টলিয়া উঠিয়াছে। সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় এখন কম্যুনিষ্টদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। পিপিং ও তিয়ানসিন অবরুদ্ধ। রাজধানী নান্‌কিংএর দ্বাররক্ষী সুচাও পরিবেষ্টিত রাখিয়া কম্যুনিষ্ট বাহিনী বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। নান্‌কিংএর প্রত্যক্ষ বিপদ আসন্ন। ইয়াংসী নদীর তীরবর্ত্তী এই নগরে এখন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা রচিত হইতেছে। শত্রু-বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলিকে চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার পর পরবর্ত্তী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই কম্যুনিষ্টদিগের রণনীতি। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কম্যুনিষ্টরা এত দ্রুত অগ্রসর হয় যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী অবরুদ্ধ স্থানগুলিকে মুক্ত করা সরকারপক্ষের অসম্ভব হইয়া পড়ে।

চিয়াং গভর্ণমেণ্ট আরও সামরিক সাহায্যের জন্য আমেরিকার নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছেন। চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমেরিকা হইতে সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মাদাম চিয়াং কাই-সেক্ আমেরিকায় গমন করেন। ট্রুম্যান্ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু এই সময় চীন সম্পর্কে বেশ উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কারণ কতকটা দুর্ব্বোধ্য। জাপান পরাজিত হইবার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চিয়াং গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার নিকট হইতে নানাভাবে ৪শত কোটী ডলারের অধিক সাহায্য পাইয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্যলব্ধ শক্তি সামরিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহার কারণ চিয়াং গভর্ণমেণ্টের কুশাসন, সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থা হেতু জনসাধারণের দারুণ দুঃখ ও অসন্তোষ। কিছুকাল পূর্ব্বে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল চীন পরিদর্শন করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টের আমূল সংস্কার না হইলে চীনে সাহায্য প্রেরণ বৃথা। বস্তুতঃ অতদিন মার্কিণ সাহায্য যত না কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তত কমুনিষ্টরাই সরকারপক্ষের বিরুদ্ধে উহা প্রয়োগ করিয়াছে। এক একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কমুনিষ্টরা প্রচুর পরিমাণে মার্কিণ সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে; সরকারপক্ষের দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক কর্ম্মচারীরা শত্রুপক্ষের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই। দলে দলে সরকার পক্ষের সৈন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কমুনিষ্টদের সহিত যোগ দেয়। আমেরিকার ডলারে চীনের জনসাধারণের দুঃখের বিন্দুমাত্র লাঘব হয় নাই। এই অর্থের অধিকাংশ অসাধু সরকারী কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ীদের পকেটে গিয়াছে। এই সব কারণে চিয়াং গভর্ণমেণ্টের আকুল আবেদনে আমেরিকার পক্ষে

াহতে অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সামরিক অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক। নান্‌কিংএর যদি পতন হয়, অথবা নান্‌কিংকে অবরুদ্ধ রাখিয়া কমুনিষ্টবাহিনী যদি ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে সাংহাই, হ্যাংচাও প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী নগরসহ সমগ্র দক্ষিণ-চীন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। চিয়াং অথবা তাঁহার অন্য কোনও কুয়োমিণ্টাঙ্গী সহযোগী এশিয়াখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ফরমোজায় যাইয়া কুয়োমিণ্টাং পতাকা উড্ডীন রাখিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু এইভাবে কমুনিষ্টদের আধিপত্য বিস্তৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি নিরপেক্ষ থাকিবে? কমুনিষ্ট রুশিয়ার উদ্দেশ্যেই সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটী প্রস্তুত হইতেছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি তাহার এত আগ্রহও সোভিয়েট-বিরোধী ও কমুনিজম্‌-বিরোধী উদ্দেশ্যেই। বস্তুতঃ, সমগ্র জগতে কমুনিজম্‌ প্রসারে বাধা দিবার সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। সে কি চীনে কমুনিজমের এই প্রসারে শেষ পর্য্যন্ত উদাসীনই থাকিবে? ইহা কি সম্ভব?

আপাতঃদৃষ্টিতে টুম্যান গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্য প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কুয়োমিণ্টাং গভর্ণমেণ্টকে চরম নতি স্বীকার করাইয়া চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তাঁহারা পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, চিয়াং গভর্ণমেণ্ট এখন যে কোনও সর্ত্তে মার্কিণ সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ওয়াশিংটনস্থিত চীনা দূত ডাঃ ওয়েলিংটন্‌ কু প্রকাশ করিয়াছেন যে, "দুর্নীতি প্রতিরোধক" মার্কিণ নিয়ন্ত্রণ তাঁহারা মানিয়া লইতে প্রস্তুত। এই দুর্নীতি চীনের সর্ব্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং মার্কিণ নিয়ন্ত্রণও হইবে সর্ব্বগ্রাসী। চিয়াং অথবা তাঁহার অন্য কোনও সহযোগী সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়নক হইয়াই শাসনকার্য্য চালাইবেন। এইভাবে আমেরিকা তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তৃত্বে দক্ষিণ চীনে কমুনিষ্ট-বিরোধী পতাকা উড্ডীন রাখিতে সচেষ্ট হইবে। কমুনিষ্টদিগকে তাহাদের অধিকৃত অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিতে হইলে এখনই এই অঞ্চলে আমেরিকার পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। সে অভিযান কেবল চীনেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অতি সত্বর সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া চরম বিধ্বংসী তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে। আমেরিকা এখনই তত দূর অগ্রসর হইবার মত প্রস্তুত হয় নাই।

বর্ত্তমানে চীনের গৃহ-যুদ্ধ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে চীন দুইভাগে বিভক্ত হইবারই সম্ভাবনা। নান্‌কিং অধিকার করিতে পারিলেই কমুনিষ্টরা সেখানে পিপলস্‌ গভর্ণমেণ্ট করিবে। বস্তুতঃ কমুনিষ্টদের দ্বারা উত্তর চীন পিপ্‌লস্‌ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের বিরোধ আরও প্রবল হইবামাত্র সোভিয়েট রুশিয়া ও তাহার অনুগত রাষ্ট্রগুলি এই পিপলস্‌ গভর্ণমেণ্টকেই চীনের প্রকৃত গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। এই সময় এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নহে। বৃটেন্‌ চিয়াং গভর্ণমেণ্টের প্রতি সন্তুষ্ট নহে, চীনের কমুনিষ্টদিগকে খুব মারাত্মক বলিয়াও সে মনে করে না। কাজেই, কমুনিষ্টরা যদি সামরিক শক্তির বলে ও জনসাধারণের সমর্থনে চীনের অধিকাংশ অঞ্চলে তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা বৃটেনের সহানুভূতি পাইতে পারে।

বার্লিন-সমস্যা

পশ্চিম জার্ম্মাণীর নূতন মুদ্রা বার্লিনে প্রচলন করিবার পরই গত জুন মাসে সোভিয়েট রুশিয়া বার্লিনে যে অবরোধ আরম্ভ করে, সে অবরোধ এখনও চলিতেছে। বৃটেন্‌, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিনিধিরা মস্কোয় যাইয়া দীর্ঘকাল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে বার্লিনের মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা আপোষ মীমাংসাও হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষ এই জিদ্‌ ধরিয়া থাকেন যে, বার্লিনের অবরোধ পূর্ব্বে উত্তোলন করিতে হইবে, তাহার পরে চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনের ব্যবস্থা হইবে। সোভিয়েট রুশিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে, একই সময় অবরোধ উত্তোলনের ও মুদ্রা ব্যবস্থায় চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক। সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী পক্ষ হইতে প্রসঙ্গটি জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল। সোভিয়েট প্রতিনিধির "ভেটো" প্রয়োগে এই পরিষদের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। অতঃপর এখন বার্লিন সম্পর্কে একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা আবার নূতন করিয়া হইতেছে। এই চেষ্টায় অগ্রণী হইয়াছেন আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি ডাঃ ব্রামুগ্‌লিয়া। মিত্রপক্ষ নিরাপত্তা পরিষদে বার্লিন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ঠকিয়াছেন। এই পরিষদ যে সোভিয়েট রুশিয়াকে সায়েস্তা করিতে পারে না, ইহা তাঁহারা জানিতেন। তবু, তাঁহারা এই আশায় ঐ পরিষদের আশ্রয় লইয়াছিলেন যে, উহাতে সোভিয়েট-বিরোধী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। কিন্তু সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার দাবী যে অসঙ্গত নহে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই ডাঃ ব্রামুগ্‌লিয়া উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করিতেছেন।

বার্লিন সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হইলে সে মীমাংসা সাময়িক-ভাবেই হইবে; স্থায়ী মীমাংসা এখন আর সম্ভব নহে। বার্লিনের সমস্যাটি জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সোভিয়েট রুশিয়া পোট্‌সড্যাম্‌ চুক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী চায়; পক্ষান্তরে, পশ্চিম জার্ম্মাণীকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ দিবার আয়োজন মিত্রপক্ষ প্রায় সমাধা করিয়া ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ, ইউরোপ পুনর্গঠনের যে মার্কিণী পরিকল্পনা, তাহা পশ্চিম জার্ম্মানীকেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে। মিত্রপক্ষের এই আয়োজন বাতিল করিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের ব্যবস্থা আর সম্ভব নহে। ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী কর্ত্তৃত্বে পশ্চিম জার্ম্মাণী যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়া তাহার এলেকায় অবস্থিত বার্লিনের একাংশে এই তিনটি শক্তির প্রভুত্বে স্থির উপস্থি

করিবেই। বর্ত্তমান মুদ্রাব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা হইলেও নূতন বিরোধের সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহার বিলম্ব হইবে না।

রুঢ়

আমেরিকার ইউরোপ পুনর্গঠনের পরিকল্পনাটি শ্রমশিল্পোন্নত রুঢ়সহ পশ্চিম জার্ম্মানীকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইবে—ইহাই আমেরিকার অভিপ্রায়। পরিকল্পনাটি সেইভাবে রচিত এবং সেইভাবে উহাকে কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। সোভিয়েট এলেকার বহির্ভূত ইউরোপকে পুনর্গঠিত করিয়া সোভিয়েট-বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাচীর রচনাই তাহার উদ্দেশ্য। কোনও বিশেষ দেশকে উন্নত করা, কোনও বিশেষ দেশের অর্থনীতিকে জাতীয় ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নহে। ১৬টি দেশের (পশ্চিম জার্ম্মানী লইয়া ১৭টি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টাই হইতেছে। এই জন্যই পশ্চিম জার্ম্মানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার যে দাবী, এংলো-স্যাকসন শক্তি তাহাতে প্রবলভাবে আপত্তি করে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ নিজ দেশের কম্যুনিষ্টদের জ্বালায় অস্থির; সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে তাঁহাদের বিরূপতা কম নহে। রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা হইলে সোভিয়েট রুশিয়াও যে সে কর্ত্তৃত্বের অন্যতম অংশীদার হইবে, ইহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু জার্ম্মানীর সামরিক শক্তিতে পুনঃ পুনঃ নির্য্যাতিত ফরাসী জাতি সামরিক শক্তিসম্পন্ন জার্ম্মানীর পুনরভ্যুত্থান সম্পর্কে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত। এই জন্য ফ্রান্সের পক্ষ হইতেও রুঢ়ে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আসিয়াছিল। এই প্রস্তাব তাহার শক্তিশালী মিত্ররা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর ফ্রান্স প্রস্তাব করে যে, রুঢ়ের শ্রমশিল্পে ৬টি শক্তির পরিচালন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হউক এবং এই শ্রমশিল্পে উৎপন্ন পণ্য এই ৬শক্তি কর্ত্তৃক বণ্টনের ব্যবস্থা হউক। এংলো-স্যাক্শন পক্ষ এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন। গত গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে ৬শক্তির সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্ম্মান শিল্পপতিরাই রুঢ়ের শ্রমশিল্প পরিচালনা করিবেন; কেবল পণ্য বণ্টন-নিয়ন্ত্রণে ছয় শক্তির কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। ফরাসী জাতীয় পরিষদ তখন এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ফরাসী জাতির মনোভাব ইহার বিপক্ষেই ছিল। সম্প্রতি লণ্ডনে আর এক সম্মেলনে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখা হইয়াছে। এবার মঃ দ্য গল পর্য্যন্ত ইহাতে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি ফরাসী জাতীয় পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে রুঢ়ের কয়লা ও ইস্পাত শিল্পে জার্ম্মান শিল্পপতিদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

রুঢ়ে জার্ম্মান শিল্পপতিদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের এই ব্যবস্থায় পরোক্ষে আমেরিকারই কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইতেছে। পশ্চিম জার্ম্মানী এখন মিত্রপক্ষের সামরিক অধিকারে; মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রই এই পক্ষের নিরঙ্কুশ নেতা। নূতন ব্যবস্থায় রুঢ়ের শ্রমশিল্পগুলি প্রাচীন শিল্পপতি-সমবায়গুলির (combines) হাতে অর্পিত হইবে না। প্রাগ্‌যুদ্ধকালীন সমবায়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিম জার্ম্মানীর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের নিযুক্ত ট্রাষ্টিদের হাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অর্পিত হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃত মালিক স্থির করিবেন জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট। পশ্চিম জার্ম্মানীর বর্ত্তমান কর্ত্তাদের তত্ত্বাবধানে গঠিত গণ-পরিষদে সেই গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কিত শাসনতন্ত্র রচিত হইবে।

ইহা সুস্পষ্ট যে, দ্বিবিধ গভীর উদ্দেশ্য লইয়া রুঢ় সম্পর্কে বর্ত্তমান ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রথমতঃ আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা না করিয়া রুশ প্রভাবে শ্রমশিল্প জাতীয়-করণের দাবী উত্থিত হইবার পথ বন্ধ করা হইয়াছে। তাহার পর, পুরাতন শিল্পপতি সমবায়গুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া অর্থনীতিক্ষেত্রে এংলো-স্যাক্শান্ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে জার্ম্মানীর পুনরুত্থানের পথও বন্ধ করা হইল। রুঢ়ের শ্রমশিল্পে আপাততঃ যে সব জার্ম্মান ধনিক কর্ত্তৃত্ব করিবে, তাহারা আমেরিকার অনুগত; ঐ সব শিল্পের মালিকানাও ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর জার্ম্মানদের উপর বর্ত্তাইবে।

বিশ্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

দেয়ালে ফাটল ফুঁড়ি
ফুটিয়াছে এক জীর্ণ চারায়
একটি ফুলের কুঁড়ি।
শিকড় সমেত উপাড়ি তাহারে
হাতে তুলে ধরি' দেখি বারে বারে।
ছোট চারাগাছ, ছোট নীল ফুল
দুটি কচিপাতা, সরু সরু মূল।
এই তার পরিচয়?
ছোট ফুল, তুমি নও ছোট নও,
বিশ্বদেবের ছায়া তুমি হও।
তোমারে জানিলে বিশ্বেরে জানি
এক তারে বাঁধা সবি।
ছোটর মাঝারে বিশ্বভুবন
দেখে আপনার ছবি।



...শের সর্বত্রই আজকাল শ্রমিক শ্রেণীকে এই শ্রেণীর সাধারণ ধর্মঘট পালনে উস্কানী দেওয়া হইতেছে। বর্তমানে এই জাতীয় ধর্মঘট পালনে কেবল জনসাধারণের অসুবিধা হইবে তাহা নহে, পরন্তু উহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়। শ্রমিক সম্প্রদায়েরও উহাতে কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি যখন একান্ত প্রয়োজন, তখন এইরূপ ধর্মঘটের আহ্বান জাতীয় স্বার্থের কতখানি পরিপন্থী তাহা বলাই বাহুল্য। —নির্ণয়

* * *

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সমাজ-সেবা সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতা অর্জ্জনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ কথা নয়। পণ্ডিত নেহেরু সর্ব্বত্রই এই কথা বারবার বলিতেছেন ইহার এক বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। দেশের সর্ব্বত্র আজ নানাসমস্যাকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে চরম জ্ঞান করাইতে তাহার সূচনা বলা যায়। সরকারী কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মী, জনসাধারণ সকলের মধ্যেই এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার মোহ-বিভ্রান্তি অতি মাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে কোনক্রমেই সুলক্ষণ বলা যায় না। —নির্ণয়

* * *

ভূতপূর্ব জনসংভরণ মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয় মন্ত্রিত্বের গদিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিলে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে। তখন মহাত্মাজী জীবিত ছিলেন। মহাত্মাজী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী হইলেও গান্ধী-পন্থী ভাণ্ডারী মহাশয় আই, সি, এস প্রভাবে এবং মন্ত্রিত্বের খাতিরে গান্ধীজীর মতের বিরোধিতা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হঠাৎ ভাণ্ডারী মহাশয়কে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। তবে কি ইহা—"বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা।" —বর্ধমান

* * *

পূর্ব্বের সভাপতিগণের অভিভাষণের ধারা ও প্রথা অনুযায়ী নয়। ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার নিজস্ব মনোভাব ও ধারা অনুসারে ও ভারতে অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য কেবল সমালোচকের ও ইতিবৃত্ত লেখকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ও অনেকেরই কাজে লাগিবে। বর্তমানে কংগ্রেসকে পুরোহিত, উপদেষ্টা বা সমরাভিযান-পরিচালক হইতে হইবে না। কংগ্রেস যদি শাসনকারী কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহা জনগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবে। —দেশন

* * *

মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান এবং ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়র স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া এবার মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে যে অভিভাষণ দিয়াছেন—ভারতের কল্যাণ যাঁহারা আন্তরিকতার সহিত কামনা করেন প্রত্যেকেরই সেইটি বার বার পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন কর্ম্মীগণকে কঠিনপরিশ্রমে অভ্যস্ত হইতে হইবে, কাজের সময় working hours বাড়াইতে হইবে এবং দক্ষতার সহিত কাজ করিতে শিখিতে হইবে। আমেরিকায় শ্রমিকেরা এইভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ভারতকেও সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কঠিন পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তিনি আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীলোকের গড় পরমায়ু হইতেছে ৬৩ বৎসর এবং পুরুষের ৬২ বৎসর। আর ভারতে গড় পরমায়ু হইতেছে ২৮ বৎসর। অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রম করিয়াও আমেরিকার লোকের পরমায়ু ভারতবাসীর পরমায়ু অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক। উপনিষদের ঋষিরা নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

শ্লোকটা এই :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ

অর্থাৎ কাজ করিতে করিতেই একশত বৎসর বাঁচিতে চাহিবে। —সারথি

* * *

গত ১৫ই ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ রোহাটগীর শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ এবং গভর্ণমেণ্টের শিল্পনীতির সমালোচনার প্রত্যুত্তরে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে উক্তি করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আশাকরি ডাঃ মুখার্জীর উক্তিতে শিল্পপতিরা কিঞ্চিৎ সংযত হইবে। কারণ ডাঃ মুখার্জী তাঁহাদিগকে স্পষ্ট ভাবেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেশের অগ্রগতি কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে না এবং তাহাদের বা অন্যান্যের (ধনিকদের) সাহায্যে যদি দেশের উন্নতি সাধিত না হয় তাহা হইলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবসান ঘটিবে ও নূতন প্রথার অবতারণা হইবে।

শ্রমিকদের সম্পর্কেও শিল্পপতিদিগকে সতর্ক হইতে বলিয়া ডাঃ মুখার্জী বলিয়াছেন "আপনারা কি ইহা চান যে, যখন তখন পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী ডাকিয়া সরকার শ্রমিককে সায়েস্তা করিবেন? শ্রমিককে

সন্তুষ্ট করার দায়িত্ব মালিকের। শ্রমিকদের গুলি করা যাইতে পারে, কিন্তু কাজ করান যাইবে কি? সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্যভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। বস্তুতঃ এই শ্রমিকেরা তাঁহাদেরই আত্মীয়স্বজন, ভাই-ভগ্নী, তাঁহাদেরই দেশবাসী—এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজনই কেবল মাত্র লক্ষ্মীর বরপুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" ডাঃ মুখার্জীর এই দৃঢ়তা ব্যঞ্জক উক্তিতে শিল্পপতিদের চৈতন্যোদয় হইবে কি?

—সংগঠনী

* * *

আমাদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরখানাগুলিতে সম্প্রতি যাঁহারা ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়াছেন পদের মাদকতা তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই পাইয়া বসিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাকে গান্ধীজী যে কথা বলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে আমি তাহার পুনরুল্লেখ করিতে চাই। ১৯৪০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখ। গান্ধীজী তখন দুইদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। সন্ধ্যায় তিনি যখন যথারীতি ভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহার সহিত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামলী'তে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা 'শ্যামলী'তে ফিরিবামাত্র সান্ধ্য প্রার্থনাসভার জন্য প্রস্তুত হইয়া তিনি অকস্মাৎ বলিলেন, "মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলে আমাদের ভাল ভাল কর্মীদের মধ্যে এতজনের নৈতিক অধঃপতন ঘটিবে জানিলে আমি কখনও এই পরামর্শ দিতাম না।" আমি তাঁহার মুখের আকৃতি লক্ষ্য করিলাম। প্রচণ্ড অন্তর্দাহে সেই মুখ কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

—হরিজন পত্রিকা

* *

বহরমপুরে গত ১৯শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মিলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-সচিব শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এই প্রদেশে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন—এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আজ যখন অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সর্বাপেক্ষা প্রবল সমস্যা, তখন যে শিক্ষায় তাহার সমাধান হইতে পারে, ছাত্রদিগকে সেই শিক্ষা প্রদান করা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। সেদিনও শিক্ষা-সচিব দুঃখ করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু যতদিন সরকারী দপ্তরের ব্যয়বাহুল্য দূর করা না হইবে, ততদিন অর্থাভাব ঘুচিবে না। —দেশ

* *

পুঁজিপতিদের গুদামে মাল ধরে রাখার কারসাজি আর চোরা-কারবারীদের বেপরোয়া উৎপাত আজ পনেরো মাসের মধ্যেও কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট কোনও রকমেই বন্ধ করতে পারছে না। এটাকে জনসাধারণও তাঁদের অক্ষমতা বলে মেনে নিতে পারছে না। বরং এটাকে তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য অথবা শাসনের অযোগ্যতা বলেই মনে করছে এবং কংগ্রেসকে 'পুঁজিবাদী সরকার' বলে অপবাদ দিচ্ছে। জনসাধারণের সমর্থন ও সহানুভূতি থেকে কংগ্রেস তাই ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে এবং সোভিয়েট আদর্শে পরিচালিত সাম্যবাদীর দল এই সুযোগে অনায়াসে তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। কমিউনিষ্ট দমন নীতি বা নিরাপত্তা আইন পাশ করিয়ে যেমন এই সাম্যবাদী বন্যা রোধ করা যাবে না, তেমনি কণ্ট্রোল চালু করেও পুঁজিপতিদের কালো-বাজারী উৎপাত দমন করা যাবে না। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারলেই আমাদের বিশ্বাস সাম্যবাদী শিবির শূন্য হয়ে যাবে। কারণ সাধারণতঃ এদেশের জনসাধারণ শান্তিপ্রিয়। তারা পেট ভরে খেতে পরতে পেলে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও সংঘর্ষে যোগ দিতে চাইবে না। জলের কল বন্ধ করা বা টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধ্বংস করা মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতিকারীর দুর্বুদ্ধিপ্রসূত ষড়যন্ত্রের ফলেই ঘটছে একথা হয়ত ঠিক, কিন্তু এর পশ্চাতে রয়েছে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে দলবিশেষের দীর্ঘ-সঞ্চিত আক্রোশ! কমিউনিষ্ট-দমন-নীতির প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি থেকেই তারা কংগ্রেস সরকারকে আঘাত করে তাদের বিপন্ন ও অচল করে তোলবার চেষ্টা করছে। এই দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ করতে হলে শ্রমিকদের সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বনে ওদের পশ্চাতের প্ররোচনাকারীদের দুর্বল করে ফেলা দরকার। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেই মানুষ শান্ত হয়ে থাকে ক্রমাগত অভাবের তাড়নায় উত্যক্ত হয়েই মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে এবং এই ধরণের সব সাঙ্ঘাতিক হিংস্র কার্য করতেও পশ্চাদপদ হয় না।

—পাঠশালা

* *

গত এক মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে একাধিক ভারতীয় জননায়ক ও শিক্ষাবিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের কথা মূলত এক—স্বাধীন ভারতের নূতন পরিস্থিতিতে ছাত্রগণের নূতন কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। স্বাধীন নাগরিকের গুরুতম দায়িত্ব বহন করিবার উপযোগী চরিত্র ও মনোভাব গঠন করিতে হইবে। আমরা এই উপদেশ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সত্যই আজ দেশের ছাত্রগণের নিকট এক মহৎ কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে। সেই কর্তব্য পালনে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য শিক্ষা ও সংস্কারে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। দেশ যতদিন বিদেশীয় শাসকের করতলগত ছিল তখন যে সকল চিন্তা ও কার্য্য প্রয়োজনীয়, এমন কি প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইত আজ তাহা বর্জন করিয়া এক নূতন রাষ্ট্রচেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সেই রাষ্ট্রচেতনার বিশেষত্ব হইবে প্রতিকূলতা নহে—সহযোগিতা, বিদ্রোহের ব্যাকুলতা নহে, ধৈর্য্যের সহিত সুদিনের জন্য অপেক্ষা। বর্তমানের দুঃখকষ্টের অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোকের প্রতীক্ষায় আজ নাগরিকগণকে সকল কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে হইবে।

—শিক্ষক

* *

গণপরিষদ গৃহে ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রমিক বীমা কর্পোরেশনের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্র

পরিচালিত এই বীমা পরিকল্পনা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা আয়ত্ত করার পথে প্রথম পাদক্ষেপ স্বরূপ। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাটি কেবল যে ভারত সরকারের মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা নহে,—উপরন্তু সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এই জাতীয় পরিকল্পনা এই প্রথম। শ্রমিক বীমা কর্পোরেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শ্রম-সচিব মাননীয় জগজীবন রাম বলেন যে, "সামাজিক নিরাপত্তা যে কেবল একান্তভাবে কাম্য, তাহা নহে, ইহা একটি অতীব জরুরী জাতীয় সমস্যা। বর্ত্তমান পরিকল্পনাটিতে শ্রমিকদের যাবতীয় ঝুঁকি বহিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই—এমন কি, ইহাতে সকলের স্থানও করা যায় নাই। সুসংগঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাস্থ্য, বীমা ও চিকিৎসা সাহায্যই প্রধান সমস্যা, এই সমস্যা সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। আজিকার এই সামান্য সূত্রপাত ভবিষ্যতে বিরাটাকার ধারণ করিবে।

—আর্থিক বাংলা

*   *

যানবাহনের সুব্যবস্থা না থাকার ফলে পল্লীগ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তাঘাটের সংস্কার করিয়া যাহাতে যানবাহনের সুব্যবস্থা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের সরকারের কর্ত্তব্য। অত্যধিক ভিড়ের চাপে সহরের আবহাওয়া দূষিত হইতে চলিয়াছে। যানবাহনের সুব্যবস্থা ও সহরের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেশের প্রাণকেন্দ্র পল্লীগ্রামকে বাঁচাইতে ও দূষিত আবহাওয়া হইতে সহরকে রক্ষা করিবার কার্য্যে আর বিলম্ব না করিলেই ভাল হয়।

—সমাধান

*

"সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা অন্য কোন ভাষার নাই। কোন প্রাদেশিক ভাষার সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বহুল প্রচারও নাই। ভারতবর্ষের এমন একটি গ্রাম নাই, যেখানে অন্ততঃ ৫।৪ জন লোকও সংস্কৃত জানে না।" চন্দননগর প্রবর্ত্তক আশ্রমে অখিল ভারত দেবভাষা পরিষদ সম্মেলনের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চিন্নস্বামী শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা তিনি ইহাও জ্ঞাপন করেন যে, সংস্কৃত ভাষা বিশাল ভারতের কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা নহে; পরন্তু বৈদেশিক দেশ-সমূহের সহিত সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রক্ষার ব্যবস্থাদিও অতীতে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে হইত। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

—নবসংঘ

*   *

বৃটিশ শাসনকে উন্মূলিত করিয়া কংগ্রেস আপনার শক্তির বিপুলতাকে প্রমাণিত করিয়াছে, কিন্তু স্বরাজ আমরা এখনও অর্জ্জন করিতে পারি নাই। এই কঠিন সত্যকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। ভারতের সাতলক্ষ গ্রাম যে তিমিরে ছিল এখনও সেই তিমিরেই আছে। আমরা যদি মনে করিয়া থাকি গভর্ণমেন্ট যখন কংগ্রেসের, তখন আর চিন্তা কি—তবে ভুল করিব। ক্ষমতার একটা দুর্জ্জয় মোহ আছে। ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের হাতে এখন শাসনদণ্ড। শাসনক্ষমতার অপব্যবহার হইলে নিপীড়িত জনগণের আশ্রয় কোথায়? আশ্রয়—কংগ্রেস। কংগ্রেস জনগণের মনে রাষ্ট্রচৈতন্য উদ্বুদ্ধ করিবে, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়া শতধাবিচ্ছিন্ন জনসাধারণকে এক সূত্রে বাঁধিবে। অত্যাচার হইলে অত্যাচারের কথা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবে ও সেই অত্যাচারের যাহাতে প্রতিকার হয় তাহার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল আলোড়িত করিয়া তুলিবে।

—লোকসেবক

*   *

সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়া বড় দুঃখেই আচার্য্য বিনোবা ভাবে বলিয়াছেন, "কংগ্রেসকর্ম্মীরা পূর্ব্বতন ত্যাগকে মূলধন করিয়া নিজের নিজের কাজ গুছাইয়া লইতেছে। তাহাদের মধ্যে নূতন ধরণের ত্যাগের কোন প্রেরণা দেখা যাইতেছে না। কংগ্রেসের মধ্যে আজ সত্যের কোন স্থান নাই। আজ তাহাদের মধ্যে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।" আচার্য্য ভাবের এই উক্তি মর্ম্মান্তিক হইলেও সত্য। স্বরাজ এখনও দূরে, কিন্তু কংগ্রেসকর্ম্মীরা স্বরাজের মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছিবার কথা ভুলিয়া গিয়া ক্ষমতাকে করতলগত করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে কদর্য্য প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিয়াছে। বহু জেলায় কংগ্রেস নেতাদের কাজ হইয়াছে, কল্পতরু হইয়া স্তাবকগণকে দুই হস্তে অনুগ্রহ বিতরণ করা। এই অনুগ্রহ বিতরণের পিছনে অনেক ক্ষেত্রেই রহিয়াছে আগামী নির্ব্বাচন যুদ্ধে কেল্লা ফতে করিবার পা-টোয়ারী কৌশলী বুদ্ধি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সকল শ্রেণীর লোকেরই সহযোগিতা প্রয়োজনীয়। নেতাদের মধ্যে সাধারণের সহযোগিতা চাহিবার মনোবৃত্তির একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে।

—লোকসেবক

*   *

গত ১৯৪৩ সালের বন্যায় আমীরপুরে দামোদরের উত্তর বাঁধ ভাঙ্গিয়া শক্তিগড় পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বিঘা উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে মোটা বালু জমিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা—যাহাদিগকে জমির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের দুরবস্থার অন্ত নাই। লীগ মন্ত্রিত্বের আমলে মহাত্মা গান্ধী যখন কলিকাতায় আসেন তথা হইতে বীরভূম যাইবার পথে শক্তিগড়ের নিকট জমিগুলির অবস্থা তাঁহাকে দেখানো হয়। তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য তৎকালীন লীগ মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহার পর অনেক বৎসর গিয়াছে, এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে এবং কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দুর্গতগণ জাতীয় সরকারকে বহু আবেদন করিয়াছে, কিন্তু এখনো বিশেষ কোন সাড়া পাইতেছে না। নানা কাজের মধ্যে এতদিন ব্যস্ত থাকিলেও যাহাতে এই বৎসর ধান উঠিবার পরেই ঐ অঞ্চলের বালুপড়া জমিগুলির উদ্ধার হয় তাহার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জমিতে ফসল হইবে না এবং তাহার খাজনা গুণিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা বাস্তবিকই দুঃসহ।

—দামোদর

* * *

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ র‍্যাভেনশ কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, "গত দেড় বৎসরকাল আমাদের নেতৃবর্গকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি স্থাপনে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহকে আমাদের রাজনীতিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে নিদারুণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিরাট সামাজিক ও বৈষয়িক সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহারা উৎসাহী ও চরিত্রবান যুবক-যুবতীর সাহায্য চান। সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি, শাসনকার্যে যোগ্যতার অপহ্নব এবং মামুলী শাসন পরিচালনা ব্যবস্থায় আইন সভার সদস্যদের হস্তক্ষেপের জন্য তাঁহারা তীব্র ভাষায় অভিযোগ করিতেছেন। সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থসিদ্ধি করায় নেতৃবর্গ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। স্বাধীনতালাভে আমরা ক্ষমতামত্ত হইয়া মানসিক ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মনে হয়। সাফল্যের মধ্যে আমাদের দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে। অধুনা দেশবাসী পরীক্ষার সম্মুখীন; স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে যে মহৎ গুণাবলীর জন্য আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, তাহার বিকাশসাধন প্রয়োজন।

চীন, ব্রহ্ম ও মালয়ে যেসব ঘটনা ঘটিতেছে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্যই সাধারণ লোক সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না, আমাদের সামাজিক সংস্থার মূলগত ত্রুটির জন্যই ঐ আকর্ষণ। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার ফলেই অন্ধ গোঁড়ামির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমাদের বিচ্যুতির মধ্যেই বিপদ নিহিত। সমাজ যদি দুর্বল হয়, যুব-সমাজের যদি আশাভঙ্গ ঘটে, সামাজিক সংস্থায় যদি অবিচার ও অন্যায়ের প্রাবল্য হয়, সমাজের উচ্চস্তরে আছে বলিয়াই যদি দুর্নীতির সহিত আপসরফা করিতে হয় এবং গণতন্ত্র রক্ষায় যদি আমরা অপারগ হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ হতাশায় নূতন পথের সন্ধান করিলে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না।

—উদ্বোধন

* * *

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে তা নিয়ে কারও কারও মনে প্রশ্ন জেগেছে: (১) ভারত কি আগেকার মতোই কমনওয়েলথ জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? এবং (২) ভারত কি আগামী যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন দলে যোগদান করবে? সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন।

প্রথম প্রস্তাবটি সম্বন্ধে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,—

"ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার ফলে বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সে তার ন্যায্য মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং বৃটেন ও কমনওয়েলথের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তন হতে বাধ্য।"

কিন্তু সেই সম্পর্ক যে ঠিক কি হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। তা কি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হবে, না কিছুটা থাকবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত স্পষ্টতর। বলেছেন: "সকল জাতির সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি হওয়া উচিত। যে সামরিক অথবা অন্য মৈত্রীর ফলে পৃথিবী দুটি বিবদমান দলে বিভক্ত হতে পারে কিংবা বিশ্বশান্তিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তেমন মৈত্রী ভারত পরিহার ক'রে চলবে।

এই প্রস্তাবের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থ নেই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তা সত্য সত্যই সম্ভব কি না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি। অথচ তুরস্ক এবং কমনওয়েলথের অন্তর্গত হয়েও আয়ার্ল্যাণ্ড তা পেরেছে। অবশ্য ছোট রাষ্ট্র ব'লেই হয়তো পেরেছে এবং তার জন্যে তাকে বেগও কম পেতে হয়নি। রাষ্ট্র হিসাবে ভারত অবশ্য ছোট নয়, কিন্তু শিশু। তা ছাড়া প্রধান রঙ্গমঞ্চ থেকে (যদি অবশ্য ইউরোপই সমর রঙ্গমঞ্চ হয়) দূরেও অবস্থিত। সুতরাং ভারতের পক্ষে এক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব হবে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ যে বিশ্বের ভাগ্যদেবতা কোথায় পাতছেন, তা কি কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে? সে রকম ক্ষেত্রে ভারতের বিবেচ্য হবে, অন্ধভাবে কোনো একটি দলের লেজে বাঁধা থাকা নয়,—ন্যায় ও নীতি কোন দলের পক্ষে এবং কোন দলের সঙ্গে তার আদর্শ ও কল্যাণ জড়িত, তাই বিবেচনা করা।

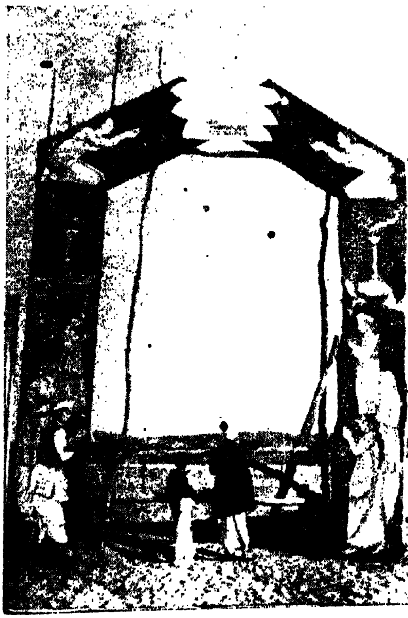
—বর্তমান





রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ—

কংগ্রেসের জয়পুর-অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত পট্টভি সীতারামিয়া তথায় যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন নূতনত্ব দেখা যায় নাই। শ্রীযুত সীতারামিয়া দীর্ঘকাল কংগ্রেসের কাজের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে লোক শুধু নীতি-কথা পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাইএর দৃঢ়তা, পণ্ডিত জহরলালের ভাবপ্রবণ আদর্শবাদ বা ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদের কর্ম্মকুশলতা কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সে জন্য লোক তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া হতাশ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন দেশের শাসকবৃন্দের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবা প্রয়োজন, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে



জয়পুর গান্ধীনগরে নির্ম্মিত তোরণ, উহাতে ভারতের সংস্কৃতি অঙ্কিত ফটো—পান্না সেন



গান্ধীনগরে (জয়পুর) নির্ম্মিত ৩৭টি তোরণের অন্যতম—রাজপুতানার গ্রাম্যচিত্র অঙ্কিত ফটো—পান্না সেন

শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কংগ্রেসকর্ম্মীরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। এ সময়ে জনগণের সহিত কংগ্রেসের ও কংগ্রেসের সহিত দেশের শাসন-ব্যবস্থার সম্পর্ক কি হইবে তাহা জানিবার জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি সে বিষয়ে জনগণকে কোন নির্দ্দেশ দিতে দেশের অগণিত জনগণের দুঃখ কষ্টের কথাও চিন্তা করা দরকার। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে তাহার অভাব দেখা গিয়াছে। দেশবাসী বর্ত্তমানে নানা কারণে অধীর হইয়াছে—এ সময়ে তাহাদের মধ্যে নূতন প্রেরণা দানই রাষ্ট্রপতির প্রথম কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না করিয়া তিনি যে বিবৃতিমূলক অভিভাষণ দিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের

সম্বন্ধে লোক আরও সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান লোকের নিকট দেশবাসী যাহা আশা করিয়াছিল, তাহা পায় নাই। তিনি যে নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন, সেই কমিটী যদি উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা স্থির করিতে পারে, তবেই কংগ্রেসের অস্তিত্ব সার্থক হইয়া থাকিবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন—

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হত্যার মাত্র ৫ দিন পূর্ব্বে ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী হিসাবে অন্য প্রদেশভুক্ত অঞ্চলগুলি ফিরাইয়া পাইবার কথা কেহ বিবেচনা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। দিল্লীতে গণপরিষদের সদস্যগণ একযোগে এ দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর কয়েক মাস অতীত হইলেও সে দাবীর আলোচনার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত হইল না। নূতন রাষ্ট্রপতি ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া ভাষার



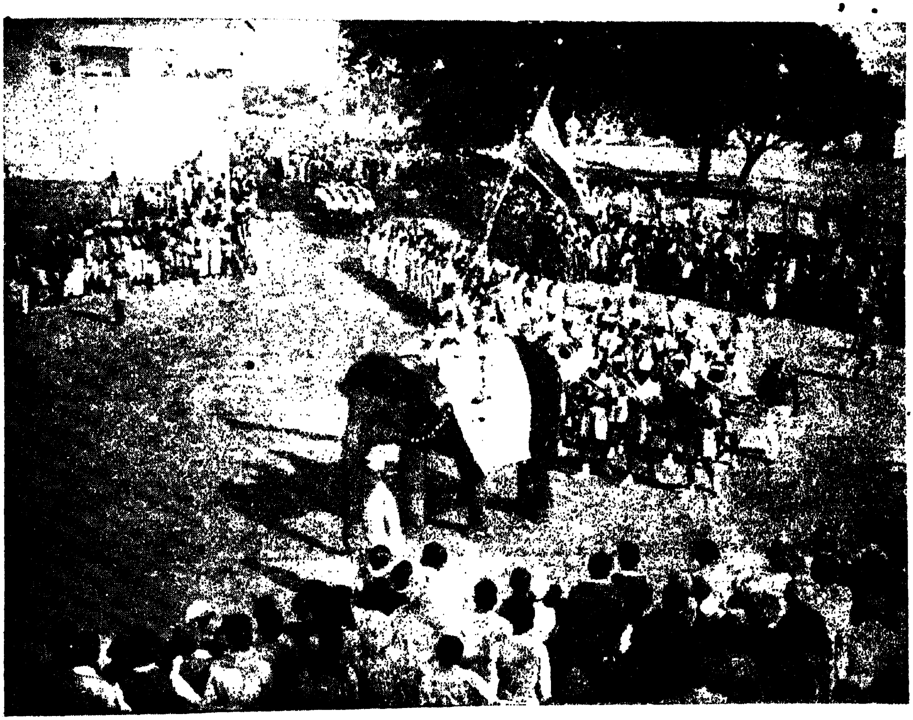
জয়পুরের পথে রাষ্ট্রপতির মিছিল—বলীবর্দ বাহিত রৌপ্যরথে রাষ্ট্রপতি ডাঃ সীতারামিয়া ফটো—পান্না সেন

বলিয়াছিলেন—"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠনের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বেই উক্ত নীতি গ্রহণ করিয়া শাসন ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে উহা কার্য্যকরী করার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছে। কারণ এইরূপ ভাবে প্রদেশসমূহ পুনর্গঠিত হইলে উহা দেশের সংস্কৃতিমূলক উন্নয়নের সহায়ক হইবে।" ইহার পর গণপরিষদের সভাপতির নির্দ্দেশে ভারতের ৪টি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী (ভাষাগত ভিত্তিতে) বিবেচনা করার জন্য কমিশন গঠিত হইয়াছে। ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী যে সঙ্গত, সে কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাঙ্গালী সদস্য ডক্টর শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় নূতন কমিটি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিবেন এবং বাঙ্গালীর ন্যায়সঙ্গত দাবী রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

শিক্ষার দুরবস্থা—

স্বাধীনতার পর ১৬ মাস অতীত হইলেও ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোনরূপ ব্যবস্থায় কেহ মনোযোগী হন

নাই। কেরাণী তৈয়ারী করিবার জন্য বৃটীশ সরকার এদেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহাই চলিতেছে। নিয়মে নহে, ব্যতিক্রমে এদেশে বহু মনীষী শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই এদেশের সংস্কৃতিরক্ষা সম্ভব হইয়াছে—তাঁহারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনয়ন করিয়াছেন। সম্প্রতি মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলনের পঞ্চবার্ষিক সভার ষষ্ঠ অধিবেশন ও ব্রহ্মের ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ও প্রতিনিধিবর্গ তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত মনুষ্যত্বের যাহাতে উন্মেষ হয়, সেইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির করিবার এখন প্রকৃত সময় আসিয়াছে—এ কথা আজ আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেশে গত ২ শত বৎসর ধরিয়া যে কুশিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেশবাসী তথাকথিত শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে লোককে মানুষ করে নাই, তাহার প্রমাণ—আজ চারি



অখণ্ডজ্যোতি লইয়া জয়পুরে মিছিল—সম্মুখে হস্তীপৃষ্ঠে 'জাতীয় পতাকা' ফটো—পান্না সেন

হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনায় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সার ডাঃ এস্ রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করিয়াছেন, সেই কমিশনের সদস্যগণও ঐ সময়ে মাদ্রাজে উপস্থিত থাকায় তাঁহারা উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ-লক্ষ্মণস্বামী মুদেলিয়ার উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং ভারত, সিংহল দিকের দুর্নীতি। শিক্ষার বনিয়াদ ভাল থাকিলে মানুষ এমন দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিত না। শিক্ষার পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করার সময় সে জন্য নীতি ও সৎশিক্ষার ব্যবস্থা প্রথমেই করা প্রয়োজন। দেশ যাহাতে আর ধ্বংসের পথে অগ্রসর না হয়, আমাদের সর্ব্বদা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা মানুষকে বিলাসী, পরিশ্রম-বিমুখ ও সহরমুখী করিয়া তোলার ফলে আজ ভারতের গ্রামগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে দেশে আজ

নিদারুণ খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, যাহার ফলে মানুষের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় ও দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশের ও নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানে সমর্থ হয়। নচেৎ শুধু সম্মিলন করিয়া বা তদন্ত কমিশন বসাইয়া কোন লাভ হইবে না। বর্ত্তমান তদন্ত কমিশনের নির্দ্দেশের ফল যেন সুদূর-প্রসারী হইয়া দেশের সমৃদ্ধি লাভের উপায় স্থির করে, আজ সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করিতেছে।

করিয়াছেন এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ পি-ভি-কানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সাধারণ লোকের ধারণা— দর্শন বিলাসের সামগ্রী—মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই; কবে ও কি প্রকারে মানুষের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ভারতের দর্শন তাহার অধিবাসীদের জীবন ও মনের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যে দর্শনের সাহায্য ভিন্ন ভারতবাসী কোন দিন কোন কাজ করে নাই। তাই



জয়পুর কংগ্রেসে 'গান্ধীনগরে' কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে (১৬ই ডিসেম্বর) ভারতের ডেপুটী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা—
পশ্চাতে রাষ্ট্রপতি, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, শ্রীজগজীবন রাম প্রভৃতি ফটো—প্রচার বিভাগ

ডাঃ সার রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষক—তিনি যে এ বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবেন এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের এ বিষয়ে তাঁহার মতাবলম্বী করিতে পারিবেন, সকলে তাহাই আশা করে।

দর্শন ও তাহার ব্যবহার—

গত বড়দিনের ছুটীতে বোম্বায়ে ভারতীয় দার্শনিক সম্মিলনের ২৩শ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এস-কে-মৈত্র উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এম-আর-জয়াকর সভার উদ্বোধন

তাহাদের সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন এত সুপ্রতিষ্ঠিত ও উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। দার্শনিকগণ যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে নির্দ্দেশ না দেন, তবে তাঁহাদের সার্থকতা কোথায়? আজ ভারতবর্ষকে একথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে, যে ভারতের দার্শনিকগণ যে নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন, তাহার অনুসরণ করিয়াই ভারতীয়গণ তাহাদের জীবন সুসংবদ্ধ ও সুপরিচালিত করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। দর্শনকে জীবন হইতে পৃথক রাখার ফলে আজ ভারতে এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ মৈত্র প্রভৃতির

মত ব্যক্তিদের দ্বারা আজ ভারতে নূতন আলোক প্রচারিত হইলে তদ্দ্বারা ভারতবাসী আবার তাহাদের শান্তিময় জীবন ফিরাইয়া পাইবে—ইহাই আমরা মনে করি।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটী—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত পট্টভি সীতারামিয়া গত ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে বসিয়া নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। এবার সদস্যর সংখ্যা ১৫ স্থানে ২০ জন করা হইয়াছে। জয়পুর কংগ্রেসের তাহাই নির্দ্দেশ ছিল। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীএস-কে-পাতিল, অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি আত্মনিয়োগ করিবেন। পুরাতন সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, রফি আমেদ কিদোয়াই, শ্রীজগজীবনরাম, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, সর্দ্দার প্রতাপ সিং কায়রণ, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীমতী সুচেতা কৃপালানী সদস্য হইয়াছেন। শ্রীশঙ্কর রাও দেও ও শ্রীকালা বেঙ্কট রাও দুই জনে সাধারণ সম্পাদকের কাজ করিবেন ও সর্দ্দারজী পূর্ব্বের মত কোষাধ্যক্ষ থাকিবেন। নূতন কমিটীতে বাঙ্গালা হইতে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—একজন মাত্র সদস্য আছেন।



জয়পুরে রাষ্ট্রপতির মিছিলের পুরোভাগে মীরাট হইতে আনীত 'অখণ্ডজ্যোতি' ফটো—পান্না সেন

শ্রীএন-জি-রঙ্গ, তামিলনাদ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীদেবেশ্বর শর্ম্মা, কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মহীশূররাজ্যবাসী শ্রীনিজালিঙ্গাপ্পা, রাজপুতানা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীগোকুল ভাই ভাট ও আলোয়ার নিবাসী (গোয়ালিয়র) শ্রীরাম সহায় সদস্য হইয়াছেন। মাদ্রাজের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও নূতন সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কংগ্রেসের সেবায় শ্রীযুক্তা সুচেতা বাঙ্গালার মেয়ে হইলেও সিন্ধী বিবাহ করিয়াছেন। তিনি আর বাঙ্গালী নহেন। এবার দক্ষিণ ভারত হইতেই অধিক সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে এবার কোন সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই কেন, তাহা বুঝা গেল না। রাষ্ট্রপতি নিজে দক্ষিণ ভারতের লোক, কাজেই তাহার দেশবাসীদিগকে অধিক বিশ্বাস-ভাজন ও কাজের লোক মনে করাই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীরও সদস্য থাকিবেন, এ ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগোপযোগী

নহে। জয়পুর কংগ্রেসের অধিবেশনে এ বিষয়ে সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন নেতা হয়ত মনে করেন যে তাঁহারা সদস্য না থাকিলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কাজ চলিবে না। রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁহাদের প্রভাব মুক্ত হইয়া থাকাও সম্ভব কিনা সন্দেহের বিষয়। কাজেই নূতন ওয়র্কিং কমিটীর সদস্য তালিকা দেখিয়া দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

প্রাদেশিক গভর্ণর ও কংগ্রেস—

জয়পুর কংগ্রেসে পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, বিহারের গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে ও উড়িষ্যার গভর্ণর শ্রীআসফ আলি যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি জন্য কংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহারা যদি স্বব্যয়ে কংগ্রেস দেখিতে গিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। যদি ঐ সফরের খরচ সরকারী তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে জনগণ অবশ্যই তাহাতে আপত্তি করিতে পারে। তাঁহাদের মত কাজের লোকদের পক্ষে কংগ্রেস দেখিতে যাওয়ার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। কোন কোন প্রদেশ হইতে মন্ত্রীরাও কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন। কংগ্রেসকে যদি বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করিবার অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়, তবে তথায় প্রাদেশিক গভর্ণর বা মন্ত্রীদের যোগদান না করাই সঙ্গত বিবেচিত হইবে।

সংস্কৃত ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা—

ডাক্তার কৈলাশনাথ কাটজু যখন উড়িষ্যার গভর্ণর ছিলেন, তখনই তিনি এক সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সংস্কৃত ভাষাই সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাইবার যোগ্য। গত ১৫ই পৌষ কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জয়ন্তী উৎসবেও তিনি সেই কথা আবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষার মাতৃস্বরূপ—এই মাতা হৃত-সৌন্দর্য্য বা জরাগ্রস্ত নহেন, সম্পূর্ণ জীবন্ত। ইনিই ভারত-মাতা। তাঁহাকেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা করা কর্ত্তব্য।" একদল লোক হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে সর্ব্ব-ভারতীয় ভাষারূপে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কি জানা নাই যে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সকল লোকই হিন্দী ভাষায় অনভিজ্ঞ। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে বাঙ্গালা দেশের যেমন অসুবিধা হইবে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশেরও নানাস্থানে সেই অসুবিধা হইবে। কিন্তু তাহার স্থলে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে ঐ সকল প্রদেশের ত কোন অসুবিধাই হইবে না—তাহা ছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদেরও সংস্কৃত-ভাষা আয়ত্ত করা আদৌ কষ্টকর হইবে না। যাহাতে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, সেজন্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল আন্দোলন হওয়া উচিত। মহারাষ্ট্র, বাঙ্গালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায়



জয়পুরে সর্ব্বোদয় প্রদর্শনীতে সূত্রযজ্ঞ—শ্রীবিনোবাভাবে, শ্রীশঙ্কর রাও প্রভৃতি সূতা কাটিতেছেন

ফটো—পান্না সেন

শিক্ষিত লোকসংখ্যা অধিক। ডাঃ কাটজুর মত তাঁহারা সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিলে গণপরিষদে এই দাবী উপেক্ষিত হইবে না। সকল দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা যত অধিক, ভারতে আর কোন ভাষার যোগ্যতা তত অধিক নহে।

পশ্চিম বঙ্গে দুর্নীতি দমন—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের দুর্নীতি-দমন-বিভাগে সন্তোষজনক কাজ চলিতেছে। আমরা এই ইস্তাহার পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশে কোথায় যে দুর্নীতি বন্ধ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাই না। কলিকাতা সহর রেশন এলাকা, তথায় মাথা পিছু সপ্তাহে এক সের ৬ ছটাক চাউল বরাদ্দ আছে। নূতন লোক সহরে আসিলে তাহার রেশন কার্ড করিতে অফিসের দোষে ২ সপ্তাহ সময় লাগিয়া যায়—কাজেই মানুষ চাউলের অভাবে থাইতে পায় না। কিন্তু সহরের রাজপথে প্রকাশ্যভাবে যে সাড়ে ১৭ টাকা মণের চাউল ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রীত হয়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গের পুলিস-কর্ত্তাদের অজ্ঞাত। সহরের বহু স্থানেই এইরূপ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে ও এক এক স্থানে ৫০জন চাউল বিক্রেতা পাশাপাশি বসিয়া চাউল বিক্রয় করিয়া থাকে। কাপড় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। দোকানে কাপড় পাওয়া যায় না—কারণ দোকানীকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে হয়। আর সেই ৬ টাকা জোড়ার কাপড় পথের ধারে ১০ টাকা জোড়া দরে সর্ব্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায়। এইভাবে কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থা চলিতেছে। মানুষ বাধ্য হইয়া দুর্নীতি-পরায়ণ হয় ও সরকারী ব্যবস্থা তাহাকে সে কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। পুলিস এ সকল কাজ দেখিয়াও দেখে না। ইহার পরও যদি কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে দুর্নীতি দমন কার্য্য সন্তোষজনক হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণ কি মনে করিবে? আমরা শাসকবর্গকে একটু সচেতন হইয়া বিবৃতি প্রকাশ করিতে বা বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা যদি মাটীর পুতুলের মত চোখ থাকিতেও না দেখেন, তবে সে দোষ কি জনসাধারণের?

ক্ষমতার আড়ম্বর—

আচার্য্য জে-বি-কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত একমত হইতে না পারিয়া তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তিনি নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার সাহসও অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি 'ক্ষমতার আড়ম্বর' সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—কংগ্রেসের সেবকগণ দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়া অর্থাৎ বড়লাট, ছোটলাট, মন্ত্রী প্রভৃতি



পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল জয়পুরে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেছেন। ফটো।—পান্না সেন

নিযুক্ত হইয়া দেশের আবহাওয়ার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যে সমস্ত গৃহে বাস করেন তাদের ঠাটঠমকের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, উর্দ্দীপরা ভৃত্য ও চাপরাশির সংখ্যা কমে নাই—পার্টি ও খানাপিনা ঘটায়ও বিরাম নাই। এখনও সর্ব্বত্র বহুসংখ্যক কর্ম্মী প্রহরী দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়া থাকে।—এই সকল বাহিরে জাঁকজমক না থাকিলে যে কর্ম্মীদের সম্মান বা প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই

যায়। জানিনাও কেন যে কংগ্রেসকর্ম্মীরা নূতন পদ পাইয়া পদমর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য এত ব্যস্ত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষ করিয়া যে সকল ভারতীয় নেতাকে রাষ্ট্রদূত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে, তাহাদের ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যান। এই ব্যয়বাহুল্য না করিলে বিদেশে ভারতের নূতন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না—পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত লোকও যে কেন এমন মনে করেন, তাহা বুঝা কঠিন। মস্কো বা নিউইয়র্কে রাষ্ট্রদূতের জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় করা হইয়াছে, তাহা ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে শোভন



জয়পুরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া পত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত নেহরুকে শুনাইতেছেন। ফটো—পান্না সেন

হয় নাই। লণ্ডনেও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁহার অফিস, আসবাবপত্র, মোটর গাড়ী প্রভৃতির জন্য অত্যধিক ব্যয় করিয়াছেন। এ বিষয়ে জনগণের সমালোচনা উপেক্ষার বিষয় নহে। ভারত চিরদিন দারিদ্র্যকে সম্মান দিয়াছে, অনাড়ম্বর জীবন যাত্রাকে সমর্থন করিয়াছে—সেই ভারত স্বাধীন হইয়া অনাবশ্যক আড়ম্বরের জন্য যদি অর্থের অপব্যয় করে, তবে কেহই তাহা সমর্থন করিবে না। আজ ভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বা প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যে ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয় বাড়াইয়া দিতেছেন, তাহা ভারতবাসীর কল্পনার অতীত ছিল। যে দেশে গান্ধীজি বর্ত্তমান যুগেও সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশের সকল অধিবাসীর পূজার পাত্র হইয়াছেন, সে দেশে মন্ত্রীদের ঘন ঘন উড়োজাহাজ চড়িতে দেখিলে লোক সত্যই মনে করে যে গান্ধীজির প্রদর্শিত পথ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছে—ভারতের চিরন্তন সভ্যতা নষ্ট করিবার জন্য সকলে উদ্যোগী হইয়াছে। আমরা কংগ্রেস-সেবক মন্ত্রীদিগকে সকল দিক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, লোক আজ ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানীর কথা ধীরভাবে চিন্তা করিবে ও তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া ভারতের গৌরব সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করিবে।

মানভূমে চাকরী ও শিক্ষা—

মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী বঙ্গভাষাভাষী—এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারাই জেলার সকল সরকারী চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেণ্ট ঐ জেলাটিকে হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সকল সরকারী চাকরী হইতে বঙ্গভাষাভাষীদিগকে সরাইয়া সেই সকল স্থানে হিন্দীভাষাভাষী লোক বসাইতেছেন। তাহার ফলে বর্ত্তমানে মানভূম জেলায় মানভূমবাসী নহেন এমন লোকই অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকরী পাইতেছেন। সকল ছোট ছোট কাজের জন্য মানভূমের এলাকার বাহির হইতে হিন্দীভাষাভাষী লোক আনায় সরকারী কাজেরও অসুবিধার অন্ত নাই। সহসা সকল স্থানে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোক কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না—সেজন্য লোকের হায়রাণির অন্ত থাকে না। বাহির হইতে যাঁহারা সরকারী চাকরী করিতে আসিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ লোকের সহিত মেলামেশা করেন না—ফলে উভয়পক্ষের কষ্ট হইতেছে। বঙ্গভাষাভাষীদিগকে এইভাবে ছলে, বলে ও কৌশলে জেলা হইতে তাড়াইবার ব্যবস্থা দেখিয়া লোক স্তম্ভিত হইতেছে। এই সঙ্গে জেলার গ্রামে গ্রামে হিন্দী শিক্ষক প্রেরণ করিয়া লোককে হিন্দীভাষা শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। শিক্ষকগণ স্কুল খুলিয়া বসিয়া থাকেন—শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না—এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। বঙ্গভাষা-ভাষীদিগকে জোর করিয়া হিন্দী শিখাইয়া হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া ঘোষণা করার জন্যই ইহা করা হইতেছে। এ বিষয়ে

ংগ্রেসের ঊর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া কোন ফল হয় াই। কতদিন বিহার গভর্ণমেণ্টের এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা লিবে তাহা কে বলিতে পারে?

সমবায় সমিতি গঠন—

পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্বত্র সমবায় সমিতি ঠন দ্বারা লোককে সমবায় প্রথায় ব্যবসা বাণিজ্য করিতে উপদেশ দান করায় পশ্চিম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সর্ব্বার্থ-সাধক া মালটি-পারপাসেস্ সমবায় সমিতি গঠনের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। সমবায় প্রথায় কাজ করিলে দেশ উন্নত হইবে—দেশের বহু অভাব অভিযোগ আমরা নিজেদের চেষ্টায় দূর করিতে পারিব—এ সকল সত্য কথা। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা সমবায় সমিতি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য যে সাধু নহে, তাহা তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সমবায় সমিতি গঠন করিলে বস্ত্র বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের দোকান পাওয়ার সুবিধা হইবে বলিয়াই দেশের একদল স্বার্থপর লোক এই সমিতি গঠন করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় যাহারা নানা প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে সহসা কংগ্রেস-সেবী সাজিয়া এই সকল সমিতির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মজার কথা এই যে, যাঁহারা সারা জীবন ধরিয়া কংগ্রেস তথা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, যাঁহারা জীবনে কোনদিন খদ্দর পরিধান করেন নাই—আজ তাঁহারা খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও দেশসেবক সাজিয়া সমবায় সমিতির মারফত আবার কালো-বাজার চালাইবার আশায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ ব্যাপার দেখিয়া দেশের সাধারণ লোক শঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সমবায় মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি নিজে কংগ্রেস-সেবক—দেশের জনগণের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহার সংযোগ আছে। কাজেই লোক আশা করে—সমবায় বিভাগে ও সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যাহাতে দুর্নীতি প্রবেশ না করে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া তিনি কার্য্য করিবেন। বাঙ্গালা দেশে বহুবার সরকারী চেষ্টায় বহুসংখ্যক করিয়া সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সে সকল সমিতি দেশবাসীর উপকার সাধন না করিয়া বহু দরিদ্র অধিবাসীর সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়াছে। সমবায় ঋণদান সমিতি ও ব্যাঙ্কগুলিও এদেশে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। আজ স্বাধীন দেশে লোক আশা করে, নবগঠিত সমবায় সমিতিগুলি যেন দেশের প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হয়।



জয়পুরে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট রাষ্ট্রপতি। ফটো—পান্না সেন

স্বাস্থ্য সম্মেলন—

গত বড় দিনের ছুটীতে কলিকাতায় এবার বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল—নিখিল ভারত মেডিকেল কনফারেন্সের রজত জয়ন্তী অধিবেশন। গত ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মাঠে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কাশীবাসী ডাক্তার ক্যাপ্টেন এস-কে চৌধুরী তথায় সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতাবাসী ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের ৮ শত চিকিৎসক সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশে চিকিৎসা-শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িতেছে—কিন্তু তাহা দ্বারা দেশ

কতটা বাড়াবাড়ি হইতেছে, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না। চিকিৎসকের দর্শনী কলিকাতার মত সহরে ৩২ টাকা ৬৪ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং মফঃস্বলে ৮ টাকা ও ১৬ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামে এখনও অধিক-সংখ্যক চিকিৎসক যাইতে সম্মত হন না। কংগ্রেসের চেষ্টায় বহু শিক্ষিত চিকিৎসককে গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। সকলেই অধিক অর্থ উপার্জ্জনের লোভে সহরের দিকে ছুটিয়া আসে—ফলে গ্রামে রোগীদের চিকিৎসার অভাবে বা অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া মারা যাইতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণ শুধু পাশ্চাত্য ঔষধের প্রতিই অনুরাগী হন। ফলে বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত চিকিৎসকগণকে 'বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধের দালাল' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর যদি দেশ হইতে এই মনোভাব দূর করার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে এই সকল চিকিৎসক-সম্মেলন বা স্বাস্থ্য-সম্মিলনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। দেশে খাদ্যাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগের সংখ্যা বাড়িতেছে—চিকিৎসকগণ দেশী খাদ্য বা ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু বিলাতী খাদ্য ও বিলাতী ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া দেশের যে কত অপকার সাধন করেন, তাঁহারা কি তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না। এ দেশে খাদ্য বা ঔষধ প্রস্তুতের কারখানাও আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই—এক দল চিকিৎসক যদি সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে বিদেশী টিনে-ভরা বা শিশিতে-ভরা খাদ্য ত্যাগ করিতে পারি ও দেশী ঔষধের ব্যবহার দ্বারা বিদেশী ঔষধ ও খাদ্যের আমদানী বন্ধ করিতে পারি, স্বাধীন ভারতে সকলের সে কথা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন।

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি—

কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী গত ১লা জানুয়ারী হইতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াতের ও মাসিক টিকিটের ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ট্রামের যাত্রীরা অনেক রকম সুবিধা ভোগ করিতেন। কোম্পানী একে একে সে সকল সুবিধা হইতে—ট্রান্সফার টিকেট, চিপ মিড্‌ডে ফেয়ার প্রভৃতি—সাধারণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ট্রাম কোম্পানী যে লাভ করেন না তাহা নহে। উক্ত বিলাতী কোম্পানী বৎসরের শেষে বহু টাকা লাভ করিয়া বিদেশে লইয়া যান। অথচ যে সকল কর্ম্মী এখানে ট্রাম চালান, তাঁহাদের উপযুক্ত বেতনাদি দানের কোন ব্যবস্থা নাই। সম্প্রতি এক ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করিয়া শ্রমিকদিগকে সুবিধা দানের অভিনয় করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমিকরা তদ্দ্বারা বিশেষ লাভবান হন নাই। তাহা গত মাসের কয়দিন ধর্ম্মঘট হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোম্পানীর আয় অধিক করার ব্যবস্থা হইল—কিন্তু ব্যয়-বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হইল না—ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইবে না যে স্বাধীন ভারতেও ধনী দ্বারা শ্রমিকের শোষণ বন্ধ হইবে না। যাঁহারা ট্রামে চড়েন তাঁহাদেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ট্রামের যাত্রীরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে বহু অনাচার বন্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ভাড়াবৃদ্ধি ব্যবস্থা মঞ্জুর করার সঙ্গে শ্রমিকগণ ও যাত্রীরা যাহাতে অধিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, তাহার ব্যবস্থাতেও আর অনবহিত থাকিবেন না।



জয়পুরে মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ—আচার্য্য কৃপালানী, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ডাঃ কাটজু, শ্রীযুত আনে, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি ফটো—পান্না সেন

এই তিনটির মধ্যে ছুটি ক্যাচ ধরা পড়[illegible] ওয়ালকটের শত রাণ উঠতো না। অপরা[illegible] ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে যে রাণ তুলেছে তা শেষ পর্য্যন্ত হয়তো উঠতো না। অন্ততঃ উইকস এবং ওয়ালকটের মত ছু'জন ব্যাটসম্যানকে তিন তিনবার আউট করার সুযোগ নষ্ট ক'রে বিপক্ষদলকে যে নৈতিক বলে বলীয়ান করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উইকস মধ্যাহ্নভোজের পূর্ব্বে নিজস্ব ১০১ রাণ ক'রে আউট হ'ন। এই শতরাণ ক'রে পৃথিবীর টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এভার্টন উইকস এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্ব্বে অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেষ্টম্যাচে উপর্যুপরি পাঁচবার সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। একমাত্র উইকস এই প্রথম সেই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে শত রাণ পূর্ণ করার পর আর মাত্র এক রাণ তিনি যোগ করেন এবং গোলাম আমেদের হাতে 'কট এ্যাণ্ড বোল্ড আউট' হ'য়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

মধ্যাহ্নভোজের সময় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ১৩৯ রাণ উঠে ৫ উইকেটে। গোমেজ ২৬ এবং ওয়ালকট ৪৪ রাণে নট আউট থাকেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর গোমেজ ক্রিশ্চিয়ানী এবং ক্যামেরণ আউট হয়ে যান। ওয়ালকট উভয় দলের মধ্যে এই টেষ্ট খেলায় সর্ব্বপ্রথম ওভার বাউণ্ডারী করেন অমরনাথের বলে নিজস্ব ৮৭ রাণের মাথায়; এরপর মানকড়ের বলে ষ্ট্রেট ড্রাইভ ক'রে দ্বিতীয়বার ওভার বাউণ্ডারী করেন কিন্তু পুনরায় মানকড়ের বল ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠাতে গিয়ে বাউণ্ডারী সীমানায় অমরনাথের হাতে ধরা পড়ে আউট হন ১০৮ রাণ ক'রে। ভারতবর্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সফরে ওয়ালকটের নিজস্ব এক হাজার সম্পূর্ণ রাণ পূর্ণ হয়। ওয়ালকট আউট হবার পর গডার্ড ৯ উইকেটের ৩৩৬ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করেন।

ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না পড়ে চতুর্থ দিনের শেষে ৬৬ রাণ উঠে। মুস্তাক আলী এবং ইব্রাহিম যথাক্রমে ৪৫ এবং ২১ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

৪ঠা জানুয়ারী, টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে মুস্তাক আলীর [illegible] ছিল। শেষ দিনের খেলা দেখবার জন্য [illegible] জনসমাগম হয় এবং মুস্তাক আলীর শতরাণ পূর্ণ [illegible] সময় উদ্যানটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠে, এবং [illegible] পূর্ণচ্ছেদ ঘটতে সময় নেয়। মধ্যাহ্নভোজের সময় [illegible] দলের ছু' উইকেটে ১৭৮ রাণ উঠে। মুস্তাক [illegible] ১০৬ এবং ইব্রাহিম ২৫ রাণ করে আউট হন। অপরা[illegible] নট আউট থাকেন মোদী ও হাজারে যথাক্রমে [illegible] ৭ রাণ ক'রে।

মুস্তাক আলীর আউট হবার পর মোদীর [illegible] দেখার জন্য দর্শকবৃন্দ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে। কিন্তু [illegible] হাজারের অসহযোগের দরুণ মোদী শেষ পর্য্যন্ত [illegible] করতে সক্ষম হ'ন না, ৮৭ রাণে গডার্ডের বলে ক্রিশ্চিয়া[illegible] হাতে ধরা পড়েন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ছু'বার আউট [illegible] গিয়ে রক্ষা পান। মোদীকে রাণ [illegible] হাজারের অখেলোয়াড়ী মনোভাব দর্শকবৃন্দকে [illegible] করে তুলেছিলো। অনেকের কাছে হাজারের [illegible] দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মোদী আউট [illegible] হাজারের জুটি হন।

চা-পানের সময় ভারতীয়দলের ৩ উইকেটে [illegible] উঠে। স্কোরবোর্ডে রাণ উঠেছিল হাজারের [illegible] অমরনাথের ৬ রাণ উভয়েই নট আউট।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা শেষ হলে দেখা গেল ভারতীয়[illegible] ৩ উইকেটে ৩২৫ রাণ উঠেছে। হাজারে এবং [illegible] যথাক্রমে ৫৮ ও ৩৪ রাণ ক'রে নট আউট রইলেন।

পঞ্চম দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতী[illegible] দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করার জন্যে ওয়েষ্ট [illegible] দলের অধিনায়ক গডার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করেন [illegible] ভারতীয়দলের দৃঢ়তায় তা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ফিল্ডিং দর্শকদের চমৎকা[illegible] তুলনায় আমাদের ফিল্ডিং অনেক খারাপ হয়েছি[illegible]।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয়দল বনাম ওয়েষ্ট [illegible] দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা অমীমাংসিতভাবে [illegible]

...তা লাভবান্ হইতেছে, তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারে ...। চিকিৎসকের দর্শনী কলিকাতার মত সহরে ৩২ টাকা ...৬৪ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং মফঃস্বলে ৮ টাকা ও ১৬ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ...গাদ্রে ৬ইকেট পান)

ভারতবর্ষ : ২৭৩ (ফাদকার ৭৪। ফার্গুসন ১২৬ রাণে ৪ উইকেট পান) ও ৩৩৩ (৩ উইকেট ; আর এস মোদী ১১২, হাজারে নট আউট ১৩৪ এবং অমরনাথ নট আউট ৫৮।)

ডন্ ব্র্যাডম্যান ঃ

খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং অষ্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ডন্ ব্র্যাডম্যানকে ইংরাজী নববর্ষে 'নাইট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।

টেষ্টে উপর্য্যুপরি সেঞ্চুরীর রেকর্ড ঃ

জে এইচ ফিঙ্গলটোন (অষ্ট্রেলিয়া) : ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে কেপটাউনে ১১২ রাণ, জোহান্সবার্গে ১০৮ এবং ডারবানে ১১৮ রাণ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে ব্রসবনে ১০০ রাণ। মোট ৪টি সেঞ্চুরী।

এ মেলভীল (দক্ষিণ আফ্রিকা) : ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ডের বিপক্ষে ডারবানে ১০৩ এবং ১৯৪৭ সালে নটিংহামে ১৮৯ এবং ১০৪ এবং লর্ডসে ১১৭ রাণ। মোট ৪টি সেঞ্চুরী।

ই উইকস (ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ) : ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডের ...টোনে ১৪১ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতবর্ষের ...তে ১২৮, বোম্বাইতে ১৯৪, ক'লকাতায় তৃতীয় ...প্রথম ইনিংসে ১৬২ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রাণ। ই উইকস উপর্য্যুপরি পাঁচবার টেষ্ট ম্যাচে শতাধিক রাণ ক'রে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ইংলণ্ড—দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট : ইংলণ্ড : ৬০৮ (ওয়াসব্রুক ১৯৫, হাটন ১৫৮, ডেনিস কম্পটন ১১৪। ম্যাকার্থি ১০২ রাণে ৩ এবং ম্যান ১০৭ রাণে ৩ উইঃ)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩১৫ (মিচেল ৮৬, ওয়েড ৮৫। ...৭ এবং রাইট ১০৪ রাণে ৩ উইঃ) ও ভারতে সফর ... রোয়েন ১৫৬ নট আউট, ডি নোর্স ৫৬ নট আউট)।

ইংলণ্ড-বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা ড্র গেছে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ : ইংলণ্ড : ৩০৮—প্রথম ইনিংস (ওয়াসব্রুক ৭৪। রোয়েন ৮০ রাণে ৫ উইঃ) ও ২৭৬ —দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩৫৬—প্রথম ইনিংস (বি মিচেল ১২০, এ ডি নোর্স ১১২। কম্পটন ৭০ রাণে ৫ উইঃ) ও ১৪৪—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইঃ)।

টেনিস ঃ

স্থাশনাল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে দিলীপ বসু ৩-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৮-৬ গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে সুমন্ত মিশ্র ও শ্রীমতী মোদী ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে দিলীপ বসু ও শ্রীমতা কে সিংকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে দিলীপ বসু ও নরেন্দ্রনাথ ৭-৫, ৬-২ এবং ৬-৪ গেমে সুমন্ত মিশ্র এবং রমা রাওকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী কে সিংহ ৩-৬, ৯-৭ এবং ৬-৩ গেমে কুমারী পি খান্নাকে পরাজিত করেন।

টেষ্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী ঃ

এ পর্য্যন্ত ১৩ জন ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের ইতিহাসে একই টেষ্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসের খেলাতেই সেঞ্চুরী করেছেন। সর্ব্বশেষ এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন ই উইকস ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেষ্ট খেলাতে। একমাত্র হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং জর্জ্জ হেডলে ছাড়া অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে দু'বার এই সম্মান লাভ করতে পারেননি। ভবিষ্যতে এ রেকর্ডও হয়তো আর থাকবে না।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত